বিশ্বের শ্রেষ্ঠ
ভূতের গল্প

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

ভূতের গল্প

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

প্রীতি পালচৌধুরী

৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

ঃ প্রথম শুভম্ সংস্করণ ঃ

রথযাত্রা (১৪২০)

ঃ প্রকাশক ঃ

ঐশানী সাহা

শুভম্

৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

ঃ প্রচ্ছদ ঃ

সুবল সরকার

ঃ অলঙ্করণ ঃ

সত্যদেব ও সুবল সরকার

ঃ অক্ষর বিন্যাস ঃ

শৈব্যা বুকস্ অ্যান্ড লেজার

৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

ঃ মুদ্রণ ঃ

আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স

এপিসি রোড, কলকাতা-৬

ঃ মূল্য ঃ

১৭০ টাকা

ভূমিকা

ভাবতে অবাক লাগে, এই একুশ শতকেও ভূতের গল্পের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং বলা যায় গত কয়েক বছরে ভৌতিক কাহিনীর প্রতি আমাদের টান আগের থেকে আরও বেড়ে গেছে। তাই বোধহয় একটির পর একটি সফল চলচ্চিত্রের জন্ম হচ্ছে, যা ভৌতিক কাহিনীকে আশ্রয় করেই নির্মিত হয়েছে। ভূতের গল্পের প্রতি এই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের মূলে কী আছে? সমাজ বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন মানুষ আজ দৈনন্দিন জীবনযাপনে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই ক্লান্তি অপনোদনের জন্য সে সাহিত্যের কাছে আশ্রয় নেয়। ভালোবাসে কল্পনা মিশ্রিত ভৌতিক গল্প পড়তে, যার মধ্যে ঈষৎ বাস্তবতার ছোঁয়া আছে।

এইসব পাঠক-পাঠিকার কথা মাথায় রেখে আমরা বিশ্বসাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্পগুলিকে দুই মলাটের মধ্যে গ্রন্থিত করে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। আমাদের এই প্রয়াস কতখানি সার্থক হয়েছে তা আপনারাই বিচার করবেন। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার, তা হল বিশ্বসাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে প্রবেশ করে গল্প নির্বাচন করা দুরূহ কাজ। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থেকেই যাবে। জায়গা না থাকাতে আমরা অনেক বিখ্যাত গল্পকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। ভবিষ্যতে হয়তো সেইসব গল্পগুলিকে নিয়ে আর একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হবে।

বর্তমান সঙ্কলনে বিশ্বসাহিত্যে পরিচিত ভৌতিক গল্প সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছেন এরই পাশাপাশি আমরা বাংলা সাহিত্যের ভৌতিক গল্পের ধারাটির কথাও মনে রেখেছি বাংলা ভাষায় এমন অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভৌতিক গল্প লেখা হয়েছে যার কোনো তুলনা নেই। যদিও মূলত এই সঙ্কলনটি কিশোর-কিশোরী, পাঠক-পাঠিকাদের কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে, কিন্তু সম্পাদক হিসাবে আমার স্থির বিশ্বাস এই সঙ্কলন গ্রন্থটি সব বয়সের পাঠক-পাঠিকাকে একইভাবে আকর্ষণ করবে।

এখানে যেসব সাহিত্যিকের নির্বাচিত ছোটো গল্প স্থান পেয়েছে ভবিষ্যতে যদি আপনারা তাঁর লেখা অন্যান্য গল্পগুলিও পড়ে ফেলেন তাহলে সম্পাদক হিসাবে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

—সম্পাদক

সূচীপত্র

গুপি গায়েন বাঘা বায়েন

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপি কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন। তার একটা মুদীর দোকান ছিল। গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির ক'রে বলত গুপি 'গাইন'।

গুপি যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব ক'রেই গাইত; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে ব'সে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গান গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চ'লে গেল ; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতর গিয়ে খুব ক'রে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপিদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলতে থাকত, আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিঁচোত, আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ ক'রে থাকত আর বলত, 'আহা! আ-আ-আ!! অ-অ-অ-হ্-হ্-হ্!!!' শেষে যখন, 'হাঃ, হাঃ, হা-হা!' ব'লে বাঘের মতো খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে প'ড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা বাইন।' তার এই বাঘা নামই রটে গিয়েছিল ; আসল নাম যে তার কি, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা ক'রে ঢোলক ভাঙত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বলল, 'তুমি না পার, নাহয় আমরাই সকলে চাঁদা ক'রে ঢোলকের পয়সাটা দি। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে!' শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা

করে বাঘাকে ঢোলক কিনে দেবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছেঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে-তিন হাত চওড়া, আর ছাউনি মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যার পর নাই খুশি হয়ে বলল, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব।'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিনকতক এইভাবে চললে কি হত বলা যায় না। এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বললে, 'লক্ষ্মী, দাদা! তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব!'

বাঘা আর কি করে? কাজেই তখন তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হল। সেখানে দুদিন না থাকতে সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার ক'রে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় ক'রে বলে, 'বাঁচলাম!'

তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না। আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, 'আর না! মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চ'লে যাওয়াই ভাল। না হয় বাঘে খাবে, তবু আমার বাজনা চলবে!' এই ব'লে বাঘা তার ঢোলকটিকে ঘাড়ে ক'রে বনে চ'লে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ-ভালুক কিছু নেই। আছে খালি একটা ভয়ানক জানোয়ার ; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায় নি, শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো। ওটা এলেই ত ঢোলক-সুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে!'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু কেউ নয়, সে গুপি গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে, সে গুপির গলা ভাঁজা। গুপিও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মতো ভয়ে কাঁপে। শেষে একটু ভাবল, 'এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।' এই ভেবে গুপি চুপিচুপি বন থেকে

বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে আর-একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায় ক'রে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারী আশ্চর্য হয়ে গুপি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে?'

বাঘা বললে, 'আমি বাঘা বাইন ; তুমি কে?'

গুপি বললে, 'আমি গুপি গাইন ; তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বাঘা বললে, 'যেখানে জায়গা জোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গানবাজনা বোঝে না, তাই ঢোলটি নিয়ে বনে চ'লে এসেছিলাম। তা ভাই, এখানে যে ভয়ঙ্কর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না। তাই পালিয়ে যাচ্ছি।'

গুপি বললে, 'তাই ত! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বলো ত, তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় ব'সে ডাকতে শুনেছিলে?'

বাঘা বললে, 'বনের পূর্বধারে, বটগাছের তলায়।'

গুপি বললে, 'আচ্ছা, সে যে আমারই গান শুনেছ। সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে, হরতুকীতলায় ব'সে।'

বাঘা বললে, 'সে ত আমার ঢোলকের আওয়াজ, আমি যে ঐখানে থাকতাম।'

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন যে দুজনার কি হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপি বললে, 'ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন! আমরা দুজনে জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করতে পারি।'

এ কথায় বাঘারও খুবই মত হল। কাজেই তারা খানিক কথাবার্তার পর ঠিক করল যে, তারা দুজনায় মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে, রাজা মশাই যে তাতে খুব খুশি হবেন, তাতে ত আর ভুলই নেই, চাই কি অর্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিতে ফেলতে পারেন।

গুপির আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শোনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল ; সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ি যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়। বেচারারা বন থেকে এসেছে পয়সা কোথায় পাবে! তারা বলল, 'ভাই, আমাদের কাছে ত পয়সা-টয়সা নেই, আমরা না হয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব, আমাদের পার ক'রে দাও।' তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুশি হয়ে নেয়েকে বলল, 'আমরা চাঁদা ক'রে এদের পয়সা দেব, তুমি এদের তুলে নাও।'

বাঘার ঢোলটি দেখেই নেয়েরও বাজনা শুনতে ভারী সাধ হয়েছিল, কাজেই সে এক কথায় আর কোন আপত্তি করল না। গুপিকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। নৌকোভরা লোক, ব'সে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকোও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল। তারপর খানিকটা একটু গুনগুনিয়ে গুপি গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকোসুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি ক'রে দিল নৌকোখানাকে উল্‌টে।

তখন ত আর বিপদের অন্ত নেই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলকটি এত বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধ'রে দুজনার প্রাণরক্ষা হল। কিন্তু তাদের আর রাজবাড়ি যাওয়া ঘটল না। তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে শেষে সন্ধ্যাবেলায় এক ভীষণ বনের ভিতর গিয়ে কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, রাত্রির ত আর কথাই নেই। তখন বাঘা বলল, 'গুপিদা, বড়ই ত বিষম দেখছি! এখন কি করি বল ত।' গুপি বলল, 'করব আর কি? আমি গাইব, তুমি বাজাবে। নিতান্তই যখন বাঘে খাবে, তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?'

বাঘা বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা। মরতে হয় ত ওস্তাদ লোকের মতন মরি, পাড়াগেঁয়ে ভূতের মতো মরতে রাজি নই!'

এই ব'লে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান বাজনা শুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজা ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যারপরনাই গম্ভীর। আর গুপিও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কি জমাট হয়েছিল, সে আর কি বলব? এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা ক'রে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল, যেন চারিদিকে একটা কি কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো, এই বড় বড় কি যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে; তাদের চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মুলোর সার। তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনার হাত-পা গুটিয়ে, পিঠ বেঁকে, ঘাড় ব'সে, চোখ বেরিয়ে মুখ হাঁ করে এল। তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠকঠকি ধ'রে গেল যে আর তাদের ছুটে পালাবারও জো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না। তারা তাদের গান বাজনা শুনে ভারী খুশি হয়ে এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপির আর বাঘার বায়না

করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকিসুরে বলল, 'থামলি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!'

এ কথায় গুপির আর বাঘার একটু সাহস হল ; তারা ভাবল, 'এ ত মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখি না।' এই ব'লে যেই তারা আবার গান ধরেছে, অমনি ভূতেরা একজন দুজন ক'রে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কি কাণ্ডকারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখলে বোঝবার জো আছে! গুপি আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমঝদারের দেখা পায় নি। সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল। ভোর হলে ত আর ভূতেদের বাইরে থাকবার জো নেই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বলল, 'চল্ বাবা মোদের গোদার বেটার বে'তে! তোদের খুশি ক'রে দিব।'

গুপি বলল, 'আমরা যে রাজবাড়ি যাব!' ভূতেরা বলল, 'সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ি একটু গানবাজনা শুনিয়ে যা! তোদের খুশি করে দিব!' কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ি চলল। সেখানে গান-

বাজনা যা হল, সে আর ব'লে কাজ নেই। তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বলল, 'তোরা কি চাস?'

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুশি করতে পারি।' ভূতেরা বলল, 'তাই হবে, তোদের গানবাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখানে থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কি চাস?'

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে আমাদের যেন খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়।' এ কথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বলল, 'তোরা যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কি চাস?'

গুপি বলল, 'আর কি চাইব, তা ত বুঝতে পারছি না!' তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে দুজোড়া জুতো এনে দিয়ে বলল, এই জুতো পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।'

তখন ত আর কোন ভাবনাই রইল না। গুপি আর বাঘা ভূতদের কাছে বিদায় হয়ে, সেই জুতো পায়ে দিয়েই বলল, 'তবে আমরা এখন রাজবাড়ি যাব।' অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ; গুপি আর বাঘা দেখল, তারা দুজনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় আর সুন্দর বাড়ি তারা তাদের জীবনে কখনো দেখে নি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ি।

কিন্তু এর মধ্যে ভারী একটা মুশকিল হল। রাজবাড়ির ফটকে যমদূতের মতো কতকগুলো দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপি আর বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'এইয়ো! কাঁহা যাতা হ্যায়?' গুপি থতমত খেয়ে বলল, 'বাবা, আমরা রাজামশাইকে গান শোনাতে এসেছি।' তাতে দারোয়ানগুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বলল, 'ভাগো হিঁয়াসে।' গুপিও তখন নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'ঈস্! আমরা ত রাজার কাছে যাবই।' বলতেই অমনি সেই জুতোর গুণে, তারা তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাজামশায়ের সামনে উপস্থিত হল।

রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাজামহাশয় ঘুমিয়ে আছেন, রানী তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, গুপি আর বাঘা সেই সর্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হল। জুতোর এমনি গুণ, দরজা জানালা সব বন্ধ রয়েছে, তাতে তাদের একটুও আটকায় নি। কিন্তু আসবার বেলা আটকাক, আর নাই আটকাক, আসবার পরে খুবই আটকাল। রানী তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চিৎকার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন ; রাজামশাই লাফিয়ে উঠে পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে লাগলেন ; রাজবাড়িময় হুলস্থূল পড়ে গেল। সিপাই সান্ত্রী সব খাঁড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল।

বেগতিক দেখে গুপি আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি তখন শুধু বলে, 'আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব,' তবেই তাদের জুতোর গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সে কথা তাদের মনেই হল না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু-পা যেতে না যেতেই বেচারারা যে মারটা খেল! জুতো, লাঠি, চাবুক, কিল, চড়, কানমলা—কিছুই তাদের বাকি রইল না। শেষে রাজামশাই হুকুম দিলেন, 'বেটাদের নিয়ে তিন দিন হাজতে ফেলে রাখো। তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটব, না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

হায় গুপি! হায় বাঘা! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকশিশ পাবে ভেবে, তার মধ্যে এ কি বিপদ? পেয়াদারা বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে পড়ে বেচারারা একদিন আর গায়ের ব্যথায় নড়তে চড়তে পারল না। তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাঘার ঢোলটি যে গেল, সেই হল সর্বনাশের কথা! বাঘা বুক মাথা চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদছে, আর বলছে, 'ও গুপিদা।—ওঃ-ওঃ-হ্-হ্-হ্-হ্- অ-অ! আরে ও গুপিদা! মার খেলাম, প্রাণ যাবে, তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু দাদা, আমার ঢোলকটি যে গেল!'

গুপির কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে বাঘার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ভয় কি দাদা? ঢোল গিয়েছে, জুতো আর থলে ত আছে। আমরা নিতান্ত বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম। যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটা মজা ক'রে নিতে হবে।' বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল, 'কি মজা হবে দাদা?' গুপি বলল, 'আগে ত খাবার মজাটা ক'রে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখব এখন।'

এই ব'লে সেই ভূতের দেওয়া থলির ভিতরে হাত দিয়ে বলল, 'দাও ত দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও।' অমনি একটা সুগন্ধ যে বেরুল! তেমন পোলাও রাজারাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কি বিশাল হাঁড়ি! গুপি কি সেটা থলির ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক, কোনমতে সেটাকে বার ক'রে এনে তারপর থলিকে বলল, 'ভাজা, ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, শরবত। শিগ্‌গির দাও।' দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনা-রূপোর বাসনে ভ'রে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার আর ঠিক নেই।

তখন বাঘা বলল, 'দাদা চলো এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।' গুপি বলল, 'পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতো থাকতে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক-না, কি হয়।' এ কথায় বাঘা খুব খুশি হল ; সে বুঝতে পারল যে, গুপিদা একটা-কিছু মজা করবে।

দুদিন চ'লে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপি থলের ভিতর হাত দিয়ে বলল, 'আমাদের দুজনের রাজপোশাক চাই।' বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোশাক বেরুল যে তেমন পোশাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। সেই পোশাক তারা দুজনে প'রে, তাদের পুরনো কাপড় আর বাসন কখানি পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে জুতো পায় দিয়ে তারা বলল, 'এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।' অমনি দেখে, রাজবাড়ির বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চ'লে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় তাদের পুঁটুলিটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে এসে রাজবাড়ির সামনে উপস্থিত হল।

দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, 'মহারাজ, দুজন রাজা আসছেন।' রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঘা আর গুপি আসতেই তিনি তাদের যারপরনাই আদর দেখিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পেয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল তার অন্ত নেই।

তারপর গুপি আর বাঘা হাত-পা ধুয়ে জলযোগ ক'রে একটু ঠাণ্ডা হলেই রাজামশাই তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোশাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, 'না-জানি এঁরা কত বড় রাজাই হবেন।' তারপর শেষে যখন তিনি গুপিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোন্ দেশের রাজা?' তখন গুপি হাত জোড় ক'রে তাঁকে বলল, 'মহারাজ! আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর!'

গুপি সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, 'কি ভাল মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় রাজা তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি!' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দুজনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সেদিন সে দুটো লোকের বিচার হবে—তিনদিন আগে যারা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত, আসামী দুটোকে আনতে পেয়াদা গিয়েছে ; কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হল, সেখানে কেউ নেই, খালি ঘর প'ড়ে আছে।

তখন ত ভারী একটা ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি প'ড়ে গেল। দারোগামশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পেয়াদাগুলোকে বকতে লাগলেন। পেয়াদারা হাত জোড় ক'রে বলল, 'হুজুর! আমাদের কোন কসুর নেই ; আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ও দুটো ত মানুষ ছিল

না, ও দুটো ছিল ভূত; নইলে এর ভিতর থেকে কি ক'রে পালাল?'

এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল। রাজামশাইও প্রথমে দারোগার উপর রেগে তাঁকে কেটেই ফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বললেন, 'ঠিক ও দুটো নিশ্চয় ভূত। আমার ঘরও ত বন্ধ ছিল, তার ভিতর এত বড় ঢোল নিয়ে কি ক'রে ঢুকেছিল?'

তা শুনে সকলেই বলল, 'হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!' বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলকটির কথা মনে ক'রে বলল, 'মহারাজ! ভূতের ঢোল বড় সর্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখুনি পুড়িয়ে ফেলুন।'

রাজামশাইও বললেন, 'বাপ রে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব? এক্ষুনি ওটাকে এনে পোড়াও!'

যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দুহাতে চোখ ঢেকে 'হাউ-হাউ-হাউ-হাউ' ক'রে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

সেদিন বাঘাকে নিয়ে গুপির কি মুশকিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না-জানি সে কি করবে। তখন, সেটা যে তারই ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? সর্বনাশ! এখন বুঝি ধরা প'ড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়।

গুপির বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তার ত আর জো নেই ; সভায় বসবার সময় যে সেই জুতোগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এদিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক বিষম হুলুস্থূল প'ড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারী অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ির বদ্যিঠাকুর এসে বাঘার নাড়ী দেখে যারপরনাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব ক'রে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বদ্যিঠাকুর বললেন, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর-একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকলে ভাবল যে, বদ্যিঠাকুর কি চমৎকার ওষুধই দিয়েছেন, দিতে বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা প'ড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হল। রাজামশাই তখন তাকে খুব যত্নের সহিত তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন ; গুপি তার কাছে ব'সে তার বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে গুপি বাঘাকে বলল, 'ছি ভাই, যেখানে-সেখানে কি এমন ক'রে কাঁদতে আছে। দেখ দেখি, এখন কি মুশকিলটা হল।' বাঘা বলল, 'আমি যদি না কাঁদতুম, তা হলে ত এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিত। এখন না হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা ত বেঁচে গেছে!'

বাঘা আর গুপি এমনি কথাবার্তা বলছে। এদিকে রাজামশাই সভায় ফিরে এলে দারোগামশাই তাঁর কানে কানে বললেন, 'মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় ত বলি।' রাজা বললেন, 'কি কথা?' দারোগা বললেন, 'মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ঐ লোকটা সেই দুই ভূত; আমি চিনতে পেরেছি।' রাজা বললেন, 'তাই ত হে, আমারও একটু যেন সেইরকম ঠেকছিল। তা হলে ত বড় মুশকিল দেখছি। বলো ত এখন কি করা যায়?'

তখন এ কথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারী একটা কানাকানি শুরু হল। কেউ বলল, 'রোজা ডাকো, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক।' আর-একজন বলল, 'রোজা যদি তাড়াতে না পারে তখন ত সে দুটো ক্ষেপে গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে। তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না।'

এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এর মধ্যে একটু মুশকিল এই দেখা গেল যে, ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়িতেও তখন আগুন ধ'রে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে, একটা বাগানবাড়িতে তাদের বাসা দেওয়া হবে ; বাগানবাড়ি পুড়ে গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। রাজামশাই বললেন, 'সেই ঢোলকটাকেও তা হলে সেই বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখা যাক ; বাগানবাড়ি পোড়াবার সময় একসঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে।'

বাগানবাড়ি যাবার কথা শুনে গুপি আর বাঘা খুব খুশি হল। তারা ত জানে না যে এর ভিতর কি ভয়ানক ফন্দি রয়েছে ; তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সংগীতচর্চার সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়িটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভাল হয়ে গেল। তখন গুপি তাকে বলল, 'ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কি? চলো আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।' বাঘা বলল, 'দাদা, এমন সুন্দর জায়গায় ত আর থাকতে পাব না, দুদিন এখানে রইলাম বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাকত!'

সেদিন বাঘা বাড়ির এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপি বাগানের এক জায়গায় ব'সে গুনগুন করছে এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চেঁচামেচি ক'রে উঠল। তার

সকল কথা বোঝা গেল না, খালি 'ও গুপিদা। ও গুপিদা!' ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপি তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলকট্যা মাথায় ক'রে পাগলের মতো নাচছে, আর যা-তা আবোল-তাবোল বলতে বলতে 'গুপিদা গুপিদা' বলে চেঁচাচ্ছে। ঢোলক পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে, সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি ক'রে প্রায় আধঘণ্টা চ'লে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বলল, 'গুপিদা, দেখছ কি, এই ঘরে আমার ঢোলকটি—আর কি মজা—হাঃ হাঃ হাঃ' ব'লে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বলল, 'দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি, একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নিই।' গুপি বলল, 'এখন নয় ভাই, এখন বড্ড খিদে পেয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় ব'সে দুজনায় ব'সে খুব ক'রে গানবাজনা করা যাবে।'

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যার সময় সেই বাগানবাড়িতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগামশায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন, খাওয়াদাওয়ার পর গুপি আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে সেই কাঠের বাড়ির চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভালমতই হল। গুপি আর বাঘা ভাবল যে লোকজন চ'লে গেলেই তারা গান বাজনা আরম্ভ করবে, দারোগামশাই ভাবলেন যে গুপি আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তারা না ঘুমোলে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপি বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শ'য়ে নাক ডাকতে লাগল।

একটু পরেই গুপি আর বাঘা দেখল যে লোকজন সব চ'লে গেছে, আর কারু সাড়াশব্দ নেই। তারপর আর একটু দেখে, যখন মনে হল যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান জুড়ে দিল।

এদিকে দারোগামশাই তাঁর লোকদের ব'লে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল ক'রে আগুন ধরাবি ; খবরদার আগুন ভাল ক'রে না ধরলে চ'লে যাস নি যেন!' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভালমতই ধরেছে, দারোগামশাই ভাবছেন, 'এই বেলা ছুটে পালাই' এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপিও গান ধ'রে দিল। তখন আর দারোগামশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখান থেকে নড়বার জো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে

হল। ততক্ষণে গুপি আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতোর জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখানে থেকে চম্পট দিল।

সেদিনকার আগুনে দারোগামশাই ত পুড়ে মারা গিয়েছিলেন তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচেছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আর দু-চার জন লোক রাজসভায় এসে বলল যে, তারা সেই আগুনের তামাশা দেখতে সেখানে গিয়েছিল ; তারা তখন ভারী আশ্চর্যরকমের গান-বাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যা রাজামশায়ের কাঁপুনি! সেদিন তাঁর সভা করা হল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপি আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ির কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা-বাপকে দেখে যায়। বনে এসেই বাঘা বলল, 'গুপিদা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল?' গুপি বলল, 'হ্যাঁ!' বাঘা বলল, 'তবে এমন জায়গায় এসে কি একটু গান-বাজনা না ক'রে চলে যেতে আছে?' গুপি বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই, তবে আর দেরি কেন? এই বেলা আরম্ভ ক'রে দাও।' এই ব'লে তারা প্রাণ খুলে গান-বাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা হয়েছে। এক দল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলে দুটিকে সুদ্ধ চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও ধরতে পারছিলেন না। গুপি আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলো সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে গান একবার শুনলে ত আর তার শেষ অবধি না শুনে চ'লে যাবার জো নেই ; কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাত্রের ভিতরে আর সে গান-বাজনাও থামল না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধ'রে ফেললেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে, গুপি আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন, তখন আর তাদের আদর দেখে কে? রাজকুমারেরাও বললেন, 'বাবা, এমন আশ্চর্য গান আর কখ্খনো শোন নি ; এদের সঙ্গে নিয়ে চলো!' কাজেই রাজা গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে চলো! তোমাদের পাঁচশো টাকা ক'রে মাইনে হল।'

এ কথায় গুপি জোড়হাতে রাজামশাইকে নমস্কার ক'রে বলল, 'মহারাজ, দয়া ক'রে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতা-

মাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।' রাজা বললেন, 'আচ্ছা, এ দুদিন আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি ; তোমরা তোমাদের মা-বাপকে দেখে দু'দিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।'

গুপিকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মেলে নি। তার মা-বাপ এর কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় ক'রে আসতে দেখেই বললে, 'ঐ রে! সেই বাঘা বেটা আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে ; মার বেটাকে!' বাঘা বিনয় ক'রে বলল, 'আমি খালি আমার মা-বাবাকে দেখতে এসেছি ; দুদিন থেকেই চ'লে যাব, বাজাব-টাজাব না।' সে কথা কি তারা শোনে? তারা দাঁত খিঁচিয়ে মৃত্যুর কথা বলে এই বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল, সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ইঁট মেরে তার পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি ক'রে দিল।

গুপি তাদের ঘরের দাওয়ায় ব'সে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সে দেখল যে বাঘা পাগলের মতো হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে; তার কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? তোমার এ দশা কেন?' গুপিকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি! মূর্খগুলো আর একটু হলেই আমার ঢোলটি ভেঙে দিয়েছিল!' গুপিদের বাড়ি'এসে গুপির যত্নে আর তার মা-বাপের আদরে বাঘার দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পর গুপি তার মা-বাপের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ব'লে গেল, 'তোমরা তয়ের হয়ে থাকবে ; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।'

তারপর কয়েক মাস চ'লে গিয়েছে। গুপি আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়িতে পরম সুখে বাস করে। দেশ বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে—'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয় নি, হবেও না।' রাজামশাই তাদের ভারী ভালোবাসেন ; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ সুখের কথা সব গুপির কাছে বলেন। একদিন গুপি দেখল রাজামশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কি ভাবছেন, যেন তাঁর কোন বিপদ হয়েছে। শেষে একবার তিনি গুপিকে বললেন, 'গুপি, বড় মুশকিলে পড়েছি, কি হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।'

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি যিনি গুপি আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনেই গুপির মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন

রাজামশাইকে বলল, 'মহারাজ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড ক'রে দেব।' রাজা হেসে বললেন, 'গুপি, তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধার না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারী ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি?' গুপি বলল, 'মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। ক্ষতি ত কিছু হবে না।' রাজা বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।' এ কথায় গুপি যারপরনাই খুশি হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপি আর বাঘা সেদিন অনেকক্ষণ ধ'রে পরামর্শ করেছিল। বাঘার তখন কতই উৎসাহ! সে বলল, 'দাদা, এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু এক কথায় একটু ভয় হচ্ছে ; হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয়, তবে হয়ত আমি জুতোর কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মতো কষে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি ক'রে দেখ-না সেবারে আমাদের গাঁয়ের মূর্খগুলোর হাতে আমার কি দশা হ'ল!'

যা হোক, গুপির কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল, আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিনকতক ধ'রে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চলে যায়, আর রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ঙ্কর ; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নেই। রাজার ঠাকুরবাড়িতে রোজ মহাধুমধামে পুজো হচ্ছে। দশ দিন এমনিতর পুজো দিয়ে, ঠাকুরকে খুশি ক'রে তারা হাল্লায় রওনা হবে।

গুপি আর বাঘা এর সবই দেখল, তারপর একদিন তাদের ঘরে ব'সে, দরজা এঁটে, সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বলল, 'নতুন ধরনের মিঠাই চাই, খুব সরেস।' সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার নয়। তেমনি মিঠাই কেউ খায় নি, চোখেও দেখে নি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপি শুণ্ডীর রাজার ঠাকুরবাড়ির বিশাল মন্দিরের চূড়োয় গিয়ে বসল। নীচে খুব পুজোর ধুম—ধূপধুনো শঙ্খঘণ্টা কোলাহলের সীমা নেই, আঙিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াৎ ক'রে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা আর গুপি মন্দিরের চূড়ো আঁকড়ে ব'সে তামাশা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধূপধুনা আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাইগুলো আঙিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে উঠল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দু-চারজন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে

তাদের একজন চোখ বুজে তার একটু মুখে পুরে দিল ; দিয়েই আর কথাবার্তা নেই—সে দুহাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আহ্লাদে চেঁচাচ্ছে। তখন সেই আঙিনা-সুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মতো কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েকজন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলছে, 'মহারাজ! ঠাকুর আজ পুজোয় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কি অপূর্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না।' সে কথা শুনবামাত্রই রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উঠোন ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখনি তিনি ভারী চটে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের কি অন্যায়। পুজো করি আমি, আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না! তোমাদের সকলকে ধ'রে শূলে চড়াব!' এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বলল, 'দোহাই মহারাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপ রে! আমরা খেতে না খেতেই ঝাঁ ক'রে কোন্‌খান দিয়ে ফুরিয়ে গেল! আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন ; কালকের যত প্রসাদ, সব মহারাজ একাই খাবেন।' রাজা তাতে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খবরদার! মনে থাকে যেন।'

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই একপ্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে ব'সে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে ব'সে তাঁকে ঘিরে তামাশা দেখছে। আর পুজোর ঘটা অন্যদিনের চেয়ে শতগুণ ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুশি হয়ে রাজামশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দেবেন।

রাত-দুপুরের সময় গুপি আর বাঘা আরো আশ্চর্যরকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চূড়োয় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোশাক, মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল ; তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপি আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চিৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিয়ে, দুহাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই ক'রে নাচনটা যে নাচলেন।

এমন সময় গুপি আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চূড়ো থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' ব'লে কে আগে গড়

করবে ভেবে ঠিক পায় না ; রাজামশাই ত লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপি তাঁকে বলল, 'মহারাজ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি ; এসো তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।' রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন ; দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি সে কি কম সৌভাগ্যের কথা?

কোলাকুলি আরম্ভ হল। সকলে 'জয় জয়' বলে চেঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপি আর বাঘা রাজামশাইকে খুব ক'রে জড়িয়ে ধ'রে বলল, 'এখন তবে আমাদের ঘরে যাব!' বলতে বলতেই তারা তাঁকে সুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ ধ'রে হাঁ ক'রে আকাশের পানে চেয়ে রইল। তারপর যখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে যার ঘরে এসে বলল, 'কি আশ্চর্যই দেখলাম! রাজামশাই সশরীরে স্বর্গে গেলেন! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন!'

এদিকে রাজামশাই গুপি আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয় নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে, সেই দুটো ভূত তাঁর মাথার কাছে ব'সে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে প'ড়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না! আমি দুশো মোষ মেরে তোমাদের পুজো করব।'

গুপি বলল, 'মহারাজ, আপনার কোন ভয় নেই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।' রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হল না। তিনি আর কোন কথা না ব'লে মাথা গুঁজে ব'সে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বলল, 'কাল রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধ'রে এনেছি ; এখন কি আজ্ঞা হয়?' হাল্লার রাজা বললেন, 'তাঁকে নিয়ে এসো!'

দুই রাজার যখন দেখা হল, তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধ'রে এনেছে। হাল্লা জয় করা ত তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়ত আমার রাজ্যও যেত, প্রাণও যেত। শুণ্ডীরাজ্যের অর্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম।' তখন খুবই একটা ধুমধাম হল। গুপি আর বাঘা হাল্লার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সঙ্গীতের চর্চা করতে লাগল। গুপির মা-বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে?

সূদন ওঝা

সুকুমার রায়

সূদন ছিল ভারী গরীব, তার একমুঠো অন্নের সংস্থান নাই। রোজ রোজ জুয়া খেলে লোককে ঠকিয়ে যা পায়, তাই দিয়ে কোনরকমে তার চলে যায়। যেদিন যা উপায় করে, সেইদিনই তা খরচ করে ফেলে, একটি পয়সাও হাতে রাখে না। এই রকম কয়েক বছর কেটে গেল; ক্রমে সূদনের জ্বালায় গ্রামের লোক অস্থির

হয়ে পড়ল, পথে তাকে দেখলেই সকলে ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা দেয়। সে এমন পাকা খেলোয়াড় যে কেউ তার সঙ্গে বাজি রেখে খেলতে চায় না।

একদিন সূদন সকাল থেকে রাস্তায় ঘুরে বেরোচ্ছে, গ্রামময় ঘুরেও কাউকে দেখতে পেল না। ঘুরে ঘুরে নিরাশ হয়ে সূদন ভাবল—"শিব মন্দিরের পুরুতঠাকুর ত মন্দিরেই থাকে—যাই, তার সঙ্গেই আজ খেলব।" এই ভেবে সূদন সেই মন্দিরে চলল। দূর থেকে সূদনকে দেখেই পুরুত ঠাকুর ব্যাপার বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মন্দিরের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

মন্দিরের পুরুতকে না দেখতে পেয়ে সূদন একটু দমে গেল বটে, কিন্তু তখনই স্থির করল—'ধাঃ—তবে আজ মহাদেবের সঙ্গেই খেলব।' তখন মূর্তির সামনে গিয়ে বলল—"ঠাকুর! সারাদিন ঘুরে ঘুরে এমন একজনকেও পেলাম না, যার সঙ্গে খেলি! রোজগারের আর কোন উপায়ও আমি জানি না, তাই এখন তোমার সঙ্গেই খেলব। আমি যদি হারি, তোমার মন্দিরের জন্য খুব ভাল একটি দাসী এনে দিব, আর তুমি যদি হার, তবে তুমি আমাকে একটি অপ্সরা মেয়ে দিবে—আমি তাকে বিয়ে করব" এই বলে সূদন মন্দিরের মধ্যে ঘুঁটি পেতে খেলতে বসে গেল। খেলার দান ন্যায়মতো দুই পক্ষই সূদন দিচ্ছে—একবার নিজের হয়ে একবার দেবতার হয়ে খেলছে! অনেকক্ষণ খেলার পর শেষে সূদনেরই জিত হল। তখন সে বলল—"ঠাকুর। এখন ত আমি বাজি জিতেছি, এবার পণ দাও।" পাথরের মহাদেব কোন উত্তর দিলেন না। একেবারে নির্বাক রইলেন। তা দেখে সূদনের হল রাগ। "বটে! কথার উত্তর দাও না কেমন দেখে নেব"—এই বলেই সে করল কি, মহাদেবের সম্মুখে যে দেবীমূর্তি ছিল সেটি তুলে নিয়েই উঠে দৌড়।

সূদনের স্পর্ধা দেখে মহাদেব ত একেবারে অবাক! তখনি ডেকে বললেন "আরে, আরে, করিস কি? শীগগির দেবীকে রেখে যা। কাল ভোরবেলা যখন মন্দিরে কেউ থাকবে না, তখন আসিস, তোকে পণ দিব।" এ কথায় সূদন দেবীকে ঠিক জায়গায় রেখে চলে গেল।

এখন হয়েছে কি, সেই রাতে একদল স্বর্গের অপ্সরা এল মন্দিরে পুজো করতে। পুজোর পর সকলে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলে, মহাদেব রম্ভা ছাড়া সকলকে যেতে বললেন, সকলেই চলে গেল, রইল শুধু রম্ভা। ক্রমে রাত্রি প্রভাত না হতে সূদন এসে হাজির। মহাদেব রম্ভাকে পণস্বরূপ দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

সূদনের আহ্লাদ দেখে কে! অপ্সরা স্ত্রীকে নিয়ে অহংকারে বুক ফুলিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। সূদনের বাড়ি ছিল একটা ভাঙা কুঁড়ে, অপ্সরা মায়াবলে আশ্চর্য

সুন্দর এক বাড়ি তৈরী করল। সেই বাড়িতে তারা পরম সুখে থাকতে লাগল। এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল!

সপ্তাহে একদিন, রাত্রে অপ্সরাদের সকলকে ইন্দ্রের সভায় থাকতে হয়। সেই দিন উপস্থিত হলে, রম্ভা যখন ইন্দ্রের সভায় যেতে চাইল, তখন সূদন বললে—"আমাকে সঙ্গে না নিলে কিছুতেই যেতে দেব না।" মহা মুশকিল। ইন্দ্রের সভায় না গেলেও সর্বনাশ—দেবতাদের নাচ গান সব বন্ধ হয়ে যাবে—আবার সূদনও কিছুতেই ছাড়ছে না। তখন রম্ভা মায়াবলে সূদনকে একটা মালা বানিয়ে গলায় পরে নিয়ে ইন্দ্রের সভায় চলল। সভায় গিয়ে সূদনকে মানুষ করে দিলে পরে, সে এক কোণে লুকিয়ে বসে সব দেখতে লাগল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলে, নাচগান সব থেমে গেল। রম্ভা সূদনকে আবার মালা বানিয়ে গলায় পরে চলল তার বাড়িতে। বাড়ির কাছে একটা নদীর কাছে এসে রম্ভা তাকে আবার মানুষ করে দিল, তখন সূদন বলল—"তুমি বাড়ি যাও, আমি এই নদীতে স্নান ও আহ্নিক করে পরে যাচ্ছি।"

এই নদীর ধারে ছিল ত্রিভুবন তীর্থ। এখানে দেবতারা পর্যন্ত স্নান করতে আসতেন। সেদিন সকালেও ছোটোখাটো অনেক দেবতা নদীর ঘাটে স্নান করছিলেন। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখে সূদন চিনতে পারল—তাঁরা রাত্রে ইন্দ্রের সভায় রম্ভাকে খুব খাতির করছিলেন। সূদন ভাবল—'আমার স্ত্রীকে এরা এত সম্মান করে তাহলে আমাকে কেন করবে না?' এই ভেবে সে খুব গম্ভীর ভাবে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল—যেন সেও ভারী একজন দেবতা। কিন্তু দেবতারা তাকে দেখে অত্যন্ত অবজ্ঞা ক'রে তার দিকে ফিরেও চাইলেন না।—তাঁরা তাঁদের স্নান ও আহ্নিকেই মন দিলেন। এ তাচ্ছিল্য সূদনের সহ্য হল না। সে করল কি, একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে দেবতাদের বেদম প্রহার দিয়ে বলল—"এতবড় আস্পর্দ্ধা! আমি রম্ভার স্বামী, আমাকে তোরা জানিস নে?" দেবতারা মার খেয়ে ভাবলেন ' কি আশ্চর্য! রম্ভা কি তবে মানুষ বিয়ে করেছে?' তাঁরা তখনই স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে সব কথা বললেন।

এদিকে সূদন বাড়ি গিয়েই হাসতে হাসতে স্ত্রীর কাছে তার বাহাদুরির কথা বলল। শুনে রম্ভার ত চক্ষুস্থির, স্বামীর নির্বুদ্ধিতা দেখে লজ্জায় সে মরে গেল, আর বলল—"তুমি সর্বনাশ করেছ। এখনি আমাকে ইন্দ্রের সভায় যেতে হবে।" দেবতারা ইন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করলে পর ইন্দ্রের যা রাগ। এতবড় স্পর্দ্ধা! স্বর্গের অপ্সরা হয়ে রম্ভা পৃথিবীর মানুষ বিয়ে করেছে? ঠিক সময় রম্ভাও গিয়ে সেখানে উপস্থিত! তাকে দেখেই ইন্দ্রের রাগ শতগুণ বেড়ে উঠল। আর তিনি তৎক্ষণাৎ শাপ দিলেন, "তুমি স্বর্গের অপ্সরা হয়ে মানুষ বিয়ে করেছ, আবার

তাকে লুকিয়ে স্বর্গে এনে আমার সভায় নাচ দেখিয়েছ এবং স্পর্দ্ধা করে সেই লোক আবার দেবতাদের গায়ে হাত তুলেছে ঃ অতএব, আমার শাপে তুমি আজ হতে দানবী হও। বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের যে সাতটি মন্দির আছে সেই মন্দির চুরমার করে আবার যতদিন কেউ নতুন করে গড়িয়ে না দেবে, ততদিন তোমার শাপ দূর হবে না।

রম্ভা তখনি পৃথিবীতে এসে সূদনকে শাপের কথা জানিয়ে বলল—"আমি এখন দানবী হয়ে বারাণসী যাব। সেখানে বারাণসীর রাজকুমারীর শরীরে ঢুকব, আর লোকে বলবে রাজকুমারীকে ভূতে পেয়েছে। রাজা নিশ্চয়ই যত ওঝা কবিরাজ ডেকে চিকিৎসা করাবেন; কিন্তু আমি তাকে ছাড়ব না, তাই কেউ রাজকুমারীকে ভাল করতে পারবে না। এদিকে তুমি বারাণসী গিয়ে বলবে যে, তুমি রাজকুমারীকে আরাম করতে পারো। তারপর তুমি বুদ্ধি করে ভূত ঝাড়ানোর চিকিৎসা আরম্ভ করলে আমি একটু একটু করে রাজকুমারীকে ছাড়তে থাকব। তারপর তুমি রাজাকে বলবে যে, তিনি বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির চূর্ণ করে, আবার যদি নূতন করে গড়িয়ে দেন। তবেই রাজকুমারী সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। রাজা অবশ্য তাই করবেন আর তাহলেই আমার শাপ দূর হবে। তুমিও অগাধ টাকা পুরস্কার পেয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারবে।" এই কথা বলতে বলতেই রম্ভা হঠাৎ দানবী হয়ে, তখনই চক্ষের নিমেষে বারাণসী গিয়ে একেবারে রাজকুমারীকে আশ্রয় ক'রে বসল।

রাজকুমারী একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে, বিড় বিড় ক'রে বকতে বকতে সেই যে ছুটে বেরুলেন, আর বাড়িতে ঢুকলেনই না। তিনি শহরের কাছেই একটা গুহার মধ্যে থাকেন, আর রাস্তা দিয়ে লোকজন যারা চলে তাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মারেন। রাজা কত ওঝা বদ্যি ডাকলেন, রাজকুমারীর কোন উপকারই হলো না। শেষে রাজা ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন,—"যে রাজকুমারীকে ভাল করতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিব—রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিব।"

রাজবাড়ীর দরজার সামনে ঘন্টা ঝুলান আছে, নতুন ওঝা এলেই ঘন্টায় ঘা দেয়, আর তাকে নিয়ে গিয়ে রাজকুমারীকে চিকিৎসা করান হয়। সূদন রম্ভার উপদেশ মতো বারাণসী গিয়ে রাজকুমারীর পাগল হওয়ার কথা শুনে ঘণ্টায় ঘা দিল। রাজা তাকে ডেকে বললেন—"ওঝার জ্বালায় অস্থির হয়েছি বাপু! তুমি যদি রাজকুমারীকে ভাল করতে না পার, তবে কিন্তু তোমার মাথাটি কাটা যাবে।" এ কথায় সূদন রাজী হয়ে তখনই রাজকন্যার চিকিৎসা আরম্ভ করে দিল।

ভূতের ওঝারা ভড়ংটা করে খুব বেশী, সূদনও সেসব করতে কসুর করল না! ঘি, চাল, ধূপ, ধূনা দিয়ে প্রকাণ্ড যজ্ঞ আরম্ভ করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড়

করে হিজিবিজি মন্ত্র পড়াও বাদ দিল না। যজ্ঞ শেষ করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেই পর্বতের গুহায় চলল, যেখানে রাজকন্যা থাকে। সেখানে গিয়েও বিড় বিড় ক'রে খানিকক্ষণ মন্ত্র পড়ল—"ভূতের বাপ—ভূতের মা—ভূতের ঝি,—ভূতের —ছা—দূর দূর দূর, পালিয়ে যা।" ক্রমে সকলে দেখল যে, ওঝার ওষুধে একটু একটু করে কাজ দিচ্ছে। কিন্তু ভূত রাজকুমারীকে একেবারে ছাড়ল না। তিনি তখনও গুহার ভিতরেই থাকেন, কিছুতেই বাইরে আসলেন না। যা হোক, রাজা সূদনকে খুব আদর যত্ন করলেন, আর, যাতে ভূতে একেবারে ছেড়ে যায়, সেরূপ ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। দুদিন পর্যন্ত সূদন আরও কত কিছু ভড়ং করল। তৃতীয় দিনে সে রাজার কাছে এসে বলল—"মহারাজ! রাজকুমারীর ভূত বড় সহজ ভূত নয়—এ হচ্ছে দৈবী ভূত। মহারাজ যদি এক অসম্ভব কাজ করতে পারেন—বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির চুরমার ক'রে, আবার নূতন ক'রে ঠিক আগের মতো গড়িয়ে দিতে পারেন,—তবেই আমি রাজকন্যাকে আরাম করতে পারি।"

রাজা বললেন—"এ আর অসম্ভব কি?" রাজার হুকুমে তখনই হাজার হাজার লোক লেগে গেল। দেখতে দেখতে মন্দিরগুলি চুরমার হয়ে গেল। তারপর একমাসের মধ্যে আবার সেই সাতটি মন্দির ঠিক যেমন ছিল তেমনটি করে, নতুন মন্দির গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীও সেরে উঠলেন, অপ্সরাও শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল। তারপর খুব ঘটা ক'রে সূদনের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হল আর রাজা বিয়ের যৌতুক দিলেন তাঁর অর্ধেক রাজত্ব।

বেঁশো ভূত

নজরুল ইসলাম

এক

শিবনগর গ্রামে ভূতের উপদ্রব খুব বেড়েছে। বিশেষ করে গ্রাম থেকে ডোমকল যাওয়ার রাস্তার পাশে মাঠের মধ্যে যে বড় বাঁশঝাড়টা আছে, সেখানে একদল বদখত ভূত-পেতনি আস্তানা গেড়েছে। আঁধার রাতে একা-একা কোনও পথচারীকে পেলে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। ছোট ছেলেমেয়ে পেলে তো তারা আরও মজা করে তাদের ঘাড় মটকাচ্ছে। ভূতের ভয়ে রাতের বেলা একাকী ও-পথ দিয়ে হাঁটা একদম বন্ধ হয়ে গেছে।

এদিকে গ্রাম থেকে ডোমকল যাওয়া-আসার ওই একটিমাত্র পথ। আশপাশের মধ্যে ডোমকলে একটিমাত্র বাজার। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গ্রামের লোককে বাজারে যেতেই হয়। অপ্রয়োজনে যাওয়া বন্ধ করা যায়। কিন্তু প্রয়োজনে যাওয়া বন্ধ করবে কী করে? কারও বাজার করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে, তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। কারও বাড়িতে রাত্রিতে হঠাৎ অসুখের বাড়াবাড়ি, তাকে ডাক্তার ডাকতে যেতেই হবে। কারও স্কুলে পুরস্কার বিতরণী, তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। কারও যুক্তি করে বাজারে গিয়েও কী করে যেন বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তাকেও একাকী বাড়ি ফিরতেই হবে। আর ভূত-পেতনিগুলি ঠিক তখনই ওদের ধরবে।

ধরার জন্য পেতনিগুলি দারুণ এক ফন্দি বের করেছে।

"কীরকম ফন্দি?" গ্রামের শিবমন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন।

সমবেত লোকদের মধ্যে সমর মণ্ডল বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। সকলের পক্ষ থেকে সে উত্তর দিল, "বাঁশঝাড়ের যে কয়েকটা বাঁশ রাস্তার ওপর হেলে আছে, পেতনিগুলি তার ওপর সাদা কাপড় পরে বসে থাকছে।"

"তে-তে-তে-তে-তে-তে-তেইখা-খা-খা-খা-খানে তো ফ-ফ-ফ-ফন্দি।"

ভট্টাচার্যমশাই হাসতে-হাসতে আবার জিজ্ঞেস করলেন,"তা ফন্দিটা কী, সেটা তো বল!"

সমর রমেনকে নাড়া দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এই রমেন, একটু থাম না বাবা। আমি বুঝিয়ে বলছি। এই কয়েকটা বাঁশ তো রাস্তার ওপর নুয়ে আছে?"

"আছে!"

"রাস্তা দিয়ে আসতে হলে বাঁশটা উঁচু করে তুলে নীচে দিয়ে গলে আসতে হবে, নয় নীচের দিকে চেপে ধরে ডিঙিয়ে আসতে হবে।"

"হবে। এতে ফন্দির কী হল?"

"নিচু হয়ে গলে আসতে গেলে পেতনিগুলি বাঁশের ওপর চড়ে চেপে ধরছে। আবার বাঁশের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে আসতে গেলে বাঁশ সমেত চ্যাংদোলা করে তুলে ধপাস করে ফেলে দিচ্ছে।"

"না, তা হলে তো ভারী বিপদের কথা!"

"না হলে আর আপনার কাছে এসেছি কেন? আপনি এই ভূতগুলি তাড়ানোর একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন।"

ভট্টাচার্যমশাই একটু ভেবেচিন্তে নিয়ে বললেন, "প্রেতাত্মা যখন কোথাও একবার ভর করে তখন তাকে তাড়ানো ভারী শক্ত কাজ বাবা! তারপর সব শুনে যা মনে হচ্ছে, এ ব্রহ্মদৈত্য! হরেন ঘোষালের বউটা অপঘাতে ম'ল। তা ঘোষাল শ্রাদ্ধশান্তি তো ভালভাবে করল না! বেলগাছটা আশ্রয় করে ছিল। তা ঘোষাল বেলগাছটাও কেটে ফেলল। এখন মনে হচ্ছে আশ্রয়চ্যুত হয়ে ওটা ওই বাঁশঝাড়েই আশ্রয় নিয়েছে। তা তোমরা সবাই মিলে ঘোষালকে বলো। ভালভাবে শ্রাদ্ধশান্তি করুক। তা হলেই বউটার আত্মা শান্তি পাবে। কুপ্রভাবও কেটে যাবে।"

দুই

সকলে মিলে হরেন ঘোষালের বাড়ি গেল।

ঘোষাল তো শুনেই রেগে আগুন, 'ইয়ার্কি মারার জায়গা পাও না? আমার বউ মরে পেতনি হয়েছে? তাও আবার বাঁশঝাড়ের আগ্‌লেতে। তাতে ক্ষান্ত হয়নি। ভট্টাচার্যের কানে-কানে বলতে এসেছে? থাম, তোমাদের সবকটাকে চাব্‌কে ভূত ছাড়িয়ে দিচ্ছি!"

ভূত ছাড়ানোর জন্য অবশ্য কেউ অপেক্ষা করেনি। পালিয়ে চাবুকের হাত থেকে বেঁচেছিল। এখন হাঁপাতে-হাঁপাতে আবার রামকমল ভট্টাচার্যের কাছে গেল। এখন দেশসুদ্ধু লোকের ভোগান্তি।"

"সেটা তো বুঝলাম!" সমর বলল, "কিন্তু এখন এর বিহিত কী হবে?"

ভট্টাচার্যের কোন ভাবান্তর হল না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার নির্ণয় আমি জানিয়েছি। এখন ঘোষাল যদি না করে, তোমরা করো।"

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। তারা চাঁদা তুলে ভট্টাচার্যের বিধানমতো ঘোষালের বউয়ের শ্রাদ্ধ করল। ব্রাহ্মণভোজন করানো হল। মন্ত্র পড়া হল। যাগযজ্ঞ হল। ধূপ-ধূনো জ্বলল। কিন্তু ভূতের উপদ্রব কমল না। পেতনিগুলির

উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল।

আগে শুধু আঁধাররাতে হত। এখন জ্যোৎস্নারাতেও হচ্ছে।

তিন

পালেদের পটলা সেদিন বাজারে পুতুল বিক্রি করতে গিয়েছিল। পুতুল বিক্রি হতে রাত হয়। ব্যাগভর্তি বাজার করে ফিরছিল। বাজার ভর্তি ব্যাগ নিয়ে ডিঙিয়ে তো আসতে পারে না। যেই নিচু হয়ে বাঁশের তলা দিয়ে গলে আসতে গেছে, অমনি পেতনিগুলি বাঁশের ওপর চড়ে চেপে ধরেছে। পটলা তো ভয়ে গোঁ-গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরলে দেখে, সাদা কাপড় পরে একটা মেয়ে বাঁশঝাড়ের দিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

রতন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পটলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে পটলা, সত্যি কিনা বল না!"

"একদম সত্যি", পটলা শপথ করে বলল, " পেতনিডার গায়ে ধলো কাপুড় ছিল!"

"কী করা যায়?"

ওদিক থেকে তোতলা রমেন বলে উঠল, "ও-ও-ও-ও-ওঝা।"

পাশের গ্রাম কালুপুকুরের (কেউ কেউ বলে, আগে নাকি ওই গ্রামটার নাম ছিল কালীপুর) ফাঁকু ওঝার কথা রমেন আগেও কয়েকবার তুলেছিল। কেউ গুরুত্ব দেয়নি। ভট্টাচার্যের বিধান ব্যর্থ হওয়ার পর গুরুত্ব না দিয়ে আর কোন উপায় ছিল না। সমরও সায় দিল, " দেখাই যাক না! রতন, তুই একবার যা।"

রতন গিয়ে ফাঁকু ওঝাকে ধরে নিয়ে এল।

চার

ফাঁকু ওঝা তার পেল্লাই ভুঁড়ি, ইয়া বড়-বড় গোঁফ-দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর কাঁধে একটা ময়লামতো ঝুলি নিয়ে এসে বাঁশঝাড়ের পাশে রাস্তার ওপর বসে ঝুলির মধ্যে থেকে এটা-ওটা বের করতে লাগল। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরে ভূত কেমন, জানতে চাইছিল। ফাঁকু ওঝা বলল, "ভূত-পেতনি বলে কিছু নেই বাবাসকল। উনারা সব পরী-হুরি। পৃথিবীতে আমাদের যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি ওঁদেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই বাঁশঝাড়ে দেখছি একদল ভূতের আসর পড়েছে।"

"তা হলে কী হবে?"

"আমি এমন দোয়া পড়ব, সবাই পালাবে।"

"কিন্তু আপনি চলে গেলেই তো আবার আসবে।"

"সে গুড়ে বালি। আমি সমগ্র গাঁয়ের সীমানা বন্ধন করে দিয়ে যাব।"

"কেমন করে?"

"দ্যাখোই না।"

"ঝাঁকু ওঝা কিছু বাঁশের শুকনো পাতা এবং খড়কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালাল। ঝুলি থেকে একটা ঝাড়ুর মতো কী যেন বের করে দোলাতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করতে থাকল। ঝাড়ুর মতো ওটা দোলাতে-দোলাতে বাঁশঝাড়ের কাছে এসে আর একপ্রস্থ বিড়বিড় করে বলল, "আপদ দূর হয়েছে।"

রতন, সমরেরা খুব খুশি হয়ে ভূতের ওঝাকে বিদায় করল। কিন্তু ভূত-পেত্নীগুলিকে বিদায় করতে পারল না। ওগুলির উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। সাঁঝের বেলাতেই দাপাদাপি শুরু করে দিল।

পাঁচ

সাহাদের সনাতন মহাজনের ঘর থেকে ফিরছিল। সবে সন্ধে হয়েছে। গাঁয়ের সীমানা বন্ধ করা হয়েছে। আর সবে আঁধার হয়েছে। সনাতন একটু নিশ্চিন্ত মনেই

আসছিল। যেই না বাঁশটা ডিঙানোর জন্য পা বাড়িয়েছে, ভূতগুলি বাঁশটাকে সড়াত জোরে তুলে দিয়েছে। ফচকে ফটিক রসিকতা করে বলল, "বাঁশের ঝাপটায় সনাতন যখন চিতপটাং ভূতগুলি তখন দড়বড়াং।" সমর সনাতনের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি করে বল তো, ঠিক কী হয়েছিল?"

"আমি তো পড়ে গেছি। খুব ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছি। দেখি, একটা বড়-বড় শিংওয়ালা ভূত এসে আমার বুকের ওপর বসেছে, সারা গায়ে হাত বুলোচ্ছে! আমি ভয়ে আবার চিৎকার করে উঠেছি। উঠে দেখি, কিছু নেই! আরও ভয় পেয়ে গেছি!"

ভয় পাওয়ার মতোই ব্যাপার। কিন্তু উপায় কী করা যায়?

পাশের গ্রামের পলক দাঁড়িয়েছিল। সে বলে উঠল, "হাবু গোয়েন্দা, ডাবু গোয়েন্দাকে ডাকলে হয় না!"

"তারা আবার কে?"

"ভূত ধরার গোয়েন্দা।"

"ধুস, ভূত আবার ধরা যায় নাকি?"

"না সমরদা। পটলডাঙার রাজবাড়িতে ভূত ধরার গল্প শোনোনি? সত্যি ধরেছিল কিন্তু!"

সমরের ঠিক মনে পড়ছে না। তবে ছোঁড়াদুটোর খুব নাম ছড়িয়েছিল বটে! এমনি এমনি কি আর ছড়িয়েছিল? তা হলে ডাকা যেতে পারে। পলকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "পলকভাই তা হলে চলো একবার তাদের কাছেই যাই।"

পলক রাজি হয়ে গেল। সমরের সঙ্গে গিয়ে হাবু গোয়েন্দা, ডাবু গোয়েন্দাকে খুঁজে বের করল।

ছয়

হাবু আর ডাবু এলে ছেলেমেয়েরা বলল, "কী করে ভূত ধরো দেখাতে হবে।"

হাবু জানাল, "আমাদের প্রথমে তদন্ত করে দেখতে হবে!"

"তদন্ত করে দেখতে হবে?" সমর ভ্রূ কোঁচকাল, "ভূতের আবার কী তদন্ত হবে?"

"দেখুন না!" ডাবু সপ্রতিভভাবে জবাব দিল, "আমরা তো কিছু গোপনে করছি না। আমাদের কাজ একদম 'খুললাম খুললা'। তবে এখন কোন প্রশ্ন করা যাবে না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"তাহলে আমরা প্রথমে এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই, যারা ভূতের হাতে হেনস্তা হয়েছে। কেউ এখানে আছেন?"

"অনেকেই আছে।"

সমর প্রথমে পালেদের পটলাকে এগিয়ে দিল। পটলার কাছে সব শোনার পর হাবু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ধলো কাপড় পরা মেয়েটা তো জঙ্গলে ঢুকে গেল। আপনার ব্যাগভর্তি বাজারের কী হল? সেগুলি ছিল?"

সমর ভেবে পেল না, ভূতের সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক কী! কিন্তু কোন প্রশ্ন করা যাবে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

পটলা মনে করার চেষ্টা করল। ভূতের হাত থেকে যে প্রাণটা বেঁচেছে, তখন সেইটাই বড় কথা। বাজারের কথা কে ভেবেছে? কিন্তু না, ছিল না। পটলা ভাল করে ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, "না, গোয়েন্দাবাবু! ছিল না!"

"তা হলে ছিল না? আর কেউ?"

সমর কিছু না বলে সাহাদের সনাতনকে এগিয়ে দিল। ডাবু তার সব কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, "শিংওয়ালা ভূতটা গায়ে হাত বুলিয়ে চলে যাওয়ার পর আপনার পকেটে টাকাগুলি ছিল?"

"আর বলবেন না! ভূতের নাম করে আমি টাকাগুলি মেরে দিচ্ছি বলে দাদা কি অশান্তিটাই না করলেন!"

"কী করবে বলুন, দাদা জানেন, ভূতে শুধু ঘাড় মটকায়। তিনি তো জানেন না, ভূতে টাকাও নেয়। কিন্তু দেখছি, এখানকার ভূতপেতনিগুলো টাকা নেয়, বাজারের ব্যাগও নেয়!"

"আবার চকোলেটও খায়!" ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা বছর দশেকের ছোট্ট মেয়ে বলে উঠল।

হাবু তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী করে জানলে বলো তো?"

"দাদু আনছিল তো! ভূতগুলি কেড়ে নিয়েছে!"

"তাই? আমরা যখন ধরব তুমি খুব করে বকে দিয়ো ভাই!"

সাত

জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে তারা বাঁশঝাড়ের কাছে গেল। নুয়ে-পড়া বাঁশগুলিকে পরীক্ষা করে দেখল। আশেপাশের জঙ্গলে কী যেন খুঁজে বেড়াল। অবশেষে হতাশ হয়ে ফিরে সবাই জানাল, "না, কিছু বোঝা গেল না।"

হতাশায় সবাই এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

হাবু, ডাবু তাদের বিখ্যাত টর্চ নিয়ে রাত্রিবেলাতেও বাঁশঝাড়ের দিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। কয়েকদিন আর কেউ ভূতের হাতে পড়েনি। তা, সে তো কাছে অন্য লোক থাকলেও ভূত আসে না। হাবু, ডাবু আছে, তাই আসছে

না। চলে গেলেই আবার আসবে। তা হলে আর সমাধান কী হল?

সত্যিই কিছু হল না। ক'দিন পরে এসে হাবু ডাবু জানিয়ে দিল, "আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের দ্বারা হবে না।"

সমর বলার চেষ্টা করল, "হবে না বললে তো হবে না! ভার নিয়েছ, কাজ তুলতেই হবে!"

পলক কাকুতি-মিনতি করল, "তোমরা অন্তত আর-একবার চেষ্টা করো!"

হাবু-ডাবু রাজি হল না। গাঁ ছেড়ে চলে গেল।

আট

পরের রাতেই মণ্ডলদের নয়ন ভূতের হাতে নাকাল হল। তার পরের রাতে হইহই চিৎকারে সবাই বাঁশঝাড়ের দিকে ছুটল।

গিয়ে দেখে, একটা শিংওয়ালা ভূতকে বাঁশের সঙ্গে হাবু দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আর ডাবুর বাঁ হাতের কবজি দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ডান হাত দিয়ে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

লোকজন জড়ো হতেই হাবু বলল, "এই হচ্ছে আপনাদের বাঁশঝাড়ের ভূত! সঙ্গে একটা পেতনিও ছিল। পালিয়ে গেছে। তবে একটা যখন ধরা পড়েছে, ওটাকেও পাওয়া যাবে।"

ডাবু গিয়ে একটানে তার মুখ থেকে মুখোশটাকে খুলে দিল।

সবাই দেখল, বেঁশো ভূত আর কেউ নয়—হাটপাড়ার কালু-চোর। সবাই একসঙ্গে পাইকারি হারে এমন কিল-চড়-ঘুসি মারতে লাগল যে, কালু-চোরের এখন-তখন অবস্থা। সনাতনের রাগটা যেন আর সবার চেয়ে অনেক বেশি। এই ভূত-বেশী চোরের জন্যেই তাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। সে একই সঙ্গে হাত এবং মুখ চালাতে লাগল, "বেটা চোর। চুরি করবার নতুন ফন্দি বের করেছ। ভূত সেজেছ! তোমার ভূত আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি!"

হাবু এগিয়ে বলল, "দেখুন, এর পর আর মারধোর করলে ও সত্যিই পটল তুলবে। সেক্ষেত্রে অন্যজন কে ছিল, সেটা আর জানা যাবে না। অথচ সেটা জানা দরকার। তার চেয়ে পুলিশকে খবর দিন।"

পুলিশের নাম শুনে কালু কেঁপে উঠল।

তোতলা রতন বলল, "ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যাটাকে পু-পু-পু-পু-পুলিশিই দা-দা-দা-দা-দাও!"

সমর বাধা দিয়ে বলল, "না, ওকে গাঁয়ে নিয়ে চল। আগে হাতের সুখ করে

আচ্ছা করে পেটাব। তারপর পুলিশে দেব।"

সবাই সমরের কথায় সায় দিল। কোমরে দড়ি-বাঁধা কালু-চোরকে গাঁয়ের দিকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। পলক এসে হাবু, ডাবুকে ধরল।

নয়

"কী করে বুঝলে বলো তো, যে বাঁশঝাড়ের ওগুলি আসলে ভূত নয়, মানুষ?"

হাবু উত্তর দিল, "মানুষ না হলে, বাজার, টাকা, চকোলেট আর কে নেবে?"

"তা হলে, 'পারব না' বলে তোমরা পালালে কেন?"

"পালাইনি তো!" ডাবু বলল, "আমরা শুধু পালানোর ভান করেছিলাম, যাতে চোররা জানে যে, আমরা চলে গেছি। না হলে কি তাড়াতাড়ি ধরা পড়ত!"

"তা সত্যি! কিন্তু আজ কী করে ধরলে বলো তো!"

"হ্যাঁ, ধরাটা একটু মুশকিল ছিল!" হাবু জানাল, "কারণ, কালুরা দু'জন ছিল। কিন্তু একজনের বেশি লোক থাকলে ধরছিল না। একজনে দু'জনের সঙ্গে মারামারি করা যায়। কিন্তু দু'জনের একজনকে আটকে রাখা যায় না।"

"তা হলে আজ কী করে রাখলে?"

"আমরাও দু'জন ছিলাম।"

"তোমরা যে বললে একা না থাকলে ধরে না?"

"হ্যাঁ!" ডাবু উত্তর দিল, "সামনে আমি একাই ছিলাম। দেখতে না পায় এরকম দূরত্বে হাবু অপেক্ষা করছিল।"

"ওকে খবর দিলে কী করে?"

"কেন? আমাদের কাছে যে ছোট ছোট 'ওয়্যারলেস সেট' আছে, তা জানো না? যেই ভূতে ধরেছে আমিও 'ভূত' বলে ভূতকে জড়িয়ে ধরেছি। ধরা পড়ে গেছে বুঝে পালাবার জন্য ভূতটা আমার হাতে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। অন্য ভূতটা ছুটে আসছিল। কিন্তু ততক্ষণে সাইকেল চড়ে হাবুও পৌঁছে গেছে। হাবু এসে হাত মটকে ছুরিটা কেড়ে নিয়েছে। অন্য ভূতটা বেগতিক দেখে বেপাত্তা হয়ে গেছে।"

দশ

কী বুদ্ধি তোমাদের! আমাকে তোমাদের দলে নেবে?

"নেব। না হলে, তোমাকে এরকম একটা দল করে দেব। কিন্তু তার জন্য আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। এরকম রক্ত ঝরতে থাকলে বেশিক্ষণ বাঁচব না।"

পলকের খেয়াল হল, সত্যি তো, ডাবুর হাত দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে। সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার হাত ধরল।

ভূতের রাজা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সরকারি কাজে বিদেশে থাকি। ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি।

সাঁওতাল পরগণার যে-জায়গায় আমার কর্মস্থল ছিল, সেখান থেকে রেল স্টেশন যেতে হলে প্রায় ত্রিশ মাইলেরও উপর পথ পার হতে হবে। পাহাড়ী

পথ,—এক মাইল হচ্ছে দু-তিন মাইললের ধাক্কা। তার উপরে রাতের বেলায় পথে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। সকাল বেলায় বেরুলেও মাঝ-পথে সন্ধ্যা হবেই। তখন একটা আশ্রয়ের দরকার।

মাঝ-পথের কাছাকাছি স্থানীয় একটি শিকার-কুঠি ছিল। রাজা বা তাঁর বন্ধুরা শিকারে বেরুলে এই কুঠি হত তাদের আস্তানা।

রাজার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁকে গিয়ে অনুরোধ জানালুম, শিকার কুঠিতে একটা রাতের জন্যে আমাকে মাথা গোঁজবার জায়গা দিতে হবে।

ম্যানেজার বললেন, "এখন শিকারের সময় না, কুঠি খালি পড়ে আছে। আপনি এক রাত কেন, এক মাস থাকতে পারেন। এখানকার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট টেলার সাহেবও আজ রাতটা সেখানে বিশ্রাম করবেন। কুঠিতে আরো ঘর আছে, আপনারও থাকবার অসুবিধা হবে না। কিন্তু—"

—"কিন্তু কি?"

"কিন্তু আপনি সেখানে রাত কাটাতে পারবেন কি?

—"কেন পারব না?"

—"লোকের মুখে শুনি, কুঠিতে না কি অপদেবতার ভয় আছে।"

—"অপদেবতা"?

—"হ্যাঁ, অপদেবতা ছাড়া আর কি বলব? কুঠির পাশেই শালবনের ভেতরে সাঁওতালীদের এক ভূতুড়ে দেবতা আছে। সেই দেবতা না কি ভূতের রাজা। তার ভয়ে সাঁওতালীরা পর্যন্ত সন্ধ্যার পর ও-পাড়া মাড়ায় না। তারা বলে, তাদের দেবতা না কি রাতের বেলায় কুঠির ভেতরে-ঘুমোতে আসে।"

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললুম, "বেশ তো, মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে রাত্রিবাস করব, এটা তো মস্ত পুণ্যের কথা! আমি রাজি!"

ম্যানেজার বললেন, "আমি অবশ্য ও-সব ছেলেমানুষী কথায় ততটা বিশ্বাস করি না, তবু বলা তো যায় না—"

যথাসময়ে ডুলিতে চ'ড়ে রওনা হ'য়ে, সন্ধ্যার কিছু আগেই শিকার-কুঠিতে পৌঁছলুম।

ডুলি বেয়ারারা ব'লে গেল, মাইল তিনকে তফাতে একটা গাঁয়ে গিয়ে তারা আজকের রাতটা কাটাবে, কাল সকালে আবার ডুলি নিয়ে আসবে।

কুঠির বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ারে বসে টেলর সাহেব তামাকের পাইপ টানছিলেন। সাহেবের সঙ্গে আমারও বেশ পরিচয় ছিল।

আমাকে দেখে সাহেব বললেন, "এই যে, গুপ্ত যে! তুমি কোথায় যাচ্ছ!"

—"ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি"...তুমি?

—"আমি 'হোমে' যাচ্ছি। তুমি কি আজ এখানে থাকবে?"

—"হ্যাঁ, সায়েব।"

—"বেশ, বেশ দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটানো যাবে, এ ভালোই হ'ল"

—"দুজন কেন সাহেব, তিন জন।"

—"তিন জন আবার কে? তুমি কি আমার আর্দ্দালির কথা বলচ? ও, তাকে আমি মানুষের মধ্যে গণ্য করি না।"

—"না সায়েব, তোমার আর্দ্দালির কথা বলছি না।"

—"তবে কি কুঠির দারবানের কথা ভাবছ? না, সে রাত্রে এখানে থাকে না।"

—"না না, আমি দ্বারবানের কথাও বলছি না।...তুমি কি শোনো-নি সায়েব, সাঁওতালীদের এক দেবতা রাত্রে আমাদের সঙ্গী হ'তে পারেন?"

টেলর হেসে বললে, "ওহো, শুনেছি বটে! তা সে রূপকথার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।...তুমি কর না কি?"

—"করলে, এক্‌লা এখানে রাত কাটাতে আসি?"

টেলর পাইপে তিন-চারটে টান মেরে বললে, "দেখ গুপ্ত, সাঁওতালীদের এই দেবতাটিকে আমি দেখেছি। এমন বীভৎস দেবতা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তাকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে।

—"পছন্দ হয়েছে?"

হ্যাঁ। তাই ঠিক করেছি, কাল যাবার সময়ে তাকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। ইংল্যান্ডে আমার বাড়ির বৈঠকখানায় তাকে সাজিয়ে রেখে দেব। আমার বন্ধুরা তাকে দেখলে খুব তারিফ করবেন।"

আমি হেসে বললুম, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কাল থেকে দেবতা আর কুঠির ভেতর শুতে আসবেন না। তবে এইবেলা তাঁকে একবার দর্শন ক'রে আসি।...তাঁর আড্ডা কোথায়?

টেলর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, বললে, "ঐ যে ঐখানে! মিনিট খানেকের পথ।"

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। কুঠির পাশেই অনেকগুলো শালগাছ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই ছায়ায় একটা পাথুরে ঢিবির উপরে মানুষের মতো উঁচু একটা মূর্ত্তিকে দেখতে পেলুম।

মূর্ত্তিটা রং-করা কাঠের। তার দেহ মানুষের মতো বটে, কিন্তু তার মুখ দানবের মতো প্রকাণ্ড। আর সে মুখের ভাব কি ভয়ঙ্কর! দেখলেই বুকের কাছটা ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করতে থাকে।

মাথার চুলগুলো সাপের মতন ঝুলছে, কান দুটো হাতীর মতন, মুখখানা

খানিক সিংহ আর ভাল্লুকের মতন, দু-দুটো গোল গোল কাঁচের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। হাঁ-করা বড় বড় দাঁতওয়ালা মুখের ভিতর থেকে রাঙা টক্‌টকে, লক্‌লকে জিভের আধখানা বাইরে বেরিয়ে প'ড়ে ঝুলছে! কাঁধ ও মুণ্ডের মাঝখানে গলাটা দেখলে মনে হয়, কে যেন একখানা লিক্‌লিকে সরু বাখারির উপর মুখখানাকে বসিয়ে দিয়েছে। হাত দুখানা বাঘের থাবার মতো। কোমরের কাছ থেকে পা পর্যন্ত দেহের কোন অঙ্গ দেখা যাচ্ছে না। কাঠকে কুঁদে আর কোন অঙ্গ গড়াই হয় নি। মূর্তির গায়ের রং আলকাতরার মতন কালো আর মুখের রং খানিক সাদা, খানিক তামাটে ও খানিক হল্‌দে।

ভাবলুম, এ মূর্ত্তি যদি সত্য সত্য রাত্রে কুঠির ভিতরে ঘুমাতে আসে, তাহ'লে আমাদের ঘুম এ জীবনে আর ভাঙবে কি?

—ধীরে ধীরে কুঠির দিকে ফিরে এলুম। টেলর পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল। আমাকে দেখে সে বলল, "গুপ্ত, খুব ঝড়-বৃষ্টি আসছে, ঐ দেখ!"

সত্য কথা। পশ্চিমের আকাশখানা আচম্বিতে ঠিক যেন কালো কষ্টিপাথর হ'য়ে গেছে। ঝড় উঠতে আর দেরি নেই।

ঝড় এসে সমস্ত অরণ্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে মুসলধারে।

অনেক রাত। টেলরের নিমন্ত্রণ দিয়ে, তার সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ আগে 'ডিনার' খেয়েছি। এখন টেলর তার ঘরে শুয়ে হয়তো দিব্যি আরাম নিদ্রা দিচ্ছে—কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই।

ভূত-টুৎ কিছু মানি না,—তবু কেন জানি না, মনটা কেমন খুৎ-খুৎ করছে! রাজার সেই ম্যানেজারের কথাগুলো আর সাঁওতালী দেবতার সেই ভয়ানক মুখখানা মনের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত আনাগোনা করছে। যত তাদের ভুলবার চেষ্টা করি আজেবাজে নানান কথা ভেবে,—তত তারা মনের উপরে চেপে বসে, নরম মাটির উপরে ভারী পায়ের দাগের মতো।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝম্‌-ঝম্‌-ঝম্‌! মাঝে ঝোড়ো, দম্‌কা হাওয়া হা-হা-হা-হা ক'রে উঠছে! —যেন কোন শত্রুকে অভিশাপ দিচ্ছে। তারই ভিতর থেকে একবার শুনলাম হায়নার অট্টহাসি, একবার শুনলুম শৃগালদলের মায়াকান্না, একবার শুনলুম বাঘের গর্জন!...

হঠাৎ আমার ঘরের দরজার উপর দুম-দুম্‌ ক'রে আঘাত হ'ল! ধড়্‌ মড়্‌ ক'রে আমি বিছানার উপরে উঠে বসলুম,—সে কি আসছে? সে কি আসছে?

দরজার উপরে আর কোন আঘাত হ'ল না! ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় দরজা ন'ড়ে উঠেছে নিশ্চয়! নিজের কাপুরুষতার জন্য মনে মনে নিজেই লজ্জিত হ'য়ে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, এমন সময় বাইরে থেকে খনখনে ঝাঁঝালো গলায় গান শুনলুম ঃ

"লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়।"

এ তো সাঁওতালি ভাষা। নিশ্চয়ই কোন সাঁওতালী গান গাইছে! কিন্তু এত রাত্রে, এমন ঝড় বাদলে, এই হিংস্র জন্তু ভরা গভীর অরেণ্যর মধ্যে কোন্ সাঁওতালী মনের আনন্দে সখ ক'রে গান গাইতে আসবে?

আবার দরজার উপরে ঘন ঘন আঘাত হ'ল—এবারে আরো জোরে...আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল! এ তো ঝড়ের ধাক্কা নয়, এ যে সত্য—সত্যই কে দরজা ঠেলছে আর ঠেলছে!...তবে কি সে এসেছে? তবে কি সে এখানে ঘুমোতে এসেছে?

আবার গান শুনলাম। এবারে আমার খুব কাছে, একেবারে কুঠির বারান্দার উপরে সেই তীব্র খন্‌খনে গলার গান!—

"লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!"

হঠাৎ উল্টো বিপদ্! কুঠির ভিতর দিক্‌কার দরজায় ঘন-ঘন আঘাত! ভিতরে বাইরে বিপদ্ দেখে প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছি, এমনি সময়ে শুনলাম ঃ —'গুপ্ত! ভগবানের দোহাই, দরজা খোলো—দরজা খোলো শীগ্‌গীর!"

এ তো টেলরের গলা!...আ! বাঁচলুম! তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

টেলর হুড়্‌দুড়্ ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল—তার চোখ-মুখ পাগলের মতো, তার হাতে বন্দুক।

আমি তাকে দু-হাতে চেপে ধরে' বললুম, "মিঃ টেলর, হয়েছে কি? এত রাত্রে কি দরকার তোমার?"

টেলর দেওয়ালে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "গুপ্ত, আমার ঘরের দরজায় ক্রমাগত কে লাথি মারছে আর গান গাইছে। তুমিই কি আমার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমাকে ডাকছিলে?"

আমি বললুম, "না না! আমি আমার বিছানা ছেড়ে এক পাও নড়িনি! কিন্তু আমারও ঘরের দরজা যে কে নাড়ছে, আর গান গাইছে!...ঐ শোনো!"

দুম্-দুম্ ক'রে আমার ঘরের দরজায় আবার দু-বার প্রচণ্ড আঘাত হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে সেই গান ঃ—

"লোগোবুরু ধীরকো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!"

....আচ্‌মকা আবার একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা এসে দরজা জানালার উপরে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খড়খড়ি দুম্‌দাম্ ক'রে খুলে গেল!

...সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে স্পষ্ট দেখলুম, বারান্দার উপরে কার একটা জীবন্ত ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে! কে ও? কে ও? এ কি সেই-ই—যে প্রতি রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসে...আমার মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল!

টেলরের বন্দুক গুড়ুম্ ক'রে গর্জে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিটা স্যাঁৎ ক'রে বারান্দার একপাশে, আমাদের চোখের আড়ালে 'সরে গেল।

টেলর চেঁচিয়ে উঠল "গুপ্ত! গুপ্ত! জানালা বন্ধ ক'রে দাও—জান্‌লা বন্ধ করে দাও।"

পা চলতে চাইছিল না! কিন্তু পাছে টেলর মনে করে বাঙালি কাপুরুষ, সেই ভয়ে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে দমন ক'রে আমি জান্‌লার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ ক'রে দিলুম।

টেলর টলতে টলতে আমার বিছানার উপরে ব'সে প'ড়ে বললে, "গুপ্ত! কিছু মনে কোরো না, আমি আজ তোমার বিছানাতেই তোমার সঙ্গে রাত কাটাব!"

বাইরে আবার কে গান গাইলে ঃ—

"লোগোবুরু ধীরকো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি কাওয়াড়!"

সকাল বেলা। কিন্তু তখনো সমানভাবে বৃষ্টি ঝরছে আর ঝরছেই।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সারা আকাশখানা যেন কালো মেঘের ঘেরাটোপ্ দিয়ে ঢাকা, সূর্যকে যেন আজ কোন্ অন্ধকার রাহু গ্রাস ক'রে ফেলেছে। যতদূর নজর চলে খালি দেখা যায় অরণ্য শ্যামল তরুর বিরাট সভা আর শৈলমালার গর্ব্বোন্নত শিখর এবং তারই ভিতরে এসে পড়েছে তীরের চক্‌চকে ফলা'র মতো বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারাগুলো। কোথাও পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ বা কোন জীবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—পথের উপর দিয়ে ক্রুদ্ধ জলস্রোতে যেন কোন অদৃশ্য শত্রুকে বেগে আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে!

হঠাৎ বারান্দায় এক কোণে চোখ গেল। কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একজন শুয়ে রয়েছে?

কাছে গিয়ে ডাকলুম, "এই! কে তুই?"

বার কয়েক ডাকাডাকির পর কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা সাঁওতালীর মুখ বেরুল।

—"কে তুই?"

—"আমি ঠাকুরের পূজারী।"

—"ঠাকুর! কে ঠাকুর?"

—"যিনি ঐ শালবনে থাকেন।"

—"এখানে কি করছিস?"

—"ঠাকুর রোজ রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসেন, তাই আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসি।"

—"কাল রাত্রে তাহলে তুই-ই দরজা ঠেল্‌ছিলি?"

—"আমি ঠেল্‌ছিলুম, ঠাকুরও ঠেল্‌ছিলেন।"

—"আর গাইছিল কে।'

—"আমি।"

এমন সময় টেলরও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে সব কথা খুলে বললুম। টেলর তো শুনেই মহা ক্ষাপ্‌পা, ঘুসি পাকিয়ে পুরুতের দিকে ছুটে যাবামাত্র সে একলাফে বারান্দার রেলিং টপ্‌কে বাইরে প'ড়ে, বনের ভিতরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

টেলর বললে, রাস্কেলকে ধরতে পারলে একবার দেখিয়ে দিতুম। ওঃ সারারাত কি অশান্তিতেই না কেটেছে।"

আমি বললুম, "যাক্; যা হবার তা তো হ'য়ে গেছেই। এখন আমাদের কি উপায় হবে! কুঠির দ্বারবানও এল না, ডুলি-বেয়ারারাও এই দুর্যোগে বোধ হয় আসবে না। আমরা যাব কেমন ক'রে?"

টেলর বললে, "আমাকে যেমন ক'রেই হোক্ আজ যেতে হবেই। বোম্বে যাবার টিকিট পর্যন্ত আমি কিনে ফেলেছি। উপায় থাকলে তোমাকেও আমি স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতুম। কিন্তু আমার 'টু সিটার' গাড়ি,—আমি, আমার আর্দ্দালি, তুমি, তোমার চাকর আর তোমার মালপত্তর অতটুকু গাড়িতে তো ধরবে না, কাজেই যেতে হবে।...আর্দ্দালি।"

টেলরের আর্দ্দালি এসে সেলাম করলে।

টেলর বললে, "আমার মালপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে তোল। তারপর শালবন থেকে সেই কাঠের পুতুলটা তুলে নিয়ে এস।"

আমি বললুম, "তুমি কি সত্যি ঐ পুতুলটা ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চাও?"

টেলর বললে, "নিশ্চয়! আমার যেই কথা সেই কাজ।"

আবার রাত এল। বৃষ্টি এখনো থামে নি, আমি এখনো কুঠিতে বন্দী হ'য়ে আছি।

টেলর চ'লে গেছে এবং যাবার সময়ে সাঁওতালীদের ভূতের রাজাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে। সে আর এই কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসবে না।

চোখে ঘুম আসছিল না। একখানা ইংরাজী নভেল বার ক'রে পড়তে বসলুম। ঘণ্টা দেড়েক পরে তন্দ্রার আবেশ এল। আলোটা কমিয়ে দিয়ে শয়নের উপক্রম করছি,

এমন সময়ে শুনলুম, বাইরের সিঁড়ির উপরে আওয়াজ হ'ল, ঠক্, ঠক্ ঠক্, ঠক্!

ঠিক যেন কাঠের আওয়াজ! ঠক ঠক করতে করতে আওয়াজটা আমার ঘরের কাছ-বরাবর এল, তারপর দরজার উপরে শুনলুম ধাক্কার পর ধাক্কা!

কী আপদ! টেলর তো পুতুলটাকে নিয়ে কোন্ সকালে বিদায় হয়েছে। এ আবার কে জ্বালাতে এল।

নিশ্চয়ই সে সাঁওতালী পুরুত ব্যাটা! সে হতভাগ্য রোজ রাত্রে এইখানে আরাম করে ঘুমোয় আর চারিদিকে রটিয়ে দেয়—কুঠির ভিতরে ভূতের রাজা শুতে আসেন।

ধাক্কার জোর ক্রমেই বেড়ে চলল...একবার ভাবলুম দরজা খুলে পুরুতটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দি। তারপর মনে হ'ল, সে কাজ ঠিক হবে না। এই দুর্যোগে বিজন জঙ্গলের ভিতরে রাত্রে একলা আমি এখানে আছি যদি কোন দুষ্ট লোক কুমতলবে এসে থাকে?

বন্দুকটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজার এক জায়গায় একটা ছ্যাঁদা ছিল, বন্দুকের নলটা সেইখানে রেখে চেঁচিয়ে বললুম, "কে আছ চ'লে যাও, নইলে এখনি আমি বন্দুক ছুঁড়ব!"

কোন জবাব নেই, দরজার উপরে ধাক্কাও থাম্‌ল না!

—"এখনো আমার কথা শোনো, নইলে—"

বাইরে বিশ্রী গলায় কে হাসতে লাগল—হিহি হিঃ হিহি হিঃ হিহিহিহিহি—

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপ্‌লুম—সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপরে ধাক্কাও থেমে গেল!

ঠক্ ঠক্ ক'রে একটা আওয়াজ ঘরের কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে লাগল,—তারপর কুঠির সিঁড়ির উপরে শব্দ শুনলুম ঠক, ঠক্, ঠক্!

খানিক পরে অনেক দূর থেকে আবার সেই বিশ্রী হাসি শোনা গেল, হিহি হিঃ হিহি হিঃ হিহিহিহিহি—

সে হাসি অমানুষিক...শরীরের রক্ত যেন জল ক'রে দেয়।

শেষ রাত্রে জল ধ'রে গেল।

সকালে দরজা খুলতেই কাঁচা সোনার কচি রোদ এসে ঘরখানা যেন হাসিতে ভরিয়ে তুললে! রোদ দেখে মনটা খুশি হ'য়ে উঠল।

বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, এককোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে!

তেড়ে গিয়ে মারলুম তাকে এক ধাক্কা! ধড় মড় ক'রে সে উঠে বসল। সেই সাঁওতালী পুরুতটা!

ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "কাল আবার কি করতে এখানে এসেছিলি? ভারী চালাকি পেয়েছিস, না?"

লোকটার মুখের ভাব একটুও বদ্‌লালো না। শান্তস্বরে বললে, "আমার ঠাকুর কাল এখানে ঘুমোতে এসেছিলেন, আমিও তাই এসেছিলুম।"

—"তোর ঠাকুর কোথায়? সাহেব তো তাকে নিয়ে চ'লে গেছে।"

—"আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন।"

—"মিথ্যা কথা! আমি নিজের চোখে দেখেছি, টেলর তাকে নিয়ে চ'লে গেছে।"

—"আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন।"

কুঠি থেকে বেরিয়ে প'ড়ে ছুটে পাশের শালবনে গিয়ে হাজির হলুম।

সবিস্ময়ে দেখলুম, ভূতের রাজা চোখ পাকিয়ে লক্‌লকে জিভ বার ক'রে ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে!

আর, আর, ওকি? মূর্তির পেটের উপর গর্ত—ঠিক যেন বন্দুকের গুলির দাগ! গর্তের চারপাশে রক্ত জমাট হ'য়ে আছে,—মূর্তির আরো নানা জায়গাতেও রক্তের চিহ্ন!

তবে কি আমার বন্দুকের গুলিই,—ভাবতে পারলুম না, মূর্তির দিকে আর তাকাতেও পারলুম না, কেমন একটা অজানা ভয়ে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল,—প্রাণপণে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

কলকাতায় ফিরে এসেই খবরের কাগজে এই বিবরণ পড়লুম ঃ সাঁওতাল পরগনার পুলিশ সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট মিঃ জে টেলর কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বিলাতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে এক বিপদে পড়িয়া খুব সম্ভব তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। স্থানীয় জঙ্গলের ভিতরে তাঁহার মোটর গাড়ি পাওয়া গিয়াছে। মোটরের উপর ভিতরে ও চারিপাশে রক্তের দাগ, কিন্তু মিঃ টেলর ও তাঁহার আর্দ্দালীর কোনই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ সন্দেহ করিতেছে, মিঃ টেলর ও তাঁহার আর্দ্দালীকে ব্যাঘ্র বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়াছে। নিকটস্থ জঙ্গলে এক নর-খাদক ব্যাঘ্রেরও খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।"

সে ভূতুড়ে মূর্তির গায়ে যে রক্তের দাগ লেগেছিল, তাহ'লে সে রক্ত হচ্ছে হতভাগ্য টেলরের আর আর্দ্দালীর গায়ের রক্ত?

এবং সেই সাঁওতালী পুরুতটাই নিশ্চয়ই কোনগতিকে খবর পেয়ে ভূতের রাজাকে আবার শালবনে ফিরিয়ে এনেছিল?

মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিলুম বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলুম, শিকার-কুঠিতে আর কখনো রাত্রিবাস করব না! কিসে কি হয়, কে জানে?

অদ্ভুত ভূতের গল্প

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভূতের গল্প তোমরা অনেক পড়েছ, অনেক শুনেছ—এ ভূতের গল্পটি মোটেই সেগুলির মতো নয়! এ হল একটি অদ্ভুত ভূতের গল্প। আমার নিজের কানে শোনা।

গঙ্গার ধারে গ্রাম। গ্রামে বহু লোকের বাস—গ্রামে সকলের বাড়ির বাগান পুকুর আছে যেমন, তেমনি আছে বনজঙ্গল, ঝোপঝাপ, শ্মশান, গঙ্গাযাত্রীর ঘর—তাছাড়া ইস্কুল পাঠশালাও আছে।

এই গ্রামের গঙ্গার ধারে দোতলা বাড়ি—বহুকাল পড়ে আছে—গ্রামের লোক বলে ভূতের বাড়ি। এই গ্রামে বাস করত ঠাকুরদাস চক্রবর্তী। তার অনেক টাকা। সে ছিল দারুণ কৃপণ। গ্রামের করও সঙ্গে মিশত না—পাছে কেউ টাকা ধার চায়। কারও বাড়ি নিমন্ত্রণ খেত না—পাছে তার নিজের বাড়িতে কাউকেও কোন কাজে কোন দিন নিমন্ত্রণ করতে হয়! গ্রামের লোকে তার নাম করত না—তার ছায়া দেখলে সরে যেত—মুখ দেখলে, কে জানে সেদিন কি বিপত্তি ঘটবে!

তার স্ত্রী ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল—তারা একরকম না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মরে গেল। তার পরে ঠাকুরদাস মারা গেল—মারা গিয়ে ভূত হয়ে সে ঐ বাড়িতে বাস করছে। সে মারা যাবার পর তার একটি ছেলে দেবীদাস ছিল বেঁচে—কিন্তু বাবা-ভূতের দৌরাত্ম্যে সে-বেচারীও-বাড়িতে বাস করতে পারল না,—কোথায় একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে—গ্রামের মানুষজন আজ বিশ বাইশ বছরেও তার কোন পাত্তা পায়নি।

সেই থেকে ও-বাড়ি পড়ে আছে...বাড়ির দরজা-জানালা কপাট ভেঙ্গে খসে পড়ছে—বাগান যেন জঙ্গল.....শুধু বাগানের মধ্যে যে পুকুর ছিল....জল শুকিয়ে পুকুরের এতবড় বুকখানা খাঁ খাঁ করছে। ও-বাড়িতে কত মানুষ তারপর বাস করতে গেছে—পুরো একটা রাতও কেউ থাকতে পারেনি। নির্মেঘ আকাশ, হঠাৎ বাড়ির মধ্যে ঝড়ের দমকা বেগ—প্যাঁচার ডাক, ছোট ছেলের কঁকানি কান্না—বন্ধ দরজা জানালা দুমদাম শব্দে খুলে যায়, আর সারা বাড়িতে গট গট খড়ম-পায়ে মানুষ চলার শব্দ! তার উপর যারা বাড়ি ছেড়ে যায়নি,—তাদের পা ধরে হিড় হিড় করে টানা-সিঁড়ির উপর থেকে দুম করে নীচেয় আছড়ে ফেলা.........এমনি নানা দৌরাত্ম্য!

শেষে এমন ব্যাপার হল ও বাড়িতে যাওয়া নয়, রাত ন'টার পর ও বাড়ি আর বাগানের ধার দিয়ে মানুষ জন রাত্রে চলতে পারে না। ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়া বাদুড় চামচিকে এসে নাকে মুখে ঝাঁপটা মেরে সরে যায়.......গাছের ডাল মড়মড় শব্দে নীচে হেলে প'ড়ে পথ আটকায়—সে ডালের পাশ কাটিয়ে চলতে গিয়ে গাঁয়ের অমন জোয়ান মানুষ তিনকড়ি—ডাল থেকে দুটো ফ্যাকড়া বেরিয়ে চিমটের মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল প্রায় বিশ হাত দূরে.......সে আছাড়ে তিনকড়ির পা ভেঙ্গে দু'টি মাস তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল।

তারপর একবার—বাগানের মধ্যে ছিল পথের দিকে বড় জামরুল গাছ......পথে দাঁড়িয়ে আঁকশির খোঁচা দিলে ঝরঝর করে পড়ে একরাশ জামরুল......স্কুলের ছেলেরা একদিন শনিবারে দেড়টার সময় ছুটি হলে দল বেঁধে এসে পথে দাঁড়িয়ে ঐ গাছের ডালে আঁকশি লাগিয়ে ডাল নাড়া দিয়েছিল—যেমন ডালে নাড়া দেওয়া, অমনি গাছের দুটো ডাল দু'দিক থেকে নেমে ছেলেদের পিঠে পটাপট........তারা যে কি করে পালিয়ে এসেছিল, তা আর বলবার নয়!

শুধু তাই! বাগানের ওধারে নদী.........একদিন রাত্রে বাগানের গা ঘেঁষে নদীতে নৌকো নিয়ে আসছিল বনমালী মাঝি—ওপার থেকে সওয়ারি নিয়ে যেমন ঐ চক্রবর্তীর বাগানের গায়ে নৌকো আসা হঠাৎ নৌকোর সামনে জলের বুকে কি একটা ভারী পদার্থ পড়ল.......সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ ওঠা আর সেই ঢেউয়ের দোলায় নৌকো উল্টে বনমালী পড়ল জলে—সওয়ারি পড়ল ছিট্‌কে—পড়েই অজ্ঞান। বনমালীকে পাওয়া গিয়েছিল ও-জায়গা থেকে আট মাইল দূরে নদীর ঘাটে বেহুঁশ, অজ্ঞান। সকালে ঘাটে যারা এসেছিল চান করতে, তারা দেখে বনমালীকে তোলে—তুলে সবার পরিচর্যায় তার জ্ঞান করায়। জ্ঞান হতে বনমালী বলেছিল—বাপরে—চক্কোতি-খুড়ো আমাকে জলে ডুবিয়ে দিতে দিতে এ ঘাটে ফেলে দিয়ে যায়। সওয়ারির কোন পাত্তা মেলেনি—নৌকোখানা পাওয়া গিয়েছিল চক্রবর্তীর বাগানের নীচে....ডাঙ্গায় উল্টানো অবস্থায়।.....

তারপর......

ওপারে ছিল ভুলো আর কানু—দাগী সিঁধেল চোর। তারা পুলিশকেই ভয় করে না, তা ভূতকে করবে। সকলের বিশ্বাস চক্রবর্তীর ছিল বহুৎ টাকা.....সে টাকা কোন ব্যাঙ্কে সে কোনদিন রাখেনি—বুকের হাঁড়-পাঁজরার মতোই সে টাকা কৃপণ চক্রবর্তী বুকে করে রাখত.....যে ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, সে যে একটি পয়সা পায়নি তা তার দুর্দশা দেখে সকলেই বুঝেছিল। সেই ভুলো আর কানু ঠিক করল—চক্রবর্তীর বাড়িতে হানা দিয়ে তার সেই টাকা করবে আত্মসাৎ!

অতি নিঃশব্দে গোপনে তারা এসে ও-বাড়িতে একদিন রাত্রে আস্তানা

নিয়েছিল.....তাদের হাতে সিঁধ-কাঠি এবং আরও কি-কি সব যন্ত্র! গভীর রাত্রে লণ্ঠন জ্বেলে তারা দুটো ঘরের মেঝে খুঁড়ে কিছু না পেয়ে দোতলার যে ঘরে চক্রবর্তী মারা গিয়েছিল, সেই ঘরের মেঝে খুঁড়ছিল—দু' পাঁচ মিনিট তারা শাবলের ঘা মেরেছে—ঘরের দরজা বন্ধ.....হঠাৎ ঘরের দরজা গেল খুলে—হুড়কো আঁটা দরজা.....দড়াম শব্দে সে দরজা গেল খুলে—দু'জনে পেছনে চেয়ে দেখে—চক্রবর্তী খুড়ো—গায়ে মাস নেই, শাঁস নেই,—মুখখানা শুধু আছে.....কঙ্কালের উপর চক্রবর্তীর মুণ্ডু বসানো!.

কঙ্কাল এলো এগিয়ে.....এসে কথা নয়, বার্তা নয়—দু'টি হাড়ের হাতে দু'জনের টুটি টিপে—জানালা খুলে দু'জনকে দিলে ঝপ্ করে নীচে বাগানে

ফেলে। পরের দিন সকালে কেষ্টর জ্ঞান হতে চোখ মেলে সে দেখে, বাগানে পড়ে আছে.....পাশে ভোলা.....সে তখনো অজ্ঞান-অচেতন!

উপায়? কেষ্ট কোন মতে বেরিয়ে এসে লোকজনকে এ খবর দেয়—তাই তো গাঁয়ের লোক জানতে পারল এ ব্যাপার! সকলে এসে ভোলাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে দিয়ে আসে—দু'দিন পরে ভোলার চেতনা হল—কিন্তু সে পাগল হয়ে গেল। দু'চোখে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি.....আর থেকে থেকে শুধু বলে চক্কোত্তি-মশাই।....

তাদের সিঁধ-কাঠি আর যন্তর-তন্তর—সেগুলির কি হল, কেউ জানে না। বাড়ির মধ্যে ঢুকে কেউ তার সন্ধান নেবে—এমন পরোয়া গাঁয়ে কারও নেই! এমনি কত গল্প যে চলে আসছে ও-বাড়ির সম্বন্ধে—কত কাল ধরে, তার আর সংখ্যা হয় না। এখন বলি, সদ্য ঐ চক্রবর্তী মশায়ের যে গল্প শুনেছি....

তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই সেই গাঁয়ের মাতব্বরের দল ঠিক করলেন ধুমধামে স্বাধীনতা-দিবস পালন করবেন। মস্ত উৎসব হবে—কোন মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীকে এনে মহা ধুম বাধাবেন। গ্রামের ছেলেরা কলকাতার কলেজে পড়ে—তারা বললে—নাট্যাভিনয় করবে—তিন-তিন রাত্রি ধরে অভিনয়—তিন রাত্রে তিনখানা নাটকের অভিনয়! ফীমেল পার্টে নামাবার জন্য কলকাতা থেকে আনা হয়েছে দুটি বন্ধুকে—সাত্যকি আর অমর সিঙ্গীকে। তারা নাকি খুব ভালো ফীমেল পার্ট করে!

ঠিক হল রিহার্শাল হবে ঐ চক্রবর্তীর পোড়ো বাড়িতে। মাতব্বররা মানা করলেন—ভয় দেখালেন। কিন্তু ছেলের দল সে কথা গ্রাহ্য করল না—তারা বললে—ভূত! ভূত স্রেফ্ কুসংস্কার।

ভূতের নাম শুনে অমর সিঙ্গী মেতে উঠল যেন! সে বললে—ভূত যদি থাকে তাকে দেখতে চাই। ভূতের গল্পই শুনে আসছি—চোখে কখনো দেখিনি। এখানে যদি সে সুযোগ পাই......

মাতব্বররা মানা করলেন—বললেন, একে একালের ছেলে—তার উপরে স্বাধীন দেশ—এরা মানুষকেই মানতে চায় না তো ভূতকে মানবে! তবে সাবধান.....আমরা নজর রাখব!

চক্রবর্তীর বাড়ির বৈঠকখানা তারা সাফ করিয়ে সেখানে পাতল অমর সিঙ্গী আর সাত্যকি আস্তানা। তারা অতিথি—তাদের মন এবং মন রাখতে গাঁয়ের ছেলেরাও বললে—আমরাও ওখানে থাকব—শুধু নাইতে—খেতে বাড়ি আসা। তারপর রাত্রে রিহার্শাল....

একখানা নয়—তিন-তিনখানা নাটকের রিহার্শাল। সব কখানাই জাতীয়তার উদ্বোধক ঐতিহাসিক নাটক! সকলেই বীর্যশৌর্য দেখাতে চায়—যার গলা যত

চড়ে—সেদিকে সকলের প্রাণপণ সংগ্রাম—হ্যাঁ, রীতিমত সংগ্রাম চলেছে।

রিহার্শাল চলেছে—হঠাৎ সে ঘরের দরজায় চক্রবর্তীর কঙ্কাল—কঙ্কালের ঘাড়ে চক্রবর্তীর মুণ্ডু সকলে দেখল.....দেখে অমর সিঙ্গী বললে—কে মশায়—বহুরূপী সেজে দেখা দিলেন এসে। দু'চারজন গাঁয়ের ছেলে বলে উঠল—তুমিই কিপ্‌টে চক্রবর্তীর ভূত! বটে।

সাত্যকি বললে—সরে পড়ো.....আমাদের রিহার্শালে বাধা দিয়ো না।

কঙ্কাল নিথর, নিস্পন্দ! অমর সিঙ্গী বললে—যাও.....এখানে তোমার কিছু হবে না।

সকলে জোর পেল মনে—বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভাগো।

অমর সিঙ্গী বললে—তোমার অনেক গল্প শুনেছি, বাপু—ওসব গল্প গাঁজা—এখানে তোমার গাঁজা চলবে না। সরে পড়ো.....

কঙ্কালের দাঁতের পাটি মুক্ত হল—এবং মুখে খোনা ভাষায় আওয়াজ বেরুল—আমি কারও ঘেঁষ সইতে পারি না—কোন কালে না—বেঁচে থেকে পারিনি—মরে গিয়েও পারি না। তোমরা হৈ চৈ চিৎকারে কেন আমার শান্তি ভঙ্গ করছ?

অমর সিঙ্গী বললে—তার কারণ, যে মরে সাফ হয়ে গেছে, এ পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। মরে গিয়েও তুমি যদি এ বাড়ি আঁকড়ে থাকতে চাও, তাহলে তোমার সে কাজ হবে বেআইনী—যার নাম ট্রেসপাশ। অতএব এ বাড়িতে এখন তোমার কোন অধিকার নেই থাকবার—তুমি সরে পড়ো!

কঙ্কাল বললে—কিন্তু.....

বাধা দিয়ে সাত্যকি বলে উঠল—কিন্তু-টিন্তু চলবে না। আমরা তোমাকে মানি না—তুমি যাও। নাহলে সেই মামুলি দাওয়াই—আমরা কোরাসে রাম-নাম গান করব। 'রঘুপতি-রাঘব রাজা রাম'.....

কঙ্কাল চুপ—হঠাৎ মনে হল, যেন মোটরের টায়ার ফেটে হুশ করে বাতাস বেরুল—তেমনি শব্দ! অর্থাৎ কঙ্কাল নিঃশ্বাস ফেলল—নিরুপায়ের মতো নিঃশ্বাস!

তারপর কঙ্কাল বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য! রাত দুটো পর্যন্ত চলল রিহার্শাল, তারপর নিদ্রা.....নিশ্চিন্ত গাঢ় নিদ্রা।

পরের দিন সকালে এ কথা কিন্তু এরা কারও কাছে প্রকাশ করল না—রাত্রি আসতে রিহার্শাল আবার.....

জোর রিহার্শাল চলেছে.....তার মধ্যে হঠাৎ সেই কঙ্কালের আবির্ভাব!

সকলে চেয়ে দেখল! অমর সিঙ্গী বললে—আজ আবার এসেছ জ্বালাতন করতে! কালকের ও দাওয়াইয়ে হল না—এ্যাঁ!

কঙ্কালের দাঁতের পাটি নড়ল—কঙ্কাল বললে—বেশ হুঙ্কার দিয়েই বললে—কাল ভাল কথায় বলেছিলুম—শুনলে না! দেখাব নাকি মজা?

অমর সিঙ্গী তেড়ে গেল তার সামনে—তার হাতে রাজার তলোয়ার—সেই তলোয়ার উঁচিয়ে বললে—শুধু তো ক'খানা হাড়! এই তলোয়ারের চোট মেরে ওগুলি খসিয়ে টুকরো-টুকরো করে দেব।

কঙ্কাল বললে—জানো, আমি ভূত।

সাত্যকি বললে—আমরা ভূত মানি না। তোমাদের নামে ভয় পেয়ে অনেকের অনেক সর্বনাশ হয়েছে! তোমার ছেলে বাড়ি-ছাড়া—দেশছাড়া! জানো, তোমাদের আমরা ভেল্‌কি-নাচ নাচাতে পারি।

অমর বললে—যাও এখান থেকে! আমাদের ভয় দেখিয়ে ফল পাবে না। আমরা এ বাড়ি ছাড়ব না। জোর যার, মুলুক তার! চাও যদি তো ফাইট করতে পারি—

সাত্যকি বলে উঠল—এ্যাকটিংয়ের ভঙ্গীতে ঘুষি পাকিয়ে—

শোন্ রে বর্বর, চলে যা এখান থেকে—

নহিলে এ বজ্রমুষ্টি—ইহার আঘাতে

রফা করে দেব তোর দফা।.....

তার এ্যাক্‌টিং শেষ হল না—কঙ্কাল হল অদৃশ্য!

পরের রাত্রে রিহার্শালের সময় আবার তার আবির্ভাব! এরা কিছু বলবার আগেই কঙ্কাল বললে—অত্যন্ত কাকুতি ভরা কণ্ঠে—(অবশ্য খোনা খোনা ভাষা)—দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও। আমি এ গোলমাল সয়ে থাকতে পারছি না।

অমর সিঙ্গী বললে—না পারো, পথ দ্যাখো। এ বাড়িতে আর থাকা চলবে না তোমার!..... আজ শেষ বারের মতো তোমাকে বলছি—ফের যদি এসে দেখা দাও—তা'হলে কঙ্কাল চূর্ণ করে পুড়িয়ে দেব।—

তারপর থেকে এ বাড়িতে চক্রবর্তীর ভূতের আর দেখা নেই। গাঁয়ের সকলে শুনলেন এ কথা। তাঁরা পরখ করলেন এবং থিয়েটার চুকে গেলে তাঁরা নোটিশ ছাপিয়ে দিলেন—ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর নিরুদ্দেশ ছেলে দেবীদাসের নামে—

দেবীদাস চক্রবর্তী—যেখানেই তুমি থাকো—এ বিজ্ঞাপন পাঠ মাত্র গ্রামে ফিরিয়া তোমার পৈত্রিক ভিটা দখল করিবে। এ বাড়ি এখন ভূতলেশহীন—সম্পূর্ণ নিরাপদ জানিবে!

জানি না এ বিজ্ঞাপন দেবীদাস চক্রবর্তীর নজরে পড়েছে কিনা এবং সে এ বাড়িতে ফিরে এসেছে কিনা! তবে খবর নিয়ে জেনেছি—সে বাড়িতে বা বাড়ির ত্রিসীমানায় ভূতের ছায়াও সেই থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আর দেখেনি।

পোড়া ছায়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তখনো নীলা চেয়ে থাকে। ঝিলমিল ঝিলমিল করতে করতে দেয়ালে ছায়াটা তখন স্পষ্ট হয়েছে। আকৃতি বোঝা যায় মূর্তিতে যে বিকৃতি ঘটেছে তাও বোঝা যায়। ফোকাস মোটামুটি ঠিক হয়েছে ধরা চলে সেটা চোখের না ছায়াটার তা অবশ্য বলা কঠিন এ অবস্থায়।—রাত দুপুরে চোখের সোমনে যখন একটা ভূত রূপ নিচ্ছে তখন ওসব হিসাব কেই বা করে।

এদিকে আধপোড়া জানালা ঘেঁষে ছায়াটা রূপ নিচ্ছিল—জানালা দিয়ে নিরাকার অবস্থায় ঘরে ঢুকে যেন আকার ধারণের চেষ্টা। ধীরে ধীরে দেয়াল বেয়ে ডাইনে সরতে থাকে। অথবা দেয়ালটাই যেন তার গা বেয়ে ওদিকে সরে যায়। ওদিকে আর একটা আধপোড়া জানালা। দুটি জানালার মাঝামাঝি জায়গায় মূর্তিটা স্থির হয়। দেয়ালে লেপ্টেই আছে ছায়ার মত অথচ দেওয়াল ছেড়ে বেরিয়েও আছে সামনের দিকটা জ্যান্ত মানুষ দেয়ালে পিঠ হয়ে দাঁড়ালে তার রক্ত মাংসের শরীরটা যেমন থাকে। আধপোড়া জামা কাপড়ের কালচেমার টুকরো গা থেকে ঝুলছে। সারা গায়ে পোড়ার দাগ ঝলসানোর থাগ থাগ ফোস্কা। মাথাটা হেট একটু ফাঁক হয়েছে। চাপ চাপ জমাট বাঁধা কালো রক্ত।

নীলা চেয়ে থাকে। ভূত দেখলে চোখের সামনে তিন চার হাত তফাতে সত্যি সত্যি সত্যিকারের ভূত দেখলে মানুষ চেঁচায় গোঁ গোঁ করে, মূর্ছা যায়—এসব শ্রেফ্ মিছে কথা। ভয় টয় যা হবার তা হয় পরে। নড়ে না চড়ে না শব্দ করে না, অবশ্য আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাই বলে অচেতন হয় না কিন্তু চেতনা থাকলে আর ভূত দেখবে কি করে? আর শরীরে ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট চালিয়ে দিলে যেমন হয়, বেশ টের পাওয়া যায় কি ঘটছে অথচ শরীরটা অবশ হয়ে থাকে, ভূত দেখলে ঠিক সেরকম হয়।

দুপাশে আধপোড়া জানালা, দেয়ালে নানারকম কালচে কালচে দাগ, ছায়ামূর্তিটা যেন তার নকল করে মিশে গিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করছে। জন্তু-জানোয়ার যেমনি বনে-জঙ্গলে রঙ ছায়া ফোঁটা ফুটকি লাইন দিয়ে গা সাজিয়ে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করে। ছায়াটা তাই ভূতের চেয়ে ভয়ংকর।

হঠাৎ ছায়াটা মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ নীলার তাই মনে হয়, সামনে ছিল, আচমকা দেখা গেল নেই। আসলে ভূত যারা দেখে ভূতের অন্তর্ধানটা তাদের কাছে এই রকম ঠেকে। ভূত আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলেও সেটা তারা টের পায় না। ভূত

বা ভূতের আবির্ভাবে ভূতের শেষ চিহ্নটুকু মিলিয়ে গেলে আরেকটা শক লাগে, তা হল ভূত দেখার শক। দুটো শকের মাঝামাঝি সময়টা হল ভূত দেখা পিরিয়ড।

গলা ফাটিয়ে প্রাণপণে চিৎকার করার জন্য নীলা মুখে করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, কানের কাছে আচমকা বিকট একটা আওয়াজ ওঠায় আঁতকে উঠে সে মূর্ছা গেল। এক পলকের ব্যাপার, প্রফুল্লবাবুও আবিষ্ট হয়ে ছায়ামূর্তিটা দেখছিলেন, ছায়া মিলিয়ে যাবার পর তিনিও স্বভাবতই গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করেছেন। নীলার চেঁচিয়ে ওঠার সিকি সেকেন্ড আগে হওয়ায় তার উৎকণ্ঠ আওয়াজে চম্‌কে নীলা মূর্ছা গেছে। নীলা আগে চেঁচালে প্রফুল্লবাবুও হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়তেন। ভূত দেখার পর এরকম হয়।

নীলার মা ঘুমোচ্ছিলেন। নীলার ছোট ভাই বলাই স্বপ্ন দেখছিল বন্যায় ট্রেন আটকে আছে, গাড়ি প্রায় ডুবুডুবু, সে গাড়ির ছাদে বসে আছে। দুজনেই ঘুম ভেঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে।

নীচের তলার ভাড়াটেদের ছেলে অনন্ত লণ্ঠন হাতে খবর নিতে আসে। তারাও প্রফুল্লবাবুদের সঙ্গেই আজ তিন দিন এ বাড়িতে ভাড়াটে এসেছে। বাড়ির দরজা জানালা যেমন সারানো হয়নি ইলেক্‌ট্রিক লাইনও ঠিক করা হয়নি। বাড়িওয়লা কথা দিয়েছে শীগ্‌গির হবে। পুরোনো ভাঙ্গাচোরা লণ্ঠন আর মোমবাতি দিয়ে চালাতে হয়।

মাথায় জল দিতে না দিতে নীলার জ্ঞান হয়। ভূতের ভয়ে মূর্ছা যাওয়াটা ঠিক অজ্ঞান হওয়া নয়, তফাৎ আছে। মূর্ছা গেলেও একটু জ্ঞান থেকে যায়। রাত দুপুরে চুল ভেজানোর অনিচ্ছা থেকে পুরো জ্ঞান ফিরে আসে চট্‌ করে।

ভূত? দু'জনেই দেখেছেন? দেয়ালে—অনন্ত চিন্তিত ভাবে একটা ট্র্যাঙ্কে বসে, এবড়ো,-খেবড়ো দাগ ধরা দেয়ালটার দিকে চেয়ে বলে, ভূত অবশ্য চোখের ভুল। যে যেখানে ভূত দেখেছে সেই চোখে ভুল দেখেছে। ভূত মানেই ভুল দেখা।

নীলা চটে যায়। আপনি বলতে চান আমরা কিছু দেখিনি! মিছে বলছি? আমরা বলে নিজের চোখে—

তাই বললাম আমি? অনন্ত তাড়াতাড়ি বলে ভূত আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন। নইলে চেঁচাবেন কেন? মূর্ছা যাবেন কেন? ভূত মানে কি আমি তাই বলছিলাম। মানে আছে বলা মানেই ভূত আছে বলা। যা নেই তার মানে থাকে?

নীলা ঢোক গেলে। প্রফুল্লবাবু একটু ভীত চোখে তাকান অনন্তর দিকে। ছেলেটার মাথায় ছোট ছোট কদম ছাঁট চুল আর এত রাত্রে চোখে রোদের ঝাঁঝ নিবারণী রঙীন কাঁচের চশমা আঁটা, এতক্ষণে যেন প্রথম নজরে পড়ে। গত তিন দিন অনেকবার অনন্তকে অবশ্য দেখেছেন, কয়েকবার ওপরে এসে ঘর গুছিয়ে

বসতে এটা ওটা সাহায্যও তাদের করেছে, আজ বিকেলে চা-ও খেয়েছে তাদের সঙ্গে। তবু এখন আনন্দপুর কিনা ছায়ামূর্তি দেখার ঠিক পরে কিনা।

আমার একটা কথা বিশ্বাস করবেন?

নীলারা জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে।

এসব জিনিস, মানে ভূতটুত, অনন্ত মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, এক রাত্রে দুবার দেখা যায় না। কেউ কোনদিন এক রাত্রে দুবার ভূতের ছায়াটুকু কখনো দেখেনি। আপনারা আজ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন।

নীলা বলে, ভয় করবে।

ভয় করাটা আশ্চর্য নয়। দাঙ্গার সময় এ বাড়িতে হানা পড়েছিল, দুজন খুন হয়েছিল, আধপোড়া বাড়িটা বহুদিন খালি পড়েছিল। দরজা জানালা দেয়ালে মেঝেতে কত চিহ্ন কত প্রমাণ আঁকা আছে। বাড়ি মেলে না, রাস্তায় থাকা যায় না, তাই তারা বাধ্য হয়ে মেরামত চুনকামের আগেই বাড়িটা দখল করেছে। অনন্ত একাই আছে একতলায়, দু'চার দিনের মধ্যে অন্য সকলে এসে পড়বে।

অনন্ত বাকী রাতটা এ ঘরে এসে শুতে পারে না? প্রস্তাব শোনা মাত্র রাজী

হয়ে অনন্ত নীচে থেকে বিছানাপত্র নিয়ে আসে। একবাক্যে এমন আগ্রহের সঙ্গে সে রাজী হয়, হুড়মুড় করে নীচে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে আসে, বেশ একটু খট্‌কা লাগে সবার মনে। ভূত চোখের ভুল। ভূতের মানে আছে। অনন্ত তাই ভূত মানে। মানে বলেই বোধহয় নীচের তলায় একলা শুয়ে বাকী রাতটা কাটাতে তার ভয়ও করে। তা হোক। সেটা দোষের নয়। ভূত না থাক, ভূতের ভয় কি তাহলে থাকবে না মানুষের?

সকালে দিনের আলোয় মনে হ'ল বৈকি যে রাত্রে একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল। সম্ভবত ছায়াই দেখেছিল, ছায়ামূর্তি নয়। ভূতের ভয়ে না হোক, দিনের বেলাও গা ছম্‌ছম্‌ করে এ বাড়িতে। যে বীভৎস কান্ড হয়ে গেছে বাড়িতে, এক মুহূর্ত ভুলবার উপায় নেই। কে জানে দু'জন কোন্‌ ঘরে খুন হয়েছিল, একতলায় না দোতলায়। বাড়িটা তাড়াতাড়ি মেরামত করা দরকার।

প্রফুল্লবাবু বাড়িওয়ালার কাছে দরবার করতে গেলেন। বাড়িওয়ালা গম্ভীরমুখে বললে, হবে মশায় হবে। বলেছি যখন, হবে। কি বাজার দেখেছেন তো? না মেলে সিমেণ্ট—

—আমরা সারিয়ে নি। ভাড়া থেকে কাটা যাবে।

—হবে মশায়, হবে। আনাড়ি লোক, দশগুণ দামে মাল কিনে বাড়ি সারাবেন, ঘাড়ে তো চাপাবেন আমার। ওই তো ভাড়া দেবেন—

প্রফুল্লবাবুর চোখ কপালে উঠে যায়, ঠিক যেন ভূত দেখেছেন। সে কি মশাই। হাজার টাকা সেলামী নিলেন, আধপোড়া ভাঙা বাড়ি তার তিনশো টাকা ভাড়া তাতে মন ওঠেনি?

বাড়িওয়ালা সবিনয় হাসল, কি বাজারটা দেখেছেন তো?

অনন্ত বলে, নালিশ ঠুকে দিলে হয় ব্যাটার নামে।

প্রফুল্লবাবু বলেন, কচু হবে। বড় কর্তাদের খাতিরের লোক, ও ব্যাটা কি আইনের ধার ধারে?

অনন্ত ভেবে চিন্তে ক'সের চুন কিনে আনে, নিজেই নীলাদের ঘরের যে দেয়ালে রাত্রে ভূতের আবির্ভাব হয়েছিল সেটা চুনকাম করে দেয়। ফল যা হয় দেখে গা আরও ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে সকলের। জানালা পোড়া, তিন দিকের দেয়াল আর সিলিং-এ ধোঁয়ার দাগ তার মধ্যে এক দিকের দেয়ালটা বিলকুল সাদাটে মেরে গেছে। চুনকামে সব দাগ ঢেকে গেলেও রক্ষা ছিল, ভেজাল বাজে চুন, তাতে নীল পড়েনি। দাগগুলি সব আবছা আবছা হয়ে উঁকি মারছে।

অনন্ত জোর দিয়ে বলে তাতে কি। ছায়াটা এলে চেনা যাবে।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে তারা ভূতের জন্যে প্রতীক্ষা করতে বসে। কাল কেউ

ঘড়ি ধরে টাইম ঠিক করে রাখেনি, তবে আন্দাজ সাড়ে বারোটার সময় ছায়ায় আবির্ভাব ঘটেছিল ঃ এগারোটার আগেই চারিদিক বেশ নিঃঝুম হয়ে আসে। সবে কিছুদিন হল দাঙ্গাহাঙ্গামা থেমেছে, পাড়াটা এখনো ধাতস্থ হয়নি। অনন্ত লণ্ঠন নিভিয়ে দিতে গেলে গোল বেঁধে যায়। কেউ আলো নেভাতে রাজী নয়।

অনন্ত বলে, আলোতে কী ছায়া আসে?

নীলা বলে, কাজ নেই এসে।

মিছে তবে বসে থেকে লাভ কী?

না থাক লাভ, ঘর অন্ধকার করলে চলবে না। তর্ক চলতে চলতেই আপনা থেকে তর্কের মীমাংসা দেখা দেয়। একটু একটু করে কমতে থাকে আলো। আপনা থেকেই লণ্ঠনটা নিভে আসতে থাকে।

বড় বড় চোখ করে সকলে তাকিয়ে থাকে। সর্বাঙ্গে কয়েকবার শিহরণ বয়ে যায়। কমতে কমতে প্রায় নিভে আসে কাঁচের ভেতরে পল্‌তের শিখাটা, তারপর বার কয়েক দপ্ দপ্ করে একেবারে নিভে যায়। কাঠ হয়ে তারা বসে থাকে, এবার আর চুনকাম করা দেয়াল থেকে দৃষ্টি সরানো যায় না। বাইরের আলোচ্ছায়ার প্রতিফলনে অস্পষ্ট ছায়াছবির আঁচ পড়েছে দেয়ালে। সেগুলি স্থির পড়ে না।

নীলা বলে অস্ফুটস্বরে, আমার ভয় করছে বাবা।

প্রফুল্লবাবুর আরও গা-ঘেঁষে বসে সে। নীলার মা আর ছোট ভাইও ঘেঁষে এসে জড়াজড়ি করে বসেছে। একজন আরেকজনের হাত চেপে ধরে থাকে। চেপে চেপে সবাই নিঃশ্বাস ফেলে। নইলে নিঃশ্বাসের শব্দ অনেক দূরে ঝড়ের আওয়াজের মতো শোনায়। টাইম পিসটা টিক্‌টিক্ করে চলেছে। সময় গুণে যেন এগিয়ে আনছে সেটাকে। তারপর ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা চাপা অস্পষ্ট ঘরঘর ঘষড়ানো দাপড়ানোর মতো আওয়াজ শোনা যায়—অনেক দূরের মোটরগাড়ির থামা যেন এই ঘরের মধ্যেই ঘটছে। আওয়াজ ঘরে—গাড়ি যেন দূরে। সেই সঙ্গে এসে গেছে দেয়ালে ছায়ার ঝিলমিল ঝিলমিল আবির্ভাব। বেড়ে-কমে, নড়ে চড়ে নেচে নেচে ছায়া রূপ নিচ্ছে। ঘরের মধ্যে আওয়াজ হয় অনেক দূরে গ্যারেজের দরজা খোলার; গাড়ি ব্যাক করিয়ে গ্যারেজে ঢোকানো। ছায়া আরও বেশী ঝিলমিল করে। ধীরে ধীরে রূপ নিতে নিতে সরে সরে দেয়ালের মাঝামাঝি এসে স্থির হবার আগে একটু কেঁপে ওঠে।

না। আজ একটা নয়। শুধু দেয়ালে নয়। আরও চারটি ছায়ামূর্তির নিঃশব্দে আবির্ভাব ঘটেছে। সকলে মোহাবিষ্টের মতো চেয়ে থাকে। ছায়াগুলি এদিকে ওদিকে ভেসে বেড়ায়। ট্রাঙ্কটা তুলে নিয়ে যায়। সুটকেশটা, হাতবাক্সটা ঘড়িটা তুলে নিয়ে যায়।....

হংসভূত

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

মেটাজীর সঙ্গে আমার পরিতোষের আর কালীচরণের দেখা হল।

লোকটি দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া, ধপধপে ফরসা, পরনে ধুতি অথচ মাথায় পারশীদের মতন টুপি অথবা ডোঙার মতন একটা বস্তু। বোঁ বোঁ ক'রে বাংলা বলেন।

কিছু দূরে কল্যাণ স্টেশনের কাছে পুনার এক শেঠ গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে একটা জঙ্গল কিনেছেন। খুব সুন্দর জঙ্গল—পাহাড়-ঝরনা ইত্যাদিও আছে। কল্যাণ থেকে পুনায় যেতে হলে যেসব জঙ্গল-পাহাড় ভেদ ক'রে যেতে হয় তারই খানিকটা আর কি! এই জঙ্গল কেটে সাফ ক'রে তিনি এখানে চাষবাস করছেন। সামান্য খানিকটা জায়গা সাফ ক'রে আপাতত চাষবাস শুরু করেছেন, পরে আস্তে আস্তে বাড়াবেন। দুই-একজন লোক এই জমির খানিকটা ক'রে ভাড়া নিয়ে নিজেরাও চাষবাস করছে। যাইহোক, এখানে নানা কাজের জন্য বিস্তর লোক খাটছে, মেটাজী সেখানে কিছু কাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, আমরা তো তখুনি রাজী হয়ে গেলুম। মেটাজী বললেন—আমি শীগগিরই সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য সব বন্দোবস্ত ক'রে আসব।

এরপর আমরা রোজই খোঁজ নিই, কিন্তু শুনি যে, মেটাজীর সেখানে যাবার সুবিধা হয়নি।

প্রায় দিন পনরো পরে একদিন বললেন কাল সকালে নিয়ে যাবেন।

সংবাদটি পেয়ে আমরা যে কিরকম আনন্দিত হয়েছিলুম তা বোধ হয় না বললেও চলবে। উৎসাহের আবেগে রাত্রে আমাদের ভাল ক'রে ঘুমই হ'ল না। খুব ভোরে উঠে স্নান ক'রে চা খেয়ে এলুম। তারপরে আমাদের ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলিগুলি বেঁধে উপস্থিত হলুম।

যথাসময়ে কল্যাণে নেমে কিছুক্ষণ হেঁটে সেই জঙ্গলে এসে পৌছানো গেল। সামনের দিকটা অর্থাৎ যেদিকটা লোকালয়ের দিকে সেদিক থেকে আরম্ভ ক'রে ভেতরের প্রায় আধ-মাইলটাক লম্বা ও আধ-মাইলটাক প্রস্থ জমি পরিষ্কার ক'রে আবাদ করা হচ্ছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকে সরু রাস্তা দিয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে একখানা পাতা-দিয়ে ছাওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম।

মেটাজী উচ্চৈস্বরে কয়েকবার কি একটা ব'লে চীৎকার করতেই ঘরের ভেতর থেকেই জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল একজন বেঁটে-মতো বেশ গুণ্ডা-গোছের লোক, হাঁটুর ওপরে মালকোঁচা-মারা ধুতি পরা, গায়ে একটা ফতুয়াগোছের হাতকাটা জামা। জামাটার সামনের দিকে একটা বড় তাপ্পি পকেট।

লোকটা কাছে এসে একবার আমাদের আপাদমস্তক দেখে তারপর মেটাজীর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল।

কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন আর আমরা তিনজনে তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করতে লাগলুম।

জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে বিরাট একটা ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হলুম। দেখলুম, একদিকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে কলার বাগান করা হয়েছে। বেঁটে কলাগাছ—তাতে কাঁদি-ভর্তি বড় বড় মোটা কলা গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল সেখানে চিচিঙ্গের ক্ষেত করা হয়েছে—তিন চার হাত লম্বা হাজার হাজার চিচিঙ্গে উঁচু মাচা থেকে মাটির দিকে ঝুলছে। বড় বড় মানুষের সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল দু'হাতে সরিয়ে তার মধ্যে রাস্তা ক'রে মেটাজী ও ভুলু সর্দার আগে চলেছেন—তাঁদের পেছনে আমরা চলেছি। সম্মুখে পিছনে আশে-পাশে মোটা মোটা বড় বড় গাছ—সে-সব গাছের চেহারাও কখনো দেখিনি, নামও শুনিনি। এইসব গাছে জাহাজের কাছির মতন মোটা ও শক্ত পাকানো পাকানো লতা ঝুলছে। কোন কোন জায়গায় জঙ্গল এত ঘন যে, গাছের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে আছে। কতদিন যে সেখানকার জমিতে সূর্যালোক স্পর্শ করেনি, তার ঠিকানা নেই। জায়গাটা একেবারে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। এক জায়গায় দেখলুম, অনেকখানি জমি পরিষ্কার ক'রে লাঙল দিয়ে চষা হয়েছে—প্রায় পঞ্চাশ জন স্ত্রী-পুরুষ মিলে সেই জমি থেকে আগাছা ও পাথর ইত্যাদি বেছে এক জায়গায় জড়ো করছে।

আমরা আসতেই তারা দাঁড়িয়ে উঠে অবাক হয়ে আমাদের দেখতে লাগল। পুরুষগুলির গায়ে কোন জামা নেই, কোমরে একখণ্ড বস্ত্র জড়ানো, তাতে কোনরকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে মাত্র। মেয়েদের দেহের উপরার্ধ একরকম নগ্ন বললেই চলে। কোমরে একটু বস্ত্র জড়িয়ে রেখেছে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত রোগা। পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা দেখে মনে হয়—কোন রকমের খাদ্য তাদের পেটে পড়ে কি না সন্দেহ। সকলেই অদ্ভুত একরকমের দৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে আমাদের তিনজনকে দেখতে লাগল।

এইখানে মেটাজী পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন—এই এদের সঙ্গে তোমাদের কাজ করতে হবে। কাজ এমন হাতি-ঘোড়া কিছুই নয়—একটা বাচ্চা ছেলেকে বললেও সে করতে পারে।

এই অবধি ব'লে আবার তাঁরা কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন। আমাদের সামনে ও পেছনে বিস্তীর্ণ অরণ্য, দক্ষিণে ও বামে ছোট পাহাড়ের সারি। মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী জঙ্গলের দুদিকে উঁচু পাথরের দেওয়াল গেঁথে রেখেছেন। এক এক জায়গায় জঙ্গল সংকীর্ণ হয়ে গেছে—দু'দিকের পাহাড় অনেক কাছাকাছি হয়েছে। দেখলুম প্রায় সর্বত্রই এই পাহাড়ের গা বেয়ে নিরন্তর জল ঝরছে—তারই ফলে পাহাড়ের গায়ে শেওলা জন্মেছে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দেখা গেল একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—তারই ওপর দিয়ে একটা শীর্ণ

জলধারা এসে নীচে একটা ডোবার মতন সৃষ্টি হয়েছে। মেটাজী আমাদের বললেন—এই দেখ কেমন সুন্দর ঝরনা। এরা এর জল খায়।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর মনে হ'ল যেন এতক্ষণে আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি। ছোট-বড় গাছ ও লতায় মাথার ওপর চাঁদোয়ার মতন একটা আচ্ছাদন সৃষ্টি হওয়ায় জায়গাটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও নির্জন ব'লে মনে হতে লাগল। এখানকার পথও পরিষ্কার নয়, বেশ বুঝতে পারা গেল যে, এদিকে লোকজন বড় একটা কেউ আসে না।

এইদিকে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর দূরে একটা বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল।

মেটাজী পেছন ফিরে আমাদের বললেন—ঐ দেখ তোমাদের বাড়ি। এমন জায়গায় এমন সুন্দর বাড়িতে লাটসাহেবও থাকতে পায় না।

একটু এগিয়ে আমরা বাড়ির কাছে এসে উপস্থিত হলুম। আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রায় দশ-বারোজন নারী ও পুরুষ শ্রমিক যে আমাদের অনুসরণ করছিল তা আমরা টেরই পাইনি। এইখানে এসে দাঁড়াতেই তারা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমাদের ভাল ক'রে দেখতে লাগল, কিন্তু সর্দার রক্তচক্ষু বার ক'রে বিকট চীৎকার করে তাদের ভাষায় কি সব বলায় সকলেই ধীরে ধীরে ফিরে চলে গেল। সর্দার মহাশয়ের এই বিকট আওয়াজ শুনে তাঁর মেজাজের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল, তিনি ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে অর্থাৎ আমরা যাতে বুঝতে পারি—মেটাজীকে বললেন—শুয়োরের বাচ্চারা অত্যন্ত পাজি শয়তান এবং অসম্ভব রকমের চালাক। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে ডাণ্ডাটা ফেলে এসেছি—হাতে ডাণ্ডা নেই—বুঝতে পেরেছে যে, এখন মারতে পারবে না—অমনি আমাদের পেছু পেছু এসেছে মজা দেখতে। কাজে কোন রকমে ফাঁকি দিতে পারলে হয়।

লোকগুলি চলে যাওয়ার পর বাড়িখানা ভাল করে দেখলুম। বেশ বড় পাথরের বাড়ি, অনেকটা গির্জা-ধরনের। মাটি থেকে প্রায় আড়াই তলা উঁচু পাথরের গাঁথনি ক'রে সেখানে ঘর বানানো হয়েছে। ঘরের চারিদিকে দরজার মতো বড় বড় জানালা। মেটাজী ও সর্দার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।—

বলা বাহুল্য, আমরাও তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করলুম।

ওপরে গিয়ে দেখলুম প্রকাণ্ড একখানি ঘর—যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া—ঠিক গির্জাঘরের মতন। ঘরের মেঝে ও দেয়াল কাঠের। দেয়ালে চমৎকার ওয়াল-পেপার মারা। ঘরখানাকে মাঝে পার্টিশান দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ঘরের পাশেই আলাদা ভিতের ওপরে তৈরী ছোট্ট একখানি ঘর। বেশ বুঝতে পারা গেল, এক

সময়ে এই ঘরে কমোড ইত্যাদি থাকত।

মেটাজী বললেন—এই ঘরে সায়েবদের পায়খানা ছিল, তোমরা এইখানেই রান্নাবান্না কোরো।

মেটাজী আরও বললেন—আজ থেকেই কাজে লেগে যাও—একটা দিনের 'রোজ' কেন আর মারা যায়।

সেই বিরাট ঘরের এক কোণে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলিগুলি রেখে তখনি তৈরি হয়ে নিলুম। মেটাজী ব'লে দিলেন—দেখ, ভোর ছ'টার সময় কাজে লাগতে হবে। বেলা এগারোটায় ছুটি পাবে। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে খেয়ে দেয়ে আবার বেলা একটার সময় গিয়ে কাজে লাগবে আর ছুটি পাবে বিকেল ছ'টায়। দুপুরে, ছুটির সময় জল-টল তুলে রাখবে। কারণ, বিকেলে ঘরে এসেই সিঁড়ির দরজা ভাল করে বন্ধ করে দেবে। তারপরে আর নীচে নামা চলবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কেন মশায়?

তিনি বললেন—এ জায়গাতে আবার সন্ধ্যের পর জানোয়ার বেরোয় বলে শুনেছি।

কি জানোয়ার বেরোয় সে-কথা জিজ্ঞাসা করায় মেটাজী ধমকে উঠে বললেন—সে-কথায় তোমাদের দরকার কি? বারণ করলুম, দরজা খুলে রেখো না। ব্যস।

কথায় কথায় মেটাজী বললেন—মনে কোরো না যে, তোমরা এসে এখানে থাকবে ব'লে শেঠজী তোমাদের জন্য এই বাড়ি তৈরি ক'রে রেখেছেন।

মেটাজীর মুখে অনেকক্ষণ থেকে এইসব ক্যাঁটকেঁটে কথা শুনতে শুনতে আমার ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। বলে ফেললুম—তা যে হয়নি তা আমরা জানি। ভাগ্যদোষে আজ আমাদের এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে ব'লে মেটাজী ম'নে করবেন না, আপনার চাইতে আমাদের বুদ্ধি কম আছে।

আমার জবাব শুনে মেটাজীর মেজাজ একেবারে জল হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন—না না, রাগ করছ কেন? আমি ঠাট্টা করছি।

মেটাজী বলতে লাগলেন—এইখানে তিনজন ক্রীশ্চান পাদরী থাকতেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম বা আমেরিকা—এই রকম কোন একটা জায়গায় ছিল তাঁদের বাড়ি। ঠিক কোন্ জায়গায় তাঁদের বাড়ি তা তিনি জানেন না, তবে তাঁরা ছিলেন একেবারে গোরা।

জিজ্ঞাসা করলুম—তাঁরা এখানে কী করতেন?

—তাঁরা এসেছিলেন এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে আলোক বিকিরণ করতে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতে পালাতে পথ পেলেন না।—ব'লেই

মেটাজী উচ্চহাস্য করলেন।

কিন্তু মেটাজীর কথাটা শুনে আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম না। জানোয়ারের কথা শুনে মনটা আগেই দমে ছিল—তার ওপর ক্রীশ্চান পাদরীদের পলায়নের কথা শুনে আরও দমে গেলুম। ভাবলুম ক্রীশ্চান পাদরী—যাঁরা আফ্রিকার সিংহসঙ্কুল গভীর অরণ্যে নরখাদক বন্যমানুষদের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে ভয় পান না, তাঁরা কিসের ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেলেন? আর আমরাই বা এমন কি তালেবর লোক যে, সে স্থানে আমাদের নিয়ে এসে রাখা হচ্ছে?

ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয় মনে ক'রে মেটাজীকে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেলা গেল—হ্যাঁ মশাই, ক্রীশ্চান পাদরীরা এখান থেকে ভেগে গেলেন কিসের ভয়ে?

মেটাজী সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললেন—যেতে দাও, অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে—এবার কাজে চল।

মেটাজী ও সর্দারের পেছনে পেছনে চলতে লাগলুম! এক জায়গায় এসে তাঁরা দাঁড়াতেই আমরাও দাঁড়ালুম। সেখানে দেখলুম পথের দু'ধারে বড় বড় মানুষ-সমান ঘাস হয়ে রয়েছে। সর্দার বললেন—এই যে বড় বড় ঘাস দেখছ—এর নীচে করোগেটেড আয়রণের মতো জমিতে আলুর ক্ষেত আছে।

মেটাজী আবার ব'লে দিলেন—রাঙা আলুর ক্ষেত—লতানো গাছ চেনো তো? দেখো যেন ঘাস তুলতে গিয়ে আসল গাছ তুলে ফেলো না।

মেটাজী যাবার সময় বললেন—বেশ মন দিয়ে কাজকর্ম করবে। আমি সর্দারকে বলে গেলুম, সে কাল তোমাদের 'রোজ' দেবে তাই দিয়ে বাজার ক'রে এনো।

মেটাজী বিদায় নিলেন আর আমরা 'জয় দুর্গা' বলে মনের আনন্দে আলুর ক্ষেতে ঘাস তুলতে লেগে গেলুম। আমাদের আশে পাশে যেসব নরনারী মজুরেরা কাজ করছিল তারা কিছুক্ষণ এই জামা-পরা মজুরদের দিকে অবাক হ'য়ে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ বোধ হয় আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা ব'লে আবার যে যার কাজে লেগে গেল।

আমরা যে জায়গাটিতে ঘাস ছিঁড়ছিলুম সেখানে আরও গুটি দুই-তিন পুরুষ ও নারী কাজ করছিল। তারা আমাদের অনভ্যস্ত হাতের কাজ দেখে মাঝে মাঝে কি সব বলাবলি ও হাসাহাসি করতে লাগল। দুনিয়ার ঘাস-ছেঁড়ারও ভালমন্দ আছে।

ভালই হোক আর মন্দই হোক, কোনরকমে বিকেল দুটো অবধি কাজ করবার পর সেদিনকার মতো কাজ শেষ হ'ল। আমরা তো একরকম ছুটতে ছুটতে এসে সেই ভাঙা পাত্রে জল তুলে হাত মুখ ধুয়ে নিজেদের বাসস্থানে এসে ঢুকলুম।

প্রকাণ্ড দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি যে, সেটি বন্ধ করবার অসংখ্য হুড়কো, খিল ও ছিটকিনির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পুরানো ও অনেকদিন অব্যবহারে

প্রায় অকমর্ণ্য হুড়কো প্রভৃতি যথাস্থানে সংযোজন করতে আমাদের তিনজনের প্রায় দম-বন্ধ হবার অবস্থা। কোনরকমে সেগুলি লাগিয়ে আমরা পূর্বদিকের একটি প্রকাণ্ড জানালা খুলে দিয়ে দাঁড়ালুম।

তখন সূর্য একেবারে অস্ত যায়নি। অস্তগামী তপনের নিভন্ত আলো এসে পড়েছে গাছের চূড়ায়। আমাদের সম্মুখে দক্ষিণে বামে যতদূর দৃষ্টি যায় সুদূর প্রসারী বনশ্রেণী। গাছের পর গাছ উঁচু নীচু সরু মোটা—সবলে ধরিত্রী মাতাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দূর দূর—আরও দূরে পাহাড়ের সারি স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হতে হতে মেঘলোকে মিলিয়ে সত্য ও কল্পনায় জড়াজড়ি হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে শত-লক্ষ বিহঙ্গমের কাকলিতে মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ। আমাদের চোখে সেই দৃশ্য ফুটে উঠেছে—কানের মধ্যে সেই বিরাট শব্দ এসে পৌঁচেছে বটে, কিন্তু মন শূন্য—চিত্তে এসবের প্রতিক্রিয়া কিছুই হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অনুভব করলুম এখনও পাখীদের কলরব থেকে গিয়েছে, বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অরণ্যমাতার কোলে আমাদের প্রথম সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিয়ে সেখান থেকে সরে এলুম। মোমবাতি অনেকদিন আগে থেকেই কেনা ছিল, তাই জ্বালিয়ে নিজের ধুতি পেতে বিছানা করলুম। আমাদের কারও মুখে কোন কথা নেই—সকলেরই মন ভারী। মনের কোন গহনে বিরাট বেদনা ও অভিযোগ জমা হচ্ছিল। কিসের বেদনা ও কার ওপরে অভিযোগ—তার স্পষ্ট ধারণা নেই। মন যেমন ভারী সেই অনুপাতে উদর তেমনি হালকা। তার ওপরে সারাদিনের সেই পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত। শুয়ে শুয়ে এই তিনের ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হতে তখনও অনেক দেরি, কিন্তু পাখীদের বিপুল চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙল বটে, কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, পাশ ফিরতে পারি না। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বন্ধুদের ডেকে তুলে মুখ ধুয়ে একটু বসতে না বসতে ভোর হয়ে গেল।

সেদিন বেলা তখন প্রায় দু'টো হবে, আমরা খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একরকম কাঁপতে কাঁপতে সর্দারের কাছে গিয়ে বললুম—হয় আমাদের কিছু খেতে দিন, আর না হয় পয়সা ও ছুটি দিন—বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি।

সর্দার তখন ঘুমোচ্ছিল। আমাদের চেঁচামেচি শুনে সুখশয্যা ছেড়ে এসে খিদের কথা শুনে একবার 'ও' বলেন, গণ্ডা পয়সা একবার দু'বার তিনবার গুণে আমার হাতে দিলেন।

পয়সা হাতে নিয়ে একেবারে হক্‌চকিয়ে গেলুম। অ্যাঁ! এই ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ ক'রে দৈনিক মাত্র ছ'পয়সা! এতে সবাই খাবই বা কি? আর পরবই বা কি?

কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তখন আর পরবার কথা চিন্তা করবার অবসর নেই। তখুনি সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলুম বাজারের দিকে। পথ চলেছি তো চলেইছি; কিন্তু কোথায় বাজার? সঙ্গের লোককে যত প্রশ্ন করি সে কিছুই জবাব দেয় না। অনেক সাধাসাধি করবার পর হয়তো যদি কিছু বলে, কিন্তু সে-ভাষা কিছুতেই বুঝতে পারি না। শেষকালে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক পথ চলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলুম—শোনা গেল, সেটা নাকি বাজার।

বাজার বললে বটে, কিন্তু দোকানপত্র কোথায়? দু'একখানা পাতার ছাউনি ঘর—তারও দরজা অর্থাৎ ঝাঁপ বন্ধ। একটা এইরকম ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে লোকটা আমাদের বললে—এই একটা দোকান।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চেঁচামেচি করার পর দোকানদার দরজা খুলতে আমাদের গাইড তাকে কি বললে। দেখা গেল, খরিদ্দারের শুভাগমনে লোকটি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ভালও চাল আছে? সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। বেশ বোঝা গেল যে 'চাল' শব্দটি কর্ণকুহরে ইতিপূর্বে প্রবেশ করেনি। আমরা খাদ্য, অন্ন, তণ্ডুল, ধান্য ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে পিল পিল ক'রে চারিদিক থেকে লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াতে আরম্ভ করল। আমাদের কথা শুনে তারাও নিজেদের বিদ্যে অনুসারে দোকানদারকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না। শেষকালে চলে যাচ্ছি দেখে সে ঘরের ভেতর থেকে একটা পুঁটলি নিয়ে এসে সেটা আমাদের খুলে দেখাল। দেখলুম তার মধ্যে ধুলোর মতন কালো খানিকটা কী জিনিস পড়ে রয়েছে, তাতে আবার পোকা ধরেছে।

সেটি কী দ্রব্য জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার ও আমাদের চারপাশের যত নরনারী দাঁড়িয়ে ছিল সবাই মিলে চীৎকার ক'রে সে দ্রব্যটির গুণাগুণ বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক ধস্তাধস্তির পর বোঝা গেল যে, সে বস্তুটি বাজরার আটা—খুবই রুচিকর ও পুষ্টিকর খাদ্য। চাল যখন পাওয়া গেল না তখন আপাতত বাজরার আটাই দিতে বললুম এক সের। দোকানদার আবার বাড়ির ভেতর থেকে এক টুকরো পাথর নিয়ে এসে বাটখারার বদলে তাই দিয়ে সেই ধুলোরূপী পুষ্টিকর ও রুচিকর গুঁড়ো ওজন ক'রে দিলে। সেখান থেকে এক পয়সার নুন কিনে বেরোলুম অন্য দোকানের সন্ধানে। পেছনে সেই ভিড়ও চলল আমাদের সঙ্গে।

অনেক বলা-কওয়া ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা এক কুমোর-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। দেখলুম সেখানে নানারকম মাটির তৈরী জিনিস রয়েছে, কিন্তু হাঁড়ি নেই। অনেক চেষ্টা ক'রেও হাঁড়ি কী দ্রব্য তা বোঝাতে না পেরে শেষকালে আধা-কলসী ও আধা-হাঁড়ি গোছের একটা জিনিস কিনে প্রায় ছুটতে

যে আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে আমি ওইরকম ভাবে ছুটে গিয়েছিলুম তখন তারা কথঞ্চিৎ শান্ত হ'ল।

কিন্তু শান্ত হবার জো কি! ওদের আওয়াজের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ঘরের পূর্বদিকে চারটে দরজায় বড় বড় সমান আকারের জানালা ছিল। মনে হতে লাগল যেন পালা করে এক-একবার জানালার কাছে আওয়াজ হচ্ছে আর তারই ধমকে জানালাগুলি থর-থর করে কাঁপছে।

আমরা আস্তে আস্তে ভূমিশয্যা ত্যাগ করে পা টিপে-টিপে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কেন যে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম তা ঠিক জানি না। দরজার কাছে যেতেই জানালার দিকের আওয়াজ কমে গেল। বেশ মনে হতে লাগল আওয়াজটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। একটুখানি প্রাণে ভরসাও এল। কিন্তু তখুনি আমাদের ভ্রম ছুটে গেল। বুঝতে পারলুম যে আওয়াজটা জানালা ছেড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিতোষ অনেক গবেষণা করে বললে—এ মনে হচ্ছে হাঁসভূত! অতি দুঃখেও হাসি পেল। হংসদূতের কথা শোনা আছে কিন্তু হংসভূতের কথা তো কখনো শুনিনি বাবা। ওদিকে হংসভূতের গর্জনের ঠেলায় মনে হতে লাগল ঘরের মধ্যে যমদূত এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভয়ে আমাদের দেহে কালঘাম ছুটতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যাবেলার রুটি গোস্ত ও কালরাত্রের কাঁচা চিচিঙ্গে ও কাঁচা বাজরার ঠুলি ভুর হয়ে দেহ বেয়ে ঝরতে লাগল। কতক্ষণ ধরে এই দুর্ভোগ আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল অধিক বলতে পারি না। আমাদের তো মনে হয়েছিল—এই গর্জন শুনতে-শুনতেই জীবন অবসান হবে।

হংসভূতের গর্জন থেমে যাওয়ার পর বুকের ধড়ফড়ানি থামতে-থামতে ভোর হয়ে গেল।

সকালবেলা কাজে লাগবার খানিক পরে সর্দার যখন এল তখন তাকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বললুম। সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি এমন সময় দেখলুম, আমাদের চারপাশে অনেকগুলি লোক এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলুম, আমাদের কথা শুনে তাদের মধ্যে জন্তুর মতো চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। আস্তে কথা বলার রীতি তাদের মধ্যে নেই—তারা নিজেদের ভাষায় সশব্দে কি সব আলোচনা আরম্ভ করে দিলে। সর্দার একটা বিরাট ধমক ও তাড়া দেওয়ায় তারা যে যার কাজের দিকে চলে গেল। সর্দার আমাদের একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—এসব কথা তোমরা ওদের বলেছ নাকি?

—না তো!

সর্দার বললে—খবরদার। ওদের কিছু বোলো না, তা হলে ওরা সব কাজে আসা বন্ধ করে দেবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—ওটা কি জানোয়ার? সর্দার তার

হাঁড়িমুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বললে—ও জানোয়ার না, ও হচ্ছে দেও। জঙ্গলে কত রকমের জিনিস আছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

মনে মনে বললুম—এরকম জিনিসেই যা অবস্থা হয়েছে—

সর্দার বললে—তোমরা কিছুতেই দরজা কিংবা জানালা খুলো না।—তাহলে বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি।

সর্দার বাড়ি ফিরে যেতেই চারিদিকে মজুরের দল—যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এসে আমাদের নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ ক'রে দিল। এ কয়েক দিন তাদের কথা শুনে শুনে সে ভাষা বলতে না পারলেও কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেছিলুম। আমাদের রাত্রের অভিজ্ঞতা শুনে তারা যা বললে তার তাৎপর্য হচ্ছে—এ জঙ্গলে অনেকদিন থেকেই দেবতারা বাস করছেন। এ জায়গাটা পরিষ্কার করার ফলে তাঁরা এখন সদলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে ওই বাড়িটাতে এসে কেউ হানা দিয়ে থাকেন। ওইখানে সায়েবরা থাকত। দেবতারা এসে চলে যেতে বলায় তারা বাড়ি ফেলে চলে গিয়েছে।

আমরা তখন একটা লাঙল-চষা জমিতে পাথর ও আগাছা বাছবার কাজে লিপ্ত ছিলুম। আমার কাছেই একটা অল্পবয়সী মেয়ে কাজ করছিল। তার বয়স বোধ হয় পনরো-ষোলো বছর হবে। অত্যন্ত রোগা কিন্তু বসন্তের বাতাস পেলে যেমন কোন-কোন শুকনো কাঁটা গাছেও ফুল ধরে, তেমনি তার দেহে যৌবনের আগমনীর সামান্য সুরের আমেজ লেগেছে মাত্র। কাজ করতে-করতে একবার দু'জনে খুব খাছাকাছি এসে পড়ায় সে আমাকে কি যেন বললে। তার কথা ভাল করে বুঝতে না পারায় আমি আরও কাছে সরে যাওয়ায় সে আবার বললে—কাল রাতে কি হয়েছিল তোমাদের?

বললুম—তুমি কি করে জানলে?

সে বললে—সবাই বলছে কাল রাতে তোমাদের ঘরে নাকি দেও এসেছিল?

বললুম—দেও কি তা জানি না, তবে—এসেছিল কেউ।

মেয়েটিকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে তার মাকে ডাকলে। মা দূরে আমাদের ক্ষেতেই কাজ করছিল। মেয়ের ডাক শুনে একরকম ছুটে কাছে এল। মায়ের দেখাদেখি বাপ, একটি ছেলে ও মেয়ে যারা সকলেই কাছাকাছি কাজ করছিল—ছুটে এগিয়ে এল। মেয়েটি সকলকে কি সব বলায় মা এগিয়ে এসে আমাদের বললে—ও বাড়িতে আর তোমরা থেকো না। দেও বড় সর্বনেশে জিনিস!

আমরা বললুম—কিন্তু সর্দার ব'লে দিয়েছে ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে আর কোন ভয় নেই।

ছুটতে স্টেশনে এসে মুড়ি ছোলা ভাজা ইত্যাদি যা পাওয়া গেল একরকম পেটভরে খেয়ে নিয়ে দৌড়লুম ডেরার দিকে।

জঙ্গলে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যে হয়ে এলেও একটু আলো ছিল। ওরই মধ্যে একরাশ শুকনো কাঠ যোগাড় করে, নতুন পাত্রে জল ভরে, ঘরে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। বাড়ি থেকে ফিরে আসবার মুখে সন্ধ্যার আবহাওয়ায় কালীচরণ একটা চিচিঙ্গে ছিঁড়ে এনেছিল। সে বললে—এই রুটি খাওয়ার অভ্যেস তো কখনো নেই, এই চিচিঙ্গের কালিয়া দিয়ে রুটি মারা যাবে।

প্রায় তিনদিন একরকম নির্জলা উপবাসের পর এই মহাভোজের আয়োজন দেখে মনটা খুশীই হয়ে উঠল। যাইহোক, তিনজনে মহা উৎসাহে আমাদের রান্নাঘর অর্থাৎ পাদরীদের ভূতপূর্ব পায়খানা ঘরে তো ঢোকা গেল। তখনো ঘরের মেঝেতে দুটো তিনটে কমোডের দাগ ঝকমক করছিল, কিন্তু জীবনে উন্নতি করতে গেলে ওসব ছোটখাট দাগকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে চলবে না।

আধখানা চিচিঙ্গে ছুরি দিয়ে কুচিয়ে মনে হ'ল রান্না হবে কিসে? পাত্র কোথায়? রাঁধবার পাত্র কিনে আনা হয়নি বলে আপসোস হতে লাগল। শেষকালে সর্দারের দেওয়া হাড়ির অংশ—যা এই দু'দিন আমাদের জলপাত্রের অভাব দূর করেছে, তাইতে জল দিয়ে আগুনে চাপিয়ে দেওয়া গেল। জল একটু সোঁ সোঁ করতেই কুঁচানো চিচিঙ্গে তাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা আটা মাখবার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম।

মাটিতে কোঁচোর খুঁট পেতে তাতে সেই ধুলোরূপী বাজরার গুঁড়ো ঢেলে একটু একটু করে জল দিয়ে মাখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মধ্যে মধ্যে কাঠি দিয়ে এক আধ টুকরো তরকারি নামিয়ে দেখা হচ্ছে সিদ্ধ হয়েছে কি না।

এমন সময় ঢাই করে এক বিরাট আওয়াজে চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তেই অর্থাৎ চমক ভাঙবার আগেই একটি বজ্রনির্ঘোষ এবং তারপরেই অগ্নিবৃষ্টি—মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মুখ হাত পিঠে গরম চিচিঙ্গে-চূর্ণ চড়চড়িয়ে উঠল!

—বাপরে—বলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চিচিঙ্গের টুকরোগুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি—মেঝেতে তরকারির টুকরোগুলো প'ড়ে রয়েছে। সেই ভাঙা হাঁড়ির কানা আবর্জনা বহন ক'রে যার শেষ জীবন কাটছিল—অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে সে দেহরক্ষা করেছে। ভাবতে লাগলুম—হাঁড়িভাঙা তো দেহরক্ষা করলে কিন্তু আমাদের দেহ রক্ষার উপায় কি? তখন সেই নিভন্ত আগুনে বাজরার ঢেলাগুলি পুড়িয়ে নিয়ে আর আধখানা চিচিঙ্গে যে ছিল তাই দিয়ে দু'দিন নিরম্বু উপবাসের পর পরমানন্দে পারণে প্রবৃত্ত হলুম।

যাইহোক, সে রাত্রে রান্না করার চেষ্টা ক'রে আমরা বুঝতে পারলুম যে নিজে

রান্না ক'রে খেয়ে এখানে কাজ করা চলবে না। সকালবেলা সর্দার আমাদের কাজের তদন্ত করতে এলে তাকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললুম।

সেদিন বেলা চারটের সময় সর্দারের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ইষ্টিশানে গিয়ে সেই তল্লাটে খুঁজে খুঁজে রুটি-গোস্ত-এর দোকানে বসে আহার করা গেল। তিনজনে মিলে সেখানে দু-আনার খেয়ে পরদিন দুপুরবেলার খাবার জন্য এক আনার রুটি কিনে নিয়ে ফিরে এলুম। আমাদের থাকবার জায়গায় এসে তখনো অনেকখানি বেলা রয়েছে দেখে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখে বেড়াতে লাগলুম।

সেখানকার একটা দৃশ্য আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এক জায়গায় দেখা গেল একটা বিরাট গাছকে বেড়ে একটা লতা ওপরে উঠে নিজের ডালপালা দিয়ে গাছটার ডালপালাকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, আর সেই লতায় ফুটেছে ছোট ছোট সাদা ফুল। এত ফুল যে, গাছ আর লতা সে ফুলে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ওপর থেকে সেই ফুল ঝরে-ঝরে গাছটার চারিদিকের মাটিতে যেন ফুলের বিছানা পাতা হয়েছে, আর সেই ফুলের সৌরভে বন আকুল হয়ে উঠেছে। আমরা কাছে যাওয়ামাত্র মৌমাছির দল ভোঁ-ও-ও ক'রে আপত্তি জানাতেই পেছু ফিরে পালিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর সেই ফুল-সৌরভে মন-প্রাণ-দেহ ভরে নিয়ে নেশায় টলতে টলতে ডেরায় ফিরে এলুম।

ফুলের গন্ধে নেশা লেগেই হোক কিংবা কয়েকদিন অনশন ও অর্ধাশনের পরে শত শরতের পুরাতন বলদের মাংস পেটে পড়ে হোক, ঘরে এসে দোর-জানালা দিয়ে বসতে না বসতেই আমাদের কালীচরণের কিরকম ভাবদশা লেগে গেল। সে শুরু ক'রে দিলে কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া তো রবে না।

অনেক রাত্রি অর্থাৎ সন্ধ্যে থেকে প্রায় দু'ঘন্টা গল্প ক'রে আমরা শুয়ে পড়লুম।

ঘুমের মধ্যে বিরাট একটা শব্দ কানে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। আচমকা ওইরকম আওয়াজে আমি যেন জ্ঞানহারা হয়ে গেলুম। আমার পাশেই যে বন্ধুরা শুয়ে আছে সে-কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে ভয়ে দিলুম দৌড়, কিন্তু আছড়ে পড়ে মাথা ও মুখে বিষম আঘাত লেগে সম্বিৎ ফিরে পেলুম, ততক্ষণে কালী ও পরিতোষ উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেললে।

সেই স্বল্পালোকেই দেখতে পেলুম ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে আর হাত কাঁপছে একটু একটু করে। আওয়াজ তখনো সমানভাবে চলছে। মনে হতে লাগল হাজার হাজার রাজহাঁস যেন একটা গলা দিয়ে চিৎকার করে চলেছে। পরিতোষ ও কালী আমাকে সেই রকম দেয়ালের কাছে দেখে মনে করেছিল আমার সঙ্গে আওয়াজের কোন প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যখন তাদের বুঝিয়ে দিলুম

কঙ্কালের টঙ্কার

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আত্মীয়রা আমায় তিরস্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাষ্টারমশাই প্রহার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেরা না -ছেপে ফেরৎ দিতেন। কিন্তু বলে রাখি, একদিন সমূহ বিপদ্ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, সে শুধু আমার ঐ কবিত্বশক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কবিতা আমার প্রাণরক্ষা করলে কেমন ক'রে? সত্যি বলছি, সেদিন কারও সাধ্য ছিল না যে, মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে! ভাগ্যিস কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অত্যাচারে কবিতা লক্ষ্মীকে বাল্যবয়সে বিদায় দিলে সেদিন আমার যে কি অবস্থা হত, তা আমিই জানি।

গল্পটা তাহ'লে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লী। টাইম-টেব্‌ল্ খুলে দেখলুম, টানা দিল্লী যেতে হলে রাত্রের গাড়িতেই সুবিধে। কিন্তু সে ট্রেন অনেক রাত্রে ছাড়ে—প্রায় দু'টো। একে জয়পুরের মতো জায়গা, তায় মাঘমাসের শীত, তার উপর রাত্রি দুটো—এই ত্র্যহস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগল। কিন্তু উপায় কি? আমি ষ্টেশন-মাষ্টারকে বল্লুম—"কি উপায় করা যায়, বলুন দেখি? এই দারুণ শীতে ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরবার কথা মনে করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে!"

ষ্টেশন-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ফার্ষ্টক্লাস প্যাসেঞ্জার? তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল-কোম্পানী আধাভাড়ায় সর্বত্র-যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি সস্তায় বড়-মানুষি করেছিলুম। বুক ফুলিয়ে বল্লুম—"হ্যাঁ, আমার ফার্ষ্ট-ক্লাসের টিকিট।" ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—"প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভাল ব্যবস্থা আছে।"

আমি বল্লুম—"কি?"

তিনি বল্লেন—"আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে ষ্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফার্ষ্টক্লাস গাড়ি ঐ সাইডিঙে কেটে রেখে দেবো, আপনি তাতেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে, তাতেই আপনার গাড়ি লাগিয়ে দেব—আপনি

দিব্যি ঘুমুতে ঘুমুতে দিল্লী গিয়ে পৌঁছবেন।"

আমি বল্লুম—"বাঃ এ তো বেশ!"

ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—হ্যাঁ শীতের রাত্রে গাড়ি ধরবার অসুবিধে বলেই তো কোম্পানী বড়লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।

আমি বল্লুম—"খুব ভাল ব্যবস্থা। আমি আটটার মধ্যেই আসব—আপনি গাড়ি ঠিক করে রাখবেন।" তিনি বললেন—"গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরী করবেন না। আটটার পরে আর ট্রেন নেই ব'লে আমরা আটটার সময় ষ্টেশন বন্ধ করে চলে যাই।"

আমি বল্লুম—"আটটার মধ্যেই আসব।" বলে আমি চলে গেলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেরে পায়ে তিনজোড়া ডবলমোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্লানেলের কামিজ, তার উপর সোয়েটার,

তার উপর তুলো ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েষ্ট কোট, ওভার-কোট এবং সর্বোপরি একটা মোটা বালাপোষ মুড়ি দিয়ে, মাথাটাকে কান-চাপা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাঁপতে কাঁপতে ঠিক আটটার সময় ষ্টেশনে এসে হাজির হলুম।

আমার মস্ত-বড় লোহার তোরঙ্গটা দু'জন কুলি এসে ধরাধরি ক'রে নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ ক'রে একটু হেসে ছেড়ে দিলে। আমি বল্লুম—"কেয়া হুল রে!"

সে বল্লে—"বাবুজির তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা দু'-একঠো ধুতি উতি আছে, সেগুলি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটি আমাদের বখশিস্ ক'রে যান বাবু—আপনার কুলি-ভাড়া, রেল-মাশুল অনেক বেঁচে যাবে।"

আমি বল্লুম—"যা যা, তোম্‌কো আর ইয়ে করতে হবে না।" বলেই আমি হন হন্ ক'রে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরের দিকে চলে গেলুম। ষ্টেশন-মাষ্টার আমাকে দেখেই বল্লেন—"গুড্ ইভিনিং বাবু। আপনার ভাগ্য খুব ভাল আজ আর কোন প্যাসেঞ্জার নেই; সমস্ত গাড়িটাই আপনার একলার। চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।" ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে, পাঁচ-ছয়টা রেল লাইন টপ্‌কে অনেক দূর চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা কন্ধকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! মাষ্টারবাবু গাড়িটার চাবি খুলি দিয়ে বল্লেন—"নিন্—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন।" তাড়াতাড়ি তাঁর হাত-বাতিটা তুলে নিয়ে "গুড্-নাইট"—ব'লে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাঁকে আর দেখতে পেলুম না, রেল-লাইনের খোয়াগুলির উপর তাঁর জুতোর খস্‌খস্ শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছ্যাঁৎ ক'রে আমার মনে হল—তাই তো মাষ্টারবাবু অমন ক'রে পালালেন কেন?

ইতিমধ্যে দেখি, কুলি-দুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বলছে—"বাবুজি পয়সা।" আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুট দিলে ষ্টেশনের দিকে। ব্যাপার কি? আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখি দুটো কয়লা-মাখা কালো ভূত রেল লাইনের বাঁধের নীচে থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে সাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিল। তার পরেই সব একেবারে নিস্তব্ধ। একেবারে অন্ধকার!

অমাবস্যার রাত্রি—চারদিকে অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট করছে। সেই অন্ধকারে একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চারিদিক দেখতে লাগলুম—আশে পাশে

কেউ নেই; দূরে কেবল গাছগুলি অসাড় হয়ে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভিতরটা কেমন ছম্ছম্ করতে লাগল।

আমি আস্তে আস্তে গাড়ির্র মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেয়াল হাতড়ে বিজ্লিবাতির চাবি টিপলুম।—খুট ক'রে শব্দ হ'ল, আলো হল না। সর্বনাশ! আলো নাই নাকি? আলোর সুইচ্ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলাম, কোনই ফল হল না, যেমন অন্ধকার তেমনই, পকেট খুঁজলুম, দিয়াশলাই নেই। কেমন ক'রেই বা থাকবে? তোরঙ্গের মধ্যে একটা দিয়াশলাই আছে। চাবি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিল, বালাপোষ, ওভার কোট, ওয়েস্ট কোট, সোয়েটার গেঞ্জির গোলক-ধাঁধার মধ্যে কোথায় যে পৈতে গাছাটা হারাল, কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বামুনের ছেলে বিপদে আপদে, বিদেশ বিভুঁয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায়! সেটাও শেষে খোওয়ালুম!

সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগল। অন্ধকার যে জাঁতাকলের মতো মানুষের বুককে এমন ক'রে পিষতে থাকে এ আমি জানতুম না। আমি গাড়ির মধ্যে এদিক ওদিক ক'রে ছট্‌ফট্ করতে লাগলুম, কানে কাদের সব ফিস্ ফিস্ কথা এসে লাগতে লাগল। কোথায় একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে দুটো পাথর তুলে ঠক্‌ঠক্ ক'রে সজোরে ঠুক্তে লাগলুম—যদি একটু আলোর ফিন্‌কি পাই। কিন্তু হায় অদৃষ্ট, আলোর বদলে পাথরের কুচির ফিন্‌কি এসে আমার চোখ-দুটোকে ঝনঝনিয়ে দিলে!

আমি দু হাতে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে ষ্টেশনের দিকে ছুট দিলুম, যেমন ক'রে পারি, সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসব। ষ্টেশন মাষ্টারটা কি পাজি! এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিল না। বল্লে কি না, দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে যাবেন। পাজি কোথাকার!

আমি ছুটতে ছুটতে একেবারে ষ্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালুম—প্ল্যাটফর্মের কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিল, ঠিক তার সাম্‌নে। কিন্তু এ কি? এই তো সেই খেজুর গাছ, এই তো এই তো রয়েছে। কিন্তু ষ্টেশন কোথায়? আমি এদিক্ ওদিক্ চারিদিক চেয়ে দেখলুম ষ্টেশন নেই। মনে হল, কালো শ্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলি মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি ক'রে অন্ধকারের গা থেকে ষ্টেশনকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে।

আমার বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠল। আমি আর তিলমাত্র না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলুম—যে-পথে এসেছিলুম, সেই পথে আমার গাড়ির দিকে—টপাটপ্ পাঁচ-ছয়টা লাইন টপ্‌কে ছুটতে ছুটতে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে।

গাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। কি সর্বনাশ!

আবার ভাল ক'রে চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম—ষ্টেশনও নেই, গাড়িও কোথায়? করি কি! একবার মনে হল, যাই, আর একবার গিয়ে ভাল ক'রে ষ্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু ষ্টেশনের দিকটার সেই খাঁ-খাঁ মূর্তি মনে হতে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। ছেলেবেলায় গল্পে শুনতুম , দৈত্যদানবরা রাতারাতি বড়-বড় বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেত—একি তাই হল নাকি? মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই!

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হল, এমন ক'রে রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয়—আচমকা একখানি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে! যেই এই কথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্যদিকে ছুটে গেলুম! কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন, সামনে পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, যে দিকে ছুটি, সেইদিকেই দেখি রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে—পালাবার উপায় আর নেই! আমার এই ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা যেন হঠাৎ খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল। আমি চম্‌কে উঠে থেমে দাঁড়াতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর গড়াতে গড়াতে নীচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হল প্রাণটা যেন বাঁচল। ট্রেন-চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। মনে হ'তে লাগল কতক্ষণে রাত্রিটা কাটবে। কিন্তু রাত্রির যেন আর শেষ নেই। বসে বসে দেখতে লাগলুম নিস্তব্ধ রাত্রি ঝিম্-ঝিম্ করতে করতে আরও নিঝুম চামচিকের ডানার মতো একখানা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে আস্তে টেনে মুড়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব জিনিস যেন মুছে আসছে। দেখতে-দেখতে আমি শুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতো-মোজা পরা আমার লম্বা পা দুখানা একটু একটু ক'রে মুছে গেল। কালো ওভার কোট ও নীল বালাপোষ মোড়া-গা—তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগল। যখন প্রায় কোমর অবধি মুছে গেছে, আমি আর সে দৃশ্য দেখতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেল্লুম। চোখ বুজে—মনে হতে লাগল—আমি আছি কি নেই?

"আছে আছে—এইখানে আছে।" ব'লে কানের কাছে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠল। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহের মেদ-মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা কঙ্কাল তার কাঠির মতো সরু সরু লম্বা আঙ্গুল নেড়ে ইসারা ক'রে কাকে ডাকছে। দেখতে দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর একটা কঙ্কাল লাফাতে লাফাতে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

তারপর আর একটা!

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট ক'রে আমাকে দেখতে লাগল। তার চোখের ওপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দুটো গোল গোল গহ্বর কালো কট্‌কট্‌ করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"এই নাকি সে?"

প্রথম কঙ্কালটা বল্লে—"বেশ বেমালুম লুকিয়েছে তো, একেবারে চেনবার যো নেই।"

শেষ কঙ্কালটা ছুটে এসে বল্লে—"কৈ, দেখি।" ব'লে তার হাড় বার-করা আঙ্গুলগুলি দিয়ে টিপে টিপে আমায় দেখতে লাগল!

"ও আর—দেখছিস কি। ও সে-ই! আমার চোখে কি ধুলো দেবার যো আছে—হাজারই লুকোক না।" ব'লে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হাঁ করে বিরাট শব্দে হেসে উঠল। মুখের ভিতর থেকে তার সেই সাদা সাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরল।

শেষ কঙ্কালটা বল্লে—"তবু একটু পরখ করতে হবে না; ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়।" ব'লে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল। আমি ভাবলুম ব্যস্‌ এইবার আমার শেষ!

দেখতে দেখতে বাকি-দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা-দুখানা ধরলে, প্রথমটা মাথার দিকটা ধরলে; তারপর তিনজনে মাটি থেকে চ্যাংদোলা ক'রে আমায় তুলে ফেল্লে। আমি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরে বলে উঠলুম—"কোথায় নিয়ে যান মশাই।"

তারা বল্লে—"বিয়ে দিতে।"

আমি চমকে উঠে বললুম—"বিয়ে দিতে কি মশাই! এই বুড়ো বয়সে?"

একজন বল্লে—"বুড়ো বরই পছন্দ করি!"

আমি বল্লুম—"মশায় আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান না, আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন।"

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—"তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেব।"

আমি বল্লুম—"আমি তো মশাই, পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছেলেবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে; তারপর তো জ্যাঠামশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন!"

সে বল্লে—"আমরাও পুলিশ এনেছি; ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেব ব'লে!"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—"কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না!"

"পারব না কি? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কি তোমার গোঁ?" ব'লে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন ক'রে উঠল।

আমি বল্লুম—"রাগ করেন কেন মশাই? আমি ছাড়া কি আর পাত্র নেই? কত ছেলে হয়তো খুশী হয়ে বিয়ে করবে।"

সে বল্লে—"এত রাত্রে এখন ভাল পাত্র পাই কোথায়? যার তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না, চল, লগ্ন বয়ে যায়।"

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লুম—"তাহলে নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে?"

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বল্লে—"দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা?"

আমি তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম—"ক্যাংলা কে মশাই! আমি তো ক্যাংলা নই। আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমার পিতার নাম ঁমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।"

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্লে, "রাধে মাধব! রাধে মাধব!"

আমি বল্লুম—"সে কি মশাই?"

সে বল্লে—"এই এত রাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শিয়াল কুকুর থাকে না, আর মাধব চক্রবর্ত্তী আছে? তুই এতই বোকা পেলি আমাদের?" আমি বল্লুম—"এই তো আমি রয়েছি।" সে বল্লে—"আরে ভাই, মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের ভিতর আবার কে এলো?"

সে বল্লে—"আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্ত্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সেঁধিয়ে আছিস, সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস?"

আমি বল্লুম—"এসব কি হেঁয়ালি বকছেন মশাই? মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো, তো মাধব চক্রবর্ত্তী গেল কোথা?"

সে বল্লে—"আরে ভাই বামুনের ছেলে সে, বৈকুণ্ঠে গেছে।"

আমি বল্লুম—"না মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল!" সে বল্লে—"মরেছে না তো কি?"

আমি বল্লুম—"মরেছে কি রকম! সে মরে গেল আর টের পেলে না?"

সে বল্লে—"মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে সে তা টের পায় না কি!"

কথাটা শুনে বোঁ ক'রে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলুম না কি অ্যাঁ? সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব মুছে আসছে—সেই কি আমার মৃত্যু নাকি? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগল। হয়তো এ আমি নই—এ আর কার

আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলির সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতুম? জ্যান্ত-মানুষ কি কখনো তা পারে? কিন্তু মরে গেলুম কেমন ক'রে? আমার তো রোগ হয়নি। হয়তো ঐ বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাইনি।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গুলিয়ে যেতে লাগল। কেমন মনে হ'তে লাগল—না, আমি চক্রবর্ত্তী নই। এবং ঠিকই বলেছে—কাঙালীচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতো আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্ত্তীর জের বুঝি এখনো চলছে, কিন্তু কাঙালীচরণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙালীচরণ হব, তবে আমি আমাকে চিন্‌তে পারছি না কেন? এরা তো চিন্‌তে পেরেছে।

প্রথম কঙ্কালটা ব'লে উঠল—"কি হে ক্যাংলা, কি ভাবছ? বিয়ে করবার মতি স্থির হল!" আমি বল্লুম—"আচ্ছা মশাই আমি কি সত্যি কাঙালীচরণ?"

সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে বল্লে—"সে কিরে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারছিস্ না?"

আমি বল্লুম—"না।"

সে বল্লে—"সর্বনাশ হয়েছে। তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না?"

আমি বল্লুম—"একটুও না।"

সে বল্লে—"তোর মনে পড়ছে না—আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুটঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে—বাগেশ্বরীর সঙ্গে?"

আমি বল্লুম—"কৈ, আমার তো কোন বিয়ের কথা হয়নি!" সে বল্লে—"সে কিরে! তোর গায়ে গোবর পর্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম—"গায়ে-গোবর কাকে বলে?"

সে বল্লে—"তুই অবাক করলি। তোর কিছু মনে পড়ছে না? গায়ে-গোবরের দিন ভোর রাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মারতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তালগাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে বাগেশ্বরী বরপণের কড়ি বাচছিল, তুই বাগেশ্বরীকে দেখ্‌তে পাস্‌নি, সেও তোকে দেখতে পায়নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস, অমনি বাগেশ্বরীর পা দুটো দুলতে দুলতে তোর কপালে এসে ঠক্ ক'রে লেগে গেল। বাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত হাত জিভ কেটে, মাথায় ঘোমটা টেনে দৌড়। আর তুই বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বল্লি ও মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। কেন রে, কেন কি হয়েছে। তুই বল্লি,—ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে। তাতে হয়েছে কি? তুই বল্লি—হয়েছে আমার মাথ আর মুণ্ডু। ব'লে তুই—কপাল চাপড়াতে লাগলি! এ সব তোর মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম—"মনে পড়ছে, এই রকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কি হল?"

সে বল্লে—"সর্বনাশ করলি। তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন; এসে বিধান দিলেন যে, বাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই সাত—একে—সাতশোবার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেঁৎলে দে, তা হ'লেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বল্লি, ওরে বাপরে; বাগেশ্বরীর মাথায় লাথি মারা! সে আমি পারব না;—ব'লে তুই ছুট দিলি।"

আমি বল্লুম—"তারপর?"

সে বল্লে—"তারপর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এই শ্মশানঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্ত্তীর মড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস। হ্যাঁরে, এই মাধব চক্রবর্ত্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায়; তোকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে বুঝি?"

আমি বল্লুম—"মাধব চক্রবর্ত্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সে বল্লে—"তোর কিছুই মনে পড়ছে না? তুই সত্যি বলছিস, না মস্করা করছিস?"

আমি বল্লুম—"তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।" সে বল্লে—"তবে সর্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে পেয়েছে।"

আমি বল্লুম—"মানুষে পেয়েছে কি গো!"

সে বল্লে—"জানিস না বুঝি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষও তেমনি আমাদের কারও কারও ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহে সেঁধিয়েছিলি, তখন বোধ হয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।"

আমি বল্লুম—"তাতে কি হয়?"

সে বল্লে—"মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিনতে পারে না, আপনার লোককে চিনতে পারে না, আবোল তাবোল বকে, কট্‌মট্ করে চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস্।

—"নিজেকে চিনতে পারছিস্ না, আমাদেরও চিন্‌তে পারছিস্ না।"

"ওগো, তবে আমার কি হবে?"

সে বল্লে—"যেমন বিয়ে করবনা বলে পালিয়ে এসেছিস্, তেমনি ঠিক জব্দ।"

আমি বল্লুম—"ওগো, আমি বাগেশ্বরীকে বিয়ে করব—আমাকে উদ্ধার করো।"

"তবে বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।"

আমি বল্লুম—"বেরুব কি ক'রে গো?"

সে বল্লে—"পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি? মুশকিল করলি দেখছি! এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্ত্তীর ঐ কোঁচার খুঁটটা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়—তাহলেই সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে আসতে পারবি।"

আমি আঁৎকে উঠে বল্লুম, "ওরে বাপরে—সে যে ফাঁসি! সে আমি পারব না।"

সে বল্লে—"ভয় কি! আমি তো কতবার ফাঁসি [illegible]র কোন ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়।"

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বল্লুম—"না গো, না—সে আমি পারব না। গলায় ফাঁসি দিতে কিছুতেই পারব না।"

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্তের মতো চোখ দুটোকে বন্ বন্ ক'রে ঘুরিয়ে বল্লে—"কী, তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলুম গলায়-দড়ে! তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে, এমন কথা বলিস্ যে ফাঁসি যেতে তোর ভয়—কুলাঙ্গার কোথাকার।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—"কি করব, আমার যে ভয় করছে!"

সে দাঁতের দু'পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠল—"ফের ঐ কথা! এই বেলা ঝুলে পড়, নইলে তোর ভাল হবে না বলছি।"

আমি বল্লুম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না—আমার ভয় করছে!"

সে আরও রেগে বল্লে—"হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ।" ব'লে সে তেড়ে আমায় মারতে এলো।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"রাগ করেন কেন খুড়ো মশাই! ও হয় তো ক্যাংলা নয়। নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?"

খুড়ো মশাই বল্লেন—"কী! ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত বছর টিক্‌টিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড় বড় ফেরার পাকড়াও করেছি— আমার ভুল হবে?" শেষ কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি দাদামশাই?"

দাদামশাই বল্লেন—"আচ্ছা বেশ, পরীক্ষা হোক্।" বলে আমার দিকে ফিরে বল্লেন—"কি হে, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী না কাঙালীচরণ!"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে, আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্ত্তী, কিন্তু তারপর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচরণ!" সে বল্লে—"কাঙালীচরণ যদি হও,

তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ ব'লে তোমায় ফাঁসি দেব আমরা, এই শ্মশানে—এই গাছের ডালে।"

আমি বল্লাম—"আজ্ঞে আমি তবে মাধব চক্রবর্ত্তী" সে বল্লে—"বেশ, মাধব চক্রবর্ত্তী ব'লে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পার, তাহলে তোমায় তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাব।"

"আর যদি না পারি?"

"তা হ'লে এইখানে তোমার ঘাড় মট্‌কে রেখে চলে যাব।"

"ঘাড় মট্‌কে দেবেন? সর্বনাশ! এই বিদেশে বিভূঁয়ে—এই অচেনা জায়গায় এত রাত্রিতে নিজেক কি করে প্রমাণ করব মশাই?"

"না পার, ঘাড়টি মট্‌কে দেব—শ্মশানের ভূত হয়ে থেক।"

সত্যি বলছি, এই কথা শুনে কেঁদে ফেল্লুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোন চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয়, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী?"

আমি বল্লুম—"আছে। এই দেখুন, আমার ডানহাতে একটা জড়ুলের দাগ।"

সে হেসে বল্লে—"ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোন ভিতরের প্রমাণ দিতে পার?"

আমি বল্লুম—"আমার ভিতর কি আছে না আছে, আমি তো জানি না মশাই। এই দেখুন না আমার ভিতরে কাঙালীচরণ আছে কি মাধব চক্রবর্ত্তী আছে, আমি তাই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।"

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠল—"আজ্ঞে না, না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

সে বল্লে—"শীগগির প্রমাণ কর, নইলে ঘাড় মট্‌কালুম ব'লে।"

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বলে—"অমন ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি কোন গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী?"

আমি ব'লে উঠলুম—"হ্যাঁ, আছে বৈকি! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি।"

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে—"তুমি কবিতা লিখতে পার? নিজে লেখ? না পরের কবিতা নিজের ব'লে চালাও?"

আমি বল্লুম—"না মশাই, আমি সে-রকম কবি নই।" সে বল্লে—"তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয়?"

আমি বল্লুম—"না, সম্পাদকরা ভয়ে ছাপেন না।" সে বল্লে—"ভয়ে ছাপেন না কি রকম?"

আমি বল্লুম—"আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে, একবার সে কবিতা ছাপলে পাঠকরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভর্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।"

সে বল্লে—"আচ্ছা! কৈ দেখি, একটা কবিতা লেখ দিকিনি।"

আমি তখনই ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট বইখানা বার ক'রে বল্লুম—"আলো একটা চাই যে।"

সে বল্লে—"দিচ্ছি আলো।" ব'লে খানিকটা ধুলো বালি একত্র করে একটা ফুঁ দিলে, আর অমনি আগুন জ্বলে উঠল। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগলুম।

খানিকটা লিখেছি, সে বল্লে—"কৈ, কি লিখলে পড়।" আমি বল্লুম—"এখনও যে শেষ হয়নি মশাই।" সে বল্লে—"কবিতার আবার শেষ আছে নাকি? যা লিখেছ পড়—ফাজলামি করতে হবে না।"

আমি সুর ক'রে পড়লুম—

"পড়িয়ে বিপদে তারা,
হয়েছি মা দিশেহারা!
উদ্ধার এ-দুঃখ-কারা
পার হ'তে মা জননী।
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির-ঢাকি,
খাবি খায় প্রাণ-পাখী,
শূন্য হেরি এ ধরণী।
কোথা মোর গেহ-খাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা, আমারে বাঁচা,
দিয়ে তোর পা-তরণী।"

এইটুকু শেষ হ'তেই সে বল্লে—"ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। এরকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা না, পুরোনো গান একটা মুখস্থ ছিল, তাই লিখে শোনাচ্ছ।"

আমি বল্লুম—"না মশাই, এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাট্‌কা। এতে আপনি পুরোনোর গন্ধ কোথায় পেলেন? দেখছেন না, একেবারে আধুনিক ধরনের লেখা।"

সে বল্লে—"থাম, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা

গান চুরি করে নিয়ে আমায় ফাঁকি দিবে ভেবেছ। তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ—আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার?"

আমি বল্লুম—"খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে, ওষুধের নাম দিয়ে অনেক ভাল ভাল কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে প্রাইজ পেয়েছিলাম। আপনার নামটা কি বলুন, আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি।"

সে বল্লে—"আমার নাম জাঁদরেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট করে। বুঝব কত বড় বাহাদুর তুমি।"

আমি বল্লুম—"মশাই, আর একটু সময় দিন।" ব'লে আমি খস্‌খস্ শব্দে লিখে যেতে লাগলুম। একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বল্লে—"উঃ, অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়।" অগত্যা আমি পড়লুম—

"রেল আছে, জেল আছে,
আর আছে কৎবেল;
পাশ আছে, ফেল আছে,
আর আছে, শূল শেল,
ঢোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সরখেল;
সব সে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল জাঁদরেল।"

পড়া শেষ হ'তেই সে চীৎকার ক'রে উঠল—"বাঃ, বাঃ, বেশ লিখেছে তো হে! আর একবার পড় তো, আর একবার পড় তো!"

আমি আর একবার চীৎকার করে পড়লুম—"রেল আছে, জেল আছে, ইত্যাদি।"

সে আবার বল্লে—"বেশ হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! যাও প্রমাণ হয়ে গেল তুমি কবি মাধব চক্রবর্তী।"

আমি বল্লুম—"ঠিক বলেছেন মশাই, আমি কাঙালীচরণ নই?" সে বল্লে—"কাঙালীচরণের চৌদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্তী না হ'লে এমন কবিতা লেখে কে?" আমি বল্লুম—"মশাই, আমার আর একটা কবিতা শুনবেন? এই খাতায় লেখা আছে—এই জয়পুরের সম্বন্ধে।" সে বল্লে—"কৈ, শোনাও তো দেখি।"

আমি তাড়াতাড়ি পকেট বইয়ের খাতা হাত্‌ড়ে কবিতাটি বার ক'রে পড়তে

শুরু করলুম—

"বস্তা-বস্তা পুঞ্জ পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম-মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড়?
লেপ-গদি বালাপোষ সর্ব বর্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড়!
উর্ধ্ব-ফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে-কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় করিছে কোতল!
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোঁড়ে শার্পনেল—"

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠল—"ওরে, ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে।"

আমি চমকে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি আমার সামনের কঙ্কাল তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগবাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি "রাম। রাম।" বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ রাম নামটা যে কেন মনে আসেনি, কে জানে!

আমি রেল লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দুটো কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বল্লে "বাবু, আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?"

আমি আর কি বলব?

বল্লুম—"আমি এখানে ঐ হিমে হচ্ছিল কি না, তাই একটু দেখছিলুম।"

তারা বল্লে—"আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।" ব'লে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে।

সে বল্লে—"বিজলিবাতি আছে, মেল গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।"

আমি বল্লুম—"আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস?—বখশিশ দেব।"

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।

টম সাহেবের ভূতুড়ে বাড়ি

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

টম সাহেবের বাড়ি।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। একতলা, দোতলা তেতলা, কত যে কামরা তাহা বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে আমরা বৃহৎ একখানি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মেঝেতে নিবিড় ধূলা পড়িয়াছিল। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ দেখিলাম ঠিক সম্মুখে একটি পায়ের দাগ পড়িল। শিশুর পদচিহ্ন। তাহার আগে কি আশেপাশে আর দাগ নাই। কেবল সেই একটি দাগ মাত্র। অগ্রসর হইয়া সেই পদচিহ্নের উপর আমার নিজের পা রাখিলাম।

অমনি ঠিক সেই সময় আমার সম্মুখে আর একটি পায়ের দাগ পড়িল। আমি আমার সঙ্গীর গা টিপিলাম। সেও আমার গা টিপিল। এইরূপে যতই যাই আগে ধুলোর উপর ততই একটি শিশুর পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতে থাকে। কেবল এক পায়ের চিহ্ন। দুই পায়ের দাগ পড়ে না। যখন ঘরের অপর প্রান্তে প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন আর দাগ পড়িল না।

সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে একখানি বড় ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল। কে যেন বাতি জ্বালাইয়া আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। দেখিলাম, সহসা ঘরের অন্য দিক হইতে একখানি চৌকি যেন হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিল।

আমি বলিয়া উঠিলাম বাঃ! একি!

ক্রমে দেখিলাম, সেই চৌকির উপর যেন কি বসিয়া রহিয়াছে। মানবের আকৃতি বটে, কিন্তু তাহার দেহ যেন অতি তরল ধূম দ্বারা গঠিত। তখন সেই ঘর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দ্বিতলে গিয়া উঠিলাম।

আমার শয়নঘর এই তলায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু তখনও নিদ্রা যাইবার সময় হয় নাই। সুতরাং এই তলার অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। একটি ক্ষুদ্র কামরার নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া আমার সঙ্গী ভৃত্য বলিল—একি হইল? এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? আমি এইমাত্র চাবি খুলিয়া কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।

বিস্ময়ে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছি এমন সময়ে কি আশ্চর্য, দ্বার আস্তে আস্তে

আপনি খুলিয়া গেল। আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এক প্রকার অমানুষিক গন্ধে ঘর ক্রমে পরিপূরিত হইতে লাগিল। একপ্রকার ভৌতিক ত্রাসে হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। আশঙ্কা যে কি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। জীবনের প্রতিকূল কোন একটা ভীষণ পদার্থ যে সেই ঘরে আছে, এইরূপ আমাদের মনে হইল।

সর্বনাশ! সহসা ঘরের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

সেই ঘরে আর অপর দ্বার কি জানালা ছিল না। প্রথমে দুইজনে দ্বার টানাটানি করিয়া দেখিলাম, কিছুতে খুলিতে পারিলাম না। আমার সঙ্গী বলিল, অতি পাতলা তক্তা দিয়া কপাট জোড়াটি গঠিত। দুই লাথিতে ভাঙিয়া ফেলিব। দেখি ভূতে কি করিয়া রক্ষা করে।

দুই লাথি নয়, হাজার লাথিতেও সে-কপাট ভাঙিল না। আমরা অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই ভঙ্গপ্রবণ কপাট ভাঙিতে পারিলাম না। শান্ত হইয়া আমরা নিবৃত্ত হইলাম।

হঠাৎ খল্‌খল্‌ করিয়া বিকট হাসির শব্দ হইল। দ্বারটি আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। সেই ভয়াবহ ঘর হইতে আমরা তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম।

সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা বারান্দায় দাঁড়াইলাম। এক পার্শ্বে মিটমিট করিয়া কেমন একটি চলমান নীলবর্ণের অলৌকিক আলো জ্বলিতেছে। কি আলো, কোথায় যাইতেছে দেখিবার নিমিত্ত আমরা তাহার পশ্চাদগামী হইলাম।

সিঁড়ি দিয়া আমাদের আগে আগে আলোটি তেতলায় উঠিতে লাগিল। তেতলার উপরে উঠিয়া একটি সাধারণ শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। যে বৃদ্ধা এই বাড়িতে একাকী বসবাস করিত, এই ঘরটি তাহার ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিলাম। ঘরের ভিতর একটি দেরাজ ছিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর একখানি রেশমের রুমাল ও দুইখানি চিঠি রহিয়াছে। চিঠি দুইটি লইয়া দ্বিতলে আসিবার নিমিত্ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম।

মনে হইল, আমার পাশে পাশে চিঠি দুইখানি কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত কে যেন বারবার চেষ্টা করিতেছে। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমি তাহার সে চেষ্টা বিফল করিলাম। আমার শয়নঘরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ঘড়ি ও পিস্তল টেবিলের উপর রাখিলাম। নিকটস্থ একটি ছোট ঘরে সঙ্গীকে শুইতে বলিলাম। মাঝের দ্বার খোলা। যে পত্র দুইখানি উপর হইতে আনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা পড়িতে লাগিলাম।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চিঠি দুইখানি কোন একটি পুরুষ তাহার প্রিয়জনকে লিখিয়াছিল, কিন্তু নামধাম কাহারও ছিল না। তাহাতে কোন একটি বিভীষিকার আভাস ছিল। কে যেন কাহাকে খুন করিয়াছে, এই ভাবের কথা। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া আমি চৌকির উপর বসিলাম। ঘরে দুইটি বড় বড় বাতি জ্বলিতেছিল।

শীতপ্রধান দেশ। ঘরের আগুন জ্বালিবার জায়গায় দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার ঘড়িটি শূন্য পথে চলিয়া যাইতে লাগিল। হাতে পিস্তল লইয়া তাড়াতাড়ি আমি ধরিতে দৌড়াইলাম। কিন্তু সোঁত করিয়া ঘড়ি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর আমি দেখিতে পাইলাম না।

আমার সেই সঙ্গী এই সময় সহসা তাহার ঘর হইতে দৌড়িয়া আসিল। চক্ষু রক্তবর্ণ। যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহার সর্বশরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছে, মাথার চুলগুলি সব খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, মহাশয়, পলায়ন করুন, পলায়ন করুন! এই স্থানে আর তিলার্ধকাল থাকিলে মারা পড়িবেন! বাপরে, ধরিল রে! এই রূপ চিৎকার করিতে করিতে সে আমার ঘর হইতে বাহির

হইয়া তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইলাম। কিন্তু ধরিতে না ধরিতে সে দরজা খুলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ শ্মশান সদৃশ অট্টালিকার ভিতর আমি এখন একা পড়িলাম। প্রাণে আমার অতিশয় ত্রাস হইল। একবার মনে ভাবিলাম, আমিও পলায়ন করি। কিন্তু একথা জানিলে বন্ধুবান্ধব সকলে হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায় আমি উপরে উঠিলাম।

আমার সম্মুখে তালগাছ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ একটি মানুষের আকৃতি দাঁড়াইল। তাহার মস্তক ছাদে ঠেকিল। সেই মস্তকে চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। সর্বশরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। পিস্তলটি হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। আমি তাহা লইবার নিমিত্ত হাত বাড়াইলাম। অসাড় ও অবশ হাত উঠিল না। আমি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম। পা অসাড় ও অবশ। পা উঠিল না। চিৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। জ্ঞান হত হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু তখনও একটা চিন্তাশক্তি আমার মনে ছিল। ভাবিলাম যদি ভয় করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রাণ হারাইব। এইরূপ মনে করিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ধৈর্য ধরিয়া রহিলাম। বাতি নিবিল না, অগ্নিস্থানে অগ্নি নির্বাণ হইল না। তথাপি ঘর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম, যেমন করিয়া হউক, ঘরে আলো রাখিতে হইবে। অন্ধকারে থাকিলে মারা পড়িব।

পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিলাম। এবার উঠিতে পরিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিলাম।

জোৎস্না রাত্রি ছিল। অল্প অল্প চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিল। সেই আলোকে দেখিলাম যে তালবৃক্ষ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণের বিকট মূর্তি তখন সম্পূর্ণভাবে ঘরে নাই, কেবল তাহার ছায়াটি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পুনরায় গিয়া চৌকিতে বসিলাম। পীত, হরিৎ, লোহিত নানা বর্ণের গোলাকার আলোক এক্ষণে ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ও গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। যে চৌকির উপর চিঠি দুইখানি রাখিয়াছিলাম, তাহার নীচে হইতে ঠিক জীবন্ত মানুষের রক্তমাংসের হাতের ন্যায় একখানি স্ত্রীলোকের হাত বাহির হইল। তাড়াতাড়ি আমি সেই হাতখানি ধরিতে গেলাম। খপ করিয়া চিঠি দুইখানি লইয়া নিমেষের মধ্যে হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য কে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার ঘাড় ভাঙিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে হাতও আসিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া আমি বরাবর সেই ভৌতিক হাত ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সে রাত্রিতে আমি যে কি করিয়া প্রাণে বাঁচিলাম, তাহাই আশ্চর্য।

কলমভূত

রাধারমণ রায়

স্বনামধন্য সাহিত্যিক সুধন্য চৌধুরী লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছেন বছর চারেক হল। ওঁর ভাষায় আমি রিটায়ার করেছি। এরপর এই চার বছরের মধ্যে ওঁকে দিয়ে কেউ চার লাইনও লেখাতে পারেনি। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা দিনের পর দিন ওঁর বাড়িতে ধর্না দিয়েও সুবিধে করতে পারেন নি। উনি বলেন, লেখার শক্তিটাই তো নেই; লিখব কী করে? বেশি পীড়াপীড়ি করলে বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠেন, অন্যদের কথা জানিনে। আমি লেখক হয়েছিলাম স্রেফ একটা কলমের জোরে। যদ্দিন কলমটা হাতে ছিল, তদ্দিন লেখক ছিলাম। এরপর যেদিন সেটা হারিয়ে গেল, সেদিন থেকে আমার লেখক-জীবনও শেষ হয়ে গেল। তারপর থেকে টানা অবসর। কলমটা হাতে আসার আগে যা ছিলাম, সেটা হারিয়ে যাওয়ার পর ঠিক তা-ই হয়ে গেলাম। অর্থাৎ বেকার। এখন শুধু আড্ডা। প্রথম জীবনে আড্ডা ছিল রাস্তার মোড়ে, এখন আড্ডা মারি নিজের বাড়িতে বৈঠকখানায়। আর জানতে চাও?

সুধন্যদার বাড়ির আড্ডায় আমারও যাতায়াত আছে। অফিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় পালটে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যের সময় চলে যাই, ওঁর বাড়িতে। এতে যাতায়াত খরচ নেই, পায়ে হেঁটেই চলে যাই; কেননা আমি ওঁর প্রতিবেশী, একই

পাড়ায় আমাদের বাড়ি। ওঁর আর আমার বাড়ির দূরত্ব দু-শো মিটারও নয়।

এই আড্ডায় প্রকাশক, সাহিত্যিক আর সম্পাদকদেরই সংখ্যা বেশি। আমি নিজেও একজন সাহিত্যিক, যদিও নাম করতে পারিনি। সুধন্যদা আমাদের মধ্যমণি। মাঝে-মধ্যে বউদি অর্থাৎ সুধন্যদার স্ত্রীও আমাদের আড্ডায় এসে যোগ দেন। ওঁদের ছেলে নেই। দুই মেয়ে, দু-জনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড়ো মেয়ে আমেরিকায় থাকে, ছোটো মেয়ে মুম্বাইতে। কাজেই আড্ডা জমানোর পক্ষে খুবই উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ওঁদের বাড়িটা।

প্রতিবেশী হিসেবে আমি জানি, সুধন্যদা লিখতে শুরু করেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। তার আগে চিঠি আর ফর্দ ছাড়া আর কিছু লেখেননি। না, পোস্টারও না। কেন না উনি কখনও রাজনীতি করেননি। চাকরিও করেননি, কাজেই অফিসের নোট লেখার প্রশ্নই ওঠে না। তখন ওঁর পেশা ছিল ছেলেমেয়েদের যোগ-ব্যায়াম শেখানো। নিজের বাড়িতেই একটা যোগ-ব্যায়ামের স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। প্রায় দেড়শো জন ছাত্রছাত্রী ছিল। মাথাপিছু মাইনে ছিল পাঁচ টাকা।

পাড়ার বয়স্কদের কাছে শুনেছি, ছোটোবেলায় সুধন্যদা ছাত্র হিসেবে মোটেই ভাল ছিলেন না। পড়তেন পাড়ারই একটা অনামী স্কুলে। ওঁর সহপাঠী ছিলেন আমার এক জ্যাঠতুতো দাদা। তাঁর কাছ থেকে জেনেছি, উনি বাংলায় খুবই কাঁচা ছিলেন। স্কুল ফাইনালে বাংলার জন্য আর-একটু হলেই হড়কে যাচ্ছিলেন। কোনও রকমে দু শোর মধ্যে বিরাশি পেয়ে চৌকাঠ পেরিয়েছেন।

সেই সুধন্যদা পঁয়তাল্লিশ বছরে কলম ধরে অবিশ্বাস্যভাবে এগারো বছরের মধ্যে তেত্রিশখানা উপন্যাস আর একশো ছত্রিশখানা গল্প লিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। লেখা ছেড়ে দেওয়ার চার বছর পরেও ওঁর নাম থাকে বেস্ট সেলার লিস্টে। রয়্যালটির মোটা টাকা আজও ওঁর পকেটে আসে।

পুরস্কারও উনি কম পাননি। রবীন্দ্র পুরস্কার থেকে শুরু করে একাডেমী আর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও উনি পেয়ে গিয়েছেন। এ-সব পুরস্কারের আর্থিক মূল্য কম না।

আরও ব্যাপার আছে। ওঁর বেশ কয়েকটা উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে বাংলা আর হিন্দিতে সিনেমা হয়েছে। টি. ভি. সিরিয়ালও হয়েছে।

কাজেই একহাতে লিখে দু-হাতে টাকা কুড়িয়েছেন। লেখক হিসেবে নাম করেছেন বলেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আর সেই সুবাদে মেয়েদের ভাল বিয়ে দিয়েছেন। একতলা বাড়িটাকে তে-তলা করেছেন। আর একখানা দামি মোটরগাড়ি কিনেছেন। তা ছাড়া পাড়ার মাতব্বরি তো বাড়তি পাওনা। পুজো-

কমিটির প্রেসিডেন্টের পোস্টে তো উনি পার্মানেন্ট হয়ে গিয়েছেন।

একদিন আড্ডায় সুধন্যদাকে চেপে ধরলাম। বললাম, "লোক তো লিখতে লিখতে লেখক হয়। আপনি কেমন করে লেখক হলেন, আজ আপনাকে বলতেই হবে।"

সুধন্যদা চাপে চিপসে যাওয়ার পাত্র নন। হাসতে হাসতে বলেন,"এর উত্তর অনেকবারই বলেছি। স্রেফ একটা কলমের জোরে।"

"সেই গল্পই আজ আমাদের শোনান। কলমটা কোথায় পেলেন, প্রথম গল্পটা কী ভাবে লিখলেন, গল্প লেখা ছেড়ে দিলেন কেন, আপনার লেখার কলমটা কোথায় গেল, সব আপনাকে বলতে হবে। কিচ্ছু বাদ দেওয়া চলবে না।" বলেই পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বের করে সুধন্যদার দিকে এগিয়ে ধরলাম।

সুধন্যদা একটিপ নস্যি নাকের ভেতর গুঁজে দিয়ে মিনিট দুয়েক গুম হয়ে বসে রইলেন। চোখদুটোও বুজে ফেললেন। তারপর চোখ খুলে উচ্চারণ করলেন, "বেশ, বলছি, কিন্তু বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ব্যাপার। তোমাদের যুক্তিবাদী মনে যদি দাগ না কাটতে পারি, আমাকে দোষ দিতে পারবে না।"

"আপনি কি আমাদের অলৌকিক গল্প শোনাতে চাইছেন?" আমি শুধোলাম।

"গল্পটা অলৌকিক হলেও লৌকিক। সত্যি ভূতের গল্প।"

"আপনি তো কখনও ভূতের গল্প লেখেননি।"

"তা ঠিক। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমি লেখার শক্তি পেয়েছিলাম একজন শ্রদ্ধেয় ভূতের কাছ থেকে। তিনিই তাঁর কলমের মাধ্যমে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন।"

এ-সময়ে আমার মনে অন্য একটা কথা এল। কিন্তু প্রকাশ করলাম না। সুধন্যদা কী বলেন, সেটাই আগে শোনা যাক।

এরপর উনি যা বললেন, তার সারবস্তু এরকম ঃ

লেখক-জীবন শুরু করার কয়েক দিন আগে সুধন্যদা ওঁর যোগ-স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন টাকীতে। ইছামতীর ধারে একটা পোড়ো বাড়িকে ওঁরা পিকনিক স্পট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে যখন রান্নাবান্না চলছিল, তখন সুধন্যদা একা নদীর পাড় ধরে উত্তরদিকে হাঁটছিলেন। একাই। পাড়ে ভাঙনের ছাপ ছিল। অনেকগুলি বাড়ির খানিকটা করে অংশ নদীর গর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। প্রায় এক-কিলোমিটার যাওয়ার পর এরকম একটা আধভাঙ্গা পোড়ো বাড়িতে এসে উনি উপস্থিত হলেন। সেখানে উনি দেখলেন কিছু

কাগজপত্র আর টুকিটাকি জিনিসপত্র কেউ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গিয়েছে। বুঝলেন, কোন চোরের কাজ। কোন গৃহস্থবাড়ি থেকে হয়তো সে একটা বাক্স-টাক্স চুরি করে এনেছিল। তারপর এখানে এসে তা থেকে দামী জিনিসগুলি নিয়ে বাকিগুলি ফেলে দেয়। এরপর সেই বাক্সটাকে হয়তো সে নদীর জলে ছুঁড়ে দেয়।

পড়ে থাকা জিনিসগুলির ওপর চোখ বুলোতেই সুধন্যদা আবিষ্কার করলেন বহুদিনের অব্যবহার্য পুরোনো মডেলের একটা ফাউন্টেন পেন। উনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে পিকনিক স্পটের দিকে ফিরে চললেন। কলমটার কথা কাউকে বললেন না। এমন কী বউদিকেও না।

পরে কলকাতায় ফিরে উনি গরম জলে কলমটাকে ধুয়ে সাফ করলেন। নিবটা ছিল সোনার। কাজেই সেটা বহুদিন অব্যবহার্য থাকা সত্ত্বেও অকেজো হয়নি। কলমটায় কালি ভর্তি করে প্রথমে উনি এক-টুকরো সাদা কাগজে নিজের নাম লিখলেন। তারপর লিখলেন বউদির নাম। এরপর যে-দেবীর নাম কখনও চিঠিপত্রেও লেখেননি, সেই দেবীর নাম লিখলেন। ইনি হচ্ছেন দেবী সরস্বতী। কলম দিয়ে মুক্তোর মতন অক্ষর বেরোতে লাগল। অক্ষর দেখে সুধন্যদা তাজ্জব বনে গেলেন। এ কি ওঁর হাতের লেখা? না, ওঁর হাতের লেখা তো এ-রকম সুন্দর নয়। তা হলে? অথচ ওঁর হাত দিয়েই এ-সব অক্ষর বেরিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যের সময় সুধন্যদা ওঁর শ্বশুরমশাইকে একটা চিঠি লিখতে বসলেন। আগে বাঁধা গদে লিখতেন। 'শ্রীচরণেষু পরম পূজনীয় বাবা' বলে শুরু করে 'আপনার স্নেহধন্য সুধন্য' বলে শেষ করতেন। মাঝখানে থাকত 'আমরা একরকম আছি', 'আপনারা কেমন আছেন' ইত্যাদি গোটা আষ্টেক বাক্য অথবা বাক্যাংশ। অথচ আজ চিঠি লিখতে বসেই ওঁর কলম দিয়ে গদের বাইরের কথা বেরোতে লাগল। ওঁর কলম ছুটতে লাগল লাইন দেওয়া কালো রঙের পিঁপড়ের গতিতে। আজকের আরম্ভে ছিল 'সবিনয় নিবেদন'। প্রায় হাফ দিস্তা কাগজ শেষ করে উনি লিখলেন 'শুভেচ্ছাপ্রার্থী সুধন্য'।

বউদির চাপে পড়েই সুধন্যদা শ্বশুরমশাইকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। সেই চিঠি নিজে পড়ে বউদি নিজের হাতে ডাকবাক্সে ফেলতেন। এদিন চিঠি পড়তে গিয়ে উনি বারবার হোঁচট খেতে লাগলেন। মাঝে মাঝেই উনি বিভিন্ন শব্দের মানে জানতে লাগলেন। সে-সব শব্দের সবগুলির মানে সুধন্যদাও জানেন না। অনুমানে বলে দিতে লাগলেন।

বাড়িতে দেবসাহিত্য কুটীরের একটা বাংলা অভিধান পোকার খোরাক হিসেবে পড়ে ছিল। সেটা খুলে উনি চিঠিতে ব্যবহার করা কিছু তৎসম শব্দের

বানান মিলিয়ে নিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, সবগুলি বানানই শুদ্ধ লিখে ফেলেছেন! অথচ স্কুলের বানান পরীক্ষায় কখনও শতকরা কুড়িটা বানানও ঠিক লিখতে পারতেন না। ভুল শব্দের বানান লিখতেন 'ভূল', কৌতূহলকে লিখতেন 'কৌতুহল'। ভৌগোলিক শব্দের বানান 'ভৌগলিক' লেখার জন্য ভূগোল-স্যারের কাছে টেনে উঠেও চড় খেয়েছেন। সেই সুধন্যদা চিঠিতে ব্যবহার করা কঠিন বানানগুলি ঠিক ঠিক লিখে গিয়েছেন। এমন কী চিঠির শিরোনামায় 'শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়' পর্যন্ত ঠিক লিখেছেন। এর আগে 'দুর্গা'র বানান লিখতেন 'দূর্গা'। আজ খটকা লাগতে ডিকসনারি দেখে নিলেন। 'দুর্গা' বানানটাই ঠিক। 'দ্'-এর নীচে 'ঊ'-কার হবে না।

বউদি চিঠি পড়ে বললেন, "বাহ্! তুমি তো ইচ্ছে করলেই গল্প লিখতে পারো।"

গল্প লেখা! কথা তো মন্দ নয়। একবার চেষ্টা করে-দেখতে ক্ষতি কী, যে-লোক দশ লাইন চিঠি লিখতে গিয়ে একঘণ্টা সময় নিত আর পনেরো-বিশটা শব্দের বানান ভুল লিখত, সে যদি এই সময়ের মধ্যে পাঁচ-ছ পাতা ঝরঝরে ভাষায় চিঠি লিখতে পারে, সে-লোক চেষ্টা করলে হয়তো গল্পও লিখতে পারবে।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর সুধন্যদা কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। কী লিখবেন? চরিত্র, বিষয় আর ভাবের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান হবে ওঁর গল্পে? গল্পের বিষয়বস্তু কী হবে? তার নামকরণই বা কী হবে? অমনিই ওঁর কলম দিয়ে প্রথম পাতার মাথার ওপর লেখা হয়ে গেল 'পুরস্কার'। তারপর গড়গড় করে তিনঘণ্টার মধ্যে দশ পাতা লিখে ফেললেন। এরপরে কাউকে না জানিয়েই সেটা ডাকে একটা নামকরা পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পরের মাসে গল্পটা ছাপা হল। সম্পাদক আরও লেখা চাইলেন।

এরপর সুধন্যদাকে পায় কে? উনি নিয়ম করে রোজ একটা করে গল্প লিখে ডাকে এক-একটা পত্রপত্রিকার অফিসে পাঠাতে লাগলেন। সবগুলি লেখাই ছাপা হল। পাঠক-মহলে হৈ হৈ পড়ে গেল। শুরু হল ওঁর জয়যাত্রা। নামী-দামি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা ওঁর কাছ থেকে লেখা চাইতে লাগলেন। গল্পের সঙ্গে উপন্যাসও লিখতে লাগলেন উনি। এত ভাল উপন্যাস এ-যুগের কেউ লিখতে পারেননি। তবে বিগত যুগের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক রাসবিহারী মজুমদারও সাড়া জাগানো উপন্যাস লিখে অনেক নাম, পুরস্কার আর টাকা পেয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলী আজও বেস্ট-সেলার। বইমেলায় আজও ক্রেতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়। তাঁকে ভাঙ্গিয়ে প্রকাশক আজও পুষ্ট হয়ে রয়েছেন। সেই রাসবিহারী

মজুমদারের উত্তরসূরী বলা হয় আধুনিক যুগের সুধন্য চৌধুরীকে।

এগারো বছর ধরে একটানা লিখে চললেন উনি। যোগ-ব্যায়ামের স্কুল তুলে দিলেন। এখন ওঁর বাড়িতে ব্যায়াম চর্চার পরিবর্তে সাহিত্য-চর্চা চলে। এই এগারো বছরে মোট তেইশটা উপন্যাস এক-শো ছত্রিশখানা গল্প লিখে উনি, এ-যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে শাহেনশাহ্ হয়ে গেলেন। চারদিকে ওঁর জয়জয়কার। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় আর ইংরেজিতে ওঁর বই অনুবাদ করে প্রকাশকেরা প্রকাশ করতে লাগলেন। লেখা শুরু করার দু-বছরের মধ্যেই পেলেন রবীন্দ্র পুরস্কার। চার বছরের মাথায় পেলেন একাডেমী পুরস্কার। আর দশ বছরের শেষে পেলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। ওঁর 'দেশদ্রোহী' উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে সিনেমা করলেন বিশ্বদীপ গাঙ্গুলী। সেটা করেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হলেন। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে সেটি প্রথম পুরস্কার পেল। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেলেন বিশ্বদীপবাবু।

এরপর সুধন্যদার উপন্যাস নিয়ে বাংলায় একের পর এক সিনেমা হতে লাগল। হিন্দিতেও হল। সব বইতেই মারমার কাটকাট। সব-কটা সিনেমাই হিট। ওঁর গল্প নিয়ে টি. ভি. সিরিয়ালও হল। সেখানেও হৈহৈ।

নাম, পুরস্কার, প্রতিষ্ঠা, টাকা সবকিছুই পেয়ে গেলেন সুধন্যদা। ছাত্রজীবনে যিনি বাংলায় ফেল করতে করতে টিকে যেতেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে যিনি প্রথম গল্প লেখেন, তিনি মাত্র এগারো বছরের মধ্যে শাহেনশাহ্ সাহিত্যিক হবেন, এটা আমাদের ভাবনায় আসে না। সুধন্যদাও ভাবেননি।

এরপর সুধন্যদা মন্তব্য করলেন, "আমি যা করেছি, যা পেয়েছি, সবই কলম-শক্তির জোরে।"

আমি শুধোলাম, "সেই কলমটা কার ছিল?"

"তার উত্তরও পেয়েছি। দাও, আর-একটিপ নস্যি দাও। তারপর বলছি।" এই বলে আমার কৌটো থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে নাকের ভেতর গুঁজে দিয়ে রুমাল দিয়ে নাক মুছে ফের শুরু করলেন। বললেন, "একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে ভাবছি, লেখার কলমটা কার হতে পারে? এমন সময় মাথায় আইডিয়া এসে গেল। লিখতে লাগলাম। কলম দিয়ে যা বেরোল, তা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম!

"প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাসবিহারী মজুমদারের আদি বাড়ি ছিল টাকীতে। পরে কলকাতাতেও বাড়ি করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর কলকাতার বাড়ি সমেত রয়্যালটির যাবতীয় টাকা দান করেন কোন একটা সেবা-প্রতিষ্ঠানকে। তিনি বিয়ে

করেননি। সংসারে আপনজন বলতে ছিল কেবল একজন ভৃত্য। তার নাম ছিল রামধন। শেষ-জীবনে রামধনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে যান তাঁর গ্রামের বাড়িতে। সেখানে তাঁর কিছু বিষয়সম্পত্তি ছিল। সে-সব তিনি রামধনকে উইল করে দিয়ে যান।

"রামধনের দেশ ছিল বিহারে। সেখানে তার বউ ছিল, দুটো বাচ্চাও ছিল। রাসবিহারীর অনুমতি নিয়ে সে তার বউ-বাচ্চাদের দেশ থেকে টাকীতে নিয়ে আসে।

"রাসবিহারী শেষ-জীবনে বড়ো একটা লিখতেন না। দু-একটা যা লিখতেন, সেগুলি ছিল স্মৃতিকথা।

"১৯৫৭ সালের ২৬শে জুন তারিখে দিক্‌পাল-সাহিত্যিক রাসবিহারী মজুমদার তাঁর টাকীর বাড়িতে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর উইল অনুসারে কলকাতার বাড়ি আর রয়্যালটির টাকা পেল একটা সেবা-প্রতিষ্ঠান আর টাকীর বিষয়সম্পত্তি পেল রামধন।

"রাসবিহারীর শেষ-জীবনের কয়েকটি লেখার পাণ্ডুলিপি আর কলমটা রামধন যত্ন করে একটা টিনের বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। পরে কলকাতার একটা নামী পত্রিকার সম্পাদক সেই পাণ্ডুলিপিগুলি নিয়ে এসে প্রতি বছর পূজো সংখ্যায় একটা করে ছাপতে থাকেন। রাসবিহারীর কলমটা কিন্তু রামধন কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে টিনের বাক্সটার মধ্যে রেখেই দিয়েছিল।

"রাসবিহারীর মৃত্যুর ২০ বছর পরে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি টাকীতে পিকনিক করতে গিয়ে রাসবিহারীর কলমটা পাই।

"রাসবিহারীর আত্মা নিহিত ছিল সেই কলমটার মধ্যে। তার মানে কলমটা ছিল তাঁর ভূত। সেই কলম হাতে নিলেই আমি লেখার শক্তি পেতাম। আসলে রাসবিহারীই লিখতেন, আমি ছিলাম নিমিত্ত মাত্র।"

"তাই আমার লেখার মধ্যে থাকত রাসবিহারীর ছাপ। লোকে আমাকে তাঁর উত্তরসূরী বলে। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? দাও, একটিপ নস্যি দাও।" আমার কাছ থেকে নস্যি নিয়ে উনি নাকের ভেতর গুঁজে দিলেন।

সাহিত্যিক ব্রজগোপাল বক্সী এই আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে শুধোলেন, "সেই কলম-ভূতটা গেল কোথায়?"

এমন সময় বউদি মুড়ি-তেলেভাজা আর চা নিয়ে এলেন। সুধন্যদা ওঁকে দেখিয়ে বললেন, "তোমাদের এই বউদিদিকে জিগ্যেস করো।"

বউদি ঝাঁঝালো গলায় শুধোলেন, "আমি আবার কী করলাম?"

"আমার লেখার কলমটা নষ্ট করে ফেলোনি?"

"আমি, না তোমার মেম-নাতনি?"

"ওই একই কথা। তুমিও যা মেম-নাতনিও তাই। তোমরা দু-জনের কেউই গল্পের বই পড়তে পারো না। এ-সবের দামও বোঝো না। তুমি ভালবাসো রান্না, আর মেম-নাতনি ভালবাসে খেতে।"

এই মেম-নাতনি হচ্ছে সুধন্যদার বড়ো মেয়ের মেয়ে। আমেরিকায় থাকে। সেবার বড়োদিনের ছুটিতে বাপ-মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল। তার বয়স তখন আট। আমেরিকায় থাকতে মায়ের মুখে সে শুনেছিল দাদু ভাল গল্প লেখেন। দুঃখের বিষয় সে বাংলা জানে না। অর্থাৎ বাংলা অক্ষর চেনে না। তাই দাদুর বই তার পক্ষে পড়া সম্ভব হয় না। এবার সে মনে মনে সংকল্প করেই এসেছিল, যে-কদিন কলকাতায় থাকবে, শুধু দাদুর কাছ থেকে গল্পই শুনে যাবে।

দাদু যখন লিখতে বসেন, তখন তাঁর কোন দিকে জ্ঞান থাকে না। কোন শব্দ, গন্ধ এমন কী ছোটখাটো ধাক্কা ওঁর অনুভূতিতে আসে না। চা খাওয়ার কথা, বাজারে যাওয়ার কথা, দাড়ি কামানোর কথা, সবই উনি ভুলে যান। কাউকে লেখার সময় চোখের সামনে দেখেও দেখতে পান না। ফলে বিরক্ত হন বউদি। বাজার আনতে দেরি হলে রেগে আগুন হয়ে বলে ওঠেন, "তোমার কলমটাকে উনোনে পুড়িয়ে দেব।" সেবার আমেরিকার নাতনির সামনে বহুবার এ-কথা বলে ফেললেন।

বউদি সেকেলে গৃহবধূ। বাড়িতে গ্যাস-ফ্যাস ঢুকতে দেননি। ফ্রিজও না। রান্না হয় কয়লার উনোনে। বাজার হয় ডেইলি সকালে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমেরিকার নাতনি, যার নাম ইভা, দাদুর কাছে বায়না ধরল, "গল্প বলতে হবে, একটা ভূতের গল্প বলো।"

সুধন্যদা ইভার কথাগুলি শুনেও শুনতে পেলেন না। উনি লিখেই চললেন। ওঁর হাতে রয়েছে একটা জটিল সামাজিক উপন্যাস। আর শুনতে পেলেও উনি ভূতের গল্প বলতেন না। প্রথমত উনি তখনও ভূতে বিশ্বাস করতেন না। দ্বিতীয়ত জীবনে কখনও ভূতের গল্প লেখেননি। তৃতীয়ত লেখা থামিয়ে উনি গল্প করা পছন্দ করতেন না। কাজেই উনি লিখেই চললেন।

ইভা ভীষণ রেগে গেল। দিদার মেজাজটা পুরোপুরি পেয়ে গিয়েছে সে। দাদুকে মুখে বলে, ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে দু-হাতে ঠেলা মেরেও যখন সুবিধে করতে পারল না, তখন সে রাগের সঙ্গে বলে উঠল, "তোমার কলমটা আজই আমি উনোনে পুড়িয়ে ফেলব।"

এ-কথাটাও সুধন্যদার কানে গেল না। বেলা দশটার সময় উনি লেখা থামিয়ে ফাইলটা আর কলমটা টেবিলের উপর রেখে বাথরুমে চান করতে ঢুকলেন। চান করতে ওঁর প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে।

এই ফাঁকে ইভা কাজটা সেরে ফেলেছে। বউদি যেই রান্নাঘর থেকে একটু বেরিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছেন, অমনিই সে জ্বলন্ত উনোনের মধ্যে কলমটা ঢুকিয়ে দিয়ে ছাদে উঠে গেল। এই ভাবে কলম-ভূতের সদ্‌গতি হয়ে গেল।

আমি শুধোলাম, "সুধন্যদা, আপনি ব্যাপারটা জানতে পারলেন কখন?"

সুধন্যদা ম্লান মুখে বললেন, "সন্ধ্যের সময় লিখতে বসে। দেখি ফাইলটা আছে, কলমটা নেই।"

"তারপর?"

"অনেক খোঁজা-খুঁজি চেঁচামেচির পর আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তখন ইভা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে মিচকি মিচকি হাসতে লাগল। তারপর সত্যি ঘটনাটা প্রকাশ করল। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। তখন তোমাদের বউদি বললেন, পুরোনো কলমটা গিয়েছে তো কী হয়েছে? আমি তোমাকে একটা দামী নতুন কলম কিনে দেব। পরদিন উনি একটা কলম কিনে আনলেন বটে, কিন্তু সেটা দিয়ে একটি লাইনও লিখতে পারলাম না। মানে, লেখা এলো না। সেই থেকে আমি আর লেখক-নই, শুধু গল্প-বলিয়ে।"

আমি বললাম, "এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কলম-ভূতের কথা তো কখনও শুনিনি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।"

"বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার। আমি তোমাদের বলছি নে, বিশ্বাস করতেই হবে।" এই বলে সুধন্যদা আমার কৌটো থেকে আর-একটিপ নস্যি তুলে নিয়ে নাকে দিলেন।

বউদি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এখন উঠে দাঁড়িয়ে সুধন্যদার দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন, "যত সব ন্যাকামো।" বলেই উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভীতু ভূত

রেভারেন্ড লালবিহারী দে

এক সময়ে এক নাপিত ও তার বৌ বাস করত। তাদের সংসারে সুখ ছিল না। বৌ কেবলই নালিশ শোনাত, পেট ভরে খেতে পাই না।

মশারির তলায় শুয়ে বেচারি নাপিতকে অনেক কথা শুনতে হত। বৌ প্রায়ই বলে, "বৌকে খাওয়াবার মুরোদ যখন নেই তখন আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?

যাদের মুরোদ নেই তাদের বৌ পোষার শখ কেন? যখন বাপের বাড়িতে ছিলাম তখন কত খাবার খেতাম, আর তোমার বাড়িতে তো বলতে গেলে উপোস করে মরছি। বিধবা উপোস করে জানি, আমি তো তুমি বেঁচে থাকতেই বিধবা হয়েছি।"

শুধু কথা শুনিয়েই তো সে শান্ত হয় না। একদিন তো ভয়ানক রেগে গিয়ে ঝাঁটা দিয়েই স্বামীকে পেটাল। লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরে নাপিত তার হাতিয়ার গুলি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ধনী না হয়ে সে বাড়িতে ফিরবে না। বৌ-এর মুখও দেখবে না। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে সন্ধ্যা হলে এক বনের সীমানায় গিয়ে পৌঁছল। একটা গাছতলায় শুয়ে নিজের পোড়া কপালের জন্য দুঃখ করতে করতে অনেক রাত কাটিয়ে দিল।

এখন সেই গাছে বাস করত একটা ভূত। গাছতলায় একটা মানুষকে দেখে তার মনে হল লোকটাকে মেরে ফেলবে। সেই বাসনা নিয়েই ভূত গাছ থেকে নেমে দুই হাত বাড়িয়ে প্রচণ্ড একটা হাঁ করে নাপিতের সামনে লম্বা একটা তালগাছের মতো দাঁড়াল। বলল, "এবার নাপিত আমি তোমাকে শেষ করব। কে তোমাকে রক্ষা করবে?"

ভয়ে নাপিত থরথর করে কাঁপতে লাগল, তার চুল খাড়া হয়ে উঠল, কিন্তু সে বুদ্ধি হারাল না। নাপিত জাতির স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চতুরতার সঙ্গে উত্তর দিল, "ওরে ভূত তুই আমাকে শেষ করবি! একটু সবুর কর্ এখনই তোকে দেখাব আজ এক রাতেই কত ভূতকে ধরে আমি এই থলের মধ্যে ভরেছি। তোকে দেখে আমি আরও খুশী হয়েছি কারণ আরও একটা ভূতকে এখনই থলেয় ভরতে পারব।"

এই কথা বলে নাপিত থলের ভেতর থেকে একখানা ছোট আয়না বের করল। ভূতের মুখের সামনে আয়নাটা তুলে ধরে বলল, "এই দেখ একটা ভূত যাকে আমি থলেয় ভরেছি। বেচারিকে সঙ্গ দিতে এবার তোকেও থলেয় ভরব।"

আয়নায় নিজের মুখটা দেখেই ভূত অত্যন্ত ভয় পেয়ে নাপিতকে বলল, "ও নাপিত মশায়, তুমি যা আদেশ করবে আমি তাই করব। কেবল ঐ থলেয় আমাকে ভরো না। তুমি যা চাও তাই দেব।"

নাপিত বলল, "তোরা ভূতরা সকলেই বিশ্বাসঘাতক, তোদের বিশ্বাস নেই। তুইও কথা দিয়ে কথা রাখবি না।"

ভূত বলল, "ও মশায়, তুমি যা হুকুম করবে আমি তোমাকে তাই এনে দেব।"

নাপিত বলল, "ভাল কথা, এখনই আমাকে এক হাজার সোনার মোহর এনে দে। আর কাল রাতের মধ্যেই আমার বাড়িতে একটা গোলা বানিয়ে ধান দিয়ে সেটা ভর্তি করে দিবি। যা, সোনার মোহরগুলি এখনই নিয়ে আয়। আমার আদেশ

পালন করতে না পারলে তোকে অবশ্যই আমার থলেয় ভরব।"

ভূত খুশী হয়ে চলে গেল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহর ভর্তি একটা থলে নিয়ে ফিরে এল। নাপিতের তো আনন্দের সীমা নেই। ভূতকে বলল, কাল রাতের মধ্যেই যেন গোলাটা তৈরী করে ধান ভর্তি করে দেওয়া হয়।

পরদিন একটু বেলা হতেই একটা ভারী বোঝা নিয়ে নাপিত বাড়ির দরজায় টোকা দিল। যে বৌ একদিন রাগের মাথায় ঝাঁটা মেরেছিল সে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিল। স্বামী থলে থেকে ঝকঝকে সোনার মোহর ঢেলে স্তূপ করে ফেললে। বৌ তো একেবারে হাঁ।

থলের মধ্যে ভর্তি হবার ভয়ে ভূত বেচারি পরদিন রাতেই নাপিতের বাড়িতে একটা বড় গোলা বানিয়ে দিল এবং সারারাত পিঠে করে ধানের বোঝা এনে ভর্তি করে দিল। ভীতু ভূতের খুড়ো ভাইপোকে এ কাজ করতে দেখে ব্যাপার কি জানতে চাইল। ভূত সব কথা খুলে বলল।

খুড়ো ভূত বলল, "আরে বোকা, ভেবেছ নাপিত তোমাকে থলেয় ভরবে! নাপিত মহাধূর্ত। তোমাকে বোকা হাঁদা পেয়ে ঠকিয়েছে।"

ভাইপো ভূত বলল, "নাপিতের শক্তিকে তুমি সন্দেহ করছ? নিজেই দেখবে চল।"

এখন খুড়ো ভূত নাপিতের বাড়ি গিয়ে জানালায় উঁকি দিল। খোলা জানালা দিয়ে দমকা হাওয়া এসে গায়ে লাগায় নাপিত বুঝতে পারল যে জানালায় একটা ভূত এসেছে। তাই তার দিকে আয়নাটা ভাল করে ধরে বলে উঠল, "এবার আয়, তোকেও থলেয় ভরি।"

আয়নায় নিজের মুখ দেখে খুড়ো ভূত কাঠ হয়ে গেল। কথা দিল সেই রাতেই একটা গোলা বানিয়ে ভরে দেবে ধান দিয়ে নয়, চাল দিয়ে।

অতএব মাত্র দুই রাতেই নাপিত মহাধনী লোক হয়ে গেল আর বৌও ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

বিয়ের বাঁশী

আশা দেবী

নির্জন পাহাড়ের একটা হোটেলে বসে আছে সুজন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই একটা কিছু ঘটে গেছে যেন। সমস্ত মুখ তার শুকনো আর পাণ্ডুর হয়ে গেছে। চোখগুলি ঢুকে গেছে কোটরে; চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া।

জিজ্ঞেস করলাম : কী হল আপনার। রাতে কি ঘুমোননি নাকি?

সুজন ঠিক তখনই উত্তর দিতে পারল না। খানিকটা চুপ করে থেকে বলল ঃ ঘুম? হ্যাঁ, ঘুম তো চোখ থেকে অনেকদিন আগেই গেছে—এবার প্রাণটা যেত, হয়তো বা তাই রক্ষা পেল। কেন?—আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।—তবে শুনুন বলেই সুজন একবার খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

বাইরে তখন মরা জ্যোৎস্নায় সমস্ত পাহাড়টা ঝলমল করছে। চারিদিকে থরে থরে পাইনের গাছের সারি।—রাতের নিথর প্রকৃতি—একেবারে নিস্তব্ধ। বাইরে একটা প্রাণের সাড়া পর্যন্ত নেই। দূরে দূরে মিটমিট করছে আলোগুলি। আকাশে কালপুরুষের তরবারি যেন ঝলসে ঝলসে উঠছে। সুজন শুরু করলো। এই যে পাহাড় দেখছেন—এর চারিদিকে ঘন অরণ্য। আমি এখানে এমনি আসিনি। আমার সঙ্গে আরও তিনজন বন্ধু আছে তারা বাইরে লনে বসে। আমরা অনেকদিন আগে খবর শুনি আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক একটা ম্যাপ পেয়েছে—তাতে অনেক গুপ্তধনের খবর আছে। বলেই সুজন চুপ করল—একটু হাসল। তারপর বললে ঃ ভদ্রলোক? ভদ্রলোক আমারই কাকা। তিনি বিয়ে টিয়ে করেননি, এই সব অসম্ভব জিনিস নিয়েই আছেন। একটা রাতে তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ সুজন আমার কাছে একটা জিনিস আছে।—এটা আমি তোমার কাছে দিয়ে গেলাম। কাল আমার দেহে আর প্রাণ থাকবে না। কাজেই আজই তোমাকে এটা দিয়ে যাচ্ছি। তোমার বিশ্বস্ত দু একজন বন্ধুকে নিয়ে আজ সকালেই সূর্য ওঠবার আগে তুমি এখান থেকে চলে যাবে নইলে তুমিও বাঁচবে না।

আমি তাঁর কথামতো আমার তিনজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম; পথে পরের দিনের খবরের কাগজে দেখলাম ঃ বিমান রায় নামে এক ভদ্রলোকের আশ্চর্যভাবে মৃত্যুর সংবাদ।

আমরা ম্যাপটা দেখে দেখে এই পাহাড়ী জায়গায় এসে পড়ি। তারপর একটা

ছোট পাহাড়ের ওপরে একটা নির্জন হোটেল বেছে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি গুপ্তধনের সন্ধানে। বলেই সুর্জন খানিকটা দম নিল। আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম।

পরদিন ওই দূরে যে ভাঙা বৌদ্ধ মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন ওটার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পাহাড়ের মজাই হচ্ছে—পাহাড়কে সামনে থেকে যত কাছে আছে মনে হবে তাতে উঠতে গেলে দেখবে দূরত্ব অনেক বেশী বেড়ে গেছে। সুতরাং আমার তিন বন্ধু আর আমি সকাল বেলাতেই কিছু শুকনো প্যাকেটের খাবার নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম।

রওনা হয়েই বুঝলাম, যা ভেবেছি তা নয়। পাহাড়টাকে যত কাছে মনে হয়েছে ওটা তত কাছে তো নয়ই বরং দারুণ দূরে এবং পথ অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না আমার জেদ ভয়ানক বেশী। যদি কিছু আমি করব ভাবি তবে করেই ছাড়ব। সুতরাং দূরত্ব দেখে ভয় পেলে চলবে না—আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম।

''আর-আর'—সুজনের মুখে চোখে যেন ভয়ের ছায়া পড়ল। সে মাঝে মাঝেই কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

পথটা সাংঘাতিক পেছল আর শেওলা ধরা, জায়গাটা দেখেই বোঝা যায় এ পথে এর আগে আর কেউ হাঁটে নি। আমরা হোঁচট খেয়ে—শীতের ঝোড়ো বাতাসে প্রায় জমে যেতে যেতে এগিয়ে চললাম। একটা কথা শুনুন—এটাই আশ্চর্য আমরা যখন চলতে শুরু করলাম সঙ্গে সঙ্গেই শিলাবৃষ্টি শুরু হলো। আমরা এক ভাঙ্গা নির্জন কুটিরে আশ্রয় নিলাম। এবং ঠিক করলাম আর যাব না ফিরে যাই এবং আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল।

তখন আমরা স্পষ্টই বুঝলাম এর সঙ্গে অন্য কিছুর একটা গভীর সম্পর্ক আছে যেটা কোন অলৌকিক ব্যাপার। সুতরাং এ রহস্য ভেদ করতেই হবে। আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। ঝড় আর শিলাবৃষ্টিও চলল সঙ্গে সঙ্গে। দীর্ঘ তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় পথ চলতে চলতে আমরা সেই বৌদ্ধ মন্দিরে এসে পৌঁছলাম।

মন্দিরের ভেতরটা ভীষণ অন্ধকার। কিছু কিছু প্রাচীন পুঁথি আছে। সাংঘাতিক মূর্তি যেন মৃতের দেবী এবং তার সামনে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। আমরা তারই আলোতে একটি অপূর্ব কারুকার্য খচিত বাক্স দেখতে পেলাম এবং ঘরে নেবার মতো আর কিছু না দেখে ওটাই নিয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা কালোছায়া ঝড়ের বেগে গাছপালা ভেঙ্গে আমাদের পেছনে ছুটে আসতে লাগল। আমরা প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। খানিকটা ছুটে পথের মাঝখানে একটা হঠাৎ মালবাহী ট্রাক পেয়ে তাতে করে হোটেলে ফিরে এলাম।

এসেই ওই বাক্সটা খুললাম। ওর পরতে পরতে বহুমূল্য কাপড়ে ঢাকা একটা বাঁশী।

তখন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। চারদিকে ঘন অন্ধকার। আমি সেই বাঁশী তুলে নাড়াচাড়া করতে করতে মনে হল—একবার বাজিয়ে দেখি না কেন।

বাঁশীটা যেই বাজালাম সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে থেকে একটা তীব্র কান্নার আওয়াজ বেরুল এবং সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-জঙ্গল-লোকালয় পেরিয়ে কে যেন ছুটে

এসে ঘরের ভেতর আছড়ে পড়ে কি যেন খুঁজতে লাগল।

আমি ভয় পেয়ে বাঁশীটা আবার বাক্সে পুরে ফেললাম। কিন্তু যে এলো সে ঘরেই রইলো বাঁশীটির পাহারায় এবং রাতে তেমনি করে পাগলের মতো বাঁশীটি খুঁজে ফিরতে লাগল। আমি বাক্সটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম।

দুদিন এমনি করে কাটল। তিন দিনের দিন আমার ঘরেপ্রলয় শুরু হয়ে গেল। আমার অন্য তিন বন্ধু পালিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। আর যে এলো— সে এক পিশাচ। কী ভয়ানক তার চেহারা! আমার এখনও বুকের মধ্যে কাঁপছে— সে বাক্সটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু আমাকে কায়দা করতে না পেরে অন্ধ রাগে ঘরের সব কিছু ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল।

পরদিন সকালে কোথা থেকে এক লামা এলো হোটেলে! সে বললে ঃ আপনি বাঁশী বাজিয়ে পিশাচ কেন ডাকলেন। এখুনি ও বাক্স ঝরণার জলে ফেলে দিয়ে আসুন নইলে আজই আপনার শেষ রাত।

আমিও আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বন্ধুরা বললে ঃ চল—ওটা ঝরণার জলেই ফেলে দিই নইলে আমাদের তোকে হারাতে হবে।

আমরা বাক্সটা নিয়ে চললাম, আর ঝড়ের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদেহ—ঝড়ের মেঘের মতো কালো এক কঙ্কাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল।

আমি কিছু দূর যেতেই সামনেই যে ঝরণাটা পেলাম তাতেই বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে ওখানেই জ্ঞান হারালাম।

আজ পাঁচদিন পর আপনি আমাকে দেখছেন। পরে শুনেছি ওটা এক পিশাচ-সিদ্ধ তান্ত্রিক লামার সম্পত্তি। ও বাঁশী যার কাছে থাকে তারই সর্বনাশ হবে। আমার কাকা জানতেন না। ওই পিশাচের হাতেই তাঁর প্রাণ গেছে, এবার আমি এটা নিশ্চিতভাবেই বুঝেছি। আমারও প্রাণ যেত। আপনি জানেন না কিরণবাবু ও বাঁশীর মধ্যে যেন যাদু আছে। কিছুতেই ওকে ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু না ছাড়লে আমার প্রাণ যাবে। তাই বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল!

আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম। বললাম, আপনি চলে যাবেন?

সুজন বললে, হ্যাঁ, বন্ধুরা গাড়ী ডাকতে গেছে। গাড়ী এসে পড়ল বলে। আমি এক্ষুনি চলে যাব। পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক জিনিস আছে কিরণবাবু যার হদিস এখনও আমরা জানি না এবং তাদের সব কিছু বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা মেলে না। আচ্ছা, আমি যাই। আমার গাড়ী এসে গেছে। টলতে টলতে সুজন ছায়ার মতো ঘুরে ঘুরে পাহাড়ী পথ দিয়ে নেমে চলল। আমি উঠে পড়লাম। আমার অন্য হোটেল। সেখানে রাত হবার আগেই আমাকে ফিরতে হবে।

বিরজা হোম ও তার বাধা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরব চক্রবর্তীর মুখে এই গল্পটি শোনা। অনেকদিন আগেকার কথা। রোয়ালে-কদরপুর (খুলনা) হাই স্কুলে আমি তখন শিক্ষক। নতুন কলেজ থেকে বার হয়ে সেখানে গিয়েছি।

ভৈরব চক্রবর্তী ঐ গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সকলেই শ্রদ্ধা করত, মানত। এক প্রহর ধরে জপ আহ্নিক করতেন, শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের জল স্পর্শ করতেন না, মাসে একবার বিরজা হোম করতেন, টিকিতে ফুল বাঁধা থাকত দুপুরের পরে। স্বপাক ছাড়া কারও বাড়ি কখনো খেতেন না। শিষ্য করতে নারাজ ছিলেন, বলতেন, শিষ্যদের কাছে পয়সা নিয়ে খাওয়া খাঁটি ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ। আর একটা কথা, ভৈরব চক্রবর্তী ভাল সংস্কৃত জানতেন কিন্তু কোন স্কুলে পণ্ডিতি করেন নি। টোল করাও পছন্দ করতেন না। ওতে নাকি গভর্ণমেন্টের দেয় বৃত্তির দিকে বড় মন চলে যায়। টোল ইন্সপেক্টরদের খোসামোদ করতে হয়। তবে দুটি ছাত্রকে নিজের বাড়িতে রেখে খেতে দিয়ে ব্যাকরণ শেখাতেন।

বর্ষা সেবার নামে নামে করেও নামছিল না, দিনেরাতে গুমোটের দরুণ আমরা কেউ ঘুমুতে পারছিলাম না। হঠাৎ সেদিন একটু মেঘ দেখা দিল পূর্ব-উত্তর কোণে। বেলা তিনটে। স্কুল খুলেছে গ্রীষ্মের ছুটির পর। কিন্তু এত দুর্দান্ত গরমে যে পুনরায় সকালে স্কুল করার জন্য ছেলেরা তদ্‌বির করছে, মাস্টারদেরও উস্কানি তাতে ছিল বারো আনা। হেড্‌মাস্টার অফিস ঘরে বসে আছেন। গোপীবাবু ইতিহাসের মাস্টার, গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন—স্যার মেঘ করেছে।

মুরলী মুখুজ্যে (এই নামেই তিনি ও-অঞ্চলের ছাত্রদলের মধ্যে কুখ্যাত) গম্ভীর স্বরে বললেন—কিসের মেঘ?

—আজ্ঞে, মেঘ যাকে বলে।

—কি হয়েছে তাতে?

—আজ্ঞে, বৃষ্টি হবে। স্কুলের ছুটি দিলে ভাল হত। ছেলেরা অনেকদূর যাবে, ছাতি আনেনি অনেকে।

বৃষ্টি হবে না ও মেঘে।

খাস ইন্দ্রদেবের অফিসের হেড্ কেরাণীও এতটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে একথা

বলতে দ্বিধা করত বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানে মুরলী মুখুজ্যের পাণ্ডিত্যের সীমা-পরিসীমা নেই, আবহাওয়া তত্ত্বটি তার নখদর্পণে। গোপীবাবু দমে গিয়ে বললেন—বৃষ্টি হবে না?

—না।

—কেন স্যার? বেশ মেঘ করে এসেছে তো?

—মেঘের আপনি কি বোঝেন? ওকে বলে তাতমেঘা। ও মেঘে বৃষ্টি হবে না।

আমিও পাশের শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ থেকে জানালা দিয়ে মেঘটা দেখছিলাম এবং আসন্ন সম্ভাবনাতে পুলকিত হয়েও উঠেছিলাম। মুরলী মুখুজ্যের

নির্ঘাত রায় শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললাম—বৃষ্টি হবে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে।

মুরলী মুখুজ্যে বললেন—তাতমেঘা। মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না।

—কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়?

—এখন বৃষ্টি হবে আলট্রোটোস মেঘে। যাকে বলে শিট ক্লাউড।

—ও!

তাছাড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। মন্সুনের আগে হাওয়া ঘুরে যাবে পুবে।

—ও!

আর কোন কথা বলতে আমাদের সাহস হল না। কিন্তু ইন্দ্রদেব সেদিন বড়ই অপদস্ত করলেন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ মুরলী মুখুজ্যেকে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মেঘের চেহারা ঘন কালো হয়ে উঠল, মেঘের চাদর ঢাকা পড়ল আরও ঘন আর একখানা মেঘের চাদরে। তারপর স্কুলের ছুটি হওয়ার সামান্য কিছু আগেই ঝম্ ঝম্ মুষলধারে বর্ষা নামল। পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে খাল বিল নালা ডোবা ভাসিয়ে রামবৃষ্টি হওয়ার পরে বিকেল সাড়ে পাঁচটার পরে আকাশ ধরে গেল। ছেলেরা তখনো স্কুলেই আটকে ছিল। কোথায় আর যাবে। সবাই আটকে পড়েছিলাম।

গোপীবাবু জয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে মুরলী মুখুজ্যেকে গিয়ে বললেন দেখলেন স্যার, তখন বললাম বৃষ্টি আসবে, তখন ছুটি দিলে আর এমন হত না।

মুরলী বললেন অমন হয়ে থাকে। ইতিহাস পড়ান, Higher Mathematic পড়ালে বুঝতেন। জগতে Space and time নিয়ে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এডওয়ার্ড গার্ণেটের প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন এ বছরের Mathematical Gazete-এ বুঝলেন?

সেটা কি?

এ্যালিস্ ইন্ ওয়ান্ডারল্যাণ্ড পড়েছেন তো? অঙ্ক শাস্ত্রে এ্যালিস্থ্রুলুকিং গ্যাসের পরীক্ষা আর কি। পড়ে দেখুন। গোপীবাবু চলে গেলেন। অঙ্ক শাস্ত্রের কথা উঠলেই তিনি স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।

বৃষ্টি থেমেছে, স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি আর গোপীবাবু চলেছি। দুজনেই আমরা মনে মনে খুব খুশী। হেড্মাস্টারকে আজ বড় জব্দ করা গিয়েছে। রোজ রোজ কেবল চালাকি।

এমন সময়ে ভৈরব চক্রবর্তীর বাড়ির দাওয়ায় দেখি ভৈরব চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে। খুব খুশী মনে আমাকে দেখে ডেকে বললেন কেমন ননীবাবু, বৃষ্টি হল তো?

এই যে চক্কত্তিমশায়, নমস্কার। তা হল।

হবে না? আজ তিনদিন থেকে হোম করছি বৃষ্টির জন্য। ওর বাবাকে হতে হবে।

অবিশ্যি বৃষ্টির পিতৃদেব কে তা ভাল জানা ছিল না। বললাম বলেন কি? হোম করার ফল তাহলে ফলেছে বলতে হবে।

গোপীবাবু অর্ধস্ফুট স্বরে বলে বসল লাগে তাক্ না লাগে তুক।

ভৈরব চক্রবর্তী কথাটা শুনতে পেয়ে বললে আসুন দুজনেই আমার বাড়ি মাস্টারবাবুরা। দেখুন দেখাই!

গোপীবাবু ও আমি দুজনেই দাওয়ায় গিয়ে বসলাম, মনটা ভাল। দুঃসহ গরমের পর প্রচুর বৃষ্টি হয়ে দিনটি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আজ পনেরো দিন দারুণ গুমুটে, রাত্রে ঘুমুই নি।

গোপীবাবু কেবল বলছিল, আজ খুব ঘুম হবে কি বলেন?

নিশ্চয়। তার আর ভুল আছে।

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। সেখানে সত্যিই হোমের আগুনে কুন্ড—বালি বিছিয়ে তৈরী, বেলকাঠ ও জগ্‌গি ডুমুরের ডালের বাড়তি সমিধ (যজ্ঞের কাঠ) একপাশে গোছানো। পূর্ণপাত্রে সিধে সাজানো তামার টাটে নারায়ণ শিলা, সিঁদুর। বেলপাতা তামার বড় থালায়। হোম হয়ে গিয়েছে, উপকরণের অবশেষ এদিক-ওদিক ছড়ানো। ভৈরব চক্কতি বললেন— দেখলেন মাস্টারবাবু? হোম করার ফল আছে কিনা দেখলেন?

গোপীবাবু বললেন—আপনি অলৌকিক বিশ্বাস করেন?

—নিশ্চয়ই। নিজের চোখে দেখা। অপদেবতাদের কাণ্ড দেখেছি যে কত! পঞ্চমুণ্ডির আসনে জপ করার সময়।

—বলুন না দু'একটা ঘটনা।

—না, সে সব বলব না। থাকগে! কিন্তু আজ এক বছরও হয়নি একটা অলৌকিক কান্ড দেখেছিলাম আমার এক যজমান বাড়ি। সেইটাই বলি। একটু চা করতে বলি?

এমন সময় আবার কালো মেঘ করে বৃষ্টি শুরু হল। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। ঝড় উঠল খুব ঠাণ্ডা হাওয়ায়। ছড়্ ছড়্ করে পাকা জাম পড়তে লাগল চক্কত্তিমশায়ের বাড়ির সানের গাছটা থেকে। নতুন জলে ব্যাঙ ডাকতে লাগল চারিদিকে।

চা এল। আমরা ছাতি নিয়ে বেরুই নি! এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে যাবার উপায় নেই। বেশ জাঁকিয়ে গল্প শুনবার জন্য ভৈরব চক্রবর্তীর মাটির দাওয়ায় মাদুরের

ওপর বসে গেলাম।

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের চা দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এলেন। তারপর শুরু করলেন গল্প বলতে—

আর বছর ভাদ্র মাসের কথা। এখনো বছর পেরোয়নি। আমার এক যজমান বাড়ি থেকে খবর পেলাম তার একটি মেয়ের বড় অসুখ। আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে বিরজা হোম করতে হবে মেয়েটির জন্য। বিরজা হোমে পূর্ণ আহুতি দিলে শক্ত রুগী ভাল হয়ে যায়। আমি এমন অনেক সারিয়েছি।

আমাকে তারা নৌকা করে নিয়ে গেল গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে। অজ পাড়াগাঁ। ঘর কতক ব্রাহ্মণ ও বেশির ভাগ গোয়ালা ও বুনোদের বাস! যমুনার ধারেই গ্রাম। গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটেই স্নান করতে আসে।

—গ্রামের নাম কি?

—সাতবেড়ে। তারপর শুনুন। গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম বিকালে। খুব বন-জঙ্গল, গ্রামের মধ্যে একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেকেলে ছোট ইঁটের তৈরী। মন্দিরের মাথায় বট অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। প্রকাণ্ড একটা শিবলিঙ্গ বসানো মন্দিরের মধ্যে চামচিকের নাদিতে আকণ্ঠ ডোবা অবস্থায়। পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই।

এই সময়ে আমাদের জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর বড় মেয়ে শৈল চাল ভাজা ও ছোলা ভাজা নিয়ে এলো তেল-নুন মেখে। ভৈরব চক্রবর্তী বিপত্নীক, তাঁর মেয়েটি শ্বশুড়বাড়ি থেকে এসেছে সবে ক'দিন হল, চলে গেলে চক্রবর্তী মশায় নিজেই রান্না করে খান।

আমরা সবাই খাবার খেতে আরম্ভ করে দিলাম। ভৈরব চক্রবর্তীও সেই সঙ্গে। এখনো দিব্যি দাঁতের জোর, ওই বয়সে এমন চাল ছোলা ভাজা যে খেতে পারে, তার দাঁত বহুদিনেও নষ্ট হবে না।

তিনি খেতে খেতেই বলে চললেন—এই শিবমন্দিরটার কথা মনে রাখবেন, এর সঙ্গে আমার গল্পের সম্পর্ক আছে। তারপর আমরা গিয়ে সে বাড়ি উঠে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হবার পর গৃহস্বামী একটি ঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। অসুস্থ মেয়েটি সেই ঘরে শুয়ে আছে। বয়েস তেরো চোদ্দ হবে, নিতান্ত রোগা নয়, বেশ মোটাসোটা ছিল বোঝা যায়—গলায় একরাশ মাদুলি। মেয়েটি চোখ বুজে একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একবার সে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে আবার সে পাশ ফিরলে।

মেয়েটির গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর। তিনের কাছাকাছি হবে। চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি,

চোখের কোণ সামান্য লাল। নাড়ি দেখলাম, বেশ নাড়ি, শক্তই আছে। হঠাৎ কোন ভয়ের কারণ আছে ব'লে মনে হল না। তাছাড়া আমার ওপর মেয়ের চিকিৎসার ভার নেই, আমি এসেছি হোম করতে। গৃহস্বামী বললেন—আপনি আশীর্বাদ করুন, পায়ের ধুলো দিন ওর মাথায়।

পায়ের ধুলো মাথায় দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ গৃহস্বামী আছাড়-খেয়ে পড়ে গেল খাটের পাশে। আমি চমকে উঠলাম। হাত নড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে এল কি হয়েছে দেখতে। কিছু সেখানে নেই, না একটা কলার খোসা না কিছু। লোকটি পড়ল কি করে? পায়ের ধুলো দেবার কথা চাপা পড়ে গেল। গৃহস্বামীর মাথায় ও মুখে ওর বড় শালা ঠাণ্ডা জল দিতে লাগল। মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সে এক হৈ চৈ ব্যাপার।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি তান্ত্রিক হোম করি। কিছু কিছু দৈব ঘটনা বুঝি। লক্ষণ, প্রতিলক্ষণ, চিহ্ন আর ইঙ্গিত এই নিয়ে দৈব। গোড়াতেই এর লক্ষণ খারাপ বলে যেন মনে হচ্ছে। তবে কি হোমে বসব না? সন্ধ্যার কিছু পর শিবমন্দিরের সামনের রাস্তায় পায়চারি করছি। বড্ড গরম। বাড়ির মধ্যে হাওয়া নেই। রাস্তায় তবু একটু হাওয়া বইছে। হঠাৎ আমার কানে গেল, কে যেন বলছে, শুনুন, শুনুন। দু'বার কানে গেল কথাটা। এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পড়ল শিবমন্দিরের ঠিক দোরের গোড়ায় একটি কে মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে।

বললাম—আমায় বলছেন?

—হ্যাঁ। ও খুকির জন্যে বিরজা হোম করবেন না। ও বাঁচবে না।

—কে আপনি?

—আমি যেই হই। যদি ভাল চান, হোম করবেন না।

আমি বিস্মিত হলাম। নির্জন অন্ধকার ভাঙা মন্দির। সেখানে এখন মেয়েমানুষ আসবে কে? নির্জন আশ্চর্য কথাই বা বলি কেন? আমার খানিকটা রাগও হল। আমার ইচ্ছার ওপর বাধা দেয় এমন লোক কে? মানুষ তো দূরের কথা অপদেবতাকেও কখনো গ্রাহ্য করিনি। মায়ের আশীর্বাদে সবই সম্ভব হয়। ভৈরব চক্রবর্তীকে ভয় দেখানো সহজ কথা নয়।

আমার এই অদ্ভুত দর্শনের কথা বাড়ি ফিরে কাউকে বললাম না। রাত্রে বসে হোমের জিনিসপত্র ফর্দও করে দিলাম। তারপর রাত আটটা বাজল গৃহস্বামী আমাকে রান্নাবান্না করতে বললেন। এই বার আমরা গল্পের আসল অংশে আসব। তার আগে ওদের বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

বাড়িটা খুব পুরনো কোঠা বাড়ি, কোন ছিরি সৌষ্ঠব নেই, কিন্তু দোতলা।

পল্লীগ্রামে দোতলা বাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। যমুনা নদীর ধারে ঠিক নয় বাড়িটা সামান্য দূরে, মধ্যে কেবলমাত্র একখানা বাড়ি। ঐ বাড়ির ছাদ আর এ-বাড়ির ছাদের মধ্যে দশ-বারো ফুট চওড়া এক ফালি জমির ব্যবধান।

ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর। সেই ঘরে আমার বিছানা পাতা হয়েছে। পাশে খোলা ছাদে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুগের ডাল আতপ চাল বড়ি আলু আর ঘি। আমি একাই রাঁধছি, রান্নার সময় কেউ থাকে আমি পছন্দ করিনে। রান্নার আগে একবার চা করে খেলাম। পরের তৈরী চা খেয়ে তৃপ্তি পাইনে।

রান্না করতে রাত হয়ে গেল। রাত সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটু জিরিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে ভাত বেড়ে নিলাম হাঁড়ি থেকে আঙট কলার পাতে। তারপর খেতে বসলাম। খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ছাদে আমি একলা নেই। এদিক-ওদিক চাইলাম; কেউ কোথাও নেই। রাত অনেক হয়েছে বাড়ির লোকেও নীচের তলায় খেয়েদেয়ে শুয়েছে, গ্রাম নিশুতি হয়ে গিয়েছে। কেবল যমুনা নদীতে জেলেদের আলোয় মাছ ধরার ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হচ্ছিল।

হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলাম।

আমার সামনে ছাদের ধারে ওটা কি গাছ? কালো মতো লম্বা তালগাছের মতো এতক্ষণ ছাদে বসে রান্না-বাড়া করছি কই অত বড় একটা গাছ নজরে পড়েনি তো এর আগে? ছিল নিশ্চয়ই, নয়তো এখন দেখছি কি করে! কি গাছ ওটা? সত্যি যখন চা খেলাম তখন দুটো বাড়ির মধ্যেকার রাস্তাটা দিয়ে একখানা গরুগাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে আমাকে ওদিকে তাকাতে হয়েছিল। তখন কই অত বড় একটা তালগাছ। উঁহু কই! না দেখিনি।

কিন্তু তালগাছটা এমনভাবে—ও কি রকম তালগাছ। ওকি! ওকি!

আমি ততক্ষণে বিভীষিকা দেখে ভাত ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়িনি। তালগাছ না।

এখনো ভাবলে—এই দেখুন গায়ে কাঁটা দিয়েছে। যদিও আমার নাম ভৈরব চক্কত্তি তান্ত্রিক। পিছনের ছাদের কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিরাটকায় অসুর কিংবা দৈত্যের মতো মূর্তি। তার ততো বড়ো হাত-পা—সেই মাপে। মাথা একটা জালার মতো। চোখ দুটো আগুনের ভাটার মতো রাঙা, আগুন ঠিকরে পড়ছে। আমার দিকেই তাকিয়ে আছে অসুরটা। যেন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

বিরাট মূর্তি। তালগাছের মতই লম্বা। অনেক উঁচুতে তার মাথাটা। নীচু চোখে সেটা আমার দিকে চেয়ে আছে।

ভাল করে চেয়ে দেখলাম। দু'দুবার চোখ রগড়ালাম। দুবার চা খেয়ে কি

এমন হল? না। ওই তো সেই বিরাট, তাল-শাল-নারকেল গাছের মতো তে-ঢ্যাঙা রোগা অপদেবতার মূর্তি বিরাজ করছে জমাট অন্ধকারের মতো। এবার ভাল করে দেখে মনে হল পিছনের ছাদে সেটা দাঁড়িয়ে নয়, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই—দুই বাড়ির মধ্যেকার ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে বলা যায়। কারণ ওই জীবের নাভিদেশ থেকে ওপর পর্যন্ত আমার সামনে। তার নীচেকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টিরেখার নীচে।

এ বর্ণনা করতে যত সময় লাগল, অতটা সময় লাগেনি আমার বার কয়েক দেখতে জীবটাকে। এক থেকে দশ গুণতে যত সময় লাগে, ব্যস। আমি বলতে পারি অন্য যে কেউ ওই বিকট অপদেবতার মূর্তি অন্ধকারে নির্জন ছাদে গভীর রাতে দেখলে আর গোলার ধানের ভাত খেত না পরদিন।

আমি অপদেবতা দেখেছি, পঞ্চমুখীর আসনে বসলে জপের শেষের দিকে প্রায়ই ভয় দেখাত। কিন্তু সে এ ধরনের বিকট ও বিরাট ব্যাপার নয়। ভয় পেয়ে গেলাম। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। চক্ষে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই আর কি? পড়লেই হয়ে যেত। দুর্বল মানুষ মরে ওদের হাতে। মন সবল হলে ওরাই সামলায়।

নিজেকে তক্ষুনি সামলে নিলাম। তারপর মন্ত্র জপতে শুরু করলাম জোরে জোরে। সেই দিকে চেয়ে মন্ত্র জপ করতে ক্রমে মূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মূর্তিটা আমার সামনে সবসুদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল এক থেকে ত্রিশ গুণতে যতটা সময় নেয় ততটা! ওর খুব বেশী হবে না কখনো। সেটা মিলিয়ে যেতে আর একবার চোখ রগড়ালাম। কিছুই নেই। বিশ্বাস করুন সঙ্গে সঙ্গেই নীচের তলা থেকে কান্নাকাটি উঠল। রুগী মেয়েটি মারা গিয়েছে।

—তখুনি?

—তখুনি। এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা দিতে আমি রাজী নই। যা ঘটেছিল তাই নিবেদন করলাম আপনাদের কাছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।

ভূতুড়ে খাদ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক কোলিয়ারী থেকে আর এক কোলিয়ারীতে বদলি হয়ে এসেছি।

কয়লা-কুঠির ডাক্তার। ভারী ঝকমারি কাজ। খাদের কুলি-আমিন থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজার-সাহেব পর্যন্ত যে যেখানে আছে, সকলেরই জীবন মরণ যেন আমারই হাতে। আমি যেন তাদের বিধাতা। কারও পায়ে একটুখানি আঁচড় লেগেছে, ডাক্ ডাক্তারকে। কোথাও কোন কুলি মরেছে, সকলের আগে আমাকেই সেখানে ছুটতে হবে। সে যাই হোক, চাকরি করতে এসে সে দুঃখ করে লাভ নেই।

বাসাটি মন্দ নয়। টালি দেওয়া খানচারেক ঘর। সুমুখে দাওয়া উঁচু ছোট-একটুখানি রক্, রকের নীচেই উঠোন, রান্নার জায়গা।

চারিদিক ফাঁকা। ভাবলাম, ভালই হল। আগে যে কোলিয়ারীতে ছিলাম, প্রকাণ্ড কোলিয়ারী, ছোটখাট একটা শহর বললেই হয়; চারিদিকে ধোঁয়া আর বস্তি, দম যেন আটকে আসত। এখানে তা হলেও একটুখানি নিশ্বাস নিয়ে বাঁচব।

ম্যানেজারবাবু বাঙালী। বড় অমায়িক ভদ্রলোক। প্রথম এসেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা জমিয়ে রাখা ভাল। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সেদিন তার বাংলোর দিকেই যাচ্ছিলাম। কালো রঙের ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে এক ভদ্রলোক আমায় দেখে নমস্কার করে পথের মাঝে থমকে দাঁড়ালেন। গোঁফগুলি নীচের দিকে বেঁকে গেছে। মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন,'আপনিই নতুন ডাক্তার না? আমি হেড ক্লার্ক।'

কী আর বলব, ঘাড় নেড়ে একটুখানি হেসে নমস্কার করে এগিয়ে যাচ্ছি, তিনি আমার পিছু নিলেন। বললেন, চলুন তবে ওইদিক দিয়েই যাই, আপনার সঙ্গে গল্প করাও হবে।

বলেই তিনি পরিচয় দিতে শুরু করলেন। এখানে চাকরি করলেন প্রায় দশ বছর, অথচ একটি দিনের জন্যও তিনি কামাই করেন নি। বাড়ি তাঁর বেশি দূরে নয়। এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই একটা গ্রামে। সন্ধ্যার আগেই রোজ তাঁকে বাড়ি পৌঁছতে হয়।

কোন কথাই তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, তবুও তিনি আমায় সাবধান করে দিলেন। বললেন, 'দেখুন, এখানকার নিয়মই হচ্ছে তাই। আপনিও যেন সন্ধ্যের পর আর বাসা থেকে বেরোবেন না। নতুন মানুষ, জানেন না তো, তাই সাবধান

করে দিলাম।

বললাম, 'কেন?'

বলতেই তাঁর সেই কালো গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে পানে রাঙা লাল লাল কয়েকটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম তিনি একটুখানি-হাসলেন।

বললেন, 'জিজ্ঞেস করবার কিছু নেই, বড় ভীষণ জায়গা মশাই। আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

বললাম, 'না'।

'এই মরেছে! চারিদিকে ভূত মশাই, কোলিয়ারীটা ভূতে ভূতে একেবারে ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যে হলে এ তল্লাটে আর জন-মনিষ্যি দেখতে পাবেন না। খাদের নীচে দিনের বেলাতেই লোকজন নামতে ভয় করে; রাত্রের কাজ তো একরকম উঠেই গেছে। অন্ধকার রাত্রে কতদিন দেখবেন কী ভীষণ ব্যাপার। ঘরে বসেই হয়তো শুনতে পাবেন ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, খাদ চলছে, ঘণ্টা বাজছে, ট্রাম লাইনের উপর ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ করে কয়লার গাড়ি ঠেলার শব্দ পাচ্ছেন; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখুন—সব চুপ। কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যেয় হয়তো দেখলেন, ডিপোয় কয়লার একটা গুঁড়ো পর্যন্ত নেই। সকালে গিয়ে দেখুন চার-পাঁচ ওয়াগন কয়লা গাদা হয়ে গেছে।

বললাম, 'তাহলে তো ভালই বলতে হবে। ভূতগুলি খুব উপকারী বলুন।'

ভদ্রলোক আবার তেমনি দাঁত বের করে একবার হাসলেন। বললেন, 'তা বললে হবে কি' খুন জখম যে লেগেই আছে। এমন মাস গেল না যে খাদের নীচে দু'চারটে খুন হচ্ছে। আগে মশাই যা কিছু হত-ওই খাদের নীচেই হত, গত দু-বছর ধরে ভূতগুলি দেখছি উপরেও উঠে এসেছে। এই ধরুন, আমার আপিসের খাতা পত্র। আজ ঠিক যেমনটি রেখে তালা বন্ধ করে দিয়ে এলাম, কাল এসে দেখব-সব ওলট-পালট হয়ে গেছে, এখানকার জিনিস ওখানে, ওখানকার জিনিস এখানে! একেবারে তছনছ কাণ্ডকারখানা। তবে, নষ্ট কিছু করে না এই যা। আজকাল আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে।

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, তাই বুঝি বেলা থাকতে থাকতে আপনাকে বাড়ি পৌঁছতে হয়?

ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোক জানালেন, 'নিশ্চয়, একদিন যে কাণ্ড ঘটেছিল মশাই শুনলে আপনার গা-হাত-পা শিউরে উঠবে। থাক, আজ আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর একদিন বলব। এখন চলি। নমস্কার। বলেই তিনি তাঁর হাত দুটি তুলে আমায় আর একটি নমস্কার করে ডানদিকে রাস্তা ভাঙলেন।

ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে সেদিন আমার অনেক কথাই হল। বললাম ''ভূতের কথা কি সব শুনছি, আপানার কোলিয়ারীতে—এ কি সত্য?

ম্যানেজারবাবু হাসলেন। 'শুনেছেন এরই মধ্যে?'

বললাম, শুনেছি, কিন্তু ভূত আবার কী? আমার তো বিশ্বাস হয় না কোনদিন।

ঘাড় নেড়ে ম্যানেজারবাবু বললেন, কিছু নয়। তবে খাদের অবস্থা বড় খারাপ, চালগুলি অত্যন্ত নরম। খুব সাবধানে কাজ করতে হয় নইলে কয়লা কাটতে গিয়ে চাল থেকে পাথর খসে পড়ে, লোকজন প্রায়ই মারা যায়।

কিছুদিন আগে..........না, কিছুদিন আগে কেন, অনেকদিন আগে আমি তখন এখানে ছিলাম না। সিপারন নদীতে সে বছর ভয়ানক বান হয়। বানের জল এত বেশী বেড়ে ওঠে যে হঠাৎ একদিন দেখতে না দেখতে বান এসে পড়ে খাদের মুখে। 'চানকের' পথে হুড়হুড় করে জল ঢুকতে থাকে। তাকে আর রুখবে কে। দিনের বেলা। খাদের নীচে তখন কাজ চলছে। লোকগুলিকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু দু-দিন ধরে ক্রমাগত জল ঢুকছে, তিন দিনের দিন বান যখন কমল, খাদ তখন ভর্তি হয়ে গেছে। পাম্প দিয়ে জল তুলে তুলে অনেক কষ্টে নীচে নেমে গিয়ে দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশ জন লোক খাদের যেখানে সেখানে মরে পড়ে আছে। ব্যস সেই থেকে লোকের ধারণা হল যে, অতগুলি লোক একসঙ্গে

যেখানে মারা যেতে পারে, ভূত সেখানে আছেই। এই বলে তিনি খুব জোরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমিও হাসলাম বটে কিন্তু কেবলই আমার মনে হতে লাগল, আহা অতগুলি মানুষ কোনদিক থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে নিতান্ত অসহায়ের মতো হাহাকার করে জলে ডুবে মারা গেল, কারও হয়তো বুড়ো বাপ-মা আছে খাদের উপরে কুলি ধাওড়ায়, কারও ছেলে, কারও মেয়ে, কারও স্ত্রী, কারও স্বামী পুত্র—আহা! চুপ করে ভাবতে গিয়ে মুখের হাসি আমার মুখেই মিলিয়ে গেল—সে করুণ দৃশ্য যেন আমি আমার চোখের সুমুখে দেখতে পেলাম।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যে হল। ম্যানেজারবাবুর চাকর আমাদের কাছে লণ্ঠন দিয়ে গেল। উঠতে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'একটু চা খেয়ে যান।'

চা খেয়ে তাঁর কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম, রাত্রি তখন আটটা।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'আলো নিয়ে চাকরটা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

ভাবলাম, তিনি ভেবেছেন হয়তো ভূতের ভয়ে রাস্তায় যদি আমার কিছু বিপদ আপদ হয়। হেসে বললাম, না, কিছু দরকার নেই, ভূতের ভয় আমি করি না।"

তিনিও হেসে আমায় নমস্কার করে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন।

ফটক পেরিয়ে বাইরে যখন পথে এসে দাঁড়ালাম, দেখি অন্ধকারে তখন চারিদিক থম্‌থম্ করছে, কোথাও জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই। মাথার উপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশটা যেন তারায় ঠাসা। তারই একটুখানি ঝাপসা আলোয় পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম।

বাসাটা আমার নেহাত কাছে নয়। পথের পাশে দু-তিনটে কুলিধাওড়া পেরিয়ে গিয়ে আম-কাঁঠালের একটি বাগান, তার পরেও খানিকটা কালো কয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরী ছোট একটি পথ, তারই কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতি একটা পোড়ো বাড়ির মতো ভাঙ্গা বাড়ি; সেইখান থেকে ডানদিকে একটা নিম গাছের তলা দিয়ে মিনিট দুই হাঁটলেই আমার বাসার দরজায় গিয়ে পৌঁছব।

কি যেন ভাবতে ভাবতে আমি সেই বাগানের ভিতর সরু একফালি পায়ে-চলা পথের উপর দিয়ে চলেছি। মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে আমার পিছনের কুলি-ধাওড়ায় সেই যে একটা কুকুর চেঁচাতে আরম্ভ করেছে, তার চিৎকার তখনও থামেনি। হঠাৎ দেখি কয়েকটা গাছের তলা দিয়ে শুকনো পাতার উপর খড়মড় শব্দ করতে করতে মস্ত লম্বা কালো রঙের একটা লোক আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল। আচমকা অন্ধকারে সত্যিই আমি একটুখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, তার আগেই লোকটা আমার আরও একটুখানি কাছে সরে এসে বললে, 'ডাক্তারবাবু, তুই একবার আয় আমার সঙ্গে।'

লোকটা বোধহয় সাঁওতাল। বললাম, 'কেন'?

সে বললে, 'ছেলেটাকে আমার বাঁচাতে হবে ডাক্তার! তুই যদি না যাবি তো ছেলেটা মরে যাবেক্—তুই আয়।'

'কী হয়েছে তোর ছেলের?'

বললে, 'তা তো জানিনা বাবু, তুই দেখবি চল, আবার তুকে আমি ঘরের কাছে দাঁড়াই দিয়ে যাব।' গলার আওয়াজ শুনে মনে হল লোকটা হয়তো এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। আমি আর না বলতে পারলাম না। বললাম চল্।

বাগান পেরিয়ে আমরা আর একটা রাস্তা ধরলাম। সে আমার আগে-আগে চলতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম তোর নাম কী?

বললে, 'আমার নাম টুইলা মাঝি।'

বললাম, 'কতদূর যেতে হবে?'

হাত বাড়িয়ে কাছেই একটা খোড়ো ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ওইখানে। চুপ করে পথ আর কত চলি, তার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলাম। 'খাদে বুঝি তুই কয়লা কাটিস?'

'হুঁ বাবু।'

'কটি ছেলে তোর?'

'ওই একটি।'

'ছেলেটি কত বড়?'

'তা অনেক বড় বটে।'

'তবু ক-বছরের?'

'কে জানে তা? অতসব জানি না।'

এমনি সব নানান কথা কইতে কইতে পথ আমরা চলেছি তো চলেইছি। সামনে হাত বাড়িয়ে যে ঘরগুলি সে আমায় দেখিয়েছিল, যতই এগিয়ে যাই, মনে হয় সেগুলি আরও দূরে। বললাম, একি রে টুইলা, কাছে বলছিলি যে। টুইলা বললে, 'হুঁ বাবু কাছে লয় তো কী?' কিন্তু পথ যেন আর ফুরোয় না। ছেলেটার তোর কী হয়েছিল প্রথমে?

টুইলা চুপ করে রইল।

প্রথমে হয়েছিল কী? হ্যাঁরে?

টুইলা যেন বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে। বললে, 'খাদে বান ঢুকে ছিল।'

'বান'! হঠাৎ আমার ম্যানেজারবাবুর সেই বানের কথাটা মনে পড়ল!

বললাম, কখন রে? সে তো অনেকদিন—

টুইলা বললে, 'হুঁ অনেক দিন।'

বললাম, তারপর?

তারপর—আমরা তখন অনেক লোক ছিলাম খাদের ভিতরে—কয়লা কাটছিলাম।

বললাম, সেখান থেকে কেউ তো বাঁচেনি শুনলাম তুই বাঁচলি কেমন করে?

টুইলা আর জবাব দেয় না।

এবার আবার কেমন যেন মনে হল। বললাম হ্যাঁরে টুইলা শুনছি নাকি এখানে খুব ভূতের ভয়! সত্য নাকি?

হঠাৎ দেখি টুইলা নেই। অন্ধকারে, ভাবলাম, কালো মানুষ, হয়তো খানিকটা এগিয়ে গেছে তাই দেখতে পাচ্ছি না। ডাকলাম 'টুইলা!'

কোথায় টুইলা!

এদিক ওদিক আগে-পাছে তাকিয়ে দেখি, টুইলা কোথাও নেই। চারিদিকে দিকচিহ্নহীন অন্ধকার। আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। মাথার ভিতরটা চন্ চন্ করে উঠল। সমস্ত শরীরের রক্ত তখন আমার জল হয়ে গেছে।

পিছন ফিরে ছুটবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ছুটে আমি যাব কোথায়? চিৎকার করলেই বা কে শুনবে!......ভাবলাম, মৃত্যু অনিবার্য। চলতে গিয়ে দেখি, পা দুটো আড়ষ্ট, গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে কতক্ষণ যে চলেছি কিছুই আমার মনে নেই। রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে চারিদিক যখন ফর্সা হচ্ছে, দেখি তখনও আমি পথ চলছি। শরীরে তখন আমার শক্তি নেই, গায়ে জোর নেই, নিতান্ত কেমন যেন মরিনি বলেই বেঁচে আছি—এমনই আমার মনে হতে লাগল। দূরে কতকগুলি লোক আসছে দেখে সেইখানে সেই পথের ধারেই আমি বসে পড়লাম। কিন্তু কাউকে যে আর বিশ্বাস হয় না! এরাও ভূত নয় তো?

প্রভাতের আলোয় দেখলাম, কয়েকজন কুলি তাদের ঝোড়া গাঁইতি কাঁধে নিয়ে কুঠিতে বোধহয় কাজ করতে চলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে, ডোম্‌রনা কোন্ দিকে?'

একজন বললে, 'সে হেথা কোথা বাবু? ওই যে চিমনি দেখছিস হেইখানে!'

সর্বনাশ! উঠে দাঁড়ালাম। প্রায় তিন মাইল হেঁটে একেবারে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আধ-মরা হয়ে বাসায় যখন ফিরলাম, দেখি বাড়িতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে। মেয়ে, ছেলে এমনকি চাকরটা পর্যন্ত সারারাত ঘুমোয়নি। অপরিচিত জায়গা, কাকেই বা কি বলবে. ভগবানের উপর নির্ভর করে সবাই তখন হাঁ করে পথের

পানে চেয়ে আছে।

পাছে ওরা ভয় পায় ভেবে কাউকেই কিছু বলিনি। বললাম মরণাপন্ন একটি রুগীর কাছে সারারাত আমায় জাগতে হয়েছে।......বলেই সেখান থেকে আমায় বদলি করবার জন্যে কোম্পানির হেড অফিসে দরখাস্ত করে জবাবের আশায় বসে আছি, এমন দিনে আবার আর এক দুর্ঘটনা।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। ম্যানেজারের কাছ থেকে ডাক এল খাদের নীচে লোক মরেছে, আমায় যেতে হবে।

বলে পাঠালাম, যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ম্যানেজারবাবুকে দয়া করে এখানে একবার আসতে বল, আলো হাতে দু-জন চাপরাশি সঙ্গে নিয়ে নিজেই এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ভূতের ভয় বুঝি? সেদিনের সেই টুইলার কথাটা আমি তাকে বলিনি। লজ্জায় বলতে পারিনি।

বললাম, না, তা নয়। খাদের নীচে রাত্রে তো এখানে কাজ কেউ করে না তবে মরল কেমন করে?

ম্যানেজার বললেন কিছু কয়লার দরকার ছিল তাই ডবল হাজিরা দিয়ে মদ খাইয়ে নামিয়েছিলাম, পুলিশে খবর পাঠিয়েছি, তার আগে চলুন একবার দেখে আসতে হবে।

অনেকগুলি লোকজন সঙ্গে নিয়েও ভয়ে ভয়ে খাদে গিয়ে নামলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড! কয়লা কাটা হচ্ছিল—সাত নম্বর কাঁথির মুখে। সেইখানে কয়লার চাবড়া মাথায় পড়ে লোকটা মরেছে। মরবার পর তার মৃতদেহ সেইখানেই ফেলে রেখে লোকজন উপরে উঠে এসেছিল। ফিরে এসে দেখা গেল মৃতদেহ সেখানে নেই। মাল-কাটার সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে, প্রচুর আলো এবং লোকজনের সঙ্গে আমরা মৃতদেহের সন্ধান করতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল তার সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা গোফার মাঝখানে—সেখানে যাবার কোন সম্ভাবনাই তার নেই। মৃতদেহটাকে সেখান থেকে টেনে এনে আবার সেই সাত নম্বর কাঁথির কাছেই রেখে দিয়ে আমরা তো উপরে উঠে এলাম। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমাদের তো উপরে তোলবার উপায় নেই অথচ প্রচুর পুরস্কারের লোভেও কেউ সেখানে মড়া আগলে থাকতে রাজি হল না।

ম্যানেজারবাবু নিজে আমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন, বললেন পুলিশ এলে আমাদের খাদে নামতে হবে।

রাত্রি তখন কত ঠিক মনে নেই। পুলিশ এসেছে। আবার আমরা খাদের নীচে নেমে গেলাম। এবার আমাদের সঙ্গে আর বেশি লোক গেল না। যেতে চাইল না।

ম্যানেজারবাবু হেসে বললেন, পুলিশ যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে, আর ভাবনা কী? ভূতের তো পুলিশের ভয় আছে!

ম্লান হাসি হেসে নেমে তো গেলাম। যা থাকে কপালে। একে রাত্রির অন্ধকার, তায় আবার কালো সেই পাতালপুরী। চারিদিক কালো। তবে আমাদের সঙ্গে আলোও ছিল প্রচুর, প্রত্যেকের হাতেই একটি করে সেফটি ল্যাম্প। পুলিশের ইন্সপেক্টরের হাতে টর্চ।

আগে আগে যাচ্ছে মালকাটার সর্দার। কিন্তু গিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড।

মৃতদেহ সেখানে নেই। খালি খানিকটা রক্তের দাগ কালো কয়লার উপর জমাট বেঁধে রয়েছে দেখলাম। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। কারও মুখে কোন কথা নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। খাদের চাল থেকে কোথাও খুট্-খুট্ করে ছোট কয়লার টুকরো খসে পড়ছে, কোথাও বা টুপ্ টুপ্ করে জল পড়ার শব্দ পাচ্ছি। কী করা যায়।

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'আসুন এদিক-ওদিক্ খোঁজ করে দেখি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

বিশ্বাস তাঁর না হবারই কথা। কিন্তু আমরা আর না বিশ্বাস করে যাই কোথায়। এর আগের বারেও তো এমনি হয়েছিল।

খোঁজাখুজি আরম্ভ করলাম। ইন্সপেক্টরবাবু বেশ সাহসী লোক। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে তিনিই সবার আগে চললেন। সবার পেছনে যেতে আমার ভয় করছিল। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে কৌশল করে কাউকে জানতে না দিয়ে ফস্ করে আমি এক সময় মাঝে গিয়ে ঢুকলাম।

খোঁজার আর অন্ত রইল না। কিন্তু লাশ আর পাওয়া যায় না।

খুব ছোট একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলছি, হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার। ভয়ানক একটা কিছু অপঘাত ঘটলে মরবার আগে মানুষ যেমন করে চেঁচিয়ে ওঠে,—এও যেন ঠিক তেমনি একটা গোঙানির শব্দ। একেবারে ইন্সপেক্টরবাবুর পায়ের কাছে। আমরা তো সব চমকে উঠে শিউরে খানিকটা পিছু হঠতে গিয়ে এ-ওর গায়ে লাগালাম ধাক্কা! ভয়ে তো আমি ম্যানেজারবাবুকে তখন জড়িয়ে ধরেছি। সর্বাঙ্গ শিরশির করে পায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে! গেলাম আর কি! বাঁচবার আর কোন আশা নেই।

ইন্সপেক্টরবাবু তো অত সাহসী লোক। টর্চের আলো ফেলে যেমনি নীচের দিকে তাকিয়েছেন —দেখেন, মৃতদেহের বুকের উপর পা দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে।

'বাপ!' বলে তিনি লাফিয়ে একেবারে উল্টে এসে পড়লেন আমার ঘাড়ে। আমি পড়লাম ম্যানেজারের গায়ে, ম্যানেজার দিলেন একটা কনস্টেবলের পা

মাড়িয়ে। এমনি করে সবাই মিলে আমরা হুটোপুটি করছি, এমন সময়—অবাক কাণ্ড! ইন্সপেক্টরের হাতের টর্চ গেল নিবে, অনেক টেপাটিপি করেও কিছুতেই আর জ্বালানো গেল না। তারপরেই একে-একে আমাদের প্রত্যেকের হাতের আলোগুলি নিভতে আরম্ভ করল।

প্রাণের আশা তখন একেবারে ছেড়ে দিলাম।

কাঠ হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পরামর্শ করলাম—যেমন করে হোক দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে সুড়ঙ্গের দেয়াল ধরে চলুন ফিরে যাই এমন করে এখানে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল।

সর্দার বললে, 'চল, আমি পথ চিনি। দে, এক্‌টো জ্বালা কাঠির বাস্‌কো দে আমার হাতে।'

আমার পকেটে দেশলাই ছিল কাঁপতে কাঁপতে সেটা বের করে সর্দারের হাতে দিলাম।

কিন্তু ফস্‌ করে সর্দার যেই একটা কাঠি জ্বেলেছে তারই সেই সামান্য আলোকে দেখলাম, কিম্ভূতকিমাকার প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মতো কালো কুচ্‌কুচে এক সাঁওতাল এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সুমুখে। লম্বা লম্বা হাত-দুটো বাড়িয়ে সে আমাদের সুড়ঙ্গের পথ আগলে বলে উঠল—'যাবি কুথা? ছেলেকে আমার বাঁচা তা বাদে এগুতে যাবি।'

ইন্সপেক্টরের পকেটে ছিল রিভলভার, চট করে সেটা বের করে তিনি ধাঁ করে চালালেন এক গুলি। ভীষণ আওয়াজ, কানে আমাদের তালা লেগে গেল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুনতে পেলাম, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ইন্সপেক্টর চিৎকার করে উঠেছেন—'গেলাম-গেলাম! ওরে বাবারে ছেড়ে দে বাবা, ছেড়ে দে।'

ভূতে মানুষে মারামারি, ইন্সপেক্টরের গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন তাঁকে আমাদের কাছ থেকে খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। ঝট্‌পট্‌ করতে করতে সব থেমে গেল। শুনলাম সাঁওতালটা বলছে, 'গুলি চালাবি আর? চালা দেখি কেমন মরদ।'

আমরা তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছি। আমাকে মেরেছিস বানে ডুবোই জলের ভিতর ঠিক ইঁদুর-মরা করে। ছেলেটা ছিল, আবার তাকে-ও মেরে দিলি। বলতে বলতে সাঁওতালটা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। কই তুদের ম্যানেজার কই?

ম্যানেজারবাবু কেঁদে ফেললেন,'দোহাই বাবা, আমায় ছেড়ে দে বাবা, আমার কোন দোষ নেই।'

জীবিত ও মৃত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়েছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার

বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাশুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল

ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্যে এই বিধবা কাকী কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরও বেশী হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না; তাহার উপরে কোন সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি—কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোন দলিল-অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল—সময় জগতের আর -সর্বত্রই চলিতে লাগিল, কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিশের উপদ্রব ঘটে, এইজন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহু দূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটির, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর-কোথাও কিছু নাই। পূর্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী শুকাইয়া গিয়াছে। সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্মিত হইয়াছে। এখানকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইত লাগিল যে, অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, সিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থম্‌থমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না; অন্ধকার ঘরে দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেষ্টাতেও জ্বলিল না—যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, "ভাই রে, একছিলিম তামাকের জোগাড় থাকিলে বড়ো সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই।"

অন্য ব্যক্তি কহিল, "আমি চট্‌ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি।"

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল, "মাইরি! আর, আমি বুঝি

এখানে একলা বসিয়া থাকিব।"

আবার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘন্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই—কেবল পুষ্করিণী তীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন সময় মনে হইল, যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল, যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোন খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল, গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে—অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটিরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানে সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদন—বস্ত্রটি পর্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে গিয়া দেখে কুটিরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়াছিল, তাহাতে স্ত্রী লোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশংকর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোন শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভালো।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্বেই কার্য শেষ করা হইয়াছে, কুটিরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারও সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না—কারণ, মৃতদেহ এমন-কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং সময়মতো পুনর্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই—হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাস মতো যেখানে শয়ন করিয়া থাকে, মনে হইল এটা সেই জায়গা নহে। একবার ডাকিল 'দিদি'—অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটি বেদনা—শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বসিয়া একটি অগ্নিকুণ্ডের উপরে খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছে—কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল—রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।' তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই সুমিষ্ট ভালবাসার স্বরে কাকিমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহপাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কিনা, বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল, যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মুক্ত দ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মুহূর্তে তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল; সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সুদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল, সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে দেখিয়া কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, 'আমি

তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতাত্মা।'

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাত্রে শারদাশংকরের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনও যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া গিয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়। শারদাশংকরের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহু দূরবর্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, 'আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি—আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণ-কারিণী; আমি আমার প্রেতাত্মা।'

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা—যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অভূতপূর্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মতো হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল—মনে লজ্জা-ভয়-ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না—মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা এক-হাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো আর অল্প অল্প দেখা দিয়াছে তখন অদূরে লোকালয়ে বাঁশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাখির ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত, জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে; মৃত্যু নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রিজাগরণে পাগলের মতো হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পলাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত।

সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল, "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ?"

কাদম্বিনী প্রথমে কোন উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল, "চলো মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই—তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বলো।"

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি তো নাই—তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক-এক সময় রীতিমতো ভালবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদম্বিনী জানাইতে চাহে, ভালবাসা তাহার দিকেই প্রবল; যোগমায়া জানাইতে চাহে, কাদম্বিনী তাহার ভালবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোন সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে এক দণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোন পক্ষেরই কোন সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল, "নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি যাইব।"

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিল; নিশিন্দাপুর যদিও নিকটবর্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল, "ওমা, আমার কী ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু, ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলে। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল।"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল, অবশেষে কহিল, "ভাই, শ্বশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির এক প্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।"

যোগমায়া কহিল, "ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন। তুমি

আমার সই, তুমি আমার—" ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনরূপে সংকোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে, এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু, এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না—মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেশা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কী যেন ভাবে—মনে করে, 'স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহু দূরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহ-মমতা এবং সমস্ত কর্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।'

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না—কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এইজন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে—যদি দুইয়ের কোনটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারী রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল; ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিককে ভয় করে—যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়, বাহিরে তার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-একদিন চীৎকার করিয় উঠিত, এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্‌ছম্‌ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া

গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন-তখন যেখানে-সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল, "দিদি, দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়া যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, "হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক। একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুরঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল, মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তিমাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কী বুঝাইয়া বলো দেখি। তোমরা পুরুষমানুষ এমনি জাতই বটে।"

বাস্তবিক, সাধারণ স্ত্রীজাতির' পরে পুরুষমানুষের একটা নির্বিচার পক্ষপাত আছে এবং সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায় অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্রস্পর্শপূর্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

তিনি মনে করিতেন, 'নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত, তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই তখন আমি ইহাকে কী করিয়া ত্যাগ করি।' এই বলিয়া তিনি কোনরূপে সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভাল ফল না'ও হইতে পারে, অতএব রানীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এ দিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিল, "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভাল দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।"

কাদম্বিনী গম্ভীরভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী।"

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল, "তোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধূকে কী বলিয়া আটক করিয়া রাখিব।"

কাদম্বিনী কহিল, "আমার শ্বশুরঘর কোথায়।"

যোগমায়া ভাবিল, 'আ মরণ! পোড়কপালি বলে কী।'

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল, "আমি কি তোমাদের কেহ, আমি কি এ পৃথিবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া। বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি— আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু, ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর-কোন স্থান গড়িয়া রাখেন নাই, তখন কাজে-কাজেই বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।"

এমনিভাবে চাহিয়া কথাগুলি বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কী বুঝিতে পারিল, কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

শ্রীপতি কহিলেন, "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী শুনিলে, বলো।"

শ্রীপতি কহিলেন, "নিশ্চয়ই তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনোই করে

না; যদি-বা করে কোন সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন, "কিরকম শুনি।"

শ্রীপতি কহিলেন, "যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে।"

এমনতরো কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে—বিশেষত নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, "আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে—কী কথার শ্রী।"

শ্রীপতি বুঝাইলেন, এ স্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন, "ঐ শোনো। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ। কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শুনিতে কী শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"

নিজের কর্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। উভয় পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারও মতভেদ ছিল না—কারণ, শ্রীপতির বিশ্বাস তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী—তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন, "ভাল বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম।"

আর-একজন দৃঢ়স্বরে বলেন, "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।"

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কাদম্বিনী কবে মরিল বলো দেখি।"

ভাবিলেন কাদম্বিনীর কোন-একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন

সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্বের দিনেই পড়ে। শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস্ করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল, "সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।"

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন: শ্রীপতির বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই—ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।" তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষনিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।"

এই বলিয়া মূর্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রানীহাটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু, প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহে আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনরূপ বাধা দিল না। এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শারদাশংকরের স্ত্রী তাঁহার ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ

করিল। সে যে কী ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে, কী হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল, রুগ্‌ণ শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আর, তাহার পর মনে পড়িল, 'আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে। ইহার মা সঙ্গ ভালবাসে, গল্প ভালবাসে, খেলা ভালবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোন দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে।'

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, "কাকিমা, জল দে।" 'আ মরিয়া যাই! সোনা আমার, তোর কাকিমাকে এখনও ভুলিস নাই।' তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া, খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জল পান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমতো কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, তুই মরে গিয়েছিলি?"

কাকিমা কহিল, "হাঁ, খোকা।"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস! আর তুই মরে যাবি নে?"

ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই একটা গোল বাঁধিল—ঝি এক-বাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া 'মা গো' বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল—সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "কাকিমা, তুই যা।"

কাদম্বিনী অনেক দিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোন বিচ্ছেদ কোন ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি

গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে; খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকিমা তো একতিলও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ। এই দেখো, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি।"

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশংকরবাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি জোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন, "ছোটবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল 'কাকিমা' 'কাকিমা' করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও— আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।"

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না; তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।"

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

"তখন বলিল, এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।"

শারদাশংকর মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন; খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল; দুই মূর্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তখন কাদম্বিনী "ওগো আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই—" বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।

একটি ভৌতিক কাহিনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আমি বি. এ. পাশ করিয়া চাকরীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েক মাস ধরিয়া বহু স্থানে আবেদন করিলাম কিন্তু কোনরূপ ফল হইল না। অবশেষে সিউড়ী জেলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহু লোকের খোশামোদ করিয়া উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে সিউড়ী বারো ক্রোশ পথ ব্যবধান। বরাবর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া দুই দিন পরে নতুন কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন সেইরূপ একটি ছোটখাটো সস্তা বাড়ি খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড্ মাস্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম করি, এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে শহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ির সন্ধান পাইলাম। বাড়িটি বহুকাল পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন তথাপি বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাঁচ সিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়িখানি পাওয়া যায়। কিন্তু গুজব এই যে বাড়িটিতে ভূত আছে। তখন আমি সদ্য কলেজের ছোকরা—ইয়ংবেঙ্গল—ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যা-মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ি লওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু অত-দূরে একাকী থাকা নিরাপদ নহে, চোরডাকাতের ভয়ও তো আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন, তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি. এ. পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ংবেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূর্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়িটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়িতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাজকর্ম সারিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি,

তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্তী রবিবার প্রাতে জিনিসপত্র লইয়া সেই বাড়িতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়িটি বহুকালের নির্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো-মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়িটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ভাড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়িটি দ্বিতল। নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দু'খানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ির পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে তবে বাসনমাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ির অদূরে একটি উৎকৃষ্ট দীঘিকা ছিল আমরা সেইখানে গিয়ে স্নান করিতাম। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। অপর খানিতে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল সেই সঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন পদব্রজে সিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতি বাঁধা থাকিত, হাতিশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্বদা বাস করেন এবং আপনার তপ-জপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

আশীর্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"বাবা তুমি কোথা যাইতেছ?"

আমি উত্তর করিলাম—"সিউড়ী স্কুলে আমার মাস্টারি চাকরী হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয়? আজ বাড়ি ফিরিয়া যাও, কল্য যাইও।"

আমি বলিলাম—"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরী, কামাই হওয়াটা বড়ো খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ?"

—"শহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ি ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া আমি ও আমাদের স্কুলে অন্য একজন মাস্টার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।"—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সিউড়ী পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময় দেখি আমাদেরই গ্রামের একজন কৈবর্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মৃত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রে। তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি?"

সে বলিল—"আজ্ঞে, মা ঠাকুরাণী এই চিঠি দিয়েছেন এবং এই একটি কবচ আপনার হাতে পরাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরাণী লিখিতেছেন,—তুমি বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়া ছিলেন এবং কবচ দিয়া বলিলেন,—"মা তোমার ছেলে প্রাতে সিউড়ী রওনা হইয়াছে পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার

আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।" সুতরাং আমি দীনু কৈবর্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিমাত্রে রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তি পূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা জানিবে।

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, "তুই আজ এইখানেই থাকবি তো? তোর খাবার যোগাড় করি।"

সে বলিল, "আজ্ঞে না মা ঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে, আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে।"

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলাম—"এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।" তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দু'জনে কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিভিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালা পথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্প খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথায় সাদা ছোট চুলগুলি যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দু'টা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রুপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিউরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম। আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি আমার হস্তে রক্ষাকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্ম

নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িতকণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন—"কি মহাশয়?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিওন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানা রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে ঃ

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

পরমশুভাশীর্বাদাঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই তিনি সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোন বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিবে। সর্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি নিয়ত আশীর্বাদক
শ্রীরমাপ্রসন্ন মজুমদার

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারীবাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ি গিয়া প্রথমেই মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব একথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন?"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাতে বেড়াইতেছে। কোন কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে

আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম—"মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয় দেখিলেন না কেন? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়িতে ছিলাম, তবে আমার উপরেই ভূতের এত আক্রোশ কেন?"

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি?"

—"তাঁহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

—"তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম—"সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে?"

—"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে, সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোন বিপদ হবে না।"

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায় বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়াছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারী পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মফঃস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। একদিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া, সেই গ্রামাভিমুখে রওনা হইলাম, শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ি মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথমে শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোন প্রকারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিষ্কার পথ পাইয়াছে—গরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও দূরে দূরে কোথাও বা ঘন সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া উহাকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ গরু দুইটা থামিয়া গেল। একটা ঝাঁকুনি দিয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্তি। গরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ির জোয়ালের উপর দুইটা জীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্মাবৃত কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলাম, সে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গরু দুইটা তখন গাড়ি পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।

ঝাঁকানিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"বাবু এ কি? গরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?" আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলাম—"হয়ত পথে কোন ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ি যাইতেছে।" গাড়োয়ান তখন গাড়ি থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গরুর গাড়ি দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম—"থাক আজ আর কাজ নাই, গরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।"

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ততদিন ধারণ করিয়া থাকিব, আমার মাতৃদেবীর এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্রদুইখানি অদ্যপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তো দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উপরের বর্ণিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দুবাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষভূত এবং অবিকল সত্য।

ভূতপত্‌রীর দেশ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"মাসি পিসি বন্‌গাঁ বাসী বনের ধারে ঘর,
কখনো মাসি বল্লেন না যে খইমোয়াটা ধর।"

কিন্তু এবারে মাসি পিসি দুজনেই ডেকেছেন। আগে মাসির বাড়ি এসেছি পাল্কি চড়ে। সেখানে মোয়া খেয়ে পেট ধামা করেছি। এখন পাল্কিতে শুয়ে পিসির বাড়ি চলেছি। মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন—পথে জল খেতে; হাতে একগাছা ভূতপত্‌রী লাঠি দিয়েছেন—ভূত তাড়াতে; এক লণ্ঠন দিয়েছেন—আলোয় আলোয় যেতে।

হুম্পাহুম্মা পাল্কি চলেছে বন্‌গাঁ পেরিয়ে; ধপড়ধাঁই পাল্কি চলেছে বনের ধার দিয়ে, মাসির ঘর ছাড়িয়ে, ভূতপত্‌রীর মাঠ ভেঙে, পিসির বাড়িতে।

পিসির দেশে কখনো যাইনি। শুনেছি পিসি থাকেন তেপান্তর মাঠের ওপারে সমুদ্দুরের ধারে বালির ঘরে। শুনেছি পিসি কাঁকড়া খেতে ভালবাসেন, কচি-কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল রেঁধে লোককে খাওয়াতে ভালবাসেন। কিন্তু লোক তো পিসির বাড়ি যায় কত! যে ভূতপ্‌তরীর মাঠ দেখেই ভয় হয়! এই মাঠ ভেঙে দুপুর রাতে পিসির বাড়ি চলেছি। চলেছি তো চলেছি,—"হঁইয়ো মারি খপরদারি!" "বড়া ভারী খপরদারি!"

মাঠের মাঝে একটা শেওড়াগাছের ঝোপ, অন্ধকারে কালো বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তারই কাছে ঘোড়ার গোর, তার পরেই তেপান্তর মাঠ! হাটের বাট ওই শেওড়াতলা পর্যন্ত; তার পরে আর হাটও নেই, বাটও নেই;—কেবল মাঠ ধূ ধূ করছে।

এই শেওড়া-তলায় পাল্কি এসেছে কি আর যত ঝিঁ ঝিঁ-পোকা তারা বলে উঠেছে—"চল্লে বাঁচি, চল্লে বাঁচি!" কেন রে বাপু, একটু না হয় বসেছি, তাতে তোমাদের এত গায়ের জ্বালা কেন? "চল্লে বাঁচি!" চলতে কি আর পারি রে বাপু? অমনি ঝিঁ ঝিঁ-পোকার সদ্দার দুই লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নেড়ে বলছে—"ওই আসছে চিঁচিঁ ঘোড়া চিঁচিঁ।" ফিরে দেখি গোরের ভিতর থেকে ঘোড়া-ভূত মুখ বার করে পাল্কির দিকে কট্‌মট করে তাকাচ্ছে। ওঠা রে পাল্কি, পালা রে পালা! আর পালা! ঘোড়া-ভূতে তাড়া করেছে—ঘাড় বেঁকিয়ে, নাক ফুলিয়ে আগুনের মতো দুই চোখ পাকিয়ে।

ভয়ে তখন ভূতপত্‌রী লাঠির কথা ভুলে গেছি। কেবল ডাকছি—জগবন্ধু রক্ষে কর, মাসিকে বলে তোমায় খৈয়ের মোয়া ভোগ দেব। বলতেই আমার খুঁটে বাঁধা খৈগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাসির বাড়ির খৈ—জুঁইফুলের মতো ফুটন্ত ধব্‌ধব্ করছে খৈ,—রাস্তা যেন আলো করে।! ঘোড়া-ভূত কি সে লোভ সামলাতে পারে? খৈ খেতে অমনি দাঁড়িয়ে গেছে। বেচারা ঘোড়া-ভূত খৈ খেতে মুখটি নামিয়েছে কি, অমনি তার ভূতুড়ে নিশ্বাসে খৈগুলি উড়ে উড়ে পালাচ্ছে। যেমন খৈয়ের কাছে মুখ নেওয়া অমনি খৈ উড়ে পালাল। খৈও ধরা দেয় না, ঘোড়াও ছাড়তে চায় না। ঘোড়া-ভূত চায় খৈ খায়,—খৈ কিন্তু উড়ে উড়ে পালায়।

ঘোড়া চলেছে খৈয়ের পিছে, খৈ উড়েছে বাতাসের আগে, আমি চলেছি পাল্কিতে বসে ঘোড়া-ভূতের ঘোড়দৌড় দেখতে মুখ বাড়িয়ে। কখন যে মাঠে এসে পড়েছি মনেই নেই। সেখানটা বড় অন্ধকার; বড় হাওয়া—যেন ঝড় বইছে।

দাদির দেওয়া একটি লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। অন্ধকারে আর ঘোড়াও দেখা যায় না, খৈও চেনা যায় না। বেহারাদের বলি—আলো জ্বাল; কিন্তু হাওয়ায় কথা উড়ে যায়;—কে শোনে কার কথা! এমন হাওয়া তো দেখিনি! আমার ভূতপত্রীর লাঠিটা পর্যন্ত উড়ে পালাবার জোগাড়। লণ্ঠনটি তো গেছে, শেষে লাঠিটাও যাবে? আচ্ছা করে লাঠি ধরে বসে আছি। বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়ছে।

সর্ব্বনাশ! এ যে দেখছি বীর-বাতাস! এ বাতাসের মুখে পড়লে তো রক্ষে থাকবে না;—পাল্কি সুদ্ধু আমি, আমার লাঠি, আমার ছাতা, ধুতি-চাদর, পোঁটলা-পুঁটলি, বিছানা-বালিশ কাগজের টুকরোর মতন কোথায় উড়ে যাবে তার ঠিকানা নেই। পথে জল খেতে দুমুঠো খৈ ছিল, তাতো ঘোড়া-ভূতের সঙ্গে কোথায় উড়ে গেছে। শেষে বীর-বাতাসে আমিও উড়ে যাব নাকি? শীতেও কাঁপছি। পাল্কি ধরে বীর-বাতাস একবার ঝাঁকানি দিচ্ছে; আর আমি হাঁক দিচ্ছি—সামাল, সামাল! ভয়ে জগবন্ধুর নাম ভুলে গেছি। পাল্কিখানা ছাতার মতো বেহারাদের কাঁধ থেকে উড়ে আমাকে সুদ্ধ নিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে। পিছনে ধর্ ধর্ করে পাল্কি-বেহারাগুলি ছুটে আসছে।

একটা বুড়ো মনসা গাছ, মাথায় তার হলদে চুল, বড় বড় কাঁটার বঁড়শী ফেলে বালির উপরে মাছ ধরছিল। মনসাবুড়োর ছিপে মাছ তো পড়ছিল কত! কেবল রাজ্যের খড়কুটো আর পাখীর পালক হাওয়ায় ভেসে এসে বুড়োর বঁড়শীতে আটকা পড়ছিল। এমন সময় আমার চাদরখানা গেল বঁড়শীতে গেঁথে। আর যাব কোথা? পাল্কিসুদ্ধ বালির উপর উল্টে পড়েছি। বেহারাগুলি একবার আমাকে ছাড়াবার জন্যে পাল্কির ডাণ্ডা ধরে আমার চাদরটা ধরে টানাটানি করলে কিন্তু বাতাসের চোটে কোথায় উড়ে গেল আমার সেই উড়ে বেহারা দু'টা, তাদের আর টিকিও দেখা গেল না।

মনসাবুড়োর হাসি দেখে কে! ভাবলে মস্ত মাছ পেয়েছি। কিন্তু আমার হাতে ভূতপত্রী লাঠি আছে তাতো বুড়ো জানেনা! লাঠি দিয়ে যেমন বুড়োর গায়ে খোঁচা দেওয়া অমনি ভয়ে বুড়োর রক্ত দুধ হয়ে গেছে;—সে তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। পাল্কিটা ঠেলে তুলে, বিছানা-পত্তর পোঁটলা-পুঁটলি যা যেখানে পড়েছিল গুছিয়ে নিয়ে চুপটি করে বসে গেছি—কখন বেহারাগুলি ফিরে আসে! মনসাবুড়োর গা বেয়ে দর্‌দর্ করে সাদা দুধের মতো রক্ত পড়ছে; সেও কোন কথা বলছে না, আমিও সাদা রক্ত দেখে অবাক হয়ে চেয়ে আছি।

বুড়ো খুব রেগেছে; তার গায়ের সব রোঁয়াগুলো কাঁটার মতো সোজা হয়ে

উঠেছে। অনেকক্ষণ গোঁ হয়ে বসে থেকে মনসাবুড়ো আমার দিকে চেয়ে বলছে—দেখছ কি? বড় আমোদ হচ্ছে না? বুড়োমানুষের গায়ে খোঁচা দিয়ে রক্তপাত করে আবার বসে বসে তামাশা দেখছ, লজ্জা নেই! যাওনা, ছাড়া পেয়েছ তো নিজের কাজে যাওনা।

আমি বল্লেম—যেতে পারলে তো। পাল্কি-বেহারা নেই যে! তারা আসুক তবে যাব।

শুনে বুড়ো হো-হো করে হেসে বল্লে—কেন, পা নেই নাকি? হেঁটে যেতে পার না? নবাব হয়েছ?

আমার ভারী রাগ হল। বুড়োর বঁড়শীর আঁচড়ে দুই পা ছিঁড়ে তখনও আমার ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়ছে। আমি রেগে বল্লেম—"পা দুটো কি আর রেখেছ! আঁচড়ের চোটে দফা শেষ করেছ যে।"

"লেগেছি নাকি!"—বলে বুড়ো খানিক চুপ করে বল্লে—"একটু দই দাও, সেরে যাবে।" আমি বল্লেম—"এই মাঠের মধ্যে দই? তামাশা করছ নাকি?"

"আচ্ছা তবে খানিক তেঁতুল-বাটা হলেও চলতে পারে।"

আমার হাসি পেল। নিশ্চয় বুড়োটা ঘুমের ঝোঁকে স্বপন দেখছে। "বলি, ও দাদা! এখানে তুমি ছাড়া তো গাছ দেখছিনে, আর-একবার লাঠির খোঁচা দিয়ে তোমার গা থেকে একটু দুধ বার করে নিয়ে দই পাতব নাকি?"—বলেই ভূতপত্রী লাঠিটা যেমন একটু বাগিয়ে ধরেছি, অমনি বুড়ো বলছে—"রও রও, কর কি দাদা! বুড়োমানুষ কখন কি বলি, রাগ কোরো না। আমরা মনসাদেবীর বরে চিরকাল নানা রকম স্বপন দেখি। এইখানটিতে কতকাল যে বসে আছি তার ঠিক নেই। ছিপ নিয়ে মাছ ধরছিলুম জলের ধারে—আজ সে কত কালের কথা; সে নদী শুকিয়ে, জল সরে চড়া পড়ে গেছে কিন্তু এখনো ঝোঁক কাটেনি; মনে হচ্ছে নদীর ধারেই বসে মাছ ধরছি! আমার বেশ মনে পড়ছে এইখানেই একঘর গয়লা থাকত আর ঠিক তাদের ঘরের কোণে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ ছিল, এখন তবে সেগুলি গেছে?"

বলেই বুড়ো আবার ঝিমিয়ে পড়ে দেখে আমি তাকে জাগিয়ে দিয়ে বল্লুম—"আচ্ছা দাদা, ওই যে ঘোড়া-ভূত আর ঝিঁঝি পোকা দেখে এলুম, ওদের কথা তুমি কিছু জান কি?"

"জানি বইকি! ওরা তো সেদিনের ছেলে!" বলেই বুড়ো গল্প শুরু করলেঃ

"দ্যাখো, এই পৃথিবী তখন সবে তৈরি হয়েছে, আমাদের মতো দুচারটি গাছ-ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই,—নদী নেই, পাহাড় নেই, এমন কি বাতাসে

একটি পর্যন্ত নেই; কেবল ধূ ধূ করছে—ঠিক জায়গাটার মতো। আমার তখন সবেমাত্র কচি-কচি দুটি কাঁটা বেরিয়েছে—ছোট ছেলের কচি-কচি দুটি দাঁতের মতো। সেই সময় তারা গান বড় ভালবাসে, তারা দেখতে অনেকটা মানুষের মতো, কিন্তু ফড়িংগুলির মতো তাদের ডানা আছে, পাখিগুলির মতো পা, ঝাঁক বেঁধে তারা আমাদের কাছে উড়ে এসে বসল আর গান গাইতে আরম্ভ করলে। আকাশ, বাতাস তাদের গানের সুরে যেন বেজে উঠল। সে কি চমৎকার তা তোমাকে আর কি বলব! আমরা তার আগে শব্দ শুনিনি, গানও শুনিনি,—আনন্দে যেন শিউরে উঠলুম। বালি ঠেলে যত গাছ, যত ঘাস মাথা তুলে কান পেতে সেই গান শুনতে বেরিয়ে এল, পৃথিবীর ভিতর থেকে পাহাড়গুলি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এল, পাহাড়ের ভিতর থেকে নদীগুলো ছুটে ছুটে বেরিয়ে এল। গান শুন্‌তে শুন্‌তে দেখতে দেখতে আমরা বড় হয়ে উঠলুম। কিন্তু যারা গান গাইতে এল, কি খেয়ে তারা বাঁচে? পৃথিবীতে তো তখন ফুলও ছিল না, ফলও ছিল না; ছিল কেবল আমাদের মতো বড় বড় গাছ, কাঁটা লতা আর পাতা। নদীতে মাছও ছিল না; আকাশে পাখিও ছিল না যে তারা ধরে খায়। তবু তারা অনেকদিন বেঁচে ছিল কেবল গান গেয়ে। একদিন হঠাৎ শুনি সে গান বন্ধ হয়ে গেছে,—তারা সবাই মরে গেছে,—শুক্‌নো পাতার মতো তাদের সোনার ডানা বাতাসে উড়ে এসে আমাদের গায়ে বিঁধতে লাগল কিন্তু তাদের গানের সুর আর শোনা গেল না। তারপর পৃথিবীতে অনেকদিন আর কোন সাড়া-শব্দ নেই; কেবল দেখছি, একদল কারা জানি না, দেখতে অনেকটা মানুষ আর ঘোড়ার মতো, এদিকে ওদিকে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরই খুঁজে খুঁজে গান যারা গাইতে এসেছিল। ক্রমে দেখি তারাও মরে গেছে। পৃথিবীতে আর তখন কিছু চলে বেড়াচ্ছে না, গানও গাইছে না;—কেবল গাছের দল আমরা চুপ করে বসে আছি। আমাদের বয়েস ক্রমে বাড়ছে আর আমরা বুড়ো হচ্ছি। তখন জলে মাছ দু-একটি দেখা দিয়েছে; আমি কাঁটা আর বঁড়শী ফেলে এক রাত্তিরে মাছ ধরছি এমন সময়—"

বলেই মনসাবুড়ো ঝিমিয়ে পড়ল! আমি যত বলি—"এমন সময় কি হল দাদা। আবার বুঝি সেই ফড়িংদের মতো মানুষগুলি ঝিঁঝিঁ পোকা হয়ে ফিরে এসে গান গাইছে দেখলে? দেখলে বুঝি সেই মানুষের মতো ঘোড়াগুলি ভূত হয়ে অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে তাদের গান শুনতে এল?" বুড়োর আর কথা নেই; কেবল একবার 'হুঁ' বলেই চুপ করলে।

আমি ভাবছি দিই আর-এক ঘা লাঠি বুড়োর মাথায় বসিয়ে, এমন সময় দেখি

দূর থেকে একটা আলো আসছে,—যেন কে লণ্ঠন-হাতে আমার দিকে চলে আসছে। একবার ভাবছি বুঝি বেহারা ক'জন আলো নিয়ে আমাকে নিতে এল। আবার ভাবছি, কি জানি মাঠের মাঝে আলেয়া দেখা দেয়, তাও তো হতে পারে। কিন্তু দেখলাম আলোটা এসে পাল্কির খানিক দূরে থামল; আর চারটে জোয়ান উড়ে আমার পাল্কিটা কাঁধে নিল। উড়েদের একেই একটু ভূতুড়ে চেহারা কাজেই ঠিক আন্দাজ করতে পারলুম না যে তারা ভূত কি মানুষ। একবার তাদের পায়ের দিকে চেয়ে দেখলুম, ভূতের মতো তাদের পায়ের গোড়ালি উল্টো কি না। কিন্তু অন্ধকারে কিছু ঠিক বুঝতে পারা গেল না। মনসাবুড়োকে ডেকে বল্লুম—"দাদা তবে যাচ্ছি।"

দাদা তখন আবার ঝিমোচ্ছেন; চম্‌কে উঠে বল্লেন—"যাবে নাকি? গল্পটা তো শেষ হল না।"

পাল্কি তখন চলছে, আমি মুখ বাড়িয়ে বল্লুম—"দাদা, একরকম গল্পটা শেষই করেছিলে, কেবল তোমার মাথার হলুদে চুল আর তোমার সাদা রক্ত কেন, সেইটে বলতে বাকি রয়ে গেল।" "মাস্টারমশায়ের কাছে জেনে নিও—" বলেই দাদা আবার ঝিমিয়ে পড়লেন। হু হু করে পাল্কি আবার মাঠের দিকে বেরিয়ে গেল।

একটু-ভয়-ভয় করছে, বেহারাগুলি মানুষ না ভূত বুঝতে পাচ্ছিনে। পাল্কির দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল—মানুষ-উড়ে পাল্কি কাঁধে নিলেই হুম্মাহুম্মা ডাক ছাড়ে; এরা তো হাঁক দিচ্ছে না! পড়েছি উড়ে ভূতের হাতেই, পড়েছি আর কোন ভুল নেই। আচ্ছা দেখা যাক, ভূতপত্‌রী লাঠি তো আছে। তেমন তেমন দেখি তো দু-হাতে লাঠি চালাব।

ভূতপত্‌রী লাঠির কথা মনে করেছি কি অমনি ধপাস্ করে পাল্কিটা তারা মাটিতে ফেলেছে কোমরটা আমার খচ্ করে উঠেছে। "তবে রে ভূত-উড়ে আমাকে এই মাঠে একলা নামিয়ে দিয়ে পালাবে ভেবেছ! তোল পাল্কি, ওঠা সোয়ারী।"—বলেই লাঠি নিয়ে যেমন তেড়ে যাব কোমরটা আমার বেঁকে পড়ল, ভূতগুলি দেখেই খিল্‌খিল্ করে হেসে অন্ধকার মাঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। মহা বিপদ! এই রাত্তিরে মাঠের মাঝে ভূতের ভয়, বাঘের ভয়, সাপের ভয়, তার উপর কোমর ভেঙে গেল। লাঠি ধরে যে গুড়িগুড়ি পালাব তারও জো নেই। মনসা-কাঁটায় পা ছিঁড়ে গেছে। "দূর আর ভাবতে পারিনে, যা হয় হবে!"—বলে পাল্কির ভিতরে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। ক্ষিধেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে।

একলা থাকতে থাকতে ক্রমে ঘুম এসেছে। একটু চোখ বুজেছি কি না অমনি

খপ্ করে একটা শব্দ হল। চোখ চেয়ে দেখি, বালির উপরে গোটাকতক তালগাছ উঠেছে, তাদের মাথা যেন আকাশে ঠেকেছে, আর একটা আলো ঘুরে ঘুরে সেই তালগাছে ঠেকেছে, আবার সড় সড় করে নেমে আসছে! আমি আর না-রাম না-গঙ্গা। কাঠ হয়ে পড়ে আছি, কেবল দুটি চোখ চাদরের একটি কোণ দিয়ে বের করে।

দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের উপর দিয়ে বোঁ-বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল! তালগাছের তলায় যে আলোটা টিপ্ টিপ্ করছিল সেটা জোনাকি-পোকার মতো উড়ে গিয়ে সেই গোলাটার উপর বসল। বসেই গোলাটাকে আমার দিকে গড়িয়ে আনতে লাগল।

পাল্কিসুদ্ধু গোলাটার ভিতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভিতরে মাছের মতো আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি,—বন্‌বন্ করে লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভিতর আমার মাসির মোয়াগুলিও ঘুরতে লেগেছে! কখনো মাঠের উপর দিয়ে, কখনো গাছের মাথা ডিঙিয়ে গোলাটা সাদা খরগোশের মতো লাফিয়ে গড়িয়ে, কখনো জোরে কখনো আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলছে!

ভয়ে দুই হাতে চোখ-ঢেকে চলেছি। ক্যাঁ-কোঁ চরকা-কাটার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি এক বুড়ি সুতো কাটছে আর একটা খরগোস তার চরকা ঘুরোচ্ছে। বুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ি! যে চাঁদের ভিতরে বসে থাকে, আর ওই তার চরকা, ওই খরগোশ! আঃ বাঁচা গেল, এটা তবে গোলাভূত নয়! ইনি আমাদের চাঁদামামা; আর বুড়ি তো আমাদের মামি। আর এ খরগোশ তো আমাদের সেই খাঁচার খরগোশটি, বিলিতি-ইঁদুরের আর গিনিপিগগুলির বড়মামা!

"বলি মামি, এমন করে কি ভয় দেখাতে হয়!"—বলেই আমি খরগোশটাকে খপ্ করে কোলে তুলে নিয়েছি। "ওরে ছাড় ছাড়, আমার চরকা-কাটা বন্ধ করিসনে; দেখচিস্‌নে এই চরকার জোরেই তোর চাঁদমামার সংসার চলছে!"

সত্যিই দেখি চরকা বন্ধ হতেই চাঁদামামা গড়াতে গড়াতে থেমে গিয়ে লাটিমটার মতো মাটির উপরে কাৎ হয়ে পড়েছেন! আমি খরগোশটি মামির হাতে দিয়ে বল্লুম—"কই মামি, চালাও দেখি মামাকে।"

খরগোশ চরকায় যেমন এক পাক দিয়েছে অমনি চাঁদামামা গা-ঝাড়া দিয়ে

উঠে ঘুরতে লেগেছেন। বুড়ি ডাকছে—"দে পাক্, দে পাক্!" খরগোশ ততই পাক্ দিচ্ছে আর চাঁদমামাও তত ঘুরপাক্ দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে রবারের বলের মতো নাচ্তে নাচ্তে চলেছেন। যত বলি—"মামি, আর পাক দিও না, মামাকে অত ঘুরিও না, মামা হাঁপিয়ে দম আটকে কোন্ দিন মারা পড়বেন যে! একটু রয়ে-বসে চালাও, শেষে বুড়ো বয়সে মামার কি মাথাঘুরুনি রোগ ধরিয়ে দেবে?—জানি কি যে মামি আমার কালা! আমার একটি কথাও বুড়ির কানে যায়নি। সে কেবল বলছে—"দে পাক্, দে পাক্।" আমি যত ইসারা করে বলি—"আস্তে আস্তে।"—বুড়ি ভাবে জোরে চালাতে বলছি, ততই ডাকে—"দে পাক্, দে পাক্!"

মামা রেলের গাড়ির মতো হু হু করে ছুটে চলেছেন। "ওরে থামা থামা। মাথা ঘুরে গেল, আর যে পারিনে।"—বলেই লাঠি তুলেছি খরগোশটাকে মারতে। যেমন লাঠি তোলা অমনি খরগোশটা খাঁক করে তেড়ে এসেছে, ক্যাঁচ করে চরকাটা বন্ধ হয়ে গেছে আর পটাং করে মামির হাতের সুতো কেটে গেছে। যেমন সুতো কাটা আর ঝপাং করে চাঁদামামা গিয়ে একটা নদীর জলে পড়েছেন, পড়েই ফেটে চৌচির!

"কি করলে গো মামি!"—বলেই চমকে উঠে দেখি নদীর ওপারে পাল্কিসুদ্ধু আমি ঠিকরে পড়েছি! কোথায় বুড়ি, কোথায় চরকা, কোথায় বা সে খরগোশ! নদীর জলে দেখি একরাশ কাঠের টুকরোর মতো চাঁদামামার ভাঙা আলো, খানিক চক্চক্ করেই নিভে গেল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই চাঁদামামার আধখানা কোথায় উড়ে গেছে।

ভাগ্যি নদীতে তেমন জল ছিল না, নইলে সবাই আজ ডুবেছিলুম আর কি! বড় তেষ্টা পেয়েছিল। নদী থেকে এক-ঘটি জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তবে বাঁচি।

নদীর ধারেই একটা গাঁ রয়েছে। দেখে সাহস হল; ভাবলুম—আজ রাত্তিরে ওই গাঁয়ে গিয়ে কারু গোয়াল-ঘরে শুয়ে থাকি; কাল সকালে এখান থেকেই ফিরে পালাব, পিসির বাড়ি গিয়ে আর কাজ নেই বাবা! এই মনে করে গাঁয়ের ভিতর গিয়ে দেখি, সেখানে জনমানব নেই। ডাক্-হাঁক্ করে কারও সাড়াও পাইনে! যাই হোক, গাঁ ছেড়ে আর এক পাও নড়া নয়। চাদর মুড়ি দিয়ে একটা ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়লুম। যেমন শোয়া আর ঘুম,—অকাতরে ঘুম।

খানিক পরে জেগে দেখি, সেই মনসাতলায় লণ্ঠন-ভূতটা আর তার চার বন্ধু আলো নিয়ে আমার মুখের কাছে বসে আছে। "তবে রে!"—বলেই যেমন উঠতে যাব অমনি তারা বলে উঠেছে—"দেখ বাবু, যদি ফের লাঠি দেখাও, কি মারতে

আস, তবে আবার আমরা তোমাকে ফেলে পালাব। আর যদি চুপ করে ভাল মানুষটি হয়ে পাল্কিতে বসে থাক তবে ওই-কি-বলে ও-কি-তলা পর্যন্ত তোমাকে আমরা পৌঁছে দেব।" বুঝলুম, ভূতগুলি ভয়ে রাম নাম মুখে আন্‌তে পারছে না, তাই পিসির বাড়ি যেতে যে রামচণ্ডীতলার কথা শুনেছি তাকে বলছে—কি-বলে-ও কি-তলা।

ভূতগুলি ভয় পেয়েছে দেখে সাহস হল; পাল্কিতে আবার উঠে বসলুম।

এবারে আর ভয় করছে না—ভোর হবার এখনো দেরী আছে কিন্তু এরই মধ্যে ভূতগুলি যেন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে; মাঠে আর ঘন ঘন আলেয়া দেখা দিচ্ছে না, পথের ধারে তালগাছ তো দেখাই দিচ্ছে না; কোথাও মনসাগাছের ঝাড়টি পর্যন্ত আর দেখা যায় না। পুবদিক থেকে ভোরের বাতাস একটু একটু আসছে; ভূতগুলি হাওয়া পেয়েই যেন জড়োসড়ো। আমি কিন্তু বেশ আরামে পাল্কিতে দরজা খুলে ঘুম দিতে দিতে চলেছি।

ভোর হয় দেখে ভূত-বেহারা চারটে ভয় পেয়েছে কিন্তু রামচণ্ডীতলায় আমাকে পৌঁছে দিলেই তাদের ছুটি এই ভেবে তাদের একটু আহলাদও হয়েছে। চার ভূতে চার সুরে চিঁচি, পিঁপি, খিট্‌খিট্‌, টিক্‌টিক্‌ করে গান গাইতে গাইতে চলেছে,—ঠিক যেন কতদূর থেকে চিল ডাকছে, আর কোলা ব্যাং কট্‌কট্‌ করছে। ঘুমের ঘোরে শুনছি যেন "কহ কেকার" ঠিক সেই পাল্কির গানটা! কিন্তু কথাগুলি সব উল্টোপাল্টা আর সুরটাও বেখাপ্পা বেয়াড়া—বেজায় ভূতুড়ে। কেবল হাড় খট্‌খট্‌, দাঁত মিট্‌মিট্‌, গোঙানি আর কাতরানি শুনে যে গায়ে জ্বর এলো। ঘুমিয়ে আছি কিন্তু তবু শুনছি—

চলে চলে	ভূত্‌ পেরেতে।	বেরাল নাচ।	ভূত্‌পেরেতের
হুম্‌কিতালে	পাল্কি দোলে		নাইকো কমি।
পংখী গালে	উঠতি আলে	মরা নদী	উড়ছে কতক
মাসিপিসি	নাল্‌কি দোলে	বালির ঘাট্‌	ভন্‌ ভনিয়ে
বাঘ্‌বেরালে।	নাম্‌তি খালে।	মন্‌সাতলায়	চলছে কতক
ভূত্‌পেরেতে	আলো আঁধারে	মাছের হাট্‌।	হঁন্‌হঁনিয়ে।
হন্‌হনিয়ে	কালোয় সাদায়		
চল্‌ছে রেতে	শেওড়াগাছ	ভূতের জমি	ঢুলছে কতক
গাছ তলাতে	কানামাছি।	সব ভূতুড়ে	সব ভূতুড়ে
দুলছে কতক	গঙ্গা ফড়িং		
তালপাতাতে।	জোনাক পোকা	ঘূর্ণি-হাওয়ায়	আলো-আলেয়া

দিনদুপুরে
বাদুড় ঘুমোয়
রাত দুপুরে
হুতুম ঘুমোয়
ভোঁদড় ভাম
বেঙ-বেঙাচি
টিকিটিকি আর

আরশোল্লা
ন্যাংটাখোকা
ছুঁচো ইঁদুর
খ্যাক্‌শেয়াল
শুকনো পাতা
গাছের ডাল।

চলছে ঘুরে।
জগৎ জুড়ে
ঘুরছে ধুলো
বাতাস দিয়ে
দুল্‌ছে কুলো!

জ্বলছে দূরে
সব ভুতুড়ে
ভূতের খেলা
খেজুরতলায়
ইঁটের ঢেলা....

গানটা শুনছি একবার—"ছুঁচো, ইঁদুর, কানামাছি, ভোঁদড়, পেঁচা, টিকটিকি, খেঁকশিয়াল।" গানটা শুনছি দুবার—"গঙ্গা ফড়িং, জোনাক পোকা, আরশোল্লা, বাদুড়—।" গানটা শুন্‌ছি তিনবার—"আলো আলেয়া, ঘূর্ণিহাওয়া, খেজুরগাছ, ইঁটের ঢেলা—।" একবার, দুবার, তিনবার—বারবার, তিনবার ইঁটের ঢেলা পড়ছে কি, আর পাল্কিসুদ্ধ আমাকে ভূতগুলি ঝপাং করে মাটিতে ফেলে খেজুরগাছের তলায় একটা মরা গরু পড়েছিল সেটাকে নিয়ে লুফতে লুফতে দৌড় মেরেছে! ওদিকে অমনি রামচণ্ডী থেকে রাত তিনটের আরতি বেজেছে—টংটং, টং-আ-টং, টংটং-আ-টং।

এই খেজুরতলা পর্যন্ত ভূত আসতে পারে, তার ওদিকে রামচণ্ডীতলা, সেখানে রামসীতা বসে আছেন, হনুমান, জাম্বুবান পাহারা দিচ্ছে, ভূতের আর সেখানে এগোবার জো নেই। ভূতপত্‌রী লাঠির জোর সেখানে খাট্‌বে না। কাজেই পোঁটলাপুঁটলি লাঠি ছাতা সমস্ত পাল্কিতে রেখে, কোমর ধরে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বালি ভেঙে রামচণ্ডীতলায় রামসীতা দেখতে তিনটে রাতে অন্ধকার দিয়ে একলা চলেছি। সঙ্গে একটি আলো নেই, হাতে লাঠিটি পর্যন্ত নেবার জো নেই। কি জানি লাঠি দেখে যদি হনুমান মন্দিরে ঢুকতে না দেয়! তখন যাই কোথা!

"রাম রাম"—বলতে বলতে বালি ভেঙে চলেছি। বালি তো বালি একেবারে বালির পাহাড়! এক একবার পিছন ফিরে দেখছি ভূতগুলি আসছে কি না। যদিও এখানকার বালিতে পা দিলেই তাদের মাথার খুলি ফুটাস করে ফেটে যাবে তবুও খেজুরগাছটার উপর থেকে তারা ভয় দেখাতে ছাড়ে না।—টুপ করে হয় তো একটা খেজুর-আঁটি এসে গায়ে পড়ল নয় তো শুনছি খেজুরতলায় যেন একটি কচি ছেলে ওমা ওমা করে কাঁদছে, শুনে ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে দেখি,—বুঝি কাদের ছেলে পথ হারিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে; হয় তো আমার নাম ধরেই পিছন থেকে কে একবার ডাকলে, গলাটা যেন চেনা-চেনা, ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই। অন্ধকারে হয় তো দেখলুম মাঠের মাঝে একটা জায়গায় খানিকটা জ্বলন্ত

বাতি তুবড়ি-বাজির মতো ফস ক'রে জ্বলে উঠল, ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখি কিন্তু গেলেই বিপদ,—একেবারে ভূতে ধরে জরিমানা করে ছাড়বে, নয় তো মট্‌ করে ঘাড় মটকে দেবে।

আমি আর এদিক-ওদিক কোনদিক না দেখে "সীতারাম সীতারাম" বলতে বলতে চলেছি। ওই দেখা যাচ্ছে বালির পাহাড়ের উপরে পঞ্চবটির বন, বনের মাথায় রামসীতা-মন্দিরের চূড়ো। মনে হচ্ছে এই কাছেই, আর-একটু গেলেই পৌঁছে যাব কিন্তু যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন সব দূরে চলে যাচ্ছে—আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমিও দৌড়েছি খোঁড়া পা নিয়ে, দৌড়েছি হাঁপাতে হাঁপাতে, দৌড়েছি উঠি-তো-পড়ি বালির উপর দিয়ে।

এইবার শুনতে পাচ্ছি মন্দিরে খোল করতাল বাজছে; দেখতে পাচ্ছি জাম্বুবানের দল আগুন জ্বালিয়ে গাছতলায় বসে আছে, হনুমানের ল্যাজ বটের ঝুরির মতো পাতার ফাঁকা দিয়ে ঝুলে পড়েছে।

আর ভয় কি? বলে যেমন রামচণ্ডী-তলায় ছুটে যাব আর নাকটা গেল ঠুকে। একি। নাক ঠুক্‌লে কিসে? এই তো সামনে সোজা রাস্তা—গাছের তলা দিয়ে মন্দিরে উঠেছে; তবে নাক ঠোকে কিসে?

নাকে হাত দিয়ে দেখি নাকটা বিলিতি-বেগুনের মতো ফুলে উঠেছে। সাম্‌নে হাতড়ে দেখি, প্রকাণ্ড কাচ, তার ভিতর থেকে ফ্রেমে-বাঁধা ছবির মতো রামচণ্ডীর মন্দির, পঞ্চবটীবন, হনুমানের ল্যাজ সবই দেখা যাচ্ছে; কেবল তার ভিতরে যাওয়া যাচ্ছে না। ফড়িংগুলি যেমন লণ্ঠনের চারিদিকে মাথা ঠুকে মরে, আমিও তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি চারিদিকে কেবল নাক ঠুকে ঠুকে। নাকটা বেগুনের মতো গোল হয়ে ফুলে উঠেছিল কাচে লেগে লেগে ক্রমে চেপটা হয়ে গেল, তবু কিন্তু ভিতরে ঢোক্‌বার রাস্তা পেলুম না।

হাঁপিয়ে গেছি বালির উপর বসে পড়েছি, হনুমানের গোটাকতক ছানা, দাঁত বের করে আমাকে দেখে হাসছে। ভারী রাগ হল, রাগে বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। "জয়রাম!" বলে দিইছি এক লাফ সেই কাচের উপরে।

লাফ দিয়েই ভাবলুম—গেছি! হাত পা কেটে, সকল গায়ে কাচ ফুটে রক্তারক্তি হল দেখ্‌ছি! কিন্তু আশ্চর্য! রামনামের গুণে জলের মতো কাচ কেটে একেবারে ভিতরে গিয়ে পড়েছি—হনুমানের জাম্বুবানের দলের মাঝখানে! আর অমনি চারিদিকে রব উঠেছে—জয় রাম! জয় জয় রাম, সীতারাম! সমুদ্দুরের ডাক শুনেছি—জয় জয় রাম; বাতাসে শব্দ শুনেছি—জয় রাম! চারিদিকে জয় রাম সীতারাম।

কেউ আমাকে একটি কথাও বল্লে না, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না! আমি মন্দিরে রামসীতা দর্শন করে একটা কাঁটাবন পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছি। সেখানে দেখি ছটা বেহারা আমার পাল্কি নিয়ে বসে আছে—দেখতে কালো কিচ্‌কিন্দে।

"কে হে বাপু তোমরা আমার পাল্কিটি নিয়ে?"

"বাবুজি, আমরা তোমার পিসির চাকর—কিচ্‌কিন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে, হারুন্দে।"

"আচ্ছা বাপু, চল তো পিসির বাড়ি।"—বলেই আমি পাল্কিতে চেপে বসেছি।

এবার চলেছি আরামে, কোন ভয় নেই; পা ছড়িয়ে বসে, পাল্কির দরজা খুলে মনের আনন্দে চারিদিক দেখতে দেখতে চলেছি। কেমন তালে তালে এবার পাল্কি চলেছে—কালকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি! ঝাঁকুনি নেই, পাল্কি চলেছে—আম্‌কাসুন্দি, জাম্‌কাসুন্দি!—যেন জলের উপর দুলতে দুলতে নেচে চলেছে। পিসির পাল্কি চলেছে—ধর্‌ কাসুন্দে, চল বাসুন্দে, বড়া ঝালুন্দে, খোঁড়া মালুন্দে।

পাল্কির এক দরজা ধরে চলেছে হারুন্দে, আর এক দরজা ধরে চলেছে উড়েদের সর্দ্দার—কালো কিচ্‌কিন্দে।

হারুন্দের মাথায় কালোচুলের উঁচু ঝুঁটি আর কিচ্‌কিন্দের মাথায় পাকাচুলের শণের নুটি। হারুন্দে ফরসা, কিচকিন্দে কালো মীস্—যেন বাংলা কালি! হারুন্দের চুল যেন বালির উপরে মনসা গাছ—খাড়া খাড়া খোঁচা খোঁচা, আর কিচ্‌কিন্দের চুল যেন সমুদ্দুরের সাদা ঢেউ—হাওয়ায় লট্‌পট্‌ করছে। কিচ্‌কিন্দের মাঠটাও দেখছি খানিক সাদা, খানিক কালো—খানিক আলো, খানিক অন্ধকার, একদিকে ধপ্‌ ধপ্‌ করছে শুকনো বালি আর-একদিকে টল্‌মল্‌ করছে কালো জল—নুনে গোলা। মাঠ দিয়ে চলেছি, না, সাদা-কালো মস্ত একখানা সতরঞ্চির উপর দিয়েই চলেছি!

আমার বাঁদিকে বালি—সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করছে খালি; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর—কালো, কাজলের মতো কালো, বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে—ডাঙার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে কিচ্‌কিন্দে—জলের আদি অন্ত কইতে কইতে; আমি চলেছি পাল্কিতে শুয়ে মনে মনে দুজনের দুটো গল্প সাদা একটা শেলেটের উপরে কালো পেনসিল দিয়ে লিখে নিতে নিতে। কিচ্‌কিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে নিতেই ধুয়ে মুছে গেছে, একটুও আর পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের মতো একেবারে শেলেট কেটে বসে গেছে; ধুলেও ওঠে না, মুছলেও যায় না,—বেশ পষ্ট পষ্ট পড়া যাচ্ছে।

নিজাম কাঁদির বিল

জরাসন্ধ

কত আর বয়স তখন! ছ-সাত বছর হবে। তবুও চোখ বুজলে সব চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি।

মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম। অনেকদূর, যশোরের সীমানা ছাড়িয়ে। শুকনোকালে আগাগোড়া হাঁটা পথ, বর্ষাকালে নৌকো। রাত থাকতে বেরোলে একটা গোটা দিন, গোটা রাত, তার পরেও বেলা দুপুর। আমি হবার পরে মার আর যাওয়া হয়নি। দিদিমা বারবার খবর পাঠাচ্ছেন। মা বললেন, "চল, দিদাকে দেখে আসবি। বয়স হয়েছে। কবে চলে যান।" আমি তো ভীষণ খুশী।

পূজার ঠিক পরে! খাল বিল নদী নালা ধানক্ষেত সব জলে ভরতি। আকাশ পরিষ্কার বেরোবার পক্ষে সব চেয়ে ভাল সময়। ঘরের নৌকো, মাঝি নটবর সারা বছরের লোক, অন্য সময়ে ক্ষেত খামারে কাজ করে, বর্ষার দিনে নৌকো চালায়। সঙ্গে রইলেন সেজদা। কোলকাতায় কলেজে পড়েন, লম্বা ছুটিতে বাড়ি এসেছেন।

নটবর মানুষটা একটু নড়বড়ে। হুঁকো নিয়ে বসলে আর উঠতে চায় না। তার ওপর বয়স হয়েছে, চোখেও কম দেখে। বড়দা তাকে বারবার হুঁশিয়ার করে দিলেন, "হাত চালিয়ে যেও, নিজাম কাঁদির বিলটা যাতে সন্ধ্যের আগেই পার হয়ে

যেতে পার।" নটবর ভরসা দিল, "আপনি ভাববেন না কত্তা। সন্ধ্যে হবে কেন? দুপুর নাগাদ বিল পাড়ি দিয়ে ফেলব।"

নিজাম কাঁদির বিলের কথা আমি মার মুখে আগেই শুনেছি। ওখানে নাকি কী সব ভয় আছে। রাতের বেলায় পার হতে গেলে মাঝিদের দিক ভুল হয়ে যায়, সারা রাত ঘুরে বেড়ায়, অনেক সময়ে ওপারে আর পৌঁছতে পারে না। শোনা যায়, এমনি করে কত লোক মারা গেছে! কী যে হয় তাদের কেউ বলতে পারে না। তবে সাহস করে কোন নৌকোই সন্ধার পর বিলের পথ ধরে না।

নটবরের আরেকটা গুণ আছে—বেশ খেতে পারে এবং একটু ভালমন্দ খাবারের দিকে ভীষণ লোভ। একটা বড় খালের ভেতর দিয়ে নৌকো চলছিল। খানিকটা পর পর ভ্যাশাল। দুটো বিশাল লম্বা বাঁশ যেন পা ফাঁক করে পড়ে আছে জলের মধ্যে, তলায় জাল বাঁধা। বাঁশ দুটোর একদিকে একটার সঙ্গে আরেকটা গাঁথা। সেইখানে চাপ দিয়ে মাঝে মাঝে যখন জল থেকে টেনে তুলেছে একজন জেলে, জালের ওপর ছটফট করছে মাছ—রায়েক, সরপুঁটি, পাবদা, শোল, পোনার বাচ্চা, আরও কত কী! দেখে দেখে নটবরের জিভে জল এসে গেল। রান্নার সরঞ্জাম সঙ্গেই আছে। দুপুরের দিকে কোথাও নৌকো বেঁধে তোলা উনুনে দুটো খিচুড়ি ফুটিয়ে নেবেন, এই ছিল মার প্লান। নটবর বলল, "কী রকম বড় বড় রায়েক দেখছেন 'মাঠাইরেন'?" মা বুঝলেন তার মনের কথা। হেসে বললেন, "মাছ কুটবার বঁটি যে আনিনি।" "তাতে কী হয়েছে। দা রয়েছে তো, আমি কুটে দেব। আপনি ভাববেন না।"

এক আনায় এক হালি (চারটা) মোটা রায়েক। মা রাঁধেনও চমৎকার। নটবরের ভোজনটা শুধু গুরু নয়, একটু গুরুতর হয়ে গেল। তার পরেই বালুই-এর ওপর খানিকটা গড়িয়ে নেওয়া। অনেক ডাকাডাকির পর যখন উঠল তখন বেলা আর বেশী নেই। নিজাম কাঁদির বিলে পড়বার আগেই সন্ধ্যা পেরিয়ে বেশ কিছুটা রাত হয়ে গেল।

যে খালটা এসে বিলে পড়েছে তার ঠিক মোহনার পাশেই একখানা বাড়ি। নৌকোর শব্দ পেয়ে সেখান থেকে একজন দরাজ গলায় হাঁক দিল, "নাও কোথায় যাবে?"

"শুকচর"—সাড়া দিল নটবর।

"শুকচর!"—গলা শুনে মনে হল লোকটি অবাক হয়ে গেছে। তামাক টানতে টানতে এগিয়ে এল,—"নাও ভিড়াও।"

শুকচরে কোন্ বাড়ি যাবে জিজ্ঞেস করতেই বেরিয়ে গেল এরা মামাদের খুব অনুগত লোক। আমাদের না নামিয়ে ছাড়বে না। তাছাড়া এই রাত্তিরে বিল পাড়ি দেবার তো কথাই ওঠে না। রাতটা তাদের 'কুঁড়ে ঘরে' কাটিয়ে যেতে হবে। জাতে

তারা নমশূদ্র, আমরা বামুন। রেঁধে তো আর খাওয়াতে পারবেন না। মাকে চাট্টি চাল ডাল ফুটিয়ে নিতে হবে। মেয়েরা সব ব্যবস্থা করে দেবে। কত্তা গিন্নী হাত জোড় করে ঘাটে এসে দাঁড়াল। 'না' বললে তারা শুনবে না।

মা মুশকিলে পড়লেন। 'কুঁড়ে ঘরে' কথাটা তারা বাড়িয়ে বলেনি। ছোট্ট একখানা পাটকাঠির বেড়া দেওয়া খড়ের দো-চালা। সামনে খোলা বারান্দা। আর ওদিকে একচালা গোয়াল। তার মধ্যে তিন চারটে গোরু। সামনে এক চিলতে উঠোন। এর মধ্যে কোথায় উঠব আমরা! তবু মাকে নামতে হল। বারান্দায় একটা খেজুরের চাটাই বিছিয়ে দিল তাঁকে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, ঘরের মধ্যে ফিসফিস করে বলছে বৌটি, "চাল যা আছে কুলোবে না। তাড়াতাড়ি কোন বাড়ি থেকে বাটিখানেক ধার করে আনো।"

লোকটি যখন একটা ছোট ধামা নিয়ে বেরিয়ে এল, মা বললেন, "শোনো, অবেলায় খেয়ে আমাদের কারও খিদে নেই। তাছাড়া এত রাত্তিরে রান্না করা অনেক হাঙ্গামা। আমাদের সঙ্গে চিঁড়ে মুড়ি খইটই আছে, তাতেই হয়ে যাবে।"

অনেক বলা কওয়ার পর তাতেই রাজি হল হারান মণ্ডল। কিন্তু শুধু চিঁড়ে মুড়ি খাওয়া যায় নাকি? গোয়ালে দুধেলা গাই ছিল। দুইবার কথা সকালে। কিন্তু মণ্ডলের বৌ তখনই দুইয়ে আনল খানিকটা। উঠোনের কোণে উনুনে মাকে সেটা ফুটিয়ে নিতে হল। কোন বাড়ি থেকে এক ছড়া মত্তমান কলাও জোগাড় করে ফেলল হারান। ফলারটা আমাদের বেশ ভালই জমল। কিন্তু তারপর? সেজদা বললেন, "এখানে থাকা অসম্ভব। ভীষণ মশা আর পচা গন্ধ, বর্ষার জল নেমে গেছে। চারিদিকের দাম জঙ্গল পচতে শুরু করেছে। ঘণ্টাখানেকই টেকা যাচ্ছে না। তার ওপরে সারারাত। তাছাড়া শোয়া যাবে কোথায়? ওদের ঘরদোরের তো ঐ অবস্থা। তিনটি ছেলেপিলে নিয়ে ওদেরই কুলোয় না।"

কিন্তু ওদিকে যে আবার নিজাম কাঁদির বিল! সেজদা কোলকাতার কলেজে পড়া ছেলে। ওসব একেবারে হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, ভয়টা কিসের? এমন চমৎকার চাঁদনী রাত। মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, ঠাণ্ডা বিল। রাত পোয়াবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব।

হারান আর তার বৌ বলতে লাগল, কাজটা ঠিক হবে না। কদিন আগেই নাকি একখানা বিদেশী নৌকো না জেনে ঢুকে পড়েছিল বিলের মধ্যে। অনেক রাত্রে তাদের চীৎকার শুনতে পেয়েছে ওরা। পথ হারিয়ে জানতে চাইছিল কোন্ দিকে যাবে। সেজদা বললেন, চেনে না বলেই জানতে চাইছিল। আমরা ঠিক চিনে যাব।

মার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ছেলের জিদ দেখে চুপ করে গেলেন। নটবর সেজো কত্তাকে যমের মতো ভয় করে। মনে মনে যতই আপত্তি থাক, বাইরে মুখ

খুলল না। আমার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করতে লাগল। ওদিকে আবার কৌতূহলও কম নয়—দেখা যাক কিসের ভয়।

ছই-এর ভেতর মা আর আমি শুয়ে পড়লাম। বাইরে পাটাতনের ওপর সতরঞ্চি বিছিয়ে সেজদাও একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। গভীর বিল! লগি চলবে না। পেছনের গলুইতে বৈঠা হাতে নটবর। যতদূর চোখ যায় জল আর জল। ঢেউগুলি মৃদু তালে ঘা দিচ্ছে নৌকোর তলায়। সেই ধক্ ধক্ শব্দে আপনিই চোখ জুড়িয়ে আসে।

কত রাত জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সেজদার হাঁক ডাকে, ঘুমিয়ে নৌকো চালাচ্ছ! নটবর মিনমিন করে বলল, "আইজ্ঞা না কত্তা, এট্টু ঝিমুনি এয়েছিল।"

ঝিমুনি এসেছিল। চোখে জল দিয়ে নাও।

নটবর চোখে জল দিয়ে জোরে জোরে বৈঠা চালাল। সেজদা একবার এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী করছ!"

নটবর আকাশ থেকে পড়ল—"কেন, কী হল?"

"—নৌকো ঘুরে যায় নি তো?"

"কী যে বলেন কত্তা!" কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল নটবর, ঘুরে আবার গেল কখন? আমি তো সোজা সামনের দিকে চলেছি।

"তা তো চলেছ বুঝলাম। কিন্তু আমরা যখন বেরোই চাঁদটা ছিল বাঁদিকে। এতক্ষণে ডানদিকে চলে যাবার কথা। বাঁদিকে রইল কী করে?"

"তা আমি কেমন করে বলব? চাঁদ কোথায় যাবে না যাবে, আমি কী জানি?"

একটু পরেই ফর্সা হয়ে গেল। ভোরের আলো ফুটে উঠল পূর্ব দিকটায়। সেজদা উঠে ছই ধরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "যা বলেছি তাই। ঐ তো সেই বাড়িটা।"

"কোন্ বাড়ি?"

"ঐ যে কী মণ্ডল, যেখানে আমরা উঠেছিলাম সন্ধ্যের পর।"

মা ছই-এর ভেতর থেকে উঁকি মেরে বললেন—"ওমা, তাইতো।"

লোকজনের আওয়াজ পেয়ে হারান মণ্ডল বেরিয়ে পড়েছিল। নৌকো চিনতে পেরে ছুটে এল ঘাটের ধারে। সেজদার দিকে চেয়ে বলল, "খুব বেঁচে গ্যাছেন, কত্তা। বেরাম্মন বলে তেনারা কোন ক্ষতি করতে পারেন নি। তা না হলে—"

বাকিটা মনে করেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চোখ বুজে দু'হাত কপালে ঠেকাল।

চাঙরীপোতার চণ্ডীভূত

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

রাত তখন আটটা হবে—

আসরটা খুব জমাট। বৃষ্টিও ঝেঁকে এলো। শচীন হাত তুলে চেঁচিয়ে বললে—"এই সব! শোন আমার কথা। এটা সত্যিকারের ভূতের গল্প। ভূতটাকে একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা—"

ফণী বল্‌লে—"তোর চোখে তো মাইনাস আট পাওয়ারের চশমা। তুই যতটা দেখিস তার চেয়ে দশগুণ করিস্ কল্পনা।"

পূর্ণ গল্প ভালবাসে, বললে—"আহা! শোনই না। সবটাই কি আর মিছে কথা হবে?"

শচীনের মুখ লাল হয়ে উঠল; বললে—"মিছে কথা বলতে ওস্তাদ তুমি। ওতে যদি কোন প্রাইজ থাক্‌ত তাহলে তুমি পেতে প্রথম পুরস্কার; এবং ঐ সঙ্গে একটা এক্সট্রা মেডেলও। আমি যা বলছি, এর শতকরা একশ' ভাগই সত্যি—"

বরদা বললে—"চট কেন? আমরা কেউ কিছু তো বলছি না। তবে ভূত-টুথ—!'

শচীন হাত নেড়ে বললে—"বলছি তো একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা—"

—"ভূত?"

—"হ্যাঁ। রিয়াল গোস্‌ট ! আমাদের বাড়িতে সেই যে চাঙড়ীপোতার চণ্ডী আসত, দেখেছ তো? সেই যে কালো রোগা, ঢ্যাঙা, চোখ দুটো বড়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ডান পা-খানা একটু ছোট বলে নেঙচে চল্‌ত—"

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"হাঁ—হাঁ—সেই—সেই—যে খুব কাঁঠাল খেতে পারত?"

"—ধ্যেৎ! কাঁঠালের সময় সে কোনদিন আসেইনি। আস্‌তো পৌষমাসে—"

পূর্ণ খাটো গলায় বল্‌লে—"পিঠে খেতে।"

কিন্তু স্বর খাটো হলেও তার হুলটুকু গিয়ে বিঁধল শচীনের মনে। সে কট্‌মট্ করে পূর্ণর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"ও খুব মাছ ধরতে ভালবাসত। গ্রীষ্মের পর একটু বর্ষা পড়লেই চারের পোঁটলা আর ছিপ হাতে চণ্ডী সেই কোথায় তিন ক্রোশ

দূরে ষষ্ঠীডাঙার ঘোষেদের পুকুরে, সাত মাইল দূরে কুমীরখালীর জোড়াদিঘীতে, দু'ক্রোশ বাবুহাটির বিলে, তার এধারে শঙ্খপুরের ঝিলে—”

পূর্ণ বললে—“চাঙড়ীপোতার ঝোপে, বারুইপুরের জঙ্গলে—”

শচীন তাতে কান না দিয়ে বলে উঠল—“মাছ ধরতে যেতো। ওর সঙ্গে মাছের কেমন একটা যোগ ছিল। যেখানেই যাক, যে দিনই ধরুক, ওর হাতে মাছ উঠতই। আমরা যে পুকুরে চার দিয়ে দিয়ে ছিপ ফেলে তিন দিন বৃথা বসে থাকব একটা মাছও বঁড়শি টানবে না, ও সেখানে মাত্র এক ঘণ্টা বসেই হয়তো দশ সের এক রুই, কি পনেরো সের এক কাৎলা তুলে ফেলত। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার!”

পূর্ণ বললে—“এই থেকে প্রমাণ করা যায়, ও গত জন্মে বেড়াল বা ভোঁদড় ছিল—”

নারান ডাক্তারী পড়ছে; সে জন্যে তার ধারণা প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। সে বললে—“সীল, শ্বেত-ভাল্লুকও হতে পারে। আবার কুকুর হওয়াও অসম্ভব নয়।”

পূর্ণ ও নারাণের দিকে শচীন একবার ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে,—“তা সেবারও গ্রীষ্মের পর রীতিমতো বর্ষা এলো। জলাগুলি উঠল জলে ভরে, মাঠে মাঠে ঘাস উঠলো গজিয়ে, ঝোপ-জঙ্গল ঘন হল, গাছ-পালা হল শ্যামল, সতেজ। আকাশে সারা দিনরাতই মেঘের মেলা। সেই সঙ্গে চণ্ডীটাও উঠল ক্ষেপে। রাঙা পিঁপড়ের বাসা ভেঙ্গে, বোলতার চাক পেড়ে মেদি গুঁড়িয়ে সুজি ভেজে সে শিকারের আয়োজন করতে লাগল। ঘরের চালের বাতায় ছিপ, কাঠের বাক্সে হুইল, সুতো আর ছটা বঁড়শি ছিল। সেসব পেড়ে বার করে ঘোষেদের একটা রাজহাঁসের পালক ছিঁড়ে তাই দিয়ে ফাৎনা তৈরী করে চায়ের মোড়কের রাংতা গলিয়ে তার ভার লাগিয়ে তিন দিনে তৈরী হয়ে নিল। কিন্তু কোথায় যে মাছ ধরতে যাবে তা কারুকে বললে না।”

“সেদিন ভরা অমাবস্যা। সকাল থেকেই আকাশভরা কালো মেঘ। মাঠের শেষে দূরে তাল-নারকোলের শ্রেণী। সেগুলিও কালো দেখাচ্ছে। মাঠখানাকেও লাগছে কালো মতো, বাতাসও বইছে ভিজে, এলোমেলো। ভোরের দিকে তো এক পশ্‌লা বৃষ্টিই হয়ে গেল। চাঙড়ীপোতায় আমার মামার বাড়ি। কলকাতা থেকে সেখানে আম খেতে গিয়ে দেখি, মামাদের বাগান ফাঁকা। আম তো ফলেই নি, যে ক'টা ফল ছিল সেগুলিও বাঁদরে খেয়ে গেছে, তবুও সকালে উঠেই আঁকশি হাতে বেরিয়ে পড়লাম।”

“বাগানের পাশ দিয়ে মাঠে যাবার পথ। গাছের তলায় তলায় বৃথা ঘুরে,
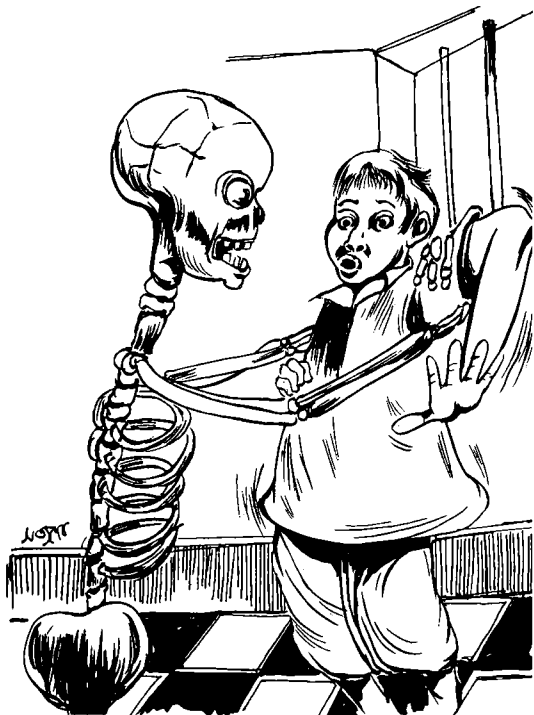
বাগান থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি চণ্ডী। তার এক হাতে ছিপ, আর এক হাতে গামছার পোঁটলা করে বাঁধা চার, টোপ, বগলে বাঁশের বাঁটওয়ালা ছাতা, গায়ে আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের কালো জুতো। আমাকে দেখেই সে একগাল হেসে বললে—'শচীদা! সকালে উঠেই গাছ ঠেঙাতে বেরিয়েছ'?''

''চণ্ডীটা আমাকে বরাবরই বড় ভক্তি করত। আমি ওর ঠিক আড়াই বছরের ছোট।''

নারাণ বললে—"হাঁ। তার ঐ কথাগুলি ভক্তেরই উপযুক্ত বটে।"

পূর্ণ বললে—"এবার আমি কিন্তু কিছু বলিনি—"

বরদা বললে— "আহা-হা! বাধা দাও কেন? তারপর বল—"

শচীন বললে—"তার উত্তরে বললাম—আমি তো ভোরে উঠেই গাছ ঠেঙাচ্ছি, তুই-ই বা কেন এখনই ছিপ হাতে বেরিয়েছিস্? কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

"সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাত তুলে বললে—'সেই পোড়ো দীঘিতে'।"

"কথাটা শুনেই চম্‌কে উঠলাম। বললাম—বলিস কিরে। সে যে ভূতের আড্ডা। ওখানে কত লোকে যে অপঘাতে মরেছে তার হিসেব নেই! আজ পর্যন্ত ও পুকুরে কেউ—ফিরে যা ফিরে যা—"

"চণ্ডী হেসে বললে—'ভূত বলে কিছু নেই শচীদা! একেবারেই কিছুই নেই। তুমি দেখো, আমি নির্বিঘ্নে ফিরে আসব, খালি হাতে নয়, অন্ততঃ দশ সের ওজনের দু'টো রুই ঝুলিয়ে। এই ব'লে রাখছি, সকলের প্রথমেই যে মাছটা ধরব, সেটা তোমার'।"

"বললাম—না রে চণ্ডী, এমন কাজও করিস্ না। ওখানে কি মানুষ যায়?"

"চণ্ডী অবশ্য শুনলে না; একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলে গেল। আমি তার বিলীয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল, ছোঁড়াটা পাগল হয়ে গেছে! 'পোড়ো দীঘিটার' এক ক্রোশের মধ্যে কোন মানুষ যেতে সাহস করে না। কোন গরুও সেদিকে ঘাস খেতে যায় না; এমন কি, রাতের বেলা শেয়াল-কুকুরও সেদিক থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে আসে। কেবল চামচিকে, বাদুড় আর পেঁচারাই সেখানে রাত কাটায়। আর ও কিনা সেখানে মাছ ধরতে যাবে!'

ফণী বললে—"কেন?"

—"এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব? দীঘিটা যে কত কালের এর হিসেব ও অঞ্চলের কোন জমিদারের সেরেস্তায় নেই! কেউ বলে আলাউদ্দিন খিলজির সময়ের, কেউ বলে আকবর বাদশার আমলের, আবার কেউ বলে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ছিল তখনকার। ওখানে নাকি এক সাহেব থাকত। কিন্তু আমার দাদামশায় বলেন, 'ওটার বয়স মাত্র একশ' দশ বছর। ওখানে রতনা ডাকাতের আড্ডা ছিল'!"

"রতনা ছিল আবার তাঁর দাদামশায়ের স্যাঙাৎ। ডাকাতি করত রতনা, কিন্তু তাতে ভাগ বসাতেন আমার দাদামশায়ের দাদামশায়। সে পয়সায় তিনি জমিদারী কিনেছিলেন। তবে সে জমিদারী, আর জমিদার-বাড়ি এখন নেই। কেবল

দাদামশাইয়ের ঘরে একটা পেল্লাই কাঠের সিন্দুক, একখানা মরচে ধরা ভোজালি, আর একখানা পোকায় কাটা জামিয়ার পড়ে আছে। যাক— নিজেদের ঘরের কথা না বলাই ভাল।"

"রতনা পথিকদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের গলায় পাথর বেঁধে ঐ দীঘিটাতে ডুবিয়ে মারত।"

দ্বিজেন বললে—"এত পাথর সে পেত কোথায়? চাঙড়ীপোতা তো পাথুরে জায়গা নয়।"

বরদা বললে—"আরে বাপু! গল্পটা শোনই না।"

শচীন বললে—"একবার এক বুড়ী আর তার ছেলেকে রতনা তো ধরে নিয়ে এল। তাদের সঙ্গে ছিল খান দুই সোনার গয়না, গোটা দশেক টাকা। বুড়ীর ছেলেটা ছিল বেশ ষণ্ডা গোছের। রতনার লোকের সঙ্গে তার বেশ একটু হাতাহাতি হল। ফলে, রতনার লোকটার নাকটা একদম মুখের ওপরে গেল বসে। রতনা এই অপমান আর ক্ষতির শোধ নেবার জন্যে বুড়ীর চোখের সামনে ছেলেটাকে দীঘিতে ডুবিয়ে মারল।"

"বুড়ী তখন আকাশের দিকে হাত তুলে চীৎকার করে বললে—'রতনা; যদি ভগবান থাকে, তুই-ও একদিন দম আটকে মরবি। তোর সদ্গতি কোন কালেই হবে না-'!"

"দাদামশাই বলেন, তাঁর দাদামশাই নাকি বলেছিলেন, বুড়ীর শাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। রতনা একদিন ঐ দীঘির ধারে দালানটার মধ্যে দম আটকে মরে। কি করে, তা আর বলেননি। সেই থেকে নাকি রতনা ওখানে ভূত হয়ে আছে। চামচিকে, বাদুড় আর পেঁচা ছাড়া রাতের বেলা যে ওদিকে যায়, রতনা তারই গলা টিপে মারে। বেঁচে থাকতে বেটার যে অভ্যাস ছিল, মরবার পরেও সে স্বভাব ঘুচল না! ঐ যে কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'—এ তারই ভৌতিক প্রমাণ। যাক্।"

"দাদামশাই তখন ছোট। একবার দীঘিটার ধারে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্যাঙাতের নাতি বলে রতনা তাঁকে কিছু বলেনি। তবে দাদামশাইকে স্বপ্ন দেখিয়ে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল—'ওদিকে আর কখনও মাড়াস নি!'

"সত্যি কথা বলতে কি দাদামশায়ের শেষের কাহিনী আমি বিশ্বাস করিনি। কেননা তিনি ডেলা ডেলা আফিং খান!"

"চণ্ডীটার জন্যে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। কি যে করা যায়, ভাবতে ভাবতে তার দাদার কাছে গিয়ে খবরটা জানালাম। শুনেই তিনি জ্বলে

উঠলেন, বললেন—'ভূতের কিল খেয়ে আজ ওর শিক্ষা হোক। আমরা তো কিছুতেই ওকে সায়েস্তা করতে পারলাম না'।"

"বললাম—ভূষন্ডীদা, শিক্ষা তো পরে; তার আগে যে প্রাণহানির—"

"ভূষন্ডীদা জিভ দিয়ে তালুতে চক্ শব্দ করে বললেন—'চন্ডের প্রাণ নেবে ভূতে? এমন বাহাদুর ভূত আজও প্রেতলোকে জন্মায়নি—"

"এর উপর আর কি বলব? বাড়ি এসে চুপ করে বসলাম—" বলে শচীন থামল।

বাইরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দূরে কোন্ অট্টালিকার মাথায় যেন বাজ পড়ল। বৃষ্টি ও বাতাস মেতে উঠেছে। শার্সিগুলির গায়ে এসে দুটোতেই মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"তারপর—তারপর?"

শচীন বললে—"চন্ডী তো চলেছে—"

পূর্ণ বললে—"তুমি কি করে জানলে?"

শচীন হাত নেড়ে ভ্রূ কুঁচকে বললে—"আরে, এটা তো আস্ত 'ইডিয়ট' দেখছি। চন্ডী যে তখন চলেছে, এ কথা কে না জানে?"

সকলে বলে উঠল—"ঠিক ঠিক। বলে যাও, বলে যাও—"

"চন্ডী আলের ওপর দিয়ে চলেছে। তার দুধারে শস্যশূন্য ভিজে ক্ষেত। চাষীরা কোন কোন ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছে। ক্ষেতের এখানে সেখানে একটি দুটি তালগাছ। বিশ্বনাথের মন্তরভরা মাদুলির মতো তাদের মাথায় জটার মধ্যে একটি করে কলসী বাঁধা। ক্ষেতের শেষ প্রান্তে গ্রাম। কালো মেঘের গাঢ় ছায়ায় সেগুলি ঝাপসা হয়ে আকাশের তলে মিশে আছে। চাণ্ডড়ীপোতা থেকে 'পোড়া দিঘী' পুরো আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে, আর সেখান থেকে সয়লা গাঁয়ের নদীটি এক ক্রোশ দূরে। চন্ডী মাঠ ভেঙে দীঘিটার কাছে গিয়ে যখন পৌছল তখন বেলা ন'টা হবে।"

"দীঘির চারধারে ঝোপ-ঝাড়। তার মাঝে মাঝে তাল, নারকেল আর কয়েকটা আম-কাঁঠালের গাছ। চন্ডী শুনেছিল, সেখানে একটা বাড়ি আছে। কিন্তু কই—কিছুই তো—ঐ যে একটা দালান! চন্ডী সেখান থেকে লক্ষ্য করে দেখতে লাগল। দালানটার ছাদ ভেঙে পড়েছে, একধারে দেয়াল ধসে খান কয়েব কড়িকাঠ বেরিয়ে আছে। ছাদের ভাঙা আলসেয় কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ, নীচে চারধারে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। তার মাঝ থেকে কি একটা লতা যেন ওপর দিকে উঠে দালানটার এক দিকে ঢেকে রেখেছে। দালানটার দিকে তাকিয়েই চন্ডীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কিন্তু দিনের বেলায় কিসের ভয়?"

"সে জঙ্গল ঠেলে দীঘিটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। জঙ্গলের জলে যে তার কাপড়-জামা ভিজে গেছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। তার সামনে প্রকান্ড দীঘি। তার প্রায় অর্ধেকটা পদ্মবন, বাকীটুকু কলমী হেলেঞ্চা ও পানায় ভরা। হঠাৎ একটা বড় মাছ ঘাই দিয়ে উঠল। সেই সময় চন্ডী দেখলে, দীঘটার জলের রঙ একটু লাল। কিছু দূরে এক জোড়া বক বসেছিল। চন্ডীর সাড়া পেয়ে তারা মোটা গলায় বকর বকর ডেকে সেখান থেকে উড়ে গিয়ে ওপারে শেওড়াগাছটার মাথায় বসল। ফণী বলে উঠল, "এই যে বললে, সেখানে যে যায় রতনা তারই গলা টিপে মারে?"

শচীন বললে—"তোর শরীরটা যেমন মোটা, বুদ্ধিটাও তেমনিই ভোঁতা। কাক-চিল-বক অর্থাৎ কোনরকম খেচরকেই মারে এমন সাধ্য ভূতের বাপেরও নেই।"

ক্ষিতীশ রোগা মানুষ; এতক্ষণ চুপ করে শুয়েছিল। পা দুখানা দোলাতে দোলাতে বললে—"এরোপ্লেনও খেচর। তাকেও—"

শচীন বলল—"চুপ কর্ উইচিংড়ি! তোকে আর চিড়িং চিড়িং করতে হবে না। বেশ, তোমাদের যদি শুনতে ইচ্ছে না হয়, আমি আর-"

সকলে বলে উঠল—"বল—বল। চন্ডী তার পরে কি করলে?"

—"চন্ডী দীঘির ধারে একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে তার ছাতা, ছিপ আর পোঁটলাটা সেখানে রাখল। তারপর পোঁটলাটার ভেতর থেকে ছোট কাটারিখানা বার করে খানিকটা জায়গায় জঙ্গল কেটে জল থেকে কলমী, হেলেঞ্চা ছিঁড়ে পরিষ্কার করে, চার ফেলে, টোপ গেঁথে বঁড়শীটা হাতে দুলিয়ে জলে ফেলবার সময় একবার বাড়িটার দিকে তাকাল। তার মনে হল, ডান দিকের ঘরখানার মধ্যে কে যেন সাদা কাপড় পড়ে দাঁড়িয়ে আছে; আর তার চোখ জোড়া আগুনের ফুলকির মতো জ্বলছে। দেখে চন্ডীর বুকটা একটু কেঁপে উঠল। তবুও সে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল—সত্যি সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। মিনিটখানেকপরে লক্ষ্য করে আর কিছুই দেখতে পেল না। ওটা মনের ভুল ভেবে চন্ডী ছিপ ফেলে খান কয়েক কচু আর ভাটপাতা বিছিয়ে তার ওপর বসল।"

"চণ্ডী তো ছিপের বাঁটটা পা দিয়ে চেপে চুপ করে বসে আছে।"

"চার ধারে নিস্তব্ধ নির্জন। ভিজে মাটি, পচা ডালপালার গন্ধ নাকে লাগছে। কচুবনে মশার ঝাঁক করছে—'পোঁ, পোঁ। দীঘির ওপারে একটা তালগাছের মাথায় বসে একটা দাঁড়কাক থেকে থেকে ডেকে উঠছে—'আহা-কাহা; আহা—কাহা;। মাঝ দীঘিতে একটা মাছ ঘাই দিয়ে উঠল; পদ্মবনের আড়ালে একটা ভীড়ভীড়ে পাখি শিষ দিল টিটির্‌র্‌র—চিট্।"

"চণ্ডীর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এমন নিস্তব্ধতা সে আগেও অনেক দিন অনুভব করেছে। কিন্তু আজকের স্তব্ধতাকে বোধ হতে লাগল—যেন পাষাণের মতো বিষম ভারী। কিছুতেই এটা নাড়ানো বা সরানো যাবে না। ক্রমেই যেন তা তার বুকের ওপর চেপে বসছে। বাতাস স্থির; আকাশে মেঘভার স্থির হয়ে আছে; একটি ছোট পাতা পর্যন্ত নড়ছে না, জলও শান্ত। কেবল একটা মোটা খড়কের মতো হলদে ফড়িং আধডোবা ফাৎনাটার ওপর বার বার উড়ে বসছে।"

"চণ্ডী আন্দাজে ঠিক করলে, বেলা তখন বারোটা। সে প্রায় তিন ঘণ্টা ছিপ ফেলে বসে আছে। অথচ একটা মাছও—মনের ভাবনাটা শেষ না হতেই সে জলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল।"

"জলের মাঝ থেকে পানা ঠেলে ভেসে উঠেছে ওটা কি? জিনিসটার রঙ কালো; দেখতে কতকটা পোড়া কাঠের মতো। সেটা তার দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দেখে চন্ডীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। সে এত কাল মাছ ধরছে, এমন তো কখনো হয় নি। সে নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়িয়ে জিনিসটাকে ভার করে লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু সেটা একেবারে কূলের কাছে এলো না, মাত্র কিছুদূর এসে হঠাৎ পদ্মবনের দিকে ঘুরে গেল। ঐ যে পিঠের কাঁটা, ঐ যে লেজ ও হাতীর কানের মতো কানকো নড়ছে। ওটা রুই মাছ! এত বড় রুই মাছ! চন্ডী বিস্ময়ে আনন্দে দু'পা এগিয়ে যেতেই দেখল তার ফাৎনা একটু নড়ে উঠল। সে চট্ করে এগিয়ে যেতেই দেখল, মাছটা কোথায়? কিন্তু সেটাকে আর দেখতে পেল না, ভাবলে ঐ মাছটাই কি ঘুরে এসে তার বঁড়শি টানছে?"

"ফাৎনাটা ক্রমেই জোরে ডুবছে-ভাসছে। চন্ডী সে দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে, ছিপটা দুহাতে শক্ত করে ধ'রে কাঠ হ'য়ে বসে আছে। তার বাঁ গালে, ডান কানে যে দুটো কালো রঙের মশা বসে রক্ত চুষতে চুষতে ফুলে উঠেছে, দীঘিপাড়ে তালবনের মাথায় মেঘে মেঘে অন্ধকার করে এসেছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই—"

ক্ষিতিশ মুচকি হেসে বললে—"সে এক মনে ফাৎনা দোলা দেখছে—"

শচীন এতক্ষণ তার দিকে মুখ করে গল্প বলছিল; এবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—'এটা দেখছি পূর্ণর স্যাঙাৎ—"

পূর্ণও তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র একটি দংশন করলে; মিহি গলায় বললে—"যেমন তোর দাদামশায়ের ছিল রতনা স্যাঙ্যাৎ—"

শচীনের সারা গা যেন জ্বালা করতে লাগল। সে চোখ-মুখ রাঙা করে বললে—"তার মানে?"

বরদা বললে—"আহা! কি ছেলেমানুষী করছ? হাঁ-হাঁ খেয়ালই নেই চন্ডীর বল—"

"এরকম করলে বলা অসম্ভব। যদি শুনতে চাও, কেউ একটি কথাও কইতে পারে না।"

"বেশ এই আমরা মুখে চাবি দিলাম।"

তবুও শচীন একটু চুপ করে রইল; তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলে—"ফাৎনা তো ডুবছে-ভাসছে। শেষে যেই একবার তল হল, চণ্ডীও মারলে সজোরে টান। সঙ্গে সঙ্গে 'কর্‌র্‌র্' শব্দে হুইলের সুতো খুলে নিয়ে মাঝ দীঘিতে মাছ ছুটে গেল। আর সেই মুহূর্তেই একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে তালবনের ওপর থেকে সোঁ সোঁ শব্দে বৃষ্টি এল ছুটে। দেখতে দেখতে বৃষ্টিধারায় সব মুছে গেল। ওদিকে মাছও ছুটছে।—একবার ডানধারে, একবার বাঁ ধারে, কখনো-কখনো সোজা মাঝ দীঘিতে। ছিপের মাথা বেঁকে বঁড়শীর মতো হয়ে গেছে। মাছটা থেকে থেকে পদ্মবনে সেঁধবার চেষ্টা করছে। চণ্ডীরও জেদ তাকে কূলের কাছে আনবেই। এক একবার তার মনে হয়, বুঝি ছিপখানা ভেঙে গেল।"

"এই টানাটানিতে প্রায় ঘণ্টা চারেক কেটে গেল। এর মধ্যে বৃষ্টি একবার থামেনি বরং ঝেঁকে এসেছে। চণ্ডীর অবস্থা তখন—"

—"ভিজে বেড়ালের মতো—"

কিন্তু টিপ্পনীটা যে কে কাটলে, শচীন তা ধরতে পারলে না। সকলেরই মুখ গম্ভীর। তবুও তার সন্দেহ হতে লাগল এ পূর্ণ কিংবা ক্ষিতীশের কাজ। যাই হোক, না থেমে সে বলে চললে, "একে মাছের সঙ্গে টানাটানি করে সে ক্লান্ত, তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি, আর সেই রকম ভুতুড়ে জায়গা। সে মাঝে মাঝে ম্রিয়মান হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু মাছটার লেজ বা পিঠের কাঁটা যেই ভেসে উঠতে দেখে তৎক্ষণাৎ সে শরীরে বল, মনে স্ফূর্তি পায়। এমনই করে বেলা যখন যায় যায় তখন সে যা আশা করেছিল, মাছটা তার কিছুই না। একটা সাড়ে পনের সের ওজনের কাৎলা মাত্র। তার প্রকান্ড মাথা, মস্ত মুখ দেখে মনে হতে লাগলো, যেন একটা রাক্ষসের বাচ্চা।—"বলে শচীন চুপ করলে। বাইরে তখনও ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়ছে।

তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলে—"ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে চণ্ডী এতক্ষণ দেখেনি, ওপারে দীঘির ডান কোণে একটি সরু নালা ছিল। সেটা দিয়ে হু হু শব্দে মাঠের জল এসে দীঘিতে পড়ছে। তাতে দীঘিটা ভরে উঠছে। চণ্ডী ছিপ গুটিয়ে বাকি টোপ আর চারগুলি দীঘিতে ফেলে, মাছটাকে গামছায় বেঁধে বহু কষ্টে দীঘির পাড়ে উঠেই দেখে, চারধারের মাঠ জলে ডুবে গেছে। কিছুদূরে যে জঙ্গলটা ছিল সেটাও আর দেখা যায় না। চণ্ডীর বুক কেঁপে উঠল। সর্বনাশ!

সয়লা নদীতে বান এসেছে নাকি! ছেলেবেলায় আমি আর চন্ডী একবার সয়লা নদীর বান দেখেছিলাম। সেবার চাণ্ডড়ীপোতার অবস্থা হয়েছিল একটা প্রবালদ্বীপের মতো। সে স্মৃতি চন্ডীকে বিচলিত করল। এই জলস্রোত ঠেলে আড়াই ক্রোশ যাওয়া একেবারে অসম্ভব। হয়ত পথের মাঝে মাঝে জল আরও বাড়বে। সে যে কি করবে ঠিক করতে পারল না। সেই সময় একবার ভয়ঙ্কর শব্দ করে দূরে একটা তালগাছের মাথায় বাজ পড়ল।"

"শব্দ আর আলোর ঝোঁকটা কাটিয়ে সে একবার পোড়ো বাড়িটার দিকে তাকাতেই দেখল, তার বারান্দার সামনে ঘরখানার দরজায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রথমটা সে ভাবলে মনের ভুল। তারপর আবার সেদিকে তাকাতেই দেখলে, সত্যিই একটা লোক । ঐ যে হাতছানি দিতে দিতে ঘরের ভেতর দিকে চলে গেল। তবে কি এখানে লোক বাস করে? ভূতের গল্পটা একদম বাজে? সম্ভবতঃ লোকটা তার দুর্দশা দেখে, তাকে আশ্রয় দিতে চাইছে। কিন্তু লোকটার স্বভাব ভাল তো? যদি ডাকাত হয়? অবশ্য ডাকাত হলেও তার তখন কিছু করবার ছিল না। তার কাছে মাছটি ছাড়া মূল্যবান আর কিছুই নেই। সে আর দেরী না করে বাঁ হাতে মাছ , ডান হাতে দা, বগলে ছিপ আর কাঁধে মাথা হেলিয়ে দিয়ে ছাতাটা চেপে ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িটার দিকে এগোতে লাগল।"

"জঙ্গল ঠেলে মিনিট পাঁচেক চলে ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে চন্ডী উঠোনে গিয়ে পড়ল, সামনেই বারান্দা আর সেই ঘরখানা। কিন্তু কই কাউকে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে না। বারান্দায় উঠবার সিঁড়িগুলি ভেঙে পড়েছে। বারান্দায় জঙ্গল। এ রকম জায়গায় কি করে মানুষ থাকে? এবার তার মনে একটু ভয় হল; ততক্ষণে আর একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি বাতাস যেন আরও মেতে উঠেছে। সে আর না এগিয়ে সেখান থেকে চীৎকার করে ডাকলো—'কে আছেন? ভেতরে আছেন কে'?"

"চণ্ডীর মনে হয়, ভেতর থেকে যেন উত্তর এলো—'চলে আসুন'!"

"চণ্ডী তৎক্ষণাৎ ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে ওপরে উঠে বারান্দা পার হয়ে ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বললে,—'আমি এসেছি'।"

—"চণ্ডীর মনে হল, তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রেখা যেন এধার থেকে ওধারে সরে গেল আর ঘরের মধ্যে কে যেন কাকে ফিস্ ফিস্ করে কি বলছে।"

"চণ্ডী আবার বললে—কে আছেন মশায়? কে আছেন?"

"সামনে অন্ধকার ঘর, বাইরেও অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে সজল বাতাসের হাহাকার, চণ্ডীর মন যেন কেমন হয়ে গেল। যে ডাকছে সে তো কই এগিয়ে আসছে না; ভেতরে কোথাও একটু আলোও ত দেখা যায় না। সে আবার বললে—মশায়, বড় অন্ধকার একটা আলো।"

"ভেতর থেকে উত্তর এলো—এগিয়ে আসুন।"

"চণ্ডী সাহসে ভর করে চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের মধ্যে হাত কয়েক এগিয়ে যেতেই তার মনে হল কারা যেন অন্ধকারের মধ্যে খিল খিল করে হেসে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে চণ্ডীর পায়ের নীচে মেঝেটা একেবারে হাত পাঁচ-ছয় গেল বসে। চণ্ডীও সেই সঙ্গে গর্তটার মধ্যে পড়ে গেল, এমন আচম্বিতে দুর্ঘটনার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবুও তৎক্ষণাৎ উঠবার চেষ্টা করতেই সে দেখল, একটা কঙ্কাল তাকে দুহাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরেছে। দেখেই চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।"

ফণী বললে—"নিশ্চয়ই 'মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল?"

শচীন বললে—"চণ্ডীর মা নেই। ইয়ারকি রেখে শোন্। তারপর সন্ধ্যা হতেই আমরা তো ভেবে অস্থির। কিন্তু তখন চণ্ডীর সন্ধানে সেই ভূতুড়ে বাড়ির দিকে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। জলটা আবার বাড়ছে। তবুও সকলে আশা করতে লাগলাম, চণ্ডী এলো বলে। কিন্তু ক্রমে রাত বেশি হতে লাগল, তবুও চণ্ডীর দেখা নেই। শেষ রাত যখন বারোটা, জলটা তখন একদম ধরে এলো, কিন্তু বাতাস শান্ত হল না। সে চারধার থেকে বন্যার কল্লোল বয়ে পাগলের মতো গ্রামের শূন্য অন্ধকার পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমরা আর কি করব? চণ্ডীদের বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর বসে ভোরের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ক্রমে রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠল। আমরাও চণ্ডীর খোঁজে বার হলাম, সংখ্যায় সতেরো জন।

ক্ষিতীশ আস্তে জিজ্ঞেস করলে—"কিসে?"

শচীন বললে—"ডোঙায়—"

পূর্ণ বললে—"তালগাছ বুঝি কাটাই ছিল?"

শচীন বললে, "সকলেই তোর মতো মিছে কথা বলে না। চাঙড়ীপোতার ব্যাপার তুই কি জানবি? থাকিস তো বদ্যিবাটিতে। তোরা শোন্। চারধারে জল—যতদূর দেখা যায়—জল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তার ওপর দিয়ে টর্পেডো-বোটের মতো আমাদের সতেরো খানা ডোঙা চলেছে। বললে বড়াই করা হবে, সেই সার্চপার্টির ক্যাপটেন ছিলাম আমিই।"

বরদা লাঠি খেলে ঃ বললে—"সাবাস!"

"আমি জানতাম, কোথায় চন্ডীর খোঁজ পাওয়া যাবে। তাই সকলকে সেই দীঘির দিকে নিয়ে যেতে লাগলাম। স্রোত ঠেলে জল কেটে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু রোদ বেরিয়েছে। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার, কিন্তু সেখানকার দৃশ্য দেখে আমার বুক দমে গেল। এর মধ্যে চণ্ডীকে পাব কোথায়? মনের ভাব গোপন করে সকলকে বললাম—'ঐ বাড়িটার ভেতর চণ্ডীর খোঁজ করা যাক্ চল'—"

হরি চক্কোত্তিটা চিরকালের ফাজিল; বললে 'চন্ডে ওখানে এতক্ষণ বসে আছে! সে আর কোথাও গেছে! আপনার যেমন কথা!'

"বলা বাহুল্য তাকে তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে থামিয়ে সকলকে নিয়ে বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে পাঁচিলের কাছে গিয়ে হাঁক দিলাম—'চণ্ডী আছ? চণ্ডী'?"

"চণ্ডীর দাদা ছিলেন, আমার পিছনে। বললেন— একটা গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে—না? ঐ শোন-ঐ।"

"সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম। হ্যাঁ—ঐ যে মনে হচ্ছে সামনের ঘরখানার মধ্যে কে যেন গোঙাচ্ছে!"

"বললাম—দাদা, চলুন সকলে।"

"আমি রইলাম সকলের আগে। সকলের আগেই উঠোন পার হয়ে বারান্দার কাছে পৌঁছলাম। এবার শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। গোঙানির মাঝে মাঝে কে যেন কথা বললে—না?"

"চণ্ডীর দাদা বললেন—'হ্যাঁ, তাই তো। চন্ডীর গলা মনে হচ্ছে। চণ্ডে চণ্ডে—'। কিন্তু সে ডাকের কেউ সাড়া দিলে না, আওয়াজও থামল না। এতে রহস্যটা আরও ঘোর বলে বোধ হতে লাগল। আমার জেদ চাপল শেষ দেখতেই হবে!"

"আমি ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে, বারান্দাটা পার হয়ে ঘরখানার চৌকাঠের ধারে পৌঁছতেই কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠল—এসো—এসো—বড়—অন্ধকার—ওঃ—ছেড়ে দাও—।"

"চীৎকার করে বললাম—'চণ্ডীরে পাওয়া গেছে—ঐ যে কথা বলছে'।"

"আমার কথা শুনে সকলে পিছনে এসে দাঁড়াল। আমি সোজা ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না, কয়েক পা গিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। দেখি, গর্তের ভেতরে একটা লম্বা কঙ্কালের বুকের ওপর চণ্ডী কাৎ হয়ে পড়ে ভুল বকছে, আর কঙ্কালটা, তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে

আছে। সকলে ইতিমধ্যে এসে গর্তটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। কঙ্কালটার মস্ত মাথা, চক্ষুহীন কোটর, বত্রিশটি দাঁত, বড় চোয়াল— কিন্তু আর বলতে ইচ্ছা হয় না।"

সকলে বলে উঠল—"বল, বল, থেম না—তারপর কি হল?"

শচীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—"সেই কঙ্কালের বুক থেকে বহু কষ্টে চণ্ডীকে উদ্ধার করে নিয়ে আমরা চাঙড়ীপোতায় ফিরে এলাম।"

নারাণ জিজ্ঞাসা করলে—"সেই কাৎলা মাছটা?"

শচীন সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—"আমি সেইদিনই দুপুরে কলকাতায় চলে আসি। রাতের বেলায় তেতলার ঘরে দরজা ভেজিয়ে একা বসে চন্ডীর কথা ভাবছি। জানালার বাইরে নারকেল গাছটা বাতাসে সর্ সর্ করছে। হঠাৎ হুস্ করে দরজাটা খুলে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে চন্ডী। তার হাতে একটা প্রকাণ্ড কাৎলা মাছ। মাছটা তখনও খাবি খাচ্ছে! বুঝলাম চন্ডী আর নেই! আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।" বলে শচীন চুপ করল!

নিস্তব্ধ ঘর; বাইরেও তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল। সকলে সে দিকে তাকিয়েই চীৎকার করে উঠল—"চন্ডী—চন্ডী এসেছে—চন্ডী!"

চন্ডী ঘরে ঢুকেই বললে—"শচীদা, তোমাকে খুঁজতে এখানে—"

শচীন ততক্ষণে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে ফরাস থেকে নীচে নেমে দাঁড়িয়েছিল। চন্ডীকে আর না এগোতে দিয়ে একজোড়া স্যানডাল্ কুড়িয়ে নিয়ে সে চন্ডীকে টানতে টানতে বললে, "শীগগির বেরিয়ে আয়—"

ক্ষিতীশও তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠল—"আরে! আমার এক পাটি স্যানডাল্ নিয়ে গেল। এ যে দুটোই বাঁ পায়ের—"

পূর্ণ বললে—"ব্যস্ত হয়ো না, ও আবার আসবার পথ করে গেল।"

রাস্তা দিয়ে একখানা ছ্যাক্রা গাড়ি যাচ্ছিল। সকলে শুনতে পেল চিৎকার করে বলছে—"এই রোখ। বাগবাজার—হাঁ—হাঁ—"

তারপরেই গাড়োয়ানের গলার ও চাকার আওয়াজ পাওয়া গেল—"টি—টি—গড়্—গড়্—গড়্।"

ডাইনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কে কবে নামকরণ করিয়াছিলেন সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু নামটি আজ পূর্ণ গৌরবে বর্তমান;—ছাতি-ফাটার মাঠে জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মতো মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন কেমন উদাস হয়ে ওঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে! তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নাম-গৌরবে মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ঘন-ধূমাচ্ছন্নতার মতো

ধুলায় একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের সীমারেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সেরূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর শূন্য-লোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। গ্যাকাশে রঙের নরম ধূলরাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এতবড় প্রান্তরটায় এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও খেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোন বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না; কোথাও জল নেই,—গোটা কয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু তাহাতে জল থাকে না।

মাঠখানির চারিদিকেই ছোট ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম; সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহারা বলে কোন্ অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রবিণী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চারমান পতঙ্গপক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরা পাতার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের ঘাসের মধ্যে।

সেই নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ। তাহারই ভাগ্যদোষ ঐ বিষজর্জরতার উপরে আর এক ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে, মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা, অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরণা জাতীয় জলটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী—ভীষণ শক্তিশালিনী নিষ্ঠুর ক্রুর একটা বৃদ্ধ ডাকিনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে, তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে ছাওয়া বারান্দা—সেই বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার অধিক কাজের মধ্যেও সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই-তিনটি বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে বেশী পরিমাণেই দিয়া থাকে। সেরখানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ি ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্ধেক বিক্রি করিয়া দোকান হইতে

একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ি ফিরিয়া আর একবার বাহির হয় শুকনো গোবর ও দুই-চারিটি শুকনো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্ত দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ি সে কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে একথা নাকি নিঃসন্দেহ যে তিন-চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটার মাঠের নির্জনরূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানেই ঘর বাঁধিয়াছে। নির্জনতাই উহারা ভালবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে অনিষ্টস্পৃহা জাগিয়া উঠে। সর্বনাশী লোলুপ শক্তিটা সাপের মতো সকলকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া ওঠে। বহুকালের পুরানো একখানি আয়না— সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজেরই ভয় হয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুইটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মতো একটা ঝকমকে ধার। জরা কুঞ্চিত মুখ, শনের মতো সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানির চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রং, আর কি পালিশই না ছিল, আর তারপরে কাচখানা ছিল রোদচকচকে পুকুরের জলের মতো। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত। ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল—ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নীচেই টিকোলো নাক; চোখ দুইটি ছোটই ছিল— চোখের তারা দুইটিও খয়েরী রঙেরই ছিল—লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত। কিন্তু তাহার বড় ভাল লাগিত, ছোট চোখ দুইটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকালেই মনে হইত, আকাশের কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল—নরু দিয়া চেরা, ছুরির মতো চোখে, বিড়ালীর মতো এই-দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না; তবে হইয়া যায়।

প্রথম দিনের কথা তার মনে পড়িয়া যায়। বুড়া শিবতলার সম্মুখেরও দুর্গাসায়েবের বাঁধাঘাটের ভাঙা রানার উপর সে দাঁড়াইয়া ছিল—জলের তলে তাহার ছবি উল্টা দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া

লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জলস্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মতো দশ এগার বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ বামুনবাড়ির হারু সরকার আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া শান বাঁধানো সিঁড়ির উপর আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর এখনও শুনিতে পায়—হারামজাদী ডাইনী তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এতবড় বাড়? খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।

হারু সরকারের সে ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল—ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল, তবে সে কথা বললি না কেন হারামজাদী?

হ্যাঁ লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা তো জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট বেদনায় ছটফট করছে।

সে আজও অবাক হইয়া যায়—কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়। কিন্তু এ যে সত্য তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই। তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে সে হারু সরকারের বাড়ি গিয়া অঝোরে কাঁদিয়াছিল, আর বার বার মনে মনে বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, ভাল করে দাও, ওকে ভাল করে দাও। কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি এই লইলাম! আশ্চর্যের কথা কিছুক্ষণ পরেই বার দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল ওকে একটা আম আর দুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার পিসি একটা ঝাঁটা তুলিয়া নিল বলিয়াছিল ছাই দেব হারামজাদীর মুখে। মা-বাপ মরা অনাথ মেয়ে বলে দয়া করি—যেদিন হারামজাদী আসে সেই দিনই আমি ওকে খেতে দি। আর ও কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়। আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে দেখ! ওর ঐ চোখের দৃষ্টি দেখে বারবার আমার সন্দেহ ছিল, কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপুলেকে খেতে দিই নি। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি আর কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি দৃষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পলাইয়া গিয়াছিল। সেদিন রাত্রে সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ির দাওয়ায় শুইতে পারে নাই; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়ো শিবতলায়।

অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিতেছিল আর বলিয়াছিল—হে ঠাকুর আমার দৃষ্টিকে ভাল করে দাও না হয় আমাকে কানা করে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির মূর্তির মতো নিস্পন্দ শ্রদ্ধার অবয়বের মধ্যে এত ক্ষীণ একটি চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কি আর সাধ্যই বা কি? বেশ মনে আছে গৃহস্থের বাড়িতে সে আর ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির-দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাইত না, কোন মতে বহু কষ্টে বলিত দুটি ভিক্ষে পাই মা। হরিবোল!

কে রে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবি নে। খবরদার!

না না ঘরে ঢুকব না মা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত এখনও উঠে। কি সুন্দর মাছভাজার গন্ধ আহা—হা! বেশ খুব বড় পাকা-মাছের খানা বোধ হয়।

এই-এই হারামজাদী বেহায়া! উঁকি মারছে দেখ! সাপের মতো।

ছি ছি ছি! সত্যিই সে উঁকি মারিতেছে—রান্নাশালায় সমস্ত আয়োজন তাহার নরুণ-চেরা চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে। মুখের ভিতর জিবের তলা হইতে ঝরণার মতো জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ-বিবর্ণ মাটির মূর্তি যেন কোথায় একটা পাইয়া দুলিয়া উঠিল; ফাট-ধরা শিথিল গ্রন্থি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খ অসমগতিতে বিহীন চঞ্চল হইয়া পড়িল; অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এবারে নড়িয়া-চড়িয়া বসিল—বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয় কেমন করিয়া এমন হয় সে কথা সারা জীবন ধরিয়াও বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়।

কিন্তু সে তার কি করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে তার কি করিবে কি করিতে পারে। প্রহৃত হইয়া পশু যেমন করিয়া অকস্মাৎ আঁ আঁ গর্জন করিয়া উঠে ঠিক তেমনই ই-ই শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শনের মতো চুলগুলিকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া হইয়া বসিল! ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি হানিয়া চাপিয়া, ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে নরুণ চেরা চোখে চাহিয়া চিলের মতো হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্র মাস,

বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠ-ভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মতো কি একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা ফুৎকার যদি সে দেয় তবে মাঠের ধূলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে। ঐ ধোঁয়ার মধ্যে জমাট দানার মতো ওটা কি, নড়িতেছে যেন! মানুষ হ্যাঁ মানুষই তো! মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইয়া হি-হি-হি করিয়া পাগলের মতো হাসিয়া একটা অবোধ নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দুই হাতে মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—না-না-না। ছাতি-ফাটার মাঠে মানুষটা ধুলোর গরমে শ্বাসরোধ ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

না ওদিকে আর সে চাইবেই না। তাহার চেয়ে বরং উঠানটায় আর একবার ঝাঁটা বুলাইয়া, ছড়াইয়া পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলাকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙ্গিয়া পড়া দেহখানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল।

জড়ো করা পাতাগুলি ফৎ-ফৎ করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে টানিয়া আনা ধূলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়িকেই যেন জড়াইয়া ধরিতে ছিল, মুখ চোখে ধূলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্রুত আবর্তিত পাতাগুলি যেন সর্বাঙ্গে প্রহার করিতেছিল। জরাগ্রস্থ রোমহীন আহতা মার্জারীর মতো ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটাগাছটা আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো বেরো বেরো।

বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। আবর্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধূলা হু-হু করিয়া উড়িয়া ধূলা একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে। শুধু কি একটা। এখানে ওখানে ছোট বড় কত বূরণ পাক উঠিয়া পড়িয়াছে—মাঠটা যেন নাচিতেছে। একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে। একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মতো অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে নুব্জা দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাশুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমতো গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল! কিছুক্ষণের মধ্যে সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোন অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তাহার ছিল না! ছোট শিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে।

কে রইছ গো ঘরে? ওগো।

জলে পচা নরম মরা-ডালের মতো বৃদ্ধা বাঁকিয়া চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়া ছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল; কে?

ধুলিধূসর দেহে শুষ্ক-পাণ্ডুর একটি যুবতী মেয়ে বুকের ভিতর কোন একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াই ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধহয় ছাতি-ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল, একটুকুন জল।

মাটির ওপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। মেয়েটির শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আহা-হা বাছারে আয়, আয়,। বোস।

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার একপাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল, একটুকুন জল দাও গো। মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া এক টুকরো পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল, আহা মা, এই রোদে ঐ রাক্ষুসী মাঠে কি বলে বের হলি তুই?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, আমার মায়ের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তু এসে পড়লাম, একেবারে মধ্যিখানে। জলের ঘটি ও পাটালির টুকরোটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল—মেয়েটির পাশে একটি শিশু। গরম জলে সিদ্ধ শাকের মতো শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল দে, দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে। মেয়েটি ছেলের মুখে চোখে জল দিয়া আঁচল দিয়া সর্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে ছেলেটির দিকে তাকাইয়া রহিল। স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধহয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মতো নরম নরম। দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, নরম নরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিয়াছে।

এঃ, ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে। দেহের সমস্ত জল কি বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। তবে কি—কিন্তু সে তাহার কি করিবে? কেন তাহার সামনে আসিল? ঐ কোমল নধর দেহ শিশু ময়দার মতো ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল-বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া—। জীর্ণ জর-জর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে! এ ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির

[illegible] আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসস্বাদ! যাঃ! নিতান্ত অসহায়ের মতো আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম— ছেলেটাকে খেয়ে ফেললামরে। পালা পালা তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি।

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢকঢক করিয়া জল খাইতেছিল—তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া গেল; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে [illegible] বিস্ফারিত-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, এটা তবে [illegible]? তুমি সেই—? সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিনীর মতো ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কি করবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন্ মুখে? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না, সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যে কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে দেখিবে কি করিয়া, ছেলেমেয়েরা এমনিতেই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়া উঠে, আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধহয়, আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে! ছি ছি ছি।

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাতে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে তো অনেকটা ডাগর হইয়াছে, তাহারই সাথী তাহাদেরই স্বজাতীয়া সাবিত্রীর পূর্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছিল। ছেলেটি শুইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি।

ঠিক তেমনি ভাবেই, ঠিক আজিকার মতই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল, ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া নরম ময়দার তালের মতো ঠাসিয়া, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত, এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল, বলি ওলো, আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে ভাবী সাবীর সঙ্গে মজলা জুড়েছিস। আমার বাছার যদি কিছু হয় তবে তোকে বুঝাব আমি হ্যাঁ।

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, বেরো। হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি।

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্বল শরীরে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল, বার বার সে মনে মনে বলিয়াছিল ছি ছি সে নাকি সে ডাইনী, কিন্তু তাই বলিয়া কী সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে? ছি ছি? ভগবানকে ডাইনী বলিয়াছিল তুমি ইহার বিচার করিবে। একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে, দয়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিও, সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালবাসি।

কিন্তু অপরাহ্নে বেলা হইতেই না হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টি-ক্ষুধার কলঙ্ক অতি নির্ভরভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমনভাবে কাতরাইতেছে, যে ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের শ্মশানে জঙ্গলের মধ্যে সন্তর্পণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল। বার বার মুখের থুথু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল কোথায় রক্ত। গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। সেই দিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাতে—সে দিন বোধ হয় চতুর্দ্দশীই ছিল, হাঁ চুতর্দ্দশীই তো—বাকুলের তারাদেবীতলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল, জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমার আগের প্রতি চতুর্দ্দশীতে মায়ের পূজা হয়, কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে—মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন দুঃখে হতাশায় উদাস হইয়া গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র বুড়ির মতো শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাঙ্গিয়া কোন নিরুদ্দেশ লোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারার অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল, সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ছাতি-ফাটার মাঠ ধূলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ; ধূসর ধূলায় গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটি এ গ্রাম হইতে খান দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে, সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া যেন বাহির করিয়া দিল। কে আবার? ঐ সর্ব্বনাশী, মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে, কেন গেলাম গো—আমি ঐ ডাইনীর কাছে কেন গেলাম গো। আমি কি করলাম গো।

লোকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু কামনা করিল একবার, জন কয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝরণাটার কাছে আসিয়াও জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মতো ফুটিয়া উঠল—সে তাহার কি করিবে? সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরল লাবণ্য কোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে এক সময় চিলের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সে চিৎকার শুনিয়া ছেলেগুলি পালাইয়া গেল। কিন্তু এখনও সে ক্রুদ্ধা অজগরের মতো ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্‌গার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে। কখনও তাহার হি হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চিৎকারে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছে হইতেছে বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই। এঃ, সে একটা গোটা শিশুর রক্ত অদৃশ্য শোষণে পান করিয়াছে।

ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল, শুক্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাসের মতো পড়িয়া আছে। কোথায় একটা পাখী অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গেল। চোখ গেল। আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছনে ঝরণার ধারে দুইটি লোক যেন মৃদু গুঞ্জনে কথা কহিতেছে। আবার সেই ছেলেগুলি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি? অতি সন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা—ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না তাহারা নয়। এ বাউড়িদের সেই স্বামী পরিত্যক্তা উচ্ছল মেয়েটা আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাউড়ি ছেলেটা।

মেয়েটা বলিতেছে, না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘর যাব।

ছেলেটা বলিল, হেঁ। এখানে আসছে লোকে। দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

তা হোক। তোর বাবা যখন আমার সাথে সাঙা দেবে না তখন তোর এখানে কেন থাকব আমি?

ছি ছি ছি। কি লজ্জা গো। কোথায় যাইবে সে। যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে, তবে মরিতে এখানে কেন? তাহার এই বাড়িতে আসিল না কেন? তাহার মতো বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কি? কি বলিতেছে মেয়েটা? বাবা মা বিয়ে না দেয় তোতে আমাতে ভিন গাঁয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। তোকে না লইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটার পছন্দর। ঐ কুপোর মতো মেয়েটাকে উহার এত ভাল লাগিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ের ছবি। একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁট। চোখ দুইটি ছোট, তারা দুইটি খয়রী রঙের। কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বই কি। আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবিই দেখিতেছিল। তখন আয়না তো ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে তখনও কোন দিন দেখে নাই। আরে তুই আবার কে রে? কোথা থেকে এলি? লম্বা চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবে বোলপুর আসিয়াছিল। লোকটাকে দেখিয়া তাহার খারাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথার ঢঙটা বড় খারাপ লাগিয়াছিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে তোমার কি?

আমার কি? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দেব। দেখেছিস কিল? ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া সে ঐ লোকটির দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মতো নিটোল শরীর। জিভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোন উত্তর না দিয়া তীব্র তির্যক ভঙ্গীতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বদিকে চুনে হলুদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মতো নিটোল গোল চাঁদ উঠিতেছিল, বোলপুরের একেবারে শেষে রেল-লাইনের ধারে বড় পুকুরটার বাঁধাঘাটে বসিয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে ঐ চাঁদের দিকে চাইয়াছিল। চাঁদের আলো তখনও দুধবরণ হইয়া উঠে নাই। ঘোলাটে আবছা আলোয় চারিদিক ঝাপসা দেখাইতেছে। সহসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই চমকাইয়া উঠিয়াছিল। সেই লোকটা হি হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজও বেশ মনে আছে—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোপ খাইয়াছিল—হাসিলে তাহার গালে টোপ খাইত—সে বলিয়াছিল—কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে চলে এলি যে?

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, তুমি যাও বলছি, নইলে আমি চেঁচাব।

চেঁচাবি? দেখছিস পুকুরের পাঁক, টুঁটি টিপে তোকে পুঁতে দেব ঐ পাঁকে।

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ছুঁড়িয়া চিৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল, ধেৎ!

সে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল—আঁচল ধরা হাতের মুঠি খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, লোকটার হি হি করিয়া সে কি হাসি। সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল, দূর হো রো প্যাচকাঁদুনে মেয়ে কোথাকার। ভাগ্।

তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল, তুমি মারবা নাকি।

না না, মারব কেন? তোকে শুধলাম—কোথায় বাড়ি তোর, তুই একেবারে হাঁক করে উঠলি, তাতেই বলি—

বলিয়া আবার হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমার বাড়ী অনেক দূর, পাথরঘাটা।

কি নাম বটে তোর? কি জাত?

নাম বটে আমার 'সোধরানি', লোকে বলে 'সরা'। আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিল, আমরাও ডোম। তা ঘর থেকে পালিয়ে এলে কেন?

তাহার চোখে আবার জল আসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল কি বলিবে?

রাগ করে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

না।

তবে?

আমার মা বাবা কেউ নাইকো কিনা? কে খেতে পরতে দেবে?

তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাতে।

বিয়ে করিস না কেন—বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

তাহাকে—তাহার মতো ডাইনীকে কে বিবাহ করিবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা আজও অকারণে নতশিরে মাটির উপর ক্রমাগত হাত বুলাইয়া ধূল কাঁকড় জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে—মালা গাঁথিতে হঠাৎ সূতা হইতে সুচটা পড়িয়া গেল।

আঃ, কি মশা। মৌমাছির চাক ভাঙিলে যেমন মাছিগুলি মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই সর্বাঙ্গে, ছাঁকিয়া ধরিয়াছে? কই? মেয়েটা আর ছেলেটার কথাবার্তা তো আর শোনা যায় না। চলিয়া গিয়াছে? সন্তর্পণে ঘরের দেয়াল ধরিয়া বৃদ্ধা

আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল, কাল আবার উহারা নিচ্ছয় আসিবে। তাহার ঘরের পাশাপাশি জায়গার মতো আর নিরিবিলি জায়গা কোথায়। এ জায়গায় কেউ আসিতে সাহস করিবে না। তবে উহারা ঠিক আসিবে। ভালবাসার কি ভয় আছে।

অকস্মাৎ তাহার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল। আচ্ছা ঐ ছোঁড়াটাকে সে খাইবে। শক্ত সমর্থ জোয়ান শরীর।

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বার বার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল—না, না।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে আপন মনে দুলিতে আরম্ভ করিল তাহার পর উঠিয়া উঠোনে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়া দিল।

আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ তো ঘুমাইবার তাহার উপায় নাই। ইচ্ছা হয় এই ছাতি-ফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। লোকে বলে সে গাছ চালাইতে জানে, জানিলে কিন্তু ভাল হইত। গাছের উপর বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত। কিন্তু ঐ মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলি শোনা হইত না। উহারা ঠিক কাল আসিবে।

হি হি হি, ঠিক আসিয়াছে। ছোড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ঘন ঘন ঘাড় ফিরাইয়া পথের দিকে চাহিতেছে। আসিবেরে সে আসিবে।

তাহার নিজের কথাই তো বেশ মনে আছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যেবেলায় সেই জোয়ানটি ঠিক পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল, তাহার আগেই আসিয়া বসিয়াছিল। পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আপন মনে পা দোলাইতে ছিল। সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

এসেছিস? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি। বৃদ্ধা চমকাইয়া উঠিল ঠিক একই কথা— সে তাহাকে এই কথাটিই বলিয়াছিল। ওঃ ঐ ছোঁড়াটাও ঠিক সেই কথাই বলিতেছে। মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। নিশ্চয়ই সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সে দিন একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল কাল তো মুড়ি পড়ে গিয়েছিল।

তারপর সে কি করিয়াছিল। হ্যাঁ মনে আছে। সে কি আর ইহারা জানে, না পারে? ও মাগো! ঠিক তাই। এ ছেলেটাও যে মেয়েটার মুখে নিজে হাতে কি তুলিয়া দিতেছে। বুড়ি দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভ[illegible]য়া পড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই হাসি তাহার থামিয়া গেল, সহসা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল

তার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে বিয়ে করবি পরা?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিন্তু ভাবিতেও পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, হাত পা ঘামিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল এই দেখ্ আমি কলে কাজ করি—রোজগার করি অনেক। তা তাতে পণ্ডিত বলে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি?

ঝরণার ধারে প্রণয়ী যুবতী বলিল, এই গাঁয়ে সবাই হাঁ হাঁ করবে—আমার জাতিগুষ্টিতেও করবে, তোর জাতিগুষ্টিতেও করবে। তার চেয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই। সেইখানে দুজনায় সাঙা করে বেশ থাকব।

মৃদুস্বরে কথাগুলি এই নির্জন স্থানটির মধ্যে যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহারা পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল—মাড়োয়ারী বাবুর কলের ধারেই একখানা ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল, বয়লা না কি বলে—সেই লম্বা পিপের মতো কলটা—সেই কলটায় সে কয়লা ঠেলিত। তাহার মজুরী ছিল সকলের চেয়ে বেশী।

ঝরণার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল—উঃ হবে না। আগে আমার খুঁটে দশটি টাকা তো বেঁধে দে, তবে আমি যাব। নইলে বিদেশে পয়সার অভাবে খেতে পাব না। তা হবে না। ছি, ছি, মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়, এত বড় লোকটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহার নাকি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনদিন। মরণ তোমার। রূপার চুড়ি কি, একদিন সোনার শাঁখা বাধা উঠিবে তোমার হাতে ছি।

ছেলেটি কথার জবাব দিল না, মেয়েটি আবার বলিল, কি রা কড়িশু না যি? কি বলছিস্ বল্? আমি আর দাঁড়াতে পারব না কিন্তু।

ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কি বলব বল? টাকা থাকলে আমি তোকে দিতাম, রূপার চুড়িও দিতাম, বলতে হত না তোকে।

মেয়েটা বেশ হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গ করিয়াই বলিল, তবে আমি চললাম।

যা।

আর যেন ডাকিস না।

বেশ।

অল্প একটু দূরে যাইতেই সাদা-কাপড়-পরা মেয়েটা ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে মিশাইয়া গেল, ছেলেটা চুপ করিয়া ঝরণার ধারে বসিয়া রহিল, আহা। ছেলেটার

যেমন কপাল। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা যে কি করিবে—কে জানে। হয়তো বৈরাগী হইয়া চলিয়া যাইবে, নয়তো গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে, বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল, ইহার চেয়ে তাহার রূপার চুড়ি কয়গাছা দিলে হয় না? আর টাকা? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে তো তাহার এক কুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা, না না হয় পাঁচটা টাকা সে দিতে পারে। তাহাতে হইবে। মেয়েটা আর বোধহয় আপত্তি করিবে না। আহা। জোয়ান বয়েস সুখের সময়, শখের সময়—আহা ছেলেটিকে ডাকিয়া রূপার চুড়ি ও টাকা দিব আর উহার সঙ্গে নাতি ঠাকুরমার সম্বন্ধ পাতাইব। গোটাকতক চোখা ঠাট্টা সে যা করিব।

মাটিতে হাতের ভর দিয়া কুঁজির মতো সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই, হাসিয়া সে ডাকিল—বলি, ওহে পাগল শুনছ?

দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে বৃদ্ধার অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল; ক্রুদ্ধা মার্জারীর মতো ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল, মর মর—তুই মর। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা একটা আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল পরমুহূর্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল। পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল সর্বনাশী ডাইনী বাউড়িদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় বিছানা নিল ঝরণার ধারে। মানুষের হের্‌স্ লোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা বাঘিনীর মতো জানিতে পারিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অতি তীক্ষ্ণ একখানা বাণ মন্ত্রপুত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কি রক্তপাত। তাহার পরই প্রবল জ্বর আর কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মতো বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে।

কিসে তাহার কি করিবে।

মধুপুরের হানাকুঠি

হিমানীশ গোস্বামী

এটি ঠিক গল্প নয়, একেবারে সত্যি কাহিনী, কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। এটা ঠিক, আমরা যারা একটু-আধটু গল্প লিখে থাকি, অনেক সময়েই বানিয়ে-বানিয়ে এমন সব কথা লিখি যার প্রায় সবটাই মিথ্যে।

আজকের এই যে গল্পটি আমি শোনাব, তার প্রায় সবটাই সত্যি। এবারে সতর্ক পাঠক প্রশ্ন করবেন, প্রথমেই আমি যে লিখেছি একেবারে সত্যি কাহিনী, সেটা তাহলে কেন বললাম। এর সহজ একটা কারণ হল, এই কাহিনী সম্পূর্ণ সত্যি হলেও (যতটুকু আমার মনে আছে) এই গল্পের চরিত্রের নাম এবং স্থান আর কাল বদলে দিয়েছি ইচ্ছে করেই। আগেই বলে রাখি গল্পটি ভূতের। অধিকাংশ ভূতই লেখাপড়ার ধার ধারে না, এমন অশিক্ষিত দুনিয়ায় আর নেই, তবে আজকাল নাকি নতুন এক ধরনের ভূত দেখা যাচ্ছে যারা কেবল শিক্ষিত নয়, উচ্চশিক্ষিত।

অনেক মানুষ ওঝা আর তান্ত্রিকের সাহায্যে এইসব ভূতকে অভিভূত করে তাদের দিয়ে অনেক লেখাপড়ার কাজ করিয়ে নিচ্ছে। কোন কোন ভূত অন্যের হয়ে গল্প, কবিতাও লিখে দেয় এও শুনেছি। তা ছাড়া এই ভূতেরা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলেও গিয়ে সামান্য দু-পাঁচ কেজি শুঁটকি মাছের জন্য ডক্টরাল থিসিস পর্যন্ত লিখে দিচ্ছে। সব শিক্ষিত ভূতই যে এইরকম হীন কাজ করে তা নয়। অনেক ভূত নীতি ন্যায় এসব মেনে চলে। এরা অমাবস্যা ছাড়া কোন মানুষের ঘাড় মটকায় না। আরও নিয়ম-মানা ভূত আছে, যারা শুধু অমাবস্যা নয়, অমাবস্যাটি শনিবারে পড়া চাই, নইলে তারা ঘাড় মটকাবে না কিছুতেই। তবে এরকম ভূতের সংখ্যা কম। যাই হোক, এতসব কথা বলে ফেললাম কেবল ঝোঁকের মাথায়। আসল কাহিনীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আজ আমি যে কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি, সেটি অনেককাল আগে ঘটেছিল, ঠিক কতকাল আগে সেটা বলব না, তবে এখন থেকে কুড়ি-ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন আমার খুব অসুখ হত। মাসে একবার অন্তত জ্বরে আক্রান্ত হতাম। ওষুধ-টষুধ খেয়ে কোনমতে সেরে উঠতাম, কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়—ফের জ্বর আসত।

আমাদের পারিবারিক ডাক্তার পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি বললেন, এটা শহুরে অ্যালার্জি হতে পারে। কোন গ্রামে গিয়ে মাস দু'য়েক থাকলে হয়তো এই বারে-বারে অসুখে পড়া বন্ধ হতে পারে। তিনি বললেন, "হরিহর, পারো তো গ্রামের কোথাও চলে যাও। কলকাতা থেকে সে জায়গাটা যত দূরে হবে ততই ভাল। কাছাকাছি একটা নদী থাকলে সেখানে সকালে-বিকেলে বেড়াবে। যা ইচ্ছে করবে খাবে, তবে খুব বেশি পরিমাণে কখনওই নয়। দুধ খাবে, আর প্রচুর দই খাবে। দিন-রাতে দু-তিন ঘণ্টার বেশি পড়বে না। একেবারেই লিখবে না। তবে চিঠি লিখতে পারো পোস্টকার্ডে, আর যদি গল্প লিখতেই হয় তাহলে দিনে এক পাতার বেশি কখনও নয়। কোন ওষুধ খাবে না। আস্তে আস্তে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে। অসুখের চেয়ে ওষুধই অনেক সময় মানুষের বেশি ক্ষতি করে।"

ডাক্তার তো বললেন কোন দূরের গ্রামে গিয়ে থাকতে। কিন্তু যাই কোথায়। সঙ্গেই বা কে যাবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাবার বন্ধু সুধাংশুকাকা বললেন, ওঁদের একটি বাড়ি আছে মধুপুরে, সেখানে বছরে দু-একবার বেড়াতে যান শীতকালটা বাদ দিয়ে, কেননা ওখানে শীতে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। "তা তুমি যদি যেতে চাও তো কোন আপত্তি নেই। ওখানে রামহরি থাকে, খুব বিশ্বাসী লোক, বললে রুটি-তরকারি বানিয়ে দেবে। ডিম, মাছ এসবও সে রান্না করতে পারে। ওখানকার দুধ খুব ভাল, হাওয়াও খুব ভাল, স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য তো কত লোকই সেখানে যায়।"

আমি যাওয়ার আগে বুঝে নিলাম কীভাবে যেতে হয়। একদিন ভোরবেলায় মধুপুরে নিরাপদেই পৌঁছে গেলাম, আর হাস্‌নুহানা কুঠিটিও খুঁজতে খুব অসুবিধে হল না। বললাম বটে হাস্‌নুহানা কুঠি, কিন্তু বাড়ির নামের প্রথম তিন অক্ষর কেউ বোধ হয় দুষ্টুমি করে ভেঙে দিয়েছে। এখন কেবল লেখা আছে হানা কুঠি! নামটা দেখেই মনটা শিউরে উঠল। হানাকুঠি নামটা মনে খুব যে একটা আমোদের সঞ্চার করে, তা নয়। তখনই মনে পড়ল সুধাংশুকাকা কী যেন বলতে গিয়ে বললেন না। যাইহোক অনেক ডাকাডাকির পর রামহরি এসে গেটটা খুলে দিল। আমি একটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম সুধাংশুকাকার। সেটি না পড়েই সে আমাকে খুব খাতির করে একতলায় একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। দেখলাম ঘরে রাশিকৃত ধুলো। টেবিলে, আলমারিতে, খাটে কোথায় নয়। রামহরি তাতে লজ্জিত হল একটু। আগে জানলে সব ঠিক করে রাখত, এ-কথাটা সে কতবার যে বলল তার ঠিক নেই। সে আমাকে বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে কোথা থেকে দুজন লোককে এনে ঘর পরিষ্কার করাতে লাগল। মেঝে ধুয়ে দিল পরিপাটি করে। জানালার কাচ ঝকঝকে তকতকে করে দিল আর বাথরুমটায় কয়েক বালতি জলও এনে দিল। এরই মধ্যে দেখলাম বড়-বড় সাইজের আটটা লুচি, সঙ্গে আলুভাজা আর পাটালিগুড় এনে সামনে রাখল একজন ঘোমটা-পরা মহিলা। বুঝলাম, ও হল গিয়ে রামহরির স্ত্রী। অত বড় লুচি একসঙ্গে অত আমি জীবনে খাইনি। গোটাচারেক খাওয়ার পর থালা সরিয়ে রাখলাম। আধ গেলাস জল খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বুঝলাম চায়ের ব্যাপারে রামহরিদের রুচি আছে। চমৎকার চা।

ঘরে ঢুকে সত্যি মোহিত হয়ে গেলাম। বিছানাটাও চমৎকার। পায়ের কাছে ভাঁজ করা কম্বল। সাদা ধবধবে বিছানার চাদর। বেডকভারটা ভাঁজ করে রাখা পাশেই। রামহরি ঠিকই ভেবেছিল যে, আমি যখন সারারাত ধরে জেগে এসেছি

তখন একটু গড়িয়ে নেব বিছানায়। দেখলাম ঘরের কোণে একটা বইয়ের বড় তাক, তাতে বাংলা-ইংরেজী কত বই!

আমিও কিছু বই এনেছিলাম, সেগুলি বের করে টেবিলে রাখলাম। সঙ্গে ছিল একটা পঞ্জিকাও। এটি আমার মায়ের কীর্তি। আমার মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন প্রতিদিন পঞ্জিকা দেখে সেইমতো কাজ করতে। যেমন, যেদিন উত্তরে যাত্রা নিষেধ সেদিন যেন কোনমতেই উত্তরদিকে না যাই। যেদিন বেগুন খাওয়া নিষেধ, সেদিন যেন আমি একটুকরো বেগুনও না খাই। মা জানতেন, আমি বেগুনপোড়া আর ভাজা খুব ভালবাসি! তা সেই পঞ্জিকাটা তুলে টেবিলের ওপর রাখলাম। ওই পর্যন্তই! কে আর ওইসব আজেবাজে সংস্কারে আজকাল বিশ্বাস করে।

আমি ঘরের তাকের কাছে গিয়ে বইগুলি এক ঝলক মোটামুটি দেখে নিলাম। আমার পড়ার মতো অনেক বই আছে সেখানে। তা ছাড়া আছে পুরনো দিনের বাঁধানো 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি'। একখণ্ড বাঁধানো শনিবারের চিঠি নিয়ে বিছানায় শুয়ে কয়েক পাতা ওলটাতেই ঘুম বেশ জোর চেপে এল। শনিবারের চিঠি পাশে রেখে দিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সেই বেলা একটায়। তাও ঘুম নিজে-নিজে ভাঙেনি। রামহরি ঘরে এসে আমাকে তাড়াতাড়ি উঠতে বলছিল চান করার জন্য, কারণ, সে জানাল, দুপুরের খাদ্য প্রস্তুত। গরম জল দেওয়া ছিল বাথরুমে, চান করে নিলাম তাড়াতাড়ি। খাওয়া-দাওয়া ভালই হল। আলু-কপির তরকারি, ছোলার ডাল আর সরু আতপ চালের ভাত, আর একটা কাচের বাটি-ভর্তি দই এবং প্লেট-ভর্তি কালাকাঁদ।

খেয়েদেয়ে ফের ঘুম। ফের রাতের খাওয়া আর সঙ্গে-সঙ্গে আবার ঘুম। রাত্রে অবশ্য ঘরে কী একটা আওয়াজ পেয়েছিলাম। খসখস করা আওয়াজ একটা, ঘুম ঠিক ভেঙে যায়নি, তবে মনে হচ্ছিল ঘরে একটা কিছু যেন আছে। বড় ইঁদুর কিংবা হয়তো-বা চামচিকে কিংবা বেড়াল বা বাদুড়ও হতে পারে। একবার মনে হয়েছিল, উঠে পড়ি, কিন্তু ইচ্ছের সঙ্গে শরীরের যোগ ছিল না। শরীর এতই ক্লান্ত ছিল যে, ফের গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম। সকাল আটটার আগে ভাঙল না। সকালের মিষ্টি রোদ্দুরটা বেশ লাগল। রাত্রের আওয়াজের কথা তখন মনেই পড়ল না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রামহরি খাবার দিয়ে গেল, বড়-বড় লুচির সঙ্গে আলু আর বেগুন ভাজা। চা সহযোগে খেতে-খেতে মনে পড়ল মায়ের কথা। আজ পঞ্জিকাতে কী লেখা আছে কে জানে! বেগুন ভক্ষণ যদি নিষিদ্ধ থাকে, তা হলেই ঝামেলার ব্যাপার। ইচ্ছে করেই আর পঞ্জিকা দেখলাম না। ওইসব পঞ্জিকার কথামতো চলেই তো এ-

দেহের এই হাল হয়েছে। খাওয়ার পর বেরোলাম ঠিক যাকে বলে যেদিকে দু'চোখ যায়। সবই তো আমার কাছে নতুন, সবই তো দেখার জিনিস। একটা ব্যাপার দেখে আমার ভাল লাগল, মাত্র একদিনেই আমার গায়ে যেন বেশ জোর বেড়ে গেছে। কলকাতায় আগে দু-তিন স্টপ যেতেই ট্রামে চড়ে বসতাম, এখন দু কিলোমিটার গিয়েও মনে হল, আরও যাই আরও যাই আরও যাই আরও যাই।

রাস্তা বেশ ফাঁকা। লোকজন কমই মনে হল। শীতও খুব। রাস্তায়ে যেতে-যেতে দেখি একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে আসছেন। আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাব ভাবছি, উনি বললেন, "এদিকে নতুন বুঝি!"

আমি তো অবাক। একজনকে দেখে কেমন করে বোঝা যায় সে নতুন লোক, আমি ভেবে পেলাম না। যাইহোক, বললাম, "হ্যাঁ কালই সকালে এসেছি।"

"কোথায় উঠেছেন।"

আমি বললাম, "হাস্‌নুহানা কুঠিতে।"

ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে বললেন, "ও, ওই হানাকুঠিতে? রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল তো?"

আমি তো ভারী অবাক।

বললাম , "হ্যাঁ চমৎকার ঘুম হয়েছিল!"

ভদ্রলোক বললেন, "সুধাংশুর বাবা সীতাংশু আমার বন্ধু ছিলেন। বড় ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। সুধাংশু তোমার কেউ হয় নাকি?"

আমি বললাম, "সুধাংশুকাকা আমার বাবার বন্ধু। আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, তাই ডাক্তার আমাকে শহর ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে বলেছিলেন। চেনা কারও সন্ধানে বাড়ি ছিল না, তা সুধাংশুকাকার এখানে একটা বাড়ি আছে শুনে তাঁকে বলায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন থাকতে দিতে। বললেন, শীতকালটায় ওদিকে বড় শীত বলে এদিকে বেশি লোক আসে না।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম জ্যোতিপ্রসাদ কর। আমি এককালে ডাক্তার ছিলাম চন্দননগরে। এখন আর ডাক্তারি করি না। এখানেই থাকি। আমার একটা ছোট বাড়ি আছে। এই কাছেই, চলে এসো মাঝে-মাঝে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এখানে আসার আগে সুধাংশু তোমাকে কিছু বলেনি? মানে ওর ওই হানাকুঠি নিয়ে?"

আমি বললাম, "না তো। কী বলবেন আবার?"

জ্যোতিপ্রসাদ বললেন, "বলা উচিত ছিল। সুধাংশু ভাল লোক, কিন্তু দায়িত্বেরও অভাব আছে। আরে বাবা, ওই বাড়িতে একটু ইয়ে আছে তো। সেটা

সবাই জানে।"

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "ইয়ে আছে মানে?"

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন, "ইয়ে আছে মানে শুনতে হলে একটু সময় লাগবে। তুমি আমার বাড়িতে চলো সব বলব।"

কাছেই বাড়ি, আমরা হাঁটতে হাঁটতে তিন মিনিটেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। জ্যোতিপ্রসাদবাবু বাড়িতে ঢুকতেই একটা বাঘা কুকুর আমাদের লেজ আর জিভ নেড়ে অভ্যর্থনা করল। ঘেউ ঘেউ করে বলল, নমস্কার!

জ্যোতিপ্রসাদবাবু একটু চেঁচিয়ে বললেন, "রাধা আমাদের জন্য একপট চা আর কিছু বিস্কুট পাঠিয়ে দাও তো, কলকাতার বন্ধু এসেছে আমার। কী যেন তোমার নাম?"

আমি বললাম, "আমার নাম হরিহর গাঙ্গুলি।"

উনি চেঁচিয়ে বললেন, "এর নাম হরিহর গাঙ্গুলি, সুধাংশুর বন্ধুর ছেলে, শরীর সারাতে হানাকুঠিতে এসেছে।"

"ওমা, সে কী গো।" বলে একজন বয়স্কা মহিলা প্রায় ছুটেই এলেন। বয়স অনেক হলেও শরীর বেশ মজবুতই আছে। তিনি বললেন, "কী সর্বনাশ! এই বাড়িতে শরীর সারাতে কেউ আসে? ওখানে সুধাংশুর বাবা, আহা বড় ভাল লোক ছিলেন। কী হয়েছিল ওকে বলেছ? তোমার নাম যেন কী ভুলে গেলাম।" আমি আমার নাম বলাতে উনি বললেন, "নামটা মোটামুটি ঠিক আছে। নামটা ওদের বিতৃষ্ণা এনে দিতে পারে। তবে নামের সঙ্গে একটা রাম থাকলে ভাল হত। ওই জগতের ওরা রাম নামটাকে ভারী ভয় পায়। রাম নাম যার তাকে তারা এড়িয়েই চলে।"

আমার তখনই কেমন গা-ছমছম করতে লাগল। একটা চেয়ারে বসে রইলাম, আর কুকুরটা দূর থেকে আমাকে দেখতে লাগল। আবার ফস করে একবার ছুটে এসে আমার সারা গা শুঁকে চলে গেল। একজন পরিচারিকা চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। আমি বললাম, "দাদু, আমার ভয় করছে যে।"

জ্যোতিপ্রসাদবাবু হা হা করে হেসে বললেন, "ভয় একটু পাওয়া তোমার দরকার। সুধাংশুর বলা উচিত ছিল যে, ওই বাড়িতে ওর বাবার কী ভয়াবহভাবে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় সাত বছর আগে। সীতাংশু লোক ভাল ছিল। খুব সাত্ত্বিক ধরনের লোক। একেবারে ভেজিটারিয়ান ছিল। ডিম পর্যন্ত খেত না। তা সংক্ষেপে বলি, ওর কাছে তখন ছিল বেশ কিছু টাকা। সীতাংশুর এক ভাই এই অঞ্চলে একটা বাড়ি কিনবেন বলে হাজার পঞ্চাশ টাকা অ্যাডভান্স দেওয়ার জন্য টাকাটা

সীতাংশুর কাছে রেখে গিয়েছিল। শেষে কী এক কারণে আর কেনা হয়নি। তাই টাকাটা সীতাংশুর কাছেই ছিল। এরই মধ্যে খবর পেয়ে একদল ডাকাত ওই বাড়িতে হানা দিয়ে সীতাংশুবাবুকে খুন করে টাকা নিয়ে পালায়। গত সাত বছর ধরে সীতাংশুর আত্মা ওই বাড়িতেই আছে।"

"কী সাঙ্ঘাতিক!" আমি বললাম, "আত্মা আছে? ওই হানাকুঠিতে, মানে হালদমা কুঠিতে? সুধাংশুকাকার বাবার আত্মা?"

"জ্বালাতন করছে, গত সাত বছর ধরে।"

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন, "লোকটি খুব একটা বিপজ্জনক নয়, লোক মানে সীতাংশুর আত্মার কথা বলছি। প্রেতাত্মা হলেও আত্মা! এক হিসেবে মহাত্মাও বলা যায়।"

"তবে যে বললেন, তাঁর আত্মা লোকদের জ্বালাতন করেন?"

"ওটা কিছু না। কোন লোক ওঁর ঘরে ঘুমোলে উনি খেপে যান। উনি করেন কী, আস্তে করে মশারি তুলে লোকটিকে ধরে নিয়ে হয়তো এক কিলোমিটার দূরে একটা বটগাছের ওপর শুইয়ে দেন। লোকেরা জেগে উঠে হাউমাউ করে ওঠে, আর সীতাংশুর আত্মা তখন ধেই-ধেই করে নাচতে থাকে। কোন সময় হয়তো খাট থেকে তুলে নিয়ে একেবারে স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় আলতোভাবে শুইয়ে দেন। একবার একজন বেপরোয়া ইংরেজ সায়েবকে কোথায় রেখে এসেছিলেন জানো? সে ভারী আমোদের ব্যাপার, একেবারে সেই সায়েবের বাড়ি ইংল্যাণ্ডে!"

কথাটা শুনে আমার মোটেই আমোদের মনে হল না। আমি বললাম, "এ তো খুব অন্যায় কথা। মানে আমি আসার আগে সুধাংশুকাকার এইসব কথা বলে দেওয়া উচিত ছিল!" জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন, "ওর কিছু একটা ভুল হয়েছে নিশ্চয়, কেননা ও যাদের-যাদের এখানে, মানে হানাকুঠিতে পাঠিয়েছে, প্রত্যেককে সে সব কথা খুলে তো বলেইছে এমনকী পইপই করে সাবধানও করে দিয়েছে। কিন্তু কথায় আছে না সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়? এমন সব লোক এই দুনিয়ায় আছে যারা ইচ্ছে করে এই সব বিপজ্জনক জায়গায় যায় বাহাদুরি নিতে। উদ্দেশ্য লোকে তাদের দেখে বলুক, বাবা কী সাহসী সব লোক, কী মনের জোর। এর আগে যারা এসে বিপদে পড়েছিল তাদের প্রত্যেককেই সুধাংশু যে সাবধান করে দিয়েছিল সেটা আমি জানি। কেবল তোমার বেলায় কেন সাবধান করল না সেটাই ভাবছি।" একটু থামলেন জ্যোতিপ্রসাদ। তারপর বললেন, "আরও একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি যে, সীতাংশুর আত্মা তোমাকে একটুও বিরক্ত করল না

কেন? এটা তো ওর চরিত্রের সঙ্গে মেলে না।"

আমি বললাম, "রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমি কিছু আওয়াজ পেয়েছি। বইয়ের পাতা ওল্টানোর মতো একটা খসখসে আওয়াজ। আমি ভাবলাম বুঝি বাদুড় কি চামচিকে হবে। এখন ভাবছি সাপটাপও হতে পারে।"

"তা হতে পারে বটে।" জ্যোতিপ্রসাদ বললেন, "এই অঞ্চলে তাঁদের সংখ্যা কম নয়, তবে শীতকালে তাঁরা বিশেষ নড়াচড়া করেন না, ওঁরা নিদ্রিত থাকেন। সাপের ভয় এই সময় নেই। আর একটা কথা বলা দরকার, ওই বাড়িতে সীতাংশুর বা সুধাংশুর কোন আত্মীয়কে সীতাংশুর আত্মা কখনও বিরক্ত করেননি।"

আমি বললাম, "আমি তো ওঁদের কারও আত্মীয় নই। আমাকে ছেড়ে দিল কেন বুঝছি না। তা ছাড়া রামহরিও তো আমাকে কিছু বলল না।"

জ্যোতিপ্রসাদ অবাক হলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "এ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!" কাপটা সরিয়ে রেখে বললেন, "রামহরি লোকটা তোমাকে বললে তো তার রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যেত না। তোমাকে সাবধান করে দিলে তুমি কি আর ওই হানাকুঠিতে থাকতে? তা হলে তোমার খাওয়াদাওয়া কাপড় কাচা এসবের জন্য কিছু ছেড়ে দেবে? ভাল কথা, ওই হানাকুঠিতে একটাও হাসনুহানা গাছ দেখেছ?"

আমি বললাম, "না তো! বাড়ির সবটা অবশ্য ঘুরে দেখিনি, তবে হাসনুহানার ঝোপঝাড় থাকলে নিশ্চয় চোখে পড়ত। রাত্রে গন্ধও পাইনি।"

"গন্ধও পাওনি? সেটাও নতুন কথা শোনালে। আগে ওই বাড়ি ভর্তি হাসনুহানা গাছ ছিল। সন্ধেবেলা চমৎকার গন্ধ বেরোত। তা সীতাংশুর খুব প্রিয় ওই গাছগুলির কী হল জানো? সীতাংশু মারা যাওয়ার কয়েকদিন পর থেকে হাস্‌নুহানাগুলিতে যেন মড়ক লাগল। এক মাসের মধ্যে গাছগুলি সব মরে গেল, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল। রামহরি ওই গাছগুলি কেটে একদিন আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল। তার জায়গায় কিছু মরশুমি ফুলের চাষ করল। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। রোজ সন্ধেয় হাস্‌নুহানার গন্ধ পাওয়া যেতে লাগল ওই বাড়িতে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। গাছ নেই ফুল নেই। অথচ গন্ধ আছে।"

আমার বোধ হয় শরীর কাঁপছিল, "দাদু, আমার শরীর খুব খারাপ। কয়েক বছর ধরে ভুগছি। আমার ওজন ছিল প্রায় পঁচাত্তর কেজি, এখন দাঁড়িয়েছে ষাটে। মাসে কয়েকদিন বিনা কারণে জ্বর আসে। রক্তে কিছু জীবাণু পাওয়া যায় না। আমি

ডাক্তারের পরামর্শে এখানে থাকতে এলাম শরীর সারাব বলে, কিন্তু এখানে থাকলে যদি ভয়েই মারা যাই, তা হলে কী হবে?" আমি প্রায় ভেঙে পড়লাম।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু আমাকে বললেন, "তোমার ও বাড়িতে না থাকাই ভাল বলে মনে করি। কাল রাতে কিছু হয়নি ঠিকই, হয়তো সীতাংশুর আত্মা অন্য কোথাও ছিল। যা হোক, খুব বাঁচা বেঁচে গেছ। অবশ্য সীতাংশু কাউকে মেরে ফেলেনি, তবে ওর স্বভাবে ইয়ার্কির ভাবটা আছে বটে। মরেও ইয়ার্কি ছাড়েনি। কেউ মরেনি ঠিকই, কিন্তু মরতেও তো পারত! না, তুমি ও হানাকুঠি ছেড়ে দাও। যদি কিছু মনে না করো তুমি আমার বাড়িতেই থাকো। তুমি আমাকে দাদু বলে ডেকেছ, তুমি দাদুর বাড়িতে থাকবে। আমরা বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী থাকি। এখানেই আমার সারাটা জীবন কাটল। আর ডাক্তারি করি না। এখানে ভাল ডাক্তার অনেক আছেন। আমার অবশ্য একেবারে ডাক্তারি ছাড়ার উপায় নেই। পুরনো সব লোক আমাকে ডাকেন। সেসব ক্ষেত্রে আমিও যাই, তবে টাকা নিই না আর। তুমি এখানে থাকলে বোধ হয় ভালই হবে। তোমার শরীরের সমস্যাটা একটু বুঝতে পারব। কী রাজি?"

আমি দেখলাম ভদ্রলোক ভারী সরল আর আন্তরিক মানুষ। মনে কোন অভিসন্ধি নেই। আমি তো বেজায় খুশি হলাম, বলাই বাহুল্য। আমি একটু পরে একটা সাইকেল রিক্‌শা নিয়ে হানাকুঠিতে গিয়ে রামহরিকে বললাম, "আমার দাদু ডাক্তার জ্যোতিপ্রসাদের বাড়িতে যাচ্ছি। এখানে আর থাকব না।" রামহরি কোন কথা বলল না। তবে মনে হল ও একটু দুঃখিত হয়েছে।

আমি আমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিলাম। বেশি গোছানোর ছিল না অবিশ্যি। মিনিট দশেকের মধ্যেই গোছানো শেষ করার পর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমার আনা পঞ্জিকাটা টেবিলে নেই। আমি রামহরিকে বললাম, পঞ্জিকার কথা। রামহরি তার মাথা চুলকে কাঁচুমাচুভাবে বলল পঞ্জিকার কথা সে জানে না। আমি সকালে বেরিয়ে যাওয়ার পর সে ঘর গুছিয়েছে বটে তবে টেবিলে সে পঞ্জিকাটিকে দেখেনি মোটেই। ওর কথায় অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। রামহরি খামোখা তিন টাকা দামের পঞ্জিকা সরিয়ে ফেলবে সেটাও সম্ভব বলে মনে হল না। তবু আমি ঘরটা ভাল করে একবার দেখে নিলাম। না, কোথাও নেই।

দুপুরে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর ওখানেই খাদ্যগ্রহণ করা গেল। তারপরে ওঁর আর ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথাটথা বলে ওঁদের বাড়ির সবচেয়ে ভাল ঘরে গিয়ে দেখলাম, চমৎকার সাজানো ঘর সেটি। কাচের বড়-বড় জানালা। জানালা দিয়ে

বাড়ির পেছনের বাগান চোখে পড়ে। কতরকমের যে ফুল ফুটে আছে, গাঁদা, হরেকরকমের গোলাপ! বেশ কয়েকটা ঘুঘু ডাকছে। বেশ নির্জন জায়গা। মাঝে-মাঝে একটু দূরের রাস্তা দিয়ে সাইকেল রিকশা চলার কেমন সরসর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা টেবিল থেকে নিয়ে এক পাতা পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সত্যি, শরীরটা আমার সত্যিই দুর্বল হয়ে গেছে। এত ক্লান্ত মনে হয়! দেখা যাক, এখানে দু'মাস থাকলে কী হয়। আবার সম্পূর্ণ অচেনা লোকের বাড়িতে এতদিন থাকাটাও কেমন যেন লাগছে। এঁরা আমার কাছ থেকে টাকা পয়সাও কিছু নেবেন না।

সেই বিকেলে ঘুম ভাঙল। বড় ঠাণ্ডা এদিকে। উঠে ঘর থেকে বেরোতেই জ্যোতিপ্রসাদ বললেন, "হ্যালো ইয়ংম্যান, কেমন লাগছে এখন?"

আমি বললাম, "ভাল, বেশ ভাল।"

উনি বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বললেন, "কাগজ এক্ষুনি এল। কলকাতার কাগজ পেতে-পেতে সন্ধে হয়ে যায়।" বলে কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। এরপর চা আর বাড়ির তৈরি কেক খেলাম। সঙ্গে কিছু কাজুবাদাম।

দেখলাম এঁরা রাত্রের খাবার সত্যি-সত্যি রাত্তির হওয়ার আগেই সেরে ফেলেন। সাড়ে আটটার মধ্যেই রাত্রের খাওয়া শেষ। জ্যোতিপ্রসাদ বললেন, "এ-বাড়িতে অনেক বই আছে, কাল সেগুলি থেকে বেছে নিয়ো তোমার যা পছন্দ। পড়তে পারো, তবে কী জানো, বেশি রাত জাগা ঠিক নয়। আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ। আমি তো ভোর পাঁচটায় উঠি, তারপর একটু হাঁটতে বেরোই। কাল তোমাকেও ডেকে নেব, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভারী ভাল এই হাঁটা। আর মনটা ভাল থাকে।"

সর্বনাশ! উনি বলেন কি? সকাল পাঁচটায় ঘুম ভাঙাবেন আমার? কিন্তু আপত্তি আর করা গেল না। চুপ করেই রইলাম।

রাত্রে ঘুমটা ভালই হল। তবে অনেক স্বপ্নও দেখলাম। স্বপ্নগুলিও অদ্ভুত। খুব যেন একটা ঠাণ্ডা দেশে চলে গেছি। ঠাণ্ডায় কষ্ট হচ্ছে, এদিকে আমার খালি গা, জুতোও নেই। চারদিকে আবার হাস্‌নুহানার গন্ধ! একবার মনে হল, আমি একটা বিমানে উঠে কোথায় চলেছি। বিমানের এঞ্জিনটা খারাপ হয়ে গেছে। বিমানেও পাচ্ছি হাস্‌নুহানার গন্ধ।

সকালের রোদ্দুর এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। হাতে ঘড়ি ছিল, সেটা দেখলাম, সকাল কোথায় আটটা বেজে কুড়ি মিনিট! কই জ্যোতিপ্রসাদ তো ডাকলেন না? ভুলে গেলেন নাকি? চট করে উঠে পড়লাম। এ আবার কী? আমি কোথায়?

জ্যোতিপ্রসাদ করের বাড়ি তো নয় এটা? এটা তো সেই বাড়ি হানাকুঠি। সেই ঘর। এই ঘর ছেড়েই তো কাল চলে গিয়েছিলাম, এখানে ফের কেমন করে এলাম? আমার মাথা ঘুরছিল। আর কিছু ভাবতে পারলাম না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হল তখন আবার অন্য দৃশ্য। একটা ছোট ঘর। নার্সিং হোমের কেবিন। আমি একটু নড়ে উঠতেই একজন নার্স এসে বললেন, "কেমন বোধ করছেন?"

আমি কোনমতে উত্তর দিলাম, "ভাল। আমি কোথায়?"

নার্স বললেন, "এটা একটা নার্সিং হোম।"

জিজ্ঞেস করলাম, "জায়গাটার নাম কী?"

নার্স বললেন, "মধুপুর। আপনি তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। কাল রাতে জ্ঞান ফিরেছে। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, আপনি এখনও দুর্বল। এক কাপ গরম দুধ খেয়ে শুয়ে থাকুন।"

সুস্থ হতে আরও দু'সপ্তাহ লেগেছিল। রোজই জ্যোতিপ্রসাদবাবু দু'বার এসে দেখে যেতেন। তৃতীয় সপ্তাহে ফের জ্যোতিপ্রসাদের বাড়িতেই নিয়ে গেলেন জোর করে। তিনি বললেন, "কী কাণ্ড, উঃ, সমস্ত মধুপুরে বিরাট চাঞ্চল্য। সব তোমাকে নিয়ে। লোকজন হতভম্ব, পুলিশ হতভম্ব। হ্যাঁ, তোমার বাবা-মা এসেছিলেন, দু'দিন থেকে চলে গেছেন। এখানে ভূতো বলে একজন ওঝা আছে, সে এক মিডিয়ামের সাহায্যে সীতাংশুর সঙ্গে কথা বলেছে। সীতাংশু নাকি আমার ওপর ভারী চটে গেছে। সে বলেছে, আমি নাকি তার অতিথিকে নিয়ে এসেছি, সেটা আমার ভারী অন্যায় হয়েছে। সেজন্য সে সেদিন রাতের বেলায় আমার বাড়ি থেকে তোমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তবে এই নিয়ে এত হইচই হওয়ায় সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে হ্যাঁ, আর একটা কথা, বলছে সে আর কিছু করবে না। তুমি ইচ্ছে করলে ফের হানাকুঠিতে যেতে পারো। তাতে সে খুশিই হবে। আর হ্যাঁ, পঞ্জিকাটি সীতাংশু নিয়েছিল দেখার জন্য। কবে কখন অমাবস্যা হয়, সেটা জানা খুব দরকার। ওতে নাকি ওর চেনা অনেক আত্মার ভারী সুবিধে হয়েছে।"

হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বলতে হবে, অবশ্য না বললেও চলত যে, আমি আর হানাকুঠিতে যাইনি। জ্যোতিপ্রসাদের বাড়ি থেকেই কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম।

আকস্মিক

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কথা হচ্ছিল আমাদের এক বন্ধু বিভূতিকে নিয়েই।

প্রায় দশ-বারো দিন আমাদের আড্ডায় সে অনুপস্থিত। কোন খবর পর্যন্ত নেই। অথচ দলের মধ্যে সে-ই বেশী আড্ডাবাজ। রোজকার মতো আমরা আমাদের ক্লাব-ঘরে এসে সেদিনও সন্ধ্যায় জমায়েত হয়েছি এবং কখন যে আকাশ ভেঙে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে টেরও পাইনি। খেয়াল হল রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ। এবারে বাড়ি ফেরা দরকার, কিন্তু দরজা খুলতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজাটা তখুনি বন্ধ করে দিতে হল।

ঝম্ ঝম্ করে তখনও বৃষ্টি ঝরছে এবং বৃষ্টিছাটের ঘন কুয়াশায় চারদিক একাকার। সমস্ত গলিটা জলে ডুবে গিয়েছে, ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত জল থৈ থৈ করছে। সঙ্গে কারও একটা ছাতা বা ওয়াটারপ্রুফ কিছুই নেই অথচ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে স্নান করে যেতে হবে।

তাই সকলে আবার জাঁকিয়ে বসলাম।

মহীন বললে,—বেরুনোই যখন যাবে না তখন ভূতের গল্প শোনা যাক। সরোজ, বল একটা জমাটি ভূতের গল্প।

আমাদের মধ্যে বন্ধু সরোজই সাহিত্যিক। শুধু সে সাহিত্যিকই নয়, চমৎকার গল্প বলবারও তার একটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু মহীনের প্রস্তাবে বাধা দিলে দিব্যেন্দু, বললে—না, শচীনের নতুন কোন ম্যাজিক দেখা যাক।

আমি প্রস্তাবে এবারে সায় দিলাম—হ্যাঁ, সেই ভাল। শচীন শুরু কর।

আমাদের দলের মধ্যে শচীন এ্যামেচার ম্যাজিসিয়ান না হলেও ম্যাজিকে সত্যিই তার বাহাদুরি ছিল। আশ্চর্য রকমের ম্যাজিক এক-এক সময় আমাদের দেখিয়ে সে কতদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে শচীন আপনমনে একটা সিগ্রেট টানছিল, আমার প্রস্তাবে সে বললে,—ম্যাজিক যে দেখব তা জিনিসপত্র কোথায়?

ঠাট্টা করে সরোজ বললে,—জিনিসপত্র না হলে ম্যাজিক দেখাতে পারবি না-তবে কিসের ছাই তোর ম্যাজিক!

—ঠিক আছে। শুধু হাতেই দেখাব।

সকলে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

-ঘরের আলোটা নিবিয়ে দে—শচীন বললে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে একটা ক্যাণ্ডেল জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখ।

শচীনের কথামতো তাই করা হল। একটা মাত্র ক্যাণ্ডেলের আলো ঘরের মধ্যে অদ্ভুত আলোছায়া সৃষ্টি করেছে। আলোর শিখার একটা ছায়া সেই আধো-আলো, আধো-আঁধারে দেয়ালের গায়ে কাঁপছে। বাইরে সমানে পড়ছে বৃষ্টি। শচীন তার পূর্বের আসনেই বসা। আমরা বার'জন ঘরের একদিকে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেছি।

—কি রে, কই, শুরু কর তোর ম্যাজিক—সরোজ বললে।

—চুপ কর। কথা বলিস না।—ভারী গলায় বললে শচীন।

তারপর সবাই চুপচাপ। এক মিনিট, দু'মিনিট করে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

এমন সময় সরোজ আবার প্রশ্ন করলে,—কি রে শচে, ঘুমালি নাকি বাবা?

—চুপ—দরজাটা খুলে দে, কে এসেছে দেখ—শচীন বললে।

সত্যিই! জলের ছপ্ ছপ্ একটা শব্দ সকলেই আমরা শুনতে পেলাম। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এসে বন্ধ দরজার কাছেই থামল।

তারপর দরজার গায়ে শব্দ উঠল—টুক্ টুক্।

—কে?

আবার শব্দ টুক্ টুক্। আমিই উঠে গিয়ে দরজাটা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে একবার বিদ্যুৎ চমাকালো। সেই ক্ষণিক আলোর দীপ্তিতে দেখলাম কে যেন একজন ঠিক দোড়গোড়াতেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট একটা ছায়ার মতো।

—কে?

কিন্তু আগন্তুক আমার প্রশ্নের কোন সাড়া দিল না, খানিকটা জমাট কুয়াশার মতই যেন পাশ কাটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকতেই আমি দরজাটা যেমন বন্ধ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ায় ঘরের একটি মাত্র ক্যাণ্ডেলের আলোটি নির্বাপিত হল। মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করল। এবারে শচীন প্রশ্ন করল,—তুমি কে?

—আমি বিভূতি। চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো স্বাভাবিক গলায় সাড়া এলো।

—বিভূতি? কে বিভূতি?

—বিভূতি চক্রবর্তী।

হাত বাড়িয়ে দরজাটার ঠিক কাছেই দেয়ালে আলোর সুইচ্‌টা টিপলাম। খট্ করে একটা শব্দ হল মাত্র, কিন্তু ঘরের আল জ্বললো না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হল, কে যেন ঠিক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। নিজের অজ্ঞাতেই দু-পা পিছিয়ে একেবারে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালাম। ভয়ে তখন আমার গলা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠেছে। হঠাৎ এমন সময় মনে পড়ল বিভূতি, বিভূতি চক্রবর্তী আমাদের বন্ধু। তবে।—সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয়টা কেটে গেল।

সোৎসাহে বললাম,—বিভূতি—তুই—

—হ্যাঁ। সেই পূর্বের মতো চাপা কণ্ঠস্বর। মনে হল বড় যেন কষ্ট হচ্ছে তার কথা বলতে। আরও মনে পড়ল বিভূতি তো থাকে সেই ভবানীপুরে। প্রায় দশ-বার দিন আমাদের আড্ডায় আসে না। সে এই প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাতে সেই ভবানীপুর থেকে এসেছে!

একটু বিস্ময়ই লাগে। আমি এবারে প্রশ্ন করলাম,—এই ঝড়-জলের মধ্যে এত রাত্রে তুই—ব্যাপার কি বিভূতি?

বিভূতি আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শচীনকে সম্বোধন করে বললে,—শচীন, আমাকে তুই ডাকছিলি কেন?

প্রশ্ন করল এবার সরোজ,—এই জলের মধ্যে তুই এলি কি করে রে বিভু?

—জল!

—হ্যাঁ। বাইরে ত'ভীষণ বৃষ্টি।

—তা হবে।

—তা হবে কি রে—চারিদিকে জল থৈ-থৈ করছে না? আগেই বুঝি বের হয়েছিলি?—বললে সরোজ।

—না ত'! শচীন ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ত এলাম।

—ভিজে গেছিস ত একেবারে!

—না!

বলে কি বিভূতি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি!

হঠাৎ আবার বিভূতি বললে,—আমি যাই ভাই!

—যাবি! কোথায় যাবি এই বৃষ্টির মধ্যে! মাথা খারাপ হল নাকি তোর!

—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে রে, আমি আর ঘরের মধ্যে থাকতে পারছি না। আমি চললাম। বলবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা যেন খুলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আলোটা দপ করে জ্বলে উঠল।

কিন্তু কোথায় বিভূতি! আমরা ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি।

—বিভূতি! বিভূতি! আমি ছুটে দরজার বাইরে গেলাম।

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে। গলির মধ্যে জল অনেকটা কমে এসেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কাউকে দেখতে পেলাম না। কেবল জলের মধ্যে দিয়ে কারও হেঁটে যাবার ছপ্ ছপ্ শব্দ কানে ভেসে এলো।

পরের দিন দুটো সংবাদ আমরা জানতে পারলাম। একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল—গত রাত্রে প্রচণ্ড তিন ঘণ্টাব্যাপী বৃষ্টির মধ্যে শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ মিনিট কুড়ির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাত্রি ন'টা পঁয়তাল্লিশ থেকে দশটা পাঁচ পর্যন্ত।

আর একটা—গতরাত্রে দিনকয়েক ভোগবার পর টাইফয়েডে আমাদের বন্ধু বিভূতি চক্রবর্তী রাত সাড়ে ন'টায় মারা গিয়েছে।

তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা আজও অস্পষ্ট হয়ে আছে। তবে স্বীকার করতে পারিনি তেমন ব্যাপারটার মধ্যে শচীনের কোন ম্যাজিকের কেরামতি আছে, যেমনি এও স্বীকার করে নিতে মন চায়নি যে, ব্যাপারটার মধ্যে কোন কিছু ভৌতিক ব্যাপার আছে। তবে যা ঘটেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

মণ্টির মা

নরেন্দ্র দেব

মণ্টির বয়স যখন চার পাঁচ বছর সেই সময় মণ্টির মা মারা গেলেন। মাকে হারিয়ে মণ্টি বড়ই কাতর হয়ে পড়ল। তাকে সবাই বোঝাতে লাগল, যে তার মা মামার বাড়ী বেড়াতে গেছে শীগ্‌গিরই ফিরে আসবে। মণ্টি কিন্তু কারুর কথাই শোনে না, কেবলই মার জন্য কাঁদে; কেবলই বলে, মার কাছে যাব; মা কোথা গেল? আমার মাকে এনে দাও।

মণ্টির বাবা মণ্টিকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন তাঁর আর কোন কাজকর্ম নেই, কেবল ছেলেকে নিয়ে থাকতে হয়। রোজ বিকেলে তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে হয়। কোন দিন বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যান, কোন দিন গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখাতে নিয়ে যান, কোন দিন আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যান, কোন দিন বা মিউজিয়াম ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। এমনি করে দিনগুলি একে একে কাটতে লাগল বটে, কিন্তু রাত্রি আর কাটতে চায় না।

রাত্রে বাপের কোলের কাছটিতে ঘেঁসে শুয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে মণ্টি যতক্ষণ না ঘুমোত ততক্ষণ কেবলই তার মায়ের কথা কয়। হ্যাঁ বাবা, মা কবে মামার বাড়ি থেকে আসবে? চলনা বাবা, তুমি আমি দু'জনে মামার বাড়ীতে গিয়ে মাকে নিয়ে আসি। মার জন্যে যে আমার বড় মন কেমন করছে! এমনি করে প্রতিদিন মণ্টি যখন তার মার কথা বলে তার বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত, মণ্টির মার জন্যে মণ্টির বাবার প্রাণটা কেঁদে উঠত। চুপি চুপি পাশ ফিরে কোঁচার কাপড়ে চোখের জল মুছে ফেলে মণ্টির বাবা বলতেন, "তুমি এখন ঘুমোও, কাল তোমাতে আমাতে গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে আসব।"

এমনি করে আর কদিন চলে। মণ্টি ক্রমেই মার জন্যে হেদিয়ে উঠতে লাগল, কিছু খেতে চায় না; কোথাও যেতে চায় না, খেলাধুলো করাও ছেড়ে দিলে। দিনরাত মুখ শুকিয়ে বেড়ায়। আর তেমন করে হাসে না, দিন দিন সে রোগা হয়ে যেতে লাগল।

মণ্টির অবস্থা দেখে তার বাবার বড় ভাবনা হল—তাইত ছেলেটার জন্যে কি করা যায়। শেষে তিনি একদিন চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে দিয়ে মণ্টির এক মাসীমাকে নিয়ে এলেন। মণ্টির মাসীমা এসে আদরযত্নে মণ্টিকে অনেকটা ঠাণ্ডা

ক'রে ফেললেন। মাসীমাকে পেয়ে মণ্টি আস্তে আস্তে তার মার কথা ভুলে যেতে লাগল, ক্রমে মাসীমাই মণ্টির কাছে সর্বস্ব হয়ে উঠল।

যেসব স্নেহের দাবী দাওয়া অত্যাচার সে তার মার উপর করত, তার সেই সব আব্দার এখন মাসীমাকেই শুনতে হয়। মণ্টির বাবা যখন দেখলেন যে, ছেলে তার মাসীকে পেয়ে মায়ের অভাব তো ভুলেছেই, এমন কি বাপকে শুদ্ধ আর চায় না, তখন তিনি আবার নিজের কাজকর্মে মন দিলেন। এমনি করে আরও তিন চার মাস কেটে গেল।

কিন্তু, মাসী তো তাঁর বাড়ী ছেড়ে চিরকাল মণ্টিদের ওখানে থাকতে পারবেন না—তাকে এইবার চলে যেতে হবে। তিনি মণ্টির বাবাকে ডেকে বললেন, "দেখ, আমার ত আর থাকবার সময় নেই; অনেকদিন হল এসেছি, এইবার আমায় ফিরতেই হবে, কিন্তু মণ্টির সম্বন্ধে কি করা যায় বলো তো? ও তো আমায় একদণ্ড ছাড়তে চায় না, তা আমি কি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব?" মণ্টির বাবা বললেন, "তা হলে আমি আর এ বাড়ীতে একদণ্ড থাকতে পারব না। মণ্টি চলে গেলে আমি বাঁচব না।"

মণ্টির মাসী হেসে ব'ললেন, "তা হলে ছেলেকে একটি তার মনের মতন 'মা' এনে দাও, তা হলেই সে বেশ থাকবে।"

মণ্টির বাবা বললেন, "সে এখন আমি কোথায় পাব? তার চেয়ে মণ্টির দিদিমাকে দেশ থেকে আনতে পাঠাই না কেন? তিনি তো একলাটি সেই পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পড়ে আছেন। তাঁকে নিয়ে আসি, এখানে থাকবেন আর তাঁর নাতিকে দেখবেন শুনবেন?"

মণ্টির মাসী ঘাড় নেড়ে বললেন, "তিনি আর এ বাড়ীতে ঢুকবেন না। যে বাড়ীতে তাঁর মেয়ে মারা গেছে, সে বাড়ী তিনি আর মাড়াবেন না, তা ছাড়া দেশের বাড়ীতে তাঁর আর কেউ নেই যে সন্ধ্যের সময় তুলসী তলায় একটা প্রদীপ জ্বেলে দেবে। তিনি সে ভিটে ছেড়ে আর কোথাও নড়বেন না।"

মণ্টির বাবা বললেন, "তবেই ত মুস্কিল! তা হলে এখন উপায় কি?"

মণ্টির মাসী বললেন, "একমাত্র এর সহজ উপায় হচ্ছে যে, তুমি আবার একটি বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে এসো, সে এসে মণ্টির মা হবে!"

মণ্টির বাবা বললেন, "তুমি আর কিছুদিন থাকো, আমি ভেবে দেখি।"

মণ্টির বাবা যেদিন আবার একটি বিয়ে করে নিয়ে এলেন, মণ্টির মাসী তার কাছে মণ্টিকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "বউ, এই তোমার ছেলে, একে মানুষ করবার ভার এখন তোমাকেই নিতে হবে!" মণ্টিকে বললেন, "মণ্টি এই তোমার মা খুব লক্ষ্মীছেলের মতন এঁর কাছে থাকবে। ইনি তোমায় খুব আদরযত্ন করবেন, খুব ভালবাসবেন।"

মণ্টি তার নতুন মার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। নতুন মা হেসে হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকলেন। মণ্টির এই নতুন মা'টিকে বেশ পছন্দ হল, সে ছুটে গিয়ে একেবারে তার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আমার মা?" নতুন মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললেন, "হ্যাঁ!" মণ্টির মাসী এদের দু'জনের এই সদ্ভাব দেখে খুব খুশী হয়ে নিজের বাড়ী ফিরে গেলেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই, মণ্টির নতুন মা মণ্টিকে বড় অযত্ন করতে আরম্ভ করলেন! মণ্টি একটু দুষ্টুমি করলেই তিনি মণ্টিকে ধরে খুব মারধোর করতেন। মণ্টির বাবা কাজকর্ম থেকে ফিরে এলেই মণ্টি তাঁর কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে দিত। মণ্টির বাবা প্রথম প্রথম মণ্টির দিকে হয়ে তার নতুন মাকে খুব বকতেন এবং মারধোর করতে বারণ করতেন। এতে কিন্তু আরও উল্টো ফল হত। মণ্টির বাবা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেই, মণ্টির নতুন মা তাকে আরও বেশী করে শাসন করতেন। পেট ভরে তাকে খেতে দিতেন না, কথায় কথায় উঠতে বসতে দাঁত খিঁচুতেন। খুব মেরে ধরে ঘরের ভিতর সমস্ত দিন চাবি বন্ধ করে রেখে দিতেন। মণ্টি বেচারী কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ত।

একদিন সে ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখলে যে, তার পুরোনো মা যেন এসে তাকে বলছেন, "মণ্টি, আয় আমার সঙ্গে তোর মামার বাড়ী গিয়ে থাকবি! এখানে আর থাকিস নি।" মণ্টি ঘুম ভেঙে উঠে তাড়াতাড়ি 'মা মা' বলে ডেকে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে দেখলে, ঘরের দোর বাইরে থেকে বন্ধ করা রয়েছে। সে তখন ভয়ানক চেঁচামেচি করতে লাগল, দরজায় লাথি মারতে লাগল! তার নতুন মা তার এই কাণ্ড দেখে ভয়ানক রেগে এসে দরজা খুলে তাকে টেনে বার করে মারতে মারতে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মণ্টি বাড়ীর সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল দেখে তিনি সদর বন্ধ করে দিয়ে উপরে চলে গেলেন। মণ্টি দোরের ধারে চৌকাঠের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, "ও মা! দোর খুলে দাও! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি দুষ্টুমি করব না।"

কিন্তু কেউ তাকে দরজা খুলে দিলে না। তখন ঠিক দুপুরবেলা, রাস্তায় লোকজন কেউ চলছিল না। বেচারী একলাটি সেইখানে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার ধারেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মণ্টির যখন ঘুম ভেঙে গেল, সে জেগে উঠে দেখলে যে, তার সেই পুরোনো মায়ের কোলে সে শুয়ে রয়েছে। আহ্লাদে গদগদ হয়ে সে তার মার গলা জড়িয়ে বললে, "মা তুমি এসেছ! এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি আমার লক্ষ্মী মা। নতুন মা বড় দুষ্টু। আমি তোমার কাছে থাকব।"

মণ্টির মা বললেন, "সেইজন্যেই তো তোমাকে আজ নিতে এসেছি। চল—তুমি আমার সঙ্গে চল।" মণ্টি আনন্দে নাচতে নাচতে তার মার হাত ধরে এগিয়ে চলল।

মার সঙ্গে গিয়ে মণ্টি ট্রামে উঠল। ট্রাম হ্যারিসন রোড দিয়ে বরাবর হাওড়ার দিকে চলল। হাওড়ার পোলের সামনে ট্রাম থেকে নেমে সে তার হাত ধরে হাওড়ার

পোল পার হয়ে গেল। মণ্টি এর আগে কখনো হাওড়ার পোল দেখেনি। পায়ের নীচে গঙ্গার অগাধ জল। তার উপর এই প্রকাণ্ড পোল ভাসছে। পোলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে মণ্টির খুব আহ্লাদ হচ্ছিল, আবার ভয়ও হতে লাগল, যদি পা ফস্কে জলে পড়ে যায়, তা হলে নিশ্চয় ডুবে যাবে! সে মার খুব কাছে ঘেঁসে তাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে চলল। পোল পার হয়ে তারা হাওড়ার স্টেশনে এসে রেলগাড়ী চড়লে। রেলগাড়ী চড়ে মণ্টির কি ফূর্তি! রেলে চলতে চলতে রাত্রি হয়ে গেল! মণ্টির মা মণ্টিকে কত কি খাবার দাবার কিনে খাওয়ালেন। খেয়ে দেয়ে সে মার কোলটিতে মাথা রেখে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোররাত্রে যখন মণ্টির ঘুম ভাঙল মা'য়ে পোয়ে তারা গরুর গাড়ী করে শুকপুর গ্রামের পথ দিয়ে চলেছে। মণ্টি জিজ্ঞাসা করলে, "মা, এ আমরা কোথায় যাচ্ছি?" তার মা বললে, "তোমার মামার বাড়ীতে, এ জায়গাটার নাম শুকপুর। তোমাকে আমি তোমার দিদিমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" মণ্টির একথা শুনে ভারী আনন্দ হল। অনেকদিন সে দিদিমাকে দেখেনি। দিদিমা তাকে কত আদরযত্ন করবেন, কত ভালবাসবেন। শুকপুরে সে নিশ্চয় সুখে থাকবে। সকালবেলা সূর্য ওঠবার আগেই তাদের গরুর গাড়ী একখানি সুন্দর পরিষ্কার কুটীরের সামনে এসে দাঁড়াল। মণ্টির মা মণ্টির হাত ধরে তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে তাকে বিদেয় করে দিলেন। তারপর মণ্টিকে সেই কুটীরের বন্ধদ্বারের কাছে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তোর দিদিমাকে ডাক, দরজা খুলে দেবেন। আমি ততক্ষণ ঐ পুকুর ঘাটে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে আসি।"

খোকার ডাকে তার দিদিমা এসে দরজা খুলে দিয়ে খোকাকে দেখে অবাক! "একি! মণ্টি! তুই এমন সময় একলাটি এখানে কার সঙ্গে এলি?" মণ্টি বললে, "কেন, আমি তো মার সঙ্গে এলুম।"

মণ্টির কথা শুনে দিদিমা চমকে উঠলেন—সে কি? খোকা এ কি বলছে? তার মা যে আজ একবৎসর হতে চলল মারা গেছে। তবে ও কার সঙ্গে এলো? বোধ হয় ওর বাবা আবার বিয়ে করেছে সেই বউয়ের সঙ্গে এসেছে। তিনি মণ্টিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললেন, "ওঃ তাই বুঝি তোর নতুন মার সঙ্গে এসেছিস? কই সে মেয়ে কোথা গেল?" মণ্টি সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল, "না গো না—নতুন মা নয় দিদিমা, আমার মা! আমার নতুন মা বড় দুষ্টু, সে আমাকে আসতে দিত না। আমার পুরোনো মা আমাকে নিয়ে এসেছে। মা আমাকে দরজা ঠেলে তোমাকে ডাকতে বলে ওই সামনের পুকুরে হাতমুখ ধুতে গেছেন।" মণ্টির দিদিমা কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কই কোন্ পুকুরে গেল চল

তো দেখি।" মণ্টি মহা উৎসাহে তার দিদিমাকে নিয়ে সেই পুকুরঘাটে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখতে পাওয়া গেল না। তখন দিদিমা মনে করলেন, ছেলেমানুষ! মাকে হয় তো ঠিক চিনতে পারে নি, গ্রামের অন্য কোন বউ-ঝিয়ের সঙ্গে এসেছে হয় তো! তাই বলছে, তার সঙ্গে এসেছি। তিনি বললেন, "আচ্ছা চল্ ঘরে চল্, সে এখুনি আসবে বোধ হয়।"

দিদিমার শোবার ঘরে ঢুকে মণ্টি দেখলে দেয়ালে তার মার একখানি বাঁধানো ফটোগ্রাফ ঝুলছে। মণ্টি বললে, "ঐ যে আমার মার ছবি রয়েছে, ওই মাই তো আমায় নিয়ে এল!" মন্টির দিদিমা তার কথা শুনে অবাক! শেষে সমস্ত শুনে তিনি বললেন, "আহা! মেয়েটা মরেও ছেলের মায়া ভুলতে পারে নি! ছেলেটার সেখানে বড়ই কষ্ট হচ্ছে দেখে নিজে সঙ্গে করে এনে আমার কাছে দিয়ে গেল।"

এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে একটা খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। কেউ কেউ বললে, ওটা আগাগোড়াই মিছে কথা। মন্টির মা আজ প্রায় পনেরো মাস হল মারা গেছেন, তিনি ওকে নিয়ে আসবেন কি করে? কিন্তু মন্টির দিদিমা ব্যাপারটা ঠিক অবিশ্বাস করতে না পেরে, মন্টির বাবাকে খবর দেওয়া উচিত ভেবে তাকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। তার জবার এলো যে সত্যিই সেদিন মন্টিকে মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে বাড়ীর দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় নি। তারপর আজ তিনদিন হল তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনার চিঠি পেয়ে খোকার সম্বন্ধে নিশ্চিত হলুম, কিন্তু মন্টির মার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, সেটা কি ঠিক? দিদিমা লিখলেন তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়, সত্যিই মন্টির মার প্রেতাত্মা তোমাদের কাছে ছেলের কষ্ট দেখতে না পেরে নিজে আবার পূর্বরূপ ধারণ করে তাকে ওখান থেকে এখানে এনে দিয়ে গেছে!

মন্টির বাবা এ চিঠি পেয়ে মন্টির নতুন মা বললে, "এ সব বাজে কথা! মানুষ, মরে গেলে আর ফিরে আসে না। এ সব ঐ বুড়ির চালাকি!"

মড়া কাটার ভয়ে

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ডাক্তারী কলেজে পড়তে পড়তে কেন যে আমি হঠাৎ ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিলুম তার আসল কারণটা কেউ জানে না। কাউকেও আমি বলিনি। তখন বলবার আমার কোন উপায় ছিল না, বললেও হয়তো কেউ বিশ্বাস করতেন না।

গুরুজনেরা জানেন মড়া কাটার ভয়ে ডাক্তারী পড়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। পাড়াপড়শীদের ধারণা হয়েছিল—আমি অকর্মণ্য, ফাঁকিবাজ, সেইটেই আসলে কারণ। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কোন কারণই খুঁজে পেতেন না, কেন ডাক্তার হবার এমন একটা সুযোগ আমি অবহেলায় নষ্ট করলুম। আসলে মড়া কাটবার ভয়েই আমি ডাক্তারী পড়া ছেড়েছিলুম। কিন্তু আত্মীয়েরা যেমনভাবে ভেবেছিলেন তেমনভাবে নয়। ব্যাপারটা তাহলে গোড়ার থেকেই বলি।

ডাক্তারী কলেজের প্রথম বছরের শেষের দিকটায় আমাদের অস্থিবিদ্যার পাঠ শুরু হলো। এক বাক্স মরা মানুষের হাড় কিনে আমার খাটের পিছনে আলমারির মাথায় রেখে দিলুম। বাড়ির বুড়ি ঝি—যে ছেলেবেলা থেকে আমাদের সকলকে মানুষ করেছে, সে রোজ রাত্রে আমার ঘরের দরজার কাছে মাদুর পেতে শুতো। যেদিন থেকে জানতে পারল ঘরে আলমারির মাথায় মরা মানুষের হাড় রয়েছে, সেদিন থেকে আমার ঘরের মেঝেতে শোওয়া ছেড়ে দিল সে।

আমি বললুম—কি হল রে বুড়ি?

বুড়ি বললে—না বাপু, রাত্রে ভয় করে।

—কই, আগে তো করত না। আমি বললুম—কিসের ভয়?

—তা জানিনে, বাপু। ঐ বাক্সের মধ্যে খড় খড় শব্দ করে, শুনতে পাও না?

আমি বললুম—ইঁদুর-টিদুর হবে হয়তো। তাতে আর ভয় কি?

বুড়ি ফোঁস করে বলল—এ ঘরে আবার ইঁদুর আসবে কোথা থেকে? বেড়াল ঘুরে বেড়ায় দেখতে পাও না? বেড়ালকে কি মাছ খাওয়াই না?

আমি বললুম—বুড়ি, তোমার কেন ভয় নেই। এই তো আমি ঘুমোই, আমার তো কিছু হয় না।

বুড়ি বলল—তোমাদের বুকের পাটা আলাদা, বাপু! তোমরা বড়ো বড়ো ডাক্তার হবে, তোমাদের কথা আলাদা। আমি আর ও-ঘরে শুতে পারব না।

সেই থেকে বুড়ি অন্য ঘরে শুতো।

অস্থিবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে মিলিয়ে আমাকে হাড়গুলির চর্চা করতে হত। বুড়ি যখন উঁকি মেরে দেখে যেত, একখানা মড়ার হাড় পরম যত্নে কোলে রেখে আমি তার উপর পেন্সিলের দাগ মারছি, তখন সে আমাকে নব্য ডাক্তার না ভেবে কাপালিক টাপালিক কিছু একটা ভাবত নিশ্চয়।

যাই হোক এমনি অস্থিচর্চা করতে করতে শেষে আমাদের শবদেহের চর্চার সময় উপস্থিত হল। ক্লাসের ছেলেদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে প্রত্যেক দু'জন ছাত্রের জন্য একটি করে মৃতদেহ দেওয়া হল। ছেলেরা ছুরি আর সন্না হাতে বসে গেল তাদের চিরে দেখতে।

কেন জানি না সে বছর যথেষ্ট শব পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাই আমি আর আমার বন্ধু অজিত প্রথমটা কোন মড়াই পাইনি। একটার পর একটা মড়া এসে শব-ব্যবস্থা গৃহের এক কোণ অবধি জমা হয়ে উঠতে লাগল—অজিত আর আমি তখনো কিন্তু খালি হাতে বসে।

অজিত ছেলেটিকে আমি ডাক্তারী কলেজে ভর্তি হবার আগে চিনতুম না। কিন্তু এখানে ভর্তি হয়ে অবধি তার সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্ব হয়েছে। বলতে কি, ডাক্তারী কলেজে সে-ই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিল। অজিতের সঙ্গে আলাপ হবার কিছুদিন পরেই আমি একদিন তাদের বাড়ি গিয়েছিলুম। অজিতের দুই দিদি সুনীতি আর প্রকৃতি তখন তাঁদের আসন্ন এম. এ. পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত। অজিতের চেয়ে তাঁরা তিন-চার বছরের বড়ো। দুই বোনের বয়সের তফাত বছরখানেক হবে, কিন্তু দু'জনে বরাবর স্কুলে ও কলেজে একই ক্লাসে পড়ে এসেছেন, তাই এম. এ. পরীক্ষাও দিচ্ছেন একই সঙ্গে।

এরকম সুন্দরী মেয়ে আমার খুব কমই চোখে পড়েছে, হয়তো দেখিইনি কখনো। আমাদের বাড়িতে এবং আত্মীয়াদের মধ্যে যাঁরা বেশ নামকরা সুন্দরী, তারাও এই দুই বোনের তুলনায় কিছুই নন। বিশেষ করে অজিতের ছোটদি প্রকৃতির তুলনা মেলা ভার। আমি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, অচেনা বাড়িতে প্রথম দিন এসেই মেয়েদের মুখের দিকে যে বোকার মতো তাকাতে নেই সেটা মনে ছিল না। মনে পড়তেই হঠাৎ এমন লজ্জা পেয়ে গেলুম যে আমার মাথা-নীচু হয়ে গেল, আর উঠতেই চায় না। শেষে অজিতের দিদিরা যখন গরম লুচি বেগুন ভাজা আর মিষ্টি নিয়ে আমাদের দু'জনকে খাওয়াতে এলেন এবং তাঁদের মিষ্টি স্বভাবের গুণে মুহূর্তে আমাকে আপন করে নিলেন তখন সত্যিই মনে হল, সুনীতি আর প্রকৃতি এঁরা আমারই দুই দিদি, কতকাল যেন এঁদেরই সঙ্গে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি।

আমার নিজের চার দিদি—কিন্তু কারুর সঙ্গেই আমার ভাব নেই। দিদিরা কত সময় কত জিনিস আমায় দিয়েছেন, ভাইফোঁটার সময় কত কী রেঁধে খাইয়েছেন—কিন্তু কোনদিন আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করিনি। সেজদি আর ছোটদিকে তো ছেলেবেলায় কত ঠেঙিয়েছি। বড়দি মেজদির বয়সটা একটু বেশী হওয়ার তাঁদের নাগাল পাইনি, নইলে বোধহয় তাঁদেরও পিট্টি দিতাম। এই নিয়ে কত ঝগড়া, কত কান্নাকাটি হয়েছে। মারামারি ঝগড়ার জন্য কোনদিন আমার ক্ষোভ হয়নি। সেদিন কিন্তু সেই লুচি আর বেগুন ভাজার থালা গ্রহণ করে আমার মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ল। সেদিন থেকে আমি অজিতদের বাড়ির

[illegible] ছেলে হয়ে গেলুম।

বাড়িতে এসে দিদিদের বললুম—আমার নতুন দিদিদের কথা। তারা তো হিংসায় জ্বলে মরল। সেজদি বলল—হ্যাঁ, রেখে দে তোর প্রকৃতিদি। ছোট দিদিমার চোখে সে সুন্দরী নাকি? ঐ তো দেখেছি তোর অজিতকে। ওরই তো বোন, কত আর হবে?

জানতুম দিদিদের মনে অসীম আগ্রহ জাগবে। অজিতের দিদিদের দেখবার জন্য সবাই ছটফট করে উঠবে। আমিও তাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাঁদের গুণ বর্ণনা করলুম। শেষে ঠিক হল সুনীতিদির আর প্রকৃতিদির পরীক্ষা হয়ে গেলেই একদিন তাঁদেরকে আর অজিতকে আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করা হবে। আমি গিয়ে বলে এলুম। সুনীতিদি আর প্রকৃতিদি তখনই রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু ঐ রাজী হওয়া পর্যন্তই হল; আমাদের বাড়িতে আসা বা দিদিদের সঙ্গে আলাপ হওয়া, কিছুই হয়ে উঠল না।

সুনীতিদিদের পরীক্ষা শেষ হবার আগে থেকেই জরুরী তাগিদ আসছিল তাঁদের মীরাটবাসী মাসীর কাছ থেকে, যাতে পরীক্ষা দিয়েই তারা মীরাটে আসে। মাসী উত্তর ভারত প্রদক্ষিণ করবার জন্য দিনস্থির করে বসে আছেন, বোনঝিরা এলেই তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। সুতরাং সুনীতিদি প্রকৃতিদির পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, সেইদিনই রাত্রের ট্রেনে দুই বোন চলে গেলেন মীরাটে। কথা দিয়ে গেলেন, ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে যাবেন।

তারপর ঘটল সেই ভয়ানক দুর্ঘটনা। উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে এক অন্ধকার রাতে নির্জন এক নদীর ধারে তাঁদের ছুটন্ত ট্রেন লাইন ফস্কে জলের উপর উল্টে পড়ল। ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে কতজন যে মারা পড়ল তার সঠিক কোন হিসেব পাওয়া গেল না। প্রকৃতিদির আর মাসীমার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। শুধু সুনীতিদি দিন-পনেরো হাসপাতালে ভুগে মাথায় পট্টি বেঁধে কলকাতায় ফিরে এলেন। পট্টি যখন খোলা হল তখন দেখা গেল, তাঁর একটি চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া সুন্দরী বলে তাঁকে আর চেনা যায় না। কোনদিন যাবেও না। সুনীতিদির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ওদের সঙ্গে আমিও তো চলে গেলে পারতুম।

এর পরে সুনীতিদির বা প্রকৃতিদির আমাদের বাড়িতে আসার আর প্রশ্নই উঠল না।

অজিত ছেলেটি ছিল খুব সংযত, খুব চাপা। তার মনের মধ্যেকার তোলপাড় সে চাপা দিয়ে কলেজে আবার যখন নতুন অস্থিবিদ্যার চর্চা হচ্ছে তাতেই

মনোযোগ দিল। কলেজের প্রায় কেউই তার পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা জানতে পারল না। আমাকেও বলে দিল, এ নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা না করতে।

অজিতের সঙ্গে আমার ক'দিনেরই বা আলাপ, তারই মধ্যে এতোগুলি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমার মনে হত যেন কত বছরের আলাপ অজিতের সঙ্গে। কেমন করে জানি না, এই সবের পরে অজিতের উপর আমার একটা মস্ত টান গিয়ে পড়ল। মনে হল, অজিতের মতো এমন প্রিয় বন্ধু আমার আর নেই। অজিতের সঙ্গে তাই প্রাণভরে মিশতুম, লেখাপড়াও করতুম প্রায় একই সঙ্গে।

দু'জনে মিলে অস্থিবিদ্যার চর্চা করতুম এক জায়গায় বসে। অজিত আমার মুখস্থ ধরত, আমি ধরতুম অজিতের। আমাদের লেখাপড়া বেশ ভালোই চলছিল। কতদিনে একটি শব পাব যার ত্বক পেশী ও শিরা-উপশিরাগুলিকে আলাদা করে ছাড়িয়ে দেখব। দেখব আমাদের বই-পড়া বিদ্যে মুখস্থ বিদ্যের সঙ্গে মিলছে কিনা। এই নিয়ে অজিতের সঙ্গে প্রায়ই আমার আলোচনা হত। আমরা মড়া না পেয়ে সত্যিই একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলুম। অন্য ছাত্রদের শবচ্ছেদ মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতুম বটে, কিন্তু তাতে মন উঠত না।

সে-বছরের কোর্স অনুযায়ী আমাদের ব্যবচ্ছেদ করবার কথা একখানি করে হাত। অজিতকে আমি বলতুম—ওরে, পুরো মানুষ না পাওয়া যাক, একখানা ছেঁড়া হাতও জোটে না ভাগ্যে!

অজিত বলত—অতো যদি তোর তড়িঘড়ি, কাট তবে আমারই একখানা হাত—কাট!

এইভাবেই চলছিল। একদিন দুই ক্লাসের ফাঁকে অজিতের সঙ্গে বসে গল্প করছি এমন সময় হঠাৎ একটি ছেলে এসে খবর দিয়ে গেল, আমাদের জন্য একটা মড়া এসেছে। আমি লাফিয়ে উঠলুম। এতদিন অপেক্ষা করার পরেও এ তো মড়া নয়, হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেলুম। আমরা দৌড়ে আমাদের মড়াটা দেখে এলুম। ভিজে কাপড়ে চাপা শুকনো এক মৃতদেহ ঘরের এককোণে এক টেবিলে শোয়ানো রয়েছে। এখনো অক্ষত, ঘরের অন্যান্য শবের মতো ছিন্ন ভিন্ন নয়। আমি বললুম—আজই লেগে যাব। আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারি না, কি বলিস?

অজিত আমার মতো অতটা উৎসাহ দেখাল না। সেদিন তার শরীরটা তেমন ভালো ছিলো না। আগে থেকেই বাড়ি যাব-যাব করছিল। তাকে আমতা-আমতা করতে দেখে আমি বললুম—অজিত, তুই বরং আজ বাড়ি যা, তোর শরীর খারাপ। ভালো করে ঘুম দে গে। আমি আজ ক্লাসের পর মড়াটাকে তৈরী করে রাখবো, একটু আধটু আঁচড়ও পারি তো দেব। তারপর কাল থেকে দু'জনে

শকুনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে লাশটার ওপর।

সেদিন শেষ ক্লাসের পর অজিত বাড়ি চলে গেল, আর আমি একটু হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে তৈরি হয়ে নিতে লাগলুম শব-ব্যবচ্ছেদের প্রথম অভিযানের জন্য।

বেশ পেট ভরে চা, বিস্কুট আর রুটি খেলুম, যেন কোন উৎসবে যাচ্ছি। তারপর কাটা-কুটির যন্ত্রের বাক্সটা বগলদাবা করে চললুম মড়ার ঘরের দিকে।

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার খুব দেরী নেই। অন্য ছাত্ররা দিনের বেলাতেই নিজেদের কাজ সেরে নিয়েছিল। মড়ার ঘরে কেউই ছিল না—ঘর খালি। শুধু দেখলুম আমাদের মড়ার টেবিলের কাছে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমটা মনে হল, হাসপাতালের কোন নার্স অথবা উঁচু ক্লাসের কোনো ছাত্রী-টাত্রী হবেন। কিন্তু যেরকমভাবে নীচু হয়ে তিনি একমনে আমার মড়াটাকে পরীক্ষা করছিলেন তাতে কেমন যেন একটু আশ্চর্য লাগল। এমনভাবে মড়াটার মাথা দেখবার কি আছে? আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলুম। মহিলাটি আমায় দেখতে পাননি। যখন খুব কাছে এসেছি তখন হঠাৎ আমার উপস্থিতি অনুভব করে একটু চমকে উঠে সরে গেলেন। আমি দেখলুম, তাঁর মুখে যেন একটা অপরিসীম ক্লান্তি এবং দুঃখের ছায়া। এ-রকম একটা মুখ দেখব বলে আশা করিনি—হঠাৎ তাই কিছু বলতে পারলুম না।

আমি কথা বলবার আগেই মহিলাটি মুখ খুললেন। বললেন—আপনারই লট-এ বুঝি এই শবটি পড়েছে?

আমি বললুম—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

তিনি বললেন—আপনাকে একটি অনুরোধ করছি। এ মড়া আপনি কাটবেন না। কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে। এটা বেওয়ারিশ লাশ নয়। এ আমারই এক আত্মীয়ের দেহ। কি করে এখানে এলো বুঝতে পারছি না। আমি কতৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে এ লাশ এখান থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করব। তার আগে আপনাকে অনুরোধ, এর গায়ে হাত দেবেন না। এই বলেই মহিলা ব্যস্ত হয়ে দ্রুতপদে ঘর পার হয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, বোধহয় কর্তৃপক্ষেরই উদ্দেশ্যে।

যন্ত্রের বাক্স হাতে স্তব্ধ হয়ে আমি খানিকক্ষণ বসে রইলুম। তারপর হতাশ মনে ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে দেখি শীতের আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে, একটা ভিজে হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

প্রথমেই চললুম আমি অজিতকে খবর দিতে। হাতে লাশ পেয়ে এমনভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে, এরকম নিরাশ জীবনে আমি কখনো হইনি। অজিতের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বৃষ্টি এসে গেল। দৌড়ে গিয়ে যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকলুম, তখন

জামা-কাপড় ভিজে গেছে। অজিতের মা আমায় শুকনো কাপড় দিলেন এবং বললেন, অজিত এখনো বাড়ি ফেরেনি।

অজিত একটু পরেই ফিরল, ভিজতে ভিজতে। তার এই অদূরদর্শিতার জন্য আমার কাছে বকুনি খেল, অজিতের মা-ও বকলেন।

অজিত বলল—বাড়ি এলেই তো বন্দী। তাই আড্ডা-টাড্ডা মেরে ফিরলুম, এইবার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বো আর কি?

বিছানায় ঢলে পড়তেই অজিতের তেড়ে জ্বর এলো। আমি তাকে সংক্ষেপে সেদিনের ঘটনার উল্লেখ করে বললুম আবার কতদিনে একটা বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া যায় দেখ।

অজিত বলল—দুঃখ করিসনে। জ্যান্ত মানুষ হাতছাড়া হয়ে যায়, এ তো একটা মড়া।

অজিতকে আর না বকিয়ে সেদিন আমি বাড়ি ফিরে গেলুম। মন বড়ো চঞ্চল হয়েছিল, আমার ন্যায্য অধিকারে কে যেন হাত দিয়েছে, তাই যেমন বিরক্ত বোধ করছিলুম তেমনি আবার সেই মহিলাটির দুঃখ-ক্লান্ত মুখের কথা মনে করে মায়াও লাগছিল। আহা বেচারার আত্মীয়ার দেহ—তার সদ্‌গতি না হলে তিনিই বা শান্তি পাবেন কোথা থেকে? আচ্ছা, কেমন করে তিনি দেহটার সন্ধান পেলেন? সেইটেই আশ্চর্য! নিশ্চয় অনেকদিন ধরে ওৎ পেতে ছিলেন—যেমনি টেবিলে লাশ আসা, অমনি এসে ছোঁ মেরে পড়েছেন। কিন্তু এই কেশহীন বর্ণহীন শুষ্ক কঠিন মৃতদেহ, একে শনাক্ত করলেন কি করে? বাহাদুরি আছে বলতে হবে!

নানা চিন্তায় রাত্রে ভালো ঘুম হল না। সকালে একটু বেলা করে উঠে মুখে ভাত গুঁজে কলেজে গেলুম। প্রথমেই খোঁজ নিলুম আমার মড়া সরানো হয়েছে কিনা—কেউ সে লাশ দাবী করেছে কিনা।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম, শুনলুম কেউই লাশ দাবী করতে আসেনি। শুনলুম, এতদিন পরে ও লাশ দাবী করবার কারুরই নাকি অধিকার নেই। দাবী করবার সময়ের সীমা বহুদিন হল পেরিয়ে গেছে। মৃতদেহ এত বিকৃত হয়ে গেছে যে, তাকে শনাক্ত করা অসম্ভব। করলেও কর্তৃপক্ষ তা মানবেন না। শুনে আমার খারাপ লাগল। মহিলার জন্য দুঃখ হল। মড়াটা শুনলুম পাওয়া গিয়েছিল বিহারের কোন এক অঞ্চলে। পুলিশের কাছে বহুদিন পড়ে থাকার পর লাশটাকে বেওয়ারিশ বলে ঘোষণা করে স্থানীয় ডাক্তারী কলেজে দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে লাশের প্রয়োজন না থাকায় কলকাতায় চালান দেওয়া হয়েছে।

অন্য ছাত্ররা শব-ব্যবচ্ছেদ-গৃহে গেল যে-যার মড়ার কাছে। পাছে মহিলা

আসে পড়েন এই ভেবে আমি গেলুম না। কিন্তু সারাদিন মহিলার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। আমি তখন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলুম যে, তিনি বোধহয় নিরাশ হয়ে তাঁর দাবী ত্যাগ করেছেন। ক্লাসের শেষে আরও একবার খোঁজ নিলুম তিনি এসেছিলেন কিনা। শুনলুম, আসেননি। মড়াটা কাটতে পারি কিনা জিগ্যেস করাতে উত্তর পেলুম, আলবাৎ পারি—ও দেহের সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদাগারের, আর কারুর নয়।

এই শুনে আমার আবার মড়া কাটবার উৎসাহ ফিরে এলো। গোড়ায় ভেবেছিলুম, অজিতের জ্বর সেরে গেলে দু'জনে এক সঙ্গে কাজ আরম্ভ করব কিন্তু হাত নিশ-পিশ করে উঠল; মনে হল, অন্তত দু-একটা আঁচড় মেরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া যাক।

এই ভেবে মড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। সেদিনও ছাত্ররা যে-যার কাজ শেষ করে চলে গিয়েছিল। ঘর খালি। মড়ার ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ নাকে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলুম, কী আশ্চর্য, আজও সেই মহিলা আমার মড়ার কাছে একটা উঁচু টুলের উপর বসে রয়েছেন।

আমাকে ঘরে ঢুকতে তিনি দেখেছিলেন। মনে হল, আমারই জন্য যেন অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই বললেন—দেখুন, এ দেহ আপনি কাটতে পারেন কিন্তু অজিত যেন না ছোঁয়।

আমি অবাক হয়ে বললুম—আপনি অজিতকে চেনেন নাকি?

মহিলা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটু থেমে একটা নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন—এ দেহ অজিতের দিদির প্রকৃতির।

সে কি!

কিসের যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলুম। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেল—পাশের টুলটা শক্ত করে চেপে ধরলুম। দেখি, মহিলা দ্রুত পদে ঘর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। আমি চেঁচিয়ে বললুম—আপনি কে ?

মহিলা এক মুহূর্ত থমকে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসলেন, তারপর দ্রুততর গতিতে দরজা পার হয়ে চলে গেলেন।

এইবার আমি চিনলুম। কোনদিন চাক্ষুষ দেখিনি, কিন্তু অজিতের মাকে তো দেখেছি— সেই কপাল, সেই চোখ। অজিতের মীরাটের মাসী, যিনি ট্রেন-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন—তিনি ছাড়া আর কেউ নন।

একা আমি শব-ব্যবচ্ছেদ-গৃহের মধ্যে—আমার সামনে পড়ে আছে যার বিকৃত গলিত দেহ, এই কিছুদিন আগেও তাঁকে দেখে ভেবেছিলুম, তাঁর মতো

সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। সেই শীতের সন্ধ্যায় কপালের ঘামটা মুছে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

কী করা যায় এখন। যা দেখলুম যা শুনলুম তা কি বিশ্বাস করব, না ভুয়ো বলে উড়িয়ে দেব? ভুয়োই হোক আর সত্যই হোক অজিতকে কিন্তু ও-মড়া ছুঁতে দেওয়া হবে না। আমিও যে ছোঁব না তাও একরকম প্রায় স্থির।

চললুম সোজা অজিতদের বাড়ি। অজিতের মা'র সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন—অজিতের জ্বরটা আজ বেড়েছে। ঘুমোচ্ছে বোধহয়। সুনীতি ঘরে আছে। যাও বাবা, তুমি দেখে এসো।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর। বারান্দা দিয়ে পা টিপে টিপে ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম। শীতের আকাশের কালো মেঘে বারান্দাটাও আবছা আঁধারে ঢাকা। সেখানে দাঁড়িয়ে একটু থমকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারলুম। অজিত ঘুমোচ্ছে। বুকের উপর একখানা হাত নিশ্বাসের সঙ্গে উঠছে আর নামছে। কিন্তু তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ও কে? সুনীতিদি তো নয়—ও যে প্রকৃতিদি। স্পষ্ট, হুবহু ঠিক আগের দিনের মতো, অজিতের সেই ছোটদি যে আমায় গরম লুচি আর বেগুন ভাজা খাইয়েছিল।

মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। চোখ মুছতে মুছতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকলুম। যখন অজিতের মাথার কাছে এলুম তখন দেখলুম সুনীতিদিই দাঁড়িয়ে নীরবে তাকে বাতাস করে চলেছেন।

আমি ফিস্ ফিস্ করে বললুম—অজিত এখন ঘুমোচ্ছে, আমি যাই। কাল আবার আসব।

সুনীতিদি কিছু বললেন না, শুধু একটু ঘাড় নাড়লেন।
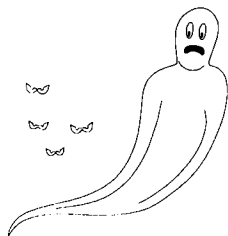
কামিনী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেশনে ট্রেন থামিতেই হ্যাট-কোট পরা সুরনাথবাবু নামিয়া পড়িলেন। স্টেশন ছোট, তাহার সংলগ্ন জনপদটিও বিস্তীর্ণ নয়; ট্রেন দু'মিনিট থামিয়া চলিয়া গেল।

সুরনাথ ঘোষ একজন পোস্টাল ইন্সপেক্টর। সম্প্রতি এদিকটার গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নূতন পোস্ট অফিস খুলিয়াছে, সুরনাথবাবু সেগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি এদিকে কখনো আসেন নাই।

ছোট সুটকেসটি হাতে লইয়া তিনি স্টেশন হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে অন্য কোন লটবহর নাই। সুটকেসের মধ্যে আছে এক সেট প্যান্টুলুন ধুতি গামছা সাবান, দাঁত মাজিবার বুরুশ ইত্যাদি।

স্থানীয় পোস্ট অফিসটি স্টেশনের কাছেই। ডাক এবং তার দুই-ই আছে, কিন্তু সবই শহরের অনুপাতে; একজন পোস্টমাস্টার, একটি কেরানী ও দু'জন পিওন। পোস্ট অফিসের পশ্চাদ্ভাগে পোস্টমাস্টার সপরিবারে বাস করেন।

বেলা আন্দাজ এগারটার সময় সুরনাথবাবু পোস্ট অফিসে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, পোস্টমাস্টার খাতির করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে আহারাদির ব্যবস্থা পোস্টমাস্টার বাবুর বাসাতেই হইল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সুরনাথবাবু ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার ধড়াচূড়া পরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর পাইয়াছেন, যে তিনটি পোস্ট অফিস পরিদর্শনে তিনি যাইবেন তাহার মধ্যে

সবচেয়ে যেটি নিকটবর্তী সেটি বারো মাইল দূরে। কাঁচা-পাকা রাস্তা আছে। সুরনাথ 'তার' পিওনের সাইকেলটি ধার লইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার সময় উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছবেন, কাল সকালে সেখানকার পোস্টঅফিস তদারক করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিবেন, তারপর আবার অন্য পোস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন।

সাইকেলের পশ্চাদ্ভাগে ছোট সুটকেসটি বাঁধিয়া সুরনাথ তাহাতে আরোহণের উদ্যোগ করিলে পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'এখান থেকে মাইল পাঁচ ছয় দূরে রাস্তা দু ফাঁক হয়ে গেছে। ডান হাতি রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু আপনি ওই রাস্তা দিয়েই যাবেন।'

সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, বাঁ-হাতি রাস্তা কি দোষ করেছে?'

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'ও রাস্তাটা ভাল নয়।'

সাইকেলে আরোহণ করিয়া সুরনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি শহরের এলাকা পার হইলেন। তারপর অবারিত মুক্ত দেশ।

দেশটা বর্ণসংকর। অবিমিশ্র পলিমাটি নয়, আবার নির্জন মরুকান্তারও নয়। স্থানে স্থানে ঘন বন আছে, কোথাও নিস্তরুপাদপ। শিলাভূমি, কোথাও নরম মাটির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুক্ষ পাথরের ঢিবি মাথা তুলিয়াছে। এই বিচিত্র ভূমির উপর দিয়া নির্জন পথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে।

আকাশে পৌষ মাসের স্নিগ্ধ সূর্য, বাতাসে আতপ্ত আরাম। সুরনাথ প্রফুল্ল মনে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। মাত্র বারো চৌদ্দ মাইল পথ সাইকেলে যাইতে কতই বা সময় লাগিবে।

সুরনাথের বয়স চল্লিশ বছর। মধ্যমাকৃতি দৃঢ় শরীর, মুখশ্রী মোটের উপর সুদর্শন। তিনি বিপত্নীক, বছর তিনেক আগে স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন, কিন্তু বিপত্নীকত্বের ফলে যে ক্ষণিক স্বাধীনতাটুকু লাভ করিয়াছেন তাহা বিসর্জন দিতেও মন চাহিতেছে না।

তিনি যখন ছয় মাইল দূরস্থ পথের দ্বিভুজে পৌঁছাইলেন তখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে দুইটি পথ ক্রমশ পৃথক হইতে হইতে ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে; মাঝখানে উঁচু জমি তাহার উপর তাল খেজুরের গাছ মাথা তুলিয়া আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, চারিদিক অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গেল। সুরনাথ পথের সন্ধিস্থলে সাইকেল হইতে নামিলেন।

আশে পাশে নিকটে দূরে জনমানব নাই। আকাশ নির্মল, কেবল সূর্যের মুখের

উপর একটুকরা মেঘ লাগিয়া আছে, যেন সূর্য মুখোশ পরিয়াছে, সুরনাথ একটু চিন্তা করিলেন। এখনো ছয়-সাত মাইল পথ বাকি, আধঘণ্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাইবে; অন্ধকার হইবার পূর্বে যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে না পারেন, দিকভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

পোস্টমাস্টার বলিয়াছেন বাঁ-হাতি রাস্তা ভাল নয়, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। সুতরাং বাঁ হাতি রাস্তা দিয়া যাওয়াই ভালো।

সুরনাথ সাইকেলে বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিলেন। পোস্টমাস্টার মিথ্যে বলেন নাই, পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ, কিন্তু সাবধানে চলিলে আছাড় খাইবার ভয় নাই। সুরনাথ সাবধানে অথচ দ্রুত সাইকেল চালাইলেন।

সূর্যের মুখ হইতে মেঘ কিন্তু নড়িল না। মনে হইল মুখে মুখোশ আঁটিয়াই সূর্যদেব অস্ত যাইবেন।

মিনিট কুড়ি সাইকেল চালাইবার পর সুরনাথ সামনে একটি দৃশ্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। অস্পষ্ট আলোতে মনে হইল যেন রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট কুটির দেখা যাইতেছে, দু'একটা আবছায়া মূর্তিও যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আরও কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া সুরনাথ ব্রেক কষিলেন। একটি ছোট মাটির কুটির যেন মন্ত্রবলে রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশে পাশে অন্য কোন কুটির দেখা যায় না; এই কুটিরটি যেন গ্রামে প্রবেশের মুখে প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া আছে। সুরনাথ রাস্তার ধারে যেখানে সাইকেল হইতে নামিলেন সেখান হইতে তিন গজ দূরে কুটিরের দাওয়ায় খুঁটিতে *ঠেস্* দিয়া একটি যুবতী বসিয়া আছে। সুরনাথের চোখের সহিত তাহার চোখ চুম্বকের মতো আবদ্ধ হইয়া আছে। চাষার মেয়ে! গায়ের রং মাজা পিতলের মতো পীতাভ, দেহ যৌবনের প্রাচুর্যে ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখের ডৌল দৃঢ়, তাহাতে প্রগলভতার সমাবেশ। মাথার অযত্নবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে একটু পিঙ্গলতার আভাস, চোখের তারা বড় বড়। পরিধানে কেবল একটি কস্তাপাড় শাড়ি, অলঙ্কার নাই। সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না। তার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন আগুন রাঙা চুল্লীর দিকে চাহিয়া আছি।

"হ্যাঁগো, তুমি কোথায় যাবে?" যুবতী প্রশ্ন করিল। দাঁতগুলি কুন্দশুভ্র, গলার স্বর গভীর ও ভরাট; কিন্তু বলিবার ভঙ্গী গ্রাম্য।

সুরনাথের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের অনভ্যস্ত একটা অন্ধ আবেগের স্বাদ তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি লঘুচেতা লোক নন, সবলে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন—,'রতনপুর'।

যুবতী দাওয়ার কিনারায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে প্রগল্‌ভতা ছাড়াও এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ুশিরায় আগুন ধরাইয়া দিতে পারে। শেষে হাসি থামাইয়া সে বলিল, 'রতনপুর যে অনেক দূর, যেতে যেতেই রাত হয়ে যাবে, পৌঁছতে পারবা না।'

সুরনাথ রাস্তার দিকে চাহিলেন। দূর হইতে যে গ্রামের আভাস পাইয়াছিলেন সন্ধ্যার ছায়ায় তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। তিনি উদ্বেগ স্বরে বলিলেন, 'তাহলে গ্রামে কি কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

'এখানেই থাকো না!'

সুরনাথ চকিত চক্ষে যুবতীর দিকে চাহিলেন। যুবতীর দৃষ্টিতে দুরন্ত আহ্বান, আরও কত রহস্যময় ইঙ্গিত। সুরনাথের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি শরীর শক্ত করিয়া নিজেকে সংবরণ করিলেন, একটু স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'বাড়ির পুরুষেরা কোথায়?'

যুবতী দূরের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল; 'তারা মাঠে গেছে, সারারাত ধান পাহারা দেবে। মাঠে ধান পেকেছে, পাহারা না দিলে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে।'

সুরনাথ কণ্ঠের মধ্যে একটা সংকোচন অনুভব করিলেন, বলিলেন, 'তা— যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই থাকব।'

যুবতী দর্শনচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাসিল, প্রায়ান্ধকারে তাহার হাসিটা তড়িদ্দীপালির মতো ঝলকিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোমার গাড়ি দাওয়ায় তুলে রাখো। আমি আসছি।'

যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল, একটি মাদুর আনিয়া দাওয়ার একপাশে পাতিয়া দিল। এক ঘটি জল ও গামছা খুঁটির পাশে রাখিয়া বলিল, 'হাত মুখ ধোও। চা খাবে তো? আমি এখনই তৈরী করে আনছি।'

যুবতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সুরনাথ হাত মুখ ধুইয়া মাদুরে বসিলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আলোর পীতবর্ণ ধারা দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল।

বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। চরাচর গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সুরনাথ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মানসিক অবস্থার বর্ণনা অনাবশ্যক। ব্যাধ শরাহত মৃগ, বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মানসিক অবস্থা কে কবে বিবৃত করিয়াছে!

'এই নাও, চা এনেছি!' চা দিতে গিয়ে আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইল—'আমি রান্না চড়াইতে চললুম।'

সুরনাথ ক্ষীণস্বরে আপত্তি তুলিলেন, 'আমার জন্যে আবার রান্না কেন? ঘরে

মুড়ি মুড়কি যদি কিছু থাকে, তাই খেয়ে শুয়ে থাকব।'

'ওমা, মুড়ি মুড়কি খেয়ে কি শীতের রাত কাটে! রাত-উপোসী হাতী টলে। তোমার অত লজ্জায় কাজ নেই, এক ঘন্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে।'

যুবতী চলিয়া গেল। সুরনাথ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন। পিতলের বাটিতে গুড়ের চা, কিন্তু খুব গরম। তাহাই ছোট ছোট চুমুক দিয়া পান করিতে করিতে তাঁহার শরীর বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কুটিরের মধ্যে দুটি ঘর—একটি রান্না ঘর, অপরটি বোধ হয় শয়ন কক্ষ। তিনি অনুমান করিলেন দাওয়ায় মাদুরের উপর তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইবে। সেই ভাল হইবে। কোন মতে রাত কাটাইয়া ভোর হইতে না হইতে তিনি চলিয়া যাইবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে যুবতী দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'ভাত বেড়েছি, খাবে এসো।'

সুরনাথ উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরটি বেশ আতপ্ত। পিঁড়ের সামনে ভাতের থালা, প্রদীপটি কাছে রাখা হইয়াছে। আয়োজন সামান্যই ভাত ডাল এবং একটা চচ্চড়ি জাতীয় তরকারী।

সুরনাথ আহারে বসিলেন। যুবতী অতি সাধারণ গৃহস্থালির কথা বলিতে বলিতে ঘরের এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরনাথ লক্ষ্য করিলেন, রান্না করিতে করিতে যুবতী কখন পায়ে আলতা পরিয়াছে!

যুবতী সুরনাথের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতেছে, অথচ তিনি হুঁ হাঁ ছাড়া কিছুই বলিতেছেন না। বিপদের সময় যে ডাকিয়া ঘরে আশ্রয় দিয়াছে, খাইতে দিয়াছে, তাহার সহিত অন্তত একটু মিষ্টালাপ করিবার প্রয়োজন আছে। তিনি শামুকের মতো খোলার ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার নাম কি?'

এক ঝলক হাসিয়া যুবতী বলিল, 'কামিনী'।

নামটা তপ্ত লোহার মতো সুরনাথের গায়ে ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। তিনি শামুকের মতো আবার খোলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আহারান্তে সুরনাথ হাত মুখ ধুইলে কামিনী বলিল, 'পাশের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি, শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরনাথের বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। তিনি তোতলা হইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি—আমি বাইরে মাদুরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা বাইরে শোবে কি! শীতে কালিয়ে যাবে যে। যাও বিছানায় শোও গিয়ে।'

সুরনাথ কথা কাটাকাটি করিলেন না, কামিনী রাত্রে কোথায় শুইবে প্রশ্ন করিলেন না, দণ্ডাজ্ঞাবাহী আসামীর মতো শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর খড় পাতিয়া তাহার উপর তোশক বিছাইয়া শয্যা। সুরনাথ সুটকেস আনিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিলেন, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া শয়ন করিলেন।

চোখ বুজিয়া তিনি পাশের ঘরে খুট-খাট ঠুন-ঠান বাসন-কোসনের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনের উত্তাপ একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল।

চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি আচ্ছন্নের মতো হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন কামিনী নিঃশব্দে কখন তাঁহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, তাহার মুখে বিচিত্র হিংস্র মধুর হাসি।

তিনদিন পর্যন্তও সুরনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন না তখন পোস্টমাস্টারবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন! কেবল সুরনাথবাবুর জন্যে নয়, সেই সঙ্গে পোস্টঅফিসের সম্পত্তি সাইকেলটিও গিয়াছে। পোস্টমাস্টার পুলিশে খবর দিলেন।

পুলিশ খোঁজ লইল। সুরনাথের যে তিনটি পোস্টঅফিসে যাইবার কথা সেখানে তিনি যান নাই। পুলিশ তখন রীতিমতো তদন্ত আরম্ভ করিল।

সাতদিন পরে সুরনাথকে পাওয়া গেল। বাঁ হাতি রাস্তায় একটিও কুটির নাই, সেই রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সাইকেলটা অনতিদূরে মাটিতে লুটাইতেছে। তাহার পশ্চাতে সুরনাথের সুটকেশ রহিয়াছে, সুটকেসের মধ্যে কাপড় চোপড় সাবান মাজন বুরুশ সমস্তই মজুত আছে! কিছু খোয়া যায় নাই।

সুরনাথের দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন নাই। কিন্তু দেহটি প্রাচীন মিশরীয় 'মমি'র মতো শুষ্ক ও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, যেন রক্ত-চোষা বাদুড় দেহটা শুষিয়া লইয়াছে।

পুলিশ হাসপাতালে লাশ চালান দিল। পোস্টমাস্টার যখন সুরনাথের মৃত্যু বিবরণ শুনিলেন তখন তিনি আক্ষেপে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা! ডাইনীর হাতে পড়েছিলেন। কামিনী ডাইনী এখনো তল্লাটে আছে, মায়া বিস্তার করে বেচারিকে টেনে নিয়েছিল। আমি ইন্সপেক্টরবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বাঁ হাতি রাস্তা ভাল নয়। কিন্তু উনি তা শুনলেন না।'

ভূত যদি রসিক হয়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'তাহলে তাঁকে চেনা দায়।'

ওপরের শিরোনামার সঙ্গে নীচের এই স্তব্যটি যে কার লেখা, আর কোথায় বা পেয়েছি, তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

হ্যাঁ, আমাদের এই শহরের সবচেয়ে লম্বা পাড়ির বাসরুটের একটি প্রায় খালি হয়ে আসা বাসের একটি বেঞ্চিতে, সম্পূর্ণ বেওয়ারিশ অবস্থায় পাওয়া লাল সালু বাঁধা পুঁটলির ছেঁড়া খোঁড়া খেরো খাতাটি থেকেই সম্পূর্ণ বাক্যটা উদ্ধার করা।

উক্তিটা সেই মেজকর্তারই, মহাভারত প্রমাণ পুরো খেরো খাতাটি ঘেঁটে ওই নামটুকুর বেশি আর যা পরিচয় তার যোগাড় করতে পেরেছি, তা নেহাত আনুমানিক ছাড়া আর কিছু নয়।

মেজকর্তা লিখেছেন, 'ভূত যদি রসিক হয় তাহলে তাঁকে চেনা দায়।'

এইটুকু লিখে মেজকর্তা যেন আর কিছু লিখবেন কিনা, সে বিষয়ে দোনামনা হয়েছেন মনে হয়।

ওপরের কথাগুলো খেরোখাতার একটি পাতার একেবারে মাথাতেই লেখা। কিন্তু সে লেখা একটা যে চালিয়ে যাওয়া হয়নি, লেখাটির কালি আর চেহারাতেই তা সহজে ধরা য়ায়।

কথা দুটো একটু কালচে কালিতে বেশ একটু মোটা গোছের 'নিব'-এ লেখা লেখার পরে কালোর বদলে নীলচে কালিতে একটু সরু গোছের নিব-এর কলমে যা লেখা হয়েছে, ওপরের অক্ষর-গুলির তুলনায় তা অনেক কম ফ্যাকাশে। তাছাড়া আগের লেখা বাক্যটি যতদূর মনে হয়, বহুকাল আগে যার খুব চল ছিল সেই 'রিলিফ' নিব-এ লেখা! আর পরের ঈষৎ নীলচে কালির বাকি সমস্ত লেখা সে-কালের 'রেড ইংক 'জি' মার্কা নিব-এর কলমে।

লেখার ধরন-ধারণ চেহারা নিয়ে এ গোয়েন্দাগিরিতে আর কিছু না হোক, লেখাটা প্রথম শুরু করবার পরই মেজকর্তা যে বহুদিন তাতে আর হাত দেননি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

ব্যাপারটা এমন কিছু হয়তো নয়, তবু এটা নিয়ে ভেবে কিছুটা সময় খরচ করেছি। শেষ পর্যন্ত একটা উত্তরই পেয়েছি ভেবে চিন্তে। বিবরণটায় এমন কিছু হয়তো আছে, যার জন্য লেখা আরম্ভ করেও মেজকর্তাকে দ্বিধা ভরে কলম

থামিয়ে আর এগোবেন কিনা ভাবতে হয়েছে।

একটা লাইন মাত্র লিখে যার জন্যে মেজকর্তাকে কিছুদিন হাত গুটিয়ে থাকতে হয়েছে, সে কারণটা কি হতে পারে?

কারণটা যাই হোক, সমস্ত লেখাটা না পড়ে তা আর বোঝা যাবে কি করে? সুতরাং মেজকর্তার বিবরণটাই তাঁর ভাষায় লিখে জানাচ্ছি।

প্রথম লাইনের পর একটু ফাঁক দিয়ে মেজকর্তা সরাসরি বিবরণে নেমে গেছেন।

না, মুকুন্দরাম হয়তো খুব বাড়িয়ে বলেনি। জায়গাটার বর্ণনা অন্ততঃ দিয়েছে চমৎকার। সমস্ত জায়গাটার কেমন যেন একটা গন্ধ আছে। কিছুটা ভেতরের দিকে যাবার পরই তা নাকি পাওয়া যায়। বুঝিয়ে দেবার মতো বিশেষণ, কি উপমা যার খুঁজে পাওয়া যায় না সেই গন্ধ।

মজা-হাজা, এঁদো পচা, পানা ভরা সব ডোবা, পুকুর, দীঘি, আর ভেঙে পড়া, ধসে পড়া আধা জঙ্গলে ঢাকা সব এধারে ওধারে নোনা ধরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া ইঁটের স্তুপের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে বিশাল বিশাল অশ্বত্থ, বট, শিরিষ গোছের সব গাছের ডালপালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ে চারিদিকের মাটি ছেয়ে জমে ওঠা পাতার রাশির সব মেলানো কেমন যেন একটা ভিজে ভিজে ছোঁয়া লাগানো গন্ধ সেটা নয়! তার সঙ্গে অস্বস্তি জাগানো আর একটা কি যেন মিশে একেবারে আলাদা কিছু।

মুকুন্দরাম আর একটা কথাও ঠিক বলেছিল, 'ঠিকানা খুবই ভালো পেয়েছি কর্তা। শুধু পৌছবারই বড় ঝামেলা।'

'ঝামেলা মানে?' একটু ধমক দিয়েই বলেছিলাম, তেনাদের ঠিকানায় বিনা ঝামেলায় পৌছোতে চেয়েছি আমি?

'আজ্ঞে না!' থতমত খেয়ে বলেছে মুকুন্দরাম, 'আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছিলাম মানে জায়গাটা খুঁজে পেতে বার করার বেশ একটু হাঙ্গামা আছে। চিনিয়ে দেবার মতো কাউকে পাওয়া যায় না কিনা।'

এবার বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, 'চিনিয়ে দেবার মতো লোক নাই পাওয়া যাক। জায়গাটার নাম শুনলে, তার হদিশ তো কেউ না কেউ দেবে?

'আজ্ঞে সেই তো হয়েছে মুস্কিল।' মুকুন্দরাম অপরাধীর মতো বলেছে, 'গুপীগঞ্জের হাট পর্যন্ত ঘোড়ার ডাকের সঙ্গে ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়িতে যেতে পারেন। কিন্তু সেখান থেকে আসল ঠিকনায় যাবার কথাটিও উচ্চারণ করতে পারবেন না।'

'কেন? এবার বিরক্ত হয়ে বলেছি, 'নামটা গালাগাল নাকি?'

'আজ্ঞে না, তা নয়। মুকুন্দরাম তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করে জানিয়েছে 'নামটা বললে কেউ যে চমকে তাকাবে, কি বেয়াড়া কিছু বলবে, তা নয়। তার বদলে যেন শুনতেই পাবে না। তারপর না শোনার ভান করে সরে যাবে সেখান থেকে!'

ধৈর্য হারিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম, তা আর বলতে হয়নি। মুকুন্দরাম নিজেই তাড়াতাড়ি আবার বলেছিল, 'নামটা শুনে অমন বোবা-কালা যে সেজে যায় তার

কারণ নামটাতেই ওদের ভয়। ও অঞ্চলের সকলের ধারণা, ওখানকার কথা পাঁচ কান করলে 'তেনারা' বেজার হন। তেনাদের কোপে পড়বার ভয়ে ওরা তাই নিজেদের জানাশোনার মধ্যে ছাড়া ওখানকার নামটি পর্যন্ত করে না, শুনতেও চায় না আর কারো মুখে...

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে।' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে এবার বলেছি 'যা বললে তাতে তো বুঝছি আসল নামটা যে কি, তা তুমিও জানো না।'

'আজ্ঞে না, আমি ঠিকই জান।' মুকুন্দরামের মুখে বিনীত গর্বের হাসিটা দেখবার মতো। নিজের বাহাদুরীটা একটু সবিস্তারে তারপর বলতে শুরু করেছে, ওখানে এক বাড়ির সঙ্গে দূর কুটুম্বিতার ছুতো ধরে বেশ ক-বার যাওয়া-আসা করে, ভাব জমিয়ে ফেলেছি। তারপর...

'তারপর নামটা জেনে নিয়ে কেল্লা ফতে করেছ!' মুকুন্দরামের বাহাদুরীয় বৃত্তান্ত দুচার কথায় শেষ হবে না বুঝে তাকে একটু নরম গলাতেই এবার থামিয়ে দিয়ে বলেছি, 'তা নামটা কি? আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেও কেমন করে সেখানে পৌঁছোনো যায়, এবার বলো দেখি?'

আজ্ঞে, নামের সঙ্গে জায়গাটার কোন মিলই পাবেন না। মুকুন্দরামের গলায় ক্ষোভের সুর তখনও একটু পাওয়া গেছে, নামটা হল সুখ সাগর।'

'সুখ সাগর!' একটু হেসে বলেছি, 'মিল না থাক, গরমিলের দিক দিয়ে নামটা হয়তো ঠিক। নাম সুখ সাগর, কিন্তু সেখানে সুখ তো নেই, সাগরও নিশ্চয়ই নয়।'

আজ্ঞে হ্যাঁ। মুকুন্দরাম সায় দিয়ে বলেছে, সাগরের বদলে যা আছে তা মজা-হাজা কটা জলা আর দীঘি, দামে আর পানায় যা একরকম বুজেই গেছে। থাকার মধ্যে আছে এককালের পেল্লায় সব পোড়ো বাড়ি যেন হা-করা হাড়পাঁজর।

মুকুন্দরাম তার বর্ণনায়, উৎসাহে আগেকার ক্ষোভটা তখন প্রায় ভুলেই গেছে। তবু বাধ্য হয়ে আবার তাকে সাজিয়ে বলতে হয়েছে, 'আচ্ছা ওসব যা বলছ, তা নিজের চোখেই দেখব। কিন্তু তা দেখবার জন্যে কারো কাছে কোন হদিস না পেয়েও পৌঁছোব কি করে, সেইটা আগে বাৎলাও দেখি।'

'আজ্ঞে...।' একটু আমতা করে দু-বার মাথা চুলকে মুকুন্দরাম এবার বলেছে, 'কিছু যদি মনে না করেন তো আমি সঙ্গে করে আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে...।'

'তুমি নিয়ে যাবে।' ধমকে মুকুন্দরামকে বলার মাঝখানেই থামিয়ে বলেছি, 'আমি যে কাজে যাচ্ছি তাতে দোসর কেউ থাকলে কাজ হয়?'

মুকুন্দরামকে তারপর আর বেশি বকাবকি করতে হয়নি। সে তার বেয়াদবির জন্যে মাপ চেয়ে জায়গাটায় পৌঁছাবার যথাসম্ভব হদিস জানিয়ে দিয়েছে।

হদিস অবশ্য বেশ অদ্ভুত এবং ভাসা ভাসা। জায়গাটার আসল নাম বলে যা জানা আছে, তা কাউকে বলবার নয়। বললে কোন কাজই হবে না। যে শুনবে, সে না শোনার ভান করে সরে যাবে।

যে দিকে যাবার তার বদলে নাম করতে হবে তাই উল্টো দিকের এক ঠিকানার।

বলবেনই বা কাকে? বলার জন্যে আছে শুধু এই ভাড়াটে ক-জন গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা। তারা দূর দূরান্তর থেকে ব্যাপারীদের মাল নিয়ে হাটে

আসে। আর হাট শেষ হলে, অন্য মাল নিয়ে ওই পারে সেই দামোদরের নদ পেরিয়ে তিন জেলার বড় গঞ্জে গিয়ে ওঠে। তাদের একটু সাধাসাধি করে বলতে হবে যাবার পথে মাঝামাঝি এক জায়গায় যেন নামিয়ে দেয়।

এমন অনুরোধে তারা বেজার হবে না। আপত্তিও করবে না কিছু। শুধু হয়তো জানতে চাইবে, তা নামবেন কোথায় কর্তা? এ পথের দুধারে আগাগোড়া তো শুধু বন পাহাড়, জঙ্গল।

তখন বলতে হবে যে, নামবেন জোড়াগড় যাবার রাস্তায়।

জোড়াগড় যাবার রাস্তায় নামবেন শুনে তারা চমকে-টমকে উঠবে না। শুধু একটু সহানুভূতি দেখিয়েই বলবে, 'সে তো অনেক হাঁটতে হবে কর্তা। আর তাছাড়া রাস্তারও কি ঠিক ঠিক চেনার মতো হাল আছে? তার চেয়ে রসুলপুরের দিক দিয়ে যদি...।'

গাড়োয়ানেরা আরো অনেকরকম খুঁত ধরে জোড়াগড় যাওয়ার বিষয়ে আরো অনেক সলা-পরামর্শ দেবে। কিন্তু গাড়িতে জায়গা দিতে আপত্তি করবে না।

কাক ভোরে রওনা হয়ে বিকেল নাগাদ জঙ্গলের মাঝখানে রাস্তার এক জায়গায় তারা সওয়ারীকে নামিয়ে দিয়ে বলবে, 'এই আপনার নামবার জায়গা কর্তা। ডানদিকের এই ঘোর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আপনাকে জোড়াগড়ে যেতে হবে। নিজে কখনো যাইনি। তবে দশ বছর ধরে এ পথে আসতে-যেতে অনেক লোকের কাছে শুনেছি, জোড়াগড়ে যেতে হলে এইখানে নামতে হয়। ওই যে দূরে উঁচু একটা টিলা দেখছেন ওইটাই তার চেন্নৎ। এখন ইচ্ছে করলে নামতে পারেন। আর নইলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন সেই দামোদর পর্যন্ত। আজ রাতেই এপারের নলগোলায় কিংবা কাল ওপারের বীরগঞ্জে নামিয়ে দেব।'

এসব সুপরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে তখন কিন্তু নেমে যেতে হবে। গাড়োয়ানদের কাউকে বখশিস্ দেবার নামটি কিন্তু করা চলবে না। তারা তাতে অপমান বোধ করবে। বলবে 'আমরা কি সওয়ারী নিয়ে ভাড়া খাটবার গাড়োয়ান। আমাদের নিজেদের গাড়ি। আড়ৎদার কি ব্যাপারীর হুকুমেও নয়, নিজেদের খুশি মতো মাল বোঝাই করি নিজেদের পছন্দ মতো ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্যে। তাতে যা হক্কের পাওনা, তার বেশি নেব কেন?

'তুমি বড় কথা ফেনাও, মুকুন্দরাম' মুকুন্দরামের কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগছিল না বলে এতক্ষণ চুপ করে থাকলেও এবার তাকে ধমকে বলতে হয়েছে এত নানাই-পানাই করেও এখনো তো আসল কথায় পৌঁছোলে না। গাড়োয়ান কি তোমাকে আর কি বলবে এ সব ছেড়ে আসল খবরটা এবার দাও দেখি। জোড়াগড়ের নাম করে জঙ্গলের মাঝে রাস্তায় নেমে তারপর সুখ সাগরে পৌঁছাব

কি করে?

মুকুন্দরাম এবার আর কথা ফেনায়নি। সোজাসুজি হদিস বাৎলে দিয়েছে।

·রুর গাড়ি থেকে জঙ্গলের মাঝখানের পথে নামবার পর একটু অপেক্ষা করতে হবে, গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করে কিছু দূরে জঙ্গলের বাঁকে চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত। তারপর ডাইনে টিলার দিকে নয়, যে পথে গাড়ি এসেছে, সেই পথেই পিছিয়ে যেতে হবে পো খানেক রাস্তা। অতটা গেলেই বাদুড় ঝোলা গাছটা চোখে পড়বে। বিরাট ডালপালা ছড়ানো গাছ। কি গাছ, তা বোঝার উপায় নেই। ডালপালা সমেত সারা গাছটায় গাদা গাদা বাদুড় ঝুলে আছে। সেই গাছটাই হল নিশানা। তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলে দেখতে দেখতে সুখ সাগর পৌঁছোতে দেরি হবে না।

মুকুন্দরাম যা বলেছিল, তাই করেছি। জোড়াগড়ে যাবার ছুতোয় গাড়োয়ানদের কথায় যেখানে নেমেছি গাড়িগুলো দূরে পথের বাঁকে চোখের আড়ালে না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে তারপর পেছন দিকে চলতে শুরু করেছি। বাদুড় ঝোলা গাছটা এবার খুঁজে পাওয়া শক্ত হবার কথা নয়। ডালপালা ছড়ানো প্রকাণ্ড একটা গাছ। ফল-ফুল পাতা নয় সারা গায়ে তার ছোট-বড় কালো কালো বাদুড়ের পুঁটলি ঝুলছে।

গাছটার কথা ভাবতেই ভেতরে ভেতরে কেমন একটু শিউরে যে উঠেছি, তা অস্বীকার করব না। দু ধারের ঘোর জঙ্গলের মাঝে একেবারে জনমনিষ্যিহীন রাস্তাটাও তার একটা কারণ নিশ্চয়ই। সন্ধ্যে হতে তখনও দেরি আছে, কিন্তু এরই মধ্যে কেমন একটা গা ছমছমে ভাব যেন সমস্ত জায়গাটার ওপর জমে উঠছে।

মুকুন্দরাম কি এইটাকেই যেন, ওপারের গন্ধ পাওয়া বলে বর্ণনা করেছিল। কিন্তু সে তো সেই সুখ সাগর পৌঁছবার পর পাওয়ার কথা। এখন থেকেই সে রকম কোন অস্বস্তি হবে কেন?

রাস্তার ধারের জঙ্গলে বাদুড় ঝোলা গাছটা খোঁজবার জন্যে সজাগ চোখ রেখে যেতে যেতে মুকুন্দরামের বিষয়েই একটু না ভেবে পারিনি। আমি যা খুঁজে বেড়াই, তার সুলুক সন্ধান দেবার জন্যে অনেক দালালই আমার হয়ে কাজ করে। মুকুন্দরাম ঠিক তাদের দলে পড়ে না। দালাল হয়ে সে আমার কাছে আসেনি। দালাল হিসাবে কাজও করে না আমার। নেহাৎ আচমকাই দেখা হয়ে গেছে।

কাজ-কর্ম তেমন ছিল না বলে, মস্ত এক দীঘির এক পাড় জমা নিয়ে চার টার ফেলে মাছ ধরতে বসেছিলাম। কিছুটা হাজা-মজা হলেও নামকরা মাছ শিকারের দীঘি। কিছু না হোক আধমণি দু-একটা রুই-কাৎলা সেখানে নাকি ফাৎনা ডোবাবেই। ফাৎনা আমারও ডুবেছিল, কিন্তু কে যে ডুবিয়েছে, তা জানার ভাগ্য

[illegible]। সকাল থেকে খাঁ-খাঁ রোদের দুপুর পেরিয়ে বিকেল পর্যন্ত তিন তিন বার ফাতনা ডোবানো অদেখা মাছের কাছে কান মলা খেয়ে যখন বেগড়ানো মেজাজে ছিপটাই দুমড়ে ভাঙতে যাচ্ছি, তখন পেছনে পাড়ের ধারে আধময়লা আটহাতি ধুতি আর ছেঁড়া ফতুয়া পরা ছোট্ট রোগাপটকা আধবুড়ো একটি গাঁইয়া চেহারার মানুষকে দেখতে পেয়েছিলাম। লোকটার পাড়ের ওপর উবু বসে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, আমার অজান্তে অনেকক্ষণ ধরেই সে আমার মাছ ধরার মিথ্যে হয়রানিটা লক্ষ্য করছে। নিজের বে-ইজ্জতের একরকম একজন সাক্ষীকে দেখে মনটা যে খুশি হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। লোকটির একটা কথায় মেজাজটা আরো তিরিক্ষে হয়ে গিয়েছিল।

আমাকে ছিপটা নিয়ে দাঁড়িয়ে কোনরকমে মেজাজটা সামলে হুইল ঘুরিয়ে সুতো গুটোতে দেখে, লোকটি বলেছিল, 'উঠে পড়ে ভালোই করেছেন কর্তা। আজকের দিনটায় কিছু হবার নয়।'

গায়ে পড়া এমন টিপ্পনির একটা চাবুকের মতো জবাব দিতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলাম, লোকটার চেহারা দেখে আর গলার স্বরটা অতি বিনীত বলে।

কড়া কিছু বলার বদলে অদ্ভুত কথাটারই তাই মানে জানতে চেয়েছিলাম, একটু রুক্ষ গলাতেই—আজ হবার নয় মানে—

'আজ্ঞে...।' লোকটি একটু ভয়ে ভয়ে যেন অপরাধীর মতো বলেছিল 'আজ সেই ষাঁড়টার দিন কিনা।'

'কার দিন?' গরম হওয়ার বদলে বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম।

আজ্ঞে সেই ষাঁড়া পিরেতটার।' লোকটি আমায় একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে বলেছিল, 'সব জোড়া মাসের পেরথম মঙ্গলবার সারা দীঘিটায় সে ভর করে থাকে। একটা পুঁটি কি কুচো চিংড়িও এ দীঘি থেকে কারুর এদিন তোলার সাধ্যি নেই। আজ সেই পেরথম মঙ্গলবার আপনি এখানে ছিপ ফেলেছেন কিনা....।'

'থামো থামো।' কিছুই বুঝতে না পারায় অধৈর্যে লোকটিকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বলেছিলাম, 'কি সব আবোল তাবোল বলছ। তোমার ষাঁড়া পিরেত আবার কি বস্তু?'

লোকটির কাছে ব্যাপারটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবার শুনেছিলাম। এ দীঘি যাঁরা কাটিয়েছিলেন, তাঁরা এ অঞ্চলের রাজাই ছিলেন এক-রকম। সে রাজবংশের ভাগ্য যখন পড়ে এসেছে, তখন শো দুই-তিন বছর আগে সে রাজবংশের শেষ এক রাজা এ দীঘিতে মাছ ধরার নামে এক মহা অধর্ম করেছিলেন। যুদ্ধের ন্যায়নীতি না মানা, আর মানীর মান না রাখার অধর্ম।

রাজবংশের সুদিন তখন ফুরিয়ে এলেও দীঘি তখন টইটম্বুর জলে জমজমাট।

মাছের ভারে ছিঁড়ে যাবার ভয়ে জেলেরা একেবারে সেরা সুতোর নতুন জাল ছাড়া এ জলে কিছু নামাতে চায় না। দীঘিতে মাছ যেমন এন্তার, তেমনি সে সব মাছের জেল্লা আর তেজ। এদের মধ্যে সবার সেরা দুটি ষাঁড়া রুই। লোকে যাদের নাম দিয়েছিল নন্দী-ভৃঙ্গী। নন্দী-ভৃঙ্গী মাছ নয়, গঙ্গাদেবীর বাহন মকর রাজেরই যেন দুই দামাল ভাতকুটুম। কোন জালে তাদের ধরা যায় না, যত বড় পাকা শিকারীর হাতের যত মজবুত ছিপই হোক, তারা টোপ-বঁড়শি-ফাতনা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। দীঘির জলে যেন তাদের আনন্দ আর ধরে না। গাঙ, কি সাগর হলে বুঝি তারা পাখনা নেড়ে সত্যিকার সুখ পায়। তবু চারা পোনা হয়ে যার জলে প্রথম কানকো কাঁপিয়েছে, সে দীঘির ওপর মায়াও তো আছে কিছু। জোড় ভেঙ্গে ভৃঙ্গী কিন্তু একদিন সে মায়া কাটিয়ে যায়। অতি বৃষ্টির বান এসেছিল সে বছর মাঠ-ঘাট পুকুর-দীঘি সব ভাসিয়ে। সে বানের জলে গা ভাসিয়ে ভৃঙ্গী কোথায় যে গেছে, কে জানে। নন্দী কিন্তু দীঘি ছাড়েনি। সারা তল্লাটের গল্পকথা হয়ে সে ওই দীঘিতেই মনের সুখে চরে বেড়িয়েছে। কিন্তু গোল বাঁধাল পড়তি রাজবংশের বেয়াড়া এক রাজা। তার খেয়াল হল কেউ যাকে ধরতে পারেনি সেই নন্দীকেই সে ডাঙ্গায় তুলে খাবি খাইয়ে মোক্ষম বাহাদুরী দেখাবে।

কিন্তু রাজার কেরামতি ওই মুখ সাপটি অবধিই। নন্দীকে ডাঙ্গায় তুলে খাবি খাওয়াবে কি, নন্দীই তাকে নিয়ে যেন তামাসা করে লোক হাসায়। কখনো ফাৎনা না নাড়িয়ে তার টোপ খেয়ে যায় চুপিচুপি, কখনো বঁড়শিতে রামটান দিয়ে হুইলের সুতোই ফুরিয়ে দিয়েছে সারা দীঘিময় দাম আর বড় বড় পানার ঝাড়ে গিঁট লাগিয়ে চরকি পাকে ঘুরে ঘুরে।

বার বার হার মেনে মেনে তল্লাট শুদ্ধ লোকের চাপা হাসাহাসিতে শেষকালে ক্ষেপে উঠেছে পড়তি রাজবংশের বেয়াড়া রাজা। যা কখনো কেউ করে না, সেই অধর্মই করেছে সে এবার। কোনমতে নন্দীকে বাগ মানাতে না পেরে সে শেষপর্যন্ত বিষ ঢেলেছে, দীঘির জলের এক ধার থেকে আর এক ধারে। আর এক পাড় থেকে আর এক পাড়ে পালিয়ে বাঁচতে চাওয়া মাছের ঝাঁকের মধ্যে খাবি খেতে খেতে ভেসে ওঠা নন্দীকে দেখতে পেয়ে কলাগাছের ভাসানো ভেলা থেকে তাকে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে।

নন্দী গেছে, গেছে সে রাজবংশও। একটু-আধটু মজে এলে বিষ কাটিয়ে এ দীঘি আবার মাছের চেনা ঘর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বছরের ফি জোড়া মাসের পেরথম মঙ্গলবার এখান থেকে একটা কুচো চিংড়ি তুলে নিয়ে যায়, এমন সাধ্যি নেই কারুর। কয়েকশো বছর আগে এই দিনটিতেই জলে বিষ ঢেলে নন্দীর মতো মাছের রাজাকে অধর্ম করে খুঁচিয়ে মারা হয়েছিল কিনা! সেই থেকে ষাঁড়া পিরেত

থাকে এই দিনটিতে সে সারা-দীঘি পাহারা দেয়।

যে লোকটি এ কাহিনী শুনিয়েছিল তারই নাম মুকুন্দরাম। লোকটি কথা বলে একটু বেশি, কিন্তু বলে বড় ভালো।

মুকুন্দরামের পুঁজিতে আরো এমন খবর থাকলে, তাকে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে দেখা করতে বলেছিলাম। সে তা করেনি। তবু তার সঙ্গে এখানে-সেখানে দেখা হয়ে গেছে মাঝে মাঝে। এমনি একবার দেখার সময় সে সুখ সাগরের খবর দিয়েছিল আমাকে।

কিন্তু।

মনের মধ্যে একটা কিন্তু-র খটকা খুব বড় হয়ে উঠেছে হঠাৎ। মুকুন্দরাম বলেছিল পো খানেক পথ পিছিয়ে গেলেই বাদুড় ঝোলা গাছের নিশানাটা দেখা যাবে। কিন্তু কোথায় বাদুড় ঝোলা গাছটা? একপোর জায়গায় আধ ক্রোশ পথই তো পার হয়ে এলাম দু-দিকে সজাগ চোখ রেখে খুঁজতে খুঁজতে। বাদুড় ঝোলা গাছের,কোন চিহ্নই তো নেই। সে গাছ যদি না পাই তাহলে?

জোড়াগড়ে যাবার নাম করে যখন রাস্তার মাঝে নেমেছিলাম, তখন বিকেল। এরই মধ্যে দু-ধারের জঙ্গলের বড় বড় গাছের মাথায় সূর্য যে অনেকখানি নেমে গেছে। রাস্তা উত্তর দক্ষিণের বলে এর মধ্যেই বেশ একটু আবছা অন্ধকার। খানিক বাদেই তো পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে। তার মধ্যে বাদুড় ঝোলা গাছটাকে কি আর দেখে চিনে নিতে পারব?

গাছটা সত্যিই কি আছে? হঠাৎ এই সন্দেহটাই গভীর হয়ে উঠেছে। যার কথা শুনে চোখ-কান বুজে অজানা বন-জঙ্গলের মাঝে এমন একটা বেয়াড়া জায়গায় নেমেছি, সেই মুকুন্দরামের ওপর এতখানি ভরসা রাখার কোন কারণ সত্যি আছে কি?

মুকুন্দরাম আমার মাইনে করা দালাল নয়। এ পর্যন্ত তার কোনো খবরা-খবর যাচাই করে দেখার সুবিধেও হয়নি কখনো। তার অমন জাঁকিয়ে বলা সুখ সাগরের বর্ণনা কি সব তাহলে মিথ্যে ধাপ্পাবাজি। আমি ওপারের তাঁদের তল্লাস করে বেড়াই বলে তাঁদেরই একজনের আমাকে একটু জব্দ করার রসিকতা!

না, না তা হতে পারে না! বাদুড় ঝোলা গাছটা নিশ্চয়ই আছে এই জঙ্গলের পথের এক ধারে। অন্ধকার হয়ে আসবার আগে আমাকে সেটা খুঁজে বার করতেই হবে।

আমি আগের চেয়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করি। আধ ক্রোশের পর এক ক্রোশের ওপর পথ পার হয়ে যাই। কিন্তু কোথাও কোন বাদুড় ঝোলা গাছের চিহ্ন তো নেই! চিহ্ন থাকলেও এরপর তা দেখে চিনে নেওয়া তো সম্ভব হবে না। সূর্য কিছুক্ষণ আগে ডুবেছে, তারপর পশ্চিম আকাশের লালচে আভাটা ক্রমশঃ যাচ্ছে মিলিয়ে। এরপর তো ঘুটঘুটি অন্ধকার। সে অন্ধকারে সারা রাত কি

তেনাদের, নয় জন্তু জানোয়ারদের ভয়ে কোন একটা গাছের ডালে কাটাতে হবে।

সেরকম গাছের খোঁজও তো এই বেলা, একটু আলো থাকতে থাকতে না করলে নয়!

তা করতে কিন্তু হয় নি।

দূরে গাড়ির গরুর গলার ঘণ্টার টুং টাং আওয়াজ শোনা যায় প্রথমে, আলো-টালো অবশ্য তারপর দেখা যায় না। এ জঙ্গলের জন-মনিষ্যি হীন রাস্তায় তেল পুড়িয়ে আলো জ্বালিয়ে গাড়ি চালাবার আহাম্মুকী কারুর নেই।

দু-চাকার ছোট খাটো গাড়িটা কিন্তু আমার কাছে এসেই থামে, একটু আলো ভেতর থেকে এবার অবশ্য দেখা যায়। গাড়োয়ান যাতে তামাক খাচ্ছে, সেই খোলো হুঁকোর কলকের একটু আলো।

গাড়োয়ানের গলাটা শোনা যায়, 'কি কর্তা, উঠবেন নাকি গাড়িতে?'

'হ্যাঁ উঠব। উঠব বই কি।' দু-বার আর গাড়োয়ানকে উঠবার কথা বলতে হয় না। পেছন দিয়ে ছই-এর তলায় তার আগেই উঠে বসি।

গাড়োয়ান হুঁকোয় টান দিয়ে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করে। আমি কোথাকার কে, এই জঙ্গলের মাঝে এই ভর সন্ধ্যেয় নেমে কি করছিলাম, কোথায় যাব, কিছুই সে জিজ্ঞেস করে না।

আমিই নিজেকে সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছি, 'আচ্ছা এই পথে তো আসো যাও, বাদুড় ঝোলা একটা গাছ এখানে কোথাও দেখেছ?'

'বাদুড় ঝোলা গাছ?' লোকটা একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলেছে, হ্যাঁ আছে কর্তা তবে রোজ তো নয়, মাঝে মাঝে তা দেখা যায়।

মাঝে মাঝে দেখা যায়! শুনে অবাক হয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম, তা কিন্তু আর বলিনি গাড়োয়ানের মুখটা তার কলকের জ্বলন্ত টিকের আভায় সামান্য একটু মাত্র দেখতে পেলেও, তার গলাটা আমি তখন বেশ চিনতে পেরেছি। সে গলা মুকুন্দরামের।

আমি একটু হুঁ-হাঁ দিলেই সে এক্ষুনি মাঝে মাঝে, খুশি মতো দেখা দেওয়া বাদুড় ঝোলা গাছের জমাটি গল্প শুরু করবে। সে গল্প শুনে তাকে বাধিত করতে আমি চাই না।

মেজকর্তা এইখানেই তাঁর কলম থামিয়েছেন। এ বিবরণের প্রথম লাইন লিখিবার পর কেন যে অনেক দিন তিনি আর কলম ধরেননি, এবার যেন একটু বুঝতে পেরেছি। যাঁদের তিনি শিকার করে ফেরেন, তাঁদেরই একজনের রসিকতার শিকার হওয়ার বৃত্তান্তটা শেষ পর্যন্ত দেবেন কি না, তাই তিনি কিছুকাল ঠিক করতে পারেন নি।

কেষ্টবাবু ভূতের গল্প শুনলেন

রবিদাস সাহারায়

কেষ্টবাবু গিয়েছিলেন মিতপুর গ্রামে বন্ধুর বাড়িতে। রেল স্টেশন থেকে বন্ধুর বাড়ি পাক্কা এক ঘণ্টার পথ। ফেরার দিন সেই দীর্ঘপথ হেঁটে তাঁকে স্টেশনে পৌঁছতে হল। কথা ছিল দুপুর দুটোর মধ্যেই খেয়ে দেয়ে রওনা হবেন। কিন্তু মধ্যাহ্নের ভুরিভোজন এত ভারী হয়েছিল যে ঘুম ভাঙতেই বেজে গেল সাড়ে তিনটে। তারপর রওনা হয়ে স্টেশনে পৌঁছতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। শীতের বেলা। রোদের তাপও কমে এসেছে। গাড়ি ছাড়বে সোয়া পাঁচটায়। এখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। কাজেই নিশ্চিন্ত মনেই টিকিট কেটে স্টেশন-ঘরে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

এদিকে সোয়া পাঁচটা বেজে গেল। বেজে গেল ছ'টা। কিন্তু গাড়ির দেখা নেই। কলকাতার দিক থেকে দুটো আপ ট্রেন চলে গেল। কিন্তু ডাউন ট্রেনের পাত্তা নেই। কখন আসবে কে জানে?

গ্রামের স্টেশন। যাত্রী বেশি নেই। কাজেই কোন কোলাহলও নেই স্টেশনে। শীতকাল, সন্ধ্যার অন্ধকার ততক্ষণে ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সাড়ে ছ'টার ট্রেনের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। শোনা গেল আগেকার জংশন স্টেশনের লাইনে জরুরী মেরামতের জন্য গাড়ি আসতে দেরি হচ্ছে।

ধীরে ধীরে স্টেশন ফাঁকা হয়ে গেল। কেষ্টবাবু ভাবলেন, এই সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে মিতপুরের দিকে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। একটু দেরি হলেও পরের ট্রেনেই যাওয়া যাবে। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছতে পারলে রাত বেশি হলেও কোন অসুবিধা হবে না।

স্টেশনে যে দু'চারজন লোক ছিল তারাও চলে গেল। কেষ্টবাবু একা। বুঝতে পারলেন কপালে আজ দুর্ভোগ আছে। ট্রেন কখন আসবে তার ঠিক কি? এখন আর মিতপুরে বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ারও উপায় নেই। বেঞ্চির ওপর বসে বসে ছাড়পোকার কামড় খেতে খেতে নানা কথাই ভাবতে লাগলেন কেষ্টবাবু। এদিকে শেষ ট্রেনের সময়ও পেরিয়ে গেল। কেষ্টবাবু ওয়েটিং রুমের দিকে চলে গেলেন। ট্রেন না এলে ওয়েটিং রুমেই রাত কাটাতে হবে।

কেষ্টবাবু মনে করেছিলেন, ওয়েটিং রুম ফাঁকাই রয়েছে। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, ইতিমধ্যেই এক যাত্রী আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে ঘরের এক পাশে।

কেষ্টবাবু ভাবলেন, নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ আগে লোকটি এখানে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার হয়ত গন্তব্য স্থানে যাবার কোন ট্রেনই নেই।

যা হোক এ ঘরেই রাত কাটাতে হবে। কেষ্টবাবুর সঙ্গে কোন বিছানাপত্র নেই। তবে একটা খবরের কাগজ রয়েছে। কলকাতা থেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। ঝোলার মধ্যেই সেটা রয়েছে। সেটাই পেতে কোনরকমে ঝোলাটা মাথায় দিয়ে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম আর এল না। মনে কি রকম যেন ভয় ও অস্বস্তি। যে লোকটা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে, সে কি রকম লোক তা তার জানা নেই। তাঁর ঘুমের সুযোগ নিয়ে কিছু চুরি করে পালাতেও পারে। তাই শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগলেন কেষ্টবাবু।

কিছুক্ষণ পর ঘরের এক পাশে ঘুমিয়ে থাকা সেই লোকটার কাশি শুরু হল। কাশতে কাশতে উঠে বসল লোকটা। উঠে বসেও কাশতে লাগল। কিন্তু তার মুখ ভালভাবে দেখার উপায় নেই। গায়ের চাদরটা মাথায় মুড়ে মুখটাকে প্রায় ঘোমটার মতো ঢেকেই রেখেছে। কাজেই লোকটার চেহারা এবং বয়স কিছুই বোঝার উপায় নেই।

কাশতে কাশতে একটু থেমে ধুঁকতে লাগল তারপর লোকটা কেষ্টবাবুকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করল, মশাইর যাওয়া হবে কুথা?

কেষ্টবাবু জবাব দিলেন, কলকাতায়।

—তা টেরেন পান নি বুঝি?

—না। আপনি কোথায় যাবেন?

—আমার কুথাও যাবার ঠাঁই ঠিকানা নেই; এখানেই থাকি।

কেষ্টবাবু কথাটা শুনে একটু ধোঁকায় পড়লেন। এ কেমন মানুষ? কোন ভিখিরি-টিকিরি নাকি? তবু জিজ্ঞেস করলেন, কি কাজ করেন?

—কিছু না। এই ইস্টিশানে এসে ঘুমিয়ে থাকি। লোকের সঙ্গে গল্প সল্প করে সময় কাটাই। অন্যদিন ইস্টিশানে কিছু পেসিনজার থাকে। আজ কেউ নেই। শুধু আপনিই আছেন। আপনার কাছে ঘড়ি আছে? এখন কটা বাজে বলুন তো?

কেষ্টবাবু বলতে চাইলেন, ঘড়ি নেই। কারণ ঘড়িটা যদি ছিনতাই করে নেয় লোকটা? কিন্তু গোপন করতেও পারলেন না। হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। কিন্তু ওয়েটিংরুমের মিটমিটে আলোতে কিছু বুঝবার উপায় নেই। অতি কষ্টে অনুমান করে বললেন, রাত এগারোটা।

লোকটা বলল, কোন টেরেন আর নেই এখন। কাল সকাল সাতটায় একটা ডাউন টেরেন আছে। তাও আসবে কিনা ঠিক কি! তবে রাত বারোটায় একটা মালগাড়ি যাবে আপ লাইন দিয়ে। তাতে আপনার লাভ কি? কোন পেসিনজারও তাতে থাকে না।

কেষ্টবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ট্রেনটা আসে কোত্থেকে? লোকটা কাশতে কাশতে একটু থামল, তারপর বুকে হাত চাপা দিয়ে বলল, কলকাতার দিক থেকেই আসে। এই কর্ড লাইনে তো বেশি গাড়ির যাতায়াত নেই। দুমতারায় একটা রেলের মেরামতির কারখানা আছে, সেখানেই কি-সব মালপত্তর যায়। এখন ক'টা বেজেছে বললেন, এগারোটা? আরও তো একঘন্টা বাকি আছে টেরেন আসার। কি করে যে সময়টা কাটবে।

কেষ্টবাবু অবাক হলেন লোকটার কথা শুনে। রাত বারোটায় মালগাড়ি আসবার সঙ্গে লোকটার কি সম্পর্ক? এবার জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, সেই মালগাড়ি আসবার সঙ্গে আপনার—কিন্তু কিছুটা বলেই চেপে গেলেন। ভাবলেন, লোকটা হয়তো ওয়াগন-ব্রেকার দলের লোক। কাছাকাছি আরও হয়তো আছে। গাড়ি এলেই ছুটে আসবে। কাছাকাছি কোন জায়গায় সংকেত দেখিয়ে থামিয়ে দেবে ট্রেন।

মনে মনে একটু শঙ্কিতই হলেন কেষ্টবাবু। কিন্তু এখন কি আর করার আছে? চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় কি?

মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন কেষ্টবাবু। কিছুক্ষণ পর লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, স্টেশন মাস্টার রাত্রে স্টেশনে থাকেন না?

লোকটা জবাব দিল, না; তিনি থাকবেন কেন? শেষ টেরেন চলে গেলেই তিনি কোয়ার্টারে চলে যান। একটু দূরেই ওনার কোয়ার্টার।

—অন্য কোন লোক স্টেশনে থাকে না?

—ওয়াচম্যান থাকে। সেও হয়তো কোথায় চলে গেছে। আজকে মাসের প্রথম মঙ্গলবার তো? এই দিনটায় সে রাত্তিরে কখনো থাকে না। কারণ আর তো টেরেন আসার ঝামেলা নেই। মালগাড়িটা এখানে থামে না।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ লোকটাই বলল, মশাই একটা গল্প বলুন না, সময়টা তবু কাটানো যাবে।

কেষ্টবাবু বললেন, আমার তো গল্প বলার কোন অভ্যাস নেই। আপনি যদি বলেন তবে শুনতে পারি।

লোকটা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, বলতে পারি কিন্তু শুনে ভয় পাবেন না তো? আমি একটা গল্পই জানি। সেটা ভূতের গল্প।

—ভূতের গল্প? কেষ্টবাবু চমকে উঠলেন। একটু থেমে থেমে বললেন, এই গভীর রাতে ভূতের গল্প বলবেন? আপনার ভয় করবে না?

লোকটা বলল, ভয় আমার নেই মশাই। ভয় থাকলে কি রাতবিরেতে এমনভাবে বাইরে থাকতে পারি? আমিই তো আগে এই ইস্টিশানের ওয়াচম্যান ছিলাম। এখন অন্য লোক এসেছে।

—আপনি সেই কাজ ছাড়লেন কেন?

—সে অনেক ব্যাপার মশাই। শুনলে আপনারও ভয় হবে। এই তো বেশ আছি। কোন দায়দায়িত্ব নেই। যাক্, ভূতের গল্প যদি শুনতে চান তা হলে শুনুন।

সর্বনাশ! তা হলে কি লোকটা ভূতের গল্প না শুনিয়েই ছাড়বে না?

কিন্তু নিজের ভয়ের কথা গোপন করে কেষ্টবাবু একটু মেকী কৌতূহল প্রকাশ করলেন। বললেন, কি আপনার গল্প?

লোকটা বলল, এই ইস্টিশানে একজন ওয়াচম্যান ছিল, তার নাম চুনিলাল। বাসা ছিল ইস্টিশানের মাস্টার বাবুর কোয়ার্টারের পাশেই। সেখানে তার বউ আর একটা ছোট ছেলে থাকত। ছেলেটার নাম চাঁদু। ছেলেটা বাবার খুব নেওটা ছিল। দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় চুনিলাল বাড়ি এলে বাবাকে সে ছাড়তে চাইত না।

অনেক কষ্টে ছেলেকে ভুলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসত চুনিলাল। ছেলেটা বাবার কাছ ছাড়া কিছুতেই হতে চাইত না।

অথচ চুনিলালের দিনে বা রাতে কখনও বাড়িতে থাকার উপায় নেই। তার চাকরিটাই এমন। তখন সে ঠিক করল, রাত্রে খেয়ে দেয়ে ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। ঘুমোবে স্টেশন মাস্টারের ঘরেই। বউ থাকবে কোয়ার্টারে।

কথা বলতে বলতে লোকটা ভয়ানক ভাবে কাশতে লাগল। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হল তার। কিন্তু মাথায় ঢাকা চাদরটা খুলল না সে। ওয়েটিং রুমের টিমটিম আলোয় তার চেহারা বুঝবার উপায় ছিল না।

কাশতে কাশতে লোকটা ক্লান্ত হয়ে নির্জীবের মতো শুয়ে পড়ল। কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। কেষ্টবাবুর মনে ভয় আর কৌতূহল দুই-ই দোলা দিতে লাগল। লোকটা বলেছিল ভূতের গল্প বলবে। কিন্তু ভূতের ছোঁয়াই ঐ গল্পের মধ্যে নেই। তবে এটা কী গল্প?

অনেকক্ষণ পর লোকটা আবার উঠে বসল। বলতে লাগল, শুনুন মশাই, একদিন রাতের সব ট্রেনই চলে গেছে। শুধু রয়ে গেছে মালগাড়ি। তখন দুমতারা রেলের কারখানা জমজমাট ছিল। প্রত্যেক মঙ্গলবার রাত্রে আসত কারখানার মালপত্র। শুধু ইংরেজী মাসের প্রথম মঙ্গলবার আসত কারখানার লোকদের জন্য চাল চিনি গম।

লোকটা হঠাৎ গল্প বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আজ ইংরেজী মাসের প্রথম মঙ্গলবার না?

কেষ্টবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

লোকটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল যেন। বলল, ঠিক এমন রাতেই দুমতারা কারখানার লোকদের জন্য চাল চিনি গম নিয়ে গাড়ি আসত। আজকেও আসবে। কিন্তু ঐ সব খাবার জিনিস হয়ত আসবে না।

কেষ্টবাবুর মনে সন্দেহ জাগল যেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, এই দিনে কোন গোলমাল হয় নাকি?

লোকটা বলল, হ্যাঁ, হয়েছিল। ওয়াগন-ব্রেকাররা মালগাড়ি আটক করল। ওয়াগন ভেঙে লুঠ করে নিতে লাগল মালপত্র। চুনিলাল বাধা দিতে গেল। কিন্তু ওয়াগন ব্রেকাররা ছিল গুণ্ডা, ডাকাত। হাতে তাদের অস্ত্র ছিল। চুনিলাল কেমন করে তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে? গুণ্ডারা ওকে মেরেই ফেলল। কুপিয়ে বিতিকিচ্ছে করে দিল মুখ। তার ছোট্ট ছেলেটা তখন স্টেশনের ঘরের বিছানায় ঘুমুচ্ছে।

পরদিন সকালে ঘটনাটা বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। ইস্টেশন মাস্টার এলেন। চুনিলালের বউও কোয়ার্টার থেকে ছুটে এল। চুনিলালের লাশটা তখনও রেল লাইনের পাশে পড়ে ছিল। ওর বউ লুটিয়ে পড়ল মরা স্বামীর লাশটার ওপর।

ওয়াগন ব্রেকাররা ধরা পড়ে নি। রেল ইঞ্জিনের চালক ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পুলিশ নিজেদের বাহাদুরি জাহির করার জন্য মামলা করল চুনিলালকে জড়িয়ে। চুনিলালকেও একজন ওয়াগন ব্রেকার বলে রেলের চালক সাক্ষ্য দিল। কিন্তু মরা মানুষের শাস্তি আর কি হবে? চুনিলালের বউকে কোয়ার্টার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আহা বেচারি! রেল কোম্পানির কাছ থেকে স্বামীর পাওনা কোন টাকাই চুনিলালের বউ পায়নি। কী দুর্ভোগ!

চুনির বউ কোয়ার্টারের লোকদের বাড়িতে কাজ করে কোন রকমে দিন চালাত। শুয়ে থাকত কোন বাড়ির খোলা বারান্দায়। স্বামীর ওয়াগন ভাঙার কথা কোনদিন বিশ্বাস করেনি তার বউ। সেকথা ভাবতে ভাবতে তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরের মাসের প্রথম মঙ্গলবার রাত বারোটায় টেরেনের শব্দ শুনে সে এসে হাজির হয়েছিল এই ইস্টিশানে।

—এ্যাঁ, তাই নাকি? পরের মাসে ঐ দিনে স্টেশনে এল কেন রাত্রিবেলা? কৌতূহল দমন করতে না পেরে কেষ্টবাবু প্রশ্ন করে বসলেন।

লোকটা বলল, আহা, বলতে দিন। তারপরেই তো ঘটল ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ওয়াগন সেদিন আসেনি। গাড়িও থামে নি। চুনিলালের বউ চলন্ত টেরেনের সামনে ছেলেটাকে কোলে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল। বউ ছেলে দু'জনেই মরে গেল গাড়ির চাপায়। কিন্তু চুনিলাল রেহাই দেয়নি গাড়ির চালককে। সে ইঞ্জিনঘরে ঢুকে গলা টিপে মেরে ফেলল মিথ্যাবাদী ড্রাইভারকে। চুনির প্রেতাত্মার বিতিকিচ্ছে মুখ দেখে চমকে উঠেছিল ড্রাইভার। কিন্তু প্রাণে বাঁচে নি। সেখানেই থেমে গিয়েছিল গাড়িটা।

পরের দিন স্টেশনমাস্টার এসে পুলিশে খবর দিয়ে সব লাশ সরিয়ে ফেলল। কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা হল না। শেষ হল আমার গল্প।

গল্প শুনে শিউরে উঠলেন কেষ্টবাবু। তাঁর ভয়ও করছিল। কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলে, তুমি এসব খবর জানলে কেমন করে?

লোকটার মুখের কাপড়টা হঠাৎ একটু সরে গেল। স্টেশন ঘরের মিটমিটে আলোতেও তার মুখটা দেখে চমকে উঠলেন কেষ্টবাবু। কী বিভৎস মুখ!

কেষ্টবাবুর শরীরটা যেন আড়ষ্ট হয়ে যেতে লাগল। এতক্ষণ বসে ছিলেন, শুয়ে পড়লেন এবার।

কতক্ষণ এভাবে ছিলেন তা কেষ্টবাবুর জানা নেই। হঠাৎ লোকটি জোরে জোরে ডাকতে লাগল, ও মশাই ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? ভয় পেয়েছেন বুঝি আপনি? এদিকে টেরেনটা যে এসে পড়েছে। আমি চলে যাচ্ছি।

কেষ্টবাবুর চেতনা ফিরে এল একটু। তাকিয়ে দেখলেন লোকটা উঠে বাইরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তিনিও কোন কিছু না বুঝে ছুটে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন ট্রেনটা চলে যাচ্ছে স্টেশনের ঠিক সামনে দিয়ে। একটি বউ ছেলে কোলে নিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ইঞ্জিনের সামনে। শোনা গেল শুধু একটা চিৎকার।

তারপর সব চুপচাপ। ট্রেন চলে গেল। কিন্তু কোথায় সেই ছেলে কোলে বউটি? লোকটাই বা গেল কোথায়? ঘরে তার বিছানাপত্রও নেই।

কেষ্টবাবু ভয়ে ভয়ে কোনরকমে বাকি রাতটা কাটালেন। পরের দিন খুব ভোরবেলাতেই এলেন স্টেশন মাস্টার। তাঁর কাছে কেষ্টবাবু ঘটনাটা বললেন। স্টেশন মাস্টার প্রথমে কথাটার গুরুত্বই দেননি। কিন্তু সব শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি আপনি এসব ঘটনা দেখেছেন?

কেষ্টবাবু বললেন, আমি কি মিথ্যে কথা বলব?

স্টেশন মাস্টার বললেন, সত্যি বড় আশ্চর্যের কথা। তবু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এই স্টেশনেরই ওয়াচম্যান ছিল লোকটি। তার পর একটু অন্যমনস্কতার ভাব দেখিয়ে বললেন, কাল ইংরেজী মাসের প্রথম মঙ্গলবার ছিল তো? তাই না?

কেষ্টবাবু বললেন, হ্যাঁ।

স্টেশন মাস্টার বললেন, গত বছর এমন রাতেই এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল এই স্টেশনে। প্রথম মঙ্গলবারে মরেছিল চুনিলাল। তার পরের মাসের প্রথম মঙ্গলবারে মরেছিল তার বউ।

স্টেশন মাস্টার মনে ব্যথাও পেলেন পুরনো কথা ভেবে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওয়াগন ভাঙার ব্যাপারটা তা হলে লোকে যা বলে তা সত্যি নয়? অথচ বিনা দোষেই শাস্তি পেয়ে গেল চুনিলালের বউ। এখন যে আর কিছুই করার উপায় নেই।

বাতিঘর

লীলা মজুমদার

শামুদের পাদুদাদু নাকি এক সময়ে নদী পুলিশে চাকরি করতেন, অথচ সাঁতার জানেন না। এমন কি ওঁদের পুরোন বাড়ির বড় চৌবাচ্চায় একবার পড়ে গেছিলেন, অমনি টুপ করে ডুবে গেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শামুরা ওঁকে তুলে মুখে ফুঁ দিয়েছিল, তবে না ধড়ে প্রাণ এসেছিল। নাকি নদীতে সাগরে যারা কাজ করে, তারা কেউ সাঁতরাতে জানে না। কিছু দরকারও হয় না। কি জানি! এদিকে বেজায় সাহসী, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এমন কোন জ্যান্ত জানোয়ার নেই যাকে উনি ভয় পান। তবে কিনা ইয়ে—

পাদুদাদু বলেন কলকাতার চাঁদপালঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হুগলী নদীর দুই তীর আর নদী মুখের প্রতিটি আগাছা আর ঘাসের চাপড়া ওঁর চেনা ছিল। জলের তলাকার প্রতিটি গর্ত আর বালির চড়া ওঁর মুখস্থ ছিল। গত তিনশো বছরের মধ্যে কবে কোথায় কোন্ জাহাজ নৌকা বা ভেলা ডুবেছিল এবং সে ডোবাতে কার কি ধরনের আর কতখানি লাভ বা ক্ষতি হয়েছিল, সব তাঁর নখদর্পণে ছিল। দুই তীরের প্রতিটি গাছ ওঁর পুরোন বন্ধু ছিল। কার ডালপালা বাঁকা বা ভাঙা কেন তাও তাঁর অজানা ছিল না। প্রত্যেকটি ভাঙা দেয়াল, ধ্বসে যাওয়া দুর্গ, গাছ গজানো ইটের গাদা, মজা পুকুর, শুকনো কুয়ো, খোড়ো ঘর, টালির গুদোম, এমন কি সমস্ত নালার মুখ, কার, কবেকার এবং কিজন্য তৈরী, তার ইতিবৃত্ত তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারতেন। এখন অবশ্য পাদুদাদুর ৯১ বছর বয়স, তাই কিছু কিছু ভুলে গেছেন। শামুদের তাঁর ঐসব লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা বলতেন শুধু একটা শর্তে। কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। বুঝতে না পারলেও না, তাতেও সবাই রাজি ছিল।

কালীঘাটে খালের পাড়ে শামুদের বাড়িতে প্রায় প্রত্যেক রবিবার সকালে নৌকা চেপে আসতেন। সঙ্গে আনতেন গামছায় বাঁধা একেকটা প্রায় কিলোটাক ওজনের দু-তিনটি চাঁদা মাছ, কি কাছিম, কি বিশাল দাঁড়া কাঁকড়া, নিদেন খান কুড়ি কচ্ছপের ডিম। সারাদিন গাল-গল্প, খাওয়া-দাওয়া দুপুরে ঘুম, বিকেলে চা সেরে হঠাৎ বলতেন, ঐ যাঃ! শেষটা না ভাঁটা পড়ে যায়!

বলে সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চেপে রওনা দিতেন। ভাঁটার আগেই পৌঁছতে হবে।

অন্ধকারে জলে থাকা নয়, জলে যাদু আছে।

সেবার একথা শুনে শামুরা মুখ লুকিয়ে হেসেছিল। পাদুদাদুর কি রাগ, জলের কথা তোরা কি জানিস'রে ছোঁড়া? জর্জ মেরি বালিচরের নাম শুনেছিস? ওপর থেকে মালুম দেয় না, আগে এত জাহাজডুবি হত যে তাদের মাস্তুলগুলো দজারুর কাঁটার মতো উঁচিয়ে থাকত। সেসব দিন গেছে বটে কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে তারা জলের ওপর ভেসে ওঠে। অনেক লোক দেখেছে। নদী পুলিশের কাজ খুব সোজা নয়। কোন্ বিপদটা সত্যি আর কোন্‌টি বা স্বপ্ন তাই বা কে বলে দেবে? হ্যাঁ।

এই বলে হাঁড়িমুখ করে নৌকায় চেপেছিলেন।

আসলে নাকি সত্যিকার আত্মীয় নন। ফ্রেজারগঞ্জের কাছে শামুর ঠাকুমার মামাবাড়ি সম্পর্কে কিরকম দাদা। বোধহয় পাড়া তুতো। তবে সেটা কিছু বড় কথা নয়। নিজের দাদারা তো খোঁজ খবর নেয়ই না এমনকি মরেও গেছে। তাই পাদুদাদুর এ বাড়িতে এত আদর। আর শুধু শামু কেন শামুর বন্ধুরাও ওঁকে ভারী পছন্দ করে।

তা এবার পুজোর সময় দেওয়ালীর পর দিন সকালে ছোট নাতি গোবরাকে সঙ্গে নিয়ে বেশ সকাল সকাল পাদুদাদু এসে হাজির হলেন। দুজনের হাতে দুটো গামছায় বাঁধা কুড়িটা কুড়িটা চল্লিশটা প্রকাণ্ড গলদা চিংড়ি। দেখেই সকলের চক্ষু চড়কগাছ।

পাদুদাদু বললেন, মা কালীকে দেখিয়ে তবে রান্না। তিনি একবার এইদিনে আমার বড় উপকার করেছিলেন। হঠাৎ সে কথা মনে পড়ে গেল। দ্যাখ রে গোবরা, চারটে নারকেলও হবে।

বাড়ি ভর্তি লোকের খাওয়া দাওয়া হলে পর, মাঝের ঘরের ফরাসে শুয়ে টেনে ঘুম। বিকেলে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে মিষ্টি গলদা শুধু আজকাল কেন; কোনকালেই এ অঞ্চলে দেখা যায়নি। কোথায় পেলেন মামা?

পাদুদাদু তাকিয়া সরিয়ে দিয়ে বললেন, এই হুগলী নদীর একটা বিশেষ জায়গায় রাতে বড় বড় দাঁড় বাধা হাঁড়া ডুবিয়ে রাখা হয়, দু-দিন বাদে ভোরে সেগুলো টেনে তোলা হয়। কপাল ভাল হলে জনাদর্শেক লোক এক এক হাঁড়ায় হাত লাগায়। আর বছরে ঐ একবারই উঠবে।

তারপর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে ইদিক উদিক চেয়ে বললেন সে কি আজকের কথা? হয়তো ৪১ কি ৪২ সাল হবে, ভাল করে মনেও করতে পারি না। তখনি আমার বয়স ৫০ এর উপরে। পাকা-পোক্ত সবচেয়ে অভিজ্ঞ আর বিশ্বাসী নদী পুলিশের একজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা হঠাৎ বড্ড কাছে এসে

পড়েছিল। আরও পরে ডিসেম্বর মাসে এখানে কলকাতায় আর তার আশেপাশে জাপানীরা বোমা ফেলেছিল। কিছু লোকও মরেছিল। শহর ছেড়ে অনেকে পালিয়েছিল। আবার পরে কেউ কেউ ফিরেও এসেছিল। সন্ধ্যে থেকে চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালীপুজোর দিনও কোথাও একটা আলোর রশ্মি দেখার উপায় নেই। পরদা ঘেরাটোপ দিয়ে, দরজা-জানালা বন্ধ করে সেবার সব পুজো হল। যেন কতই না লজ্জার ব্যাপার। একটা পাঁঠা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সব মিলিং টারিতে কিনে নিয়েছিল। তার ওপর আমি বাড়ির বড় ছেলে একদিনের জন্যেও ছুটি চাইতে পর্যন্ত পারলাম না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিঃশব্দে, লঞ্চে করে রোজ রাতে চাঁদপাল ঘাট থেকে স্রোতের সঙ্গে ১০ মাইল টহল দিচ্ছি। অন্ধকারে যথাস্থানে বোমা ফেলার যেমন অসুবিধা হয় তেমনি আবার প্যারাশুটে করে কমাণ্ডো নামাবার সুবিধাও হয়। বোমা অবিশ্যি ডিসেম্বরে ওরা খোলাখুলি দিনের বেলাতেই ফেলেছিল। সে যাই হোক, আমাদের কাজ হল যাতে কোন নির্জন জায়গায় প্যারাশুটে নেমে নৌকো করে নদী পথে এসে ফোর্ট উইলিয়াম কেউ না ক্ষতি করে সেইটে দেখা। ঠাকুমা বলতেন সে রাতে স্বয়ং মা-কালী নাকি ভিড়ের সঙ্গে মিশে আলোর শোভা দেখতে বেরোন।

তবে ১৯৪২ সালের ঐ ঘুটঘুটে অন্ধকারে কি দেখতে বেরোবেন? এক যদি জাপানী বোমারু ঠেকাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে। নিঃশব্দে মোটর লাগান সরু লঞ্চে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এগোচ্ছি। মনে হচ্ছে নৌকোর তলাটা জলের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে। ভাবছি এমন তেল-তেলা নদী ভূ-ভারতে আর নেই। আবার ভাবছি ঐ তেল-তেলা জল থেকে অন্ধকারেও কেমন একটা আভা বেরচ্ছে, তাতে আমরাও যেমন জলের ওপরটা দেখতে পাচ্ছি তেমনি আকাশ থেকে আমাদের লঞ্চটাও মালুম দিচ্ছে না তো? তাছাড়া আরেকটা ভয়ও ছিল। এই জগৎ জোড়া আতঙ্কের মধ্যিখানেও কলকাতার দুষ্কৃতকারীরা যে যার সুবিধা করে নেবার তালে আছে, আগেও তার প্রমাণ পেয়েছি। ভয়-ডর নেই তাদের। ঠাকুর দেবতাকেও বিশ্বাস নেই। চাই কি কালীপুজোর এই নিকষ-কালো অন্ধকারে চুপিসাড়ে গিয়ে সেই গোপন জায়গা থেকে ডুবনো হাঁড়ি তুলে গলদা পাচার করলেই বা দেখছে কে? যেরকম ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায় ওরা, লুকনো জায়গাটা জেনে ফেলাও অসম্ভব নয়।

আকাশে এদিকে একটা অসময়ের ঝড় পাকিয়ে উঠেছে। কালির শিশিতে আরো কালি ঢাললে যা হয়, তাই হচ্ছে। জলেতে আকাশেতে তফাৎটা ক্রমে দূর হয়ে যাচ্ছে। চারদিক থমথম করছে। কোথায় নদীর তলায় গর্ত, কোথায় বালির চড়া—আমি যে আমি, আমারই তা গুলিয়ে যাচ্ছে, অন্য লোকের কথা! এমনি রাতেই হয়তো—ও কি?

বুকটা ধড়াস করে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সরু পানশির মত একটা নৌকো অন্ধকার ভেদ করে সাঁই করে ডানদিক থেকে বাঁদিকে চলে গেল। কি করে দেখলাম জিগগেস করিস না। বিপদের সময় মানুষের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় গজায়, হয়ত তারই সাহায্যে। সঙ্গে সঙ্গে হড়-হড় করে মোটা শেকলের মতো কিছুতে বাধা পেয়ে আমাদের লঞ্চ প্রায় উল্টোল আর কি! আমাদের চক্ষুস্থির! "হোয়াট হোয়াট" করতে করতে আমাদের অফিসার ক্যাপ্টেন গ্যারিক কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ সে দূরবীন দিয়ে আকাশ দেখছিল।

অন্ধকারেও জায়গাটা চিনতে পারলাম। গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। আসন্ন ঝড়ের অন্ধকারে সব লেপে-পুছে একাকার হয়ে গেলেও, মানস নেত্রে দেখতে পাচ্ছিলাম বাঁয়ে সেই অষ্টাবক্র তেঁতুল গাছ, যার নীচে কোন মাঝি মরে গেলেও নৌকো বাঁধে না। তার ওপরে ওলন্দাজদের ওয়াচ-টাওয়ারের, ভগ্ন স্তূপের ইটের গাদা। ফোকলা দাঁত আর কানা চোখ নিয়ে অমাবস্যার অন্ধকার আর ব্ল্যাক-

আউটের কালো কম্বল আর আসন্ন ঝড়ের কালিমা গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে সরু পানশি চেপে শত্রুদের চর কোথায় গিয়ে সেঁদোল কার বাবার সাধ্য বোঝে, পাদুদাদু তুলে নিলেই বা কে বাধা দিচ্ছে!

সায়েবকে কিছু বলা যায় না। অমনি হুকুম দেবে পাদু নাও। রকেট উড়িয়ে, ফ্লেয়ার জ্বেলে রাতকে দিন করে সাংঘাতিক এক মিলিংটারি তল্লাসী চালাবে। চিরকালের মতো আমাদের গাঁয়ের লোকেদের গলদার হাঁড়ি ডুবনো ঘুচে যাবে। জানিস বোধ হয় মিলিংটারি সাহেবদের হাত থেকে জাপানী কমাণ্ডো যদি বা বাঁচে গলদা চিংড়ি কদাচ নয়। বলতে এতটা সময় লাগল কিন্তু ঘটতে লেগেছিল হয়ত আধ মিনিট।

তারই মধ্যে লঞ্চ কাৎ হয়ে যাওয়াতে সাহেব, আমি, বিলিতী গানাররা দুজন আর চার দিশী সারেঙ ঝুপ ঝুপ করে জলে পড়ে গেলাম। বলেছি তো যারা জলে জলে জীবন কাটায় তারা কেউ সাঁতার শেখে না। কারণ জলকে তারা ভয় পায় না। যারা ড্যাঙায় থাকে, কিন্তু মাঝে মধ্যে জলে নামে আর মাঝিরা সবাই দক্ষ সাঁতারু হয়।

তা আমরা কজনা টুপ করে ঐ তেল-তেলা জলে ডুবে গেলাম। একবারে কেউ ডোবে না জানিস তো? থেকে থেকে ডুবলাম, আবার ভাসলাম। সাহেবগুলোর কথা আর বলিসনে। তারই মধ্যে খচমচ করে কাৎ হয়ে যাওয়া লঞ্চে চেপে বসল। সারেঙরা মাঝির ছেলে, তারা সাঁতরে অপর পারে ডাঙায় উঠল।

আর আমি? আমার কথা বলিসনে! প্রাণপণে ঠ্যাং হাত ছুড়ে কতবার যে ডুবলাম আর ভাসলাম তার ঠিক নেই। শেষটা দেখি দিব্যি ভেসে আছি। এমনকি ডাঙার কাছে পৌঁছে গেছি। আর সবচেয়ে অদ্ভুত চারদিক আলোয় আলো। পর্তুগীজ বাতিঘরে কে এ, আর, পি কে তুচ্ছ করে, বিরাট মস্ত বাতি জ্বেলেছে! আর সেকি হট্টগোল। দেখি কানে মাকড়ি, মাথায় ফাট্টা, হাতে মুগুর, নেংটি পরা একদল লোক গোটা পাঁচেক জিপ আর জনা দশেক বেঁটে লোককে কোণঠাসা করেছে। দেখেই ভাবলাম তবে আমি নিশ্চয় মরে গেছি, স্বর্গে গেছি, মা-কালী তাহলে আমার সব দুষ্কর্মের কথা জানতেই পারেননি যেমনি ভাবা, অমনি মুচ্ছো।

যখন জ্ঞান হল, নাকে এল গলদা চিংড়ির খোশবাই। চেয়ে দেখি রাত ভোর হয়ে গেছে। আমি আমাদের গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছি। আমার পাশে গলদা চিংড়ির গাদা, প্রতি বছর যেমন হয়। ধড়মড় করে উঠে বসতেই গাঁয়ের লোকরা আনন্দ কোলাহল করে উঠল, মরেনি! মরেনি! চিংড়ি খেতে বাধা নেই!

শুনে আরেকবার মুচ্ছো না গেলেও খুব হেঁচকি উঠল। তবে দুপুরে নারকেল চিংড়ি খেতে কোন অসুবিধে হয়নি। এই বলে পাদুদাদু গল্প থামিয়ে উঠে পড়ার

উদ্যোগ করছেন দেখে শামুরা ৭/৮ জন ওঁর কাছা ধরে ঝুলে পড়তে উনি থপ করে বড় তাকিয়াটার ওপর বসে পড়ে শামুর মার হাত থেকে আরেক পেয়ালা চা নিয়ে বললেন—

হ্যাঁ, ঐ যে বলছিলাম সায়েবগুলোর কথা আর বলিসনে। পরে কাগজে পড়লাম ওরা যেই দেখেছে বাতিঘরে জোর বাতি জ্বলছে অমনি ভয়ডর ভুলে লঞ্চ থেকে ছোট নৌকো দুটো নামিয়ে ড্যাঙায় চলে এসেছে। কার এত আস্পদ্দা যে ব্ল্যাকআউট ভাঙে। আর কারফিউ বলবৎ থাকতে কারা এত হল্লা করছে! সঙ্গে সঙ্গে দপ করে আলো নিবল! সব চুপ। এসে দেখে গোটা দশ-বারো জাপানী কমাণ্ডো তাদের ছিপের ওপর এলোপাতাড়ি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ছিপ টেনে কাদায় তোলা কানা বাতিঘরে একশো বছর আলো জ্বলেনি। জনমানুষের সাড়াশব্দ নেই। গ্যারিক আর সানারদের জয় জয়কার, টাকাকড়ি মেটেল ফেটেল পেল। ওনলি স্যাড থিং হল প্যাড়ুই নিশ্চয় একলা লড়ে ওদের ঘায়েল করে নিজে জলের তলায় তলিয়ে গেছে। প্যাড়ুর জন্য টুপি খুলে খানিকক্ষণ দাঁড়াল-টাড়াল। ওদের মাইনেও বাড়ল।

—আর তুমি? চাকরিতে ফিরে গেলে না?

—পাগল, আর যাই কখনো? শেষটা যদি সত্যি করে মরে টরে যাই। গা ঢাকা দিলাম। ওরা কালো বর্ডারের চিঠি, বেশ কিছু টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

—না গাঁয়ের লোকেরা খুব সাহসী বলতে হবে। ঐ অন্ধকারে চিংড়ি তুলল, জাপানী ধরল, তোমাকে প্রাণে বাঁচাল। খুব বীরপুরুষ।

আরে দূর! দূর! তাই করে কখনো? তাহলে তো ঐ কুখ্যাত অষ্টাবক্র তেঁতুলতলা দিয়ে আসতে হবে। তোরাও যেমন। অর্ধেক ছিল তক্তাপোষের তলায়, বাকি অর্ধেক আলো জ্বলা দেখে আর হট্টগোল শুনে মুচ্ছো গেছিল। তারপর ভোরে উঠে চণ্ডীমণ্ডপে চিংড়িসহ আমাকে দেখে সকলের কি ফূর্তি। ওদের বিশ্বাস আমি একলাই সব চিংড়ি তুলে এনেছিলাম। ডবল ভাগ নিয়ে সেদিন চেতলা ফিরেছিলাম। আর কখনো নদীপুলিশের ধারেকাছে যাইনি। বাবা! পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচা নিয়ে কথা।

শামুর ঠাকুমা বললেন, কিন্তু পাদুদা, তাহলে কানে মাকড়ি, নেংটি পরা ঐ লোকগুলোই বা কে?

পাদুদাদু উঠেই পড়লেন।—কে জানে কে। তবে একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মা-কালীর চিংড়ি ফাঁকি দিতে পারে.না কেউ। তিনি নিজেই ব্যবস্থা করে নেন। চলরে গোবরা। আর দ্যাখ, এসব কথার এক বর্ণ যদি তোর ঠামুর কানে তুলিস তো আর কখনো কোথাও নিয়ে যাব না।

গোবরা বলল, আমি শুনতে পাইনি দাদু, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

অকৃতজ্ঞ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছোট, পাড়াগেঁয়ে শহর। ঢালা মাঠ, অনেকটা দূরে-দূরে কয়েকখানা টিনের ঘর। ঘরগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আঁকাবাঁকা মাটির রাস্তা। বিকেল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। পথে লোক-জন নেই, একটা গরুর গাড়িও চলছে না। সবে সন্ধ্যে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মাঝরাত।

পৃথিবী যেন ভয়ে চোখ বুজে আছে, এমনি অন্ধকার। চলেছে একটানা ধারাবাহিক বৃষ্টি—শূন্যময় শোনাচ্ছে একটা কাতর গোঙানির মতো; তাতে শরীরে ঘুম না এসে আসে একটা ক্লান্তিকর বিভীষিকা। বৃষ্টির একঘেয়ে কাতরতা ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দ নেই—না বইছে ক্লান্তিকর জোলো হাওয়া, না ডাকছে একটা ঝিঁ-ঝিঁ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকালে বোধহয় অন্ধকারকে এমন ভয়ঙ্কর লাগত না। একটা বাজ ডাকলেও যেন কেউ কোথাও আছে বলে একটা আশ্রয় পেত। সব কিছুকে এমন একা, এমন দূর মনে হচ্ছে।

মাঠের শেষ সীমানাতেই কেশব মজুমদারের বাড়ি। তেজারতি কারবার করে কেশবের বিস্তর পয়সা। কিন্তু হলে কী হবে মনে তার সুখ নেই। তার মুখের চেহারা আজকের এই আকাশের চেয়েও ঘোরালো। তার সমস্ত বাড়িতে আজকের এই বিবর্ণ অন্ধকার যেন নিশ্বাস বন্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক-দিন থেকেই এ-অঞ্চলটায় ডাকাতি হচ্ছিল; উড়ো খবর এসেছে কেশবের বাড়িতেও শিগ্‌গিরই ডাকাতের পদধূলি পড়বে। কেশব দিনে-রাতে তটস্থ, যেন শুয়ে আছে সে কাঁটার বিছানায়। লাঠি-সোঁটা হাতিয়ার বন্দুক সব সে হাতের কাছে জোগাড় করে রেখেছে বটে, কিন্তু মনে তার তবু স্বস্তি নেই। চোখে একটু একটু ঘুম জড়িয়ে এলে মনে হয় গায়ে তার কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, চোখ খুলে রেখে জেগে থাকলে মনে হয় পেছনের দেয়ালে কার যেন এই ছায়া পড়ল। তারপর আজ যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে এই যেন কারা এল, এই যেন শোনা গেল কাদের চাপা গলার ফিস্‌ফিসানি।

বৃষ্টির আর বিরাম নেই, জলে-কাদায় রাত উঠেছে ঘোলা হয়ে।

কেশবের স্ত্রী এল তাকে অভয় দিতে, বললে, এবার শুয়ে পড়। ডাকাতদের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, জলের মধ্যে তারা বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরুবে।

কেশব বললে, হ্যাঁ, এইবার শুয়ে পড়তে হয় বৈকি কিন্তু বাইরে কে দরজাটা ধাক্কা দিচ্ছে না?

কেশবের স্ত্রী খেঁকিয়ে উঠল, দরজায় তো নয়, তোমার মাথায় ধাক্কা দিচ্ছে!

না, না শোন কান পেতে। কে ডাকছে?

ডাকাতরা তোমার নাম ধরে আদর করে ডাকতে যাবে, না?

কেশব চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। ভীত, অসহিষ্ণু গলায় বললে,—আওয়াজটা আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আশ্চর্য তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

স্ত্রী ধারালো গলায় তাকে ধমকে উঠল ঃ কী বুদ্ধি তোমার, ডাকাতরা তোমাকে দরজা খুলে দেবার জন্যে সকাতরে অমন সাধবে কিনা। তারা বড় হুড়মুড় করে খিল-কপাট ভেঙে চলে আসতে পারে না? হাওয়া, ওটা হাওয়ার শব্দ।

না, না, স্পষ্ট মানুষের গলা। লণ্ঠনটা উসকে দিয়ে কেশব বন্দুকটা বাগিয়ে ধরল। বললে, কে?

কোন সাড়া নেই।

স্ত্রী হেসে উঠল, ডাকাতরা তাদের নাম-ধাম তোমাকে বলবে কিনা—কী বুদ্ধি।

কেশব আবার হাঁক দিল—কে?

দরজার ওপার থেকে ভিজে, মসৃণ গলায় কে বললে, আমি।

ভয়ে সমস্ত ঘরটা যেন ছোট হয়ে গেল। লণ্ঠনের আলো যেন গেল কমে, দেয়ালগুলি হেঁটে কেশবের চারপাশে এল সরে, দাঁড়াল ঘন হয়ে, প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে কেশব বললে, কে—আমি কে?

আমি মণীন্দ্র।

মণীন্দ্র। কোন্ মণীন্দ্র। কেশবের গলা চিরে আওয়াজ বেরুল। ওপার থেকে রাত্রির অন্ধকার যেন কথা কয়ে উঠল—মণীন্দ্র-মণি আপনার ভাইপো। ব্যান্ডেলে যে কাজ করত, যাকে আপনি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন। দরজাটা খুলুন বাইরে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

কে, মণি? এতদিন পরে—

উৎসাহিত হয়ে কেশব দরজা খুলতে যাচ্ছিল, স্ত্রী তাকে বাধা দিল। গলা নামিয়ে বললে কে না কে মণির নাম ভাঁড়িয়ে এসেছে। খবরদার, দরজা খুলো না বলছি, নইলে তিন-চার বছরে 'যে এদিক মাড়ায়নি' সে বলা-কওয়া নেই হঠাৎ এসে দরজায় ঘা মারবে? তাও এ দুর্যোগের রাতে। কী বুদ্ধি তোমার?

পাশের জানালাটার ছিটকিনি লাগানো ছিল না, মণি হঠাৎ ভিতর দিয়ে তার একখানি হাত বাড়িতে দিল। রোগা লিক্‌লিকে, সরু একখানি হাত। বললে,

আলোটা নিয়ে আসুন, দেখুন সেই যে ছেলেবেলায় কব্জির কাছটায় কেটে গিয়েছিল সেই দাগ স্পষ্ট, অটুট আছে। খুলে দিন দরজা, জলে আর কতক্ষণ দাঁড়াব বলুন?

আর সন্দেহ নেই। কেশব একহাতে দরজা খুললে, আরেক হাতে বন্দুকটা সে বাগিয়ে ধরেছে। বিস্ময়ে বন্দুকটা হাত থেকে খসে পড়ে আর-কি।

সত্যি-সত্যিই সামনে মণি দাঁড়িয়ে। মণি হাসিমুখে বললে, আমাকে সম্বর্ধনা করবার এক অদ্ভুত আয়োজন দেখছি যে।

লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে কেশব বললে মনে কিছু করিস নে। এদিকে আজকাল বড্ড ডাকাত পড়ছে, তাই সব সময় এমনি সাবধান হয়েই থাকি। কখন কী হয় বলা যায় না তো।

মণি বললে, তা আমি জানি। তা জেনেই তো আমি এলাম। কেশব অবাক হয়ে বললে, কোত্থেকে এলি? এত রাতে ট্রেন?

আমাদের কী, মণি তার শরীরটা বিস্তারিত করে বললে, আমরা সোজা হেঁটে চলে আসতে পারি।

মণি খিক-খিক করে হেসে উঠল : সে চাকরিটা গেছে। কদিন এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করলুম। শুনলুম আপনাদের এখানে বড় বিপদ, তাই ভাবলুম একবার দেখা করে আসি।

তা বেশ করেছিস, 'স্ত্রীকে সম্বোধন করে কেশব পরে বললে, ওর কিছু খাবার যোগাড় কর চট্ করে।

মণি ব্যস্ত হয়ে বললে, না আমার খিদে নেই। শোবার জন্যে এখন একটা বিছানা পেলেই আমি খুশি। আপনারাও আর মিছি মিছি কেন জেগে আছেন? ঘুমোতে যান এবার। ডাকাত এলে আসবে, ভয় কী? আমি তো আছি। আমি তবে এত পথ ভেঙে এলুম কী করতে?

মণির খুড়িমা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, চাকরি খুইয়ে এখন থেকে এইখানেই তবে শেকড় গঁথিয়ে বসবে নাকি? কাকার ভাত খুব সস্তা পেয়েছ, না?

না। মণি গম্ভীর মুখে বললে, কাল ভোরেই আবার আমি চলে যাব। ভয় নেই।

তবে একরাত থেকে তুমি কী এমন সাহসের ভোজবাজি দেখাবে শুনি? খুড়িমা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। ডাকাতরা তো আর তোমার ফরমাস-মতো আসবে না।

তবু তো একটা রাত আপনারা নিশ্চিত হয়ে ঘুমুতে পারবেন, সেইটেই বা কী কম কথা? মণি কি-রকম অদ্ভুত করে হাসল। বলল, ঘুমে আমার চোখ ঢলে আসছে, শিগ্গীর বিছানা করে দিন। এই বাইরের ঘরটাই বা মন্দ কী। আমার

কিছুতেই আর ভয় নেই।

খুড়িমা বিছানা পাততে লাগল।

কেশব মণির দিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে এত জলের মধ্যে দিয়ে এলি, তবু একফোঁটা ভিজলি না, মণি?

সঙ্গে আমার এক বন্ধু আসছিল যে, সেই-ই তো তার ছাতায় আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। মণি একলাফে বিছানায় শুয়ে পড়ল, আগাগোড়া একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে বললে, আপনারাও আর কেন মিছি মিছি জেগে আছেন? নরম ঠান্ডা রাত, এবার চমৎকার ঘুম আসবে। বাইরের ঘরে আমিই তো রইলাম পাহারায়—তবে কিসের ভয়?

আহা, যা টিঙটিঙে চেহারা, তার বীরত্বের বহর দেখো একবার? খুড়িমা ঠাট্টায় কণ্ঠস্বর বিকৃত করে বললেন, খাটের নীচে দুয়েকটা ইঁদুরের গর্ত আগে খুঁজে রেখো। নইলে চাকরি গেছে, প্রাণটাও যাবে আর-কি।

কাঁথার তলা থেকে মণি বোবা, বিকৃত গলায় হেসে উঠল।

বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ এসেছে মরা মুখে হাসির মতো ফ্যাকাসে হয়ে।

স্ত্রী বললে, ঐ লোকটাকে যে তুমি পরিপাটি করে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলে, সত্যি ও তোমার ভাইপো তো?

কেশব ভীত অথচ অবাক বিস্ময়ে বললে, বা মণিকে তুমি চেন না?

চিনি তো। কিন্তু এতদিন বাদে খুড়ো খুড়ির সঙ্গে দেখা, কাউকে প্রণাম পর্যন্ত করলে না। চেহারা, গলার স্বর অবধি কেমন হয়ে গেছে। হাত পায়ের শিরা উঠে এসেছে, খাড়া-খাড়া চুল, গালে গলায় হাড় ঠেলে—ভাল করে লোকটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলে তো?

কেশবের শিরদাঁড়াটা ভয়ে কনকন করে উঠল। অথচ মুখে সাহস এনে বললে, কী যে তুমি। চাকরি বাকরি নেই, তাই চেহারা এমন দুর্ভাবনায় খারাপ হয়ে গেছে। দেখছ না, ডাকাতের ভয়ে আমিই কেমন শুকিয়ে যাচ্ছি। ও কিছু নয়।

কেশবের স্ত্রী খাটো গলায় বললে, কিন্তু এসেই একেবারে লম্বা দিল কেন? তাও মুখ চোখ ঢেকে,—এমন কী একেবারে শীত পড়েছে জিজ্ঞেস করি। তোমাকে বলছি ও মণি নয়। পাছে মণি নয় বলে চিনতে পারি তাই অমনি ঝুপ করে কাঁথার তলায় লুকিয়ে পড়ল। চল, এখন ও হয়ত ঘুমিয়েছে, কাঁথার ঢাকনাটা আস্তে আস্তে তুলে চেহারাটা ওর একবার দেখে আসি।

কেশবের গা-হাত-পা শিরশির করে উঠল, বোজা গলায় বললে, আজ আর না, কাল ভোরে।

কাল ভোরে তো ও চলেই যাবে। যা ঘটবার তা তো আজ রাতেই—

কেশব অস্ফুট গলায় চিৎকার করে উঠল ঃ এত কথা আগে তবে বলনি কেন?

কেশবের স্ত্রী কণ্ঠস্বরকে ঝাপসা করে আনল। বললে, ও যে-ই হোক, অমার মনে হচ্ছে ও-ই ডাকাত।

'বল কী। বল কী।' অন্ধকারে শূন্যে চোখ মেলে কেশব বললে ডাকাত গদিতে শুয়ে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে কেন?

ও আগে থেকে এখানে রয়েছে দলের লোকদের দরজা খুলে দিতে। তুমি দেখো আমার কথা ঠিক হয় কিনা। নইলে দেখলে না, কথায় বার্তায় একখানা ভাব দেখালো যেন আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে ডাকাতি হবে বলেই ও এসেছে, কী করে জানল ও এত কথা? আর কী বড়ফট্টাই, আমাদের উনি বাঁচাবেন। সবংশে শেষ করে দেবার মতলব।

কেশব যেন বন্দী, অসহায় একটা পশুর মতো গরজে উঠল ঃ এখন কী করা যায়?,

কেশবের স্ত্রী ঝামটা মেরে উঠল ঃ ঘুমুনো ছাড়া কী আর করা যাবে? সারা জীবন তো কেবল নাকে তেল দিয়েই ঘুমুলে।

কেশব দেয়ালের দিকে আরও একটু ঘন হয়ে সরে বসল। বললে তুমি বলতে চাও মণি আমার ও সর্বনাশ করবে? আমি যাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করলাম—।

মণি কি না তাই বা কে জানে। আরো কাটুক না খানিকটা রাত।

আরও খানিকটা রাত কাটল। কোথাও যেন সাড়া-শব্দ নেই। বাইরের ঘরটা ঘুমে একেবারে মুছে গেছে। একটি নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে থাকতে কেশবের হালকা একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ তুমুল একটা গোলমালে তার হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে গেল। গোলমালটা যে কিসের, স্পষ্ট সে কিছু ধারণা করতে পারল না। স্তম্ভিত হয়ে একতাল মাংসের মতো বসে রইল। মনে হল মরবার আগের মুহূর্তে মানুষ বুঝি এমনি স্তব্ধ হয়ে যায়।

তার গায়ে একটা ধাক্কা মেরে তার স্ত্রী বললে, শুনতে পাচ্ছ না, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

কেশব মূর্চ্ছাহতের মতো বললে, কোথায়?

গোলমালটা ঠিক আক্রমণের জয়োল্লাসে নয়, যেন পলায়মান কতকগুলি লোকের ভীত, কাতর আর্তনাদ। গোলমালটা বাড়ির মধ্যে না এসে ক্রমশ যেন দূরে সরে যাচ্ছে। ব্যাপার কী।

কেশব সাহস পেয়ে বলে উঠল ঃ বন্দুক, আমার বন্দুক।

বন্দুকের দরকার ছিল না, চিৎকারটা তখন রাস্তা ছেড়ে মাঠে পড়েছে।

বাইরের ঘরে কেশব জানালা খুললে। বৃষ্টির পর আকাশে তখন ঘোলাটে একটু জ্যোৎস্না ফুটেছে। সেই আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল একদল লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ঝোড়ো হাওয়ার চেয়েও দুর্দান্ত বেগে। একেকবার তারা পেছনে ফিরে তাকায়—কী দেখে তারা কে জানে—আবার মাঠের উপর দিয়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে থাকে।

ঐ এল, ঐ এল, ধরতে—সবার মুখে সেই ভয়ার্ত চিৎকার।

কেশবের স্ত্রী বললে, এত গোলমাল, রাস্তায় লোকজন জড়ো হয়ে গেল আর তোমার বীর ভাইপোর এখনো ঘুম ভাঙল না। উনি এসেছিলেন আমাদের ধনে প্রাণে রক্ষা করতে।

কেশব খাটের কাছে এগিয়ে এসে হুঙ্কার দিলে ঃ মণি....

কাঁথাটার কোথাও এতটুকু কুঁচকালো না পর্যন্ত।

মণি।

কে কাকে ডাকছে।

কেশব এক হেঁচকা টানে কাঁথাটা তুলে ফেলল। কোথায় মণি। সমস্ত বিছানাটি তেমনি সাদা, তেমনি পরিপাটি। কোথাও একটা রেখা পর্যন্ত নেই।

কী ব্যাপার।

বাইরে এসে দেখা গেল, ডাকাত সত্যি এসেছিল। অনেক কিছু চিহ্ন তারা ফেলে গেছে—ছোরা, শাবল, মুখোশ, লোহার ছোট ছোট ডান্ডা। এমনকি একপাটি জুতো। পালাবার তাড়ায় কারুরই কোন দিশে ছিল না। কিন্তু মণি গেল কোথায়?

কেশবের স্ত্রী বললে, এই সামান্য ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না? বীটের পুলিশ কোথাও এদিকে টহল দিচ্ছিল হয়ত, তাই দেখে ডাকাতরা চোঁচা ছুটে পালিয়েছে। আর উনি তোমার মণি হচ্ছেন ডাকাতের দলের সর্দার—কী করে আর শুয়ে থাকেন বল ওদের সঙ্গে উনিও দিলেন দৌড়।

কেশব হতভম্ব হয়ে বললে, তাই হবে।

'তাই যদি না হবে তবে ও ফিরে আসত না? ডাকাত তাড়িয়ে দেবারই যদি ওর মুরোদ থাকত তবে নিজেও সেই সঙ্গে পালিয়ে যাবে কেন।

ঠিক বলেছ, নইলে ওই বা সেই সঙ্গে পালিয়ে যাবে কেন? কেশবের এতক্ষণে বুদ্ধি খেলল। পরে ঢোক গিলে বললে, কিন্তু কিছু নেবার চেষ্টা না করে দল-কে দল পগার পার হয়ে গেল, এও একটা রহস্য বটে।

রহস্য না হাতি। কেশবের স্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে বলল, না পালালে দেখতে কখন তোমার ভাইপোই তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিত। দেখ না আসুক না পুলিশ, দলের সর্দারকে যখন চিনতে পেরেছি তখন আর ভাবনা নেই।

সকাল বেলা যথাসময়ে পুলিশ এল।

কেশব মণীন্দ্রের নাম ধাম জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সব পরিচয় দিয়ে হঠাৎ বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, এ 'কী দারুণ অকৃতজ্ঞ ভাবুন। আমিই তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিলুম, আর সে এসেছিল আমার বুকে ছুরি বসাতে। তাকে দিলুম আশ্রয়, আর তার কিনা এই মতলব ছিল—

কেশবের স্ত্রী ঘর থেকে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল—আমি তো তখনই বলেছিলুম!

ডাকাতের সর্দার! ওর দশটি বছর জেল চাই, দারোগাবাবু! হাড়ে-হাড়ে শয়তান, নইলে কোনদিন কেউ খুড়োর বুকে ছুরি তুলতে পারে? হ্যাঁ, এ ছুরি প্রায়

পা'কে বসাচ্ছিল আর-কী, আর এক ইঞ্চি নামলেই সাবাড়—ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কী করলেন?

কেশব লাফিয়ে উঠল : বন্দুক, আমার বন্দুক হাতে না? খপ্ করে তাই উঁচিয়ে ধরলুম। ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, মুখ থেকে মুখোশ গেল খসে। স্পষ্ট দেখলুম, মণীন্দ্র। ব্যান্ডেলে সে কাজ করে, আমার আপন ভাইপো। রাতে যে ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখি! তাকে চিনতে দেরি হবে কেন?

তারপর?

ছুট দিল লম্বা। যা ছিল যন্ত্রপাতি, সব গেল ফেলে। কেশব গর্বে টগবগ্ করে উঠল : বন্দুকের সঙ্গে পারবে কেন? ঘোড়াটা টিপতে গেলুম দারোগাবাবু, পারলুম না। শত হলেও তো নিজের বংশের রক্তপাত—

কেশবের স্ত্রী ঘর থেকে খেঁকিয়ে উঠল : বাবু, আমিই তো বারণ করলুম—বন্দুক ছুঁড়তে।

হ্যাঁ, কেশব মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, বলার ত আর অপেক্ষা রাখে না। ওঁর পরামর্শ শুনেই আমাকে কাজ করতে হয়।

দারোগাবাবু বললেন, কিছু নিতে পারেনি তো?

নেবে? কেশব বুক চিতিয়ে দাঁড়াল! নিক না? দেখি না কতখানি বুকের পাটা।

দারোগাবাবু যন্ত্রপাতি সব কুড়িয়ে নিলেন থানায় জমা দিতে, বললেন—ওদের সহজেই ধরে ফেলতে পারব। অনেক কিছুই ক্লু পেয়ে গেলাম—এর আগে কোথাও একটা পায়ের দাগ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ বন্দুক সব বাড়িতেই তো ছিল।'

কেশব অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বললে, বন্দুক থাকলেই তো চলে না, তাকে বাগিয়ে ধরবার কায়দা জানা চাই।

দারোগাবাবু যাবার আগে বললেন, 'এ গ্যাং ধরতে পারলে দেশের একটা খুব স্থায়ী উপকার করা হবে কেশববাবু। আপনার সাহস ও কৌশলকে পুরস্কৃত করতে পারলে আমরা খুশি হব। আপনার ভাইপোর খোঁজে আজই আমরা ব্যান্ডেলে লোক পাঠাচ্ছি। আর এই যে একপাটি জুতো দেখছেন তা থেকে এর মালিককে খুঁজে পেতে আমাদের দেরি হবে না।

আবার রাত এল ঘনিয়ে। আজকে আর বৃষ্টি নয়, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। দিয়েছে এলোমেলো হাওয়া।

লণ্ঠন নিবিয়ে কেশব বাইরের ঘরে তার মশারির মধ্যে এসে ঢুকল। চারিদিক

ভাল করে গুঁজে সে নিশ্চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত। তেমনি রোগা, শিটে, লিকলিকে। আঙুলগুলি সাপের মতো পিছল, আঁকাবাঁকা। আঙুলগুলি তার গলার উপর আলগোছে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। প্রাণপণে চোখ বুজে সমস্ত শরীর কঠিন করে কেশব চেঁচিয়ে উঠল ঃ কে?

মশারির বাইরে থেকে স্পষ্ট উত্তর দিল ঃ আমি। চিনতে পাচ্ছেন না। এই দেখুন কব্জির দাগ।

কেশব ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল। মশারির বাইরে কারু কোন অস্তিত্বের ভাব নেই।

বন্দুক, আমার বন্দুক? কেশব ধড়মড় করে উঠে বসল। নামতে গেল খাট থেকে। মশারি তুলতে যাবে, অমনি আবার তার বুকের উপর সেই হাতটা লোলুপ হয়ে উঠল। কে বললে, আমিই আপনাকে খুন করতে এসেছিলাম? আমি খুবই অকৃতজ্ঞ না?

স্পষ্ট, পরিচিত, রাত্রির কণ্ঠস্বর।

কিন্তু কেশব চেয়ে দেখল, ঘরে-বাইরে ঝিম ঝিম করছে শূন্যতা।

বন্দুক, আমার বন্দুক নিয়ে এস শিগগির। কেশব স্খলিত পায়ে নীচে এল, ছুটে গেল দরজার দিকে। পা দুটো নিমেষে পাথর হয়ে গেল—দরজার কাছে একটা চেয়ার টেনে মণি এলিয়ে বসে আছে।

একি, মণি যে। তুমি কোত্থেকে। কেশব একেবারে বসে পড়ল।

মণি নির্লিপ্ত গলায় বললে, কাল যেখান থেকে এসেছিলাম।

কী মনে করে এসেছ জিজ্ঞেস করতে পারি?

ধরা দিতে এসেছি। আপনি থাকতে পুলিশ কেন আর কষ্ট করে বলুন? পুরস্কারটা আপনারই হোক।

আহাহা, সে কী কথা? তুমি আমার ভাইপো। তোমাকে ধরিয়ে দেব কী? বস, তোমার খুড়িমাকে ডেকে আনি। কেশব ভিতরে চলে যাচ্ছিল, বন্দুক আনতে যাচ্ছেন? মণি হেসে উঠল, তার দরকার নেই। বন্দুকে আমার কিছু করতে পারবে না। বসুন, একটা কথা বলি।

কেশব কাঁপতে কাঁপতে বললে, কী?

কাল আমিই ডাকাতদের তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। আপনি আমাকে মানুষ করেছিলেন সেই কথা আমি ভুলি নি।

কিন্তু কী করে তাড়ালে? কেশব ভয়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে।

আমি ম্যাজিক জানি। মণি তেমনি অনর্গল হেসে উঠল।

ফাঁসিগাছ

প্রমথনাথ বিশী

আমাদের গ্রাম থেকে রেল স্টেশনে পৌঁছবার পথের মাঝামাঝি একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটি একটি বনস্পতি, যেমন বিশাল, তেমনি প্রাচীন; আর সেটা যে কি গাছ তার পরিচয় কেউ জানত না। এদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে তার গোত্রের মিল ছিল না। চারিদিকের বৃক্ষরাশির মধ্যে সেই বলিষ্ঠ, সমুন্নত, অজ্ঞাতকুলশীল বৃক্ষটি পাণ্ডব-সেনাসমাবেশের মধ্যে যেন ঘটোৎকচ। স্বভাবতই বৃক্ষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো, কিন্তু তার আরও কারণ ছিল, সেটি ছিল একটি ফাঁসি-গাছ। লোকে বলত নবাবী আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফাঁসি দেবার জন্য গাছটি ব্যবহৃত হত। কাছেই একটি গ্রামে থাকত নবাবের ফৌজদার; প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা ছিল তার; কোনো ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হলে জবাবে লোকটাকে ঝুলিয়ে দিত গাছটির

একটি ডালে। মানুষ-ঝুলিয়ে দেবার মতো ডালগুলিই বটে। গাছটির গুঁড়ি থেকে পঁচিশ ত্রিশ হাতের মধ্যে কোন ডালপালা নেই, একবারে পরিষ্কার গা, মসৃণ, তার উপরে ডাল বেরিয়ে; এক-একটা ডাল কি লম্বা, একেবারে গ্রামান্তরে গিয়ে যেন পৌছয়, এমনি থাকে থাকে সুবিন্যস্ত ডাল উঠে গিয়েছে; যত উঁচুতে উঠেছে ততই ডালের দৈর্ঘ্য কম; সবসুদ্ধ মিলে গাছটির উপরের দিকে ছুঁচলো—মন্দিরের আকৃতি। গাঁয়ে গোপাল বলে একজন বৃদ্ধ মুসলমান কৃষাণ ছিল, সে বলতো তার ঠাকুর্দা নাকি ঐ গাছে ফাঁসি দিতে দেখেছে, সেটাই ছিল নাকি ঐ গাছে শেষ ফাঁসি লটকানো। গোপালের বয়স তখন ছিল বিরানব্বই; গোপালের কথা সত্যি হলে তার ঠাকুর্দার সময় নবাবী আমলের শেষ পড়ে বটে; আর তার মুখে এ গল্পটাও শুনেছি আমার বাল্যকালে; কাজেই গোপালের বিরানব্বই-এর সঙ্গে আমার বয়েসের মোটা একটা অঙ্ক জুড়ে নেওয়া উচিত।

যাইহোক শেষ ফাঁসির বর্ণনা সত্য হোক আর নাই হোক গাছটা যে ফাঁসি-গাছ ছিল তা নিঃসন্দেহ। জেলা গেজেটিয়ার পুস্তকে ফৌজদার-অধ্যুষিত ঐ গ্রামটির উল্লেখ আছে, আরও উল্লেখ আছে যে কাছাকাছির গাছগুলিতে ফাঁসি দেওয়া হত। তা যদি হয় এমন যোগ্য গাছটির ব্যবহার না হবার কথা নয়।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস যাক। যা বলতে বসেছি তা হচ্ছে ঐ ইতিহাসের স্মৃতি। সেদিনের বিষাক্ত স্মৃতি আজও গাছটিকে ভয়াবহ করে রেখেছিল। কেউ পারতপক্ষে রাতের বেলায় গাছটির কাছে যেত না একা তো নয়ই। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে না গিয়েও উপায় ছিল না, রেল স্টেশনে যাবার সড়কের ঠিক পাশেই তার অবস্থান। কত নিঃসঙ্গ পথিক যে রাতের বেলায় ওখানে এসে ভয়ে মূর্ছা গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের প্রশ্ন করলে বলত—কি দেখলাম? তা কি এখন মনে আছে। তবে মনে হল গাছের ডালে সারি সারি যেন মৃতদেহ ঝুলছে। আবার কেউ বা বলত মুমূর্ষুর অন্তিম আর্তনাদ স্পষ্ট শুনেছে। একজন বলেছিল, সে লোকটা বিদেশী—গাছের ইতিহাস জানত না। ঐ গাছতলায় পৌছুবামাত্র হঠাৎ একটা মৃতদেহ ধপ্ করে তার পায়ের কাছে পড়ল; সে চমকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে যে গাছের ডালে লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। প্রশ্নের খোঁচা খেয়ে সে বলল যে সেটা ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি তার ভুল করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে এসব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সত্য হতে পারে না। কেন না ফাঁসি হত বহুকাল আগে। তার সেদিনের স্মৃতি যদি কোন অলৌকিক সুড়ঙ্গ পথে আজ মূর্তি ধরে দেখা দেয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা; যুক্তি দিয়ে প্রমাণ অপ্রমাণ করার পথ বন্ধ।

কিন্তু যুক্তি এক আর বিশ্বাস আর এক। লোকের মনের ব্যাপক বিশ্বাসই এমন তথ্যের স্থান গ্রহণ করেছিল আর তাই ছিল যথেষ্ট। ফলে ঐ গাছটা যাতায়াতের পথের পাশে ভীতিমিশ্রিত একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্নের মতো দণ্ডায়মান ছিল।

তারপর বয়েস বাড়লে কোলকাতায় গেলাম কলেজে পড়তে। আমাদের মেসে একজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকতেন তাঁর থিওজফি চর্চার বাতিক ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁকে ফাঁসি গাছটির বিবরণ শুনিয়ে ছিলাম। তিনি বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে যেখানে কোন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে থাকে সেখানে পরবর্তীকালে সেই মৃত্যুদৃশ্যের ঠিক পুনরাভিনয় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কেন হয় তিনি জানেন না। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মৃত্যুর সময় মানুষগুলি যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিল সেই নিদারুণ তাড়নাতেই ওখানে ঐ রকম অলৌকিক ছায়াছবি উদ্ভূত হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন।

বলা বাহুল্য এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপুত হল না কিন্তু তা নিয়ে আর তর্কবিতর্ক করিনি।

তারপরে কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম এবং চাকুরি উপলক্ষ্যে নিজের গ্রাম থেকে এক প্রকার নির্বাসিত হলাম। বহুকাল জীবনের দুটি দশক কাটল দেশে এবং দেশান্তরে। এই সময়ের মধ্যে স্বগ্রামে যাওয়ার সুবিধে হয়ে ওঠেনি। কালক্রমে গ্রামের ছবি মনে ঝাপসা হয়ে এল। রেল স্টেশনে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে যেসব দৃশ্য বাড়িঘর গাছপালা এমনকি মানুষের যে মুখগুলি যাতায়াতের পথের পাশে দেখতে পেতাম ক্রমে ক্রমে ভুলে গেলাম, সেই সঙ্গে ফাঁসি গাছটার স্মৃতিও মন থেকে মুছে গেল।

প্রায় কুড়ি বছর পরে গ্রামে চলেছি। সন্ধ্যাবেলায় নামলাম স্টেশনে, একখানা টমটম গাড়ি ভাড়া করলাম বারো মাইল পথ পৌঁছতে এক প্রহর রাত হবে। পথে চলতে চলতে পুরাতন ছবিগুলি জন্মান্তরের স্মৃতির মতো একে একে মনে পড়তে লাগল। মনে হল, যেন ধীরে ধীরে নিজের অতীত কালের মধ্যে প্রবেশ করেছি; রাত তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মাঝামাঝি পথে এসে পড়েছি এমন সময়ে সেই ফাঁসি গাছটার কথা মনে পড়ল। ভয় হল তা সঙ্গে তো গাড়ির গাড়োয়ান আছে। কৌতূহল খুব। অভিনব কিছু দেখা যায় কিনা ভেবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ করে নিয়ে স্থির হয়ে বসলাম। এবারে বোধকরি ফাঁসিগাছের কাছে এসে পড়েছি, রাস্তার বাঁ দিকে গাছটা। ঐ তো গাছটা! কি বিরাট! অন্ধকারের আলখাল্লা পরে যেন এক গৈরী অতিকায় পুরুষ। লোকে যে ভয় পাবে তা আর আশ্চর্য কি।

আমারই সর্বাঙ্গ শির শির করে উঠল। নির্বিপাকে গাছগুলি অতিক্রম করে গেলাম। কিছুদূরে এসে গাড়োয়ান বলল, বাবু, এখান দিয়ে আগে রাতের বেলায় যাওয়া বড় কঠিন ছিল।

—কেন?

—ফাঁসিগাছটার ভয়ে।

কান খাড়া করে সজাগ হয়ে উঠলাম, শুধোলাম—এখন বুঝি সাহস বেড়েছে?

—সাহস বাড়তে যাবে কেন? ভয়ের ব্যাপার তো আর নেই।

—গাছটার ভূত ছেড়ে গিয়েছে বুঝি?

—গাছটাই যে গিয়েছে।

—কোথায়?

—আপনি বুঝি এ পথে অনেকদিন আসেন নি। তাই জানেন না।

—কি ব্যাপার বলত!

সে আরম্ভ করল—বছর পাঁচেক আগে একবার বৈশাখী ঝড়ের সময়ে গাছটার মাথায় বাজ পড়ে আগাগোড়া পুড়ে গেল। একটা বাজ যে অতবড় একটা গাছকে পুড়িয়ে আঙার করে দিতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

—তারপর?

—তারপর সেই আঙার ঝড়ে-জলে ভেঙ্গে পড়ল, ঝড়-ঝাপটায় কোথায় ছড়িয়ে গেল।

—এখন?

—এখন ও জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার—যেমন দেখলেন।

যেমন দেখলাম।

নিজের মনে মনে বললাম—আমি তো বাপু গোটা গাছটাকেই দেখেছি। অথচ তার কথাও বিশ্বাস না করা শক্ত। লোকটা মিথ্যা বলতে যাবে কেন? এ মিথ্যা বলে তার লাভ কি? এখুনি তো অপরের মুখে প্রতিবাদ হবে।

যেমন দেখলাম! কি দেখলাম! কিন্তু নিজের জাগ্রত দৃষ্টিকেই বা অবিশ্বাস করি কিভাবে? নিশ্চয় দেখেছি তাতে কোন ভুল নেই। ভাবলাম, একবার ফিরে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি অনেকটা পথ এসেছে, তাছাড়া লোকটাই বা কি ভাববে?

তবে—কি দেখলাম? ছায়া না মায়া, না কি! কিন্তু কিছু যে তা নিশ্চয়। তখন মেসের সেই থিওজফিস্ট ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, গাছের ডালে মৃত্যুদৃশ্যের পুনরাভিনয় যদি সম্ভব হয়, তবে মৃত গাছটির পুনরাভিনয়ই বা কেন অসম্ভব? তা-ই কি? আমার অভিজ্ঞতা কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু নিজে অবিশ্বাস করি কেমন করে?

অশরীরী

সুমথনাথ ঘোষ

কৌতূহল আজও যায়নি। ভূতপ্রেত, অশরীরী আত্মা বলে জগতে কিছু সত্যি সত্যি আছে কিনা, অনেকের মতো আমারও জানতে প্রবল ইচ্ছা জাগে মনে। তাই কোথাও কোন অলৌকিক কিছুর গন্ধ পেলেই, আগে ছুটে যাই। তবে প্রকৃত কথা বলতে কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছি। বক্তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রঙ চড়িয়ে, এসব কাহিনীকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বা বাস্তব ঘটনা বলে, রোমাঞ্চিত দেহ ও বিস্মিত দৃষ্টি শ্রোতাদের সামনে উল্লেখ করে বাহাদুরি নেন তার সাড়ে পনেরো আনাই দেখেছি, অপরের মুখে শোনা, নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটাও তাতে নেই।

আমি ছাড়বার পাত্র নই। সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরি, আচ্ছা এটা কি সত্যি ঘটনা?

নিশ্চয়। একেবারে নির্জলা সত্যি যাকে বলে।

আপনার জীবনে ঘটেছিল? আবার প্রশ্ন করি।

বক্তা একটু থেমে এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেন, মানে, হ্যাঁ, আমার নিজের জীবনে না ঘটলেও, আমার শাশুড়ীর কাছে শোনা। তার মামার বাড়ি কানপুর, সেখানে যখন ঘটনাটা ঘটে, তিনি সশরীরে ছিলেন।

কেউ কেউ আবার আমার মুখে অবিশ্বাসের রেখা ফুটে উঠতে দেখে বিরক্ত হয়ে জবাব দেন, নিজের চোখে না দেখলে বুঝি সত্যি হতে নেই? অবিশ্বাস করতে হয়—এ ধারণা কোথা থেকে জন্মালো আপনার মনে?—বলে ভ্রূকুঞ্চিত করে আমায় প্রশ্ন করেন। কাল পাইকপাড়া রোডে, একটা বাড়ির বারান্দা ভেঙে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আপনি তো চোখে দেখেননি বলে ঘটনাটা সত্যি নয় বলে উড়িয়ে দেবেন?

তর্ক না করে চুপ করে যাই। মোট কথা, আমার মন ভরে না ওসব যুক্তিতে। একেবারে সোজাসুজি, যার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে ভূতপ্রেত সম্বন্ধে, এমন লোকের মুখ থেকেই শুনতে চাই। যাতে অন্ততঃ বুঝতে পারি যে সত্যি ভূতপ্রেত, অশরীরী আত্মা বলে কিছু জগতে আছে এবং মন থেকে অবিশ্বাস ও সন্দেহটা একেবারে মুছে ফেলতে পারি। দু'-চারজন এমন লোকের সাক্ষাৎ যে পাইনি, তা নয়। তবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, তার মূলে আছে মানসিক বিকৃতি বা দৃষ্টির বিভ্রম বা আত্মসম্মোহন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় হয়তো আরও অনেক কিছু তার নামকরণ করা যেতে পারে।

যাক গে, ওসব বাজে কথা এখন থাক। যে কথাটা আসলে আমি বলতে চাই, তা হচ্ছে, একদিন কিন্তু হঠাৎ ট্রেনে এক ভদ্রলোকের মুখে এমন এক কাহিনী শুনেছিলুম যা আমার চিন্তাজগতে সত্যি একটা বিপ্লব এনে দিয়েছিল। কিন্তু সেই এক এবং অদ্বিতীয়। ও ছাড়া তেমন আর কিছু আজও শুনিনি, তাই এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন ধারণা এখনো মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পারিনি। প্রহেলিকার মধ্যে যেন রয়েছি।

ঘটনাটা এই রকম।

সে-বার বোম্বাই যাচ্ছিলুম। নাগপুর থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠলেন কামরায়। ছোট্ট ফার্স্ট ক্লাশ সেই কামরায় আমরা শুধু দু'টি প্রাণী। কথায় কথায় আলাপ জমে উঠল। ভদ্রলোক প্রায় চল্লিশ বছর বাংলাদেশ ছাড়া। একজন বাঙালীকে এভাবে একাকী নিজের কাছে পেয়ে নিমেষে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। বেশ হাসিখুশী মজার মানুষটি। মাথাজোড়া টাক। এককালে খুবই বলিষ্ঠ ছিলেন। বয়স সত্তর পেরিয়েছে এই জানুয়ারীতে। না বললে, এখনো মুখচোখ দেখলে মনে হয় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বড়জোর হবে। ভদ্রলোকের একটি বদ্ অভ্যাস মুহুর্মুহু চুরুট খান।

প্রথমে খুচরো মামুলী আলাপ শুরু হলো। যেমন—দেশ, জন্মস্থান, চাকরিবাকরি, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা,

নেহরু-গভর্ণমেন্টের কেচ্ছা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ক্রুশ্চেভ, আইসেনহাওয়ার থেকে বাঙালীর কি ছিল আর আজ কি হয়েছে ইত্যাদি। বিলাপ ও সংলাপের পর যখন চুরুটটায় আবার অগ্নিসংযোগ করার জন্যে চুপ করলেন, আমি প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার জন্যে বললুম, আচ্ছা, আপনি যখন এখানে দীর্ঘদিন আছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়িঘর, জমিজমা অনেক কিছু করেছেন তখন একটা খবর নিশ্চয় আমাকে বলতে পারবেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি সাগ্রহে বলে উঠলেন, বলুন, কি খবর?

আমি বললুম, আচ্ছা, একবার কিছুদিন আগে কাগজে খবর বেরিয়েছিল, আপনাদের এই নাগপুরে একটা বাড়িতে ভূতের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে—তিনটে লোককে নাকি মেরে ফেলেছে। ব্যাপারটা কতদূর সত্যি, জানেন কিছু?

ভদ্রলোকের কপালের কয়েকটা রেখা একসঙ্গে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন—কই, মনে পড়ছে না তো তেমন কিছু! তারপর চুরুটের ধোঁয়া একমুখ ছেড়ে বললেন, কি জানি! নাগপুর তো ছোট জায়গা নয়। হতে পারে অনেক কিছুই, কে আর খবর রাখে বলুন।

আমি বললুম, আচ্ছা, আপনার কি ধারণা ভূত-প্রেত বলে কিছু আছে—আপনি বিশ্বাস করেন?

চুরুটটা মুখ থেকে টেনে নিয়ে ভদ্রলোক আমার চোখের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মুহূর্তকয়েক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, সত্যি কথা বলতে কি, একদিন ছিল যখন একেবারেই বিশ্বাস করতুম না। তবে, একটা ঘটনা আমার জীবনে যা ঘটেছে, তারপর আর 'না' বলতে সাহস পাই না।

কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠল। বললুম, কি রকম?

সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী মশাই, শুনলে আপনিও হয়তো ঠাট্টা করবেন, লোকটার মাথা খারাপ নাকি? কিন্তু সত্যি আমার জীবনে যা ঘটেছিল যাকে প্রত্যক্ষ করেছি, কেমন করে 'কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিই, বলুন তো?

প্রত্যক্ষ করেছেন?

হ্যাঁ। কথাটা বলার সঙ্গে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ল। রাত তখন অনেক। বোধহয় বারোটার কাছাকাছি। গাড়ি ছুটছে উন্মত্ত বেগে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, শুধু জমাট গাঢ় অন্ধকার, আর দু'পাশে—পাহাড় বনজঙ্গলের ঠেসাঠেসি। ঠিক মনে নেই, সেদিনটা বোধহয় অমাবস্যা ছিল।

যা হোক, ভদ্রলোককে চিন্তামগ্ন দেখে বললুম, আপনার জীবনে ঘটেছিল, বললেন কি?

হ্যাঁ। বলেই তিনি এমনভাবে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন, যেন কথাটা আমার কাছে

বলা উচিত হবে কিনা তাই ভাবছেন আতঙ্কে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাঁর কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলির দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলুম, এই নাগপুরেই কি ঘটেছিল?

না।—বলেই তিনি যেন ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলেন। কি একটা মর্মান্তিক কথা যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

চোখ দুটো আস্তে আস্তে আমার চোখের উপর রেখে তিনি বললেন, যাদুকর নরপতির নাম শুনেছেন?

আরে বাপ! তিনি তো মস্ত বড় ম্যাজিসিয়ান ছিলেন। একবার সরস্বতী পুজোর সময় হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে তাঁর খেলা দেখতে গিয়েছিলুম। দুটি ছোকরা আমার সামনে অজ্ঞান হয়ে গেল, যখন তিনি একটা মেয়েকে স্টেজের ওপর কেটে দু'ভাগ করে আবার জুড়ে দিলেন।

ভদ্রলোক বললেন, শেষদিকে নরপতি ভূতের খেলায় খুব নাম করেছিলেন। শুনেছি, বিলেত-আমেরিকায় নাকি বহু লোক তাঁর এই খেলা দেখতে দেখতে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে সীট থেকে পড়ে গেছে। এমন দিন ছিল না, যেদিন অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয়নি।—বলে সহসা নীরব হয়ে যেন কি ভাবতে লাগলেন। নিঃশব্দে চুরুটটা যে তাঁর আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে, সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না।

বোম্বাই মেল্ ছুটছিল। হঠাৎ একটা বড় জংশন স্টেশনের মুখে ঢোকবার আগে ঝনঝন করে লাইনে কি একটা শব্দ হতেই তাঁর চমক ভাঙল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি শুরু করলেন, এই নরপতি ছিল আমার একেবারে বাল্যবন্ধু, যাকে বলে ল্যাংটোবেলার ইয়ার। গ্রামের পাঠশালে, স্কুলে ও কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলুম; তারপর কার্যোপলক্ষে দু'জনের জীবন দু'পথে বেঁকে গেলেও, অন্ততঃ বছরে একবার বিজয়াদশমীর প্রীতি-আলিঙ্গন জানিয়ে চিঠি দিতে কখনো তার ভুল হত না। তা যেখানেই থাকুক—বিলেত, আমেরিকা বা কলকাতায়। এত টাকা, এত নামযশ, এত বড়লোক হয়েছিল, কিন্তু তা বলে বাল্যবন্ধুকে কোনদিন ভোলেননি বা কৃপার চোখেও দেখেনি।

একবার নাগপুরে খেলা দেখাতে এসেছিল। গভর্ণমেণ্ট-আতিথ্য গ্রহণ না করে, সোজা আমার বাড়িতে এসে উঠলো। ওঃ, তা নিয়ে শহরে কী চাঞ্চল্য। ওই যা, ভুলে গেছি।

হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলুম।—বলে, ভদ্রলোক আবার ফিরে এলেন পূর্বের আলোচনায়। সে-বার বিজয়ার পরদিন আপিসে বসে কাজ করছি, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ট্রাঙ্ককল্ ফ্রম বোম্বে।

হ্যালো!—বলে তাড়াতাড়ি ফোনটা কানে তুলতেই উত্তর এল : জগদীশ,

তুই? আমি যাদুকর নরপতি বলছি।

হ্যাঁ, কি খবর? হঠাৎ ট্রাঙ্ককল্ যে!

খবর সব ভাল। আর একটু পরেই আমার জাহাজ ছাড়বে বোম্বে থেকে। এবার খেলা দেখাতে যাচ্ছি জাভায়। তাই বিজয়ার প্রীতিভালবাসা ও আলিঙ্গন জানাচ্ছি। বলে, একটু থেমে কেমন অদ্ভুত কণ্ঠে যেন আবার সে বললে, ভাই, বোধ হয় এই শেষ বিজয়া আমার জীবনে, তাই চিঠিতে না জানিয়ে নিজে মুখে জানিয়ে যাচ্ছি।

কি যা-তা অমঙ্গলের কথা বলছিস—বিদেশযাত্রার আগে! যত বুড়ো হচ্ছিস, তোর যেন ছেলেমানুষি বাড়ছে! বলে, মৃদু তিরস্কার করে সেই সঙ্গে আমিও তাকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানালুম।

সে বললে, সত্যি বলছি ভাই, এবার মনে কেমন যেন ভয় হচ্ছে। হয়তো আর ফিরব না। জানিস, তারা আমাকে মেরে ফেলবে বলে শাসিয়েছে।

কারা? চমকে উঠলুম। যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল আমার সামনে।

যাদুকরের গলাটা নিমেষে আর একটু কেঁপে উঠল। বললে, যেসব অশরীরী আত্মাদের নিয়ে খেলা দেখাই, তাদের দলপতি। তুই হয়তো ভাবছিস ঠাট্টা করছি, স্টেজের ওপর কৃত্রিম সিয়াস্ বসিয়ে কল্পিত ভূত-প্রেত আমদানি করে লোক ঠকিয়ে যে এতদিন খাচ্ছে, আজ তার মুখে এ কি কথা!

হ্যাঁ, আজ সেই কথাটাই তোকে বলে যেতে চাই, যা আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী জানে না। হয়তো আর জানবেও না। বলে, সে শুরু করলে, জানিস ইদানিং ভূতের খেলা দেখাতে দেখাতে মনে হত যেন সত্যিকারের কতকগুলি বিকট ছায়ামূর্তি আমার আশেপাশে ঘুরছে। গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু একদিন অন্ধকার স্টেজের ওপর থেকে দেখি এক বিকটাকৃতি ছায়ামূর্তি উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আতঙ্কে ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠলুম। দর্শকরা কিন্তু তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে আমায় সংবর্ধনা জানাল। সবাই ধন্যি ধন্যি করতে লাগল সেদিনের খেলার। আমি একেবারে চুপ। ভেতরে ঠকঠক করে কাঁপছি। কাউকে কিছু বলিনি।

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, কে যেন আমায় বলছে, সাবধান, ভূত-প্রেত নিয়ে রঙ্গরস করে, লোকের সামনে অশরীরী আত্মাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মজা একদিন টের পাইয়ে দেব। এখনো যদি ভাল চাও তো ওই আত্মঘাতী খেলা বন্ধ কর। নইলে তোমার জীবন-সঙ্কট ঘটবে বলে দিচ্ছি।

পরের দিন কিন্তু আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। স্টেজের ওপর ভুয়ো 'মিডিয়ম্' নিয়ে কৃত্রিম 'সিয়াস্' যেমন প্রতিদিন বসাই, সেদিনও তেমনি বসিয়েছি, এমন সময় দেখি আমার সেই মিডিয়ম ছোকরাটি সত্যি অচৈতন্য হয়ে পড়েছে অথচ তার হাত

লিখে চলেছে টেবিলের ওপর সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে সহসা তার হাতটা থেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ খুলে চাইলে। আমি তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপার কি? সে যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠেছে, এমনিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কিছু নয় তো। আমি কাগজখানা নিয়ে তখন পকেটে পুরে রাখলুম। নিজের ঘরে এসে দেখি—লেখা, সাবধান, আবার বলছি, এখনো সাবধান। বন্ধ করে দে এ খেলা! ইতি—তারানাথ তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ।

সবে এই কথাটা উচ্চারণ করেছে নরপতি, অমনি যেন কে জোর করে টেলিফোনটা কেটে দিলে। হ্যাল্লো, হ্যাল্লো, বলে অনেক ডাকাডাকি করেও আর কোন সাড়া পেলুম না।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক কেমন এক রহস্যভরা দৃষ্টিতে আমার মুখের ওপর তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম, তারানাথ তান্ত্রিক? ও লোকটা একেবারে বাজে 'বোগাস' ছিল। পিশাচসিদ্ধ না হাতি! যখন জীবিত ছিল একবার আমি বিভূতি বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে গিয়েছিলুম তাকে দেখতে। ওঃ, সে কি এখানে! হাওড়া জেলার কোন এক অজ-পল্লীগ্রামে মার্টিন কোম্পানীর রেল থেকে নেমে ডাহা আড়াই ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বললে বিশ্বাস করবেন না, এত কষ্ট সব জলে গেল। ওখানকার লোকেরা দেখলুম ভয় করে, পিশাচ-সিদ্ধ তান্ত্রিকের নাম উল্লেখ করতে গেলেই আগে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। আমাদের কিন্তু মনে হল লোকটা একেবারে বাজে 'বোগাস্'।

'বোগাস্' কথাটা বলা শেষ হয়নি তখনো, অমনি দপ করে গাড়ির আলোটা নিভে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল, এ কি! আলো নেভাল কে?

আমি হেসে জবাব দিলুম, কে আবার নেভাবে? 'ফিউজ' হয়ে গেল। পরের স্টেশনে গাড়ি থামলে গার্ডকে বলে ঠিক করিয়ে নেব। বলেই আবার ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলুম, হ্যাঁ, তারপর কি হল?

কি আর হবে! মাস তিনেক আর কোন খবর নেই। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায় একটা সংবাদ বেরিয়েছে—"জাভার বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে ভৌতিক ক্রীড়া প্রদর্শনকালে যাদুকর নরপতি অকস্মাৎ স্টেজের ওপর থেকে অজ্ঞান হয়ে নীচে পড়ে যান। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, খেলা দেখাবার সময় সত্যিকারের প্রেতাত্মা তাঁকে এইভাবে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছিল। এই সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং একাধিকক্রমে দু'মাস ধ'রে একই রঙ্গ-মঞ্চে 'ফুল-হাউস' চলে।"

আমি একটু হেসে বললুম, ওকে বলে 'বিজনেস স্টান্ট'—ব্যবসা জমাবার

বলি। কী চমৎকার ব্যবসাবুদ্ধি দেখেছেন যাদুকরের!

ভদ্রলোক এবার চটে উঠলেন, চুপ করুন মশায়। আগে সব শুনুন, তারপর লাফাবেন। পরদিন তাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার জীবন তিনি রক্ষা করেছেন।

এর ঠিক পনরো দিন পরে নরপতির এক চিঠি পেলুম, সেদিন আমার কথা ঠাট্টা মনে করেছিলি, কিন্তু খুব জোর বেঁচে গেছি। তারানাথ তান্ত্রিক পিশাচসিদ্ধ, সাংঘাতিক শত্রুতা শুরু করেছে। জানি না, কপালে কি আছে। হয়তো এই শেষ চিঠি আমার তোকে।

একটু থেমে ভদ্রলোক এবার চুরুটটা জ্বেলে নিলেন। নিভে গিয়েছিল। তারপর কতক টান দিয়ে আবার বললেন, এর কিছুদিন পরে, বেশ মনে আছে সে-দিনটা ছিল কিসের ছুটি, আপিস-আদালত সব বন্ধ। আমি একাই আপিসঘরে বসে কাজ করছি। জরুরী কাজ। পরদিন ইন্‌কামট্যাক্সের হিসাবনিকাশ দাখিল করতে হবে। হঠাৎ দারোয়ান এসে খবর দিলে, এক ছোক্‌রী আব্‌সে ভেট্ করনে মাঙ্গতা।

মুখটা কাগজ থেকে না তুলেই জবাব দিলুম, আজ নেহি হোগা, কাল আনে বলো।

একটু বাদে ঘুরে এসে দারোয়ান আমার হাতে একটা ছোট্ট কাগজের শ্লিপ দিলে, তাতে লেখা—শ্রী লীনা চ্যাটার্জী—ফ্রম্ তারানাথ তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ।

আরে, তারানাথ তান্ত্রিক তো মরে ভূত হয়ে গেছে কবে! তার কাছ থেকে আসছে? ব্যাপার কি! কৌতূহল হল। দারোয়ানকে বললুম তাকে পাঠিয়ে দিতে।

একটু পরেই সেই মেয়েটি এসে ঢুকল ঘরে। ধবধবে রঙ কিন্তু ফর্সা বলা চলে না, যেন বিবর্ণ। বয়েস চৌদ্দও হতে পারে আবার চল্লিশও অসম্ভব নয়। ক্ষয়া, ক্ষয়া, অপুষ্ট চেহারা, মুখ, চোখ, নাক সবই আছে, অথচ কোনটাই ঠিক-ঠিকমতো নয়। মাথার চুলগুলি কটা, অস্বাভাবিক রকমের লাল্‌চে। কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বসল আমার সামনে, মুখোমুখি টেবিলের ওপরে। বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে তার আপাদমস্তক একবার বুলিয়ে নিয়ে বললুম, আপনার নাম লীনা চ্যাটার্জী?

মেয়েটি জবাব দিলে, হ্যাঁ। তার গলার স্বরটা মোটেই মেয়েদের মতো নরম নয়। কেমন যেন ভারী-ভারী, মোটা কর্কশ। বললুম, কি দরকার আমার সঙ্গে?

মেয়েটি ছোট্ট একটা খামমোড়া চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, তারানাথ তান্ত্রিক এই চিঠিটা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি বললুম, তিনি তো মারা গেছেন অনেকদিন। এ চিঠি আপনার কাছে কি করে এলো?

মেয়েটি বললে, আমি তাঁর মিডিয়ম্—তাঁর আত্মা আমার দেহটা অধিকার

করে নিয়ে আমার হাত দিয়ে তাঁর যা বক্তব্য লেখায়। যন্ত্রস্বরূপ আমার হাতটা শুধু তিনি ব্যবহার করেন মাত্র। কি লিখি, কেন লিখি, কিছুই আমি জানি না। স্বপ্নাবিষ্টের মতো শুধু আমার হাত কাজ করে যায়।

চিঠিটা হাতে করে আমি বললুম, আচ্ছা, আমার নাম-ঠিকানা এসব তিনি পেলেন কোথায়?

মেয়েটি অদ্ভুত এক ধরনের হাসি হেসে উঠল। তিনি পিশাচসিদ্ধ, পৃথিবীর যেখানে যে মানুষ থাকুক, তার নাম-ঠিকানা জানতে তাঁর কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে মাত্র। আচ্ছা, নমস্কার। বলেই মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে চলে যেতে আমি খামটা ছিঁড়ে চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলুম। ছোট্ট চিঠি, মাত্র তিনটি লাইন, পেন্সিলে লেখা ঃ তোমার বন্ধু ভেবেছে কি? জগতের সামনে আমাদের নিয়ে এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কত করবে? সেদিন একটা আছাড় মেরেছিলুম। তাতেও শিক্ষা হয়নি। আজ থেকে সাতদিন সময় দিলুম, যদি এ খেলা বন্ধ না করে তা হলে আর আমি ঠেকাতে পারব না তার মৃত্যুকে। সবাই ক্ষেপে উঠেছে।

ইতি—তারানাথ তান্ত্রিক।

ভদ্রলোক এই বলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হু হু করে ছুটে চলেছে ট্রেন। বাইরে যেমন ভয়ঙ্কর গাড়ির ভেতরটায় যেন তার চেয়েও বেশি।

আমি তখন আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিলুম না। বললুম, তারপর কি হল?

ভদ্রলোক বললেন, তারপর আর কি! কোন্ দেশে, কোথায় নরপতি খেলা দেখাচ্ছে জানি না, তবু একখানা চিঠি ও একটা তার দিলুম ভৌতিক খেলা দেখাতে নিষেধ করে। জানি না সে চিঠি ওর কাছে পৌছেছিল কি না। কারণ, ঠিক তার সাতদিন পরে কাগজে যাদুকর নরপতির মৃত্যুসংবাদ দেখে একেবারে আঁতকে উঠেছিলুম। সংবাদ বেরিয়েছে, ভৌতিক-ক্রীড়া প্রদর্শনকালে অকস্মাৎ হার্টফেল করায় যাদুকরের মৃত্যু হয় স্টেজের ওপর।

আমি বললুম, বলেন কি!

ভদ্রলোক বিষণ্ণসুরে বললেন, এর পরেও আপনি বিশ্বাস করতে বলেন অশরীরী আত্মা বলে কিছু নেই, ভূত-প্রেত সব মিথ্যা?

ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করেছিলুম কি না জোর করে বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ-না কোন উত্তর না দিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে যে তাকিয়েছিলুম, তা বেশ মনে আছে।

দিন-দুপুরে

বুদ্ধদেব বসু

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্রাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদ্দুর পিঠে চড়্ চড়্ করে ফুটছে আলপিনের মতো। ঐ এতোক্ষণে কালীঘাটের পুল থেকে আস্তে আস্তে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্রামকে।

এমন সময় রাস্তা পার হয়ে ছোট্ট একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আপনি কি ডাক্তার?'

ভাবতেই পারিনি মেয়েটি আমাকে কিছু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখুন, আপনি কি ডাক্তার?'

খুব অবাক হলুম, একটু যেন খুশীও—'কী করে বুঝলে?'

'ঐ যে আপনার পকেটে বুক দেখার যন্ত্র। দেখুন, আমার মা-র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন?'

মেয়েটি এমন ভাবে কথাটা বলল যেন এটা মোটেও অদ্ভুত কি অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে ট্রাম এসে গেছে, একটা ট্রাম ফসকালে এই দারুণ রোদ্দুরে আবার হয়তো পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা গলায় কাতর ভাবে আবার বলল, 'চলুন না, যাবেন?'

ও সব কথায় কান না দিয়ে ট্রামে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হত সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলাম না। ট্রামটা মোড় ঘুরে আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটর ঘটর করতে করতে বেরিয়ে গেল।

'কোথায় তোমার বাড়ি?'

'চেতলায়—এই কাছেই।'

'কী হয়েছে তোমার মা-র?'

'কী হয়েছে, জানি না তো। বড় অসুখ।'

'কদ্দিন অসুখ?'

'অনেক দিন। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন তো?'

মেয়েটির ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হল। ভাবলুম যাই না, দেখে আসি ব্যাপারটা।

'ডাক্তারবাবু, আপনাকে তো টাকা দিতে পারব না'—মেয়েটি আরও কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেল।

'আচ্ছা আচ্ছা, সে জন্য ভেব না', আমি তাড়াতাড়ি বললুম।

নতুন পাশ করে বেরিয়েছি, আত্মীয় বন্ধুমহলে ডাক-খোঁজ পড়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশ টাকা যে মাসে পাই, সেই মাসেই খুব খুশী। এই তো বন্ধুর ছেলের নিরানব্বুই বুঝি জ্বর হয়েছে, ট্রামের পয়সা খরচ করে এসে তার প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে এতক্ষণ আড্ডা মেরে বাড়ি যাচ্ছিলুম। তবু এই মেয়েটি যা হোক টাকার কথাটা মুখে আনল।

হেঁটে চললুম মেয়েটির সঙ্গে কালীঘাট পুলের দিকে। জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার মাকে আর কোন ডাক্তার দেখেননি?'

'ডাক্তার? না। মা বলেন, ডাক্তার দিয়ে কি হবে, এমনিই আমি ভালো হয়ে

পাব। টাকা পাব কোথায়—'

'তুমি কি আজ ডাক্তার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে? আর কেউ নেই তোমার বাড়িতে?'

'নাঃ, কে আর থাকবে? এক দাদা ছিল আমার, সে তো চটকলে কজ করতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ল। সেই থেকে আমি আর মা। বেশ তো ছিলুম আমরা—এর মধ্যে কেন অসুখ করল মা-র? ডাক্তারবাবু মা কদ্দিনে ভালো হবেন?'

আমি ডাক্তারি ধরনে হেসে বললুম, 'সে এখন কি করে বলি?'

'ডাক্তারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হয়ে আছেন—একবার চোখ মেলে তাকান না। দেখুন বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এতদূরে এসেছি, যদি কোন ডাক্তার খুঁজে পাই, যদি আমার ওপর কোন ডাক্তার দয়া করেন। ঐ তো সব ঔষুধের দোকান, ভেতরে পাতলুন পরা ডাক্তাররা বসে—আমার তো সাহস হয় না ভেতরে ঢুকতে। রাস্তার এদিক ওদিক কেবলই ঘুরছি, এমন সময় আপনাকে দেখেই মনে হল আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে খাবেন আমাদের বাড়ি। কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা—ছি, ছি, এটা কী বললুম, আপনারা কেন গরীবের বাড়িতে খেতে আসবেন? ডাক্তারবাবু, আপনার দয়া আমি কোনদিন ভুলব না।'

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'কিছু না। চলো।'

মুখে বললুম বটে, কিন্তু কালীঘাট পুল পর্যন্ত আসতে আসতেই মনে হতে লাগল এই মহৎ কাজের ভারটা না নিলেই পারতুম। এমন কত গরীব দুঃখী আছে। বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে, না খেয়ে তাদের সবার উপকার করতে গেলে নিজেরই—

পুল থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলুম, 'আর কতদূর?'

আমার প্রশ্নে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মেয়েটি বললে, 'এই তো—আর একটুখানি। আমার পয়সা নেই, তা হলে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়ি করে নিতুম। ওঃ, কত কষ্ট হল আপনার।'

'বাঃ এইটুকু হাঁটতে পারব না?'

অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌছলুম। কলকাতার এ অঞ্চলে কোনদিন আর আসিনি। সত্য বলতে, জায়গাটা ঠিক কলকাতাই নয়। একেবারেই পাড়াগাঁ, পুকুর, বন-জঙ্গল, কিছু পাকা বাড়ি, কিছু বা খড়ের ঘর। একটা অতি শীর্ণ শ্যাওলা ধরা, চুন বালি খসে পড়া একতলা পাকা বাড়ির সামনে মেয়েটি এসে বলল, 'এই।'

ভিতরে ঢুকে দেখি, মেঝের উপর মলিন বিছানায় একজন স্ত্রীলোক নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছে। চোখ তার আধো বোজা। খানিক পর-পর নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, 'মা মা।'

কোন জবাব এলো না।

'মা মা, তোমার জন্য ডাক্তার নিয়ে এসেছি, চেয়ে দেখো। মা, এই ডাক্তারবাবু তোমাকে ভাল করবেন।'

চোখ দুটো একবার পলকের জন্য খুলেই আবার বুজে এলো, একখানা হাত বুঝি একটু ওঠাবার চেষ্টা করল, অস্ফুট একটু আওয়াজ হয়তো বেরুল গলা দিয়ে।

মেয়েটি বলল, 'ডাক্তারবাবু, ভাল করে দেখুন, মাকে আজই ভাল করে দিন।'

কিছু দেখবার ছিল না। আর একটু পরেই নাভিশ্বাস শুরু হবে। তবু আমরা সব সময় একবার চেষ্টা করে থাকি।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি।'

মেয়েটি বলল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি আবার আসবেন তো? আমার মা ভাল হবেন তো?'

'এক্ষুণি আসছি ওষুধ নিয়ে,' বলে আমি বেরিয়ে গেলুম।

ফেরবার সময় রাস্তাটা বোধ হয় একটু গোলমাল হয়েছিল। একটু ঘুর পথে এসে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। রোদ্দুরে ছুটোছুটি করে তখন আমি কানে পি পি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু ডাক্তারের নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার তখন সময় নয়। ভিতরে ঢুকতে ঠিক যেন পা সরছিল না, কে জানে গিয়ে কি দেখব। দরজাটা খোলা দেখে ঢুকলুম, কিন্তু ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

তবে কি আমি ভুল বাড়িতে এলুম? না, ঐ তো সেই পুকুর, সেই সুরকির রাস্তা, ঐ সুপারি গাছ। দেড় ঘন্টা আগে এই ঘরটাতেই তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু মেয়েটি কোথায় তার মুমূর্ষু মা-ই বা কোথায় গেল? ঘরে জিনিসপত্র অবশ্য খুব কমই ছিল, কিন্তু যে ক'টা ছিল, সে ক'টাই বা কোথায়?

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই মারা গেল, আর ওর মাকে নিয়ে চলে গেল কেওড়াতলাতে? এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে হতে পারে? ঘরে জিনিসপত্র অবশ্য কমই ছিল, একটা লণ্ঠন, দু'একটা থালা-বাটি, সেগুলি...?

আস্তে আস্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তবে কি সমস্ত জিনিসটাই আমার চোখের ভুল...মনের ভুল? এই রোদ্দুরে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল? এই তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে, আমার পকেটে ইনজেকশন, সব ঠিক আছে—নাকি আমি ভুল করে অন্য বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। মাথার উপরে যে আগুন ঝরছে সে খেয়ালও নেই। চারদিকে ছবির মতো সব চুপচাপ। হঠাৎ দেখি টাকপড়া একটি আধ-বয়সী লোক আমার পাশে এসে কখন দাঁড়িয়েছে। কোনখানে কেউ ছিল না, হঠাৎ কি লোকটা মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো? তার দিকে তাকাতেই সে, বলল, 'কি মশাই বাড়িখানা কিনবেন নাকি?'

'আপনার বাড়ি বুঝি?'

লোকটা ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আইনত আমারই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে? কোথাকার এক বিধবা পিসী, জন্মে দুবার চোখে দেখিনি মশাই—সংসারে কেউ কোনখানে নেই। আইনের প্যাঁচে ঘুরতে ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়ল আমারই ঘাড়ে, আর বলেন কেন, এমন কপাল নিয়েও আসে মানুষ। পিসে টেঁসলেন তিরিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা রেলে কাটা পড়ল। পিসী যখন স্বগ্‌গে গেলেন, ভাবলুম ভালই হল। একটা মেয়ে ছিল—'হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্যরকম সুরে লোকটা বলল, 'ওসব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।'

আমি কথা বলার জন্য হাঁ করলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবার আগেই লোকটা বলে চলল, 'ঐ তো এক ফোঁটা বারো বছরের মেয়ে, তা মা-টা যেদিন অক্কা পেল, পরদিন ও দিব্যি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়ল। একখানাই শাড়ি ছিল পরনে, সেটা দিয়ে কর্ম সারল। কী ডেঁপো মেয়ে মশাই! থাকলে আমরা একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে দিতুম। বাড়িখানা ছিল তিন পুরুষের, এক রকম চলে যেত। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা মশাই—হ্যাঁ, ভূত না হাতি! আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনিই বলুন, এসব কথায় কি কান দিতে আছে? নিতে চান তো বাড়িট্যা খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা। আচ্ছা, দরে দরে চারশোই দেবেন, যান। জলের দরে পাচ্ছেন, জমিটুকু তো রইল, আপনি ইচ্ছে মতো বাড়ি তৈরী করে নেবেন।'

অতি ক্ষীণস্বরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ক'দিনের কথা এটা?'

'কোন্‌টা? এই পিসীর...তা দু'বছর হবে। পিসীর জন্য কোন ভাবনা ছিল না মশাই, মেয়েটার জন্য বাড়িটার এমন বদনাম হয়েছে যে, পাঁচ টাকাতেও কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে ট্যাক্সো তো গুণতে হচ্ছে আমাকেই। কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারি নে, উগরাতেও পারি নে। আমি গরীব মানুষ। আমার ওপরে এ জুলুম কেন? থাকি কাঁচড়াপাড়ায়। রোজ রোজ এসে যে তদ্বির করব তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে। আচ্ছা, কী দেবেন আপনিই বলুন...বলুন না।'

ডাক্তারের সাহস

প্রবোধকুমার স্যান্যাল

বরাহনগর জায়গাটার নাম সকলেই জানে। কলকাতার উত্তরে মাইল দুয়েক গেলেই বরাহনগর। আজকাল শ্যামবাজার থেকে মোটর-বাসে যাওয়া যায়—আগে যেতে হত হেঁটে কিংবা 'শেয়ারের' গাড়িতে। শেয়ারের গাড়ি ছাড়ত কোম্পানীর বাগানের মোড় থেকে, এক-একজনের চার আনা ভাড়া। কলকাতায় যাতায়াত করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

বরাহনগরের বড় রাস্তার দুধারে তখন কল-কারখানা, মুটে-মজুর, দোকান-বাজার, পাট আর ভূষিমালের আড়ৎ—এই সব ভীড় ছিল বেশী। এদের ধারে ধারে শ্রমিকদের বস্তিগুলি দেখা যেত। দিনের বেলায় পথে শোরগোল, হৈ চৈ, গরুর গাড়ির দল, জন-মজুরের হল্লা, মালগাড়ির আমদানি-রপ্তানি, এমন কি মারামারি পর্যন্ত লেগেই থাকত। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই তাদের আর চিহ্ন পর্যন্ত থাকত না। পথ হয়ে যেত নির্জন মরুভূমি, রাতের বেলা সে পথে হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না; মাঝে মাঝে এক-আধটা কুকুর কেবল ডাকতে ডাকতে চলে যেত। অনেক অসতর্ক পথিক নাকি অনেকদিন রাতে এই পথে গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে।

ভদ্রলোক কয়েকজন যে পাড়ায় থাকতেন, সে পাড়াটা গঙ্গার কাছাকাছি। তাঁরা স্টীমারে কলকাতায় আনাগোনা করতেন। সকালের দিকে বেরোতেন, আবার ফিরে আসতেন দিনের আলো থাকতে। তার একটা কারণ ছিল। যে পথটা দিয়ে তাঁরা পাড়ার ভিতরে ঢুকতেন, সেই পথের দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরানো বাড়ি অনেকদিন পড়েছিল এবং বাড়ীর ধার দিয়ে সন্ধ্যার পরে হেঁটে যাওয়া তাঁরা উচিত মনে করতেন না। বাড়ীটা এখানকার পূর্বকালের জমিদার বংশের। এখন সে জমিদারও নেই, তাদের আগেকার ঐশ্বর্যও নেই—কেউ মরে গেছে, কেউ গেছে ছেড়ে। কিন্তু এই অট্টালিকা এখনো তার ভগ্ন দেহ নিয়ে অতীতকালের স্থবির প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ীটা, জনহীন, নানা আগাছায় পরিপূর্ণ বাদুড় আর চামচিকের বাসা, শেয়াল আর সাপের অবাধ লীলাভূমি। শুধু তাই নয়, লোকের বিশ্বাস এ বাড়ীতে নাকি কোন কোন গভীর রাত্রে মানুষের কান্না শোনা যায়। আগেকার সেই জমিদারের দুইটি মেয়ে নাকি

গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ এ বাড়ীর অন্দরমহলে ভূত আছে। ভূতের কথা শুনলে আর রক্ষা নেই। ভগবানের চেয়ে ভূতকে ও-পাড়ার লোক বেশী মানে আর ভয় করে। সুতরাং অন্ধকার হলে ও-পথ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

কিন্তু চাটুয্যের জামাই এ-সব আজগুবি কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি পাশ-করা ডাক্তারি পাশ করেছেন। কুস্তী-করা দেহ, বিশাল তাঁর বুকের ছাতি, শিলং

ভূত নামাইবার সহজ পদ্ধতি

আশাপূর্ণা দেবী

নুটুঠাকুর্দা যে এযাবৎকাল ইহলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সে খবরটি জানা গেল, তাঁর পরলোক প্রস্থানের পর। খবরটা আনল ঠাকুর্দার গ্রামের একটা কাদাখোঁচা-মার্কা ছেলে, একখানা গঙ্গা-মার্কা চিঠি হাতে নিয়ে এসে।

পুজো সংখ্যার প্রথম লেখাটি সবে ধরেছে বেদব্যাস, হঠাৎ এই বিঘ্ন। চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, "উনি এখনও ছিলেন নাকি?"

"ছিলেন আবার না? আমাদের থেকে টনটনে ছিলেন। আপনারা তো আর দেশে যান-টান না। খবরও রাখেন না।"

বেদব্যাস অবশ্য এতে লজ্জায় মারা গেল না। দেশের বাড়ির গ্রাম সম্পর্কে ঠাকুর্দার বাঁচামরার খবর নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে? কিন্তু এই গঙ্গা-মার্কা চিঠিটির আয়োজন করলে কে?

চিঠির খামের মুখ খুলতে-খুলতে ভাবল বেদব্যাস, চির-ব্যাচিলার বুড়োর তো না ছেলেমেয়ে, না নাতিপুতি। পাড়ার লোকেরাই বোধহয়...

ভাবতে-ভাবতেই খাম খুলে ঠিকরে উঠল উঠতি-লেখক বেদব্যাস বটব্যাল, এ আবার কী চিঠি!

সামাজিক ইতিহাসে এমন একটা চিঠি আর কখনও কেউ দেখেছে? বিয়ের চিঠির তারিখ কখনও-কখনও কেটে লাইনের মাথার ওপর হাতে লিখে অন্য তারিখ বসানো দেখেছে লোকে, বেদব্যাসও দেখে থাকবে। কত কারণেই তো বিয়ের তারিখ বদল হয়। কিন্তু শ্রাদ্ধের ছাপা চিঠিতে হাতে-লেখা তারিখ!

তবে এটিতে তারিখের জায়গাটি ফাঁকাই ছিল। যেমন অনেক সময় দোকানের বিল-বইটাই একদশকের মতো ছাপা থাকে। বছরে বছরে বসিয়ে যাও উনিশশো একাশি, উনিশশো বিরাশি, উনিশশো-ইত্যাদি। কিন্তু এটা কি বিল-বই? তাই ফাঁকা রেখে শূন্যস্থান পূরণ!

আর চিঠির প্রেরক?

দেখে ঠিকরেই উঠতে হল। 'নিবেদক' হচ্ছেন স্বয়ং চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া নুটুবিহারী সরকার।

বেদব্যাস বলে উঠল "কী এ? ঠাট্টা, না তামাশা, নাকি ইয়ার্কি, নাকি স্রেফ মামদোবাজি!"

ছেলেটা দেখতে কাদাখোঁচা, কিন্তু কথাতে বেশ খোঁচাই আছে, 'কাদা'ভাব নেই।

বলল, "সেটা বরং সুবিধে পেলে তাঁকেই জিজ্ঞেসা করবেন। তবে পাছে ওনার শ্রাদ্ধে ঘটা না হয় তাই উনি বহু আগে থেকেই ওই সব বিধি-ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। চিঠি ছাপিয়ে নেমন্তন্নিদের লিস্টি করে তাদের-নাম ঠিকানা লেখা খামের গোছা, ভোজের দিনের রান্নার মেনু, খরচপত্রের আনুমানিক হিসেব ইত্যাদি সব গুছিয়ে রেখে গেছেন, আমাদের 'মশা গ্রাম যুবক সংঘ ক্লাবের' সেক্রেটারি বটুকদার কাছে। এই যে নেমন্তন্নপত্তরের ও-পিঠে রান্নার মেনু ছাপা। পাছে বটুকদা কিছু ঘাটতি করেন, আপনারা ধরতে পারবেন।"

বেদব্যাস হতাশ হয়ে বলে, "ইদানীং কি উনি পাগল টাগল হয়ে গিয়েছিলেন নাকি?"

"জানি না স্যার! পাগল না, ভূতাশ্রিত। তবে কিছুকাল থেকে ভূতটুত নিয়ে রিসার্চ করছিলেন।"

"ভূত নিয়ে রিসার্চ! সেটা আবার কী?"

"কী সেটাও জানতে হলে ওঁর কাছেই যেতে হবে।"

বেদব্যাস একটু চড়াগলায় বলে ওঠে, "তা উনি যে ভূত নিয়ে রিসার্চ করছিলেন, সেটাই বা জানলে কী করে?"

"জানলাম কমনসেন্স দিয়ে। যদি কারও ফাঁকা বাড়ি থেকে বিচিত্র সব গলার স্বর শোনা যায়, খোনা গলা, খ্যানখেনে গলা, হেঁড়ে গলা, মিহি গলা, উট্‌কো গলা, ভূট্‌কো গলা, ঢ্যাবঢেবে গলা, টনটনে গলা, আর তার সঙ্গে ঠাকুর্দার মিচকে গলার বুকনি, তো কী বুঝতে হয়? চিরটাকাল তো রিসার্চ করাই বাতিক ছিল। ঘাস নিয়ে ফড়িং নিয়ে, কেঁচো নিয়ে, কেন্নো নিয়ে, উইপোকা নিয়ে। শেষ জীবনে ভূত নিয়ে পড়বেন এ আর আশ্চয্যি কী?"

চিঠিখানা হাতে নিয়ে তাতে চোখ রেখেই বেদব্যাস বলে, "শেষটায় কী হয়েছিল?"

"হবে আবার কী! হয়েছিল বয়েস," ছেলেটার গলার স্বরে তাচ্ছিল্য, "বয়েসের কি গাছপাথর ছিল?"

তা কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। নুটুঠাকুর্দা বেদব্যাসের বড়ঠাকুর্দার অর্থাৎ বাবার জ্যাঠামশাইয়ের ক্লাসফ্রেণ্ড। সেই সূত্রেই যোগসূত্র। আগে আগে নুটুঠাকুর্দার এখানে খুব আসা-যাওয়া ছিল। খুদে বেদব্যাসকে বেশ সুচক্ষে দেখতেন তিনি।

কিন্তু কোথায় বা সেই ফ্রেণ্ড-ট্রেণ্ড। কোন্ কালে তেনারা সব কাটা-ঘুড়ির মতো সুতো কেটে গিয়ে কোথায় গিয়ে লটকে পড়েছেন। নুটু সরকার যদি চিরকাল

পাহাড় থেকে সেদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকার করে এনেছেন। তাঁর ভয়ানক সাহস। ভূতটুত তিনি গ্রাহ্য করেন না।

বড়দিন উপলক্ষে তিনি শ্বশুরবাড়ী বেড়াতে এসেছেন। এ-পাড়ার সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, সবাই তাকে ডাক্তার বলে ডাকে।

ছেলে-ছোক্‌রাদের দলে তাঁর নাম ডাক খুব। ক'দিন ভূতের বাড়ীর আলোচনায় তিনি উৎসাহভরে বললেন—যদি একটা রাত আমি ও-বাড়ীতে কাটিয়ে আসতে পারি, তাহলে তোমরা আমাকে কি খাওয়াবে?

ছেলেরা অবাক হয়ে বললে,—একটা রাত? আপনি বলেন কি ডাক্তারবাবু? দু'ঘন্টার বেশী যদি আপনি থাকতে পারেন, তবে কি বলেছি।

ডাক্তার প্রথমটা হেসেই অস্থির। তারপর বললেন—কত বাজি ধরবে বলো।

ছেলেরা বললে—বাজি? আপনি যা চাইবেন ফিরে এলে পাবেন।

—আচ্ছা সেই ভাল।

কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। পাড়ার বিজ্ঞ লোকেরা এসে বাধা দিয়ে বললেন—অল্প বয়সে আমরা জল চিবিয়ে খেয়েছি কিন্তু ভূতকে মেনেছি চিরকাল। তুমি ও-বাড়ীতে যেয়ো না বাবা। একটা ভাল মন্দ ঘট্‌লে তখন—

ডাক্তার হেসে বললেন—আমাদের জাতের অবনতির একটা কারণ আমাদের ভূতের ভয়।

—আমাদের কথা তবে শুনবে না?

—আজ্ঞে না।

শ্বশুরবাড়ীর সকলে কান্নাকাটি করে অস্থির। এমন সর্বনেশে ডাকাত-জামাই তাদের না হলেই ভাল ছিল। ডাক্তার বললেন—আমাকে যদি আপনারা বাধা দেন, তাহলে ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

শাশুড়ী বললে—বাঁচলে তো সম্পর্ক! সম্পর্ক যাক্ বাবা, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকো।

ডাক্তার কোন কথা শুনলেন না। তাঁর বন্দুক আছে, কুকুর আছে, দেহে অপরিসীম শক্তি আছে—তাঁর ভয় কী? সকলের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সে-দিন ছিল অমাবস্যা। ডাক্তার কোটপ্যান্ট পরে বন্দুক লাঠিসোটা হাতে নিয়ে টর্চটা পরীক্ষা করে হেসে বললেন—রেডি।

রাত তখন দশটা বাজে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে লাঠিসোটা হাতে নিয়ে শোরগোল ক'রে একবার সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটার ভিতরে তন্ন তন্ন করে দেখে এল।

শীতের দিন, সুতরাং বিছানা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দিয়ে আসা হোল। বড় একটা ঘড়ি রইল টেবিলের ওপর; একটা জলের কুঁজো আর কাঁচের গেলাস, একটা লাঠি। এবং বলা বাহুল্য, কারবাইডের একটা উজ্জ্বল আলো, টমী—চিরবিশ্বস্ত টমী সঙ্গে। কুকুরটা প্রকাণ্ড, বাঘ শিকার করতে সাহায্য করে।

দশটার পরে একসঙ্গে সবাই বিদায় নিলে। তারা তখন এই বাড়ীর ভয়ানক অন্ধকার গহ্বর থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কেউ আর কোনদিকে তাকাতে সাহস করলে না—পাছে কিছু বিভীষিকা চোখে পড়ে যায়, ডাক্তার যে একা এই জনহীন অন্ধকার প্রাসাদের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে রইলেন। এবং তাঁর ভাগ্যে যে কিছু একটা ঘটবেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে সবাই যে যার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল।

ঘরের দরজা-জানালা ডাক্তার একে একে সব বন্ধ করে দিলেন। কোথাও আর এতটুকু ফাঁক নেই, বাইরে বাতাস জোরে বইলেও আর কোথাও শব্দ হবে না। চারদিক নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ। এই বিশাল অট্টালিকার বাইরে যে রাস্তা-ঘাট আছে, লোকালয় ও মানুষ আছে, কর্মকোলাহলময় জগৎ আছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এখানে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটলেও কেউ কোনদিন জানতেও পারবে না। অমাবস্যার অন্ধকার যেন এই প্রেতপুরীকে উদরসাৎ করেছে।

ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে। এগোরোটা বাজল। নিজের নিঃশ্বাসটা যে ইতিমধ্যে কখন ভারী হয়ে উঠেছে ডাক্তার বুঝতে পারেননি। পাঁচজনে আগে থাকতে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, তাই এই দুর্বলতা। মনে হল, ঘড়িটায় আরও একটু আস্তে শব্দ হলে ভাল হয়। ওটা ভয়ানক জীবন্ত, অবাধ্য। বিছানার ওপর বসে ডাক্তার একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। দেয়ালগুলি জীর্ণ, তার গায়ে নানারকম আঁকিবুঁকি কাটা—অনেকটা যেন মানুষের কঙ্কালের মতো।

খুট্ খুট্—

ডাক্তার চমকে ফিরে তাকালেন। না, কেউ নয়,—বাতাসের শব্দ। না, বাতাসের নয়— বোধহয় কোন পোকামাকড়ের আওয়াজ। কিন্তু কোন্ দিকে? জানালায় না দরজায়?

খুট্ খুট্—

কে ধাক্কা দিল দরজায়? টমী মুখ তুলে তাকালে। একবার সে একটু গোঁ গোঁ করে উঠল, সে যেন বাঘের সন্ধান পেয়েছে। না, কেউ নয়—বাতাস। পুরনো দরজা, বাতাসে একটু নড়ে বৈকি। টমী তার প্রভুর কোলের কাছে আবার মুখ নীচু করে পড়ে রইল। ডাক্তার হাত বুলিয়ে দেখলেন, তাঁর বন্দুকটা ঠিক আছে

কিনা। নিজের হাতটা যেন সহজে আর নড়তে চাইছে না। কেমন যেন মনে হতে লাগল, নিজের ওপর কর্তৃত্ব তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তবু অনেক চেষ্টায় তিনি গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

চোখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেও কিন্তু পলক পড়ছে না, চোখের তারা যেন স্থির হয়ে গেছে, পাথরের মতো প্রাণহীন। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে। ওটা যেন জীবন্ত মানুষের মাথা, যেন ওর চোখ কান নাক আছে, ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসছে। প্রেতের মতো হাসি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেয়ালের গায়ে। ও কী? দেয়ালের সেই আঁজিবুঁজি, সেই মানুষের কঙ্কালটা নড়ছে কেন? ডাক্তারের বুকের ভিতরকার রক্ত জমাট বেঁধে এল। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগছে একটু একটু করে। হাত, পা, বুক, মাথা, মুখ। উজ্জ্বল আলোয় সেই কঙ্কাল বিরাট দানবের চেহারা নিয়ে দেয়ালে উঠে দাঁড়াল। এবার হাত বাড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

হাত বাড়িয়ে ডাক্তার বন্দুকটা ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু হাত উঠল না। কই, বন্দুকটা তো তার কাছে নেই? কে নিলে? ডাক্তারের গলাটা কে টিপে ধরেছে! স্বর নেই, চীৎকার নেই, নিঃশ্বাস নেই। তিনি নড়বার চেষ্টা করলেন কিন্তু সম্ভব হল না, খাটের সঙ্গে তাঁকে বেঁধে দিয়েছে।

ডাক্তার জ্ঞান হারাননি, খুব সাহসী লোক তিনি। চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য, জলের কুঁজোটা ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, কাঁচের গেলাস ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উড়ছে। হ্যাঁ, এইবার ডাক্তার একটু ভয় পেয়েছেন। ভয়ে তাঁর রোমকূপগুলি আর্তনাদ ক'রে উঠল।

খট্ খট্ খট্—

কিসের শব্দ? কই টমী তো আর গোঁ গোঁ করে উঠল না? ডাক্তার প্রাণপণে টমীর গায়ে একটা চিমটি কাটলেন, এত জোর যে টমীর গায়ের মাংস তাঁর আঙ্গুলে ছিঁড়ে উঠে এল। কিন্তু কই টমী তো জাগল না? তবে? তবে? বেঁচে আছে তো? টমী বেঁচে নেই, তার সর্বশরীরে একবিন্দু প্রাণ নেই—মরে সে কাঠের মতো পড়ে রয়েছে। এ-পাশে বন্দুক নেই, ও-পাশে টমী নেই।

ঘড়িটায় আর টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে না, সেটা থেমে গেছে। কে দিলে থামিয়ে? টেবিলটা এইবার নড়ে উঠল, পায়া চারটে ছড়িয়ে নাচতে লাগল। টমী, টমী? টমী বেঁচে নেই—বাঁ-হাতের কাছে তার মৃতদেহ অসাড়, অচেতন। জলের কুঁজোটা ঘুরছে, কাঁচের গেলাসটা উড়ছে, টেবিলটা নাচছে। আর—আর সেই দানবটা হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

হঠাৎ সশব্দে দরজা-জানালাগুলি খুলে গেল। ডাক্তার শিউরে উঠলেন। কারা ঢুকছে ঘরে? বড় বড় মাথা, ঝাঁকড়া চুল,—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো। মানুষ নয়, দানব নয়—এরা যেন আরও বিচিত্র। গভীর রাত্রির অন্ধকারে এরা এসেছে কঙ্কালটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে।

আলো কই, আলো? কারবাইডের আলোটা যেন পাগলের মতো ঘরের চারিদিকে ছুটছে। কে তাকে তাড়া করেছে, কিন্তু পালাতে পারছে না, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যারা ঘরে ঢুকেছে তারা নিশ্বাস ফেলছে, দ্রুত নিশ্বাস, ঝড়ের মতো তার শব্দ।

ডাক্তারের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। তিনি কেঁদে ওঠবার চেষ্টা করলেও পারলেন না। গলা তাঁর বন্ধ, হাত পা বন্দী, চোখ দুটো অচেতন। দেখতে দেখতে সেই দানবের হাতখানা তার মাথার দিকে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে মাথাটা ছুঁয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, মাথার সব চুলগুলি দাঁড়িয়ে উঠেছে।

আঃ আঃ—খাটখানা কে নাড়ছে। ডাক্তার আবার চীৎকার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই হিংস্র প্রেতের দল তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে—তাঁকে নিয়ে শূন্যে উঠতে লাগল। ডাক্তারের মাথাটা ঘুরছে! টমী, টমী? টমী মরে গেছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, টমীর মুখটাও দানবের মতো বদলে গেছে, টমী নখর বিস্তার করে তাঁর দিকে মুখব্যাদন করে এগিয়ে আসছে।

বিশ্বাসঘাতক! তোমার এই কাজ?

টমী-দানব হেসে উঠল। ধারাল দাঁত দিয়ে ডাক্তারের পাঁজর কামড়ে ধরল।

খাটখানা শূন্যে উঠছে! মহাশূন্যের ঘন অন্ধকার দেশে। আরও-আরও উঁচুতে দানবের দেশে তাঁকে নিয়ে যাবে, ভূত-প্রেতের রহস্য রাজ্যে ঊর্ধ্বদেশে খাটখানা উড়ে যাচ্ছে, দূরে,—ওই যা, তাদের হাত থেকে খাট খসে গেল! ডাক্তার বেগে নীচের দিক পড়ে যাচ্ছেন, হয়তো কোন মহাসমুদ্রের জলে তিনি আছাড় খেয়ে পড়ে তলিয়ে যাবেন। গেল, গেল,—

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু?

দরজায় ধাক্কা পড়তেই ডাক্তারের ঘুম ভাঙল। বুকটা ধড়ফড় করছে! চোখ চেয়ে দেখলেন, সকালের আলো জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। সর্বশরীর তার তখনো কাঁপছে। ডাক্তার চেয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে। সেই আলো, ঘড়ি, টেবিল, কুঁজো ও গেলাস, তাঁর বন্দুক আর টমী। গলার আওয়াজ দিয়ে তিনি বললেন—যাই হে, দাঁড়াও।

জামাই

মনোজ বসু

অনেক দিনের কথা। খুলনা অবধি নতুন রেললাইন বসেছে। একটা স্টেশন ঝিকরগাছি।

শ্রাবণ মাস। সারাদিন ঝুপঝুপে বৃষ্টি। সন্ধ্যা থেকে একটুখানি ধরেছে। রাত্রি সাড়ে আটটায় কলকাতার ট্রেন ঝিকরগাছি এসে থামল। দুর্যোগে মোটে ভিড় নেই। জন তিন-চার গাড়িতে উঠল। নামল একটিমাত্র যুবাপুরুষ। নাম বিনোদ। কাছাকাছি সাদিপুর গাঁয়ের মাখনলাল করের জামাই। তাঁর ছোট মেয়ে চঞ্চলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বছর দুই আগে।

পুনায় থাকে বিনোদ, মিলিটারিতে চাকরি করে। সম্প্রতি বাসা পেয়েছে। বউকে নতুন বাসায় নিয়ে যাবে। এক হপ্তার ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। এর পর ভাদ্র মাস পড়ে যাবে। শ্বশুর-শাশুড়ি তখন মেয়ে পাঠাবেন না। সেইজন্যে তাড়াতাড়ি।

স্টেশনে নেমে বিনোদ গেট পেরিয়ে বেরুল। গেটে লোক নেই, কেউ টিকিট চাইল না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কোন দিকে জনমানব দেখা যায় না। আরও দু-বার সে শ্বশুরবাড়ি এসে গেছে, পথ মোটামুটি জানা। তবু ভাল করে একবার স্টেশনমাস্টারের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবে।

অফিসঘরের দরজা ঝাঁকাচ্ছে ঃ মাস্টারমশায়, মাস্টারমশায়—

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আলো জ্বলছে। স্টেশনমাস্টার আছেন অফিসে। সাড়া দিচ্ছেন না। শুনুন একবারটি মাস্টারমশায়—

পয়েন্টসম্যান এল হঠাৎ কোন্ দিক থেকে। গায়ে নীল কোট; তার উপর মোটা কম্বল জড়ানো। তা সত্ত্বেও হি হি করে কাঁপছে। বলে, ডাকেন কেন বাবু? মাস্টারমশায় জ্বরে বেহুঁশ। গাড়ির ছাড় গার্ডসাহেব আজ আমার কাছ থেকে নিয়ে নিল। উনি উঠতে পারবেন না, আমায় বলুন কি দরকার।

সাদিপুর থেকে আমার জন্য পালকি আসার কথা। দেখতে পাচ্ছিনে তো।

ভ্রূভঙ্গি করে পয়েন্টসম্যান বলে, পালকি চাচ্ছেন বাবু, বলি পালকিটা বইবে কারা? বেহারা জুটবে কোথা? ম্যালেরিয়ার নতুন আমদানি—ঘরে ঘরে মেয়েমর্দ সকলের জ্বর। একবাটি বার্লি রেঁধে দেবার মানুষ জোটে না, আপনার মাথায় পালকির শখ চাপল এখন।

হাঁসফাস করছিল লোকটা—বিনোদের সামনে সেইখানে মেঝের ওপর বসে পড়ল। বলে, আগের লোকটা মারা গেল জ্বরে। পরশুদিন আমায় এই স্টেশনে পাঠাল। আমাকেও জ্বরে ধরেছে। কপালে কী আছে জানিনে।

দু-মাসের মধ্যে বিনোদ শ্বশুরবাড়ির কোন চিঠিপত্র পায়নি। মন বড় উতলা। স্টেশনমাস্টার পুরনো লোক, তিনি হয়তো খবরাখবর কিছু বলতে পারতেন। এ লোক একেবারে নূতন, একে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই।

সারাদিন খাওয়া হয়নি বিনোদের। বড় ক্লান্ত। একবার ভাবল, রাত্রিটা স্টেশনে কাটিয়ে সকালবেলা বেরুবে। কিন্তু সামান্য পথ, মাইল তিনেকের বেশী নয়। মশা
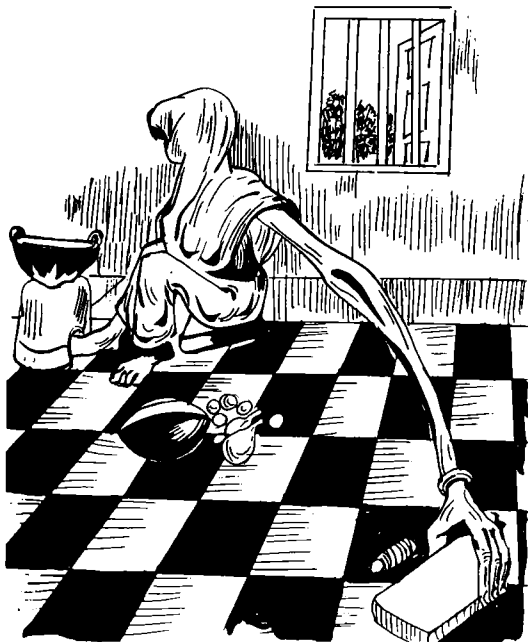
ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে—যা গতিক, রাতের মধ্যে চোখ বুজতে দেবে না। তার চেয়ে কোন রকমে পথটুকু কাটিয়ে শ্বশুরবাড়ির খাটের উপর গদিয়ান হয়ে পড়া ভাল।

পথে নেমে পড়ল বিনোদ। হনহন করে চলেছে। হাতঘড়িতে ন'টা। সন্ধ্যারাত্রি বলা যায়। এরই মধ্যে চারিদিক একেবারে নিশুতি। রাস্তার জল কলকল করে নালায় পড়ছে। ব্যাং ডাকছে গ্যাঙর-গ্যাং। বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছে মাথার উপরে।

চাঁদ দেখা দিল আকাশে। মেঘ-ভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্না। অদূরে কেয়াঝাড়। ছত্রাকার কেয়া-পাতার নীচে মানুষ যেন। মানুষটা কাঁটাবনের মধ্যে মোটা কেয়া গুঁড়ির উপর আরামে পা ছড়িয়ে বসে আছে, স্টেশন থেকে বেরিয়ে এতক্ষণের মধ্যে প্রথমে এই মানুষ।

বিনোদ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, সাদিপুরে মাখনলাল করের বাড়ি যাব! যাচ্ছি তো ঠিক?

উঁহু—। শঙ্খের মতন আওয়াজে মানুষটা জবাব দেয় ঃ সাদিপুর যাবে তো এই দিকে চলে এস। ডাকছি, আসছ না কেন?

পথ কোথা গহিন জঙ্গলের মধ্যে। পাগল নিশ্চয়—নয় তো রাত্রিবেলা ঘরবাড়ি ছেড়ে এমন জায়গায় কেন? মিলিটারি মানুষ বিনোদ—সে কিছু গ্রাহ্য করে না। নিরুত্তরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আরও জোরে গটমট করে চলল।

দীর্ঘ একটা খেজুরগাছ ঝড়ে বেঁকে গেছে। কাত হয়ে আছে সেটা রাস্তার ওপর। গাছটা আগেও দেখেছে, বিনোদের মনে পড়ল। ঠিক-পথেই যাচ্ছে তবে, পথ হারায়নি। যেই মাত্র গাছের নীচে আসা, গাছটা নুয়ে এসে বিষম জোরে মাটিতে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আবার আগেকার অবস্থায়—তেমনি কাত হয়ে আছে রাস্তার উপর। কার যেন খলখল হাসি শুনতে পায় বাতাসে। বিনোদ ছুটে বেরুল, তাই রক্ষা। নইলে গাছ ঠিক মাথার উপরে পড়ত, মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।

খুব খানিকটা গিয়ে পিছনে তাকায়। খেজুরগাছ যেমন তেমনি আছে, পাতা ঝিলমিল করছে জ্যোৎস্নায়। সাহসী মানুষ বিনোদ—প্যারেড করে, বন্দুক চালায়। ভাবছে চোখের ভুল। বম্বে মেল আজ বড্ড লেট ছিল—হাওড়া স্টেশনে নেমেই শিয়ালদা মুখো ছুটতে হল। খাওয়াদাওয়া হয়নি সমস্তটা দিন। খিদে তেষ্টায় অবসন্ন হয়ে মাথা ঘুরছে, আর এই সমস্ত জিনিস দেখছে। আসলে কিছুই নয়।

শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে গেল। অবস্থা ভাল এঁদের, পাকা কোঠাবাড়ি। বৈঠকখানা অন্ধকার। শীতকালে বড়দিনের সময় বিনোদ এসেছিল, দিনরাত লোক গিজগিজ করত তখন। রাত দুপুর অবধি পাশা খেলার হুল্লোড়। আজ কেউ নেই। সেটা হয়

রা ঐ পয়েন্টসম্যানের মুখে যা শোনা গেল—জ্বরজারির মধ্যে আড্ডা দেওয়ার লোক নেই মানুষের। বাড়ির কর্তারাও হয় তো জ্বরের তাড়সে ভিতর-বাড়ির বিছানায় পড়ে কোঁ কোঁ করছেন।

ভিতর-বাড়ির দরজাটা হা হা করছে। জামাই ঢুকে গেল ভিতরে। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে শব্দসাড়া করে। কাশছে। একজন কেউ বেরিয়ে আসুক। কী আশ্চর্য, গেলেন কোথা সব?

এই রকম ভাবছে। কোন্ দিক থেকে ঘোমটা-দেওয়া এক বউ এসে সামনে দাঁড়াল। বিনোদ হকচকিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি পরিচয় দিল, এ বাড়ির ছোট জামাই আমি—বিনোদ।

খিলখিল খিলখিল উচ্ছ্বলিত হাসি। হাসতে হাসতে ঘোমটা খুলে ফেলে চঞ্চলা। বিনোদের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

চঞ্চলা আগে আগে চলেছে। মস্ত বড় বাড়ি। আরও কত বারান্দা কত সিঁড়ি উঠান পার হয়ে চলল। একসময়ে বিনোদ সেই আগের প্রশ্ন করে, মানুষ দেখিনে—গেলেন কোথা এঁরা সব?

চঞ্চলা বলে, ঝিকরগাছি আমার এক পিসীর বাড়ী। পিসীর মেয়ের বিয়ে আজ। বাড়িসুদ্ধ সেখানে চলে গেছেন।

একবার ঢোক গিলে বলে, আমারও যাবার কথা। কিন্তু জ্বর থেকে উঠে সবে কাল অন্নপথ্য করেছি কিনা—

ঘরের মধ্যে এসে গেছে দু-জনা। কুলুঙ্গিতে প্রদীপ। প্রদীপের আলোয় বিনোদ চঞ্চলার দিকে ভাল করে তাকাল। অসুখ করেছিল, চেহারায় তা বোঝা যায় না। আগে যেমন দেখে গেছে, তেমনি। চঞ্চলার চেহারা ও স্বাস্থ্য চমৎকার।

বিনোদ বলে, এত বড় বাড়ির মধ্যে একলা একটি প্রাণী ভয় হচ্ছে না তোমার?

একলা কেন হব? বুড়ো দারোয়ান আর গোবিন্দ চাকর রয়েছে। তারা বৈঠকখানায়, সৌদামিনী ঝি-ও আছে। শরীর খারাপ বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে, ডাক দিলে এসে পড়বে।

পালঙ্কের বিছানায় চেপে বসে বিনোদ অভিমান ভরে বলে, আজ এসে পৌঁছব, স্টেশনে পালকি রাখবার জন্য চিঠি দিয়েছিলাম। পালকি না জুটুক, স্টেশনে অন্তত বুড়ো দারোয়ানকে পাঠালে পারতে।

চঞ্চলা ঘাড় নাড়ল ঃ চিঠি পৌঁছয়নি, পৌঁছবার উপায়ও নেই। পোস্টমাস্টার-পিওন দুটোই মারা গেছে। যে রানার ডাক বয়ে আনত, সে-ও নাকি নেই।

সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া। জ্বরজারি কাকে বলে এ অঞ্চলের লোক আগে জানত না। পাথরে- কোঁদা নিরেট দেহ যেন মানুষের। রেললাইন হয়ে অবধি এই কান্ড। গাঙ খালের মুখ বন্ধ করে রাস্তা বেঁধেছে। খানাডোবা চারিদিকে। বর্ষার জল পড়তে না পড়তে নরক গুলজার। মানুষজন উজাড় হয়ে গেল।

কথাবার্তার মধ্যে এক সময় বিনোদ বলে, তোমার কাছে বলতে কি— সারাদিন ভাত জোটেনি, বিষম ক্ষিধে পেয়েছে। ক্ষিধের চোটে মুখে আমার কথা সরছে না। তাড়াতাড়ি চাট্টি ভাত ফুটিয়ে দিতে পার তো দেখ।

চঞ্চলা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল ঃ ছি ছি, আগে বলতে হয়! চালে-ডালে খিঁচুড়ি চাপিয়ে দিইগে, তাড়াতাড়ি হবে। তরকারির হাঙ্গামায় যাব না। শুয়ে থাক তুমি, বিশ্রাম কর। এসে ডাকব তোমায়।

চলে গেল চঞ্চলা। যেন উড়ে বেরিয়ে গেল পাখির মতন।

এই ঘরটায় বিনোদ আগেও থেকে গেছে। পেছনে খিড়কির বাগান। কদম-ফুল ফুটেছে, খোলা জানলায় মিষ্টি গন্ধ আসছে। কুলুঙ্গির প্রদীপটা হঠাৎ দপ্‌দপ্ করে। আলো নাচে দেয়ালে দেয়ালে। চমক লাগে—অনেক লোকের আনাগোনা যেন বাইরে ফিসফিস কথাবার্তা।

কে রে, গোবিন্দ নাকি ওখানে?

জবাব নেই। একা গোবিন্দ কিংবা দু-জন চার জন মানুষ নয়। অনেক, অনেক। বাড়ির সকলে নিমন্ত্রণে গিয়েছে। এত লোক তবে কোথা থেকে আসে?

উঁকি দিয়ে দেখল জানালার বাইরে। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হয়েছে এখন। না, কিছুই নয়। কিন্তু যেই মাত্র ভিতর দিকে সরে আসে, আবার সেই পাতার খসখসানি। চাপা গলায় শলাপরামর্শ।

উঠে গিয়ে বিনোদ দড়াম করে জানালার কপাট বন্ধ করল। একলা ঘরে গা ছমছম করছে। চঞ্চলার কাছে একথা বলা যাবে না! হাসবে! ঠাট্টা করবে ঃ এই বীরুপুরষ তুমি; এই সাহস নিয়ে লড়াই-এর পাঁয়তারা কষে বেড়াও!

তার চেয়ে কোথায় চঞ্চলা রান্নাঘরে খিঁচুড়ি চাপিয়েছে—চলে যাওয়া যাক সেখানে। রান্না চলবে আর গল্প হবে দু-জনায়।

পা টিপে টিপে নিঃসাড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঢুকে পড়ে চঞ্চলাকে চমকে দেবে।

কিন্তু—ওরে বাবা, কী সর্বনেশে কান্ড গো। রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে বিনোদ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। রান্না করছে চঞ্চলা—উনুন জ্বালাবার কাঠকুটো নেই বুঝি, সেইজন্য নিজের পা দু-খানা ঢুকিয়ে দিয়েছে উনুনের ভিতর, দাউদাউ করে পা জ্বলছে। উনুনের উপর কড়াইতে খিঁচুড়ি ফুটছে টগবগ করে। চঞ্চলা আঙুল

দিয়ে একবার তুলে টিপে দেখছে সিদ্ধ হল কিনা। গরম খিঁচুড়ির মধ্যে ইচ্ছামতো আঙুল ডুবিয়ে দিচ্ছে, পা জ্বলছে ওদিকে উনুনের ভিতরে।

মশলা বাটবে। কোণের দিকে শিল-নোড়া। চঞ্চলার উঠবার জো নেই—পা তুললেই তো নিভে যাবে উনুন। হাত বাড়াল শিল-নোড়া আনবার জন্য। হাত ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। লম্বা হয়ে শিল-নোড়া ধরল। তারপর ছোট হচ্ছে। হতে হতে আবার স্বাভাবিক আকারে এল। কাছে এনে শিল পেতেছে। হাত লম্বা করে তখন তাকের উপরের মশলার ডালা নামিয়ে আনল। এক জায়গায় বসে সমস্ত হচ্ছে। ঘটরঘটর করে চঞ্চলা বাটনা বাটে এবার।

বিনোদ রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখে সব তাকিয়ে। পা দুটো খুঁটির মতন অনড় হয়ে গেছে। দেখছে একদৃষ্টিতে।

খিঁচুড়ি নামিয়ে চঞ্চলা থালায় ঢালে। পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করল, জলের গেলাস দিল পাশে। পাতিলেবুর কথা মনে হল বুঝি এই সময়। জানালার গরাদ দিয়ে হাত বের করে দেয়। লম্বা হচ্ছে হাত—আরও, আরও। হাত পঞ্চাশ তো হবেই। পাঁচিলের প্রান্তে পাতিলেবুর গাছ—বিনোদের দেখা আছে! ডান হাত সেই অবধি বাড়িয়ে পটপট করে গোটা চারেক লেবু ছিঁড়ে হাত আবার গুটিয়ে আনে। বঁটি পেতে লেবু কাটছে।

হঠাৎ বিনোদ যেন সংবিৎ পেয়ে যায়। উঠি-কি-পড়ি ছুটছে। শ্বশুরবাড়ির বাইরে, একেবারে রাস্তার উপর। রাস্তা ধরে ছুটছে। মানুষ দেখা যায় না, কিন্তু চারিদিক থেকে কলরব। বহুকণ্ঠে ডাকাডাকি করছে ঃ পালাস কোথা? দাঁড়া। তোমার তরে বলছি, দাঁড়িয়ে যা, খলখল করে হাসি।

বাঁশতলার অন্ধকার। ছুটতে ছুটতে অন্ধকার কাটিয়ে বিনোদ ফাঁকায় এল। কী আশ্চর্য, তার সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে চারটে বউ। সে যত ছোটে, বউগুলিও ছোটে ততই। ছায়াকে যেমন ছেড়ে পালানো যায় না, তেমনি এরা।

সামনের বউটা এক সময় থমকে দাঁড়ায়। গায়ের উপরে বিনোদ হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, কোন রকমে সামলে নিল। রক্ষা নেই, এইবারে ধরল। তাকিয়ে দেখে, অন্য তিন বউও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে।

সামনের বউটা ঘুরে দাঁড়ায় বিনোদের দিকে। এতক্ষণে মুখের ঘোমটা তুলল। তারই স্ত্রী চঞ্চলা—রান্না করছিল যে বসে বসে। ডাইনে বায়ে ও পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখে, তারাও সব ঘোমটা খুলেছে। চঞ্চলা সবাই। এক চঞ্চলা চারজন হয়ে গেছে। পালাবার পথ নেই কোন দিকে। বিনোদের গায়ে ঘাম দেখা দিয়েছে। চারজনের আটখানা হাত অক্টোপাসের মতো টুঁটি চেপে ধরে বুঝি এইবার।

হাতগুলি সত্যি লম্বা হচ্ছে একটু একটু করে; তার দিকে এগিয়ে আসছে। ফাঁকার মধ্যে বেঘোরে প্রাণটা গেল—হায় ভগবান!

চেতনা হারিয়ে বিনোদ পড়ে যায় আর কি পথের উপর! কিন্তু, না—হাতের মুঠিতে গলা চেপে ধরে না, হাতের আঙুলের কোমল স্পর্শ তার দেহে। সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

চঞ্চলার চোখে জল। চারজনের একসঙ্গে জল এসে গেছে চোখে। বলে দেখ, একজন আমি চারজন হয়ে চারদিক থেকে ঠেকিয়ে নিয়ে এলাম। নয় তো রক্ষা ছিল না। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দিত না ওরা।

বিনোদ বলে, ওরা কারা?

চঞ্চলা বলে, আমি মরে গেছি। আমার ভাই-বোন বাপ-মা সবাই। মহামারিতে এত বড় গাঁয়ের মধ্যে একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। বেঁচে থাকতে এখানকার মানুষ গাঁয়ের মধ্যে চোর ডাকাত ঢুকতে দিত না। মরার পরে তেমনি এখন জ্যান্ত মানুষ ঢুকতে দেয় না! ঢুকে পড়লে গলা টিপে মেরে দলের মধ্যে নিয়ে নেবে। তোমায় যে পারেনি, সে কেবল আমার জন্যে। তুমি বেঁচে থাকো শতেক পরমায়ু হোক। এই কম বয়সে কেন তুমি মরতে যাবে?

হাঁপাচ্ছিল চঞ্চলা ছুটোছুটির ক্লান্তিতে। খানিক দম নিয়ে বলে, গোড়ায় পিছু পিছু আসছিলাম। কিন্তু ভরসা হল না। সামনের দিক দিয়ে কিংবা ডাইনে বাঁয়ে কেউ এসে টপ করে যদি ধরে নেয়। একজন চারজন হয়ে চতুর্দিকে ঘিরে নিয়ে এসেছি। সে যে কী কষ্ট! আর ভয় নেই, সাদিপুরের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি। একটুখানি গিয়েই স্টেশন।

চার বউ চার পাশ থেকে মাথা নুইয়ে চারখানা ডান হাত বের করে বিনোদের পায়ের ধুলো নিল। পলকের মধ্যে দেখে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে একলা সে দাঁড়িয়ে। কোন দিকে কেউ নেই।

সেই আশ্চর্য লোকটি

বিমল কর

অনেকদিন আগেকার কথা। অন্তত বছর পঁয়ত্রিশ। আমার তখন পনেরো-ষোলো বছর বয়েস। ঠাকুমা আর ছোটকাকার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলাম বেড়াতে, ফেরার সময় এমন একটা কান্ড ঘটেছিল যার কোন অর্থ আমরা কেউই খুঁজে পাইনি। আজও পাই না।

কোন্ গাড়ী, কী তার নাম ছিল, আজ আমার কিছু মনে নেই।

দুপুর নাগাদ আমরা কাশী থেকে মোগলসরাই স্টেশনে এসে রেলে চড়েছিলাম। তখন ওই দিককার রেলের নাম ছিল ই. আই. আর, মানে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে। এখানকার মতন মাত্র দুটো ক্লাসও ছিল না, ছিল চারটে; ফার্স্ট, সেকেন্ড, ইন্টার, থার্ড। আজকাল রেলের কামরা মানেই যেন একটা ছোটখাটো মেলা, গিশগিশ করে লোক। তখনকার দিনে এত ভিড় টিড় কোন গাড়িতেই থাকত না, মেল এক্সপ্রেস গাড়িতে তো নয়ই।

আমাদের গাড়িটা বোধহয় এক্সপ্রেস গাড়ি ছিল, কেননা সব স্টেশনে থামছিল না। দুপুরের শেষ দিকে গাড়িতে উঠেছি। ইন্টারক্লাস কামরা। জনা ছয় যাত্রী আমাদের কামরায়। দুই দিন পরে কালীপুজো। দুর্গাপুজোর পর গিয়েছিলাম আমরা, কাশীতে ফিরছি কালীপুজোর আগে। আসব ধানবাদ। বাবার কাছে নিজেদের বাড়িতে।

সাসারাম এসে পৌঁছাতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। তখন ওদিকে শীত পড়তে শুরু করেছে সবে। এসব দিকে পুজোর পরেই শীত এসে যায়। সাসারাম শেরশাহের সমাধি শুনেছি। গাড়ি যখন সাসারামে এসে পৌঁছল তখন এত অন্ধকার যে আমার চোখে বাইরে কিছু ধরা পড়ল না। এমন কি স্টেশনটাও যেন টিমটিম করছে।

সাসারাম থেকে গাড়ী ছাড়ার সময় একজন ভদ্রলোক এসে গাড়িতে উঠলেন। গায়ে লম্বা রেলের কোট, ওভারকোট ধরনের, পরনে রেলের প্যান্ট। গলায় একটা রুমাল জড়ানো। মাথায় বারান্দামার্কা রেলের টুপি। মাথায় বেশ লম্বা।

ভদ্রলোক যখন উঠলেন, গাড়িটা তখন ছাড়ছিল। উনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কামরার আলো দপ্ করে নিভে গেল। অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার জ্বলে উঠল। লোকটিকে ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না। টুপিটা এমন করে নামানো যে, চোখের তলায় গিয়ে ঠেকেছে। সঙ্গে কোন মালপত্র নেই। ঝাড়া হাত পা। উনি কামরায় উঠেই এদিক-সেদিক তাকিয়ে সোজা বাংকে উঠে শুয়ে পড়লেন। জুতো সমেত। শুয়ে পড়ে মাথার টুপিটা এমন করে মাথার ওপর চাপা দিলেন, মনে হল কামরার আলো যেন চোখে না লাগে সেই ব্যবস্থা করে নিলেন। যেটুকু দেখলাম ভদ্রলোককে, বুঝতে পারলাম রেলের লোক, আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। আমার বাবা রেলের চাকুরে। ছেলেবেলা থেকে রেলের লোক দেখতে দেখতে কেমন একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, গোমো আর ধানবাদে অজস্র আংলো ইণ্ডিয়ান দেখেছি যারা রেলেই কাজ করে। ভদ্রলোকের কত বয়েস তা ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে আমার ছোটকাকার থেকে নিশ্চই বড়।

গাড়ি চলতে শুরু করল। একটা বেঞ্চিতে আমরা-ঠাকুমা, ছোটকাকা আর আমি। আর-এক বেঞ্চিতে এক বিহারী ভদ্রলোক শুয়ে ছিলেন, তিনিও কাশী ফেরত। সঙ্গে বিস্তর মালপত্র। অন্য বেঞ্চিতে এক সাধুবাবা, সঙ্গে তাঁর কোন মারোয়াড়ী শিষ্য। সাধুবাবার গায়ে গেরুয়া বস্ত্র এই মাত্র, নয়ত তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের মতন, হিন্দীতেই কথাবার্তা বলছিলেন। বিড়ি টানছিলেন।

আমার কাকা ট্রেনে উঠলেই ঢুলতে শুরু করেন। সন্ধ্যে হয়েছে দেখে কাকাও মাথার উপর বাংকে চড়ে বসলেন। গাড়ি চলতে লাগল। ঠাকুমা বোধহয় জপতপ শুরু করল মনে মনে। আমি চুপচাপ একা। বাইরে তাকালেই অন্ধকার আর

অন্ধকার। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের ধোঁয়া এসে নাকে লাগছে। কয়লার গুঁড়ো উড়ছে। আর থেকে থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের ফুলকি জোনাকির মতন অন্ধকারে ছিটকে পড়ছে।

এই ভাবে শোন নদী পেরিয়ে এলাম। কী বড় ব্রিজ। ট্রেন ছুটছে। ছুটতে ছুটতে গয়াও এসে গেল, তখন রাত শেষ হয়ে গিয়েছে।

গয়া থেকে গাড়ি ছাড়ল। খাওয়া দাওয়া শেষ আমাদের। কাকা আবার বাংকে উঠে ঘুম লাগালেন। বিহারী ভদ্রলোক খাওয়া শেষ করে ঢেঁকুর তুলতে লাগলেন। বড়-বড়। সাধুবাবা শিষ্য সমেত গয়ায় নেমে গেছেন। নতুন কেউ চড়েনি।

সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক কিন্তু একইভাবে শুয়ে আছেন। ঘুমোচ্ছেন নিশ্চয়। ট্রেনে রেলের বহুলোকই যাতায়াত করে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশন। কাজকর্মে যায়, কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরে। কাজেই ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার কোন কৌতূহল হয়নি।

গয়া আর কোডারমার মধ্যে কোডারমার আগে মস্ত জঙ্গল। নামকরা জঙ্গল। বিহারে এত বড় জঙ্গল খুবই কম, লোকে বলে গুরপা গুঝাণ্ডির জঙ্গল। দিনের বেলাতেও এই জঙ্গলের অর্ধেক জায়গায় রোদ আলো ঢোকেনা। রেল লাইন পাতার সময় এই জঙ্গলের আরও ভয়ঙ্কর চেহারা ছিল। রেলের কুলি লাইনের অনেকেই নাকি বাঘ টাঘের পেটে গিয়েছে এখানে।

রেলের দুটো স্টেশনই আছে। গুরপা আর গুঝাণ্ডি। এই পাহাড়ী জায়গাটুকুর চড়াই ভাঙতে বাড়তি একটা এঞ্জিন জুড়তে হয়। একটা এঞ্জিন গাড়ি টানতে পারে না।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না কোডারমা থেকে গয়ার দিকে আসার সময় না গয়া থেকে কোডারমার দিকে যাবার সময় দুটো এঞ্জিন লাগে। যখনই লাগুক তাতে এ গল্পের কোন ক্ষতি নেই। কেননা তখনকার দিনে বাড়তি এঞ্জিনটা একবার যেমন যেত অন্যবার তেমনি ফিরে আসত। আবার যেত।

ডবল এঞ্জিন জুড়ে গাড়িটা ছাড়ল। রাতও হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলের মুখে ঢুকে বেশ শীত শীত লাগছিল। কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। চারদিকে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। গাছপালা আর অন্ধকার মিশে সে এক এমন জগৎ যা চোখে সওয়া যায় না। তবু গুরুপা গুঝাণ্ডির আসল জঙ্গল তখনও শুরু হয় নি, তেমন নিবিড় নয় গাছপালা।

যেতে যেতে গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল।

সব রেল-গাড়িই মাঝে মাঝে বে জায়গায় থেমে যায়। হয় সিগন্যাল পায় না, না হয় অন্য কোন গোলমাল হয়। কেন যে থামে যাত্রীরা তা বুঝতেও পারে না।

গাড়িটা থামার পর সামান্য সময় চুপচাপ কেটে গেল। ভাবছি, এই ছাড়বে। গাড়ি আর ছাড়ে না। হঠাৎ শুনি এঞ্জিনের হুইসেল বাজছে তারস্বরে। বাজছে তো বাজছেই।

বিহারী ভদ্রলোক জেগে ছিলেন, বললেন, 'লাইনের অত ওপর নিশ্চই বাঘ আছে। সরছে না।'

রেললাইনের ওপর বাঘ বসে থাকে। এঞ্জিনের অত জোরালো আলোয় নড়ে না। শব্দতেও নয়-এ আমার জানা ছিল না। আমার কাকাও দেখি বাংক থেকে নেমে এলেন।

ব্যাপারটা কি হচ্ছে বোঝবার জন্য জানলা খুলেছিলাম। দেখি গার্ডসাহেব হাতের সেই লাল সবুজ লন্ঠন ঝুলিয়ে সামনের এঞ্জিনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁর সঙ্গে আরও দু-একজন খালাসী ধরনের লোক, বোধহয় পেছনের ইঞ্জিনের। লাইনের পাশ দিয়েই যাচ্ছে সবাই।

আমাদের মতন আরও অনেকে গলা বাড়াচ্ছে কামরার মধ্য থেকে। গাড়ির বাইরের দিকে আলো পড়েছে সামান্য, ভেতরের আলোও জানলা দিয়ে বাইরে পড়েছিল ঝাপসা ভাবে।

আমার কাকা আর বিহারী ভদ্রলোক নানারকম কথা বলতে লাগলেন। ঠাকুমা একটু শুয়েছে। সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক কিন্তু বাংকে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। টুপিতে মুখ ঢাকা। গাড়ি আর ছাড়ে না।

ঠিক যে কতক্ষণ কাটল তাও বুঝতে পারলাম না। শেষে দেখি গাড়ির দরজা খুলে অনেকেই নামতে শুরু করেছেন। নেমে যে যার পা-দানীতে দাঁড়িয়ে। নানারকম গলা শোনা যাচ্ছে।

জঙ্গলের মধ্যে কারও সাহস নেই দু-পা এগিয়ে কিছু জেনে আসবে।

আমার কাকাও দরজা খুলে নীচে নামলেন।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। কি যে হচ্ছিল তাও বুঝতে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত বেশ সোরগোল পড়ে গেল। কেমন করে যেন দু-চারটে টর্চও বেরিয়ে গেল। লাইনের পাশ দিয়ে আসা যাওয়ায় করতে লাগল কেউ কেউ। গার্ডসাহেব শেষ পর্যন্ত ফিরতে লাগলেন। লোকে খবর নিচ্ছে হল কী? কাকা একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। খবর নিয়ে ফিরে এসে শুকনো মুখে বললেন সামনে ইঞ্জিনের ড্রাইভার মারা গিয়েছে হঠাৎ নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। ফায়ারম্যানের একজন গাড়ী থামিয়ে দিয়েছে।

শুনে আমি চমকে উঠলাম। বিহারী ভদ্রলোক বললেন, 'হায় ভগবান'

মানুষ হঠাৎ কেমন করে মারা যায়। সে-বয়েসে বুঝতাম না। এখন বুঝি।

তখন বুঝতে পারিনি ড্রাইভারের সেরিব্রালস্ট্রোক হয়েছিল। তখন এসব রোগ-নিরোগের কথা শোনাও যেত না।

আগে রেল এঞ্জিনের মধ্যে ড্রাইভারের সঙ্গে কয়লা দেওয়া জনাদুয়েক লোক ছাড়াও বোধ হয় একজন সাগরেদ থাকত ড্রাইভারের, এদেরই কেউ গাড়ী থামিয়েছে। ঘন ঘন হুইসল্‌ মেরে বিপদটা জানাচ্ছিল গার্ডকে।

এখন কী হবে? ড্রাইভার তো মারা গেল। গাড়ি চালাবে কে? আমরা কি সারারাত এই জঙ্গলে পড়ে থাকব?

ড্রাইভার মারা গেছে এটা কোন রকমে সারা কামরায় প্রচার হয়ে পড়ল। তারপর-ই একটা হই হই। বাইরে বড় কেউ নামছে না, পা-দানীর তলায় দাঁড়িয়ে আছে। গলা বাড়াচ্ছে সবাই।

এমন সময় শোনা গেল মৃত ড্রাইভারকে নামিয়ে ব্রেকভ্যানে তোলা হচ্ছে। গাড়ির মধ্যে তো ফেলে রাখা যায় না। দেখতে দেখতে রাত বেড়েই চলল।

আমরা অসহায়ের মতন গাড়িতে বসে আছি। ভাবছি এই জঙ্গলেই সারাটারাত এভাবে থেকে যেতে হবে কিনা। না জানি কি হবে।

গার্ড সাহেবও বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। কতবার যে সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করলেন। তাঁরই তো ঝামেলা। এতগুলো যাত্রীর জীবনমরণ যেন তাঁরই হাতে।

আরও খানিক বাদে দেখি গার্ডসাহেব প্রত্যেকটি কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলে দিচ্ছেন। বোধ হয় সাবধান করে দিচ্ছেন। বলছেন যে যার কামরার দরজা বন্ধ করে বসে থাকো, সকাল না হলে কিছু করার উপায় নেই।

আমাদের কামরার কাছে এলেন গার্ডসাহেব। আধখোলা দরজা দিয়ে উঠলেন ভেতরে। লম্বা চওড়া চেহারা, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গার্ড। বললেন। 'আপনাদের সারা রাত গাড়িতেই থাকতে হবে। সাবধানে থাকবেন। খুবই দুঃখের কথা, সামনের এঞ্জিনের ড্রাইভার হঠাৎ মারা গেছেন।'

গার্ডসাহেব নেবে যাবার একটু পরেই দেখি বাংক থেকে সেই অ্যাংলো ভদ্রলোক নেমে গেলেন। টুপি পড়লেন এমন একটা, যে মুখটা আড়াল হয়ে গেল। ভাল করে দেখতেও পেলাম না মুখটা। ভদ্রলোক কামরা থেকে নেমে গেলেন। তারপর দেখি পাশের কামরা থেকে গার্ডসাহেব নামা মাত্র কী সব কথাবার্তা বলছেন।

সামান্য পরে দেখলাম গার্ডসাহেব আর সেই লোকটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কাকা বললেন, যে মারা গেছে তার কেউ হবে। বিহারী ভদ্রলোক বললেন, মালুম দোস্ত ......

ঠাকুমা বললেন 'দরজাটা বন্ধ করে দে।'

আমরা যখন দরজা বন্ধ করে, জানলার সার্শি ফেলে যে যার শোবার ব্যবস্থা করছি—তখন একেবারে আচমকা এঞ্জিনের হুইসেল বেজে উঠল। বার তিন টানা টানা। তারপরেই গাড়ি আবার নড়ে উঠল।

সবাই অবাক!

কাকা বললেন, 'লোকটা নিশ্চয় ড্রাইভার।'

এ লাইনে হরদম রেলের কত লোক যাতায়াত করে। যাক্ বাবা, বেঁচে গেলাম। কোডারমা তো পৌঁছই। এই জঙ্গলে সারারাত পড়ে থাকতে হবে নাকি?

বিহারী ভদ্রলোক বললেন 'রামজী কী কৃপা, বাবু!'

গুরপা-গুঝাণ্ডির জঙ্গল পেরিয়ে আমরা কোডারমা পৌঁছলাম যখন, তখন প্রায় মাঝরাত।

স্টেশনে গাড়ি থামল।

হঠাৎ শুনি প্ল্যাটফর্মে হই-হই।

জানলা দরজা খুলে নেমে গেলেন অনেকে। খানিকটা পরে ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, সাংঘাতিক কান্ড। ওই যে লোকটা আমাদের কামরা থেকে নেমে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল, সেই লোকটা যখন গাড়ি চালিয়ে আনছিল, তখন এঞ্জিনের ফায়ারম্যানরা বয়লারের আলোয় লোকটাকে পুরো দেখতে পেয়েছিল। একেবারে মরা ড্রাইভারের মতো দেখতে, ওটা সেই মরা ড্রাইভারই।

গাড়ি থামতেই দুটো ফায়ারম্যান এঞ্জিন থেকে নেমে পালিয়েছে। লোকটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

বিহারী ভদ্রলোক বললেন, 'হায় রাম'! বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আমি বললুম 'আর গার্ড সাহেব?'

কাকা বললে : 'গার্ড সাহেব ব্রেক ভ্যান খুলে ডেড্‌বডি নামাবার সময় মাথা ঘুরে ঘুরে পড়ে গেছেন, বলছেন, মরা ড্রাইভার আর জ্যান্ত ড্রাইভার কে যে সত্যি আর কে মিথ্যে তিনি বুঝতে পারছেন না।'

আমার হাত-পা কাঁপছিল, গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠেছে। আমি বললাম তাহলে কে গাড়ি চালিয়ে আনল?

কাকা বললেন—'আমিও তো তাই ভাবছি ভূতে তো আর গাড়ি চালাতে পারে না। কিন্তু ফায়ারম্যানরাই বা কেন পালাবে? লোকটাই বা কেন উধাও হবে? আশ্চর্য! আমার মনে পড়ল, সাসারাম স্টেশনে লোকটা ওঠামাত্র আমাদের আলো দপ্ করে নিবে গিয়েছিল, কেন?

দশ নম্বর বাড়ির রহস্য

শিবরাম চক্রবর্তী

দিব্যি একটা খালি বাড়ি পেয়ে গেলাম আলিপুরে! হার্ট ট্রাবলের জন্য ডাক্তার বলে দিল হাওয়া বদলাতে, বলে দিল—'কলকাতা ছেড়ে ঘুরে এসো গে কোথাও দিনকতক—বাঁচতে চাও যদি। তবে যদি না বাঁচতে চাও সেকথা আলাদা।'

বাঁচতে কে না চায়? কাজেই ছাড়তে হল কলকাতা। চলে এলাম আলিপুরে।

হ্যাঁ, হাওয়া বদলাতে চাও তো আলিপুর, ঘন্টায় ঘন্টায় হাওয়া বদল হচ্ছে সেখানে। এমনকি মিনিটে মিনিটেও বলা যায়। আর তার রেকর্ড থেকে যাচ্ছে দস্তুরমতো, আবহাওয়া আপিসটা সেখানেই কিনা!

উঠেছি এসে এখানে—আজ সকালেই। বিনি আর আমি। আমার উপর হাওয়া বদলের দায়, আর বিনির দায় খাওয়া বদলের। ঘন্টায় ঘন্টায় সে আমাকে খাওয়াবে—পুষ্টিকর আর তুষ্টিকর যত রকমের খাবার আছে। খাওয়ার ভার তার ওপর, সে ভার বইবে ও। আর খাদ্যের ভার যা কিছু আছে সব বোঝা সইতে হবে আমায়—হয়তো একটু কষ্ট করেই, এই রকমের বোঝাপড়া।

তা কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না—এখানে অবশ্যি কেষ্টকে না পাবার জন্যেই এই কষ্ট করা। কেষ্টপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টির জন্যেই না এই খাদ্য-বৃষ্টি? তা হোক, যতই কষ্টদায়ক হোক্—কেষ্ট আর খাদ্যের মধ্যে বাছবিচার করতে হলে খাদ্যকেই আমি বেছে নেব অম্লান বদনে, এমনকি শ্রীমতী বিনির রান্না হলেও।

এক ঘন্টাও হয়নি আমার। ইতিমধ্যে আসরে খাদ্য এসে হাজির। এক বাটি দুধ আর একখানা খাম বিনি আমার টেবিলে এনে রাখলে।

—তোমার চিঠি দাদা—দুধটা খেয়ে ফেলো দেখি।

আমি আগে চিঠিখানা দেখি, এখনো তো কাউকে এখানকার ঠিকানা জানাইনি। আসতে-না-আসতেই তবে চিঠি আসে কি করে? কিন্তু না, সত্যিই। এই ঠিকানারই চিঠি বটে। ওই তো লেখাই রয়েছে লেফাফার উপরেই ১০ নং আলিপুর টেরেস। কিন্তু এর মধ্যেই আলিপুরে আমাদের ট্রেস পেল কি ক'রে আমাদের শত্রু-মিত্ররা? খাম খুলতে খুলতে কেমন একটা চকচকে আওয়াজ পেলাম। খামটা চকচকে বটে, কিন্তু তা বলে যতই চাকচিক্য থাক তার থেকে চক চক শব্দ কেউ আশা করে না। তা বরদাস্তও করা যায় না কখনোই। খাম-টামের অত অহঙ্কার থাকা ভাল নয়।

'শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু—'

যুতসই ভণিতা দেখেই চট করে চিঠির শেষে চোখ বুলোতে গেলাম—কোন্ মহাত্মনের লেখা দেখা যাক। না, নাম-ধাম নেই কারও। বিলকুল একখানা চিঠি।

প্রতিবেশীর প্রতি বেশী রকম ভালবাসা থাকে না সকলের, থাকবার কথাও নয় তা মানি, কিন্তু তা বলে, সে আসতে-না-আসতেই তার প্রতি এইরূপ বেনামা চিঠি ছুঁড়ে মারা, এই বা কি রকমের ভদ্রতা? অ্যাঁ?

শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু, সবিনয়ে নিবেদন মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী...

জানি মহাশয়, জানি—কিন্তু দুঃসংবাদ অমন বার বার বেশী বেশী করে মনে করিয়ে দেবার মানে কি বলুন তো? আসতে-না-আসতেই চান কি যে এখান থেকে আমরা উঠে যাই?

চিঠিখানা রেখে দুধ খেতে যাই। দেখি বাটি ফাঁকা। অজান্তে কখন খেয়ে বসে

বাটি। যাক, বাঁচা গেল। দুধের মতো একটা অখাদ্য যে অন্যজনে খেতে পেরেছে এটা আমার সৌভাগ্যই।

কিন্তু যার বোন আছে, বিনির মতো বোন আছে, তার সৌভাগ্য বলে কিছু নেই। তার হচ্ছে বনবাস। আরেক বাটি দুধ হাতে সে হাজির, আবার সাথে এক প্লেট হালুয়া।

—আরে এই তো খেলাম রে, আবার এখুনিই? আমি আপত্তি করি। এই ঘন ঘন পথ্যি করলে কি মানুষ বাঁচে? বিশেষ হার্ট যাদের খুব উইক? তাতে ট্রাবলস থাকে যদিও তার, শেষটায় হয়তো পেটের ট্রাবলেই সে মারা যায়।

—কিন্তু ডাক্তার বলেছে না ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে?

—তোর এর মধ্যে এক ঘণ্টা হয়ে গেল?

তাক লাগে আমার। আলিপুরে আবহাওয়া মিনিটে মিনিটে বদলায় বলে শুনেছি বটে। কিন্তু তা বলে ঘণ্টারা কিছু আবহাওয়ার মতই বদলাতে পারে না! তাদের বদলাতে পাক্কা ষাট মিনিট লাগে, যেমন লাগত কলকাতায়। অবশ্যি সময়তত্ত্বে আমি বিশেষজ্ঞ নই, ঘড়িদর্শনেও পোক্ত নই তেমন, তা ঠিক, কিন্তু তাহলেও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির যদ্দুর ধারণা, এক একজামিনেশনের হল ছাড়া আর কোথাও পনরো মিনিটে ঘণ্টা কাবার কখনো হয় না।

তবে কিনা, এখানেও তো আমি একটা পরীক্ষার সম্মুখীন। জীবন-মরণই পরীক্ষা। আর সেই জন্যেই যদি—। সেজন্যেই কিনা বিনির কাছে আমি জানতে চাই। বিনির জবাবে যা পাওয়া গেল, তা হচ্ছে এই—ডাক্তারের উপদেশ যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়, তাহলে দিনে-রাতে চব্বিশবার খাওয়াতে হয় আমায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারো ঘণ্টাই নাকি আমি নাক ডাকাই। আর নাক থেকে হলে—'নাক থেকে নয়, ঘুম থেকে'—আমি আবার ভুল শুধরে দিই—যাক সেই নাকামো থেকে তুলে আমাকে কিছু গেলানোর মতো দুঃসাধ্য কাজ আর দুটি নেই। আর তা নাকি ওর কম্মো নয়। তা ছাড়া রাত-বিরেতে সেও নাকি একটু ঘুমোতে চায়। ঘুম পেলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। সে-ও। আর আমার মতো অতটা না হলেও, ঘুমোতে একটু ভালই বাসে। তার ঘুমোনোর সময়ে আমাকে তোলেই বা কে, আর খাওয়ায় বা কে? তাকে তুলে খাওয়ানোর জন্যেই, মানে, তাকে নয়—আমাকে খাওয়ানোর জন্যেই।

এই সব ভেবেচিন্তে সে ঠিক করেছে যতক্ষণ আমি জেগে থাকি তার মধ্যেই উঠে পড়ে যেমন করে হোক বার-চব্বিশেক আমাকে খাইয়ে দেবে। বরং সেই মহাচেষ্টাতেই এই...

'খাওয়াও'। হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বলি—'খাইয়ে যাও।' পড়েছি মোঘলের

হাতে খানা খেতে হবে সাথে। দুধের বাটিটা রেখে হালুয়ার প্লেটটা হাতে নিই। চামচেয় করে মুখে তুলে এক-একটু চাখি। চাখতে চাখতে আবার শুনি সেই চকচকানো ধ্বনি। আমার খারাপ লাগে এবার। এই কালো ভূতের মতন হালুয়া, কোনই চাকচিক্য নেই এর কোনখানেই। মুখে তুলতে-না-তুলতেই এও যদি চকচকে আওয়াজ ছাড়ে তো গা জ্বালা না করে পারে না। এমন বিচ্ছিরি হালুয়ার মুখে এমন চোখা চোখা বুলি—বড্ডোই বাড়াবাড়ি, নিতান্তই আদিখ্যেতা।

কিন্তু না, প্লেটে নয়—দুধের বাটিতেই। সেই চক্কার টেবিলের ওপরে শুধু সেই বাটিটা, তার সীমানায় কেউ নেই। এক সীমান্তে কেবল আমি। আর সেই বাটির সম্মুখেই অদ্ভুত উক্ত আওয়াজ চক্‌চক্ করে যেন দুগ্ধ পান করছে। হক্‌চকানো ব্যাপার। বেশ করে রগড়ে খালি চোখে তাকালাম ভাল করে—টেবিলে শুধু সেই দুধের বাটিটা, কেউ নেই কিছু নেই তার কাছাকাছি—খালি সেই বাটিটা। দেখতে-না-দেখতে বাটিটা খালি হয়ে গেল।

অবাক কাণ্ড। বুক জ্বর-জ্বর করতে লাগল। হার্ট ট্রাবল বাড়তে লাগল নিজের থেকেই। অ্যাঁ—এ আবার কি গো, এক চকরবরতির সামনে এ আবার কোন্ চকরবর্তী? কোন্ চক্রান্তকর্তা? তখনই মনে পড়ল ব্যাপারটা খুব অশ্রুতপূর্ব না, একটু আগেই এমনি চক্‌চক্‌কার যেন আরেকবার শুনেছি। আগের বাটিটাও তাহলে...এমনি নিজগুণেই? তবে কি আমি নিজে ফাঁক করিনি সেটাকে?

বিনি! বিনি! বিনি—। আমার আর্তনাদ ফোটে। আমার চীৎকারে সে ছুটে আসে—কি হয়েছে, কি হয়েছে দাদা?

কী আবার হবে ঐ দ্যাখ। আমি দেখাই। অদৃশ্য কিন্তু অশ্রুত মনকে দেখাতেই যাই। দেখাতে গিয়ে অন্য দৃশ্য দেয় এবার। ঘরের কোণে কতকগুলি অগ্নি শলাকা ছুটোছুটি করছে দেখতে পাই।

ওমা একি...। বিনি গালে হাত দেয়। সে অবাক। আর আমি। আমি ত হতবাক তার আগেই। খানিক বাদে ওর কথার জবাব দিতে গিয়ে নিজের গোঙানি আমার কানে আসে।

ভূতুড়ে বাড়ি নাকি দাদা!

—কে জানে দিদি। বলতে গেছি একথাটাই। কিন্তু সমস্ত বাক্যটা আপ্লুতস্বর হয়ে বেরিয়ে আসে এক কথায় গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ...আমি বলতে থাকি। আপ্লুত হয়ে।

তোমার গোঁয়ারতুমি থামাও তো। বলে বিনি এক জালা ঠাণ্ডা জল এনে আমার মাথার উপর ঢেলে দেয়। এই সব কাণ্ডেই ভড়কে গিয়েই কিনা কে জানে! জ্বলন্ত ফলকগুলি ঘরময় হুটোপাটি লাগিয়ে দেয়। ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরে এসেছে।

—বোন বলতে কি বহ্নি বলতে আমাদের বাড়িতে তুই-ই ছিলি একমাত্র, এক মাত্রই বল আর এক মাত্রায় বল...আমি বলি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এ পাড়াতে তোর প্রতিদ্বন্দ্বিনী আছে। অনেক আছে। মানে এটা ভূতুড়ে বাড়ি নয়। ঐ বহ্নি শিখারা ভূত নয় কখনোই পেত্নী।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেত্নী বলা হচ্ছে আমায়? বটে? বুঝতে পারছি এখনও তোমার জ্ঞান সঞ্চার হয়নি ঠিক মতন। দাঁড়াও! বলে সে আরেক বালতি জল আনতে যায়—ভাল করে আমার চৈতন্য সম্পাদনের মতলবেই।

যাবার মুখেই অযাচিত কার ল্যাজে যেন পা পড়ে যায় ওর আর সে (বিনি নয়। সেই অদৃশ্য লাঙ্গুলধারী) ম্যাও-ও বলে চেঁচিয়ে ওঠে। মাগো বলে একলাফে চার পা পিছিয়ে আসে।

আর চতুর্থ বারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে!

জীবটি অদৃশ্য হলে কি হবে তার আওয়াজ বেশ সুশ্রাব্য—সুখ শ্রাব্যই। আর বিনির পায়ে তার আঁচড়ানি একেবারেই অদৃশ্য নয়। সুদৃশ্যই বলতে হয়। তারপর আইডিন লাগাবার পর সেই পায়ের বাহার যা খোলে।

দেখবার মতোই।

—বেড়ালের ভূত।—বিনি বলে।

—উঁহু। ভূতুড়ে বেড়াল। আমি তার ভ্রম সংশোধন করি। মাগো বেড়াল মরে ভূত হয় জানতুম না সাত জন্মে। আঁচড়িতে আইডিন-চর্চিত শ্রীচরণে সে হাত বুলোয়।—আবার মরে ভূত হবার পরেও এমন বেঁচে জলজ্যান্ত থাকে তা কে জানত।

বেড়ালের ভূত মানুষের কোন ক্ষতি করে না। করতে পারে না। বরং ভেবে দেখলে—আমি ভেবে দেখি মানুষের উপকারেই লাগে। মনে কর তুই যেমন ঘণ্টায় চার বার করে আমায় দুধ গেলাবার জন্য কোমর বেঁধেছিস, তাতে ঐ ভূতুড়ে বেড়ালটা এখানে না থাকলে আমার কি দশা হত? আমি বাঁচতাম? ওর সাহায্য না পেলে কি?

—তোমার আদরের বেড়াল নিয়ে তুমি থেকো। আমার বোনার কাজ ফেলে এসেছি—বলে আমার আদুরে বিনি ব্যাজার মুখে চলে যায়।

এবার আমি চিঠিখানা নিয়ে পড়ি—

মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী। ঐ দশ নম্বর বাড়ির রহস্য হয়ত আপনার জানা নাই। সেই জন্যই আপনাকে সমস্ত জানাবার প্রয়োজন বোধ করছি।

হ্যাঁ খুলেই বলি সব—যে বাড়িতে আপনারা এসে উঠেছেন, বছর দুই আগে আমরাই সেখানে থাকতাম। কিন্তু যে কারণে ঐ বাড়ি—অমন চমৎকার বাড়ি—

আমাদের ছাড়তে হল সেই কথাই বলছি।

মাঝের যে ঘরটায় এখন আপনি এসে আছেন, ওইটায় আমার শোবার ঘর আর তাঁর ল্যাবরেটরী। আমার কাকা একজন পাস করা বৈজ্ঞানিক! নাম করলেই টের পাবেন বলে এর বেশী আর জানালাম না। ঐ ল্যাবরেটরীতে বসে তিনি নানা রকমের গবেষণা করতেন। নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলত তার ঐখানেই। এমনি করতে করতে হঠাৎ একদিন তিনি অদৃশ্য হওয়ার উপায় আবিষ্কার করে বসলেন। পরীক্ষায় লাগানোর কাজে কতকগুলি বিলাতী ইঁদুর তিনি আনিয়েছিলেন।

ইঁদুরগুলি সাহেবদেরই মতো সাদা! সেই শ্বেতকায়দের নিয়েই তাঁর যত পরীক্ষা চলত। সেদিনের কথা এখনো আমার স্মরণে আছে। "হাঁকাহাঁকি করে তিনি ডাকতে লাগলেন সবাইকে। সবাই আমরা ছুটে গেলাম—তার গবেষণা ঘরে। তিনি বল্লেন—দ্যাখ। কি হয়েছে দ্যাখ।"

সবাই আমরা চোখ প্যাট প্যাট করে তাকালাম। না, দেখবার কিছুই নেই কোথাও—কিছু নেই।

দেখছিস না খাঁচাটা? চেয়ে দ্যাখ্ ভাল করে। বলে তার সাহেবী ইঁদুরের খাঁচাটা দেখালেন। দেখলাম, যে খাঁচাটায় তার ইঁদুর সাহেবরা থাকত সেটা বিলকুল ফাঁকা, কোথায় গেল ইঁদুরগুলি? জিজ্ঞেস করলাম আমরা।

. —আছে রে। ওইখানেই আছে। ওরই মধ্যে রয়েছে।—গর্বের হাসি হাসলেন কাকা—অদৃশ্য হয়ে রয়েছে সবাই।

আমার কাকা ভারী চালাক লোক। অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আছে ভগবানের মতোই তাদের অস্তিত্ব। কেউ অবিশ্বাস করে সেই জন্যে আগের থেকেই তাদের গায়ে জ্বলজ্বলে কোন জিনিস লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলুম সত্যিই তো। কতকগুলি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু খাঁচার ভিতর ঝলমল করছে। জাজ্বল্যমান একপাল তিড়িং তিড়িং।

সবাই আমরা খাঁচার চারধারে ঘিরে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে সেই আলোর কণাগুলি এমন লাফঝাফ লাগাল যে বলবার নয়। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে একজন আমাদের খাঁচার দরজা খুলে দিল একবার—কী মজা হয় দেখবার জন্যে, তারপর আর দেখতে হল না। দেখতে না দেখতে জ্বলন্ত ফোঁটাগুলি বেরিয়ে পড়লো খাঁচা থেকে—ছিটকে পড়ল। ছিটকে পড়ল চারধারে—ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল ঘরময়।

কাকা তখনি আমাদের তাঁর ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল এঁটে দিলেন। তিনি খুব চটে গিয়েছিলেন আমাদের এই কান্ডে—এই অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে, তা বলাই বাহুল্য। তারপর কি হল শুনুন, তার দিনকতক বাদে। যখন সেই অদৃশ্য ইঁদুরের কথা আমরা ভুলে গেছি। কাকার আবিষ্কার কাহিনী আর আমাদের মনে নেই, খেতে

খেতে বসলাম আমরা সবাই গোল ঘরটায়। কাকীমা পরিবেশন করছেন। এমন সময়ে কাকীমার আদরের মেনি বেড়ালটা ফিরল বাহির থেকে। এসে বসল আমাদের পায়ের গোড়ায়। বসে খালি সে মুখ মুছতে লাগল নিজের। মুখের ভাব ভারী হাসি খুশী। কোথা থেকে তিনি যে বেশ কিছু সাঁটিয়ে এসেছেন তা বুঝতে পারা শক্ত নয়।

তারপর কি বলব মশাই—বসেছিল বেড়ালটা আমাদের সবার চোখের সামনেই। চোখের ওপরেই সেটা কেমন ছায়ার মতো ঘোলাটে হয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই ছায়া মূর্তি ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল একেবারে। দেবতারা যেমন অন্তর্হিত হন ঠিক সেই মতন।

আমরা খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম!

কাকাবাবু খেয়ে দেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন তাঁর বেতের চেয়ারে। আমরা ছুটে গিয়ে তক্ষুনি তাঁকে জানালাম—তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে। কিন্তু বিশদ করে সব বোঝাবার আগেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন, তার সযত্ন সমুজ্জ্বল লাঙ্গুলের কতখানি কোন অদৃশ্য জীবের তাড়নায় তাঁর কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল আচমকা। তিনি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ালেন একলাফে। কাকীমার বেজায় আদরের ছিল বেড়ালটা, তার অন্তর্ধানে তার প্রাণে কিরকম ব্যথা লেগেছিল অনুমান করতে পারবেন। নামজাদা বিজ্ঞানীর বৌ হলে কী হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যাকে বলে তা তার আদপেই ছিল না। বেড়ালের তিরোধানে মর্মাহত হয়ে কাকাবাবুকেই তার জন্য দায়ী করে তার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না বলেই কাকীমার বুদ্ধি ছিল একটু বেশী। একদিন তিনি করলেন কি একটা বড় জামবাটিতে দুধ ভর্তি করে রেখে দিলেন ঘরের মেঝেয়, আর আমাদের সবাইকে বলে দিলেন ম্যাও ম্যাও করে বেশ মৌজ করে গলা সাধতে।

আমরা সাধ্যমতো সুর করছি। আমাদের সাধাসাধিতেই কিনা বলা যায় না। দেখলাম বাটির দুধ কমে আসছে—কমতে শুরু করেছে ক্রমেই। আমাদের সুরধুনি থামতেই না, বেড়ালটা তাঁর অদৃশ্য গোঁফ ডুবিয়েছে দুগ্ধ পাথারে। দুধের সেই ক্ষতির মুখে, কাকীমা করলেন কি—সুকৌশলে তার পুষিকে পাকড়ে ফেললেন। তাকে ধরে তার গলায় একটি লাল রঙের রুমাল বেঁধে দিলেন কায়দা করে।

তারপর থেকেই যত অদ্ভুত কান্ড আরম্ভ হল আমাদের বাড়ী, নিত্য নতুন মজা। কোথাও কিছু নেই। বাড়িময় একটা লাল রুমাল ঘুর ঘুর করছে—লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে চারধারে। কখনো বা দেখা যেত কতকগুলি অগ্নিবিন্দু হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে আর তাদের পিছু পিছু তাড়া করে চলেছে উদ্যত এক লাল ঝান্ডা। যাক, দেখতে দেখতে সব আমাদের গা সওয়া হয়ে গেল।

তারপর এলো আরেক উৎপাত—তার কিছুদিন পরেই। মনে হল

অগ্নিপুচ্ছদের সংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে—এদিকে পুষির বংশবৃদ্ধিরও খবর পেলাম আমরা। প্রচুর কচিগলায় মিশানো মিঠে আওয়াজেই তা জানা গেল। চারধার থেকেই অদৃশ্য কণ্ঠের অবিশ্রান্ত মিউমিউ শুনে আর অফুরন্ত আলোর ঝিলমিল দেখে সবাই আমরা কেমন মিইয়ে গেলাম—এমন কি আমাদের বৈজ্ঞানিক কাকাবাবুও। কুরুবংশ আর পান্ডুবংশ—দুই পক্ষই বাড়তে লাগল মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদে। আর সেই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে বাস করা আমাদের নিতান্তই কঠিন হয়ে উঠল। আমরা পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হলাম তারপর।

সেই থেকে ও বাড়ি খালি পড়ে ছিল অ্যাদ্দিন। এখন আপনারা এসেছেন। যাই হোক আপনারা যেন ঘাবড়াবেন না যদি আপনার আনাচে কানাচে অগ্নিশিখাদের নড়ে চড়ে বেড়াতে দেখেন, যদি কখনো বা হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখতে পান বা কোন অলক্ষিত নখরের লক্ষ্য হন জানবেন সেটা বিজ্ঞানের জয়স্তম্ভ। আমাদের কাকাবাবুর দান। তার সৃষ্টির আনন্দ—বৈজ্ঞানিক খুশি। আর কাকীমার পুষির বংশ বিস্তার। তার জন্য ভয় পাবেন না যেন। অদ্ভুত হলেও ভূত নয় ওসব। বেড়ালের ভূতটুত না—শুধু সেই একটি বেড়ালই বেড়ে বেড়ে এখন প্রভূত হয়েছে।

প্রীতি নমস্কার নিন।

ইতি আপনাদেরই এক অদূর প্রতিবেশী।

পুনশ্চ : —মাছ আর দুধের পাত্র সব সময়েই ঢাকা দিয়ে রাখতে যেন ভুলবেন না।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বিনির ঘরে যাই। এ বাড়ির ওখানকার বাড়াবাড়ির সব রস সমস্ত রহস্য আবিষ্কার করতে চাই তার কাছে। গিয়ে দেখি বিনিদেবী বেতের চেয়ারে বসে বেতসের মতই কাঁপছেন—তার দুচোখ ভয়ে বিস্ফারিত। আর তার আধ-বোনা ব্লাউজখানা পড়ে আছে এক ধারে একান্ত অবহেলায়। এবং তার উলের গুলতি নিয়ে—

গুলতি নিয়ে সাত দিক থেকে সাতটি অদৃশ্য খেলোয়াড় ফুটবল খেলতে লেগেছে দেখলাম। তারপর আর রহস্য বিস্তার করেও কোন ফল হল না। বিজ্ঞানের মহিমা ফলাও করেও নয়—বিনি সেইদিনই সেইদন্ডেই—আমাকে নিয়ে চলে এলো সেখান থেকে। চলে এলাম আমাদের পুরানো বাড়িতে—আমার পুরানো হার্ট ট্রাবলে। সে বললে, শুধু একটা কথায় বললে, হ্যাঁ মানি এটা বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু তা বিজ্ঞানের সব দান আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে, এমন কি তা অ্যাটম বোমা হলেও একথা আমি মানতে রাজী নই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা খুব ভাল, কিন্তু তার কাছাকাছি বাস করতে নেই।

নিশির ডাক

স্বপনবুড়ো

ঝন্টা যখন একেবারে কোলের ছেলে—তখন তার মায়ের শক্ত অসুখ করে। সেই জন্যে সে আহ্লাদী পিসির কোলে মানুষ হয়। আহ্লাদী পিসি ঝন্টার বাবার দূর সম্পর্কের এক বোন, মাথায় একটু ছিট আছে বলে শ্বশুরঘর করতে পারেনি। আবার কারণে অকারণে এলোমেলো আহ্লাদীর মতো কথা বলে বলেই তার নাম হয়েছে আহ্লাদী। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সে তাই আহ্লাদী পিসি। মায়ের অসুখ থেকে সেই যে ঝন্টাকে সে কোলে তুলে নিল, তার পরেই ছেলেটা এমন ন্যাওটা হয়ে গেল যে, মায়ের অসুখ ভাল হলেও আহ্লাদী পিসি আর ওকে কোল থেকে নামাতে চায় নি। ঝন্টাও আহ্লাদী পিসি বলতে একেবারে অজ্ঞান! আহ্লাদী পিসি স্নান করিয়ে দেবে! পিসিকে না হলে ঝন্টার এক মুহূর্ত চলে না। ঝন্টার মা-ও সাত ঝামেলায় দিবা-রাত্রি জড়িয়ে থাকেন, তাই আহ্লাদী পিসির কোলে ছেলে দিয়ে তাঁরও সকল রকমে নিশ্চিন্তি।

আহ্লাদী পিসি মাছ খেতে বড় ভালবাসে। বিশেষ করে শোল মাছ। ঝন্টা যখন একটু বড় হল সে পিসির জন্যে নানা রকম মাছ ধরে নিয়ে আসে। পিসি এক গাল হেসে, বলে 'ভাগ্যিস আমার ঝন্টা ছিল, তাই দুটো মাছ-ভাত খেয়ে বাঁচি।'

বর্ষায় যখন দেশের নদী-নালা ভরাট হয়ে আসে—নিজেদের পুকুরে জল পড়ে, ঝন্টা গভীর রাত্রে গিয়ে নানা ধরনের মাছ ধরে নিয়ে আসে—বিশেষ করে আহ্লাদী পিসির জন্যে শোল মাছ যদি পায় তবে তার মুখে হাসি ধরে না।

এক কথায় ঝন্টা পিসির জন্যে সব করতে পারে। আবার ঝন্টাই পিসির সব। আহ্লাদী পিসি মরলে যে ঝন্টাই তার গলায় পিন্ডি দেবে—এই কথাই সে সগর্বে সবাইকে বলে বেড়ায়!

আহ্লাদী পিসি হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মারা গেল।

দিব্যি শক্ত-সামর্থ আহ্লাদী পিসি—দেহে রোগ বালাই নেই—অমনভাবে যে হঠাৎ মারা যাবে তা বাড়ির কেউ ধারণাই করতে পারে নি। দুর্দান্ত দস্যি ছেলে ঝন্টা—আহ্লাদী পিসির মৃত্যুর পর কে যেন তার মুখে বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। কারও সঙ্গেই কথা কয় না, খায় না, উদাস চোখে একদিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলে যেন দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল।

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে ঝন্টা ধড়মড় করে উঠে বসে।

মা শুধোন, 'হ্যাঁরে ঝন্টা, বিছানার উপর উঠে বসলি কেন? এখন তো অনেক রাত। ঘুমিয়ে পড়।'

ঝন্টা ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিকে তাকিয়ে, তারপর ফিস্‌ফিস্ করে মাকে সে বলে, 'আহ্লাদী পিসিমা, আমায় ডাকল যে।'

শুনে মা শিউরে ওঠেন। ঝন্টার গায়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। মুখে বলেন, 'রাম রাম।'

পাড়ার পাঁচজন বৌ-ঝি বলে, 'ঝন্টার মা, ওর দিকে বেশ কড়া নজর রেখো। পোড়ারমুখী আহ্লাদী মরেনি। তাই বুঝি এখনো আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে।'

ঝন্টাদের বাড়ির নীচে পুকুরপাড়ে একটা শ্যাওড়া গাছ; গাঁয়ের লোকেরা হাট থেকে সওদা করে ফেরবার মুখে এই শ্যাওড়া গাছের ডালে কাকে যেন বসে থাকতে দেখেছে।

বৃন্দাবন গাঙ্গুলি একদিন নাকি, একেবারে সামনা-সামনি পড়ে গিয়েছিলেন। বললেন 'ভাগ্যিস আমি বুদ্ধি করে পৈতেটা হাতে জড়িয়ে ধরে গায়ত্রী জপ করতে শুরু করলাম। নইলে ঝন্টাদের পুকুরের পাড়ে আমার ঘাড় মটকে রাখত।' এই ভাবে সারা গাঁয়ে একটা চাপা ফিসফিস আলোচনা। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়।

তখন আষাঢ় মাস। আশেপাশের নদী নালা বর্ষার জলে ভরাট হয়ে গেছে। ঘোলা জল পাক খেতে খেতে ধানের জমি ভরিয়ে মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে, উঁচু নীচু

গাঁয়ের পথগুলিকে পিছল করে ঝন্টাদের বাড়ির পুকুরের খালে ঢুকছে।

তখন বোধ করি দুপুর রাত। এমন একটা আবছা জোছনা ফুটেছে যে, আশে-পাশে দূরে সব কিছু নজরে পড়ে, কিন্তু ভাল করে ঠাহর করা যায় না। মনে হয়, যেন একটা পাতলা কুয়াশা জোছনার সঙ্গে মিশে গোটা গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছে।

মায়ের পাশে শুয়ে ঝন্টা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বাড়ির পিছন দিক দিয়ে একটা কালো বেড়াল বিকটভাবে ডেকে গেল! কোথায় একটি ভুতুম পাখি একটানা ডেকে ডেকে বিরক্তি জাগিয়ে তুলছে। একটা থম্‌থমে ঝিম্ ঝিমে ভাব...

এমনি সময় ঝন্টার হঠাৎ মনে হল—ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আহ্লাদী পিসি ওকে ডাকছে। বলছে, 'ওরে ঝন্টা শীগগির আয়—তোদের পুকুরে নতুন জল এসেছে। কত মাছ উঠছে—দেখবি আয়। তোর পোলোটা নিয়ে আসতে ভুলিসনি যেন!'

আচমকা ঝন্টার ঘুম ভেঙে গেল! সে বিছানার ওপর উঠে বসল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল, সবাই অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তার মায়ের ডান হাতটি ওর গায়ের ওপর ছিল। আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে রাখল।

কে যেন কানের কাছে বলল, দরজাটা ভেজিয়ে দে ঝন্টা, নইলে ওরা জেগে উঠবে। ঝন্টা বিনা প্রতিবাদে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হনহন করে পুকুরের ধারে চলে গেল।

নিশুতি রাত, কেউ কোথাও জেগে নেই। কল কল করে বর্ষার জল ঢুকছে খালে—ঝন্টা ছপ্ ছপ্ করে পোলো ফেলছে আর রাশি রাশি মাছ ধরছে। এত শোল মাছ কোত্থেকে এলো—ঝন্টা ভেবে কুলকিনারা পায় না। ও যে খালৈ সঙ্গে এনেছিল, সেটা মাছে ভর্তি হয়ে গেল। কিসের যেন একটা পোড়া গন্ধ ক্রমাগত তার নাকে আসছিল। তার আকর্ষণে ঝন্টা সেই মাছ ভর্তি খালৈ নিয়ে এগিয়ে চলল—একি এ যে সেই শ্যাওড়া গাছ।

—আমায় শোল মাছ পোড়া খাওয়াবি ঝন্টা?

ঝন্টা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে কে যেন বসে আছে, আহ্লাদী পিসি না? দেখতে ঠিক সেই রকম।

এতক্ষণে ঝন্টার যেন জ্ঞান ফিরে এলো। আহ্লাদী পিসি তো মরে গেছে। ও তা হলে কার ডাকে এই নিশুতি রাতে মাছ ধরতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে? ভয়ে ওর মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠল। সে প্রাণপণ চেষ্টা করল পালিয়ে যেতে কিন্তু পা দুটো কিছুতেই উঠছে না। শেষকালে মনে জোর এনে ঝন্টা মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করে দিল। পেছন থেকে আহ্লাদী পিসির কান্না শোনা গেল, ওঁরে ঝন্টা, শোঁল মাঁছগুলি আমায় দিঁয়ে যাঁ আমি আর কিঁছু চাঁইনে—'

আহ্লাদী পিসির কথা যত কানে আসে, ঝন্টা তত ছোটে। হঠাৎ সে দেখল

একটা বিরাট লম্বা শ্যাওড়া গাছের ডাল ওদিক থেকে এসে তার হাতের মাছের খালৈ ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

একটা আর্তনাদ করে ঝন্টা সেইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল! তার চীৎকার শুনে বাড়ি থেকে লোকজন এসে যখন পৌঁছাল, ওর মুখ দিয়ে তখন গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে।

অবশেষে মায়ের বুকভরা কান্নায় তিনদিন পর ঝন্টা তাকাল। কিন্তু কি হয়েছিল কোন কথাই সে মনে করতে পারে না, শুধু বোকার মতো ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকে।

গাঁয়ের সবাই বলল, দেখো ঝন্টার মা, এখন থেকে ঝন্টাকে একেবারে চোখে চোখে রাখতে হবে। পেত্নীরা ওরকম করে নিশির ডাকে ভুলিয়ে জলার ধারে ঘাড় মটকে রাখে।

শুনে ঝন্টার মার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। সারারাত ঘরে ছেলের শিয়রে জেগে থাকে। ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। ভাবে আমার শান্তির সংসারে এ কী হল। কি কুক্ষণেই পরের মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম।

এদিকে হঠাৎ বাড়ির লোকে লক্ষ্য করল যে কেমন যেন পাগলা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে ঝন্টা।

হঠাৎ সে বলে বসল, 'আমি পোড়া শোলমাছ খাব।'

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা পোড়া শোলমাছ ঘরের মাঝখানে এসে পড়ল। ভয়ে আঁৎকে উঠল সবাই।

ক্রমে ব্যাপারটা সহজ হয়ে এলো। দেখা গেল যে, ঝন্টা যখন যা চায় কে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাই এনে হাজির করে।

সেদিন দুপুরে গরমে আই ঢাই করতে করতে ক্ষীণকণ্ঠে ঝন্টা বলল, 'মা এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও না।'

মুখের কথা খসাতে যতটুকু সময়। দেখা গেল, সুন্দর একটি গেলাসে টলটলে পরিষ্কার জল। ঝন্টা সেই জল খেতে যাচ্ছিল কিন্তু ওর মা হাত দিয়ে সবটুকুন মেঝেতে ফেলে দিয়ে বললেন, 'কক্ষনো মুখে দিসনে ঝন্টা.....ওসব পেত্নীতে যোগাচ্ছে!'

সন্ধ্যের পর পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে আসত ঝন্টাকে দেখতে। কথায় কথায় গাঙ্গুলী-গিন্নী বললেন, 'আমার জর্দা ফুরিয়ে গেছে। কাশীর জর্দা না হলে আমার মুখে রোচে না।'

আপন মনে ঝন্টা বলল, 'তুমি জর্দা খাবে ঠানদি?' সঙ্গে সঙ্গে ঠন্ করে মেঝেতে পড়ল একটি কৌটো।

গাঙ্গুলী-গিন্নী অবাক হয়ে বললেন, 'এই তো কাশীর জর্দা! একেবারে নতুন কৌটো। কোত্থেকে এল ঝন্টার মা।'

আর যারা আশেপাশে ছিল—ব্যাপারটা জানত তারা খুলে বলল।

জর্দার কৌটোটা গাঙ্গুলী-গিন্নী হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যেই আহ্লাদী পেত্নীর কথা শুনলেন, অমনি 'রাম রাম' করতে করতে একেবারে নিজেদের বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

যতদিন ব্যাপারটা তামাশা থাকে লোকে ভিড় জমায়। কৌতূহলী হয়ে বসে থাকে পেত্নীর কাণ্ড দেখতে। কিন্তু কত রাত্তির লোকে এইভাবে না ঘুমিয়ে জাগতে পারে? কাজেই আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে আসতে লাগল। গমগমে বাড়ি আবার মানুষ জনশূন্য থমথমে হয়ে এল।

কিসের যেন দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝ রাত্তিরে ঝন্টার মায়ের ঘুম ভেঙে যায়। মা ছেলেকে বুকের কাছে প্রাণপণে টেনে নেন। বাঁশঝাড়ের পেছন দিকে যেখানে একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলে, সেখানে কার যেন কান্নার রেশ শুনতে পাওয়া যায়। মা চমকে উঠে বসেন। ছেলের মাথায় হাত রেখে সারারাত ধরে দুর্গা নাম জপ করতে থাকেন। কেবলি মনে হয়, তাঁর কোলের ছেলেকে কে যেন ছিনিয়ে নিতে আসছে।

সেদিন সন্ধ্যে থেকে একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। দূর বনে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকছে—মনে হচ্ছে যেন ওরাও খুব ভয় পেয়েছে। পাখি পাখালিরা কখন যে গিয়ে বাসায় সেঁধিয়েছে—কেউ খবর রাখে না, গেরস্ত বাড়ির গোয়ালগুলিতে গরুগুলি এমনভাবে হামলাচ্ছে যে, মনে হয় অশুভ কোন ইঙ্গিত পেয়েছে। মাঝে মাঝে কালো-প্যাঁচার চ্যাঁচানি কানে ভেসে আসছে।

শ্মশানের দিক থেকে একটা শোঁ শোঁ হাওয়া বুক চিরে উত্তর জলাভূমির ওপর দিয়ে বইছে। মনে হচ্ছে, কোন পেত্নী বুঝি নিঃশ্বাস ফেলছে। গাঁয়ের পথে আজ একটিও লোক নেই। কোন বাড়িতে একটি ছেলেও কেঁদে উঠছে না। মনে হচ্ছে, রুদ্ধ আতঙ্কে সবাই প্রহর গুণছে।

ঝন্টাদের বাড়িতে আজ সবাইকে কি কাল-ঘুমে পেয়েছে কে জানে। সন্ধ্যেবেলা উনুনে আগুন পড়েনি। বামুনদিদি ঘুঁটে আর কয়লা সাজাতে গিয়ে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের ঘরে বাড়ির কর্তারা সন্ধ্যে থেকেই দাবা পাশা খেলতে বসেন, তাদের চীৎকারে আশেপাশের দশটা লোক ঘুমতে পারে না। আজ আঁধার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দাবার ছক একপাশে সরিয়ে রেখে সবাই ফরাসের উপর অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলছে তারই সঙ্গে তাল বজায় রেখে খানা ডোবার ব্যাঙেরা আসর জমিয়ে তুলছে! আকাশের সমস্ত তারা মেঘে ঢাকা পড়েছে। মাথার ওপর কালপুরুষ—একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে বলে বুঝি দম বন্ধ করে প্রহর গুণছে। ঝড়ের গর্জনে বিপদের ইঙ্গিত।

মায়ের পাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে ঝন্টা। এমন ঘুম যে, দেখে মনে

হয়—ওর দেহে বুঝি প্রাণ নেই।

আকাশের বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, ঝিঁ ঝিঁর ডাক, ব্যাঙের শব্দ, প্যাঁচার চ্যাঁচানি আর কালপুরুষের নীরব ইঙ্গিত ওকে যেন এমনভাবে ঘুম পাড়িয়েছে যে সে ঘুম আর ভাঙবে না।

কিন্তু হঠাৎ বেড়ার পাশে কার ফিসফিসানি কথা শোনা গেল ঃ 'ঝন্টা, উঠে আয়, জলের ধারে আজ মাছ থই থই করছে।'

ঝন্টা এক মুহূর্তে সচকিত হয়ে ওঠে।

আবার সেই ফিসফিসানি আহ্বান ভেসে এল।

উদাস দৃষ্টিতে ঝন্টা উঠে বসল। কার ডাক—কোথায় যেতে হবে—কিছু জানে না তবু সে উঠে দাঁড়াল পাগলের মতো।

আবার সেই বাঁশবনের কানাকানির মতো কার আহ্বান।

'আজ আর পোলো নিসনে ঝন্টা, খাপলা জালটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বেরিয়ে আয়—'এই প্রহেলিকাময় নিশির ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই।

ঝন্টা খাপ্‌লা জালটা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে দরজার হুড়কোটা খুলে উঠোনে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লাগানো মেঘের গর্জন—আর বাদুড়ের ডানার ঝটপটি।

কিন্তু মেঘের ডাকেও কারও ঘুম ভাঙল না।

ছায়ামূর্তির হাতছানিতে ঝন্টা জলের দিকে এগিয়ে যায়।

পথে অন্ধকার এত জমাট বেঁধে আছে...তবু ওর পথ চলতে কোন অসুবিধে হয় না।

'ওই যে ওইখানে। কত মাছ ঘাই মারছে....। তুই দেখতে পারছিস নে ঝন্টা? এগিয়ে যা, ছুঁড়ে দে খাপলা জাল—'

অশরীরীর নির্দেশ শুনে ঝন্টা একেবারে জলার মধ্যে পা চালিয়ে দিল। তারপর কচুরিপানার মধ্যে তার দেহটা যে কোথায় তলিয়ে গেল সারা গাঁয়ের কেউ জানতেও পারল না। শুধু ঝন্টাদের বাড়ির কালো বেড়ালটা ওর মায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগল। মায়ের কাল-ঘুম তবু ভাঙল না।

পরদিন জেলেরা যখন ঝন্টার মৃতদেহটা জালে টেনে তুলল, সারা গাঁয়ের মানুষজন একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

গাঁয়ের একজন বর্ষীয়সী মহিলা কপাল চাপড়ে বললেন, 'আহ্লাদী পোড়ারমুখী পেত্নী হয়েও ওকে ভুলতে পারেনি, তাইতো রাহু হয়ে ঝন্টাকে কোলে টেনে নিলে—'

বহু বছর কেটে গেছে, এখনও গাঁয়ের লোকেরা একটু বেশী রাত্তিরে জলার ধার দিয়ে যেতে ভয় পায়। মনে হয়ে, কে যেন ওখানে, কেঁদে কেঁদে এলোচুল উড়িয়ে, বুক চাপড়িয়ে ছোটাছুটি করে।

এক রাত্রির অতিথি

গজেন্দ্রনাথ মিত্র

বুড়ো মাঝিটাকে তাড়া লাগানো বৃথা জেনেই অনিমেষ বহুক্ষণ আগেই চুপ করে ছিল। তার ফলে মাঝি আর আরোহী দুজনেই হাল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে। মাঝির বকাটাই রোগ।—এমনি কি ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল ঐটেই

লাটাইয়ে সেঁটে বসে থাকেন, কে কত পারবে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে?

বেদব্যাস বলল, "শেষ সময় কাছে কে ছিলটিল?"

"কে আবার থাকবে ওই ভূতেরা ছাড়া! সন্ধ্যের পর আর কেউ ওনার বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াত নাকি?"

"তবে ওই আওয়াজ-টাওয়াজ শোনা যেত কী করে?"

"সে একটা কৌশল। পাড়ার ঘন্টেশ্বর ওঝা ওনার ওই ভূত-ভূতুড়ে রিসার্চের কথা শুনে একটা 'দুরশুনুনি' যন্তর বানিয়ে সেটাই দূর থেকে কানে নিয়ে বসে থাকত মাঝ-রাত্তিরে। কিন্তু লাভ কিছু হত না। কথার শব্দই পাওয়া যেত, ভাষা বোঝা যেত না। ভূতের ভাষা কে বুঝবে?" দূরশুনুনি মানে? মানে আবার কী? যেমন 'দূরভাষিণী' তেমন দূরশুনুনি। ঘন্টেশ্বর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বানিয়েছিল।

"কী ভাগ্যিস, রাতে মরেননি। মরেছেন দিনদুপুরে পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে ধরতে!"

বেদব্যাস মনে মনে একবার তার বড় ঠাকুর্দার বয়েসের হিসেব কষে নিয়ে অবাক হয়ে বলল, "তখনও মাছ ধরতেন?"

"ডেইলি। শুধু ধরতেন? সে মাছ নিজের হাতে কেটেকুটে জম্পেশ করে রেঁধে-বেড়ে তোয়াজ করে খেতেন, পাড়ায় বিলোতেন। কাজকর্ম করে দেবার জন্যও একখানা তোফা লোক ঠিক করেছিলেন" হেঁহেঁ করে হেসে ছেলেটা বলে, "গাঁয়ের ছাপমারা ডাইনি বাতাসিবুড়ি, ছেলেপুলেকে যার ছায়া মাড়াতে দেওয়া হয়না, বাঁশবনের ধারে একখানা কুঁড়ে বেঁধে থাকে, সেই বাতাসিবুড়িই ছিল ওঁর 'কাজকরুনি'। বলতেন আমার তো আর 'নজর' লাগবে না রে বাবা। আর তো কেউ ওকে চাকরি দেবে না। মানুষটা অনাহারে মরবে। 'ডাইনি' যেন মানুষ। আসলে ভূত-প্রেত-ডাইনি নিয়েই ছিল কারবার। তবে হ্যাঁ, মিথ্যে বলব না, আমাদের ক্লাবে মোটা টাকা চাঁদাটাদা দিতেন। তা দেবেন নাই বা কেন? পয়সাকড়ি তো ছিল বিস্তর। ওয়ারিশন বলতে কেউ নেই।"

যেন, পয়সাকড়ি থাকলেই এবং ওয়ারিশন না থাকলেই লোকে যুবক সঙ্ঘে মোটা টাকা চাঁদা দেয়।

বেদব্যাস এখন চিঠিটা খুলে আবার নিরীক্ষণ করে পড়ে।

চিঠির বয়ান এই ঃ

সবিনয় নিবেদন

মহাশয়!

বিগত ২৩শে বৈশাখ ১৩৯২, ইং ৬ই মে উনিশশো পঁচাশি, আমি মশাগ্রাম নিবাসী শ্রীনুটুবিহারী সরকার সজ্ঞানে পরলোক গমন করি। চন্দ্রবিন্দু

নুটুবিহারী হইয়াছি। আগামী ৩১শে বৈশাখ ১৩৯২ আমার আদ্য মধ্য বরাদ্দ, ইত্যাদি যাবতীয় শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন হইবে। অতএব মহাশয়, আপনি উক্ত দিবসে মদীয় মশাগ্রাম সরকারপাড়াস্থিত প্রাক্তন গৃহে শুভাগমন করিয়া আহারাদি করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ করিবেন।

পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি 'অমার্জনীয়' হইলেও অত্র ক্ষেত্রে অবশ্যই মার্জনীয়।

ইতি—
সৌভাগ্যবান
নুটুবিহারী সরকার

গ্রাম—মশা, জেলা—বর্ধমান.
তাং ....

অপর পৃষ্ঠায় ছাপানো মেনু ঃ

১। শাকভাজা
২। ছ্যাঁচড়া
৩। মুড়ো সহযোগে ছোলার ডাল
৪। আলুপটলের দম
৫। রুইমাছের কালিয়া
৬। চিংড়ির মালাইকারি
৭। ইলিশের সর্ষে-ঝাল
৮। ভেটকির ফ্রাই
৯। কাঁচা আমের চাটনি
১০। পাঁপরভাজা
১১। দই, দরবেশ, সন্দেশ, রসগোল্লা, বোঁদে, অমৃতি, মিঠে পান।

মেনুর তলায় লেখা ঃ

অনুগ্রহ করিয়া নির্লজ্জভাবে চাহিয়া চিন্তিয়া খাইয়া, পরলোকে আগত আমার আত্মার শান্তি বিধান করিবেন।

বেদব্যাস চিঠিটা মুড়ে মুঠোয় রেখে বলে, "এই ঢালাও কারবারের খরচটি কে দেবে? ওঁর তো আর ..."

"দাদা, বললাম তো সব ব্যবস্থা নিজেই করে গেছেন। টাকা ধরে দিয়েছেন বিস্তর, আমাদের ওই সেক্রেটারির হাতে।"

"অদ্ভুদ! মাথাটাথা ঠিক ছিল বলে মনে হয় না।"

পেশা, ওর বউ কতদিন মরেছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে কী ভুল করেছে, জামাই কেন মেয়েকে নেয় না, ছোট জামাইটা জুয়াড়ি, ছেলেটা নেশা করতে পেলে আর কিছু চায় না—খুব ছেলে বয়সে একবার ও কলকাতায় গিয়েছিল কিন্তু হট্টগোলে মাথা ঠিক থাকে না বলে পালিয়ে আসতে পথ পায়নি—আবার একবার যাবে মা কালীকে দর্শন করতে ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করবার ফাঁকে ফাঁকে শুধু মাত্র দম নেবার প্রয়োজনে যখন তখনই শুধু দাঁড় বাইবার কথা মনে পড়ে ওর। সুতরাং শহরে যাবার বাস যে পাবে না তা অনিমেষ আগেই ভেবেছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় যে পড়বে তা কল্পনা করেনি। বাস তো নেই-ই, আশেপাশে কোথাও মানব বসতির চিহ্নও যেন চোখে পড়ে না।

নৌকো এসে যেখানে ভেড়ে সেখানে বাঁশের মাচা মতো একটা আছে, জাহাজঘাটা হলে অনায়াসে জেটি বলা যেত, সেই মাচাতে নেমে অসহায়ভাবে অনিমেষ একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলে! নীচের ময়ূরাক্ষীর কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। তার স্রোতের গতি থাকলেও তবু একটা প্রাণ স্পন্দন বোঝা যেত—এত মন্থর তার স্রোত, এত নিস্তরঙ্গ মনে হচ্ছে সমস্ত জলটা যেন জমাট বেঁধে স্তব্ধ হয়ে গেছে—আর তার সেই অতল কালো বুকে কত কী রহস্যময় জীব স্পন্দনহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসছে—

ওপারে ভগীরথপুর গ্রাম, বেশ সম্পন্ন গ্রাম তা সে জানে, বহু লোকের বাস, অনেক পাকা বাড়ি ইস্কুল ডাকঘর আছে কিন্তু এখান থেকে তার কিছুই দেখা যায় না। ঘাট থেকে উঠে যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে গিয়েছে তার সাদা বালির আভাস নিবিড় বনের অন্ধকারে মিশে গেছে একটুখানি গিয়েই। দু'দিকে বড় বড় গাছ—কী গাছ তা বোঝা যায় না কিন্তু তারই অসংখ্য শাখা-পল্লব সমস্ত গ্রামটাকে যেন চোখের আড়াল করে রেখেছে। আলোর রেখা পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

ও পারেই যদি এমন হয় তো এপারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এ পারে যেদিন সে এসেছিল সেদিন দিনের বেলা কোন গ্রাম ওর চোখে পড়েনি। বাসটা এসে একেবারে এই ঘাটের ধারে দাঁড়ায়, যাত্রীরা সবই ভগীরথপুরের, সেদিনও দুদিকে আম গাছের ঘন বন কাটিয়ে এসেছিল— বেশ মনে আছে। হয়ত ছিল কোথাও ঘরবাড়ি কিন্তু তা ওর চোখে পড়েনি।

পারাপারের জন্য একটা খেয়া নৌকা আছে, চওড়া ভেলার মতো প্রকাণ্ড বপু কিন্তু শেষ বাস চলে যাবার পর আর ওপার থেকে কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই জেনে সে ইজারাদারও বহুক্ষণ বাড়ি চলে গেছে নৌকোটা ওপারে বেঁধে রেখে।

"বাবু ভাড়াটা?" তাড়া লাগায় মাঝি।

বিহ্বলতা কাটে কিন্তু যেন আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে অনিমেষ।

"ভাড়াটা কিরে! এই অন্ধকার রাত্রিতে আমি এখানে কোথায় থাকব। তুই তো একঘন্টার রাস্তা সাতঘন্টায় এসে আমাকে এই বিপদে ফেললি। এখন নিদেন ওপারে পৌঁছে দে। দেখি কোথাও একটা আশ্রয় পাই কি না, এপারে এই জঙ্গলে শেষে কি বাঘের পেটে প্রাণ দেব, চল, ওপারে নিয়ে চল্"—

"উটি লারলম্ আজ্ঞা।"

"সেকি! কেন রে? কী হয়েছে?"

তার উত্তরে মাঝি যা বললে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, ওপারে অন্য নৌকো গেলে খেয়ার ইজারাদার বড্ড বকাবকি করে, পুলিশে ধরিয়ে দেয় সুতরাং ওপারে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অনিমেষ তাকে অনেক করে বোঝালে। ওপারে তোকে ধরাবার জন্য ইজারাদার যদি বসে থাকত তো অনিমেষ তাকেই ডাকত। শুধু ইজারাদার কেন জনমানবের চিহ্ন থাকলেও সে মাঝিকে এ অনুরোধ করত না। কোন মতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে যাক, "তাতে যদি কেউ তাকে ধরেও অনিমেষ তার দায়ী" ইত্যাদি সব কথার উত্তরে তার সেই একই উত্তর—"উটি লারলম্ আজ্ঞা।"

অনিমেষ তখন রাগ করে বললে, "তবে তুইও থাক আমি তোর নৌকাতেই রাত কাটাই।"

"আজ্ঞা উটিও লারল্ম।" শুধু তাই নয়, দাঁড়ের একটা ধাক্কা দিয়ে নৌকাটা খানিক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

"টাকাটা ছুঁড়ে দ্যান্ কেনে—বাড়ি চলে যাই।"

"তবে টাকাও পাবি না যা!" রাগ করে বলে অনিমেষ, কিন্তু যখন দেখে বুড়োটা সত্যি সত্যিই একটা নিশ্বাস ফেলে ঘর-মুখো হচ্ছে তখন সে একখানা একটাকার নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়েই দেয়।

"যা বেটা যা পথে ডুবে মরিস তো ঠিক হয়!" মনে মনে বলে অনিমেষ।

ব্যস্। এরপর সব পরিষ্কার। ওপারে ঘন বনের নিবিড় অন্ধকার' সামনে অতল শান্ত জলে তারই রহস্য আছে জমাট বেঁধে—আর এপারে তার চার পাশে দিরেও দৈত্যের মতো কতকগুলি গাছপালা ভয়াবহ অন্ধকার বিস্তার করে সমস্ত সভ্যতার চিহ্ন এমন কি আকাশকেও যেন আড়াল করে রেখেছে। বাস এসে দাঁড়ায় এবং ঘোরে যেখানটায় সেখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে বটে কিন্তু সে যেন আরও ভয়ঙ্কর।

সুটকেশটা মাথার উপরে পেতে সেখানেই জেঁকে বসল অনিমেষ। বাঘ

ভাল্লুক যদি সত্যিই আসে তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে—এখানেই খানিকটা তবু নিরাপদ।

খর খর ঝটপট শব্দ করে কী একটা পাখী উড়ে বসল মাথার উপরে। ভয় পেয়ে চমকে উঠল অনিমেষ। কাছেই কোথায় শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কি একটা সরীসৃপ চলে গেল বোধ হয়। সামান্য শব্দ তবু বেশ স্পষ্ট। জলের মধ্যে হঠাৎ একটা মাছ ডিগবাজী খায়। ঐটুকু আওয়াজ কিন্তু অনিমেষের মনে হল যেন বন্দুকের শব্দ হল কোথায়।

বিশ্রী লাগছে। নক্ষত্রের আলোতে যতদূর দৃষ্টি চলে বহুক্ষণ ধরে হাত ঘড়িটা দেখলে রাত ন-টা। কলকাতায় সবে সন্ধ্যা। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। এখনও দীর্ঘ সময় তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কখন ভোর হবে, তারপর কখন ইজারাদারের ঘুম ভাঙবে তবে সে একটু লোকালয়ের মুখ দেখতে পাবে। বাস একটা আসে এখানে সকাল আটটা নাগাদ—সন্ধ্যাতে যেটা এসেছে সেটা কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকে, সাতটা নাগাদ এখানে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রায় বারো ঘন্টা এখনও।

আচ্ছা, হাঁটলে কেমন হয়? বাসের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে থাকলে কি আর একটা গ্রাম পাওয়া যায় না কাছাকাছির মধ্যে? কিন্তু যদি তাকে আশ্রয় দিতে কেউ না চায়? ডাকাত বলে মনে করে? তাছাড়া দুদিকে যে ঘন বন, যদি বাঘ আসে? মুর্শিদাবাদ জেলায় এ সব অঞ্চলে প্রায় বাঘ বেরোয়।

দরকার নেই। দশ এগারো ঘন্টা সময়—এক রকম কেটেই যাবে।

"মশাই শুনছেন? বাস মিস করেছেন বুঝি? কোথাও আশ্রয় পান নি?"

অস্ফুট একটা শব্দ করে চমকে ওঠে অনিমেষ, বরং আঁতকে ওঠে বলাই ঠিক। কখন নিঃশব্দে কে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত, যেন একটা কথা শেষ হবার আগেই আর একটা শুরু হয়েছে—এইভাবে পর পর তিনটি প্রশ্ন করে আগন্তুকটিও চুপ করে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

অবশেষে মরিয়া হয়েই অনিমেষ ফিরে তাকায়।

রোগা কালো গোছের একটা মানুষ খুব বেঁটে নয়—তাই বলে ঢ্যাঙাও বলা চলে না। উসকো খুস্‌কো এক মাথা চুল ও ঘন দাড়ি কিন্তু আবক্ষ বিস্তৃত নয়। মধ্যে মধ্যে কামানো বা ছাঁটা নয়—এমনি দাড়ি, খোঁচা খোঁচা। একখানা খাটো আধ ময়লা কাপড় পরনে—কোঁচার খুট গায়ে জড়ানো। মোটা ভুরুর আড়ালে কোটরগত চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিঃশব্দে শুধু মাত্র চাউনির দ্বারাই যেন অনিমেষের সমস্ত ইতিহাস পূর্বাপর আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছিল।

"বলছিলুম যে আপনি বোধ হয় কোথাও আশ্রয় পাচ্ছেন না—না? তা হলে বরং চলুন না হয় আমার কুটিরেই—কোন মতে রাতটা কাটিয়ে দেবেন।"

হায়রে আগুল্ফ লম্বিত—কুন্তলা বনমালা শোভিতা কপালকুণ্ডলারা শুধু উপন্যাসেই দেখা দেয়।

যাক্ গে, নবকুমারের অদৃষ্ট তার নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই বলে কি ওর চেয়ে ভদ্র চেহারার কেউ জুটতে নেই। এ লোকটাকে দেখেই পাগল বলে মনে হয়—শেষ পর্যন্ত এর আশ্রয়ে গিয়ে কি আরও বিপদে পড়ব!

"কী বলেন? যাবেন নাকি?"

"আ—আপনি এখানে—মানে" আমতা আমতা করে অনিমেষ।

"আমার এখানেই একটা ঘর আছে, এই যে। " লোকটা আঙ্গুল তুলে দেখায়।

সত্যিই তো, এই তো বলতে গেলে তার সামনেই পাড়ের ওপর একখানা খড়ের ঘর...অঞ্চলে যেমন হয় তেমনি। আশ্চর্য, এতক্ষণ তার চোখে কি হয়েছিল?

লোকটি বোধ হয় তার মনের ভাব বুঝেই হেসে বললে, "ঘরে আলো ছিল না কিনা, তাই অন্ধকারে টের পাননি। আমিও বাড়ি ছিলুম না, নদীর ধার দিয়ে একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। অন্ধকারে একা একা বেড়াতে আমার বেশ লাগে।"

"এখানে বাঘের ভয় নেই?"

"আছে বৈকি। তবে আমার অত ভয় নেই!...মরবার ভয় করি না। করে লাভই বা কি বলুন, মরতে তো একদিন হবেই।"

না, লোকটাকে ঠিক পাগল বলে তো মনে হয় না!

"চলুন চলুন, ঘরে বসেই কথাবার্ত্তা হবে এখন।" লোকটা তাড়া লাগায়।

"চলুন" বলে স্যুটকেসটা তুলে নেয় অনিমেষ।

একখানা নয়—দুখানা পাশাপাশি ছোট ঘর, সামনে একফালি দাওয়া। ভেতর দিকে আরও কি আছে তা ওর নজরে পড়ল না। বেশ ঝকঝকে করে নিকানো, পরিচ্ছন্ন দাওয়া। লোকটা আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে "দাঁড়ান আলো জ্বালি" বলে ওকে দাওয়াতেই দাঁড় করিয়ে রেখে দোর খুলে ভেতরে ঢুকল। তালা চাবির বালাই নেই, দোর শুধু ভেজানোই ছিল ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আশ্চর্যরকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা আলো জ্বেলে লোকটি বললে "আসুন—ভেতরে আসুন।"

ঘরে আসবাবপত্র বেশী ছিল না। একটি তক্তাপোষের ওপর একটা মাদুর

বিছানো, শয্যা বলতে এই, একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। একপাশে একটা দড়িতে টাঙানো খান দুই কাপড়, তার মধ্যে একটা লাল—মেঝেতে জলের মেটে কলসী, একটি ঘটি, এবং পিতলের পিলসুজে একটা মাটির প্রদীপ। এছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

"বসুন বসুন। ঐ চৌকিটির ওপরেই বসুন।" তারপর খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিজের দুই হাত ঘষে কেমন একরকমের বিচিত্র হাসি হেসে বললে, "ভাল বিছানা আমার নেই। ঐ স্যুটকেসটা মাথায় দিয়েই শুতে হবে......আর খাবারও তো কিছু দিতে পারব না। আমার ঘরে কিছুই নেই......আপনি মদ খান?"

যেন একটা আকস্মিক উগ্রতা দেখা দেয় ওর প্রশ্ন করবার ভঙ্গীতে।

"না না। রক্ষে করুন। কিছু ব্যস্ত হবেন না আমার জন্যে। আশ্রয় পেয়েছি এই ঢের।"

"ঐ আশ্রয়টুকুই যা। বাঘ ভাল্লুকের হাত থেকে তো বাঁচলেন অন্তত ঃ—তা আশ্রয় ভালই। ঘরখানা মন্দ নয়, কী বলেন।"

বলতে বলতে হেসে ওঠে সে। সাদা ঝকঝকে দাঁত কালো দাড়ির ফাঁকে চক্‌চক করে।

অনিমেষের যেন ভাল লাগে না ওর ভাবভঙ্গী। আবারও সেই সন্দেহটা মনে জাগে—পাগলের পাল্লায় এসে পড়ল নাকি?

"আপনি এখানে কি করেন?"

"আপাতত কিছুই না। আচ্ছা বসুন, আমি আসি, মুখ হাত ধোবেন নাকি?"

ধুতে পারলে ভালই হ'ত কিন্তু অনিমেষের তখন নড়তে ইচ্ছে করছে না, সে বলল, —"না—দরকার নেই!"

লোকটি বেরিয়ে গেল, অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে বসেই রইল। ভাল বোধ হচ্ছে না ওর। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী করে লোকটা এখানে, এমন একাই বা থাকে কেন? ঘরে কোনরকম কিছু খাবার নেই তো ও নিজে খায় কি? চোর ডাকাত নয় তো? লোকজন ভুলিয়ে এনে শেষে—

ঈশ্বর বাঁচিয়েছে—ব্যাগে ওর খানকতক কাপড় জামা ছাড়া আর কিছুই নেই। পকেটেও মাত্র টাকা ছয়েক আছে, কিন্তু একটু পরেই সমস্ত দেহ হিম হয়ে ওর মনে পড়ে...এই সব উদ্দেশ্যে যারা নিয়ে আসে ভুলিয়ে টাকা না পেলে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মেরে ফেলেও দেখবে কী আছে। ওদের দেশে একবার খুব ডাকাতের উপদ্রব হয়েছিল, তারা একটি লোককে খুন করার পর পেয়েছিল

মাত্র একটি আধলা।

কখন গৃহস্বামী আবার নিঃশব্দে ওর কাছে দাঁড়িয়েছে অনিমেষ টেরও পায় নি, যদিও খোলা দরজার দিকে চেয়েই বসেছিল সে, আশ্চর্য!

লোকটি বললে, "এখনই শুয়ে পড়বেন নাকি? যদি ঘুম পেয়ে থাকে তো স্বতন্ত্র কথা। নইলে একটু বসি, কতদিন লোকের সঙ্গে কথা কইতে পাইনি। বলেন তো দুটো কথা কয়ে বাঁচি।—এখানে লোকজন তো নেই, আসেও না কেউ—"

অনিমেষ আবারও পূর্ব প্রশ্নের জের টানলে, "তা এমন জায়গায় আপনি থাকেনই বা কেন?"

সেই হাসি গৃহস্বামীর মুখে, তেমনি নিঃশব্দ হাসি, দাড়ির ফাঁকে শুভ্র দন্তে সেই বিজলী প্রকাশ।

"ভয় নেই, আমি চোর-ডাকাতও নই, পাগলও নই। ঘরে কিছু নেই মানে আমার কিছুর দরকার নেই, থাকারও দরকার হয় না আমার, কেন জানেন?"

তারপর—যেন কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলে ওঠে, "আমি সাধক। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।"

"সন্ন্যাসী?" অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চায় অনিমেষ।

অপ্রতিভ হয়ে লোকটি বলে, "না—সন্ন্যাসী মানে ঠিক অভিষিক্ত সন্ন্যাসী নই—তবে সাধক বটে।"

উবু হয়ে ঘরের মেঝেতে বসল লোকটা, কিছুক্ষণ মৌনভাবে থেকে বললে, "তাহলে আপনাকে বলেই ফেলি সেটা। কাউকে কখনও বলিনি, বলবার সুযোগও পাইনি বিশেষ। এই অঞ্চলের লোক আমি। বুঝলেন? ছেলেবেলা থেকেই নানা বইতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত সব ক্ষমতার কথা পড়ে ঐ দিকে মনটা ঝোঁকে। মনে হত আমিও ঐসব সাধনা করে সিদ্ধ হব, তারপর প্রাণ ভরে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য ভোগ করব—আর আমায় পায় কে।"

"হায়রে, তখন কি জানতুম যে ভোগের উদ্দেশে সাধনা করতে এলে সিদ্ধি তো দূরের কথা সমস্তই খোয়াতে হয় একে একে।"

এই পর্যন্ত বলে লোকটি চুপ করল। এতক্ষণে অনিমেষও অনেকটা সহজ হয়েছে। লোকটির ভাবভঙ্গী আর কথাবার্তায় সত্য কথা বলছে বলেই মনে হয়। দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেল ওর।

"বাড়ি আমার এ অঞ্চলে নয়। বাড়ি সেই পাঁচফুপির কাছে, এখানে কেন এলুম? বলছি দাঁড়ান। বলেছি আপনাকে ছেলেবেলা থেকেই ঐ দিকে ঝোঁক গিয়েছিল, ইস্কুলের পড়া হল না, তার বদলে যত সব ঐ ধরনের বই পড়তে

লাগলুম। পড়তে পড়তে বিশ্বাসটা খুব পাকা হয়ে গেল। কিন্তু গুরু কৈ? দু একটা সন্ন্যাসী যা' হাতের কাছে পেলুম দেখলুম সব বাজে—কেউ কিছু জানে না। অথচ পথ দেখাবে এমন লোক না পেলে এগোব কি করে? মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল। খাবার চিন্তা ছিল না। মাথার উপর বাবা, বড় ভাই ছিল, জমিজমা তারাই দেখাশুনো করত। অবশ্য আমিও বকুনি খেয়েছি ঢের, কাজকর্ম কিচ্ছু করি না বলে, কিন্তু সে সব গায়ে মাখিনি।

"তবে যত দিন যেতে লাগল মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। শেষমেষ আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের সময়ে বাড়ি থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ বুঝেছিলুম ঘরে বসে আর কিছু হবে না।....এ তীর্থ ও তীর্থ করে অনেক দেশেই ঘুরলুম। ভাল চাকরি বা বিয়ে করার অনেক সুযোগও পেয়েছিলুম; সংসার মশাই মায়ার ফাঁদ পেতে রেখে দেয় সারা জগতে—যাই হোক সেদিকে মন ছিল না বলে কেউ বাঁধতে পারলে না, এমনি ভাবে ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠেছি, তখন একদিন—বাড়ি ফেরার পথে বলতে গেলে বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ একজনকে পেয়ে গেলুম। বক্রেশ্বরের শ্মশানে এক সাধু থাকেন শুনেছি, উলঙ্গ থাকেন শ্মশানে শুয়ে, কেউ খেতে দিলে খান নইলে এমনি থাকেন। কাঁচামাংস পাতা লতা এমনকি বিষ্ঠা খেতেও তাঁর আপত্তি নেই বোধ হয়—এমন নিস্পৃহ তিনি।

"খোঁজ করে গেলুম। প্রথম তো দেখাই পাওয়া যায় না। তিন দিন ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতে দর্শন পেলুম। বিপুল দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাগলের মতো ভাবভঙ্গী—কিন্তু পাগল নন। একদিন আমার চোখের সামনে শিয়ালের দেহ ধরে বনের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলেন, কেউ আর খুঁজেই পেল না। বুঝলুম যে এতদিন ধরে যাকে খুঁজেছিলুম এতদিন পরে তাকে পেয়েছি।"

অনিমেষের মনেও ততক্ষণে গল্প জমে উঠেছে। লোকটি থামতেই সে বললে, "তারপর?"

"লোক তো পেলুম—তাকে ধরি কী করে?—কিছুতেই ধরা দেয় না। কিছু বলতে গেলে শ্মশানের পোড়া কাঠ তুলে তেড়ে আসে। একদিন খুব কান্নাকাটি করতে সব শুনলে মন দিয়ে, কিন্তু তারপর যা বকুনিটা দিলে, বললে, 'ভাল চাস তো এসব মতলব ছাড়। সাধনা করবি তুই ঐ দেড় ছটাক কাঁপা নিয়ে? তোর কাজ নয়—বুঝলি, মরবি একেবারে।

তা ছাড়া ভোগ করবার জন্য এসব কাজ যে করতে আসে তার একুল ওকুল যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের গল্প পড়িসনি? মাকে বলেছিল মা অষ্ট সিদ্ধিই

[illegible]— স্বপ্নে বলছে চাইতে। মা বললেন, কাল সকালে এর উত্তর পাবি। পরের দিন সকালে দোর খুলতেই নজরে পড়ল একটি মেয়েছেলে ঐদিকে ফিরে শৌচ করতে বসেছে—পরমহংস অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এসে ভাগ্নেকে এই মারে তো সেই মারে। বুঝলি—এমনি তুচ্ছ শুধু নয় ছোট জিনিস ওসব। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা—বিয়ে থা কর ভগবানকে ডাক, নয় তো কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিস্!' অনেক কাকুতি মিনতি করলুম বাবার আর দয়া হল না। আমি কিন্তু মশাই হাল ছাড়লুম না।.....ঐখানেই পড়ে রইলুম, বলতে গেলে না খেয়ে না দেয়ে আর গোপনে ওর দিকে নজর রাখলুম। যদি আসল প্রক্রিয়ার কিছু হদিশ পাই বুঝলেন না? এতদিন কি আর বৃথাই এ লাইনে ঘুরেছি। আসল মানুষ না পাই, ওদের ভেতরের কথা কিছু কিছু জেনেছি বৈকি! তারপর হল কি মশাই, আরও দু-একজন সাধক ভৈরবী ওখানে এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। গোপনেই এল কিন্তু আমি তো ঐখানেই পড়ে থাকি, আমাকে এড়াবে কি করে?.....ওঁদের পর পর কদিন চক্র বসল। তাও দেখলুম—মনে হল আর কি, সব শিখে গেছি....ওখান থেকে রওনা হয়ে আর বাড়ি ফিরলুম না, নির্জন স্থান অথচ শ্মশান, লোকালয় কাছে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়লুম। পথে নলহাটিতে একজন তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষাও নিয়ে এলুম।

"ও মশাই, এলুম তো এখানে, কিন্তু সাধনা আর হয় না। প্রথম দিন থেকে বিঘ্ন। উপকরণ জোটে তো দিন পাই না, দিন পাই তো উপকরণই নেই—শেষে অনেক কৌশল ক'রে অনেক নীচে নেমে যদিও বা সব যোগাড় করলুম, মঙ্গলবার অমাবস্যার রাত পেয়ে যেমন আসন ক'রে বসেছি—কি বিঘ্ন, ধ্যানে মন দেব কি, কিছুতেই মন স্থির করতে পারি না....এখন এটা বাসের রাস্তা হয়ে শ্মশান এখান থেকে সরে গেছে, আগে এখানটাতেই শ্মশান ছিল, এখন যেখানে ঘর দেখছেন, এই যেখানে আমরা বসে আছি, এইখানেই সেদিন আসন করে বসেছিলুম—

নিজের অজ্ঞাতেই অনিমেষ যেন একটু করে সরে বসে। তারপর বলে, "আচ্ছা বিঘ্ন কি রকমের? ভয় পেলেন? শুনেছি তো এ রকম সাধনায় বসলে প্রথম প্রথম নানা রকমের ভয় দেখায়—কিন্তু সেটা শুধু পরীক্ষা করার জন্যে। আপনিও তো সে রকম শুনেছিলেন নিশ্চয় তবে ভয় পেলেন কেন?"

হাসলেন লোকটা আবারও। কাউকে ছেলেমানুষী করতে দেখলে বিজ্ঞ মানুষরা যেমন হাসে কতকটা তেমনি হাসি। বললে, "জানে তো সবাই কিন্তু শোনা এক জিনিস আর অভিজ্ঞতাটা আর এক। তেমন অভিজ্ঞতা হলে বুঝতেন।...শুনবেন কেমন? মড়ার বুকের ওপর বসেছি আসন করে, মড়ার

খুলিতে করে মদ খাচ্ছি—মনে ভয় ডর কিছুই নেই, এই বিশ্বাস হয়েছিল। কিন্তু সেই লোকেরই বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল সেই সব শুনে। না, না, তেমন ভয়ানক কিছু নয়, প্রথম শুরু হল শুধু ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ, খিল খিল হাসি, চাপা হাসিই। ক্রমে সেটাই বাড়তে লাগল। মনে হল দশজন, একশজন—হাজার হাজার। আপনার চারপাশে যদি লক্ষ লোকের ফিস্ ফিস্ কথারই শব্দ হতে থাকে তো কেমন মনে হয়? আর তার সঙ্গে চাপা এক ধরনের। যদিও কাজে মন দিতে পারলুম না, এটাও ঠিক। তারপর মশাই স্পষ্ট দেখতে লাগলুম শ্মশানের মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেন মড়াগুলি উঠছে। কতকাল থেকে মরেছে সব—কত হাজার বছর ধরে। এক এক জনের বীভৎস চেহারা, রোগে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। কেউ বা খুন হয়েছিল, কেউ বা ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে প্রাণ দিয়েছে, কেউ বা গলায় দড়ির মড়া। ঠিক সেই অবস্থায় উঠেছে—তেমনি কন্দকাটা বা হাড়গোড় ভাঙ্গা অবস্থায়। সকলেরই মুখে রাগ চোখের দৃষ্টিতে আগুন! তারা সবাই আঙুল তুলে শাসাতে লাগল, পাপিষ্ঠ তুই এখানে কেন? শ্মশান অপবিত্র করতে এসেছিস। চলে যা, দূর হয়ে যা। জানিস না এখানে আমরা পাহারা দিচ্ছি? মনে পাপ নিয়ে তুই এসেছিস শ্মশান জাগাতে? চলে যা—তার মধ্যে এক জনের আবার শুধু কঙ্কাল, বোধ হয় তাকে পুঁতে রেখেছিল কোথাও মেরে—তারপর তাকে তুলে পোড়াতে হয়েছে। সেটাই সব চেয়ে কাছাকাছি এল, মুখে সেই একই শব্দ, দূর হ! দূর হ! ভয় পেলুম খুব, তবু জানি একবার ভয় পেলেই গেল—চিরকালের মতো। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম, যাব না, উঠব না আমি। ব্যস—আর যায় কোথা সেই কঙ্কালটা আরও এগিয়ে এসে তার সেই অস্থিময় আঙ্গুল কটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরল। ওঃ সে কী চাপ, যেন মোটা লোহার সাঁড়াশী। কত চেষ্টা করলুম মুক্ত হবার কিন্তু সে বজ্রকঠিন মুষ্টি খোলে কার সাধ্য। দম বন্ধ হয়ে গেল, বুকে সে এক অসহ্য যন্ত্রণা—মনে হল যেন দেহের প্রতিটি শিরা ফেটে যাচ্ছে। আকুলি বিকুলি করতে লাগলুম এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে—সে হাওয়া চারিদিকেই রয়েছে, তবু এক বিন্দু বুকের মধ্যে নিতে পারলুম না, বরং আরও চেপে বসতে লাগল সেই সাঁড়াশীর মতো আঙ্গুলগুলি।'...

"তারপর?" রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করে অনিমেষ। 'তারপর?'

আবার সেই হাসি, "তারপর আর কি, মুক্তি, সেই থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানেই, কাজ নেই কামাইও নেই। জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারছি না। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় কথা কইবার লোক নেই বলেই—"

—"কি—কিন্তু" কথা কইতে গিয়েও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে অনিমেষের

যেন গলা কেঁপে যায়, "আপনি মুক্তি পেলেন কি করে?"

"তা আমি জানি না। এক সময় দেখলুম যে, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমারই ভূতপূর্ব আশ্রয় অর্থাৎ দেহটার পাশে। যারা এসেছিল তাদেরও তো কাজ শেষ, তারাও সব যে যার মিলিয়ে গেছে। এক সময় সব কিছুর শান্তি।"

তবু বুঝতে কয়েক মিনিট দেরী লাগে অনিমেষের, কথা কইতে গিয়েও গলার স্বর ভারী হয়ে যায়, 'তার—তার মানে কি? আপনি কি বলতে চান যে আপনি তখন মারা গেলেন? আ-আপনি কি মড়া?"

প্রশ্নের শেষ অংশটা আকস্মিক আর্তনাদের মতো চিৎকারে পরিসমাপ্ত হয়, কিন্তু সে প্রশ্ন করছে কাকে? কেউ তো নেই। শুধু সে একা বসে আছে ঘরে, বাকী জিনিসগুলি ঠিক আছে, পিদিমটা তেমনি জ্বলছে। শুধু উবু হয়ে বসে যে লোকটা কথা বলছিল সে আর নেই—

কোথা দিয়ে গেল লোকটা, কখন উঠে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে।

বার বার এই ব্যাকুল প্রশ্ন ওর মনে উঠতে লাগল কিন্তু উত্তর দেবে কে! খানিক পরে আসল প্রশ্নটা আবার প্রবল হয়ে উঠল, তাহলে কি লোকটা যা বলে গেল তাই সত্যি, ও লোকটা মানুষ নয়—অশরীরী, বিদেহী আত্মা! খাবার কিছু লাগে না ওর—বলেছিল বটে। মরবার ভয় নেই।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অনিমেষের কিন্তু সে শিক্ষিত ছেলে, বিজ্ঞান পড়া ছেলে। এ সব মিথ্যা—কল্পনা, আত্মসম্মোহন বলেই জানে। সে বিশ্বাস করত না এ কথা, যে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসে সে ভূত দেখেছে।

আচ্ছা, ছায়া পড়েছিল কি ওর? মনে করবার চেষ্টা করে অনিমেষ।

সত্যই কি— ? না, লোকটা তার সঙ্গে তামাশা করছিল? আগে যা ভেবেছিল তাই। ডাকাত বা ঠ্যাঙ্গাড়ে জাতীয়—ভয় দেখিয়ে গেল এরপর কাজ হাসিল করা সোজা হবে ভেবে?

মনকে প্রবোধ দেয় সে, এইটে হওয়াই সম্ভব। ভূত হলে আলোয় থাকবে কি করে?—বদমাইস। আরও বেশী ভয় দেখাবার জন্যে ম্যাজিকওয়ালাদের মতো চোখের নিমেষে সরে গেছে।

—দোরটা বন্ধ করে দেবে না কি?

—দেওয়াই উচিত।

—পালাবে?

—কোথায় যাবে এই অন্ধকারে। আরও তো ওদের কবলে গিয়ে পড়তে হবে! সে দেখতে পাবে না ওদের, ওরা দেখবে। তার চেয়ে দোর বন্ধ করে বসে

থাকা মন্দ নয়—যা হবার হবে, আলো তো থাকবে এখানে লোকগুলিকে চোখে দেখা যাবে।

অনিমেষ অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। হাতে পায়ে যেন জোর নেই। কোনমতে উঠে গিয়ে সন্তর্পণে দোরটা বন্ধ করে দিল। ভাগ্যিস ভিতরে খিল আছে। বেশ মজবুত খিল। দেখে শুনে ভাল করে বন্ধ করে দিলে। যাক নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এ কী?

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল! মুহূর্তের মধ্যে কোনরকম নোটিশ না দিয়েই ঘরটা, তার চার পাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল। তেল ছিল না? কিন্তু তা হলে তো একটু একটু করে ম্লান হয়ে আসবে।

তবে—ভয়ে ওর গা-টা হিম হয়ে গেল, তবে কি ঘরের মধ্যে কেউ ছিল? এখন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে? সেই লোকটাই কি? হয়ত তক্তাপোশের নীচে ঢুকে গিয়েছিল তখন, সেইখানেই লুকিয়েছিল, তাই সে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করে নি। নিশ্চয় তাই।

কী সর্বনাশ! এ যে হিতে বিপরীত হল। ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে একেবারে ওদের মুঠোর মধ্যেই এসে পড়ল। পকেটে দেশলাই পর্যন্ত নেই। ব্যাগটাই বা কোথায়? চৌকিটা যে ঠিক কোন্ দিকে। তার মনে পড়ছে না।

উঃ কী বদমাইস্ লোকটা!

ক্রুদ্ধস্বরে, হয়ত বা একটু ভীত কণ্ঠেই অনিমেষ বলে উঠল, "কে? কে ওখানে? আলো জ্বালা বলছি শিগগির; নইলে ভাল হবে না, দেখিয়ে দেব মজা। কে? জ্বাললে না?"

নিস্তব্ধ চারিদিক! কোথাও একটা জনপ্রাণী আছে বলে মনে পড়ে না। রহস্যময় সুগম্ভীর স্তব্ধতা।

ঘরে কি জানালা ছিল? তাও তো মনে পড়ছে না ছাই।

জানালা খুলে দিলে তবু একটু নক্ষত্রের আলো আসে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেও জানলা কোন্ দিকে মনে পড়ল না। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গেলেই তো দেওয়াল, হাতড়িয়ে দেখতে দোষ কি!

পরক্ষণেই মনে পড়ল, আরে! আচ্ছা বোকা তো সে, দরজা রয়েছে খুলে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়। ঘরের অন্ধকারের চেয়ে বরং বাইরের অন্ধকার ভালো, নক্ষত্রের আলো আছে? থাকগে, প্রাণ তো বাঁচুক।

যেদিকে দোর দিয়েছে এইমাত্র, সেই দিকেই হাত বাড়াল। কৈ সে দরজা? ও তো দরজা সবে বন্ধ করে এ পাশ ফিরেছে আর আলো নিভেছে।

তবে কি দিক ভুল করেছে? এদিকে দরজা ছিল না?

আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে যায় সে। এইটুকু ত'ঘর, দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে ঘুরলেই দরজা পাবে। শুধু ভয় হচ্ছে, ও লোকটা না এই সুযোগে পেছন থেকে মেরে বসে। কিন্তু উপায়ই বা কি? এদের কবলে যখন এসে পড়েইছি।

মরিয়া হয়েই এগোয় অনিমেষ। এক পা এক পা করে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোয়।...এক দুই...একি, এ যে কুড়ি পা হয়ে গেল ঘরটা যতদূর আন্দাজ হয় দশ-বারো ফুটের বেশী হবে না লম্বায়। নেহাৎই ছোট ঘর। অথচ কুড়ি পা মানে অন্তত পনের ফুট।

আরও দুপা...আরও দশ—আরও কুড়ি।

একি সে মাঠে চলেছে না কি?

কী রকম হল! চল্লিশ পা চলার মতো ঘর তো নয়। কোণাকুণি হাঁটছে। তাতেই বা এতদূর হবে কেমন করে? তবু আরও কয়েক পা যায় সে। হয়ত চলতে চলতে কখন গতি বেঁকে গিয়েছে। সোজা হয়ে হাঁটে আরও খানিকটা।

না, তবু দেওয়াল নেই। রহস্যময় অন্ধকার, অনন্তশূন্যতা বাইরের মুক্ত শূন্যতা নয়, চার দেওয়াল চাপা—তবু তা অনন্ত।

এইবার কপালে ঘাম দেখা দেয় অনিমেষের। এতক্ষণ ডাকাতের ভয়ে যা হয়নি এইবার তাই হল, পা দুটো কাঁপতে লাগল সর সর করে।...একেবারে যেন ভেঙে গেল। অসহায় ভাবে সেইখানেই বসে পড়ল।

এ তার কী হল! কী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ল সে?

তবে কি সে লোকটা অশরীরী—সত্যি-সত্যিই? সে কি তাহলে কোন প্রেতযোনির মায়াতে এসে পড়েছে?

বিহ্বল হয়ে ভাবে অনিমেষ কি করবে কিন্তু কোন পথ দেখতে পায় না।

ঐ যে কারা আসছে না? হ্যাঁ, ঐ তো কত লোকের পায়ের আওয়াজ। অন্তত আট-দশ জনের কম নয়। কিংবা আরো বেশী। এই বাড়ীর কাছেই আসছে, ঐ দাওয়ায় উঠল।

"ও মশাই শুনছেন? ও মশাই—"

গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। টাক্‌রা শুকিয়ে গিয়েছে। গলা কাঠ।

কিন্তু ওরাই যদি ডাকাতের দল হয়, তা হোক্ তবু তো তারা মানুষ। ভয় হয় একটু অনিমেষের তাহলে অন্তত এটা প্রেতের নয়। আঃ—বাঁচা গেল।

হ্যাঁ, ডাকাতই।

নইলে ওরা অমন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে কেন? বহু লোক যেন

পরস্পরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে? আরও, লোক বাড়ছে। আরও পায়ের শব্দ, বহু ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার আওয়াজ—

একি—ওরা কি ঘরে ঢুকেছে না কি? কেমন করে ঢুকল?

ওর চারিদিকে শব্দগুলো এগিয়ে আসছে। ওর চার পাশে, খুব কাছে। খিল খিল করে চাপা হাসির শব্দ—অনেকে হাসছে তবু শব্দটা খুব জোর নয়।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরফ নেমে যায় দেহের মধ্যে। হাতে পায়ে আর কোন সাড় থাকে না। আতঙ্ক যে এমন জিনিস তা আগে অনিমেষ কল্পনাও করে নি। মস্তিষ্ক সুদ্ধ যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে।

চীৎকার করবে? সাধ্য নেই। পালাবে? পথ কৈ? কিন্তু কিছুতো একটা করা উচিত।

লোকগুলো যেন ওকে ঘিরে ধরেছে। তাদের নিঃশ্বাস, দূষিত তীব্র, উষ্ণ নিঃশ্বাস ওর সর্বাঙ্গে......

মনে পড়ে গেল লোকটার বর্ণনা। সেও তো এমনি ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনেছিল, এমনি হাসি। তারপর? সেই মৃতের পুনরুত্থান, সেই কঙ্কালের অভিযান।

তারও অদৃষ্টে কি তাই হবে? সে তো কোন দোষ করেনি। সে তো সাধনা করতে আসেনি শবের বুকের ওপর চড়ে?

অকস্মাৎ কে একজন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল তারই আশেপাশে কোথাও। তীক্ষ্ণ চড়া গলায় সে হাসি মনে হল যেন তার চারপাশের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, আবার চারিদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে তারই চারিদিকে। বহুক্ষণ ধরে যেন সেই হাসির শব্দ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তাকে ঘিরে। বিশ্রী, তীক্ষ্ণ একটা উপহাসের হাসি—সে হাসির জাল যেন তাকে চারদিক থেকে বেড়ে ধরেছে, আর নিস্তার নেই।

প্রাণপণ চেষ্টায় চীৎকার করে উঠল একবার অনিমেষ—"হে ভগবান, এ কী করলে!"

সত্যিই তো! ভগবানের কথা তো তার মনে ছিল না। তাঁকে তো সে ডাকে নি।

"হে ভগবান, হে হরি বাঁচাও—হে রামচন্দ্র!" আর কিছু মনে এল না তার। গায়ত্রী মনে আছে কি? হ্যাঁ আছে। পৈতেটা কোথায়?

সুগভীর ক্লান্তি আর অসম্ভব তন্দ্রায় সমস্ত চৈতন্য শিথিল হয়ে আসে ওর।

সহচর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গী ভদ্রলোক হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সামনের একখানা ছয় বার্থের সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করেছেন তাঁরই পরিচিত একদল এবং তাদের বার্থ খালি যাচ্ছে একখানা। খবরটা সংগ্রহ হতে-না-হতে হৈ-হৈ করে তিনি মালপত্র টেনে নামালেন। যাওয়ার সময় একগাল হেসে বলে গেলেন, "ভালোই হল মশাই আপনার। এখন আপনি একচ্ছত্র। বেশ সম্রাটের মতো ঘুমিয়ে যেতে পারবেন।"

'সম্রাট', 'একচ্ছত্র'—এ-সব ভালো কথা শোনবার আগেই আমি অনুমান করেছিলুম, বাইরের কার্ডে যার নাম ছিল, তিনি এ কালের একজন দিক্‌পাল সাহিত্যিক। আমি তাঁকে অবশ্য কখনও দেখিনি; কিন্তু তাঁর ছবির সঙ্গে এ

ভদ্রলোকের চেহারারও সাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট। তাই একখানা 'কুপে'তে ওপরের বার্থে এমন একজন ভয়ঙ্কর বিখ্যাত সঙ্গীকে নিয়ে ট্রেন যাত্রার কল্পনার রীতিমতো শঙ্কিত ছিলুম আমি।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিক—দুটোকেই আমি নিদারুণ ভয় করি। আমি কাজ করি স্ট্যাটিসটিক্‌সে এবং এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই সংখ্যাতত্ত্বের কাছে রসতত্ত্বের স্বাদ অত্যন্ত জোলো বলে মনে হয় আমার কাছে। সারা ভারতবর্ষে বছরে কোন্ ভাষার কত বই ছাপা হয় তার হিসেব মোটামুটি একটা দিতে পারি, কিন্তু উর্ধ্বে লোকবিহারী সাহিত্যিক মহারথীটি যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কী কী বই আমি পড়েছি—তাহলেই গেছি। মানসাঙ্কে ফেল করা ছাত্রের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া নাস্ত্যেব গতিরন্যথাঃ।

কাজেই তিনি নেমে যেতে বেশ খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলুম—সন্দেহ কী! বেশ নিজের মতো বিছানা পেতে নিলুম—গুছিয়ে নিলুম জিনিসপত্র। তারপর আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে মুখাগ্নি করলুম সিগারেটে।

হাওড়া থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ল—সেই স্বস্তির আমেজে তখনও ভরপুর হয়ে আছি। পর পর উল্কাবেগে যখন কয়েকটা স্টেশন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল, তখনও। কিন্তু আলো নিভিয়ে শোওয়ার উপক্রম করতেই কি রকম একটা অদ্ভুত অশান্তি আমাকে পেয়ে বসল।

হঠাৎ মনে হতে লাগল, আমি একা। শুধু এই ছোট কামরাটুকুর ভেতরেই নয়—এই বিরাট ট্রেনটাতে আমি একা ছাড়া আর কোথাও কোন যাত্রীই নেই। একটা অতিকায় ভূতুড়ে গাড়ি আমাকে নিয়ে একরাশ অজানা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে আমি জানি না, হয়তো গাড়িটারও সে-কথা জানা নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি উঠে বসলুম, আলো জ্বেলে দিলুম। আর তীক্ষ্ণ তীব্র আলোর একটা ঝাপটা চোখে এসে লাগবার সঙ্গে-সঙ্গেই অস্বস্তির ঘোরটা কেটে গেল। সত্যি কথা বলতে গেলে, হাসিই পেল আমার। সাহিত্যিকের সঙ্গগুণ আছে বটে। ভদ্রলোক আমার সহযাত্রী না হতেই তাঁর ব্যাধি এসে আমাকে ছুঁয়েছে—সঙ্গে থাকলে আর রক্ষা ছিল না দেখা যাচ্ছে। কী করে যে এসব উদ্ভট কল্পনা মাথায় এল—আশ্চর্য!

একগ্লাস জল খেয়ে, একটা আলো জ্বেলে রেখে শুয়ে পড়লুম আবার।

কিন্তু চোখের কাছে আলো জ্বললে আমার কিছুতেই ঘুম আসে না। বিরক্ত হয়ে আমি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। অথচ আলো নিবিয়ে দিতেও সাহস হচ্ছে না—পাছে আবার এই সমস্ত এলোমেলো ভূতুড়ে ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে। চোখের পাতা দুটোকে যথাসাধ্য চেপে ধরে প্রাণপণে ঘুমের সাধনা করলুম।

সেও মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। তার পরেই একটা নতুন ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল। বড় বেশী অস্বাভাবিক স্পীডে? যতগুলো রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্টের খবর জানি একটার পর একটা মনে পড়ে যেতে লাগল সেসব। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অন্ধের মতো ছুটছে ট্রেনটা—পার হয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত গ্রাম, শূন্য প্রান্তর, কালো জঙ্গল, নদীর পুল। এই নির্জন নিশীথ যাত্রা যেন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কে বলতে পারে কোথায় আলগা হয়ে আছে একটা ফিস প্লেট, কোথায় ব্রীজের পিলারে ধরেছে ফাটল! মুহূর্তের ভেতরে লাইন থেকে ছিটকে পড়ে যেতে পারে ট্রেনটা, তারপর—

আবার আমি নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। কী আশ্চর্য—কেন এ সমস্ত অবান্তর অর্থহীন ভাবনা আমার! প্রতিদিন, প্রতিরাত এমনি অসংখ্য ট্রেন সারা ভারতবর্ষময় ছুটে বেড়াচ্ছে, তাদের কখানাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়? দুর্ঘটনা ঘটার ভয় আমার যত বেশী, তার চাইতেও বেশী রেল কোম্পানীর—যারা এই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের। কম করেও তিন-চারশো মানুষের প্রাণের দায়িত্ব যাদের হাতে, এ সব ভাবনা আমার চাইতে ঢের বেশীই ভাবছে তারা।

আমি আবার উঠে পড়লুম। 'টয়লেটে' ঢুকে মাথায় চোখে ঠাণ্ডা জল দিলুম খানিকটা। একা গাড়িতে এভাবে চলবার অভিজ্ঞতা জীবনে আমার প্রথম নয়—যার জন্যে এই সমস্ত ছেলেমানুষী দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসবে! কোন কারণে মাথা গরম হয়ে গেছে, তাই এই কাণ্ড।

দুটো পাখারই রেগুলেটার পুরো ঠেলে দিয়ে গাড়ি অন্ধকার করে আবার শুয়ে পড়লুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই অদ্ভুত ভয়টা যেন বুকের ওপরে এসে চেপে বসতে লাগল। মনে হতে লাগল, কোথায় কী যেন ঘটতে চলেছে—কী একটা নিশ্চয় ঘটবে। আজ হোক কাল হোক—এই গাড়িতে হোক আর পরে হোক। আরো মনে হতে লাগল, এই গাড়িতে এখন আর আমি একা নেই, আমার সঙ্গে আর কেউ—অথবা আর কিছু একটা চলেছে। আমার এই বার্থটার নীচেই সে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। একবার মাথা নামিয়ে নীচের দিকে তাকালেই আরো দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আমি দেখতে পাব।

কিন্তু এইবারে আমি নিজের ওপরে চটে উঠলুম। পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি আমি! কোন কারণ নেই—কোন অর্থ নেই, তবু পৃথিবীর যত অবাস্তব উদ্ভট কল্পনা আমাকে পেয়ে বসেছে! হালে কতকগুলি বিলিতী ভূতের গল্প পড়েছিলুম, হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া এ সব।

এই অদ্ভুত অস্বস্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে এবার আমি মনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলুম দস্তুরমতো। প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলুম সংখ্যা-তত্ত্বের

কতকগুলি জটিল সমস্যা—যা ভেড়া গোনবার চাইতেও কার্যকরী। তারপর প্রায় আরো এক ঘণ্টা পরে—গাড়ি খড়্গপুর ছাড়িয়ে গেল, আমার চোখে ঘুম নেমে এল।

কিন্তু কে জানত—জেগে থাকার চাইতেও আরও বীভৎস হয়ে উঠবে ঘুমটা! মনের সমস্ত সরীসৃপ ভাবনা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ঘুমের ভেতরে! আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।

অদ্ভুত কুৎসিত সে স্বপ্ন। পরিষ্কার দেখলুম একটা ন্যাড়া নগ্ন পাহাড় আমার সামনে। তার কোথাও একটা গাছপালা নেই—এক গুচ্ছ ঘাস পর্যন্তও নয়। কলকাতার চিড়িয়াখানার অতিকায় কচ্ছপগুলোর মতো বড়ো বড়ো পাথরে ছেয়ে আছে তার সর্বাঙ্গ। চারিদিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। শুধু পাহাড়টার মাথার ওপর পড়ন্ত' বেলার খানিক রক্ত-রৌদ্র কারো নিষ্ঠুর ভ্রূকুটির মতো জ্বলছে। আর সেখানে—সেই অশুভ রাঙা আলোয় ডানা মুড়ে বসে আছে একটি মাত্র শকুন, যেন অপেক্ষা করে আছে কালপুরুষের মতো।

কিন্তু ওইখানেই শেষ নয়। আরো ছিল তারপর। আমি দেখলুম, সেই পড়ন্ত আলোয়, সেই ভয়ঙ্কর নগ্নতার ভেতরে—শকুনের সেই ক্ষুধার্ত চোখের নীচে চারজন মানুষ একটা মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে জানি না—তাদের চারজনের চোখে-মুখেই একটা বিবর্ণ ক্লান্তি। আর—আর সেই শববাহকদের মধ্যে আমি একজন।

চীৎকার করে আমি জেগে উঠলুম। আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম পড়ছে। চলন্ত ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে বেজে উঠছে আমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ।

আলো জ্বেলে দিয়ে উঠে বসলুম এবার। না—আর ঘুমোব না। যে কোন কারণেই হোক—আমার মধ্যে কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম—রাত প্রায় তিনটের কাছাকাছি। ঐ সময়টুকু না হয় আলো জ্বেলে বসেই থাকব।

এতক্ষণে আমার মনে অনুতাপ হতে লাগল। সাহিত্যিক ভদ্রলোককে ধরেই রাখা উচিত ছিল আমার গাড়িতে।

এই দুঃস্বপ্নের চাইতে সাহিত্যচর্চাও নেহাৎ মন্দ ছিল না।

হেলান দিয়ে বসে বসে আবার সংখ্যাতত্ত্ব ভাবতে শুরু করলুম। কিন্তু এতক্ষণে সত্যিই ঘুম আমাকে পেয়ে বসেছে। বসে থাকতে থাকতে আবার আমার চোখ জড়িয়ে এল।

এবং—

এবং একটু পরেই সেই কুৎসিত স্বপ্নটার পুনরাবৃত্তি। সেই পাহাড় সেই পড়ন্ত রোদ—সেই শকুন। আর তেমনি একটা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আমরা চারজন শবযাত্রী!

এবার চীৎকার নয়—আর্তনাদ করে সোজা হয়ে বসলুম আমি। আর পাশের জানলার ভিতর দিয়ে যদি ভোরের ফিকে আভাস দেখা না যেত—তা হলে হয়তো চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দিতুম, নয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তুম দরজা দিয়ে।

উঠে সমস্ত জানলাগুলো খুলে দিলুম। সূর্য ওঠেনি এখনো—বাইরের গাছপালা, মাঠ আর পাহাড়ের ওপরে শুভ্র ধূসর ব্রাহ্মমুহূর্ত। একরাশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে শরীরে—আমি গ্রাহ্য করলুম না। বিদেশী কবির ভাষায় শুধু আমার প্রাণভরে বলতে ইচ্ছে করছে ঃ

"Hail Holy light—"

বেলা আটটার সময় পৌঁছুলুম গন্তব্য স্টেশনে। ভূতুড়ে গাড়িটা থেকে নেমে যেন মুক্তিস্নান হল।

স্টেশনে এক্কা ছিল—মামাই পাঠিয়েছেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই আট মাইল রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

মামা ব্যাচেলার মানুষ। একটু পাগলাটে ধরনের। প্রথম জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন, তারপর এখানে এসে ডাক্তারী শুরু করেছেন। একেবারে পাণ্ডববর্জিত গ্রাম-অঞ্চল। কয়েক বাক্স হোমিওপ্যাথি ওষুধের জোরেই এখানে ধন্বন্তরি হয়ে বসেছেন তিনি।

পাহাড়, শালবন, একটি ছোট নদী আর কয়েক ঘর দেহাতী মানুষের ভেতরে মামার লাল টালির ছোট্ট বাড়িটি অত্যন্ত মনোরম। জায়গাটার কাব্যসৌন্দর্য আমি ঠিক বর্ণনা করতে পারব না—সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোক থাকলে তিনিই সেটা ভালভাবে করতে পারতেন। মোটের ওপর আমার ধারণা—কলকাতা থেকে যারা কিছুদিনের জন্য পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায় এবং সেই অজ্ঞাবাসের সময়ে শহরের কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা না হলেই যারা স্বস্তি বোধ করে, এ জায়গা তাদের পক্ষে আদর্শ।

অনেকটা আগ বাড়িয়েই মামা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর রগের দু'পাশে দু'গোছা পাকা চুল ঝকঝক করছিল সকালের রোদে।

কিন্তু তার চাইতেও ঝকঝকে হাসি হাসলেন, মামা, 'আয়—আয়! পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?

'অসুবিধে!' আমি ম্লান হাসলুম উত্তরে। সারারাত ট্রেনের সেই দুঃস্বপ্নটা আবার আমার নতুন করে মনে পড়ে গেল।

কিন্তু একটু পরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করে জ্বালা-ধরা চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল সব, তখন চামচেতে মুরগীর ডিমের পোচ তুলতে তুলতে আমি মামাকে স্বপ্নটা বললুম। শুনে মামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

"আসবার আগে মাংস-টাংস খেয়েছিলি বোধ হয়?"

"তা খেয়েছিলুম। একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল।"

"তাই এই কাণ্ড। পেট গরম হলেই লোকে ওসব খেয়াল দেখে। রান্নার তো দেরি আছে— ব্রেকফাস্টটা ভালো করে সেরে নিয়ে ঘণ্টা তিনেক নিশ্চিন্তে ঘুমো। আমি ততক্ষণে গ্রাম থেকে একটা রোগী দেখবার পাট সেরে আসি।"

ব্রেকফাস্ট চুকে যাওয়ার পরে মামার ডাক্তারী ব্যাখ্যাটাকে হৃদয়ঙ্গম করে সমস্ত মনটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। তারপর ক্যাম্বিসের খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিতেই আবার ঘুমের পালা। এবার নিঃস্বপ্ন এবং নিশ্ছিদ্র।

ঘুম ভাঙল চাকরটার বিকট কান্নায়।

ছুটে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। মামাকে একদল মানুষ বয়ে আনছে কম্পাউণ্ডের মধ্যে। তাদের চোখে-মুখে শোক আর বেদনার ছাপ। হাউ হাউ করে কাঁদছে চাকরটা।

"কী হয়েছে? কী হয়েছে?" বুকফাটা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিলুম আমি।

কিন্তু উত্তরের দরকার ছিল না—আমার মন তা আগেই টের পেয়ে গেছে। তবু কে জানত মামার হার্টের অবস্থা এত খারাপ ছিল! মাইল চারেক দূরে পাহাড়ী রাস্তায় ওঠবার সময় ঘোড়া থেকে তিনি পড়ে যান। যারা কাছে ছিল, তারা বললে, ঘোড়া থেকে পড়ে তিনি মারা যাননি—পড়বার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কাঁদবার মতো শক্তি আমার ছিল না।

এসে যখন পড়েছি, তখন শোকে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা আমার চলে না। আট মাইল দূরের পোস্ট অফিসে দরকারী টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে—সব ঠিক করে, যখন মড়া নিয়ে বেরুলুম—তখন বেলা নেমে এসেছে।

আড়ষ্ট ক্লান্ত পায়ে চলেছি। প্রায় মাইল দেড়েক দূরে শ্মশান।

কিন্তু একি—একি! এখানে সেই ন্যাড়া পাহাড়টা এল কোত্থেকে? কোথা থেকে তার ধারালো চুড়োটার ওপরে অমন করে পড়েছে শেষ বেলার হিংস্র আরক্তিমে আলো—কোথা থেকে একটা শকুন এসে সেখানে ডানা মেলে বসেছে কালপুরুষের মতো?

সব এক—সেই স্বপ্নের সঙ্গে সব এক। আমার চারিদিকে সেই অবিশ্বাস্য শূন্যতার সেই প্রেতপাণ্ডুর বিস্তৃতি।

অমানুষিক ভয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম—কে যেন আমার পা দুটোকে টানতে লাগল পাথুরে মাটির তলায়। সারারাত ট্রেনে আমাকে অমন করে ভয় দেখালে কে? আমার বার্থের তলায় গুঁড়ি মেরে যে বসেছিল—কে সে?

সে কি মৃত্যু? আমার সঙ্গে—আমার সহচর হয়ে এসেছে সে?

অদ্ভুতুরে ভূতুড়ে সভা

কুমারেশ ঘোষ

সেদিন অমাবস্যার রাত।

চারধারে ঘুটঘুটি অন্ধকার। এক হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না।

গাঁয়ের শ্মশানটার চারপাশের বট, অশত্থ, শ্যাওড়া গাছগুলো এক পায়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে অন্ধকার যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মাঝে মাঝে শেয়াল শকুনদের পিলে চমকানো আওয়াজ, অনেকটা মড়া-কান্নার মতই।

আজ এখানে ভূত পেত্নী শাকচুন্নীদের সভা। গেছো ভূত, মামদো ভূত, গাছভূতেরাও এসেছে। কেউ তাল গাছ থেকে সড় সড় করে নেমে, কেউ বা কবরের মাটি ফুঁড়ে এসেছে।

সব ভূতেরা মিছিল করে এখানে এই শ্মশানে জমায়েত হয়েছে। মিছিলে ভূত পেত্নীরা তাদের কঙ্কাল হাত মুঠি করে শ্লোগান ছাড়ছে, অবশ্যই নাকি সুরে। আঁমাদের দাঁবি মাঁনতে হঁবে। নঁইলে ঘাঁড় মঁটকে খাঁব। গোভূতরা সামনে শিং নেড়েছে আর মামদো ভূতরা দাড়ি নেড়েছে। অনেকের হাতেই ছিল কালো পতাকা। অনেকে শিঙে ফুঁকিয়েছেও। অনেক পেত্নী আর শাকচুন্নীরা পটল ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাবার সময় পটপট করে অনেক পটল তুলে নিজেদের কোঁচড়ে ভরেছে। বাড়িতে গিয়ে পটল ভাজা, পটল চচ্চড়ি করে খাবে।

সব ভূত-পেত্নীরা শ্মশানে সভায় এসে বসবার পরই একটা বিরাট খট্ খট্-খটাং করে আওয়াজ হল। এই অদ্ভুত আওয়াজে সব ভূত পেত্নীরা তটস্থ হয়ে উঠল।

শ্মশানের পাশেই বড় শ্যাওড়া গাছটা থেকে খড়ম পায়ে খটাং করে নামল ব্রহ্মদত্যি। কালো কঙ্কালের গলায় সাদা পৈতেটা ধব ধব করছে। মাথায় চকচকে টাক, চোখ দুটো যেন চার ব্যাটারীর টর্চ, জ্বল জ্বল করছে। সভাটা ঝলসে উঠল।

শ্মশানের চিতার আধপোড়া কাঠ দিয়ে সভাপতি ব্রহ্মদত্যির জন্যে বেদী সাজানোই ছিল। সামনে রাখা আছে একটা মড়ার খুলি, ফুলদানী। তাতে সাজানো ছোট ছোট ঝাউ গাছের ডাল।

ব্রহ্মদত্যি বেদীতে পায়ের উপর পা রেখে বসল।

শ্মশানে এদিক ওদিক অনেক শুকনো মালা পড়েছিল, একটা ক্ষুদে পেত্নী তা তুলে নিয়ে ব্রহ্মদত্যির গলায় পরিয়ে দিল। সভাপতি বরণ হল। ভূত পেত্নীরা সব হাড়-হাতে হাততালি দিল।

সভাপতি ব্রহ্মদত্যি বলল, হে ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, প্রথম সারির পাঁচজন আপনাদের অভিযোগ পেশ করুন। পাঁচজনে বললেই যথেষ্ট। কারণ পাঁচজনে যা বলে, তাই সত্যি বলে মেনে নেওয়াই নিয়ম।

(এখানে বলে রাখি, কথাগুলিতে চন্দ্রবিন্দু যোগ করে নাকি সুরেই বলল সভাপতি এবং অভিযোগ জানানো হল নাকি সুরেই। ছাপার অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু টাইপ কম পড়তে পারে, তাই বাদ দেওয়া হল।)

মামদো ভূত দাড়ি নেড়ে বলল, আর কবরের জন্যে জমি পাওয়া যাচ্ছে না। জমির দাম খুব বেড়ে গেছে। তাই কবরখানা পর্যন্ত বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। এর বিহিত করুন।

গেছো ভূত বলল, সব গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে শহর করবার জন্যে। থাকি কোথায়?

মেছোতে বলল, আমাদের কোল্ড-স্টোরেজে রাখা হচ্ছে, শীতে হাড় কাঁপুনি-কাঁপতে হয়। একবার মরেও আবার মরে যাবার জোগাড়।

গোভূত বলল, আমাদের হাড় চামড়া শিং দিয়ে নানা জিনিস তৈরী করছে, বাঁচ থাকতে দুধটুকু নিংড়ে বার করেছে, জল মিশিয়ে লাভ করেছে। অথচ যত্ন করে না, বরং বদনাম করে, দুধ দিই না কেবল খাই।

পেত্নী উঠে বলল, গৃহবধূদের হত্যা বন্ধ করতে হবে। হত্যার শোধ নিতে হবে দাসী শাশুড়ীর ঘাড় মটকাতে দিতে হবে।

পেত্নী বলতেই একটা শাকচুন্নী উঠে দাঁড়াল। সভাপতি সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল —আর নয়। পাঁচজন হয়ে গেছে।

শাকচুন্নী বলল, তা হোক। আমার অভিযোগও শুনতে হবে। ঐ মুখপুড়ি পেত্নীটার কথা শুনলেন যখন আমার কথাও শুনতে হবে। আমি বিধবা মানুষ মাছ খাইনে, শাক ভাত খাই। কিন্তু শাকের ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া পুঁতে রাখা হয়। সেটা দেখলেই ভয় করে। ভূতের চাইতেও দেখতে বিশ্রী। কাকতাড়ুয়া হটাতে হবে।

শাকচুন্নী বসতেই পেছনে থেকে লাফিয়ে উঠল পেঁচোভূত। হাত উঁচিয়ে বলল, স্যার স্যার আমার কমপ্লেন আছে।

শুনেই চমকে উঠল ব্রহ্মদত্যি—কমপ্লান? না, না এসব চলবে না। ও-তো নাকি পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের শত্রু। আমাদের কাছে না আসতে দেবার ষড়যন্ত্র। বসুন বসুন বসুন।

পেঁচো ভূতটা বলল, না স্যার কমপ্লান নয়, কমপ্লেন, অভিযোগ। আগে বাচ্চারা পেঁচোয় পেয়ে মরত, এখন নানা ওষুধের কৃপায় আর মরছে না। ওষুধে আরো ভেজাল বা বিষ মেশানো যায় কিনা ভেবে দেখুন।

সভাপতি ব্রহ্মদত্যি বলল, ঠিক আছে, আপনি বসুন।......আমি আপনাদের সকলের অভিযোগ শুনলাম। আমি তাল গাছের গেছো ভূতকে নির্দেশ দিচ্ছি, তিনি সব অভিযোগ তালপাতায় লিপিবদ্ধ করে যমরাজের সেক্রেটারি চিত্রগুপ্তের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

এমন সময় অদূরে শব্দ শোনা গেল, বলো হরি, হরি বোল। কারা যেন মড়া নিয়ে শ্মশানের দিকে আসছে।

ব্রহ্মদত্যি বলল, সভা এখানেই শেষ হল।

বলেই খটাং করে শ্যাওড়া গাছে উঠে গেল। আর সব ভূত-পেত্নীরা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

খুব আশ্চর্যের কথা, ভূত পেত্নীদের সকলেই খুব অল্পকথায় বক্তব্য জানালো অযথা ঘ্যানর ঘ্যানর করল না।

অদ্ভুত ভূত

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

আমি তখন বেঙ্গল নাগপুর রেলে কাজ করি, সংক্ষেপে ওই রেলের নাম ছিল বি. এন. আর, এখন সে নাম বদলে হয়েছে এস. ই. আর অর্থাৎ সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে।

আমি ছিলাম সদর অফিসের লোক, কিন্তু পরিদর্শনের কাজ নিয়ে আমাকে প্রায়ই লাইনে লাইনে ঘুরতে হত। এক রাত্রে লাইনে ঘোরার সময়ে এক ভূতের পাল্লায় পড়ে প্রাণ খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল—আজ সে কথাই বলি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে, একদিকে ফাসিস্ট শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, হিটলার ইওরোপের অনেক দেশই জয় করে নিয়েছে, রাশিয়ার ওপর প্রচণ্ড হামলা চলছে; ইংরেজ শক্তি ফাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যথাশক্তি লড়ছে।

ভারতের মাটিতেও যুদ্ধের আশঙ্কা। জাপান কলকাতার বুকে বোমা ফেলেছে। কলকাতা শহর ছেড়ে লোক পালাচ্ছে। সে সময় ট্রেনে শুধু সৈন্যদের চলাফেরা। বৃটিশ সৈন্যরা এই দেশের সর্বত্র ঘুরে ফিরে পাহারা দিচ্ছে। রেলের লাইনে শুধু মিলিটারি স্পেশাল। যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা খুব কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবু আমাদের কষ্ট করেই যেতে হত। যেখানে সারাদিন তিনটে কি চারটে যাত্রী গাড়ি ছিল, সেখানে একখানা যাত্রীবাহী ট্রেন চলতে লাগল; ফলে গাড়ীতে অস্বাভাবিক ভীড় হত, সেই গাড়ীতে ওঠা যেন ছোটখাটো যুদ্ধজয় করার সামিল।

তবু তো আমাদের লাইনে কাজে বেরোতে হত। আমরা করতুম কি, ট্রায়াল বগিতে চেপে যাতায়াত করতাম। ট্রায়াল বগি কি—তা আগে বলে নিই, নচেৎ এই বগির ভূত যে কি সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর—তা বোঝা যাবে না।

রেলের কারখানা থেকে বগি তৈরী হওয়া মাত্রই সেই বগি যাত্রীদের গাড়ীতে জুড়ে দেওয়া হয় না, আগে মেল ট্রেনের পেছনে—একেবারে শেষে ট্রায়াল বগি লাগানো হয়, দরজা তালাবন্ধ থাকে, জানালাও বন্ধ থাকে, তাতে না থাকে আলোর ব্যবস্থা, না বিপদ সংকেতের চেন। বগিটা কেমন ছুটতে পারবে—সেটা পরীক্ষার জন্যে নতুন বগিকে মেলগাড়ীর পেছনে লাগানো হয়। রেলের লোকেরা এই আলোহীন বগিতেই যাতায়াত করে থাকে; চাবি খোলা বা চাবি দেওয়া

তাদের কাছে কোন ব্যাপারই না। প্রত্যেক বড় স্টেশনেই ট্রেন-পরীক্ষক থাকে, তাদের কাছে রেলকামরার চাবিও থাকে।

এই ট্রায়াল বগির এক কামরাতেই জাঁদরেল এক ভূতের সঙ্গে একবার আমার দেখা হয়েছিল। সেই গল্পই বলছি, ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

যতই মুখে বলি না কেন,—ভূত নেই, তবু ভূতের সামনাসামনি যদি হওয়া যায়, ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে আসে, তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো হয়। আমার ত' সেই রকম অবস্থাই হয়েছিল।

চক্রধরপুর থেকে বিলাসপুর যেতে হবে আমাকে। রাত্রি এগারোটায় চক্রধরপুর থেকে আপ বোম্বে মেল ছাড়ে, ভোরবেলায় পৌঁছয় বিলাসপুরে। যুদ্ধের সময় তখন ঐ লাইনে একখানি মাত্র ভালো গাড়ী, সুতরাং অসম্ভব ভীড়। ঐ ট্রেনের স্থানাভাবের জন্যে মাঝপথের কোন স্টেশন থেকে টিকিট বিক্রী করা হত না—কোন যাত্রীকে। সব স্টেশনেই এক কথা ঘোষণা করা হত—ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই।

আমাকে বিলাসপুরে যেতেই হবে, বিশেষ কাজে—রেলেরই কাজ। মালগাড়ী হোক, মেলগাড়ী হোক—আমাদের কাছে যে কার্ডপাশ আছে, তাতে কোন বাধা নেই; এমন কি গার্ডের কামরাতেও যেতে পারি। তবে আমরা খোঁজ করতাম, ট্রেনের পেছনে কোন ট্রায়াল বগি আছে কিনা।

যে রাতের কথা বলছি—সেই রাতটায় প্রচণ্ড শীত পড়েছিল, বোধহয় মাঘ মাসের গোড়ার দিকটা হবে। স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল আপ বোম্বে মেলে চক্রধরপুর থেকে একটা ট্রায়াল বগি জুড়ে দেওয়া হবে, সুতরাং আমার বিলাসপুর যাওয়ার আর কোন ভাবনা রইল না। আমি রাতের আহারাদি সেরে ট্রায়াল বগিতে উঠে হোল্ড-অল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। কামরায় আর কেউ নেই, থাকার কথাও নয়। দরজা চাবি বন্ধ; আপ বোম্বে মেলের পেছনে জোড়া হয়েছে বগিটা, অন্ধকার কামরা, ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থা নেই, বিপদজ্ঞাপক চেনও নেই। নিরিবিলিতে একটি ঘুমে রাত কাবার করতে পারলেই সকালে বিলাসপুর।

ট্রায়াল বগিতে শুয়ে পড়ার সময়ই লক্ষ্য করেছি—চক্রধরপুর থেকে গাড়ী ছাড়ল। বোম্বে মেল এরপর একটানা ঘন্টা দেড়েক চলবে, মাঝে কোথাও দাঁড়াবে না। গাড়ীটা চলওে বেশ জোরে—

শুয়েছি, ঘুম-ঘুম যে একটু পাচ্ছিল না, তা নয়; ট্রেনের দুলুনিতে আমার, শুধু আমার কেন, অনেকেরই ঘুম ধরে যায়। বেশ ঝিমিয়ে পড়েছিলাম—

ট্রেনটা সবে স্পীডে চলতে শুরু করেছে। হঠাৎ মনে হল আমার সামনের

দিকে বেঞ্চে যেন কে এসে বসেছে। কালো কোট গায়ে—আমি যে দিকে পা রেখে শুয়েছি—ঠিক তারই উল্টোদিকের সীটে বসে আছে। ভদ্রতার খাতিরে আমি পায়ের দিকটায় মাথা যে দিকে রেখে ছিলাম সে দিকে পা রেখে—অর্থাৎ উল্টে ঘুরে শুলাম।

আমাকে উঠে ঘুরে শুতে দেখেই বোধহয় লোকটা কথা বললে। কিন্তু সে যা বললে—তা শুনে আমার সারা শরীর ত' প্রায় অসাড় হবার দশা। লোকটার প্রথম জিজ্ঞাসাই হচ্ছে—ধরা, কর্কশ কেমন রুক্ষ ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললে—"আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?"

হঠাৎ এ কী প্রশ্ন! রেলের লোক ছাড়া এ বগিতে ত' কারুর ওঠার কথা নয়; আর রেলের কেউ উঠলে অফিস সংক্রান্ত কথাবার্তাই হয়, না হয় পে কমিশনের দৌলতে টাকাকড়ি বাড়বে, কবে বাড়বে—সে সব আলোচনাই হয়। এমন বিশ্রী বিদঘুটে প্রশ্ন তো কখনো শুনিনি। ভয় পেয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, কালো একটা শরীর—বোধহয় চোখ মুখ দেখা যাচ্ছে না—কালো কোট না ওভারকোট গায়ে, বগির ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার—চেহারাটা মালুম হচ্ছে না—তবে কোন একটা দেহ, সেই দেহে মুখ চোখ আছে কিনা—বুঝতে পারছি না, সচল দেহ না স্থানু লোক—তাও বোঝা যাচ্ছে না।

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় আবার সেই প্রশ্ন—"আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?"

এর কী জবাব দেব? কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভয় পেলে তো চলবে না। সাহস সঞ্চয় করে কোন রকমে বলি—"না, আমি ভূত বিশ্বাস করি না।"

তৎক্ষণাৎ সেই ধরা রুক্ষ ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলার আওয়াজ শুনলাম—"কিন্তু আমি করি।"

ব্যস্, এই পর্যন্ত! কালো অন্ধকার পরিবেশেও বুঝলাম—লোকটা সেখানে নেই, কেমন যেন উবে গেছে। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে।

বোম্বে মেলের সামনে লাইন ক্লিয়ার—ঘন্টাখানেকের আগে তো দাঁড়াবার কথা নয়। রেলের ঝিক ঝিক ঝম ঝম আওয়াজে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল!

ভূতুড়ে দোলা

বিশু মুখোপাধ্যায়

অল্প বয়সে ভূত সম্বন্ধে কৌতূহল-মেশানো ভীতি সবারই থাকে, আমারও ছিল। ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগত বটে, কিন্তু বেশী ভয়ের গল্প হলে বেশ দু'চারদিন গা ছম্ ছম্ করত। মনে মনে তখন বলতুম, 'ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি!' ঠাকুমা ভূতের ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে এই মন্তরটা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রমশঃ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার একটা কৌতূহলও জেগেছিল মনে। তখন সত্য ঘটনা বলে কেউ ভূতের গল্প বললে, আমি তাকে চেপে ধরে প্রশ্ন করতুম, আপনি স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন কি? অনেকেই তখন আমতা-আমতা ক'রে বলতেন, আমি নিজে দেখিনি, কিন্তু নিজে দেখেছে এমন লোকের মুখ থেকে শুনেছি।

আমার এক বড় ভগ্নীপতি ছিলেন, তিনি খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা ভূতের গল্প শুনতুম। নানা ভাবে অনেকবার নাকি তাঁর সঙ্গে ভূতের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল। তিনি সেই কাহিনীগুলি এমনভাবে গুছিয়ে আমাদের কাছে বলতেন যে, আমরা ভয় পেলেও বার বার সেগুলি শুনতে চাইতুম। একবার তিনি তাঁর পিসতুতো ভাই-এর এমন একটি ঘটনা আমাদের কাছে বলেছিলেন, যা আজও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি আরও এই জন্যে যে, সেই পিসতুতো ভাইকে ছোটবেলায় আমরাও দেখেছিলুম এবং এ-কাহিনী যে সত্য তা তিনি নিজেও আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন।

ভগ্নীপতির এই পিসতুতো ভাই ছিলেন তাঁর বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাঁদের অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। গ্রামের মধ্যে দোতলা কোঠা বাড়ি ছিল একমাত্র তাঁদেরই। জমি-জায়গার আয় থেকে সংসারই শুধু চলে যেত না, বাড়িতে দোলদুর্গোচ্ছব পূজাআর্চাও হত। ঐ পিসতুতো ভাই-এর বউটি ছিল ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো বউটি শ্বশুরের ঘর আলো করে ঘুরে বেড়াত। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাযত্নে, ঘর-সংসারের কাজকর্মে সকলের মুখেই বউ-এর সুখ্যাতি আর ধরত না! কিন্তু বিয়ের পর সাত-আট বছর কেটে যাবার পরও বউ-এর যখন কোন ছেলেপুলে হল না, তখন পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একমাত্র ছেলে কোন ছেলেপুলে না হলে ছেলের

বাপ-মায়ের ভাবনা হয় বৈ কি! তাঁরা বউ-এর ছেলেপুলে হবার জন্যে নানা ঠাকুর-দেবতার শরণাপন্ন হতে লাগলেন। এখানে-ওখানে বউ-এর নামে পূজাআর্চা দেন, মানত করেন। যে যা বলে তাই করেন, বউ-এর হাতে গণ্ডা-কতক মাদুলী ঝুলিয়ে দিলেন। এমনি করে আরও প্রায় বছর দুই কেটে গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না! শেষে বউ-এর উপর কেমন যেন একটা বিরূপ ভাব দেখা দিতে লাগল শ্বশুর-শাশুড়ীর। বিশেষ করে শাশুড়ীই সেটা প্রকাশ করে ফেলতে লাগলেন নানা ভাবে। পাড়ার মেয়েরাও এসে যোগ দিতে লাগল তাঁর সঙ্গে। এমন টুকটুকে মিষ্টি বউ-এর মুখে ক্রমশঃ ভয়ে-ভাবনায় কে যেন এক রাশ কালি ঢেলে দিলে। সুঠাম, সুশ্রী চেহারা দিন দিন রোগা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল। অনেকে এমন কথাও বললে যে, বউ-এর উপর নিশ্চয়ই কোন অশরীরীর দৃষ্টি পড়েছে—তাই ছেলেপুলেও হচ্ছে না, আর শরীরটাকেও চুষে খাচ্ছে।

এই সব শুনতে শুনতে বউ-এর মনেও একদিন ধিক্কার এসে গেল। সে স্থির করলে, এ জীবন সে আর রাখবে না। একদিন রাত-দুপুরে বাড়ির পাশেই এক জল-থইথই দীঘিতে ডুবে আত্মহত্যা করবে বলে সে বেরিয়ে পড়ল চুপি চুপি। আস্তে আস্তে পা টিপে বাড়ীর দরজা খুলে দীঘির পাড়ে এসে সে দাঁড়াল। চারিদিক আবছা চাঁদের আলোয় থম্ থম্ করছে। মৃত্যুভয় না থাকলেও, বউটি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সামনেই বেলগাছের তলায় এক ইয়া লম্বা-চওড়া পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। আলো-আঁধারের মধ্যেও তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন বউটির কাছে। এসেই ধমকের সুরে বললেন, ছিঃ মা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ! যাও, ঘরে ফিরে যাও—শীগ্‌গীরই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তবে এ কথা কারুকে বলো না তুমি।

গলায় পৈতে, খালি গা, দীর্ঘকায় এই পুরুষকে প্রণাম করে বউটি ভয়ে ভয়ে আবার পা-টিপে-টিপে বাড়ি ফিরে এলো। সকলে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বাড়ীর কেউই এ কথা জানতে পারলে না।

পরদিন সকাল থেকে বউ হয়ে গেল একেবারে অন্য মানুষ। এতদিন মন-মরা হয়ে যে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে, আজ তার মুখ হাসিখুশী, মনে আনন্দের জোয়ার! কয়েক মাস যেতে না যেতেই ক্রমশঃ বউ-এর কোলে বাচ্চা আসার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল সকলের কাছে। শ্বশুর-শাশুরী থেকে আরম্ভ করে পাড়া-পড়শীদেরও আনন্দ আর ধরে না। বউ-এর তখন সে কি আদর-যত্ন! শাশুড়ী বলে, তুমি মা বেশী খাটাখুটি করো না; শ্বশুর বলে, বউমাকে মাছের মুড়োটা দাও। আর তার স্বামীর তো কথাই নেই! সে যেখান থেকে যা পারে ভাল খাবা-

জিনিস এনে দেয় বউকে।

এমনি করে দিন যায়। ব্রহ্মদত্যি ব্রাহ্মণের কথাটা কিন্তু বউ-এর পেটের মধ্যে ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে। স্বামীকে বলি-বলি করেও ভয়ে বলতে পারে না। শেষে একদিন থাকতে না পেরে বলেই ফেলল। স্বামী তো শুনে একেবারে হতভম্ব! কিন্তু এই হতভম্ব ভাব সহজেই কেটে গেল, যখন একটি মিষ্টি হাত-পা-নাড়া জ্যান্ত ডলি পুতুলের মুখ ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে

গেল। মাথায় একরাশ কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, টানা-টানা চোখ, আর তুলতুলে দেহটা যেন ময়দার সঙ্গে আলতা গুলে তৈরি করেছে কে!

ছেলের মা-বাবা তো বটেই, এমন কি ঠাকুমা-ঠাকুর্দা থেকে আত্মীয়স্বজন সকলেই আঁতুড়-ঘরে গিয়ে বিভোর হয়ে যেত, এই সাত রাজার ধন মাণিককে দেখে—তার দিক থেকে কেউই চোখ ফেরাতে পারত না।

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে, আঁতুড়-ঘরেই বিষাদের ছায়া নেমে এলো। বউটি হঠাৎ মারা গেল আটকড়ায়ের আগের দিন সেপটিক জ্বরে। মারা যাবার একটু আগেও বউটির বাচ্চার দিকে চেয়ে চেয়ে সে কি দেখা! বাচ্চার গায়ে একটা হাত রেখেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

এমন ঘটনা ঘটবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি! সবাই দুঃখে শোকে একেবারে মূহ্যমান হয়ে পড়ল। কিন্তু এই শোককেও চাপা দিয়ে আর এক ঘটনা বাড়ির সবাইকে ভয়ে-ভাবনায় একেবারে কাবু করে ফেলল! ব্যাপারটা ঘটল ঐ নবজাত শিশুকে নিয়ে। মা-মরা বাচ্চাকে কি করে বাঁচান যাবে, এই নিয়ে যখন সকলেই জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত, তখন কোন্ এক অদৃশ্য হাত যেন তার সব ভার নিজের হাতে তুলে নিল।

দুধের বাচ্চাকে মানুষ করার হাঙ্গামা অনেক। তাছাড়া মায়ের মতো বুকের রক্ত আর স্নেহ-যত্ন দিয়ে কেউই পারে না সাত-আট দিনের বাচ্চাকে বাঁচাতে! কিন্তু এ হাঙ্গামা কারুকেই পোয়াতে হল না, বরং বাচ্চার আনন্দ-উচ্ছল মুখ ও হালুচালু ভাব দেখে অবাক হয়ে গেল। ছেলের পেট যেন সারাক্ষণই ভরে আছে, খাওয়াতে গেলে খেতে চায় না, কান্নাকাটিও বেশী নেই। একটু কেঁদেই কাকে এদিক-ওদিক দেখে আবার যেন চুপ করে যায়, মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। গায়ের কাঁথা বা ঢাকা ভিজিয়ে ফেললে, কেউ বদলে দেবার আগেই, সেগুলি সবার অলক্ষ্যে কে যেন পাশে টেনে ফেলে আবার নতুন পাট করা কাঁথা-কাপড় বদলে দেয়।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বাড়ির কেউ তেমন করে বুঝতে পারে নি, কিন্তু সেদিন বুঝল, যেদিন দেখল বাচ্চার দোলা বারান্দায় আপনা থেকেই দুলছে। বাচ্চার ঠাকুমা দোতলার বারান্দায় বাচ্চার জন্যে একটা বেতের দোলা টাঙিয়েছিলেন। মা-মরা এই ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে, দোলায় শুইয়ে দিয়ে, তিনি একটু নিশ্চিন্ত হতেন—সংসারের কাজকর্ম দেখতে পারতেন। কিন্তু এমন কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি! মানুষজন কেউ কোথাও নেই, অথচ দোলা আপনা থেকে দুলছে! দুলতে দুলতে যেই দোলাটা থেমে আসছে, আবার যেন কেউ ঠেলে দিচ্ছে সেটাকে। বাচ্চার ঠাকুমা বাড়ির সবাইকে

ব্যাপারটা ডেকে এনে দেখালেন। দেখে সবাই তো থ হয়ে গেল!

কথাটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া-পড়শীরা ভেঙে পড়ল বাড়িতে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল আশেপাশের চারিদিকে। দূর দূর গ্রাম থেকেও লোক আসতে লাগল এই ভূতুড়ে দোলা দেখার জন্যে।

পাড়ার মাতব্বররা ছেলের বাপ ও ঠাকুর্দার কাছে, গিন্নীবান্নীরা ঠাকুমার কাছে গিয়ে বলতে লাগল রোজা ডাকিয়ে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্যে। গয়ায় গিয়ে মায়ের পিণ্ডি দিতেও বলল কেউ কেউ। কিন্তু এক বছরের আগে গয়ায় মৃতের পিণ্ডি দেবার রীতি নেই। তাছাড়া ছেলের বাপ এ সবে আপত্তি করলে। এ ব্যাপারে সে ভয় পেয়ে গেল আরও এই জন্যে যে, এতে হয়ত ঐ শিশুর জীবন নিয়েও টানাটানি হতে পারে!

শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হল না। দিনের পর দিন এই ভূতুড়ে কাণ্ড চলতে লাগল বাড়িতে। এক মাস, দু'মাস করে ছেলে বড় হতে লাগল, হামা দিতে শিখল। ক্রমশঃ তার মুখে ভাত দেবার সময় এগিয়ে এলো। ছেলের মৃত মা-ই তখন অলক্ষ্যে থেকে তাকে তদারক করে, তার সঙ্গে খেলা করে। ছেলে উপরের ঘরে থেকে হাসে-খেলে। তাকে দেখার জন্যে ঠাকুমাকে আর উদগ্রীব হতে হয় না। শুধু একটি বুড়ী ঝিকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, বেশী টাকা দিয়ে, তার জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা বাড়ির সকলের গা-সওয়া হয়ে গেলেও সবারই মনে একটা চাপা অস্বস্তি লেগে গেল। তাছাড়া এক বছর হয়ে গেল অথচ ছেলের অন্নপ্রাশন হল না। কতদিনই বা অস্বস্তিকর ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা টেনে যাওয়া যায়? এদিকে ছেলেও বড় হচ্ছে আর আত্মীয়স্বজনরাও যা-তা রটাচ্ছে! এমনি সময় ছেলের বাপ একদিন গয়ায় যাওয়াই স্থির করলে। যাওয়ার আগে তার বাপ-মার সঙ্গে যুক্তি করে গেল যে, গয়া থেকে ফিরে এসেই ঘটা করে তারা ছেলের মুখে ভাত দেবে।

কিন্তু তার আর সুযোগ হয় নি। গয়া থেকে ফিরে এসে ছেলের বাপ ছেলেকে আর দেখতে পায়নি! যেদিন সে গয়ায় তার কাজ শেষ করে, সেই দিনই গ্রামে ঐ শিশু ডিপথিরিয়ায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

আশেপাশের যারা ঐ ভূতুড়ে ঘটনার কথা জানত, তারা সকলেই একবাক্যে ঐ মৃত্যুসংবাদ শুনে বলেছিল, মা-ই নিয়ে গেল বাচ্চাটাকে তার কাছে!

ভৌতিক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভূত আছে কি নেই এ তর্ক বহুদিনের। ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েও এ ধরনের তর্ক আদিম যুগ থেকে চলে আসছে। দুটো তর্কেরই আজও নিষ্পত্তি হয়নি। বিজ্ঞানের যুগে তোমরা হয়তো এসব মানতে চাইবে না।

অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যা দেখা যায় না, তার অস্তিত্বও নেই, এই তোমাদের মত।

ভূতের কথা তোমাদের মতন এতদিন আমিও বিশ্বাস করতাম না। অনেক জায়গায় ভূত দেখার আমন্ত্রণ পেয়েছি। পোড়ো বাড়িতে রাত কাটিয়েছি, ঘোর অমাবস্যায় শ্মশানে ঘোরাফেরা করেছি। কিছু চামচিকে আর শেয়াল ছাড়া আর কিছু নজরে পড়েনি।

ভূত সম্বন্ধে আমিও ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়ে উঠছিলাম, এমন সময় ব্যাপারটা ঘটল।

ঠিক আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে সময় রায়। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, লেখাপড়াতেও তেমনই উৎসাহী। বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগে মাঝে মাঝে আমার কাছে পড়তে আসত। সেই সময়ে তার বিদ্যাবুদ্ধি পরখ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তা ছাড়া একেবারে পাশের বাড়িতে থাকত, খুব ছোটোবেলা থেকেই তাকে দেখছি।

ইদানীং অনেকদিন সমরের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছিলাম পরীক্ষার পর সে বাইরে কোথায় বেড়াতে গেছে।

এক সন্ধ্যায় ঘরে বসে একটা বই পড়ছি। বাইরে ঝড়ের আভাস। জানালা, দরজার পর্দাগুলো দমকা বাতাসে উড়ছে। দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও যেন গায়ে এসে পড়ল, কিন্তু বইটা এত ভাল লাগছিল যে উঠে গিয়ে জানালাগুলো বন্ধ করতেও ইচ্ছে করছিল না।

হঠাৎ সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। ভাবলাম ঝড়। চোখ ফিরিয়েই কিন্তু অবাক হলাম। সমর এসে দাঁড়িয়েছে। উস্কখুস্ক চুল, পাংশু মুখ।

কি সমর, কবে ফিরলে? বইটা মুড়ে প্রশ্ন করলাম।

সমর কৌচে, আমার পাশে বসে বলল, এই একটু আগে। জামা কাপড়

ছেড়েই আপনার কাছে চলে আসছি।

কি ব্যাপার? মনে হল সমরের বোধ হয় জরুরী কোন কথা বলবার আছে।

আপনার সময় হবে এখন? আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

হাসলাম, অফুরন্ত সময়। বল কি তোমার কথা?

আপনি ভূত বিশ্বাস করেন মাস্টারমশাই? এ প্রশ্ন হাজার বার হাজার জায়গায় শুনেছি। সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম, কি বলতে চাইছ বল?

মৃত্যুর পর মানুষ শেষ হয়ে যায় না মাস্টারমশাই। ভূত বলুন আত্মা বলুন, তারা আছে। মাঝে মাঝে তারা দেখাও দেয়।

বুঝলাম কোন কারণে সমর খুব উত্তেজিত হয়েছে। অনেকেরই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। আধো অন্ধকারে গাছপালা দেখে ভূতপ্রেত কল্পনা করে, কিংবা বদমাইশ লোকের প্রতারণায় ভুলে মনে করে অশরীরী কিছু একটা দেখেছে। সমরের পিঠে হাত রেখে বললাম, মাথা ঠাণ্ডা করে কি হয়েছে বল তো?

সমর কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ আর কপাল মুছে নিল তারপর একটু দম নিয়ে বলতে আরম্ভ করল।

লক্ষ্ণৌতে আমার এক পিসি আছেন আপনি জানেন বোধ হয়?

হ্যাঁ, তোমার কাছেই শুনেছি। তিনি কোন্ এক স্কুলের শিক্ষিকা, তাই না?

সমর ঘাড় নাড়ল, পিসি বৈজনাথ শিক্ষাদানে পড়ান। তিনি অনেকদিন ধরে তাঁর কাছে আমাকে যেতে লিখছেন, কিন্তু একটার পর একটা ঝঞ্ঝাটের জন্য যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তাই পরীক্ষার পর ভাবলাম, এখন তো প্রচুর অবসর, এইবার ঘুরে আসি। মাসখানেক আগে দেরাদুন এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে গেলাম।

তোমার বাবার কাছে শুনেছি। আমি কৌচের ওপর পাদুটো তুলে ভাল হয়ে বসলাম।

আপনি শুনলে হাসবেন, জীবনে এই আমার প্রথম রেলযাত্রা। কাজেই উৎসাহের অন্ত ছিল না। প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেন থামতেই আমিও নেমে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে আরম্ভ করি। গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে কামরায় উঠি। কিন্তু এক স্টেশনে বিপদ ঘটল।

আমি সোজা হয়ে বসলাম, কি ট্রেন ছেড়ে দিল তো?

সমর আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বলতে লাগল, এক স্টেশনে নেমে এদিক ওদিক বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম একটি বছর আট-নয়েকের মেয়ে, বেশ ফুটফুটে চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, পরনে নীলচে রঙের একটা ফ্রক, আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

প্রথমে ভাবলাম আমারই ভুল হয়েছে। মেয়েটি বোধহয় অন্য কাউকে ডাকছে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম, না আর কেউতো ধারে কাছে নেই। মেয়েটিকে বাঙালী বলেই মনে হল। প্ল্যাটফর্মের ওপর বেশীর ভাগই অন্য জাতের জটলা। মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমায় সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ভাবলাম, বিদেশে মেয়েটি নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে। আমাকে স্বজাতি দেখে সাহায্য চাইছে।

মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি এগোতে সে চলতে শুরু করল স্টেশনের বিশ্রামকক্ষের দিকে। বুঝতে পারলাম, সম্ভবতঃ ওই বিশ্রামকক্ষে তার কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া বিপদে পড়েছেন কিংবা হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন। কিন্তু না, বিশ্রামকক্ষের সামনে একটু দাঁড়িয়ে মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে আবার হাত নেড়ে ডেকেই আরও এগিয়ে গেল।

এ ধারে একটা বকুলগাছ। অজস্র বকুল ঝরে পড়েছে পথের ওপর। পাশে স্টেশনের সীমানার রেলিং। মেয়েটি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি জোরে জোরে হেঁটে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং ঠিক সময় আমি আর উৎকণ্ঠা দমন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল?

হুইসেল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। এদিকে চেয়ে দেখি মেয়েটি উধাও। এক

নিমেষে যেন মুছে গেল। আমি ট্রেনের দিকে ছুটলাম কিন্তু ধরতে পারলাম না। দ্রুত গতিতে ট্রেন যেন আমার চেষ্টাকে উপহাস করতে করতে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ পরে আমি হাসলাম। ওই তোমার ভৌতিক গল্প! মেয়েটি তোমায় ধোকা খানিয়ে সরে পড়েছে। বয়স কম হলে হবে কি, মেয়েটি ভারী ওস্তাদ মনে হচ্ছে।

সমর আমার হাসিতে যোগ দিল না। গম্ভীর গলায় বলল, আমার কাহিনী এখনও শেষ হয়নি মাস্টারমশাই।

আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। বললাম, বেশ, বলে যাও।

আমি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে ট্রেন ফেল করার কথা বললাম। তিনি পরের স্টেশনে ফোন করে দিলেন, যাতে তারা আমার বিছানা আর সুটকেসটা নামিয়ে রাখতে পারে। এর পরের ট্রেন রাত সাড়ে নটায়। হাতে অঢেল সময়।

সমস্ত বিশ্রামকক্ষগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কয়েকজন দেহাতী যাত্রী বসে আছে। মেয়েটি কোথাও নেই। স্টেশনের বাইরে কয়েকটা টাঙ্গাওয়ালাকে মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তারা কেউই কিছু বলতে পারল না।

আশ্চর্য লাগল, চোখের সামনে থেকে মেয়েটি কি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এই প্রচণ্ড দিনের আলোয় কোথায় সে সরে যেতে পারে!

আশ্চর্য হবার আমার আরও বাকি ছিল। রাত সাতটা নাগাদ সারা স্টেশনে হৈ চৈ। সবাই খুব ব্যস্ত। গিয়ে খবর নিয়েই চমকে উঠলাম। দেরাদুন এক্সপ্রেসের সঙ্গে এক মালগাড়ীর ভীষণ ধাক্কা লেগেছে। অনেক লোক আহত হয়েছে, মারা গেছে বেশ কয়েকজন। আপাততঃ সব গাড়ি বন্ধ। দু একটা রিলিফ ট্রেন সাহায্য নিয়ে ছোটাছুটি করছে। স্টেশন মাস্টারের কামরায় খুব ভিড়। অনেকেই আত্মীয়স্বজনের খবর নেবার জন্য ব্যাকুল।

ভিড় কমতে খবর পেলাম, দেরাদুন এক্সপ্রেসের সামনের চারখানা বগি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। সামনের তিন নম্বরের বগিতে আমার থাকার কথা। সেই মুহূর্তে নতুন করে আবার মেয়েটির কথা মনে এল। মেয়েটি যদি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে না নিয়ে যেত, তাহলে আমার কি অবস্থা হত ভেবেই শিউরে উঠলাম।

সেই রাত্রেই দুটো টেলিগ্রাম করলাম। একটা কলকাতার বাড়িতে আর একটা লক্ষ্ণৌতে, পিসির কাছে। লিখে দিলাম যে ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার হাত থেকে আমি বেঁচে গেছি। পথে এক স্টেশনে আমি নেমে পড়েছিলাম।

লাইন ঠিক হতে দিন দুয়েক লাগল। তারপর লক্ষ্ণৌ রওনা হলাম, পিসিকে খবর দিয়ে।

সারারাত মেয়েটির কথা ভাবলাম। বিধাতার আশীর্বাদের মতন মেয়েটি যেন আমার প্রাণরক্ষা করতেই এসেছিল। কিন্তু কাজ শেষ করে মেয়েটি কোথায় মিলিয়ে গেল।

পরের দিন এগারোটা নাগাদ লক্ষ্ণৌ পৌঁছলাম। স্টেশনে পিসি এসেছিলেন। খুব ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছিলাম, তবু চিনতে অসুবিধা হল না। পিসির চেহারা প্রায় একই রকম আছে।

প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, খবরের কাগজে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পড়ে আমার যা অবস্থা হয়েছিল। কেবল মনে হচ্ছিল, এর জন্যে যেন আমিই দায়ী। আমি বার বার তোকে আসতে লিখেছিলাম। তারপর তোর টেলিগ্রামটা পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। কি ব্যাপার বল তো?

সব ব্যাপারটা বললে পিসি হয়তো বিশ্বাসই করতেন না। বিশেষ করে তিনি যখন স্কুলে বিজ্ঞান পড়ান। কাজেই মেয়েটির ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গিয়ে বললাম, চা খেতে একটা স্টেশনে নামতে ট্রেন ছেড়ে দিল পিসি। ছুটে গিয়েও ট্রেন ধরতে পারলাম না।

পিসি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান তোকে বাঁচিয়েছেন, জন্ম জন্ম যেন তোর চা খাওয়ার নেশাটা থাকে।

দুজনে টাঙ্গায় উঠলাম। প্রায় আধঘন্টার ওপর চলার পর একটা বাড়ির সামনে টাঙ্গা থামল পিসির নির্দেশে।

পিসি নেমে চিৎকার করলেন, সুন্দর, সুন্দর। একটি ছোকরা নেমে এল। আমার সুটকেস আর বিছানা নিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল। পিসির পিছন পিছন আমি ওপরে উঠলাম।

মাঝারি সাইজের একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে পিসি বললেন, ওই ঘরটা তোর। যা জামা কাপড় ছেড়ে নে। আমি জলখাবারের বন্দোবস্ত করি। শরীর খুবই ক্লান্ত ছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ারের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলাম।

এক কোণে একটা টেবিল, তার ওপর বাতিদান। একটা আলনা, ছোট একটা খাট। দেওয়ালে গোটা তিনেক ছবি। সামনের ছবিটার দিকে চাইতেই সমস্ত শরীর বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতন কেঁপে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল ভয়ের কালো একটা ছায়া আমাকে আবৃত করার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ডাকলাম, পিসি, পিসি।

পিসি বোধ হয় নীচের রান্নাঘরে ছিলেন। কোন সাড়া পেলাম না। কিন্তু পিসিকে আমার একান্ত প্রয়োজন। আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ির মাঝ বরাবর নেমে

আবার ডাকলাম পিসি, ও পিসি।

এতক্ষণে আমার ডাক পিসির কানে পৌঁছল। হন্তদন্ত হয়ে পিসি সিঁড়ির কাছে এসে বললেন, কিরে, কি হয়েছে?

একটু এ ঘরে এসো তো।

আমি ছুটে ওপরের ঘরে এসে দাঁড়ালাম। হাঁপাতে হাঁপাতে পিসিও এলেন একটু পরে। কি হল রে তোর? শরীর খারাপ হয়নি তো? এত ঘামছিস কেন?

আমার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘামের বিন্দু মুছে ফেলে বললাম, না, শরীর আমার ঠিক আছে। কিন্তু এ ছবিটা কার? এই যে?

হাত দিয়ে সামনের ফটোটা দেখালাম। পিসি বললেন, ওটা টুনুর ফটো। আমার মেয়ে টুনু।

— মেয়ে?

—হ্যাঁ, তাকে তুই দেখিসনি। তোর জন্মাবার বছর খানেক আগে টুনু মারা গেছে। টাইফয়েডে। বোধহয় বছর আটেক হয়েছিল বয়স।

শেষদিকে পিসির কণ্ঠস্বর একটু গাঢ় হয়ে এল। কিন্তু ঠোঁটটা কামড়ে থেমে গেলাম। কিন্তু কিরে, কি বলবি বল? পিসি বললেন।

—তুমি কি বিশ্বাস করবে পিসি? বিশ্বাস করবার কথা নয়।

কথাটা বল, তবে তো বুঝব বিশ্বাস করার কথা কিনা। পিসি আমার ভাবভঙ্গী দেখে রীতিমতো বিস্মিত হলেন।

টুনুদির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে পিসি। আমার কথা শেষ হবার আগেই পিসি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। ভাবলেন, নির্ঘাৎ ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েছে।

একটু একটু করে সব বললাম। যখন শেষ করলাম, পিসির চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। পিসি বিজ্ঞান পড়ান, কিন্তু একটি কথার প্রতিবাদ করলেন না, কিছু অবিশ্বাস করলেন না। শুধু বললেন টুনুই তোর প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এবার সমর আমার দিকে ঘুরে বসল। বলুন মাস্টারমশাই কি করে এটা সম্ভব? মারা যাবার পরও কি আত্মার স্নেহ, দয়া মায়ার আকর্ষণ থাকে? নিজের আত্মীয়দের বাঁচাবার জন্য তারা কি মানুষের দেহ ধরে আবার ফিরে আসতে পারে মরলোকে?

বাইরে ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমগাছের একটা ডাল জানলার পাল্লায় মাথা ঠুকছে অনবরত। জলের ঝাপটায় ঘরের অনেকখানি ভিজে গিয়েছে।

সেই দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। কি উত্তর দেব সমরের প্রশ্নের!

চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া মানুষ নিজের লোককে বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে? তাও কি সম্ভব!

তান্ত্রিক

ধীরেন্দ্রলাল ধর

দুর্গাবিনোদ ইস্কুল মাস্টারের ছেলে। অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে এম. এ. পাশ করলেও মুরুব্বির অভাবে ভাল চাকরি জোগাড় করতে পারল না। শেষ অবধি হল কেরানী। এখনকার দিনে কেরানীগিরির আবার দুটো ভাগ হয়েছে, নীচু কেরানীর মাইনে হয় সওয়া শো টাকা থেকে শুরু, আর উঁচু কেরানীর মাইনে শুরু হয় সওয়া দুশো টাকা থেকে। মুরুব্বিহীন দুর্গাবিনোদ নীচু ধাপের কেরানী হল। তাও জুটল অনেক কষ্টে। এম. এ. পাশেও কুলোয়নি। এই কেরানীগিরির জন্য আবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

যাক চাকরিটা হয়ে দুবেলা অন্নের সংস্থান তো হল। দুর্গাবিনোদের পড়াশুনার শখ আছে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে সে লাইব্রেরীতে হাজিরা দিয়ে চলল, রাত নটা অবধি। দর্শনশাস্ত্রে সে এম. এ. পাশ করেছে, এবার হিন্দু দর্শনটা সে ভালভাবে বুঝে নিতে চায়।

ধর্ম কী? ঈশ্বর কী? মানুষ কেমন করে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে? এই বুঝতে বুঝতে শেষে এসে পড়ে যেসব সাধু সন্ত মহাত্মা সাধনা করতে করতে ভগবদ্-শক্তি লাভ করেছিলেন তাঁদের কথা। ভারতের সাধকদের যত সব অলৌকিক কীর্তির কথা পড়তে পড়তে দুর্গাবিনোদ সাধু দর্শনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। রবিবারে ছুটির দিনে তার আর বাড়িতে বসে থাকা চলল না। কলিকাতার আশেপাশে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোথায় কোন্ আশ্রম আছে, কোথায় কোন্ তান্ত্রিক থাকেন, সেখানে সে যাওয়া আসা শুরু করল।

দুর্গাবিনোদ আশ্রমে যায়, আরো দশ জনের মাঝে বসে, আশ্রমিক মহাত্মাদের বাণী শোনে, তারপর প্রণাম করে বিদায় নেয়। ফেরার পথে মহাত্মার বাণী মনে মনে আলোচনা করে, মহাত্মা কত বড় সাধক তার একটা পরিমাপ করার চেষ্টা করে। মহাত্মার কোন অলৌকিক শক্তি আছে কিনা জানার চেষ্টা করে। একদিন খবর পেল হাওড়ার এক গ্রামে এক তান্ত্রিক আছেন যিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। জলপড়া দিয়ে অম্লশূল সারান, কানে কাঠি দিয়ে কালা মানুষের বধিরতা দূর করেন, কঠিন বাতের বেদনা সামান্য বুলিয়ে আরাম করে দেন।

যিনি খবরটা দিয়েছিলেন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

বাস থেকে নেমে মাইল খানেক হেঁটে গেলে একটি গ্রাম। গাঁয়ের গোড়াতেই এক পুকুর পাড়ে একটি ছোট্ট মন্দির, পাশেই একখানি চালাঘর। ঘরের দাওয়ায় একজন জটাধারী সাধু বসে আছেন, সামনে ধুনুচিতে আগুন জ্বলছে, পাশে একটা কলসী ও ভাঁড়। কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা হাত জোড় করে সামনে মাদুরে বসে আছে।

দুর্গাবিনোদও বসে পড়ল।

সাধুর বয়স বেশী নয়, তার চেহারা বলিষ্ঠ, রং কালো, মাথার জটাও বিশেষ দীর্ঘ নয়। চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল। তার উপর কপালে চন্দন লেপা। ভক্তির চেয়ে ভয় হয় বেশী।

দুর্গাবিনোদের দিকে নজর ফেলতেই সে হাত জোড় করে প্রণাম জানাল। সাধু নিজে থেকেই বললেন—কী চাই? গুরু মেলা অত সহজ নয়, আগে নিজেকে তৈরী কর, তারপর গুরু। পাত্র ফুটো হলে জল রাখবি কেমন করে? আধার ঠিক না হলে মন্ত্রশক্তি ধারণ করবি কেমন করে? সে মন্ত্র যে দেবে তার কোন লাভ নেই, যে নেবে সেও ব্যর্থ হবে। তৈরী হ'।

দুর্গাবিনোদ ভরসা পেল। বলল—কিভাবে তৈরী হতে হবে?

—বাক সংযম কর, বেশী কথা বলবি না। নিরামিষ আহার করবি। অযথা কোন পরিশ্রম করবি না, শক্তি সঞ্চয় করবি। সন্ধ্যার পর কোন মন্দিরে বা গঙ্গার তীরে চুপ করে ঈশ্বরের ধ্যান করবি। ধীরে ধীরে মন আত্মস্থ হবে। চিত্ত দৃঢ় হবে। তখন গুরুমন্ত্র নিয়ে সাধন-ভজনের কথা উঠবে, তার আগে কিছু হবে না।

দুর্গাবিনোদ এতদিনে যেন একটা আলো দেখতে পেল। গুরু ও মন্ত্রের কথাটা সে ভেবেছে, কিন্তু এমন ভাবে তার হদিশ কেউ তাকে বাতলাতে পারেনি। তান্ত্রিকের উপর তারা বিশ্বাস হল। প্রথম দর্শনেই এমনভাবে মনের কথাটা টেনে বলা সহজ নয়।

বিকাল অবধি দুর্গাবিনোদ কালীবাবার সামনে বসে রইল। অবধূত কালীবাবা আর তার সঙ্গে কোন কথা বললেন না। কলসী থেকে ভাঁড়ে ঢালেন আর খান। আর অসুস্থদের রোগের কথা শোনেন। দু-এক জনকে ওষুধও দেন। ওষুধ মানে কাউকে ধুনির ছাই, কাউকে ধূপের আধপোড়া কাঠি।—এই ছাইটা তিনভাগ করে তিন দিন সকালে খালি পেটে খাবি।—এই কাঠিটা একটা তামার মাদুলিতে ভরে ধারণ করবি ইত্যাদি।

বিকেলবেলা দুর্গাবিনোদ প্রণাম জানিয়ে উঠে পড়ল। কালীবাবা একবার তাকিয়ে হাসলেন শুধু।

দুর্গাবিনোদ অনেক আশ্রমে ঘুরেছে, অনেক মহারাজকে দর্শন করেছে, দিনের পর দিন অনেকের উপদেশ-বাণী শুনেছে। কন্তু কালীবাবার মতো অলৌকিক ক্ষমতা কারও দেখেনি। ছাই দিয়ে রোগ সারানো, কানে কাঠি দিয়ে বধিরতা আরাম করা, হাত বুলিয়ে বাতের বেদনা মুক্ত করা—এসব বড় কম শক্তির কথা নয়। এই মানুষটি কিছুটা ঐশ্বরিক শক্তি যে আয়ত্বে এনেছেন—একথা মানতেই হবে। দুর্গাবিনোদ কালীবাবার কাছে নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু করল। যদি ইনি প্রসন্ন হয়ে কৃপা করেন, তাহলে দুর্গাবিনোদও একদিন কৃতার্থ হবে।

কালীবাবা সেই যে প্রথম দিন কথা বলেছিলেন, তারপর থেকে আর কথাই বলেন না। প্রণাম করলে হাসেন আর হাত তুলে বলেন—জয়স্তু।

দুর্গাবিনোদ এদিকে নিরামিষ খাওয়া শুরু করেছে, কথা কম বলে, অনর্থক কোন ঘোরাফেরা করে পরিশ্রম করে না। রাত বারোটা অবধি বই পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। কালীবাবার কথা মতো নিজেকে সে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলেছে।

হঠাৎ একদিন মাস ছয়েক পরে কালীবাবা বললেন—তুই তো রবিবারে আসিস, আসছে শনিবার আয় না। সেদিন অমাবস্যা, রাতে মায়ের পুজো দেখবি?

—এ তো আমার সৌভাগ্য।

—সন্ধ্যায় চলে আসবি। রাতে এখানে থাকবি। সারা রাত জাগতে পারবি তো? আমি সারা রাত পুজো করি।

—একটা রাত তো।

—তাহলে আসার সময় মায়ের পুজো নিয়ে আসিস।

—কী আনতে হবে বলুন?

—তুই আর কী আনবি? তিন বোতল দেশী মদ আনবি। কারণবারি—তাতেই হবে।

কালীবাবা গুনগুন করে উঠলেন—মদ খাই মা কালী বলে—তারপর কলসী থেকে এক ভাঁড় মদ নিয়ে গলায় ঢাললেন।

দুর্গাবিনোদ সেদিন খুশি হল। কালীবাবা মদ চেয়েছেন। পুজো দেখার জন্য ডেকেছেন। এবার তিনি প্রসন্ন হবেন। উৎফুল্ল মনে দুর্গাবিনোদ সেদিন বাড়ি ফিরল।

শনিবার সন্ধ্যায় এক রেশন ব্যাগের মধ্যে তিন বোতল দেশী মদ নিয়ে দুর্গাবিনোদ কালীবাবার আশ্রমে এলো, তখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কালীবাবা দাওয়ায় বসেছিলেন, বললেন—এনেছিস? দে—

বোতল তিনটি নিয়ে কালীবাবা মন্দিরে চলে গেলেন, বললেন—দু ঘণ্টা এখন বোস, পুজোর সময় আমি তোকে ডাকব।

মাদুর পাতা ছিল, দুর্গাবিনোদ সেই মাদুরের ওপর উঠে বসল।

ক'মিনিট বসে থাকার পরেই দুর্গাবিনোদ বুঝল রাতের অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকার মতো স্থান সেটা নয়। কানের পাশে মশার ডাক আর থামতে চায় না। বুদ্ধি করে দুর্গাবিনোদ রেশনের থলির মধ্যে একখানা চাদর এনেছিল। এবার সেই চাদরখানা দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে দিল। শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে রইল। তবু মনে হয় মশা কামড়াচ্ছে।

সামনে অন্ধকার, মাঠ ঘাট গাছপালা সবই কালোয় মিশে গেছে। অনেকটা তফাতে দু-তিনটে ঘরের জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। কাছাকাছি মানুষ আছে বলে মনে হয় না। কালীবাবার এ ঘরখানাতেও কেউ থাকে না। তাঁর পরিজনরা

থাকে ওই গ্রামে। এখানে কালীবাবা একা থাকেন, সাধন-ভজনের জন্য। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। চারিপাশে নিঝুম। এই তো সন্ধ্যা হয়েছে, এরই মধ্যে মনে হয় রাত যেন দুপুর হয়ে গেল।

এভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে।

কালীবাবাও তো মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

পাশে একজন কথা বলার মানুষ থাকলে ভাল হত। বড় একা একা মনে হয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে দুর্গাবিনোদ ঝিমুতে শুরু করে।

দুর্গাবিনোদ কোন এক সময় বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। সহসা ঘুম ভাঙল কালীবাবার ডাকে—আয় উঠে আয়—এবার মায়ের আরতি হবে।

ধড়মড় করে উঠে দুর্গাবিনোদ কালীবাবার অনুসরণ করল।

মন্দিরের মধ্যে পিদিম জ্বলছে। ধুপধুনায় অন্ধকার। ছোট্ট প্রতিমাটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সামনে কিছু জবা ফুল, আর মদের তিনটে বোতল। কালীবাবা আসনে গিয়ে বসলেন, বললেন,—তুই দরজার বাইরে বোস। দুর্গাবিনোদ বাইরে বসে পড়ল।

কালীবাবা ওঁ হ্রিং বলে মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করলেন। মাঝে মাঝে জবা ফুল তুলে প্রতিমার চরণে অর্ঘ্য দিতে লাগলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে পূজা করার পর হাঁক দিয়ে উঠলেন—মা কালী করাল-বদনা-লোল-জিহ্বা মা—তারপর পঞ্চপ্রদীপের আরতি শুরু করলেন।

এবার প্রদীপের আলোয় ধোঁয়ার মাঝেও কিছু কিছু নজরে পড়তে লাগল। দুর্গাবিনোদ দেখল ঘরের মধ্যে দরজার পাশে আরেকজন কে বসে আছে। ও কে? কখন এলো?

পঞ্চপ্রদীপ ঘুরতে ঘুরতে আলোটা যখনই সেদিকে পড়ে দুর্গাবিনোদ লোকটির মুখের পানে নজর করে। কি বিশ্রী ফ্যাকাশে মুখ, যেন মড়ার মতো।

আরতি শেষ হয়। শাঁখ বাজিয়ে কালীবাবা বসলেন। মদের তিনটি বোতল মায়ের চরণে স্পর্শ করিয়ে হাঁক দিলেন—মা কালী করাল-বদনা...লোল-জিহ্বা মা।

তারপর বললেন—প্রণাম কর—প্রসাদ নে—

দুর্গাবিনোদ প্রণাম করল।

বোতল থেকে এক ভাঁড় মদ ঢেলে কালীবাবা বসে থাকা সেই লোকটির মুখে ধরলেন, বললেন—খাও।

লোকটি মদ খেল।

কালীবাবা সেই ভাঁড়ে আবার মদ ঢাললেন। তাকে বললেন—ধরো, ওকে

দাও —

লোকটি ভাঁড় ধরল, হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল দুর্গাবিনোদের দিকে।

মানুষের হাত যে এতটা লম্বা হয়, দুর্গাবিনোদ তা জানত না। ভাঁড় সুদ্ধ হাতখানা সোজা দরজা পার হয়ে চলে এলো তার মুখের কাছে।

দুর্গাবিনোদ থ'।

—ভয় পাসনি, খা, মায়ের প্রসাদ—কালীবাবা বললেন।

দুর্গাবিনোদ তাকিয়ে দেখল। হাতখানায় কোথাও এতটুকু মাংস নেই, সবটাই কঙ্কাল। হাতের মালিকের পানে তাকাল—মুখ কই, কঙ্কালের করোটি।

দুর্গাবিনোদের সারা দেহ কেঁপে উঠল।—না না বলেই এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠেই সে ছুটল। সোজা পথ দিয়ে সে ছুটল। কানে এলো পিছনে কে যেন অট্টহাসি হাসছে।

সেই অন্ধকার পথে পুরো দু'মাইল ছুটে এসে দুর্গাবিনোদ থামল একেবারে বাজারের মধ্যে। তখনও সকাল হতে অনেক দেরী। ভয়ে ভয়ে সে পিছন পানে তাকাল, পিছনে কেউ আসছে কিনা।

বাজারে অনেক ঘরের দাওয়ায় মানুষ শুয়েছিল। তাদের দেখে দুর্গাবিনোদ ভরসা পেল।

একটা দোকানের দাওয়ায় সে বসে পড়ল।

পরক্ষণেই মনে হল সেই হাতখানা তার মুখের সামনে মদের ভাঁড়টা যেন এগিয়ে ধরেছে। দুর্গাবিনোদ চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সকালে বাজারের লোকেরাই দুর্গাবিনোদকে বাসে তুলে দিয়েছিল।

ভয়ের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে ক'দিন তার সময় লেগেছিল।

খুনী ভূতের কাণ্ডকারখানা

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

আমার মামার বাড়ি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত নৃসিংহপুর গ্রামে। যে সময়কার কথা বলছি তখন আমার বয়স ছিল সাত কি আট। বিরাট দুমহলা বাড়ি, চারদিকে ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু বাড়ির লোকেরা ভূতের ভয়ে মূল দোতলা দালানটায় রাত্রিকালে শুতে পারত না। পূর্বদুয়ারী দালানটার সামনে ছিল মস্তবড় উঠোন। উঠোনটার দুপাশে ছিল লম্বা টানা দুটো একতলা ঘর। বাঁ দিকের ঘরখানাতে রান্নাবাড়া হত আর ভাঁড়ার থাকত। ডানদিকের ঘরখানাতে রাত্রিবেলায় শোয়া হত। ডানদিকের লম্বা ঘরখানার সঙ্গে লাগোয়া দুদিকে দরজাওয়ালা একখানা ঘর ছিল। সেই ঘর দিয়ে বারমহলে যাওয়া হত বলে ঘরখানাকে বলা হত চলন ঘর। ঘরখানা পড়ে থাকত। রাত্রিকালে ডোমেদের পতিলাল নামে এক সাহসী লোক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে ঐ ঘরখানায় শুত। সদর দরজার বাইরে সামনেই ছিল একটা পুকুর। চারদিকে বাঁশঝাড় আর কয়েকটা গাছ। পুকুরটার ডানদিকের কোণে বাড়ির পাঁচিলের কাছাকাছি ছিল বিরীক্ষি একটা তেঁতুলগাছ। মোটা গুঁড়িওয়ালা বিশাল দেহী গাছটা কতদিনের পুরনো তা কেউ বলতে পারত না। তবে লোকমুখে শোনা যায়, গাছটা নাকি চালানে গাছ। বহুকাল আগে গাছচালানো মন্ত্র-জানা এই গাঁয়েরই কোন লোক একটা উড়ন্ত গাছকে দেখে মন্তর দ্বারা নামিয়ে সেটাকে বসিয়ে দেয় এইখানে।

ছেলেবেলা থেকেই মামার বাড়ির প্রতি আমার একটা বেজায় টান ছিল। লোকে বলত, মামার বাড়িতে আমার জন্ম হয় এবং এই বাড়ির উঠোনের এক কোণে আমার নাড়ী পোঁতা ছিল বলেই আমার টানটা এত বেশী ছিল। কিন্তু আমার সে টানের আসল কারণটা কেউ জানত না। মামার বাড়ির প্রতি আমার টানের আসল কারণ ছিল ঐ দালানটা। ভূতুড়ে দালানটাকে ঘিরে ভূতের যেসব কাণ্ডকারখানা চলত, মামার বাড়ি এলেই সেই সব কাণ্ডকারখানার গল্প শুনতে পেতাম। সেটাই ছিল আমার আকর্ষণের বস্তু।

মামার বাড়িতে যতদিন থাকতাম, রোজ রাতে লম্বাঘরে শোবার সময় মা মাসিমা ও আমার দিদিরা মিলে ভূতের গল্প করত। তখন পতিলাল মামার স্ত্রী

পুপীমামীও এসে যোগ দিত। ভূতুড়ে কাণ্ড সম্বন্ধে তার নিজের অভিজ্ঞতার কথাও বলত। তখনো পর্যন্ত ভূত আমি দেখিনি। মৃত্যু, পরলোক বা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। তবু টিমটিমে লণ্ঠনজ্বালা, আলোছায়ার মৃদু

কাঁপনভরা ঘরে বসে বা শুয়ে সেই সব গল্প শুনতে আমার বড় ভাল লাগত। গল্প শুনতে শুনতে একটা আতঙ্কিত বিস্ময় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ত আমার শিশুমনে। একটা অনির্বচনীয় উত্তেজনার রোমাঞ্চ জাগত আমার সারা শরীরে। গা-ছমছমে ভয় লাগার সঙ্গে একটা ভাল-লাগা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত কেমন যেন।

আমার একমাত্র মামার কিশোর বয়সেই মৃত্যু হয়। আর সে মৃত্যুর কারণটাও নাকি ভৌতিক। শুনেছিলাম তাঁর মৃত্যুর তিন মাস আগে এই বাড়িতেই একদিন দুপুরবেলায় যখন কেউ ছিল না, হঠাৎ ভূত দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েন তিনি। দালানটার সব দরজা জানালা তখন বন্ধ থাকলেও সামনের দিকে হলঘরের একটা জানালা হঠাৎ খুলে যায় আর সেই খোলা জানালা দিয়ে বরফের মতো সাদা লম্বা একটা হাত বেরিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে মামাকে। তা দেখে ভয়ে খুব জোর একটা চিৎকার করে মাটিতে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়েন মামা। চিৎকার শুনে বাইরে থেকে লোকজন ছুটে এসে মুখে চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরায়। এই ঘটনার তিন মাসের মধ্যেই মৃত্যু হয় মামার। মামার মৃত্যুর অনেক আগেই আমার দাদু ও দিদিমার মৃত্যু হয় এই বাড়িতেই। তারও আগে আমার দুই মাসিও কুমারী অবস্থায় এই বাড়িতেই মারা যান।

সবার আগে এই বাড়িতে প্রথম মৃত্যু হয় আমার মার ঠাকুরমার। তারপর মৃত্যু হয় মার বৃদ্ধ ঠাকুরদার।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর মার দাদু ঐ দালানটার মধ্যেই একা শুতেন। তখন তাঁর বয়স নব্বই হলেও তিনি বেশ শক্ত সমর্থ এবং সাহসী ছিলেন। একদিন ভোরবেলায় তাঁর শোবার ঘরে লণ্ঠনের আলোটা সবেমাত্র নিভিয়ে দিয়েছেন, এমন সময় আধো অন্ধকারে দেখতে পেলেন, দালানের সিঁড়ির পাশের চোরা-কুঠুরী থেকে চওড়া লালপাড় শাড়ী পরা ঘোমটা মাথায় তাঁর স্ত্রীর মতো দেখতে এক নারীমূর্তি এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। সে জ্ঞান আর ফেরেনি। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শোনা যায়, মার দাদু দালানের সিঁড়ির নীচে চোরা-কুঠুরীর মেঝে বা দেয়ালে বেশ কিছু গুপ্তধন পুঁতে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই গুপ্তধনের কথা তাঁর স্ত্রী ছাড়া কাউকে বলেননি জীবনে, মৃত্যুকালেও কাউকে বলে যেতে পারেননি। তাই তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর প্রেতাত্মা ভূত হয়ে সেই ধন আগলাচ্ছে, যাতে সেই ধনে কেউ হাত দিতে না পারে, তার জন্য সেই দুটো প্রেতাত্মা সদা সর্বদা কড়া নজর রেখে চলেছে বাড়িটার উপর। সারাদিন প্রেতাত্মা দুটো বাড়ির পিছনের আমগাছে অথবা সামনের তেঁতুলগাছে থাকত আর রাত্রি হলেই তারা গাছ থেকে নেমে আসত

বাড়ির ছাদে। দালান অথবা লম্বা ঘরের ছাদের উপরে নামার সময় দুম্ করে একটা শব্দ হত। তারপর তারা সারারাত ধরে ছাদের উপর ঘোরাফেরা করত। কখনো বা ছাদের উপর চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে থাকত।

তবে এই দুই প্রেতাত্মা ছাড়াও আরো কিছু ভূত ছিল দালান বাড়িতে। বাড়িতে সবাই বলাবলি করত, যাদের অকালে মৃত্যু অথবা অপঘাতে মৃত্যু হয়, তাদের সকলের আত্মার সদ্‌গতি হয় না। তাদের অনেকেরই মৃত আত্মা অশরীরী বায়ুভূক প্রেত হয়ে বাড়ির আশেপাশে বা আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে ছায়ামতো আকার ধারণ করে। আমার মার বাবা-মাও প্রৌঢ় বয়সে মারা যান। তাঁদের কারো বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়নি। তাঁরা কেউ দীর্ঘদিন রোগভোগ করেননি, অসুখ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই কথা বন্ধ হয়ে মারা যান। ফলে মৃত্যুকালে কেউ কোন কথা বলে যেতে পারেননি। দাদু ও দিদিমার মৃত্যুর পর আমার আর এক মাসির মৃত্যু হয়। তাঁর তখন বিয়ে হলেও কোন ছেলেপুলে হয়নি।

মামাদের কেউ না থাকার জন্য সেখানকার সব বিষয়সম্পত্তি আমার মা মাসিমাকেই দেখাশোনা করতে হত! আমার পৈত্রিক বাড়ি ছিল মামার বাড়ি থেকে দশ বারো মাইল দূরে গোপালপুর নামে একটা গ্রামে। আমি সেখানে থেকেই পড়াশুনা করতাম। বাবার মৃত্যুর পর মাকে দু জায়গার বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করতে হত। মাসিমা থাকতেন মেসোমশাই-এর চাকরির জায়গায়। তবে মা যখন মামার বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকতেন মাসিমাও তখন চলে আসতেন সেখানে।

মামার বাড়ি যাবার কথা শুনলেই আমার খুব আনন্দ হত। আর সেই আনন্দের প্রধান কারণ ছিল ভূতের কাণ্ডকারখানা শোনা আর ভূত দেখার এক আতঙ্কিত কৌতূহল। ভূতের গল্প যে শুধু মা মাসিমার কাছেই শুনতাম তা নয়, সে গল্প বলার আরো একজন ছিল। সে হল বলাইকাকা। বলাইকাকা ছিল জাত বোষ্টম। নাম বলহরি দাস বৈরাগী। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। শক্ত চেহারা শ্যামবর্ণ। মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল। গলায় তুলসীকাঠের মালা। সে ছিল আমার মামার বাড়ির কর্মচারী। বাড়ি আর জমিজমা দেখাশোনা করত। কেউ না থাকলে সে নিজেই রান্না করে খেত আর বাড়িতেই শুত। বলাইকাকা মানুষ হিসাবে যেমন খুব ভাল ছিল, তেমনি ছিল দারুণ সাহসী। আমাদের যে দালানটায় দিনের বেলায় ঢুকতে সবাই ভয় পেত, চাকরি নিয়ে এ বাড়িতে আসার পর থেকে সেই দালানের হলঘরে একা একটা লণ্ঠন জ্বেলে শুত সে। বলাইকাকা নিজে ভূত প্রেতে কোন ভয় না করলেও আমাকে অনেক ভূতের গল্প বলত।

মামার বাড়িতে আমার আর একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল। সে হল আমার প্রায় সমবয়সী ও খেলার সাথী নারাণ। নাম নারায়ণচন্দ্র মালিক, জাতিতে কোটাল। আমাদের পাড়াতেই থাকত। গ্রামের পাঠশালা পর্যন্ত পড়াশুনা করে তার বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করত আর বাড়ির গরু বাছুর দেখাশোনা করত। বয়স অনুপাতে তারও খুব সাহস ছিল। আমি মামার বাড়িতে গেলে রোজ সারা বিকেল আমার কাছে থাকত। সন্ধ্যের সময় আমাদের বাড়িতে বসে থাকত। সেও ভূতের গল্প বলত। তবে সে কখনো ভূত দেখলে ভিরমি খেত না। বলাইকাকা যেমন ভূত দেখলে গলার মালাটা ছুঁয়ে হরিনাম জপ করত, সেও তেমনি রামনাম জপ করত সাহসের সঙ্গে। তার বিশ্বাস, হরি বা রামের নাম করলে ভূত পালিয়ে যায়। এরই জন্য নারাণকে আমার খুব ভাল লাগত।

তখন কার্ত্তিক মাস। পুজোর ছুটিতে মামার বাড়িতে ছিলাম আমি। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি লম্বাঘরে লণ্ঠনের আলোয় পড়ছিলাম। মা মাসিমা ছিল রান্নাঘরে। বলাইকাকা দালানে কি একটা কাজ করছিল। তখন মেসোমশাইও বাড়িতে ছিলেন। তিনি তখন বৈঠকখানা ঘরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাদের বৈঠকখানা ছিল দু মহলা বাড়িটার সীমানার বাইরে। এমন সময় নারাণ ছুটতে ছুটতে এসে বলাইকাকাকে ডাকল, একটা জিনিস দেখবেন আসুন। বলাইকাকার সঙ্গে আমিও বেরিয়ে গেলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাঁচিলের পাশ দিয়ে বৈঠকখানার পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল নারাণ। তারপর সেই বিরীক্ষি তেঁতুল গাছটার উপর দিকে হাত বাড়িয়ে বলাইকাকাকে কি দেখাল।

তখনও অন্ধকার গাঢ় হয়নি। সেই পাতলা অন্ধকারে তেঁতুলগাছটার মাথার উপরে যা দেখলাম তাতে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। আমার পাশে তখন বলাইকাকা আর নারাণ না থাকলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। আমি দেখলাম লালপাড় শাড়িপরা অতি বিশাল শুভ্রধবল এক নারীমূর্তি তেঁতুলগাছের মাথায় একটা পা আর দালানের ছাদের উপর একটা পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। এত উঁচু যে, মনে হল, তার মাথাটা আকাশ ভেদ করে আমাদের দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বলাইকাকা গলার মালায় হাত দিয়ে 'হরিবোল হরিবোল' বলতে লাগল। নারাণ রামনাম জপ করতে লাগল।

আমরা বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম, মা মাসিমা লণ্ঠন হাতে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারাও বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। বলাইকাকা কিন্তু কাউকে কিছু না বলে একহাতে একটা লণ্ঠন আর একহাতে একটা নারকেল ঝাঁটা হাতে করে সোজা দালানের ছাদে গেল। তারপর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে

তেঁতুলগাছটার দিকে মুখ করে ঝাঁটা উঁচিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, আয় যত সব ভূতপ্রেত, ডাকিনীযোগিনী কে কোথায় আছিস। এই ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব। আমি জাত বোষ্টমের ছেলে। আমার গলায় আছে তুলসীকাঠের মালা। এতে স্বয়ং বিষ্ণু বাস করেন।

এই বলে গোটা ছাদটাতে ঝাঁট দিতে লাগল বলাইকাকা। তখন কেবলি আমার মনে হতে লাগল, বলাইকাকা মানুষ নয় দেবতা। যাই হোক, ভূত দেখার প্রথম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় সে রাতে ঘুমই হল না আমার। ভাবলাম, ঐটাই সেই খুনী ভূত যা একের পর এক করে অনেকের প্রাণ হরণ করেছে। আবার কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। তবে বলাইকাকার কথা ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম মনে।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা হল না। সেই খুনী ভূতের কাণ্ডকারখানা একেবারে বন্ধ করতে পারল না বলাইকাকা। এর পর বছরখানেকের মধ্যে আমার বড়দিদি এই বাড়িতেই মারা গেল। বড়দি অবশ্য কিছুদিন হতে স্ত্রীরোগে ভুগছিল। কিন্তু কিছুদিনের জন্য ঠাইনড়া হয়ে মামার বাড়িতে এসেই রোগ তার বেড়ে যায়। মৃত্যুকালে সেই খুনী ভূতটাকে তার আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখে বড়দি।

এর পর মেসোমশাই চাকরি ছেড়ে এসে বাড়িতে লোকজন রেখে চাষ করতে লাগলেন। বাড়িতে রাঁধুনি, ঝি, ক্ষেতমজুর রাখতে হল। লোকজনের ভীড়ে গমগম করতে লাগল বাড়িটা পর্যন্ত। দূর থেকে শশধর পণ্ডিত নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে আনিয়ে বাড়িতে যজ্ঞ ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা হল। মেসোমশাই মাসিমা দালানের একটা ঘরেই শুতে লাগলেন। একেবারে বন্ধ হয়ে গেল খুনী ভূতের কাণ্ডকারখানা।

মামার বাড়িতে গিয়ে বড় ভাল লাগত আমার। আগেকার সেই নিরানন্দ নীরব ভূতুড়ে বাড়িটা আনন্দে ঝলমল করতে লাগল। বছর কতক বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। কিন্তু সহসা নীল নির্মেঘ আকাশে কালো মেঘের ছায়ার মতো হরষে বিষাদ নেমে এল বাড়িতে। ঘুসঘুসে জ্বরে ধরল মেসোমশাই এক। প্রথম প্রথম রোজ সন্ধ্যের সময় জ্বরটা এসে সারারাত ভোগ করে সকালে ছেড়ে যেত। কোন ওষুধে কাজ হল না। কিছুদিন পর আরো বেড়ে গেল। জ্বরটা তখন সকালেও ছাড়ত না। তার উপর নিউমোনিয়া হল। উত্থানশক্তি রহিত হয়ে দিনরাত বিছানাতেই পড়ে থাকতেন মেসোমশাই। খবর পেয়ে মা আমাকে স্কুলবোর্ডিং -এ রাখার ব্যবস্থা করে মামার বাড়িতে এসে মাসিমার কাছেই থাকতে লাগলেন। আমি তখন নবম শ্রেণীতে পড়ি।

মা এসে শহর থেকে বড় ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করলেন। দামী ওষুধের ব্যবস্থা হল। সবাই বলল, দালান ঘরে শোয়ার জন্যই জ্বর যাচ্ছে না। কিন্তু মেসোমশাই শিক্ষিত মানুষ কোন ভয় বা কুসংস্কার ছিল না তাঁর যুক্তিবাদী মনে। তাই দালান ছেড়ে লম্বাঘরে শুতে রাজী হলেন না। তবে জ্বরটা যে ভূতুড়ে তা তিনি শেষকালে স্বীকার করলেন। কিন্তু তখন কোন উপায় ছিল না।

আমি মাঝে মাঝে দেখতে আসতাম মেসোমশাইকে। আমার মাসতুতো ভাইবোনেরা তখন ছোট। একদিন সন্ধ্যের সময় মেসোমশাই ক্ষীণকণ্ঠে আমাকে বললেন, ভূত তাড়াতে চাকরি ছেড়ে এখানে এসে বাস করছিলাম। এখন ভূত আমাকেই তাড়াচ্ছে। আমি মরলেই গোটা বাড়িটাকে আবার গ্রাস করবে ওরা। তাই বলছি বৈঠকখানা ঘরের চারিদিকে পাঁচিল তুলে ঘর বাড়িয়ে ওখানে মা মাসিমাকে নিয়ে উঠে যাব যত তাড়াতাড়ি পারি। এখানে থাকলে আরো বিপদ ঘটবে।

দিনকতকের মধ্যেই মারা গেলেন মেসোমশাই। আবার নিরানন্দ হয়ে উঠল গোটা বাড়িটা। চাষ তুলে দেওয়া হল। বলাইকাকা আর একজন ঝি ছাড়া বাকি লোকজন সব ছাড়িয়ে দেওয়া হল। রাত্রিতে মা মাসিমা থাকত লম্বাঘরে। বলাইকাকা থাকত দালানে। পতিলালমামা শুত চালাঘরে। বাড়ির ঝি মাসির কাছে শুত লম্বাঘরে।

বৈঠকখানাটাকে বসবাসের যোগ্য করে তোলার জন্য কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। কাজ শেষ হলেই ওখানে উঠে যাওয়া হবে ভূতুড়ে ভিটেটাকে চিরদিনের মতো ভূতের হাতে ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু তার আগেই আবার একটা অঘটন ঘটল।

একদিন দুপুরবেলায় মা মাসিমা দালানে কাজ করছিল। মাসিমার কোলের ছেলেটা হলঘরের খাটের উপর শোয়ানো ছিল। ছেলেটা ঘুমিয়েছিল। ছেলেরা উঠোনের ছায়ায় খেলা করছিল। বলাইকাকা বাইরে ছিল। কাজ সেরে মাসিমা ছেলেটাকে তুলতে গিয়েই দেখল ছেলেটা মরে পড়ে আছে। গলায় আঙ্গুলের দাগ বসা। জিবটা বেরিয়ে এসেছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মাসিমা। এই আশ্চর্যজনক অলৌকিক মৃত্যু দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই।

সেইদিনই দালান থেকে সব জিনিসপত্র বার করে অন্য সব ঘরে রাখা হল। ঠিক হল বৈঠকখানা ঘরের পাঁচিলের কাজ শেষ না হলেও দিনকতকের মধ্যে ওখানেই উঠে যাওয়া হবে।

আমার মামার বাড়িটা ছিল নির্জন পরিবেশে। বাড়ির পিছনে ও বাঁ দিকে ছিল মাঠ। প্রতিবেশী বলতে ছিল খুবই কম। যাও বা ঘরবাড়ি ছিল তা দূরে দূরে। এদিকে আমাদের বাড়িতে তখন মা মাসিমা খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

খারো মেয়েলোকের দরকার। দিনের বেলাই কাটতে চায় না। মা তাই আমার দুই দিদিকে তাদের শ্বশুড়বাড়ি থেকে আনা করালেন।

আমি ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ. পড়ছি কলকাতায় মেসে থাকে, দিনকতকের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। মা তখন মামার বাড়িতেই থাকতেন। আমার দিদিরাও বেশ সাহসী ছিল। তারা আসায় মনে কিছুটা জোর পেলেন মা মাসিমা। আমি রাত্রিতে নারাণকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে শুতাম। বাকি সবাই লম্বাঘরে শুত।

সেদিন রাত্রিতে আমি বৈঠকখানা ঘরে নারাণের সঙ্গে গল্প করছি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে। তখন শীতাল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি। হঠাৎ ভিটেবাড়ি থেকে মেয়েদের সমবেত কান্নার রোল উঠল। আমরা তখন দুজনে ছুটে গেলাম বাড়িতে। দেখলাম আমার দুই দিদির দুটি কোলের শিশু মাসিমার ছোট ছেলের মতো অকস্মাৎ বিনা রোগে রহস্যজনকভাবে মারা গেছে। তেমনি গলায় কালসিটে দাগ। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ভূতের অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু ভূত যে খুনী মানুষের মতো মানুষ খুন করে, তা কখনো শুনিনি। এর আগে এ বাড়িতে যেসব মৃত্যু হয়েছে, তা খুনী ভূতের পরোক্ষ প্রভাবের ফলে এবং তা কল্পিত হলেও হতে পারে। কিন্তু এ তিনটি শিশুমৃত্যুর ঘটনায় খুনী ভূতের প্রত্যক্ষ হাত ছাড়া তার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না আমি এবং পরবর্তী কালেও বুদ্ধি দিয়ে অনেক বিচার করেও পাইনি।

পরদিন সকালেই ভিটেবাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব নিয়ে বৈঠকখানা বাড়িতে গিয়ে উঠল। বলাইকাকা হতাশ হয়ে বলল, আমি হেরে গেলাম বাবা। মনে হচ্ছে, ঠাকুর দেবতা সব মিথ্যে।

এর পর বলাইকাকা কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য গাঁয়ে চাকরি করতে গেল। একজন গণৎকার এসে মা'দের বলল, অনেক আগেই তোমাদের ভিটে ছাড়া উচিত ছিল। যাই হোক আর কোন উৎপাত হবে না তোমাদের উপর। তবে রাত-বিরাতে তোমাদের কেউ যেন ঐ বাড়ির সীমানা দিয়ে না যায় বা বাড়ির গুপ্তধন তোলার চেষ্টা না করে। গাঁয়ের কোন দূষিত জায়গা দিয়েও কেউ যেন না যায়।

ক্রমে বছরখানেক কেটে গেল। আমি তখনো কলকাতায় থেকে পড়ছি। খুনী ভূতের কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। তখন শীতকাল। দিনকতকের জন্য ছুটি পড়ায় আমি একদিন মামার বাড়ি যাবার জন্য এগারটার ট্রেনে হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হলাম। তখন ধান ওঠার সময়। মা মামার বাড়িতেই ছিলেন।

ভেবেছিলাম বেলাবেলি বাড়ি পৌছাব। কিন্তু ট্রেনটা পথে অত্যধিক লেট করায় ওসকরা স্টেশনে পৌছাতেই পাঁচটার উপর হয়ে গেল। তারপর স্টেশন

থেকে বাস ধরে দেবপুরের চটিতে নামতে ছটা বেজে গেল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্ধকার রাত। দেবপুর থেকে নৃসিংহপুর মাঠের উপর দিয়ে সোজাপথে গেলে দু মাইল। কিন্তু অন্ধকারে মেঠোপথে না গিয়ে বাঁধা সড়ক ধরে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত গেলাম। তারপর ক্যানেলের বাঁধ ধরে গাঁয়ের পথে যেতে লাগলাম। বাঁধ থেকে নেমে কোন্ দিক দিয়ে গাঁয়ে ঢুকব তা ভাবতে লাগলাম। একদিকে শ্মশান আর মুসলমানদের গোরস্থান, অন্যদিকে দীঘির পাড়ের দূষিত জায়গা আর বোষ্টমদের সমাধিক্ষেত্র। বর্তমানে ক্ষ্যাপাবাবা নামে এক কালীসাধক এসে সে শ্মশানে ঘর করে কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে এক পবিত্র মনোরম আশ্রমে পরিণত করে তুলেছে শ্মশানটাকে। কিন্তু তখন এ সব কিছু ছিল না। তাই পশ্চিম প্রান্তের দীঘির পাড়ের পথটাই ধরলাম।

লম্বা দীঘি। দু'পারে গাছের এলোমেলো জটলা। আমি ডানদিকের পথ ধরে এগোতে লাগলাম। কিন্তু যেতে যেতে দুদিকে দুটো গাছের তলায় এসেই হঠাৎ গাটা ছমছম করে উঠল আমার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। পা আর উঠল না। একবার উপর দিকে তাকাতেই অন্ধকারে আবছা দেখলাম সেই খুনী ভূতটাই আকারটাকে ছোট করে দুটো গাছের মাথায় দুটো পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, দাঁত বার করে হাসছে। তখন গণৎকারের কথাটা মনে পড়ে গেল আমার, 'গাঁয়ের মধ্যে কোন দূষিত জায়গায় তোমাদের কেউ যেন না যায়।' বুঝলাম, এবার আর আমার নিস্তার নেই। আমি গাছের তলা দিয়ে যেতে গেলই আমার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকাবে। কাছে কোন বাড়িও নেই। তাছাড়া শীতকাল বলে সন্ধ্যের পরেই সবাই বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। গোটা গাঁ প্রায় নিশুতি।

এমন সময় আমার বলাইকাকার কথাটা মনে পড়ে গেল। একমাত্র বলাইকাকাই আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত। আমার সব জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তিবোধ ব্যর্থ হয়ে গেল। কাউকে ডাকতেও পারলাম না চিৎকার করে।

ঠিক সেই সময় আমি দেখলাম, আমার উল্টোদিকে অর্থাৎ গাঁয়ের ভিতর থেকে একজন লোক আসছে। কিছুটা সাহস পেলাম তাতে। কাছে আসতে বললাম, কে গো?

লোকটি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, কোন ভয় নাই বাবা, এস আমার সঙ্গে।

গলা শুনে দেহে প্রাণ ফিরে এল আমার। আর একটু হলেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতাম আমি। গলার স্বরে বুঝলাম, বলাইকাকা, যার কথা ব্যাকুলভাবে ভাবছিলাম এতক্ষণ। আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললাম, 'বলাইকাকা, তুমি কি

অন্তর্যামী? কিন্তু এ সময় এলে কোথা থেকে? তুমি ত এখন এখানে থাক না।

বলাইকাকা বলল, শরীরটা খারাপ বলে দিনকতকের ছুটি নিয়ে এসেছি। যাই হোক, এস আমার সঙ্গে। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি আর কোন কথা না বলে বলাইকাকার পিছু পিছু চললাম। কিন্তু বাড়ির দরজার কাছে এসেই পিছন ফিরে আর দেখতে পেলাম না বলাইকাকাকে। ডেকে কোন সাড়াও পেলাম না। ভেবেছিলাম বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গল্প করব। কতদিন পর দেখা হল।

এত রাতে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল মা মাসিমা। বকাবকি করতে লাগল। আমি ট্রেন লেটের কথা বললাম। কিন্তু বলাইকাকার কথাটা বললাম না।

কিন্তু পরদিন সকালেই নারাণের কাছে গিয়ে সব বললাম। কথাটা শুনেই চমকে উঠল নারাণ। বলল, সেকি কথা দাদা, বাবাঠাকুর যে তিন চার দিন আগেই দেহ রেখেছেন। ঐ দীঘির পাড়েই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। এখন গোঁসাইদের বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে ওঁর স্ত্রী থাকেন।

আমি তখন নারাণকে সঙ্গে নিয়ে বলাইকাকার সমাধির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর নতজানু হয়ে ভক্তি ভরে বললাম, বলাইকাকা, জীবনে তুমি আমাদের অনেক উপকার করে গেছ। মৃত্যুর পরেও আজ তুমি আমার যে উপকার করে গেলে তা পুনর্জীবন দানেরই তুল্য। তোমাকে ভূতপ্রেত ভেবে ছোট করব না। তুমি যথার্থ হরির দান। একজন মহাপ্রাণ বৈষ্ণব। তোমার মহান আত্মা মানবকল্যাণের জন্য। শরীরী রূপ ধরে গতরাতে আমাকে মৃত্যুসম চরম ভয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে যে উপকার করে গেলে, আমি তা জীবনে ভুলতে পারব না। ভগবানের কাছে কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি যেন আপন পুণ্যবলে বৈকুণ্ঠে গিয়ে বিষ্ণুর পর্ষদ হয়ে অক্ষয় স্বর্গসুখ ভোগ করতে পার।

যে ভূতকে আমি বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না, যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না, সেই ভূতের ভালমন্দ দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ কাজের এক জীবনগত অভিজ্ঞতায় যে পরম বিস্ময় আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম, সেই বিস্ময়ের অনুভূতি আমার মনের মণিকোঠায় এক অক্ষয় রত্নরূপে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে আজও। আর থাকবেও চিরদিন।

ভূতুড়ে গাড়ির যাত্রী

কণা বসু মিশ্র

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। যেন বিশাল একটা হিমবাহ গলেগলে পড়ছে। জানুয়ারির শীতলতম রাত। শহরটা সারা গায়ে বরফের গুঁড়ো মেখে অন্ধকারে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। পটকা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোন্ দিকে যে ছুটছে হুঁশ নেই। বোধ হয় কাকঝোরার দিকে। কারণ, পরদিন সকালে ওই কাকঝোরার কাছেই হিলকার্ট রোডের ওপর ওর জ্ঞান ফিরেছে কিনা।

ওই সময় দার্জিলিং যেতে পইপই করে বারণ করেছিলেন মা। কিন্তু যেখানে নিষেধ সেখানেই যে পটকা। তা ছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে ও বাজিও ধরেছিল, শীতের সঙ্গে লড়াই করে তবেই কলকাতা ফিরবে। চট করে দার্জিলিং মেলের একখানা রিজার্ভেশান পেতেও ওর কোন অসুবিধা হয়নি। কেননা, ভিড়টা তখন কলকাতামুখী। শীতের দেশে শীতের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। দলেদলে লোক পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে সমতলভূমির দিকে।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একটা অটো নিয়ে পটকা সোজা চলে যায় শিলিগুড়ি বাস টার্মিনাসে । তখন সন্ধ্যে সাতটা হবে। লাক্সারি বাসগুলো পর পর দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ আগেই নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। সাতটার পর পাহাড়গামী সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ। নেহাত বাঘের বাচ্চা না হলে কেউ এ সময় দার্জিলিং আসে? পটকা নামের দিক থেকে ছেলেমানুষ হলেও সে এখন রীতিমতো সাবালক। ওই নামটার ওপরে পটকার মোহ তো নেই, বরং দারুণ রাগ। পৈতৃক সম্পত্তি অনেকেরই থাকে না। কিন্তু পিতৃদত্ত ভাল একটা নাম পাওয়ার অধিকার তো সকলেরই থাকে? এই কৈফিয়ত যিনি দিতে পারতেন, তিনি পটকার বাবা। অনেকদিন আগেই স্বর্গারোহণ করেছেন। পটকার মা কলেজে পড়ান। পটকা স্কুলের বারো ক্লাসের গণ্ডি ডিঙিয়ে সম্প্রতি কলেজে ঢুকেছে। তাই উঠতি বয়সের চ্যালেঞ্জটা ওর যেমন আছে, তেমনই আছে দুর্গমকে জয় করার নেশা। পটকার মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সটাও করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মায়ের এক ছেলে হওয়ার যা জ্বালা! মা কিছুতেই চান না, ছেলে তেনজিং নোরগে হোক, কিংবা এডমন্ড হিলারি।

পটকা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে যদি কোন ল্যান্ডরোভার ভাড়া পাওয়া যায়। খিদের জ্বালায় ওর পেটের মধ্যে ছুঁচো দৌড়চ্ছে। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে

দিগ্‌ভ্রমনে পায়চারি করতে থাকে বাস টার্মিনাসে। তারপর ফুটপাথের চায়ের স্টল থেকে এক খুরি চা নেয় আর দুটো বিস্কুট। পটকা চায়ের ভাঁড়ে ঠোঁট ছোঁয়াতেই দ্যাখে, একজন নেপালি ড্রাইভার একটা খালি ল্যান্ডরোভারের স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। ভাঁড় ফেলে দিয়েই পটকা চোঁ-চোঁ দৌড়। ও আবদারের ভঙ্গিতে বলে, "দাজু। তোম দার্জিলিং মে জায়গা? হামকো লে চলো গে?"

ড্রাইভার বলে, "কিতনা ফগি ওদোর! হাম ক্যায়সা যায়গা?"

কিন্তু পটকা নাছোড়বান্দা, "তোম কিতনা রূপেয়া মাঙতা হ্যায়?"

ড্রাইভার হাসে। পান খাওয়া লাল ছোপের হাসি। বলে, "বহুত ঠান্ডি হ্যায়। রূপেয়া তো জাদা দেনা পড়ে গা।"

পটকা বলে, "কই বাত নেহী হ্যায়। জরুর দেগা।"

ও ড্রাইভারের চোখের সামনে চারখানা একশো টাকার নোট বাগিয়ে ধরে। টিউশানির টাকায় পটকার পকেটটা বেশ গরম। সেইসঙ্গে মাও কিছু ট্রাভেলার্স চেক দিয়ে দিয়েছেন, দার্জিলিঙের ব্যাঙ্ক থেকে পটকা যাতে ভাঙিয়ে নিতে পারে। চারদিকে ছিনতাই, ডাকাতি যে পরিমাণ হচ্ছে, তাই ক্যাশ টাকা ওকে বেশি সঙ্গে নিতে দেননি মা। পটকা টাকাটা বাগিয়ে ধরেই ভাবে, কাল রোববার। ব্যাঙ্ক বন্ধ। ড্রাইভার ছোঁ মেরে নোটগুলি কেড়ে নেয়। পটকা মনে-মনে বিড়বিড় করে, 'মাটি টাকা, টাকা মাটি।'

টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পটকা একলাফে উঠে বসে ড্রাইভারের পেছনের সিটে। স্টার্ট দিতেই গাড়ির এঞ্জিন গর্জে ওঠে। রাস্তার দু'পাশে শাল গাছের সারি। জঙ্গল। ঝিঁঝি ডাকছে। অদ্ভুত গলায় কোন একটা পাখিও ডাকছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মধ্যে হিমেল হাওয়ার হাড় কাঁপুনি, চারিদিকে দারুণ নির্জনতা। গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটাটা একশো আর আশি মাইলের মধ্যে লাফালাফি করতে-করতে গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা খায় একটা শাল গাছের গায়ে। ড্রাইভার ক্ষিপ্রহাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নেয়। বুনো শূকরের মতো গোঁ-গোঁ করতে-করতে ল্যাণ্ডরোভার ফের ছুটে চলে।

ড্রাইভারের কান-মাথা কালো মাফলার দিয়ে জড়ানো। গায়ে গরম কালো পুলওভারের ওপর গরম কালো কোট। ওর চ্যাপটা মুখখানায় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কপালের নীচে কুতকুতে একজোড়া চোখ।

ওরা সেবক ব্রিজ পেরিয়ে যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে শুরু হয় আঁকাবাঁকা পথ। যে পথ ফিতের মতো চলে গেছে কখনও উঁচু, কখনও নীচু। একেই তো বলে জিগজাগ কোর্স। রাস্তার একদিকে খাদ, অন্যদিকে নদী। খাদের নীচ দিয়ে তিস্তা বয়ে চলেছে। পটকা একটা জিনিস সব সময় লক্ষ্য করে, যখনই পাহাড়ের গায়ে

হাজার-হাজার ফিট উঁচুতে কোন রাস্তা তৈরি হয়, তখনই কোন নদীকে চিহ্ন রাখা হয়। কখনও বাঁ দিকে, কখনও ডান দিকে পাহাড় আর নদী ঘুরে-ঘুরে চলে যায় সরল কিংবা বক্ররেখায়। পটকা কাচের জানলায় চোখ রেখে যদিও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কুয়াশার দাপটে পাহাড়, খাদ, রাস্তা মহাশূন্যে পরিণত হয়েছে। ঠাণ্ডাটা ক্রমেই জাপটে ধরছে। পটকার গায়ে উলের সোয়েটার, গরম কোট এবং সবেধন নীলমণি একটি চাদর। মা সঙ্গে বেডিং দিয়েছিলেন। কিন্তু শিয়ালদায় আসার পথে পটকা পার্ক সার্কাসে এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে এসেছে। ও তো যাচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার করতে, তা সঙ্গে আবার গুড়ের কলসি কেন বাপু!

চাদরটা ব্যাগ থেকে বের করে পটকা সিটের গায়ে মাথা রাখে। ওদিকে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। দূর। ঘুম আসছে না। যদি ধস নামে? পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টির সঙ্গে ধসের একটা সম্পর্ক রয়েছে! ড্রাইভার নাকি-নাকি গলায় কোন একটা নেপালি গানের সুর ভাঁজছে। পটকার রাষ্ট্রভাষায় দৌড় খুব বেশি নয়। নেপালি ভাষাও জানা নেই। ও ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করে।

"ড্রাইভারজি!"

"কেয়া হ্যায় সাব?"

"ধস নামে গা?"

"কিঁউ?"

"বৃষ্টি হোতা হ্যায়?"

ড্রাইভার খুক-খুক করে হাসে। বলে, "পাহাড় পর যব এক তরফ সে বারিষ হোতি হ্যায়, তব ধস নামতা।"

পটকা তবু ভাবে, ওপর থেকে যদি পাথরের চাঁই গড়িয়ে পড়ে, তবে ড্রাইভারের সব খেলই খতম। পটকার চোখে পড়ে মাঝে-মাঝে আলোর বিন্দু! হয়তো সেখানে বস্তি আছে। অন্ধকার আর কুয়াশা মাখামাখি হয়ে ঢেকে রয়েছে। শুকনা স্টেশনই বা কখন পেরিয়ে গেল পটকা কিছুই টের পায়নি। দিনের বেলা হলে কত মনোরম দৃশ্যই না ওর চোখে পড়ত। অবশ্য কুয়াশা ঘন না থাকলে। আকাশের মেঘ কখনও পায়ের তলায়। মেঘের সঙ্গে লোফালুফির খেলাটা পটকার দারুণ লাগে। শীত তাড়ানোর জন্য পটকা একটা গান ধরে, 'ব্রহ্মময়ী! আমায় দে মা পাগল করে।'

ড্রাইভার বলে, "কেয়া গানা গাতা হ্যায় বাবুজি?"

পটকা গান থামিয়ে বলে, "ভগবান কা গানা।"

"আপ বোম্বাই ফিলিম কা গানা নেহি জানতা?"

পটকা বলে, "জানতা, জানতা। আভি ভগবান কি গানা নেহি, গানে সে তো

ডর ভি নেহি যাতা।"

ড্রাইভার খ্যাক-খ্যাক করে হাসে। বলে "আপকো ডর লাগতা বাবুসাব? কিঁউ?"

পটকা বলে, "গাড়ি গিরনে সে তো ভূত হো জায়গা।"

ড্রাইভার বলে, "নেহি। হামি পাকা ডেরাইভার আছি। দেখিয়ে।" ড্রাইভার গাড়িটাকে দোলনার মতো দোলাতে থাকে। উলটো দিক থেকে আর-একটা গাড়ির জোরালো আলো পড়ে। বাঘের চোখের মতো আলোটা ছুটে আসে। পটকা আশ্বস্ত হয়। এই নির্জন রাতে আরও কেউ দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়েছে তা হলে? ভাবতে-ভাবতেই গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যায়। পটকা তো অবাক। এ সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ওভারটেক করা তো সম্ভব নয়। গাড়িটা গেল কোথায়? পাহাড়ের মাথায় কি আরও কোন রাস্তা আছে? পটকা প্রশ্ন করে, "ড্রাইভারজি! থোড়া আগাড়ি মে যো গাড়ি আয়া, ওহি গাড়ি কিধার চলা গিয়া?"

ড্রাইভার বলে, "ভেলকি হ্যায়।"

পটকার চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। ও বুকের মধ্যে অসংখ্য হাতুড়ির শব্দ শুনতে পায়। ড্রাইভার নির্বিকারভাবে স্টিয়ারিং ধরেই থাকে। চারদিকের বিশ্বচরাচর কুয়াশা আর অন্ধকারে ঢাকা। শুধু গাড়ির একটানা গোঁ গোঁ শব্দ। পটকা ভাবে, ড্রাইভারটা কি ম্যাজিসিয়ান? ওর খুব ইচ্ছে হয় ড্রাইভারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে।

"তুমহারা নাম কেয়া হ্যায় ড্রাইভারজি?"

"মেরা নাম কুলবাহাদুর ছেত্রী।"

"তোম্ কিতনা বরস সে এহি রাস্তামে গাড়ি চালাতে হ্যায়?"

"হাম? বিশ বরস হো গিয়া।"

পটকার হঠাৎ মনে পড়ে, ওর পকেটে চিউংগাম আছে। ও একটা কুলবাহাদুরকে দেয়। নিজেও চিবোতে থাকে। চিউংগাম চিবোতে-চিবোতে কুলবাহাদুর বলে, "এই রাস্তার প্রতিটি বাঁক মুখস্থ। যাদের জন্ম, মৃত্যু দুইই পাহাড়ে, তাদের আবার পাহাড়কে ভয়?"

বার কয়েক ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা হঠাৎ থেমে যায়। পটকা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। চারদিকে ঝাঁক-ঝাঁক আলো। পটকা প্রশ্ন করে, "কুলবাহাদুর! হামলোক দার্জিলিং আ গিয়া?"

কুলবাহাদুর বলে, "নেহি, ইয়ে কার্শিয়াং হ্যায়।"

প্রায় আধ ঘন্টা সময় পেরিয়ে যায়। গাড়ি রেখে কুলবাহাদুর তো হাওয়া। পটকা হিহি করে কাঁপতে -কাঁপতে চায়ের স্টলের দিকে এগিয়ে যায়। ও রুটির

গায়ে চিজ লাগিয়ে সবে কামড় বসিয়েছে, এমন সময় গুম-গুম শব্দ। শব্দটা বাড়তে বাড়তে প্রচন্ড জোরে যেন বিস্ফোরণ হয়। খানিকটা পাহাড় ধসে পড়ে।

বেঁচে যায় পটকা আর চায়ের দোকানটাও। পেছনের খানিকটা রাস্তা ধসে নেমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কী সর্বনাশ! ল্যাণ্ডরোভারটা কোথায়? সেটাও কি চাপা পড়েছে? পটকা পাগলের মতো এদিক-ওদিক তাকায়। ঠিক তখনই দুটি ঠাণ্ডা হাত ওর দু'কাঁধ চেপে ধরে। পটকার সারা শরীরে শীতল স্রোত বয়ে যায়। পটকা তোতলাতে থাকে, "কে এ? কে...? কে...?" ও পেছন ফিরে দেখে কুলবাহাদুর। পটকা ভয়ার্ত গলায় বলে, "আভি কেয়া হোগা ড্রাইভারজি?" ড্রাইভার দেঁতো হাসি ছুঁড়ে বলে, "আউর দুশো দিজিয়ে।"

পটকা অসহায়ভাবে তাকায়। এই প্রথম ওর মনে হয়, ও একটা খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। কুলবাহাদুরের কাজটাই কি তবে এই? রাতের সওয়ারিকে পাকড়াও করা? সেইজন্যই এই হিমেল রাতে ও বাসস্ট্যান্ডে ওৎ পেতে থাকে। ওর পকেটে কি ভোজালি আছে? অথবা রিভলভার? পটকা মনে মনে ক্যারাটের প্যাঁচ কষতে থাকে। পটকার কাছে নগদ দুশো নেই, মাত্র একশো আছে। বাকি সবই ট্র্যাভেলার্স চেক। কুলবাহাদুর যদি ভোজালি কিংবা রিভলবার বের করে, পটকাও তবে ক্যারাটের কায়দায় ওকে ঘায়েল করবে। যদিও পরমুহূর্তেই টেপরেকর্ডারের মতো মনের মধ্যে বেজে যায় মায়ের কথা, 'আমি যে একটা ভাল ছেলের মা হতে চেয়েছিলুম পটকা!' এই মুহূর্তে সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। আত্মরক্ষার জন্যই তো ক্যারাটে শেখা? অন্যায়ের সঙ্গে মোকাবিলা কখনও নয়।

ওদিকে ফের পাহাড় ভাঙার শব্দ, গুম...গুম...গুম। পটকার পায়ের তলার মাটি থরথর করে কেঁপে ওঠে। তখন কুলবাহাদুরের অবিশ্বাস্য হাতটাই পটকা পরম বিশ্বাসে চেপে ধরতে চায়। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায়, চরম বিপর্যয়ে ও মানুষকেই বিশ্বাস করতে যায়। কিন্তু এ যেন হাত নয়। একটা কঠিন হাড়। হাতটায় কি স্প্রিং লাগানো রয়েছে? কুলবাহাদুর সেই মুহূর্তেই লোভের চোখ ঘুরিয়ে বলে, "আউর দুশো?"

ওর চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। পটকার গলা শুকিয়ে কাঠ। বলে, "আভি একশো লিজিয়ে। পরশু ট্রাভেলার্স চেক ভাঙায় কে আপকো আউর একশো দে দুঙ্গা।"

কুলবাহাদুর বলে, "নেহি দেনে সে বিলকুল গড়বড় হো যায় গা।' সূচিভেদ্য অন্ধকার। টর্চের জোরালো আলোয় চারদিক আলোকিত হতেই পটকা দেখে, ওরা সত্যিই একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পটকা কাঁপা গলায় বলে,

"কুলবাহাদুর। কেয়া হোগা?"

"কুছ নেহি হোগা। আপ আইয়ে।"

আবার তেড়ে বৃষ্টি নামে। পটকার গায়ে ভাগ্যিস বর্ষাতি ছিল। কুলবাহাদুর আগে-আগে যায়। পেছনে পটকা! এই রাস্তাটাই কেবল অবিচ্ছিন্ন আছে, যদিও বিপজ্জনক।

কুলবাহাদুর গাড়িতে স্টার্ট দিতেই কোত্থেকে একটা লোক এসে হাজির। পটকার সামনের সিটে সে থপ করে বসে পড়ে। ড্রাইভারের চেনা লোক হয়তো। নেপালি ভাষায় দু'জনে কথা বলতে থাকে। লোকটার গায়ে বর্ষাতি নেই, হাতে ছাতাও নেই। অথচ সে ভেজেনি। পটকা এবং ঐ লোকটার মধ্যে হাতখানেক দূরত্ব। তার সঙ্গে ওর মাঝে-মাঝেই চোখাচোখি হতে থাকে। লোকটার দৃষ্টি কুৎসিত। পটকা চোখ সরিয়ে নেয়। গাড়িটা দুরন্ত গতিতে বাঁকের পর বাঁক ঘুরতে-ঘুরতে খাদে পড়তে-পড়তেও বেঁচে যায়। কুলবাহাদুর বলে, "এহি রাস্তামে একঠো অ্যাক্সিডেন্ট হুয়া হ্যায়।"

পটকার সামনের আগন্তুক খনখনে গলায় হেসে ওঠে। কুলবাহাদুরও তার সঙ্গে গলা মেলায়। পটকা বুঝতে পারে না এতে হাসির কী আছে? ড্রাইভার বলে "এহি রাস্তামে পুলিশ কো সাথমে স্মাগলার কো গোলি বদলা হোতা। কম সে কম ছ'সাতশো ফিট নীচুমে গাড়ি গির গিয়া।"

সেই লোকটা হঠাৎ বলে ওঠে, "এইসা মাফিক?" কথাটা বলেই ল্যাণ্ডরোভারের দরজাটা খুলে সে ঝাঁপ দেয় খাদে। পটকা চিৎকার করে ওঠে। ওর শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু কুলবাহাদুর নির্বিকার। পটকা ভয়ার্ত গলায় বলে, "লোকটা যে পড়ে গেল কুলবাহাদুর?"

কিন্তু সে পাত্তাই দেয় না। পরমুহূর্তেই একটা হাত পটকার কাছে এগিয়ে আসে। কোন মুখ নেই। শরীর নেই। শুধু হাত। ফ্যাসফেসে গলায় কে যেন বলে, "একটা সিগারেট হবে দাদা?"

পটকার প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা। হাতটা ওর চোখের সামনে শুধুই ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে থাকে। পটকা তোতলাতে থাকে, "আপ...আপনি?" হঠাৎ দেখে সিটে বসে আছে সেই লোকটা। তারপরই পটকা বেহুঁশ।

কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার সময় ওর খুব ইচ্ছে ছিল, পাগলাঝোরা দেখবে, দেখবে বাতাসিয়া ল্যুপ। হায় রে, কোথায় বা প্রকৃতি আর কোথায় পটকা।

ড্রাইভারের চেঁচামেচিতে ওর চৈতন্য হয়, "দার্জিলিং মে আ গিয়া।"

চক বাজার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গাড়ি থামে। পটকা চোখ কচলে দেখে সেই লোকটা নেই।

"কুলবাহাদুর! ওহি আদমি কাঁহা গিয়া?"

কুলবাহাদুর খেঁকশিয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসে। বলে, "ভ্যানিশ।"

পটকার মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। কুলবাহাদুর আর ওই লোকটা কি জাদুকর? না অন্য কিছু? পটকা বুকে ক্রশ-চিহ্ন আঁকে। কুলবাহাদুর বলে, "পরশু রাত দশ বাজে হাম হিঁয়া রহে গা। রূপেয়া নেহি দেনে সে জান লে লেগা।"

কুলবাহাদুর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বৃষ্টি, বরফের গুঁড়োয় পটকা জমে যেতে থাকে। ও টর্চ জ্বেলে গাইড বুকে হোটেল খোঁজে। দমকা হাওয়ায় গাইড বুকটা হঠাৎ ছিটকে চলে যায়। অন্ধকারে বার্চ গাছগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। পটকার পাশ কাটিয়ে তখন গড়গড় করে চলে যায় কুলবাহাদুরের ল্যাণ্ডরোভার। গাড়িটা সোজা গিয়ে ছিটকে পড়ে খাদে। টর্চের আলোয় গাড়ির নম্বরটা পড়তে পটকার ভুল হয়নি। ও আঁতকে ওঠে। পরক্ষণেই ভাবে, এ কি কুলবাহাদুরের দ্বিতীয় খেল? পটকা উত্তেজিভাবে একটা সিগারেট ধরায়। হাঁটতে-হাঁটতে ও এক সময় আবিষ্কার করে, ও রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেছে। পটকা স্বস্তি বোধ করে। ভবঘুরে বাউণ্ডুলেদের জন্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলো চিরকাল জায়গা রেখে দেয়। পটকা এক কাপ গরম চায়ের লোভে এদিক-ওদিক তাকায়। এত রাতে এই ঠাণ্ডায় কোথায় চায়ের স্টল? পটকা স্টেশনমাস্টারের ঘরে উঁকি মারে। কাচের জানলা-দরজা সব বন্ধ। উনি নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে ভেতর থেকে কার যেন নাক ডাকার গর্জন আসছে। সে গর্জন কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়। পটকা জোরে দরজায় ধাক্কা দেয়। ডাকে, "মাস্টারবাবু!" কোন উত্তর নেই। একেই পটকার মনের মধ্যে বিষণ্ণতার ঝড়। শিলিগুড়ি ছাড়ার পর নানা বিচ্ছিন্ন ভাবনা মনের মধ্যে তোলপাড় করে, তারপর আবার ঠাণ্ডায় বরফ হওয়ার মতো অবস্থা। স্টেশনমাস্টারকে ডেকে তুলে বলে কয়ে যদি এক কাপ চা ম্যানেজ করা যায়? ওঁর ফ্লাস্কে নিশ্চয় চা আছে। পটকা ভাবে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। এলোমেলো পা ফেলতে ফেলতে পটকা স্টেশনের শেষ মাথায় চলে যায়। জায়গাটা একটু অন্ধকার। শরীরটাকে গরম করার জন্য পটকা আর একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেটে সবে একটা টান মেরেছে, এমন সময় ভুঁই ফুঁড়ে কে যেন ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। আরে, এ যে কুলবাহাদুর! গাড়ির দুর্ঘটনাটা তবে কি সত্যিই ভেলকি? কুলবাহাদুরের চোখ হিংস্র জন্তুর মতো জ্বলতে থাকে। সে দেঁতো হাসি হেসে বলে, "আঁইয়ে বাবুসাঁব, আঁইয়ে, আঁপকো চা পিঁয়ায়গা।"

কুলবাহাদুরের গলার স্বর নাকি-নাকি শোনাচ্ছে কেন? বেমালুম বদলে গেছে। একটা মাংসহীন কঙ্কাল ক্রমেই ওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

"বাঁচাও...বাঁচাও..." পটকা চেঁচিয়ে ওঠে। ও ছুটতে-ছুটতে দেখে, প্ল্যাটফর্মের আর-এক মাথায় সান্টিং-করা একটা ট্রয় ট্রেন। পটকা লাফিয়ে ওঠে মাঝখানের বগিতে। দরজাটা ভেতর থেকে লক করে দিয়েই ও হাঁফাতে থাকে। বন্ধ কাঁচের জানলা দিয়ে ও দু'জন গার্ডকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয়। তারপর পটকা গরম চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ে। ও শুয়ে-শুয়ে ভাবে, কুলবাহাদুরের যথার্থ রহস্যটা কী? ভূত যদি হবে, তবে টাকা নিল কেন? টাকা আরও চাইছেই বা কেন? তবে কি কোন অতৃপ্ত আত্মা, যে টাকার জন্য খুন হয়েছিল, সেই লোকটা কি ছিল ওর শাগরেদ? এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পটকা ঘুমিয়ে পড়ে।

মাঝ রাত্তিরে পটকার ঘুম ভেঙে যায়। ওর মনে হয়, চাদরটা ধরে কে টানাটানি করছে। একেই পটকা ঠাণ্ডায় জমে একেবারে বরফ, তারপর আবার চাদরে টান? পটকা ভাবে, রাস্তার কুকুর-টুকুর নাকি? নাকি ধেড়ে ইঁদুর? ও চাদরটা টেনে নেয়। কিন্তু এবার মনে হয়, ওর উলটো দিকে চাদরের তলায় কেউ যেন ঢুকে পড়েছে। তবে কি কোন ভিখিরি? বেঞ্চের তলায় এতক্ষণ ঢুকে ছিল হয়তো। পটকার হাঁটুর সঙ্গে তার হাঁটু লেগে ঠোকাঠুকি হতে থাকে। পটকা লাথি মেরে ওটাকে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তার পা দুটো ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরে চিমটের মতো। পটকার মায়া হয়। আহা! এই ঠাণ্ডায় ওই বা যাবে কোথায়? সেও মানুষ আমিও মানুষ। মানুষের কি জাত আছে? বরং দুটো মানুষ জড়াজড়ি করে থাকলে ঠাণ্ডাটা একটু কমই লাগবে। কিন্তু মানুষটা যেন ওর হাঁটুতে ক্রমেই হাড় বিঁধিয়ে দিচ্ছে। কাঁকড়ার মতো সরু-সরু আঙুলগুলো দিয়ে মাঝে-মাঝে চিমটি কাটছে। পটকার দারুণ রাগ হয়। একে এই খিদে, তৃষ্ণা এবং শীতে ওর প্রায় অচৈতন্য অবস্থা, তারপর আবার এই ঝামেলা? পটকা চাদর ধরে হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারে। লোকটা তড়াক করে উঠে বসে। তারপর জ্বলন্ত চোখে পটকার দিকে চেয়ে থাকে। পটকা রাগী গলায় বলে, "তোম কোন্ হ্যায়? তোমকো মতলব কেয়া?" লোকটা পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দেয়, "মঁতলব তোঁ তোঁমার ভাঁই। আঁমার আঁস্তানাটা দঁখল কঁরেছ, অ্যাঁ?"

পটকার বুকের রক্ত হিম। ও কি ফের ভূতের পাল্লায় পড়েছে? পালাবার পথ নেই। দরজাটা লক করা, পটকা দ্রুত উঠে গিয়ে দরজায় লাথি মারে।

লোকটা খনখনে গলায় হেসে বলে, "দাঁদা! এঁকটা সিঁগারেট হঁবে? মঁনে নেঁই? ল্যাঁন্ডরোঁভারে আমিঁ যেঁ আঁপনাঁর সঁহযাত্রী ছিলাম!"

আরে সর্বনাশ! এ কি সেই ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া লোকটা? কুলবাহাদুরের সেই শাগরেদ? পটকা দরজায় দড়াম-দড়াম লাথি কষাতে থাকে। তারপরই ছুট...ছুট...ছুট...।

ভূতের কাছারী

মুরারিমোহন বেদান্তাদিতীর্থ শাস্ত্রী

ছেলেবেলায় ঠাকুমা ও দিদিমারা নাতি নাতনিদের ভূতের গল্প বলে ঘুম পাড়াতেন। সত্যি সত্যি বাচ্চা ছেলেদের যদি ভূতের কোন গল্প বলা যায়—ছেলে যতই দুষ্টু হোক না কেন ভূতের নাম শুনলেই অস্থির হয়ে পড়ে। আদপে ভূত বলে কোন বস্তু আছে কিনা সন্দেহ থাকলেও কিন্তু আছে। পুরাকালে যে সমস্ত মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটেছে বা ঠিকমতো শ্রাদ্ধ শান্তি না হয়ে থাকলে বা তাদের দুষ্ট কর্মের জন্য, তাদের ঊর্দ্ধ গতিতে বাধা সৃষ্টি হয় ফলে তারা আকাশ মার্গে বায়বীয় দেহে আনাচে-কানাচে, গাছপালায়, পায়খানায়, মাঠে, ধানক্ষেতে, বট ও অশ্বত্থ গাছে আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং সেইখান থেকেই নানা প্রকার আকার ইঙ্গিতের দ্বারা মানুষের সংসার জীবনকে অতিষ্ঠ করে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দেয়। এই ভাবেই আমাদের দেশে ভূতের রাজ্য চলে আসছে অনেক দিন থেকেই। মানুষ ভূতকে ভয় পায়। ভূতও মানুষকে ভয় পায়।

আজ থেকে প্রায় একশ বৎসর আগের সত্য ঘটনার কথা বলছি—পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ঘাল্‌না গ্রামে একটি ভূতের কাছারি ছিল—অর্থাৎ বহু প্রকারের ভূত এসে জড়ো হত একটি অশ্বত্থ গাছের তলায়, মধ্য রাত্রিতে আন্দাজ এক ঘটিকা থেকে তিন ঘটিকার মধ্যে তারা উপস্থিত হত। ধারাবাহিকভাবে প্রতি শনি এবং মঙ্গলবার এবং জনসাধারণের কিছু উপকারের ইচ্ছায় সেবা করত—দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ মানুষদের, যেমন—পাড়ার একটি মোড়ল তাঁর নাম হচ্ছে যুগল খাঁ, বাড়ীতে অনেকে তার ওপর নির্ভরশীল। সে একমাত্র রোজগারী, মারা গেলে সংসারটা ভেসে যাবে। তার জন্য গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা দুঃখিত ও চিন্তিত। কি করে তাকে বাঁচান যায়। তখনকার দিনে ইংরেজী শাসনে গ্রামে গঞ্জে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু হয়েছে। লোকটি কিন্তু মধ্য বয়সী। ডাক্তার, বদ্দি, হাকিমী, কবিরাজী চিকিৎসা সবই একে একে ফেল করল। কোন চিকিৎসা তার কাজে লাগল না। সকলেরই ধারণা ও আর বাঁচবে না। মিছিমিছি চেষ্টা করা। একজন বৃদ্ধা দূর গ্রাম থেকে এসে বলল, তোমরা অনেক কিছু করলে কিন্তু ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলে না। আমার একটা কথা শোনো আমি বলে যাই। কাল শনিবার অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে তোমরা

এই রোগীটাকে নিয়ে গ্রামের ষষ্ঠীতলায় অশ্বত্থ গাছের চৌমাথায় যদি রাত্রি বারোটার মধ্যে রেখে আসতে পার তাহলে ওখানে ভূতেদের কাছারি বসে, অনেক নানা জাতের ভূত আসে এবং কিছু কিছু রোগীদের ঔষধ দিয়ে যায়। শুনেছি আমরা ডাক্তার-ফেরৎ মানুষদের আরোগ্য জীবন ফিরে আসে। বুড়িটার কথা শুনে বাড়ীর লোকেরা ঠিক করল আগামীকাল অমাবস্যায় রোগীটিকে নিয়ে রাত্রি

বারোটার মধ্যে ষষ্ঠীতলায় রেখে আসবে। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, কোলের মানুষকে চিনতে পারা যায় না এমন অবস্থায় রোগীটিকে নিয়ে সেই গাছতলায় ফেলে রাখল। ফেলে রাখার সময় দেখে, সেখানে ভীষণ ঝড়ে গাছের পাতাগুলো সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে। যে কজন সেখানে রোগীকে নিয়ে গেছিল তারা ভয়ে পালিয়ে গেল ও রোগীটি আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রইল। মহারাত্রি (একটা থেকে দুটো) দারুণ রাত্রি। সেই রাত্রিতে একের পর এক ভূত এসে হাজির হল এবং রোগীটিকে ঘিরে শলাপরামর্শ হল এবং তাদের মধ্যে ঠিক হল রোগীকে সুস্থ করে তোলা হোক। ঔষধ খাইয়ে দিল এবং কাপড়ে কিছু ঔষধ বেঁধে দিয়ে আবার ধরাধরি করে তার বাড়ীর উঠোনে ফেলে দিয়ে গেল। পর দিন সকালে ঘরের লোকেরা দেখতে পেল কর্তা বাড়ীর উঠোনে পড়ে আছে। তার শরীর হিমের ঠাণ্ডায় একেবারে জড়সড়। মাঝে মাঝে চোখের পলক ফেলছে এবং হাঁ করছে। বাড়ীর লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে বদ্দিকে ডাকল। সে এসে বলল রোগী বেঁচে আছে, মেয়েরা একটু গরম দুধ নিয়ে এসে ওর মুখে ঢেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর স্পন্দন বাড়তে লাগল। ডাক্তার খুব আশ্চর্য বোধ করল। এইভাবে ভূতের কাছারির মাহাত্ম্য জনে জনে প্রচার হতে লাগল এবং শাস্ত্র কথায় ভূতকে যে দেবযোনিবিশেষ বলা হয় এই শাস্ত্রকথা সত্যে রূপ দিল এবং তখন থেকেই গ্রামের কারো কোন কঠিন ব্যাধি হলে কাছারিতে নিয়ে ফেলত। ভূতেরা বিচার করে দেখত রোগী বাঁচবে কি মরবে। বর্তমান যুগেও সেই ঘাল্‌না গ্রামে ভূতের কাছারির গল্প ছেলে বুড়ো সকলেরই মনে শিহরণ সৃষ্টি করে। আর এখনও সেই গাছতলায় প্রদীপ জ্বেলে ও ভালমন্দ খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এই বিজ্ঞান প্রভাবিত সংসারে ভূতের কথা মানুষের মনে প্রবল অনুভূতি সৃষ্টি করে। ছেলেমেয়েরা এখনও সেই স্থান দিয়ে ভরদুপুরে বা সন্ধ্যায় আনাগোনা করে না পাছে তাদের ভূতে ধরে। এই হল আমাদের মরজীবনের ভূতের কাহিনী, জড়িত হয়ে আছে সারা দুনিয়ায়।

পিণ্ডিদান

প্রবোধ নাথ

অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর পথটাই বেছে নিল পরান সাহা। বাপের দেওয়া কিছু টাকা ছিল। ছোটবেলার বন্ধু বিশু মল্লিক ব্যবসা করবে বলে স্ট্যাম্প পেপারে সই দিয়ে টাকাটা নিল মোটা সুদের লোভ দেখিয়ে। সুদও দিল ক'মাস। তারপর রাতারাতি ব্যবসা গুটিয়ে সেই যে গা-ঢাকা দিল বিশু মল্লিক, সাত তল্লাট গরু খোঁজা খুঁজেও তার পাত্তা পেল না পরান সাহা। টাকার শোকে আর অভাবের জ্বালায় ঠিক করল পরান, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে বরং সুইসাইড করা ভাল। ছেলেকে ডেকে বলল, বাবা ঘনশ্যাম, বিশু মল্লিক আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা ধার নিয়ে যে কাগজখানায় সই করেছে ওখানা আছে আলমারিতে। পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সইও আছে। যত্ন করে রাখিস কাগজখানা। বেঁচে থাকতে তো আমি ওর দেখা পেলাম না, তবে বিশু মল্লিক বেঁচে থাকলে ওর সঙ্গে তোর দেখা হবেই। সেদিন কাগজখানা দেখিয়ে টাকাটা কিন্তু আদায় করিস।

ঘনশ্যাম বাপের কথাটা ঠিক বোঝে না, তবু ঘাড় কাত করে।

আর একটা কথা, পরান বলে, আমি যদি হঠাৎ মারাও যাই, মরতেই পারি মানুষের জীবন তো, তবে যেন তড়িঘড়ি গয়ায় পিণ্ডি চড়িয়ে বসবি না। পাক্কা দুটি বছর অপেক্ষা করবি বিশু মল্লিকের জন্য। দেখা না পেলে তখন যা ভাল বুঝিস করবি। কেমন!

আর সে রাতেই ভাগীরথী এক্সপ্রেসে গলা দিল পরান সাহা।

অপঘাতে মৃত্যু। মরলেই ভূত। প্রথমটাই যা একটু কষ্ট, তারপরই শরীরটা একদম পাখির পালকের মতো হালকা। ভূত হয়ে রেল লাইনের ধারে এক দীঘল শেওড়া গাছে এক নাগাড়ে সাত রাত সাত দিন ঘুমিয়ে কাটাল পরান। বেঁচে থাকতে ভাবনায় চিন্তায় কত রাত ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। ঘুমিয়ে এখন শরীরখানা শান্ত হলো, সুস্থির হল। মনে পড়েল বিশু মল্লিকের কথা। ও শয়তানটার জন্যেই আজ তার এ ভূতের দশা। ঠিক করল প্রথমে গ্রামেগঞ্জে ওকে খুঁজে দেখবে। এখন তো আর হাঁটা চলার বালাই নেই। শুধু মনে মনে ভাবলেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং বেঁচে থাকলে বিশু মল্লিককে খুঁজে বার করতে সময় লাগবে না।

তার আগে একবার ছেলে ঘনশ্যাম ও বৌকে দেখার বাসনা হল পরান সাহার। কেমন আছে ছেলেটা বাপকে হারিয়ে।

শেওড়া গাছ ছেড়ে হাওয়ায় ভেসে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল পরান সাহা। গ্রামে ঢুকতেই দেখল চণ্ডীতলার মাঠে অনেক লোকের ভিড়। ছেলে ঘনশ্যাম একটা চেয়ারে বসে আছে তার বাপের ছবির সামনে চুপটি করে। এটা তবে তার শোকসভা হচ্ছে। পরান সাহা ভাবল, বাঃ! খুব ভাল তো। একটু না হয় বসে দেখাই যাক কি দিয়ে কি করে গেরামের মানুষ। মাঠের ধারে একটা গাব গাছে পা ঝুলিয়ে বসল পরান।

সভায় লোকজন মন্দ হয়নি। মাইক লাগিয়ে কার্তিক সভা ম্যানেজ করছে। বলছে, পরান সাহার এ শোকসভার আয়োজন করেছেন আমাদের গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজদরদী হরগোবিন্দবাবু। তিনি এখুনি এসে পড়বেন। আপনারা দূরে না দাঁড়িয়ে থেকে সভায় এসে বসুন।

হরগোবিন্দবাবুকে চিনত পরান। বিশু মল্লিকের শালা। বিশু মল্লিক ফেরার হওয়ার পর বোনের সংসার বাঁচাতে হরগোবিন্দবাবু সেই যে সে সংসারে গিয়ে উঠল আর ফিরে যায়নি নিজের বাড়িতে। এখানে থেকেই ভগ্নীপতির ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিশাল করে তুলেছে। চেহারায় সাধক সাধক ভাব। কাঁচা পাকা এক জঙ্গল দাড়ি গোঁফে মুখখানা ঢাকা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মুখে রাধাকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন বুলি নেই। বেঁচে থাকতে হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে পরান সাহার। মানুষটাকে মোটেই ভাল লাগত না তার। সব সময় চোখে মুখে যেন কি খাই কি খাই ভাব।

কার্তিক আবার ঘোষণা করল, এবার সভার কাজ শুরু হচ্ছে। সভাপতির আসনে এসে বসবেন মহামান্য শ্রীহরগোবিন্দ বিশ্বাস।

হরগোবিন্দবাবু সভাপতির চেয়ারে এসে বসল। তাকে দেখে পরান সাহা এমন চমকে উঠল যে গাছের ডাল থেকে হড়কে নীচে পড়ে যাওয়ার যোগাড়। ব্যাটা, তুমিই তবে হরগোবিন্দবাবু! শয়তান, চোর, জোচ্চোর! হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগল পরান সাহা।

হয়েছে কি, মরে ভূত হওয়ার পর পরান সাহা একটা অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছে। এটা অবশ্য সব ভূতেরাই পায়। সে দৃষ্টি দিয়ে ভূতেরা অনেক অজানা জিনিস, অদেখা বস্তু জানতে পারে, দেখতে পায়।

ওই যে ঘড়িটা হাতে দিয়ে সভা ম্যানেজ করছে কার্তিক ওটা পরানেরই ঘড়ি। লাইনে গলা দেওয়ার পরদিন সকালবেলা কার্তিকই ওকে প্রথমে দেখতে পায়।

লাশের বাঁ হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিজের হাতে পরে তবেই গ্রামে গিয়ে খবর দেয়।

কার্তিকের পরে ও পথে আসে নৃপতি। পরানকে মড়ে পড়ে থাকতে দেখে দর্শন করে। এদিক সেদিক তাকিয়ে পরানের পকেট থেকে দুটাকা পঞ্চান্ন পয়সা তুলে নিজের পকেটে ভরে গ্রামে ফিরে ঘনশ্যামকে খবরটা দিয়ে কর্তব্য সারে।

সে যা গেছে যাক। তার জন্য পরান মোটেই ভাবিত নয়। কিন্তু ওই হরগোবিন্দ। এক মুখ গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের আড়ালে নিজের আসল মুখখানা ঢেকে চেহারাখানা পাল্টে বিশু মল্লিকই কিনা আজ দু'বছর ধরে হরগোবিন্দ সেজে দিব্যি নিজের সংসারে সুখে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে ঘুণাক্ষরেও কি

জানতে পেরেছিল এটা পরান সাহা! সে তখন কতদিন গেছে বিশু মল্লিকের দোকানে জিনিস কিনতে। মাঝে মাঝে শুনিয়েছে তার ভগ্নীপতির টাকা মারার কাহিনী। শুনে মাথা নেড়ে তাকে শুধু কেষ্ট নাম শুনিয়েছে হরগোবিন্দ।

যাক, আত্মহত্যাটা তবে সার্থক হয়েছে পরান সাহার। ভূত হয়েছে বলেই চিনতে পারল বিশু মল্লিককে। এখন গ্রামের পাঁচজনের কাছে ব্যাটার পরিচয়টা ফাঁস করাতে পারলেই নিশ্চিন্তি।

ছেলে বৌয়ের সঙ্গে দেখা করার বাসনা ত্যাগ করে পরান নদীর ধারে শ্মশানঘাটের পঞ্চবটের মগডালে গিয়ে বসল। ওখানে দেখা হলো ছোটবেলার বন্ধু ফেলুরামের সঙ্গে। বছর দশেক আগে শান্তিপুর-কালনা ফেরি ঘাটে নৌকাডুবিতে মারা গিয়েছিল ফেলা। পরানের মুখে সব শুনে ফেলা লাফিয়ে উঠল, বললো, চল, এখনি ব্যাটার ঘাড় মটকে আসি।

দূর, তাহলে আমার টাকাটা আদায় হবে? প্রথমে ওর গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে গ্রামের পাঁচজনের কাছে পরিচয়টা ফাঁস করতে হবে যাতে ঘনশ্যাম টাকাটা আদায় করতে পারে।

বুঝলাম, কিন্তু আমাদের যে লোহা ছোঁওয়া বারণ। নইলে খুরের একটানে হরগোবিন্দের মুখের জঙ্গল সাফা করতে কতক্ষণ।

না ওভাবে হবে না। এমন রাস্তা বার করতে হবে যেন ব্যাটা নিজেই নিজের দাড়ি গোঁফ কাটতে বাধ্য হয়।

কি করা যায় ভাবতে ভাবতে দু'জনে আবার চণ্ডীতলার মাঠে এসে গাব গাছের ডালে বসে। সভা ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। হরগোবিন্দ ঘনশ্যামকে কাছে ডেকে কি যেন বলছে। কি বলছে শোনার বাসনা মনে পোষণ করতেই পরান সাহা ডালে বসেই শুনতে পায় হরগোবিন্দ বলছে, খরচ খরচা হবে বলে পিণ্ডি দেবে না? তোমার বাবা যে তবে নরকে পড়ে পচবে হে! যাও মাকে নিয়ে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ঘুরেও এসো আর পিণ্ডিটাও দিয়ে এসো। টাকার জন্যে ভাবছ কেন, আমি তো আছি। দেখ আমার ভগ্নীপতির সই করা একটা কাগজ আছে তোমার বাবার আলমারিতে। ওখানা আমায় এনে দিলেই আমি তোমাকে হাজার টাকা অমনি দিয়ে দেব।

কিন্তু বাবা যে কাগজখানা খুব যত্ন করে রাখতে বলেছে দু'বছর, ঘনশ্যাম বলে।

কি লাভ! হরগোবিন্দ অল্প হাসে, বিশু মল্লিক কি আর কোনদিন ফিরবে ভেবেছ? আর সে না ফিরলে ও কাগজখানার মূল্যই বা কি! তার চেয়ে তুমি বরং কাগজখানা নিয়ে কাল বা পরশু আমার বাড়িতে এসো, আমি নয় তোমাকে দেড়

হাজার টাকাই দেব।

বেশ, ভেবে দেখি। মাকেও জিজ্ঞেস করি মা কি বলে।

ভাব, তবে বেশি দেরি করো না। যা করার কাল পরশুর মধ্যেই করো। আমি আবার কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাব কিনা!

শুনে পরান আর ফেলুরাম ঠিক করলে যা করার দু'একদিনের মধ্যেই করতে হবে। কারণ লোভে পড়ে ঘনশ্যাম যদি কাগজখানা একবার হাতছাড়া করে আর টাকা পেয়ে গয়ায় গিয়ে যদি পিণ্ডি চড়ায় তবে বিশু মল্লিকের পিণ্ডি চটকানোর আগেই নিজের দফা গয়া।

এ অবস্থায় কি করা যায় বল তো ফেলুরাম? পরান বন্ধুর পরামর্শ চায়।

ও আমি ভেবে রেখেছি। হরগোবিন্দের দাড়িতে উকুন ছাড়তে হবে যাতে ব্যাটা উকুনের কুটকুটুনিতে ছটফটিয়ে দাড়ি কাটতে বাধ্য হয়।

বুঝলাম। কিন্তু আমরা উকুন পাব কোথায়? ভূত হয়ে তো আমাদের সকলেরই নেড়া মুণ্ডি।

সেও আমি ভেবে রেখেছি। আমার নাতনী পুঁটির মাথা ভরা উকুন। ওখান থেকে চাট্টি এনে হরগোবিন্দর দাড়িতে ছাড়লেই হবে।

দূর! পরান সাহা মাথা ঝাঁকায়, ও সব পাতি উকুনে হরগোবিন্দের কিচ্ছু হবে না। সরু চিরুনি চালিয়ে কিংবা উকুন মারার ওষুধ লাগিয়ে উকুন তাড়াবে। আসল চীনে উকুন চাই।

ওখানে বসেই অন্তর্দৃষ্টি চালিয়ে তাও বার করল ফেলুরাম। মানকুণ্ডুর পাগলা গারদের এক পাগল, উকুনের জ্বালাতেই বেচারা পাগল হয়েছে, ওর মাথা ভর্তি চীনে উকুন। ডাক্তাররা রাতদিন ওকে ঘুমের ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। জেগে থাকলেই শুধু চুল ছেঁড়াছিঁড়ি আর চিৎকার। ওর মাথা থেকে চাট্টি উকুন এনে ঘুমন্ত হরগোবিন্দের দাড়িতে ছেড়ে দিল ফেলুরাম। দিয়ে দু'জনে গাব গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

উকুনের কুটকুটুনিতে ঘুম ভেঙে গেল হরগোবিন্দবাবুর। এ কি আপদ রে বাবা! এত যত্ন করার পরও কিনা দাড়িতে উকুন! বিছানায় বসে আয়না সামনে ধরে দাড়িতে সরু চিরুনি চালাল কতক্ষণ, তারপর আবার ঘুমুতে গেল। কিন্তু উকুনের কামড়ানিতে দু'চোখের পাতা এক মুহূর্তের জন্যেও সারা রাত এক করতে পারলো না।

ভোরের আলো ফুটতেই ডেটল, উকুন মারার ওষুধ আর কার্বোলিক সাবান নিয়ে হরগোবিন্দ বাথরুমে ঢোকে। ওষুধ মেখে, দাড়িতে সাবান ঘষে তিন ঘণ্টা স্নান সেরে বাথরুম থেকে যখন হরগোবিন্দ বের হল ছোবড়ার ঘষটানিতে মুখখানা টকটকে লাল। ভাবল বুঝি নিশ্চিন্ত। কিন্তু চীনে উকুন এত সহজে কাবু

হওয়ার পাত্র নয়! আর হরগোবিন্দের মতো এমন নধরকান্তি মানুষের সুস্বাদু রক্ত, উকুনদের যেন ভোজবাড়ির নেমন্তন্ন। তবে কিনা দিনের আলো ফুটলে ওরা হাত পা খেলিয়ে একটু বিশ্রাম করে। তাই হরগোবিন্দের দিনটা কাটল ভালয় ভালয়। কিন্তু সন্ধ্যের পরেই চুলকুনি বাড়ল। ঘুমুলে পরে দাড়ির জঙ্গলে শুরু হল বাঘ ভাল্লুকের লড়াই। লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নামল হরগোবিন্দ। এক পাক চড়কি নাচন নাচল। তারপর খুঁজে এক শিশি 'টিকটোয়েন্টি' বার করে ঢালল দাড়ি ভরে। ব্যস, চুলকানি একেবারে বন্ধ।

চীনে উকুন কিন্তু ভারী চালাক। টিকটোয়েন্টির উগ্র গন্ধ পেয়ে একদম দাড়ির গোড়ায় গিয়ে লুকোলো সবকটা। কোনটা আবার গোড়ার গর্তে মুখ গুঁজে পড়ে রইল দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। ওষুধের তেজ সরতেই শুরু হল দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে তাণ্ডব নৃত্য। গেছিরে গেছিরে চিৎকারে হরগোবিন্দ নাচতে লাগল উইচিংড়ের মতো।

ভোরের আলো ফুটলেই হরগোবিন্দ দাড়িকাটার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকল বাথরুমে। গ্রাম ছেড়ে লোপাট হওয়ার পর প্রায় আজ আড়াই বছর দাড়ি গোঁফ কাটেনি হরগোবিন্দ। এখন কেটে শান্তি।

দাড়ি গোঁফ কামিয়ে গন্ধ সাবান মেখে স্নান করতে করতে যেন আপনা থেকেই দু'চোখ বুজে আসতে লাগল। এমন সময় স্নানঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চাকর খবর দিল, বাবু, ঘনশ্যামবাবু এয়েচেন একখানা কাগজ হাতে করে। আপনি নাকি কাগজখানা কিনবেন বলেছিলেন।

শুনেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে হরগোবিন্দ। স্নান সেরে কোন রকমে গায়ে জামা-কাপড় চড়িয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে বলে, এনেছ? বেশ বেশ, দাও কাগজখানা। বাপের পিণ্ডি দিতে যাবে বলে কথা, ও তোমাকে আমি আরও পাঁচশো টাকা বেশিই দেব।

হরগোবিন্দের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ঘনশ্যাম। অবাক হয়ে বলে, আপনি! আপনিই তবে বিশু মল্লিক! দাড়ি গোঁফে মুখ ঢেকে হরগোবিন্দ সেজে দিব্যি এতকাল চালিয়ে দিলেন! আর আমার বাবা বেচারা অকালে প্রাণ দিয়ে মরল!

হরগোবিন্দ ওরফে বিশু মল্লিক থমকে যায়।

ঘনশ্যাম উঠে দাঁড়ায়। কাগজখানা বুকে চেপে ধরে বলে, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আসছি পাড়ার পাঁচজনকে নিয়ে। বাবার পিণ্ডিদান করতে আপনি আমায় গয়ায় পাঠাচ্ছিলেন, এখন ফিরে এসে আপনার পিণ্ডি চটকাব। দুমদাম পায়ের আওয়াজ করে ঘনশ্যাম বেরিয়ে যায়।

গালে হাত বোলাতে বোলাতে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বিশু মল্লিক। বসে সামনের দেয়াল আয়নার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

ভূতুড়ে মৌমাছি

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

কত বিচিত্র কারণে কখনও কখনও এমন কিছু ঘটে যায় যা মানুষ বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমনি ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে একশ বারো বছর আগে—১৮৬৫ সালে এক সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায়। রচেস্টারের ওয়াশিংটন হল লোকে লোকারণ্য, তিল পর্যন্ত রাখার জায়গা নেই। সে যুগের বিশ্বের দুই সেরা বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়—লুই ফক্স আর জন ডিয়ারি সেদিন বিশ্ব বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছেন। ঠিক এক বছর আগেও তাঁদের মধ্যে খেলা হয়েছিল কিন্তু সে খেলা শেষ হয়নি। বিজয়ী যে কে তাও ঠিক হয়নি। তাই এই ফাইনালে চমক আরও বেড়ে গিয়েছে। হলের গেট অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরে ভিড়ও জনতার সমুদ্রে রূপ নিয়েছে। খেলার ফলাফল শোনার জন্য তাঁরা চঞ্চল হয়ে আছে। ভেতরেও উৎসাহী দর্শকদের বাঁধ ভাঙো ভাঙো অবস্থা।

খেলা শুরু হল। দর্শকদের মধ্যে নেমে এল অদ্ভুত নীরবতা। মুগ্ধ নয়নে কৌতূহলী ক্রীড়ামোদীরা অবাক হয়ে দেখছে দুই বিলিয়ার্ড যাদুকরের কৌশল। দুজনেই সমান সমান।

প্রথম পালা পড়ল লুই ফক্সের। ফক্স তাঁর বিলিয়ার্ড দণ্ডটি দিয়ে অনুপম কায়দায় একের পর এক মেরে চলেছেন। পয়েন্টের অঙ্ক একশো, দুশো, তিনশো করে বেড়েই চলেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী যেন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কোন রকমে তিনি যুঝে চলেছেন। নিশ্চিত হার। ফক্সের পালা শেষ হয় হয়। আর একটা সোজা মার বাকী। ফক্স এটা ঠিকমতো মারতে পারলে নির্ঘাৎ জয়ী হবে। উত্তেজনায় নির্বাক দর্শকরা অপেক্ষা করছে সেই মারটির জন্য। চারপাশ নিস্তব্ধ নিঝুম। জয়ের আশায় উৎসাহী ফক্স এগিয়ে চলেছেন বিলিয়ার্ড টেবিলের দিকে তার শেষ মারটির জন্য। দর্শকরাও তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সারা পৃথিবীর মানুষের সংবর্ধনা পাওয়ার সুখ-স্বপ্নে ফক্সের প্রাণ-মন দুলে দুলে উঠছে। আর ওদিকে পরাজয়রত ডিয়ারি আনত ম্লান মুখে অপেক্ষা করছে সেই অভিশপ্ত মুহূর্তটির জন্য।

লুই ফক্স হাতের কিউটি দিয়ে তার শেষ মারটি মারতে যাবেন, এমন সময় কোথা থেকে যেন ছোট্ট একটা মৌমাছি গুন্ গুন্ শব্দে বিলিয়ার্ড টেবিলের দিকে উড়ে এল। তার হাল্কা পাখা দুটি নিয়ে উড়তে উড়তে, ঘুরতে ঘুরতে সে বলটির উপর গিয়ে বসল। মুচকি হেসে ফক্স হাত দিয়ে মৌমাছিটি তাড়িয়ে আবার রেডি হলেন বলটি মারার জন্য। কিন্তু এ কী ব্যাপার! আবার সেই মৌমাছিটা ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠিক সেই বলটির উপর বসে পড়ল। ছোট্ট এই মজার ঘটনায় চারপাশে হাসি ও গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ এই বিচ্ছিরি ঘটনায় ফক্স একটু

বিরক্ত হলেন। বেয়াদপ মৌমাছিটাকে তাড়াবার জন্য ফক্স বলটাকে একটু ঠেলে দিলেন। এবার মৌমাছিটা গুন্ গুন্ করে ফক্সের নাকের পাশ দিয়ে ঘুরে একদম উধাও হয়ে গেল। কিন্তু ওদিকে ফক্সের অসতর্কতার জন্যই বিলিয়ার্ড টেবিলে বলটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে গড়িয়ে কয়েক ইঞ্চি দূরে সরে গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ফক্স তাঁর পালা হারলেন। গম্ভীরভাবে টেবিলের সামনে থেকে সরে দাঁড়ালেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী ডিয়ারি টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন। তিনি যেন তাঁর সকল হারানো উদ্যমকেই ফিরে পেয়েছেন। ধীরে ধীরে বেশ সতর্কতার সঙ্গে তিনি তার কিউ দিয়ে একের পর এক মেরে চললেন। আর পয়েন্টের পরিমাণও ক্রমেই বাড়তে থাকল। এতক্ষণ যে হারছিলেন হঠাৎ তার জয়ের আশা দেখে দর্শকরাও বিস্মিত হয়ে উঠল। দর্শকরাও এবার ডিয়ারিকেই উৎসাহ দিতে আরম্ভ করল। হতচিত্ত পরাজিত ডিয়ারির গম্ভীর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। ক্রমে ডিয়ারি তার শেষ মারটি মেরে ফক্সের পয়েন্টের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেলেন। হাজার হাজার দর্শকের উল্লাসের মধ্যে ডিয়ারি বিশ্ববিজয়ী ঘোষিত হলেন।

আর ওদিকে লুই ফক্স পাথরের মূর্তির মতো এক কোণে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভেবে চলেছেন কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। অর্থহীন দৃষ্টিতে ফক্স দর্শকদের উল্লাসের দিকে তাকিয়ে। দর্শকদের প্রচণ্ড চিৎকারের মধ্যেও তিনি সেই ছোট্ট মৌমাছিটার গুন্ গুন্ ধ্বনিই বেশি করে শুনছেন। সেই ধ্বনিই তার কাছে হলের সব কোলাহলকে ছাপিয়ে দিচ্ছে। যখন মনে করছেন মৌমাছিটা যেন তাঁকে ঘিরেই উড়ে চলেছে। চঞ্চল হয়ে ওঠেন ফক্স। না, এর হাত থেকে ছাড়া পেতেই হবে। মুক্তি পেতেই হবে। এপাশে বিশ্ববিজয়ী ডিয়ারি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ফক্সের সামনে। কিন্তু ফক্সের সেদিকে খেয়াল নেই। উদাস দৃষ্টিতে ফক্স তাকিয়ে আছেন। তাঁকে সেই মৌমাছিটার গুন্ গুন্ ধ্বনি পেয়ে বসেছে। হঠাৎ ফক্স সেই ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে অন্ধকার গলি দিয়ে উদ্দেশ্যহীন পথে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু না তবু তার মনে হচ্ছে দর্শকদের চিৎকার আর মৌমাছির গুন গুন্ ধ্বনি তাঁর পিছু নিয়েছে। ক্লান্ত শ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ফক্স আর ছুটতে পারেন না। থেমে পড়লেন শহরের বাইরে একটা ছোট্ট পাহাড়িয়া নদীর উপর, ছোট্ট পুলের উপর। কাঠের পুল। নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী। না এখনও ফক্সের নিস্তার নেই। ফক্স নদীর জলের সেই কুল কুল ধ্বনির মধ্যেও দর্শকদের উল্লাস ধ্বনি আর তাকে ছাপিয়ে ওঠা সেই মৌমাছিটার গুন্ গুন্ ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। না...আর সহ্য হয় না। ফক্সের মুখ থেকে অকস্মাৎ এই কথাটা বেরিয়ে আসে।

তারপর কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল তা কেউ জানে না। শুধু সবাই জানে তার পরদিন ভোরবেলায় সেই নদী দিয়ে যেতে যেতে প্রহরীরা দেখতে পায় প্রাণহীন নিথর ফক্সের শরীরটাকে। টুকরো পাথর খণ্ডের খাদের মধ্যে সেটা আটকে আছে।

মাঝরাতের জলসায়

শিশিরকুমার মজুমদার

প্রসন্ন বলল, 'এত রাতে ওখানে যাবার কি দরকার। জায়গাটা ভাল নয়। দিনের বেলাতেই তেমন লোকজন যায় না। আর তুই বলছিস এখন যাবি!'

ননী বারান্দায় পায়চারি করছিল। সেখান থেকে বলল, 'ভূতের ভয় আমার নেই। তাছাড়া এটা তো আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তুই তো জানিস প্রসন্ন, রঘুর সঙ্গে আমার আর আজকাল মোটেও সদ্ভাব নেই। বাড়ি নিয়ে মামলাটাই এর কারণ। ও মামলায় আমি জিতেছি। তারপর থেকে রঘুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখিই একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর রঘুরাও তো কলকাতা ছেড়ে গাঁয়ে চলে এসেছিল। কদিন আগে হঠাৎ ওর চিঠিটা পেলাম। ওই তো তোর টেবিলে ওটা আছে, পড়ে দেখ না। এর পর আর আমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয় কিছুতেই।'

প্রসন্ন টেবিলের ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিল। খুলে পড়ল। অদ্ভুত চিঠি। লেখা আছে—

ননী, বন্ধু ছিলি, মিথ্যা মামলা জিতে শত্রু হলি। তোর তো খুব সাহস শুনি। আয় না আমার কাছে। মরতে বসেছি, এ অসুখ সারবার নয়। মরার আগে তোর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে চাই। তোর জন্য অপেক্ষা করে থাকব আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে। সে বাড়ি গ্রামের বাইরে 'ভবদুলাল ভবন'। আসবি কিন্তু, সাহসী বীরপুরুষ।

প্রসন্ন বলল, 'আমার আপত্তি ওই বাড়িটা নিয়ে। চকগোবিন্দপুরের ভবদুলাল ভবনে মানুষ থাকে বলে শুনিনি। তবে ভেঙে পড়েনি, কারণ রঘুদের লোকজনরা ওটা নিয়মিত দেখাশোনা করে। তা রঘুরা তো ও বাড়িতে থাকে না। বিশাল খালি বাড়িটা তালা বন্ধ হয়েই পড়ে থাকে। ভূতের বাড়ি বলেই জানে সবাই এখানে। ওখানে ও তোকে গুম করতে পারে।'

বারান্দা থেকে ননী ঘরে এল। হাতঘড়ি দেখে বলল, 'চলি। বাইরে সাইকেল রিকশা পাব নিশ্চয়ই এখন রওনা দিলে সাতটা নাগাদ নিশ্চয়ই পৌছাব ওই ভবদুলাল ভবনে। দেখতে চাই ও আমার সঙ্গে এতদিন পরে কি ব্যবহার করে।'

'খুন করবে, না ভয় দেখাবে। হয়তো বা বোকার মতো তোকে দিয়ে নতুন

দলিল লিখিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। অবশ্য সে দলিল টেঁকে না।' বলল প্রসন্ন। 'কিন্তু তোর গোঁয়ার্তুমির মানে হয় না। মামলার পর মুখ দেখাদেখিও বন্ধ তোদের দুজনের। তারপরও যখন তোকে আসতে লিখেছে ওই রকম ভাষায়, তখন তোর বোঝা উচিত, মুখোমুখি দেখাটা তেমন আনন্দের ব্যাপার হবে না। তবুও যদি যেতে চাস তো কাল সকালে যাস। রাতেই যেতে হবে তার কি মানে আছে?'

হাসল ননী, বলল 'কলকাতা ছাড়ার আগে আমি গেছিলাম রঘুর প্রাণের বন্ধু রাখালের কাছে, সে তো আমারও বন্ধু। বলল, রঘুর নাকি ভীষণ অসুখ। কেমন আছে তাও জানে না। তবে রঘুরা তো ও বাড়িতে থাকে না। ও বাড়ির সুনাম নেই। শুনেই মনে মনে ঠিক করেছি রাতেই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব। ওই যে দেখলি না, ও আমাকে বীরপুরুষ বলে ঠাট্টা করেছে। এটাই হবে তার উত্তর।' টেবিলের ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে ভাঁজ করে পকেটে পুরল ননী। কোন দিকে না তাকিয়ে বলল, 'স্টেশনে নেমেই তোর কথা মনে পড়ল, অনেক দিন দেখা হয়নি বলে দেখা করে গেলাম। এর সঙ্গে ও বাড়িতে যাওয়ার কোন সম্বন্ধ নেইরে প্রসন্ন। চলি।' বলে ননী বার হয়ে গেল।

ভবদুলাল ভবনের সামনে সাইকেল রিকশাটা থামিয়ে রিকশাচালক জোরে জোরে ঘন্টা বাজাল বেশ কয়েকবার। ভেতর থেকে কারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রিকশাচালক বলল, 'আমি বলেছিলাম বাবু, কেউ থাকে না এখানে। ওই দেখুন কেউ সাড়াও দিচ্ছে না, কোথাও আলোও জ্বলছে না। আপনি কি নামবেন এখানে?'

তাকিয়ে তাকিয়ে বাড়িটা দেখছিল ননী। সত্যি কোথাও আলোর দেখা নেই। রঘু ওকে এখানে এসে দেখা করতে বলেছে, কিন্তু ও তো লেখেনি, সে এখানেই থাকে। তাছাড়া কদিন আগে ও খুব অসুখে ভুগেছে। এখন তাহলে তো ওর গ্রামের বাড়িতেই থাকা সম্ভব। সেখানেই যাবে নাকি ও এখন।

এ গাঁয়ে ও এর আগে কখনো আসেনি। প্রসন্ন ওখানে এসেছে এর আগে ক'বার। কলকাতায় প্রসন্ন আর রঘু ওর সঙ্গে একই কলেজে এক সঙ্গেই পড়ত। রঘু আর ও একই পরিবারের শরিকের ছেলে। রঘুদের বাড়ির সবাই বরাবর দেশেই বাস করেছেন। অতীতে ননীর ঠাকুর্দা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। গ্রামের সম্পত্তির মূলধনের জোরে কলকাতাতেও কিছু সম্পত্তি করেন তিনি। সেই সম্পত্তির কিছু অংশ দাবি করে বসে অন্য শরিকরা। তাই নিয়েই শেষ পর্যন্ত মামলা বাঁধে। মামলা চালু করেছিলেন ননীর বাবা, রঘুর বাবার অন্যায় দাবি ও দখলদারির বিরুদ্ধে। সেই মামলার নিষ্পত্তি হল রঘু আর ননীর আমলে।

দু'পক্ষের কর্তারা তখন পরপারে। ননীর পক্ষে রায় দিলেন বিচারক। জয়ের খবর পেয়ে ননী ছুটে গেছিল রঘুর কাছে। বলেছিল, "আরে তুই নাকি কলকাতা ছেড়ে দেশে চলে যাবি ঠিক করেছিস। কেন? ও বাড়ি তোকে ছাড়তে হবে না। তোর উকিলকে বলে, ও বাড়িটা আমি তোকে দানপত্র লিখে পাকা করে দিচ্ছি। তাহলেই তো ঝামেলা মিটবে।'

ঝামেলা মেটেনি। ভীষণ রাগে রঘু শহর ছেড়েছিল। ও-ই মুখ দেখাদেখি বন্ধ করেছিল।

রিকশাওয়ালা বলল, 'বাবু, তাহলে গ্রামে এদের বাড়িতে নিয়ে যাই আপনাকে? সে বাড়িও আমি চিনি।

তাই করতে যাচ্ছিল ননী। তখনি অন্ধকার বাড়িটার নীচের তলা থেকে একটা ডাক শোনা গেল। একটা দরজা আওয়াজ করে খুলে গেল। সাদা কাপড় পড়া একজন বাইরে বার হয়ে এলো। স্পষ্ট শোনা গেল তার কথা, 'কে? ননী এসেছিস নাকি? আয় আয়। আলো নেই দেখে চলে যাচ্ছিলি নাকি রে?'

এ যে রঘুর গলা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাড়াতাড়ি রিকশা থেকে নেমে পড়ল ননী। বাগানের গেট খুলে ভিতরে ঢোকার আগেই রঘু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ব্যঙ্গ করে বলল, 'অন্ধকার দেখে ভয়ে পালাচ্ছিলি না কি রে সাহসী পুরুষ। আমি তো তোকে এখানেই আসতে লিখেছিলাম। তবে?'

সেকালের জমিদার বাড়ি। বাগান সামনে, তার মাঝ দিয়ে পথ। সে পথের দুপাশে অন্ধকারে কিছু দূর দূর পাথরের মূর্তিগুলো কেমন যেন ভয় দেখানো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। এগোতে-এগোতে ননী বলল, 'ভয় নয় রে রঘু। আলো নেই দেখে ফিরে যাচ্ছিলাম। তোদের এখানকার বাড়িতে।'

রঘু ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত রাতে এলি, কেউ তোকে কিছু বলেনি? ওই রিকশাওয়ালাটা?'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রঘুর সামনে দাঁড়াল ননী। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'না, না, কি বলবে। তোর দেখা না পেলে বিপদে পড়তাম এত রাতে। যাক সে কথা। চল ভিতরে চল। আলো জ্বালবি না?'

হি হি করে হাসল রঘু। 'আলো? কলকাতা থেকে এলি, লোডশেডিং জানিস না। দেখ, এখুনি হয়তো আলো এসে যাবে। আয় ভিতরে আয়।'

রঘুর পেছন পেছন ঘরের মধ্যে ঢুকল ননী। নাকে সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ লাগল ওর। যেন এ ঘরের দরজা জানালা বহুদিন খোলা হয়নি। থমকে দাঁড়াল ননী।

থমকে থেমে ঘাড় ঘোড়াল রঘুও। হেসে বলল, 'কি হল রে? আবার ভয় পেলি নাকি, বীরপুরুষ!'

'অন্ধকারে কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। এ ঘরের দরজা জানালাগুলিও সব বন্ধ নাকি রে?' আন্দাজে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল ননী, 'মোমবাতি নেই? জ্বাল

না। আমার অসুবিধা হচ্ছে।'

তখনি দড়াম করে আওয়াজ তুলে পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সে আওয়াজে চমকে উঠেছিল ননী। ঘরটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ডুবে গেল। অবাক ননী বলল, 'ওরে রঘু কোন্ দিকে তুই, আলো না হলে এগোব কি করে রে?'

সঙ্গে সঙ্গে রঘু বলে উঠল, 'আলো তো জ্বলবে নারে বীরপুরুষ। এ বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন নেই। নেই কেরোসিন তেল, লণ্ঠন। এমনিই এগিয়ে চল। আমরা ওপরে যাব।'

'কি পাগলের মতো বকছিস! এ বাড়ি তোদের নিজেদের বাড়ি। এর আনাচে কানাচে তোর চেনা। অন্ধকারেও চলতে পারিস। আমি নতুন, শেষে কি ঠোক্কর খেয়ে ঠ্যাং ভাঙব? মোমবাতি বা লণ্ঠন আন।' বলে অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে রঘুকে ধরতে গেল ননী। ওকে সামনে না পেয়ে অবাক হয়ে বলল, 'এই রঘু, তুই কোথায় গেলি? আরে, অন্ধকারে আমি যে সত্যিই কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আলোর ব্যবস্থা নেই এখানে?

'না'। বেশ যেন জোর দিয়েই বলল রঘু। 'চল ওপরে চল এখানে তোকে থাকতে হবে না।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ আওয়াজ করে অন্য দিকের একটা দরজা খুলে গেল। অন্ধকারেই বুঝতে পারল ননী, ওটা ভিতরে বাড়িতে যাবার দরজা। আবছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রঘু ডাকল, 'আয় আমার সঙ্গে।'

দরজাটা খুলে যাওয়াতে মনে মনে স্বস্তিবোধ করল ননী। রঘুর পেছন পেছন দরজা দিয়ে বাইরে বার হয়ে ও অবাকই হল। ভিতর বাড়িরও কোথাও কোনখানে আলো জ্বলছে না। বারান্দার শেষে একদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা অন্ধকারের মাঝে আরও অন্ধকার হয়ে আছে। সেদিকেই এগোল রঘু। বলল, 'আয় বীরপুরুষ, দোতলায় তোর থাকার ব্যবস্থা করেছি। সেখানেই সবাই তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন। আয়, আয়।'

কিছুটা এগিয়ে ননী জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে আর কে কে থাকে রে রঘু। শুনেছিলাম, তোরা নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েছিলি, তাহলে?'

সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে রঘু বলল, 'থাকেন সবাই। ওপরে গেলেই তো তাঁদের দেখতে পাবি। তাঁরা তো তোর জন্যই অপেক্ষা করে আছেন। তুই আমার এত বড় বন্ধু। তোকে তো সবাই আদর-যত্ন করবে রে।' ওর গলার স্বরে ব্যঙ্গের ঝাঁজ।

সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ননী বলল, 'তুই দেখছি মামলার ব্যাপারটা এখনও

ভুলিসনি। অথচ ও ব্যাপারে আমার তেমন দোষ ছিল না।'

'মিছে কথা বলিস না ননী।' বেশ যেন রাগ করেই বলল রঘু, ' ওসব মিথ্যে কথা শুনতে ভাল লাগে না। তাছাড়া তোকে এখানে এখন ডেকে এনেছি মণ্ডা মিঠাই খাওয়াতে নয়। ডেকে এনেছি মামলার ব্যাপারটা নতুন করে মিটিয়ে ফেলতে। উঠে আয় ওপরে।' বাঁক নিয়ে সিঁড়িটা সোজা উঠে গেছে দোতলায়। বাঁক ঘুরে ফের থমকে দাঁড়াল ননী। অবাক কাণ্ড, দোতলাতেও কোথাও কোন আলো জ্বলছে না। এতক্ষণ একটানা অন্ধকারে থেকে, অন্ধকার ওর চোখে অনেকটা সয়ে গেছে। ও দেখল, দোতলার টানা বারান্দার একদিকে সারি সারি ঘর। তার প্রত্যেকটার দরজাই বন্ধ। অন্য দিকে বুক সমান উঁচু জাফরি কাটা রেলিং। ওদিকেই নীচে বোধ হয় ভিতর বাড়ির উঠোন। রঘু বারান্দায় উঠে গেছিল। না ফিরেই বলল, 'থামলি কেন? আয়, আয় তোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছি। কোন অসুবিধা হবে না তোর।'

আর উপরে না উঠে ননী বলল, 'তুই কি রঘু আমাকে ভয় দেখাবার জন্য এখানে এনেছিস? এ বাড়িতে তো দেখছি কেউ থাকে না। সব ঘর বন্ধ।'

হি হি করে হাসল রঘু। বলল, 'বাজে কথা। কে বলল সব ঘর বন্ধ। কোন্ ঘরটাতে তুই থাকতে চাস বল। প্রথম ঘরটা নাচঘর, ওটা থাক। দুনম্বরে থাকতেন দাদুর বাবা। একশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। তার মধ্যে নব্বই বছর কাটিয়ে ছিলেন এই ঘরে। পাশেরটা দাদুর ঘর। তিনিই তোর দাদুর বন্ধু ছিলেন। তাঁকেই তোর দাদু ভাল মানুষ পেয়ে ঠকিয়েছিলেন। তাঁর টাকায় কেনা কলকাতার বাড়ির দলিল নিজের নামে করেছিলেন। এ তো জচ্চুরি! আমাদের পক্ষে অনেক সাক্ষী ছিল। কিন্তু তোর বাবা টাকা খাইয়ে তাদের মুখও বন্ধ করে দিল। আর তুই, জানতিস মামলাটা চালু আছে, অথচ আমাকে সে ব্যাপারে কোনদিনও কোন কথা বলিসনি, আপনজনের মতো হেসেছিস, গল্প করেছিস, এক সঙ্গে সিনেমা দেখেছিস, বাড়িতে এসেছিস, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিস। শয়তান কোথাকার, ও সবই ছিল তোর ভড়ং। তলে তলে মামলার এক তরফা রায় নেবার ফন্দি! আমাদের উকিলটাকে কত টাকা খাইয়েছিলি? কলকাতার অতবড় বাড়িটা স্রেফ ঠকিয়ে দখল নিলি। এই সবের আজ ফয়সালা করব বলেই তোকে ডেকে এনেছি রে বীরপুরুষ। এ বাড়িতে কেউ নেই বলছিস কেন? এ বাড়িতেই তো তাঁরা সবাই আছেন, যাঁদের তুই ঠকিয়েছিস। আয়, আয়, উঠে আয়, তিন নম্বরের ঘরটা খুলে দিচ্ছি। এখন বিশ্রাম কর। রাত দশটায় অমাবস্যা লাগবে। তখনই তাঁরা আসবেন, ফয়সালা হয়ে-যাবে মামলাটা পাকাপাকি ভাবে। উঠে আয় তুই।'

থমকে গেল ননী। এই প্রথম ওর মনে কিছুটা ভয় ঢুকল। একি বলছে রঘু। এভাবে বাহাদুরী করে এখানে না আসাই উচিত ছিল ওর। অমন একটা চিঠি পেয়ে ওর অন্তত একবার ভাবা উচিত ছিল। রঘু ওকে নিয়ে এখন কি করতে চায়? ও বলছে এ বাড়িতে এখন আরও অনেকেই আছেন, আছেন তো তাঁরা কোথায় আছেন? সব ঘরগুলিই তো বন্ধ সামনে।

'উঠে আয় তুই। উঠে এলি?' যেন ধমকেই বলল রঘু। 'চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে? তোকে আসতেই হবে এখন ওপরে। নইলে যাবি কোথায়?'

সহজ হবার চেষ্টা করে ননী বলল, 'আচ্ছা, এসব কি পাগলামি করছিস তুই বল তো? ওপরে যেতে বলছিস, যাবটা কোথায়, দেখতেই তো পাচ্ছি, সব ঘরগুলি বন্ধ। আমার তো মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে তুই ছাড়া আর কেউ নেই।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের সব ঘরের সব দরজাগুলি এক সঙ্গে খুলে গেল। আর প্রত্যেকটা দরজা দিয়েই সাদা ছায়া ছায়া পোশাক পরা এক একজন মানুষ বার হয়ে এসে রেলিং-এর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। সবার শেষে বিশ্রী আওয়াজ তুলে সামনের একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। যেন বহুদিনের বন্ধ হয়ে থাকা জং ধরা দরজা খুলল। অবাক ননী দেখল, তার ভিতর থেকেও সাদা ছায়ার মতো পোশাক পরা একজন দশাসই পুরুষ বাইরে এসে দাঁড়াল। যে দাঁড়াল সেও যেন ওকেই দেখছে।

রঘু বলল, ''ভীতু কোথাকার, বলছি লোডশেডিং চলছে। ওই তো তোর থাকার ঘরের দরজা খুলে গেল। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমার আত্মীয়-স্বজনরা। সামনেই ঠাকুর্দা। তিনিই তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। সেই জন্যই তো তোকে এখানে ডেকেছি। ওসব আলোর কথা ছাড়তো! ও নিয়ে আমি কখনও সত্যি বলব না। সত্যি যা হল, এ বাড়িতেও অনেকে থাকেন।'

অনেকটা স্বস্তি বোধ করল ননী, বাকি ক' ধাপ উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে ও ঠাকুর্দাকে প্রণাম করতেই যাচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, 'থাক থাক আর অত ভক্তির দরকার নেই। ওখানেই থাক। কেন তোমাকে ডাকা হয়েছে জান?'

বেশ স্বস্তির সঙ্গে ননী বলল, 'না তো ঠিক জানি না। রঘুর চিঠিটায় মাথামুণ্ডু কিচ্ছু নেই। কেন যে আসতে হবে আমাকে এখানে, তা নিয়ে কিছুই লেখেনি। শুধু আমাকে ভীতু কাপুরুষ বলে মনের ঝাল ঝেড়েছে।'

'তোমাকে ডাকা হয়েছে শাস্তি দেবার জন্য। যে অন্যায় তুমি করেছ বন্ধুর

সঙ্গে, সে তো বিশ্বাসঘাতকতা। তার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে।

'মানে, আমাকে কি আপনারা বাগে পেয়ে গুম করে রাখবেন?' বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই বলল ননী। মনে মনে একটু ভয়ও পেল। লোডশেডিং কতক্ষণ চলবে এখানে। আলো আসবে না! দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইকে যেন কেমন দেখাচ্ছে। কেমন যেন দেখাচ্ছে ঠাকুর্দাকে। মনে হচ্ছে হাওয়ায় ভাসা হাল্কা তাঁদের দেহ। স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না। তার ওপরে ঠাকুর্দার কথাগুলিও যেন কেমন ফ্যাসফেসে।

'ঢোকো ঘরেতে তুমি। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।' ঠাণ্ডা গলায় বললেন ঠাকুর্দা, 'ঘরে ঢোকা ছাড়া আর তোমার কোন উপায় নেই। ঘরে তোমাকে ঢুকতেই হবে।'

মনে অনেক সাহস এনে ননী বলল, 'আপনাদের এই সব পাগলের প্রলাপ শুনতে আমি এখানে আসিনি। ভেবেছিলাম রঘু সব ভুলে গেছে। হ্যাঁ, তা তো গেছেই। নইলে যে বাড়ি নিয়ে এত কথা, তা তো আমি মামলা জেতার পরই ওকে দানপত্র করে বিনা শর্তে দিতে চেয়েছিলাম। তা ও নিল না কেন? এখন আমাকে মিথ্যা দোষী করা হচ্ছে।'

'তুমি তো জুতো মেরে গরু দান করতে চেয়েছিলে, তা রঘু নেবে কেন? ওর কি মানসম্মান নেই? তাছাড়া বাড়ি দিয়েই দেবে তো গোপনে মামলা লড়লে কেন?'

একথার যে কি উত্তর দেবে তা ননী ভেবেই পেল না। মামলা লড়েছিলেন ওদের বাঁধা আইনজীবী। তিনি ছিলেন ওর বাবার একান্ত বন্ধু। অনেক বলা সত্ত্বেও তিনি কোন কথাই শোনেননি। তার জন্য ওকে দায়ী করা অন্যায়।

পরক্ষণেই ওর মনে হল, এ কথা বললে রঘু মানবে কেন? ও যে এ সব কথা এখন বানিয়ে বলছে না, তার প্রমাণ ও দেবে কি করে! ভয়ঙ্কর অস্বস্তিতে ননী বলল, 'ও মামলার জন্য আমি দায়ী নই। অনেক বলা সত্ত্বেও আমাদের উকিলমশাই ও মামলা চালিয়ে গেছিলেন। তাঁকে থামাতে পারিনি বলেই তো বাড়িটা আমি রঘুকে দান করে দিতে চেয়েছিলাম। তাহলে আমি আর কিসে দোষী?'

'ওসব তোমার বানানো কথা। আমাদের খপ্পরে পড়ে এখন বলছ। ও কথা আমরা বিশ্বাস করব না। এসো, ঘরে ঢোকো। ওই ঘরের মধ্যে তোমাকে আর তোমার অপবিত্র আত্মাটাকে বন্দী করে রাখব। কেউ জানবে না। কেউ শুনতেও পাবে না তোমার আর্তনাদ। এই ঘরেই চিরকাল বন্দী হয়ে থাকবে তুমি। এই তোমার শাস্তি। এস,-এস, এস, সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে যাও। আর দেরি কর না।

রাত অনক হল।' হঠাৎ সামনে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন ঠাকুর্দা। বললেন, 'এই দুনিয়ায় এখন আর কারও ক্ষমতা নাই তোমাকে রক্ষা করে। এস, এস, এস।'

মনের সমস্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে খানিকটা এগিয়ে গেল ননী। বলল, 'এ আপনাদের অন্যায় জুলুম। আমার সম্বন্ধে যা তা ভেবেছেন। এখন আমাকে তেমনি মিছিমিছি বিপদে ফেলতে চান। আমি যদি না ঢুকি ঘরে, তাহলে আপনি কি করতে পারেন?' বলে বারান্দার মাঝখানে থেমে পড়ল ননী।

'আমার কথা না শুনলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। আমি আঁধার ভৈরবকে জাগাব। সে তোমার চুলের মুঠি ধরে তোমাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দেবে। যাই কর আর তাই কর, শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে।'

'ঠিক আছে।' রুখে দাঁড়িয়ে ননী বলল, 'আমি আর ওদিকে এগোবই না। নীচে নেমে যাব। সেখান থেকে হেঁটেই স্টেশনে চলে যাব।' বলেই তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কোথায় বিশ্রীভাবে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সেই ডাক থামার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটার অন্য কোনখানে একটা বেড়াল কঁকিয়ে উঠল—ওঁয়াও ওঁয়াও ওঁয়াও। যেন বেড়ালটা বাড়ির কোন ঘরে আটকা পড়েছে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে ননী সিঁড়ির বাঁকের মুখে এসে পড়ল। এ বাড়িতে আর ও এক মুহূর্তও থাকবে না। বাঁক ফিরতেই কে যেন এসে সজোরে ওর মুখে থাপ্পড় মেরে গেল। আতঙ্কে শিউরে উঠল ননী। থমকে দাঁড়াল সিঁড়ির বাঁকে।

ওপর থেকে তখনি রঘুর গলা শোনা গেল, 'বীরপুরুষ পালাচ্ছিস? পালাবি কোথায়? এ বাড়িতে ঢোকা যায় বার হওয়া যায় না। উঠে আয়, উঠে আয় বলছি। এলি উঠে।'

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে তিন চারটে করে সিঁড়ি লাফিয়ে নেমে ননী একতলার বারান্দায় এসে থামল। ডানদিকের একটা দরজা দিয়েই ও এখানে এসেছিল। সেই দরজাটা দিয়েই বাইরে চলে যাবে। অন্ধকার ওর চোখে একদম সয়ে গেছে। দরজাগুলি ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। প্রথম দরজাটা খুলল না, দ্বিতীয়টাও খুলল না। তাহলে ও কোন্ দরজা দিয়ে ভিতরে এসেছিল।

কানে এল পিছনের সিঁড়িতে ভারী পায়ের আওয়াজ। কে যেন পা ঠুকে ঠুকে নামছে নীচে, থপ, থপ, থপ। সে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পাগলের মতো তৃতীয় দরজাটাতে প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা মারল ননী। দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল। প্রায় মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে রয়ে গেল ননী। যাক বাবা, বাইরে যাবার পথ তাহলে ও খুঁজে পেয়েছে এতক্ষণে।

অন্যদিকের দরজাটার দিকে এগোল ও। এগোতে ওকে হল না। পিছনের দরজাটা প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা জুড়ে ঘোর অন্ধকার ঘনাল। কোন্ দিকে যে কি তা আর বুঝতে পারল না ননী। আন্দাজে ও বাইরের দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওটা বন্ধ। ওটা ও কিছুতেই খুলতে পারল না। এই দরজাটা নয়, নিশ্চয়ই অন্য আর একটা দরজা আছে ঘরে, সেটা দিয়েই ভিতরে এসেছিল রঘু। দেয়াল ধরে ঘরের একদিক থেকে অন্য দিকে হাতড়ে বেড়াতে লাগল ননী। আছে, আরও দুটো দরজা আছে ঘরটাতে, কিন্তু সে দুটোও খোলে এমন শক্তি নেই ওর দেহে। ওকে এ ঘরের মধ্যেই বন্দী করেছে রঘু। কিন্তু কেন? কি করেছে ও রঘুর। মামলা জিতেও ও তো বাড়িটা দিয়েই দিতে চেয়েছিল। তাহলে ও কেন এমন করছে ওর সঙ্গে। সত্যি ভীষণ ভয় পেয়েছে ননী। যা করছে রঘু তা তো আর সহজভাবে নেওয়া যাবে না। ও তাহলে এখন কি করতে চায় ওকে নিয়ে? প্রাণে মেরে ফেলতে চায়? তা কি সম্ভব! কিন্তু ওর ঠাকুর্দা, তিনিও তো এর মধ্যে আছেন। তাঁর মতো বয়স্ক একজন!

আতঙ্কে শিউরে উঠল ননী। ঠাকুর্দা। তিনি তো কবেই গত হয়েছেন। তিনি আসবেন কি করে আবার? ছায়া ছায়া মূর্তিগুলি তাহলে কাদের? রঘু কি ওকে ভয় দেখিয়ে কিছু লিখিয়ে নিতে চায়। কিন্তু সে লেখায় ওর কি লাভ হবে। বাইরে বার হয়েই তো ও অস্বীকার করবে ওই লেখার কথা। তবে কি করতে চায় রঘু ওকে নিয়ে।

'মজা করতে চাই আমি তোকে নিয়ে।' ওর কানের কাছে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল রঘু।

আতঙ্কে ফিরে দাঁড়াল ননী। হ্যাঁ, ওর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে একজন! যার গলাই বলে দিচ্ছে সে রঘু। কিন্তু এই বন্ধ ঘরের মধ্যে এল কি করে ও? ঘরের কোন দরজা তো খোলার শব্দ পায়নি ননী!

'আমাদের আর কিছুই বাধা দিতে পারে না। ওরে বোকা, ওরে গাধা, এখনও বুঝলি না আমরা কে? মামলার কথা গোপন রেখে, আমার বন্ধু সেজে মনে মনে তুই খুব মজা লুটছিলি। এখন আমিও তোকে এখানে এনে এই ঘরের মধ্যে বন্ধ করে তেমনি মজা লুটছি। এ বাড়িতে কেউ আসে না। রাতের অন্ধকারে আমরা ঘুরে বেড়াই আনাচে-কানাচে। আমরা যে মুক্তি পাইনি রে। পাব কি করে বল? ভাল মানুষ আমার ঠাকুর্দাকে তোর ঠাকুর্দা ঠকিয়েছিল। যখন সে কথা ঠাকুর্দা বুঝতে পেরেছিল, তাঁর সে কি হাহাকার। তাঁর সেই হাহাকারই আজও তাঁকে এই বাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছে। তারপর আমার সঙ্গে তুই বিশ্বাসঘাতকতা করলি। আমি

মরার আগে পর্যন্ত সে কথা ভুলতে পারিনি। আমিও তাই মুক্তি পাইনি। আজ তোর সঙ্গে শেষ খেলা খেলে তৃপ্তি পাব। কি জানি, তখনই হয়তো আমার, আমার ঠাকুর্দার মুক্তি। উঃ। কি যন্ত্রণা নিয়েই না আমরা দুজনে এই বাড়িটার চার দেয়ালের মধ্যে ঘুরে মরছি। আয় না কাছে আয়, তোকে ভাল করে বুঝিয়ে দিই কি যন্ত্রণা আমাদের।'

এক ছুটে ননী ওদিকের দরজাটার উপর আছড়ে পড়ল। সেকালের মজবুত মেহগনি কাঠের দরজা একটুও নড়ল না।

হি হি করে হেসে উঠল রঘু। অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে ডাকল, 'ও ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দা, এসো, এসো দেখে যাও কি মজা! খাঁচায় আটকা পড়া ইঁদুরের মতো করছে ও। এসো না দেখে যাও। আর, আপনারাও আসুন সকলে, যে যেখানে আছেন।'

না, ঘরের কোন দরজা খুলে যাবে না। সব কটাই শক্ত করে বন্ধ করা। সত্যিই খাঁচাকলে আটকা পড়া ইঁদুরের মতোই অবস্থা ওর। এখন যদি ও বুদ্ধি হারায় তো সর্বনাশ হবে। যাই কেন ঘটুক না, ওকে সাহস দেখাতেই হবে। তা না হলে ওরা পেয়ে বসবে। এদিক ওদিক তাকাতে থাকল ননী।

রঘু বলল, 'তোর মনে আছে ননী, সে দিনটা ছিল আমাদের বাড়িতে উৎসব। আমার গানবাজনা ভাল লাগত। ওস্তাদ বিলিমোরিয়া এসেছিলেন সেদিন। গান বেশ জমে উঠেছিল। এমন সময় মাখনবাবু, আমাদের সরকারমশাই, আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, তোর মামলা জেতার কথাটা! তুই জানতিস। তুই আমাকে কিছু না বলে, আমারই ঘরে বসে মাথা দুলিয়ে গান শুনছিলি। সে দিনের কথাটা আজও আমি ভুলিনি রে। আজও এখানে গানের জলসা হবে। তুই শুনবি, আর আমরা সবাই বসে বসে খুশিতে মাথা দোলাব।'

কথার শেষে ও দুবার হাতে তালি মারল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা নরকের আলোর আভাস জাগল। বাইরের দরজাটা আঁকড়ে ধরে ননী তাকিয়ে দেখল, ঘরের মাঝখানে ফরাস পাতা। ওস্তাদ কানে হাত চাপা দিয়ে গান গাইছেন, তার ভাষা শুনে আঁতকে উঠল ননী।

আয় জেগে আয় অন্ধকারের শব তোরা।
নরক জাগা গান শোনাব আজ তোদের।
আসর ঘিরে বস না তোরা সদ্য মরা আনকোরা।
বাজবে হাড়ের খটখটানি বাদ্য মধুর।
কলজে ছেঁড়া সুরের সাথে ধর না তোরা,
শ্মশান জাগা গুমরে ওঠা হাওয়ার সুর।

গানের মাঝেই রঘু এগিয়ে এল ননীর দিকে। হি-হি করে হেসে বলল, 'কিরে

এখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, তোর সম্মানে গান গাইছেন ওস্তাদ, বস এসে, বাহবা দে, মাথা দোলা, তা না হলে গানে উনি উৎসাহ পাবেন কি করে?'

ওর কথা শেষ হতেই আসরের সবাই মুখ ফিরিয়ে এক সঙ্গে বলল, 'তা তো নিশ্চয়ই, তা তো নিশ্চয়ই। আসুন আপনি, বসুন এসে।'

শিউরে উঠল ননী। আসর ঘিরে বসে থাকা যারা ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছে, সব কজনেই কঙ্কাল। মাঝখানে তানপুরা হাতে গান গাইছে যে ওস্তাদ সেও কঙ্কাল।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ননী। প্রাণপণ শক্তিতে দরজাটা ধাক্কা দিতে লাগল। বিকট আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল। প্রায় ছিটকে বাইরে বার হয়ে এল ননী। পিছনে প্রাণ-কাঁপানো অট্টহাসি উঠল। পড়িমরি করে ছুটে ননী গেটের বাইরে এসে পড়ল। আবারও ছুটতে যাচ্ছিল হঠাৎ যেন সামনে এসে থামল একটা সাইকেল রিকশা। রিকশা থেকে প্রসন্ন চেঁচিয়ে উঠল ভয় পাস না ননী, ভয় পাস না। আমি প্রসন্ন।' ননী ওখানেই ঢলে পড়ল।

তারপর যখন ও চোখ খুলল, ও শুয়ে আছে প্রসন্নর ঘরে। প্রসন্ন ওকে তাকাতে দেখেই বলল, 'যাক বাঁচালি। যা চিন্তায় ফেলেছিলি!'

কেমন যেন চোখে তাকাল ননী ওর দিকে।

প্রসন্ন বলল, 'তুই চলে যেতেই আমার মনে হলো কাজটা ভাল করলাম না। তোর পেছন পেছন রিকশা নিয়েই ছুটেছিলাম। আগে গেছিলাম রঘুদের এখনকার বাড়িতে। ওখানে সবাই বললেন, মাস দুই আগে রঘু মারা গেছে। শুনে অবাক হলাম, তাহলে রঘুর নামে কে তোকে চিঠি দিল? এর মধ্যে গোলমাল অছে বুঝেই চলে এসেছি এখানে। তা তুই অমন পাগলের মতো ছুটছিলি কেন?'

তখনি ননীর মনে পড়ল রঘুর চিঠিটার তারিখ প্রায় আড়াই মাস আগের। তাহলে ওই অ্যাঙ্কর চিঠিটা রঘু বেঁচে থাকার সময় লিখেছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্যেই কি তাহলে ওর আত্মা আজ এমন করে ওকে বন্দী করেছিল! ভাগ্যিস ওর ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলে গেছিল, তো না হলে যে কি হতো!

সে এক সাঁঝের বেলা

মধুশ্রী মৈত্র

আমাদের কেশব সেন স্ট্রিটের বাড়িটা অনেক দিনকার পুরানো, তা প্রায় অনেক দিনেরই হবে কারণ যখন বাড়িটা হয়েছিল, তখন সেখানটা ছিল এক গোরস্থান। পরে বড়োদের মুখে শুনেছি সোনার বেলপাতা পুঁতে অনেক পুজোটুজো দিয়ে তবে নাকি বাড়ি করতে হয়েছিল ওখানকার বিখ্যাত চোখের ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচীকে, যার কাছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও চোখ দেখাতে এসেছেন।

তা সে যাই হোক, আগেকার দিনের অনেক বাড়ির মতোই আমাদের বাড়িতেও একটা আলসেবিহীন ছোট ছাদ ছিল বড়ো ছাদের একেবারে গায়ে গা লাগানো, যাকে আমরা বলতাম নেড়া ছাদ।

সেদিন যাই-যাই বিকেলের আলো-আঁধারিতে আমার ছোট পিসি একাই ছিল সেই ছাদে, তারপর চুল বাঁধতে এল ঐ তেতলাতেই আমার এক দাদুর ঘরে।

হঠাৎ এক বিকট চিৎকার। এমনই সেই চিৎকার যা আমাদের অতবড় তিনতলা বাড়ির একতলা থেকে শোনা গিয়েছিল। সবাই তো দুদ্দাড় করে ওপরে, কি ব্যাপার হলটা কি? আমাদের ছোটদের চোখে তো একরাশ বিস্ময় আর ভয়।

এদিকে ছোট পিসি ঐ চিৎকার করে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে এসে দোতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর মুখেচোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে জ্ঞান তো ফিরল, কিন্তু সে কি হিন্দী বুলি। অনবরত বলছে 'ম্যায় কস্তুরী বাঈ আখরদ্ হু।' আর গায়ে কি জোর, দু-তিন জনে ধরে রাখতে পারছে না। মুখ চোখ লাল, দাঁত কিড়মিড় করছে।

ঠাকুমা, মা, পিসিরা তো সব ঠকঠক্ করে কাঁপছে। একেই আমাদের বাড়ি সম্পর্কে নানারকম গল্প শোনা যেত, তারপর আবার এই কাণ্ড।

এরপর এল ওঝা, সে তো কিছুই করতে পারল না, নানারকম মন্তরতন্তর ঝাড়ফুঁক সবই চলতে লাগল। তারপর একদিন বলল, 'হ্যাঁ বুঝেছি, এইবার তোর দফারফা করছি আমি', বলেই বাড়ির একজনকে বলল 'এক ঘড়া জল নিয়ে আসুন।' তারপর ছোট পিসিকে বলল 'যা, এবার দাঁতে কামড়ে ঐ ঘড়াটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়।' আমরা তো বোকার মতো তাকিয়ে একটা অলৌকিক

কাণ্ডকারখানার জন্যে অপেক্ষা করছি আর ভাবছি এও কি সম্ভব? ছোট পিসি কিন্তু সত্যি সত্যি দাঁত দিয়ে জল ভর্তি ঘড়াটা নিয়ে আমাদের ভেতরবাড়ির উঠোনের ধারের ছোট রকটা থেকে লাফিয়ে নামল, তবে রাস্তা অবধি যাওয়ার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

ওঝা তো হাল ছেড়ে দিল, এদিকে কস্তুরীবাঈ তো ছোট পিসিকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সবারই মন খারাপ, মাথায় হাত। এযে সত্যি সত্যি ভূতুড়ে গল্পকেও ছাড়িয়ে গেল।

এরপর এলেন এক মহিলা ওঝা তিনি নাকি ভূতপেত্নী তাড়ানোর ব্যাপারে খুবই পটু। তিনিও নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আরম্ভ করলেন আর এইসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার চোটে আমরা সবাই রাত্তিরে এক ঘরে খুব কাছাকাছি গুটিশুটি মেরে শুতাম। তেতলাকে তো প্রায় ভূতেদের আড্ডাখানাই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কাজের লোকে সন্ধ্যাবেলায় কিছুতেই কোন কারণেই যেতে চাইত না। ঐ বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে এই এক ঘটনা একেবারে ঝড় বইয়ে দিল।

এরপর আবার সেই মহিলা ওঝা ফতোয়া জারি করলেন, ছেঁড়া জুতো মুখে করে রাস্তায় ফেলে আসতে হবে, তা এবার কিন্তু অজ্ঞান-টজ্ঞান না হয়েই ছোট পিসি সত্যি করেই আদেশ পালন করল।

ব্যস্ একেবারে স্বাভাবিক, সবাই তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক্ কস্তুরী বাঈ শেষ পর্যন্ত ছাড়ল তাহলে আমার পিসি বেচারাকে।

একদিন আমার ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, তুই কি দেখেছিলি, যে অমন করে চিৎকার করে উঠেছিলি?' আমরা সবাই ঘিরে বসেছি বড়োদের চোখ রাঙানি সত্ত্বেও, চিটে গুড়ে মাছি লাগার মতো আমরা কেউ যাচ্ছি না।

ছোট পিসি শুরু করল—'জানো বড়োমা, সেদিন সন্ধ্যেবেলা আয়নার সামনে চুল বাঁধছি, হঠাৎ আয়নার মধ্যে দিয়ে সে যে কি বীভৎস একটা মুখ দেখলাম, সে মুখটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল আমার দিকে—'কথা আর শেষ হলনা, মুখ চোখ লাল করে ছোট পিসি আবার অজ্ঞান, বুঝতেই পারছ আবার একপ্রস্থ হৈ হৈ ব্যাপার। যাই হোক, মুখ চোখে জল দিতে আবার কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল, ঠাকুমাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এবার কিছু হলে দোষের ভাগী তাকেই হতে হত।

এরপর দিন গেছে গড়িয়ে, একের পর এক অনেকেই চলে গেছেন। পঞ্চান্নজনের বিরাট একান্নবর্তী বাড়িটাকে মাঝে মাঝে হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা গেলে খুব খালি লাগে, কিন্তু আজও আমার সব যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ছোট পিসির ঐ ঘটনাটাকে

ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। অনেকে বলেন হিস্টিরিয়া, কিন্তু তাই যদি হয় ঠিক এক মাসের জন্যে একটি পুরনো পরিবারের খাঁটি বাঙ্গালী পরিবেশে মানুষ হওয়া একটি মেয়ে কি করে হিন্দী বলেছিল আর কস্তুরী বাঈ-এর নামটিই বা তার ঠোঁটের আগায় কে বসিয়ে দিয়েছিল? যাই হোক, মীমাংসার ভারটা তোমাদের

হাতেই ছেড়ে দিলাম। আর একটা কথা জেনে তোমরা হেসো না যেন, আমি বাপু এই বয়সেও আমাদের ঐ বাড়ির ছাদে রাত্তিরে উঠলে এখনও 'রাম রাম' বলি।

পুরনো দিনের মাছি

অনীশ দেব

খাওয়া-দাওয়া হই-হল্লোড় সব মিলিয়ে আসর যখন একেবারে জমজমাট, ঠিক তখনই তাতা এসে শাড়ির আঁচলে ছোট্ট টান মেরে আমাকে একপাশে ডাকল। আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকাতেই ও চাপা গলায় বলল, 'দিদি, রুমুকা আসতে পারবে না। পিসিমণি বলল, ক'দিন ধরেই যেন কী হয়েছে—ঘর ছেড়ে একদম বেরোচ্ছে না। সবসময় জানালা-দরজা বন্ধ করে বসে আছে।'

তাতার কথায় বেশ অবাক হয়ে গেলাম। রুমুকা আসবেন না!

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করেছি আমি। সেই উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে আজ খাওয়া-দাওয়া হইচই। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা সব এসেছে। অথচ রুমুকা আসবেন না।

রুমুকা আমাদের আপন কাকা নন, কিন্তু তাঁর চেয়েও বেশি। বাবার কীরকম যেন ভাই হন। ওঁদের বাড়িটা আমাদের খুব কাছেই—মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ। একটা পুকুর পেরিয়ে যেতে হয়।

ছোটবেলায় যখন খেলাধুলো করতাম, তখন রুমুকাই ছিলেন আমাদের কোচ। কবাডি খেলা হোক কিংবা ব্যাডমিন্টন, রুমুকা কখনওই পিছিয়ে পড়তেন না। তাছাড়া দেশ-বিদেশের কতরকম খেলার কত যে খবর রাখতেন! আমার বা তাতার জন্মদিন নিয়ে মা বা বাপির তেমন উৎসাহ না থাকলেও রুমুকা কোথা থেকে এসে একেবারে হইহই কাণ্ড বাঁধিয়ে দিতেন। কখ্খনও আমাদের জন্মদিন ভুলে যাননি।

আমার ডাকনাম ঝিনি। কিন্তু রুমুকা সবসময় আমাকে ঝুনঝুনি বলে ডাকেন। বলেন, 'ঝুনঝুনির মধ্যে একটা তালের ব্যাপার আছে।' আমার আর তাতার স্কুলের পড়াশোনায় রুমুকা ছিলেন বিনিমাইনের গৃহশিক্ষক। যখন তখন এসে পড়াতে শুরু করে দিতেন। কিন্তু ওঁর কাছে পড়তে কখনও আমাদের খারাপ লাগত না। বাপি সবসময় মাকে বলতেন, 'রমণীরঞ্জন যতদিন আছে তদ্দিন ওদের লেখাপড়া নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই।'

এই হল রুমুকা—অথবা রমণীরঞ্জন সিন্‌হা। লম্বা ফরসা চেহারা। টানটান শক্তপোক্ত শরীর। কপাল স্বাভাবিকের চেয়ে খানিকটা বেশি চওড়া। সাদা-কালো

চুল ব্যাকব্র্যাশ করে আঁচড়ানো। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে ফুলহাতা শার্ট আর ধুতি। গত দশ-বারো বছর ধরে আমি আর তাতা মানুষটাকে এই একই রকম দেখেছি।

রুমুকা বিয়ে করেননি। অল্প বয়েসে বিধবা হওয়া দিদিকে নিয়ে থাকেন। দিদির কোন ছেলেমেয়ে নেই। ছোট দোতলা বাড়িতে ওঁরা দুজন, আর একজন কাজের লোক—সীতাদি।

রুমুকা ঠিক নিয়ম করে চাকরি করেননি। সবার কাছে যা শুনি তাতে এর মধ্যেই উনি গোটা বারো চাকরি পালটেছেন। একদিন এই বারবার চাকরি পালটানোর কথা জিজ্ঞেস করায় হেসে আমার বিনুনিতে আলতো টান মেরে বলেছেন, 'ঝুনঝুনি, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে। আমার লাইফটা হল যাকে বলে "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির"।

তবে এইবার চাকরি ছাড়ার পর রুমুকা ঠিক করেছেন, স্টেশনের কাছাকাছি একটা দোকান দেবেন। মাস দুয়েক ধরে তারই খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছেন।

দিন দশেক আগে যেদিন আমি উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের কথা বলতে গিয়েছিলাম, সেদিনও রুমুকা পড়ার বই-টই ছুঁড়ে ফেলে একেবারে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠেছেন বাচ্চাছেলেদের মতো। বলেছেন, 'এটা নিয়ে দারুণভাবে সেলিব্রেট করতে হবে, বুঝলি? সেদিন আমি তোদের গান গেয়ে শোনাব।'

অথচ আজ রুমুকা এলেন না। তাতাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ও ফিরে এসে যা বলল তাতে ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। রুমুকার কী হয়েছে যে সবসময় জানালা-দরজা বন্ধ করে বসে আছেন? রুমুকা কি কোন কারণে ভয় পেয়েছেন? যে মানুষটার জীবন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির', সে ভয় পেয়েছে! ঠিক করলাম আজ রাতেই রুমুকার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির পালা যখন শেষ হল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। মাকে আর বাপিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে তাতাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম রুমুকার বাড়ির দিকে। বাপি সঙ্গে করে আসতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি বারণ করলাম। একে তো তাতা যথেষ্ট বড়, ক্লাস টেনে পড়ে, ও সঙ্গে থাকছে—তা ছাড়া, এই তো কাছেই বাড়ি। দরকার হলে সীতাদি আমাদের এগিয়ে দেবে।

মা টিফিন কেরিয়ারে খাবার-দাবার সাজিয়ে দিলেন। আর পিসিমণির জন্য আলাদা বাক্সে মিষ্টি দিলেন। পিসিমণি খুব সাত্ত্বিক মানুষ। পুজো-আর্চা, গঙ্গাজল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

এখন বর্ষার সময়। যখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আমরা ছাতা নিয়ে বেরোইনি। মাত্র তো দশ-পনেরো মিনিটের ব্যাপার। তা ছাড়া টিফিন কেরিয়ার,

টর্চ, ছাতা এসব একসঙ্গে সামাল দেওয়া ভারী মুশকিল।

কাদা প্যাঁচপেচে একটা জায়গা সাবধানে ডিঙিয়ে আমি তাতাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাতা, তুই রুমুকাকে আসার জন্যে বলেছিলি?'

তাতা বলল, 'না। আমি বাড়িতে ঢুকতেই পিসিমণি ওই খবর দিল। তারপর বলল, তুই ওপরে গিয়ে একবার ডেকে দ্যাখ। তখন আমি দোতলার ছাদের ঘরে গেছি। গিয়ে দেখি ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। শুধু ভেতর থেকে একটা হুসহুস শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। মনে হল রুমুকারই গলার আওয়াজ। তখন আমি রুমুকার নাম ধরে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে হুসহুস শব্দটা থেমে গেল। বেশ ভয় পাওয়া গলায় রুমুকা চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে? গলাটা কেমন যেন পিকিউলিয়ার শোনাল। আমার একটু ভয় ভয় করছিল। কোনরকমে বললাম, আমি তাতা। আমাদের বাড়ি যাবে না? অমনি সব চুপচাপ হয়ে গেল। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না আর। আমি আরও দু'তিন বার রুমুকার নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু সেই নো রিপ্লাই। তখন আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি।'

তাতার কথা শুনে, আমার অবাক হওয়ার ব্যাপারটা আরও বাড়ছিল। মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না।

আমরা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পুকুরটা জলে জলে টইটম্বুর। অন্ধকারে জল ভাল করে ঠাহর হচ্ছে না। দু'এক জায়গায় আলোর টুকরো ঠিকরে পড়েছে। ব্যাঙদের বর্ষা-অধিবেশন এখানে আরও জোরদার। জোলো বাতাসে পুকুর পাড়ের দুটো মাঝারি গাছ এপাশ-ওপাশ দুলছে। একটু দূরেই রুমুকাদের বাড়ি। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাড়ির কোথাও কোন আলো চোখে পড়ছে না। এম মধ্যেই ওঁরা সবাই শুয়ে পড়ল নাকি?

মনের মধ্যে একটা শিরশিরে অস্বস্তি নিয়ে রুমুকাদের বাড়ি পৌঁছলাম। অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দেবার পর সীতাদি দরজা খুলল। আমাদের দেখেই চোখ গোল গোল করে বলল, 'তোমরা এত রাতে?'

আমি বললাম, 'পিসিমণি কোথায়? রুমুকা কোথায়?

'দিদিমণি পুজো করছে—ঠাকুরকে শোয়াচ্ছে। আর দাদাবাবু ওপরে-বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।'

আমি আর তাতা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মিষ্টির বাক্সটা সীতাদির হাতে দিয়ে বললাম, 'এটা দিদিমণিকে দিও। বোলো আমরা এসেছি, রুমুকার ঘরে গল্প করছি।'

আর সময় নষ্ট না করে আমরা দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোলাম।

সিঁড়িতে একটা বাল্‌ব জ্বলছে। তার আলোটা কেমন ঘোলাটে। সিঁড়ির

অর্ধেকটা উঠলেই বাড়ির পিছন দিকের অগোছালো বাগানটা দেখা যায়। তবে এখন, অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শুধু বাতাসে গাছের পাতার অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

দোতলার অর্ধেকটা ছাদ। আর বাকিটা রুমুকার ঘর। অন্ধকার ছাদে আরও গাঢ় একতাল অন্ধকারের মতো ঘরটা একপাশে দাঁড়িয়ে। ঘরে আলো জ্বলছে কিনা বোঝার উপায় নেই, কারণ দরজা-জানালা সব বন্ধ। ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমি 'রুমুকা রুমুকা' বলে ডাকলাম। ধাক্কাও দিলাম কয়েকবার। ঘরের

ভেতরে বই-টই জাতীয় কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। তাতা পিছন থেকে আমার হাত ধরে টান মারল। চাপা গলায় বলল, 'চলে চল—'

আমি ওর কথা গ্রাহ্য না করে আবার ডাকলাম।

কোন সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন চেঁচিয়ে বললাম,'রুমুকা, আমি আর তাতা তোমার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি। আমার পরীক্ষার রেজাল্টে তুমি খুশি হওনি? তাই নেমন্তন্নে গেলে না!'

কোন জবাব এল না ভেতর থেকে। তাতা আবার আমার হাত ধরে টান মারল। কিন্তু আমার কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল। চেঁচিয়ে বললাম, 'তুমি দরজা না খুললে আমরা দু'জন সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকব, বৃষ্টিতে ভিজব।'

এমন সময় মেঘ ডেকে উঠল। বিদ্যুতের রেখা ঝলসে গেল আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। আর প্রায় একই সঙ্গে খটাস করে খুলে গেল রুমুকার ঘরের দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' মানুষটা। কিন্তু আলোছায়ার মাঝেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ওঁর মাথাটা বেশ ঝুঁকে পড়েছে। যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি সেই মানুষটার মুখে-চোখে কী যে দেখলাম—আমার চোখে জল এসে গেল পলকে— 'রুমুকা।'

রুমুকা আমার হাত ধরে পরম স্নেহে মাথায় হাত বোলালেন, বললেন, 'ভিজিসনি তো? আয়, আয়, ভেতরে আয়। আয়, তাতা—'

আমরা ঘরে ঢুকতেই চট করে দরজা বন্ধ করে দিলেন রুমুকা। তারপর বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বিছানায় গিয়ে বসলেন। মাথাটা কিন্তু সামান্য ঝুঁকেই রইল।

রুমুকার ঘরে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল বই। দেয়ালের তাকে, বিছানায়, মেঝেতে এলোমেলোভাবে রাখা অসংখ্য বই। ওঁর অভ্যাস হল পেনসিল দিয়ে বইয়ের পাতায় পাতায় অসংখ্য মন্তব্য লেখা। উনি বলেন, 'খুঁটিয়ে কোন বই পড়তে হলে বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার সময় মনের ভাব, মতামত, মন্তব্য এসব লিখে রাখা দরকার। তাহলে বইটা মনে দাগ কেটে যায়। তা ছাড়া পরে বইটা আবার পড়ার সময় ওই মন্তব্যগুলি খুব সাহায্য করে।' রুমুকার এই অভ্যাসটা আমি খানিকটা রপ্ত করে ফেলেছি। দেখেছি, তাতে সত্যিই পড়াশোনার সুবিধে হয়।

রুমুকার বিছানা নীল রঙের একটা বেডকভারে ঢাকা। তার ওপরে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে চারটে বই, একটা হলুদ রঙের পেনসিল, আর একটা সাদা ইরেজার। এছাড়া আরও একটা অদ্ভুত জিনিস পড়ে আছে বিছানায়—একটা ছোট লাঠি।

ঘরের ডান দিকের দেয়ালে ঘেঁষে রাখা একটা মাঝারি টেবিলের ওপরে আমি টিফিন কেরিয়ারটা নামিয়ে রাখলাম। চোখের জল মুছে রুমুকাকে দেখলাম ভাল করে।

রুমুকার সারা শরীরে কেমন এক অবসন্ন ভাব। ফরসা রঙ কিছুটা মলিন মনে হল কপালে আর চোখের নীচে ভাঁজও যেন অনেক বেশি। পরনের গেঞ্জি আর পাজামা অন্যদিনের মতো ধোপদুরস্ত নয়।

রুমুকা আমার দিকে তাকালেন। ওঁর উজ্জ্বল চোখে কেমন এক ভয়ার্ত আকুল ভাব। আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। তাতা কখন যেন আমার হাত আঁকড়ে ধরেছে। বুঝলাম, ও ভয় পেয়েছে। এই রুমুকাকে ও চিনতে পারছে না। আমার কাছেও এই মানুষটা অচেনা।

রুমুকা বললেন, 'বোস—তোরা বোস—'

ঘরে একটা টুল, একটা বেতের মোড়া, আর একটা চেয়ার রয়েছে। আমি বিছানায় রুমুকার প্রায় মুখোমুখি গিয়ে বসলাম। তাতা মোড়াটা আমার কাছটিতে টেনে নিয়ে এসে বসল।

রুমুকা হাসতে চেষ্টা করে বললেন, 'ঝুনঝুনি, তোর রেজাল্টের খাওয়া-দাওয়া হইচই কেমন হল?'

আমি বিছানায় রাখা লাঠিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'পড়াশোনা করতে তোমার আজকাল লাঠি লাগছে নাকি?'

রুমুকা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, 'না রে, লাঠিটা নিয়েছি...' হঠাৎই চুপ করে গেলেন।

আমার রাগ হল। অভিযোগের সুরে বললাম, 'তুমি তো আমাদের সেই ছোটবেলা থেকে সত্যি কথা বলতে শিখিয়েছ। আর তুমি নিজেই সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছ! ঠিক করে বলো তো তোমার কী হয়েছে? ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছ না, দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে আছ—কী ব্যাপার বলো তো?'

রুমুকা জেদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে শক্ত হয়ে বসে রইলেন।

আমি তাতার দিকে ফিরে তাকালাম, 'তাতা, ঘরের জানালা-দরজাগুলি খুলে দে তো—'

ইলেকট্রিক শক-খাওয়া মানুষের মতো ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন রুমুকা। ওঁর চোখে-মুখে পলকে নেমে এসেছে গাঢ় আতঙ্কের ছায়া। ভয়ার্ত গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'খুলিস না! খুলিস না! খুললেই ওগুলি ভেতরে ঢুকে পড়বে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওগুলি? ওগুলি মানে?'

'মাছি! মাছি!' প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন রুমুকা। তারপর ধপাস করে

বসে পড়লেন বিছানায়। ডান হাতের শক্ত মুঠোয় তুলে নিলেন খাটো লাঠিটা। ঘরের চারপাশে অনুসন্ধানী নজর বুলিয়ে নিলেন একবার।

বিছানায় লাঠিটা রাখার মানে এবার বুঝতে পারলাম আমি। কিন্তু লাঠি দিয়ে মাছি তাড়াতে এত মরিয়া কেন রুমুকা?

আমি ওঁকে সাহস যোগানোর জন্য বললাম, 'মাছিকে এত ভয় পাচ্ছ কেন? মাছি কি তোমাকে খেয়ে ফেলবে!'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন রুমুকা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই বুঝবি না, ঝুনঝুনি। এ সাধারণ মাছি নয়...'

'মউমাছি?' আমি পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম।

রুমুকা হাসলেন না। আমার দিকে ভয়ের চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'মউমাছি নয়। পুরনো দিনের মাছি।'

'পুরনো দিনের মাছি! তার মানে?'

হাতের লাঠিটা বিছানায় রেখে বিষণ্ণ হাসলেন রুমুকা। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'বললে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।...'

'আমি করব। তুমি বলো। সব তোমাকে বলতেই হবে। কেন তুমি ক'দিন ধরে এমনই করছ। কী হয়েছে তোমার?'

আমার জেদ রুমুকা জানেন। তাই এমনভাবে উনি বিছানায় গুছিয়ে বসলেন যে, আমি বুঝতে পারলাম, সবকিছু খুলে বলার জন্য উনি মনে মনে নিজেকে তৈরি করেছেন। রুমুকার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, ওঁর ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণার একটা তোলপাড় চলছে। আমার ভীষণ মায়া হচ্ছিল।

আচমকা বাজ পড়ার শব্দে আমাদের কানে যেন তালা লেগে গেল। মেঘের গুড়গুড় শব্দ মিলিয়ে যেতেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেলাম। ঘরের পাখাটা ফুলস্পিডেই ঘুরছে, কিন্তু জানালা-দরজা সব বন্ধ থাকায় কেমন একটা গুমোট ভাব।

রুমুকা খুব সিরিয়াস মুখ করে বললেন, ' তোদের সব বলছি, কিন্তু আর কাউকে এ-কথা বলিস না। তাহলে আমাকে সবাই পাগল ভাববে।'

আমি ঘাড় নেড়ে কথা দিলাম। তাতা বলল, ''কাউকে বলব না। মরে গেলেও বলব না।'

'শোন তাহলে..' কয়েকবার ঘরের এপাশ-ওপাশ দেখলেন রুমুকা, তারপর হাতে হাত ঘষে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করে থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'আমার বই পড়ার নেশার কথা তো তোরা জানিস। এও জানিস যে, বই পড়ার সময় আমি বইয়ের মার্জিনে পেনসিল দিয়ে নোট লিখি। একজন ফ্রেঞ্চ ম্যাথামেটিশিয়ান পিয়ের দ্য ফার্মা-র এরকম নোট লেখার অভ্যেস ছিল। ১৬২১

পালে তিনি আর এক ম্যাথামেটিশিয়ান ডায়োফ্যাণ্টাসের লেখা ''অ্যারিথমেটিক'' নামের একটি বই কিনেছিলেন। সেই বইয়ের মার্জিনে তিনি এমন একটি মন্তব্য লিখে গিয়েছিলেন যা থেকে ''ফার্মাজ্ লাস্ট থিয়োরেম'' নামে একটি উপপাদ্যের জন্ম হয়। এই উপপাদ্যটা প্রমাণ করতে অঙ্কবিদদের ৩২৭ বছর লেগে গিয়েছিল।'

কথা বলতে বলতে রুমুকা নিজের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাচ্ছেন বলে আমার মনে হল। তা না হলে উনি মাছির কথা থেকে ম্যাথামেটিশিয়ানের কথায় যেতেন না।

ঘরের টিউব লাইটের আলো একপাশ থেকে রুমুকার কপালে এসে পড়েছে। চকচকে সেই জায়গায় একটা শিরা ফুলে রয়েছে।

'ফার্মার কথা থাক, আমার কথা বলি—' রুমুকা আবার বলতে শুরু করলেন, 'বইয়ের মার্জিনে নোট লেখার জন্যে আমি একসঙ্গে এক ডজন করে পেনসিল কিনে রাখি। সেগুলি শেষ হয়ে হয়ে যখন একটা পেনসিলে এসে ঠেকে তখন আমি কলকাতা থেকে আবার নতুন এক ডজন পেনসিল কিনে নিয়ে আসি। ঝুনঝুনি তো জানিস, কোহিনুর পেনসিল আমার বরাবরই বেশি পছন্দ। কলকাতায় গিয়ে কলেজ স্ট্রিট পাড়ার পটুয়াটোলার একটা পাইকিরি খাতা-পেনসিলের দোকান থেকে আমি সবসময় কোহিনুর পেনসিল কিনি। শুধু পেনসিল কেন, ইরেজার এসবও আমি ওই দোকান থেকেই কিনি।

'ঠিক সাত দিন আগে আমি কয়েকটা কাজে কলকাতায় গিয়েছিলাম। আগের পেনসিলগুলি শেষ হয়ে গিয়ে একটায় এসে ঠেকেছিল। তাই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এসে ঠিক করলাম এক ডজন পেনসিল কিনে নিয়ে যাব।

'সেদিনটা ছিল মেঘলা। দুপুর দুটো নাগাদ আমি পটুয়াটোলার সেই দোকানটায় গেলাম। আর তারপর থেকেই যতসব অদ্ভুত ব্যাপার শুরু হল—'

রুমুকা থামলেন। কপালে হাত বোলালেন—বোধহয় ঘাম মুছলেন। চোখের চশমাটা অকারণেই বারকয়েক নাড়াচাড়া করলেন।

তাতা কৌতূহলের গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী শুরু হল?'

রুমুকা কয়েকবার ঢোঁক গিলে বলতে শুরু করলেন, 'দোকানটার নাম গ্লোব স্টেশনার্স। মাঝারি মাপের একটা রঙচঙে সাইনবোর্ডে শৌখিন হরফে নাম লেখা। দোকানটার সুনাম যথেষ্টই আছে, কারণ গলির মধ্যে হলেও সেখানে সবসময় খদ্দেরের ভিড় লেগেই থাকে।

'কিন্তু সেদিন দোকানটার কাছাকাছি গিয়েই আমি খানিকটা তাজ্জব হয়ে গেলাম।

'দুপুরের মেঘলা আকাশ থেকে অদ্ভুত এক আলো চারপাশে ছড়িয়ে

পড়েছিল। সেই অপার্থিব আলোয় দেখলাম, দোকানটার সামনের পিচের রাস্তাটা একেবারে পালটে গেছে। কোথায় সেই খানাখন্দে ভরা ময়লা পিচের পথ! তার বদলে মসৃণ পরিচ্ছন্ন এক শান বাঁধানো চত্বর চোখে পড়ল আমার। চত্বরটা গলির তুলনায় মাপে অনেক বড়। আমি অবাক হয়ে এপাশ-ওপাশ দেখতে লাগলাম।

'ঠিক তখনই আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি খেয়াল করলাম।

'দোকানটা এমন এলাকায় যেখানে শব্দের ঝালাপালা সর্বদা লেগেই আছে। ট্রামের ঘড়ঘড়, বাস-গাড়ির শব্দ, রিকশা, সাইকেল ভ্যান, বইয়ের স্টল, মুটে, পথচারী—কী নেই সেখানে! কিন্তু সেদিন ওই শানবাঁধানো চত্বরে পা দেওয়ামাত্রই চারপাশের হরেকরকম শব্দ পলকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সব চুপচাপ। যেন ভুল করে কোন উপাসনা-মন্দিরে আমি পা দিয়ে ফেলেছি।

'একটু দূরে আমি দোকানটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে গ্লোব কনসার্নের সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ল না, তার বদলে রঙচটা লম্বা একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম। তার অক্ষরগুলির এমনই দুর্দশা যে ভাল করে কিছু পড়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া সবকিছু কেমন ঝাপসা লাগছিল আমার চোখে। দোকানটার দু'পাশে নকশা-কাটা দুটো থাম। তাদের গায়ে খোদাই করে কী সব যেন লেখা। তবে ডান দিকের থামে একেবারে শেষ লাইনে ১৯০৬ সংখ্যাটা লেখা ছিল এটা মনে আছে।

'আমি খানিকটা ইতস্ততভাবে পা ফেলে দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, যে-দোকানটা খাতা-পেনসিল-কাগজ এসবে একদম ঠাসা থাকে সেটা একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। আর দোকানটাকেও বেশ অন্যরকম লাগছে।

'সামনে পালিশ করা কাঠের লম্বা কাউন্টার। কাউন্টারের ওপাশে কেউ নেই। দোকানের মালিককে আমি চিনি—মানে, মুখ চিনি। বেঁটে মতো, মাথায় টাক, ধুতি-পাঞ্জাবি পরেন, পান খাওয়ার অভ্যেস আছে। তাঁকে কোথাও দেখলাম না। আর যে-তিনজন সেল্‌সম্যানকে দোকানে বরাবর দেখেছি, তাদেরও পাত্তা নেই। দোকানের ভেতরে যেসব র‍্যাক দাঁড় করানো রয়েছে সেগুলি খালি।

'দোকানের পিছন দিকের দেয়ালে একটা বড় পেন্ডুলাম ঘড়ি চোখে পড়ল আমার। একটা প্যাঁচানো তারের সঙ্গে ধাতুর পিণ্ডটা ঝুলছে। আর ঘড়িটার সব কলকব্জা একটা কাচের গ্লোবের মধ্যে বসানো। ফলে বাইরে থেকেই যন্ত্রপাতির নড়াচড়া কাজকর্ম সবকিছু দেখা যাচ্ছে। ঘড়িটা দেখেই বেশ পুরনো মনে হচ্ছিল। পরে বইপত্র পড়ে জেনেছি, ওই ঘড়ি কম করেও দেড়শো বছরের পুরনো। এগুলিকে বলা হত "ফোর হানড্রেড ডে ক্লক"। কারণ, একবার দম দিলে এই ঘড়ি চারশো দিন চলত। সে সময়ে এই ঘড়িগুলি ইউরোপ আর আমেরিকায় খুব পপুলার ছিল। এত পুরনো পেন্ডুলাম ঘড়ি এই দোকানে কোথা থেকে এল কে

জানে। তা ছাড়া দোকানেও তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! বেশ কিছুক্ষণ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেটে গেল। তারপর আমি দু'তিনবার "কেউ আছেন?" বলে হাঁক মারলাম। ওই নিস্তব্ধ পরিবেশে আমার কথাগুলি কেমন এক অদ্ভুত ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলল। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেলাম না, আর কাউকে দেখতেও পেলাম না। আমি এপাশ-ওপাশ নজর চালিয়ে দোকানদারকে খুঁজছি, হঠাৎই দেখি ঢ্যাঙা মতন একজন মানুষ কাউন্টারের ওপাশে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই মানুষটা কোথা থেকে আচমকা এসে উদয় হল তা বলতে পারব না, তবে একে আমি আগে কোনদিন দেখিনি।

'লোকটি বেশ লম্বা আর রোগা। গাল দুটো বসে গিয়ে দুটো গর্ত তৈরি হয়ে গেছে। তার কপালে অনেক ভাঁজ। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। দু'চোখে সুর্মাজাতীয় কিছু লাগানো, আর তার জন্যে চোখ দুটোকে চেরা গর্ত বলে মনে হচ্ছে। বয়েস সত্তর-টত্তর হবে। পরনে ঘিয়ে-রঙা সাটিনের ফুলহাতা জামা। তাতে বুকের বাঁ দিক ঘেঁষে বোতামের সারি নেমে গেছে। আর চওড়া পাড় শান্তিপুরী ধুতি বেশ যত্ন করে কোঁচানো।

'লোকটির গোটা মুখ আর হাত বেশ ফ্যাকাসে—যেন হোয়াইট ওয়াশ করা। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। সে বিড়বিড় করে কী যেন বলল আমাকে, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, তার জিভ আর মুখের ভেতরটা ঠোঁটের মতোই টকটকে লাল—যেন এইমাত্র এক বোতল আলতা গিলে এসেছে।

'লোকটিকে ঘিরে অদ্ভুত এক আবছা কুয়াশা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল। আর বর্ষার গুমোটের মধ্যেও আমার একটু শীত-শীত করছিল। আমি হতভম্ব চোখে মানুষটাকে দেখছিলাম।

'লোকটি যেন হাওয়ায় ভেসে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমাদের দুজনের মাঝে শুধু ওই কাঠের কাউন্টার। লোকটির ঠোঁট নড়ে উঠল আবার। বোধহয় জিজ্ঞেস করল, কী চাই। আমি ইতস্তত করে এক ডজন কোহিনুর এইচ. বি. পেনসিলের কথা বললাম। এমন সময় দু'তিনজনের কান্নার শব্দ আমার কানে এল। কয়েকজন মহিলা দোকানের আড়ালে কোথাও বসে বুক চাপড়ে মড়াকান্না কাঁদছে। সে-কান্না ভারী অদ্ভুত। কারণ কান্নার এক-একটা টান প্রায় দু'তিন মিনিট ধরে চলছে—তার মাঝে দম নেবার জন্যে কেউ একটুও থামছে না।

'কান্নার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের শব্দও হালকাভাবে কানে এল। আর সেই সঙ্গে অগুরুর মতো গন্ধও যেন টের পেলাম। বৃদ্ধ দোকানদার পেনসিল নিয়ে আসার জন্যে দোকানের পিছন দিকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তখনই দোকানের ভেতর দিকে মেঝেতে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা খাঁচা আমার

নজরে পড়ল।'

রুমুকা দম নেবার জন্য একটু থামতেই আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসের খাঁচা, রুমুকা?'

রুমুকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জানি না, তবে তার ভেতরে কিছু একটা ছিল। কারণ, সেটা নড়ছিল, খাঁচার ফাঁকফোকর দিয়ে বোধহয় মাথা বাড়াচ্ছিল। ফলে কালো কাপড়টা বারবার এদিক-ওদিক উঁচু হয়ে উঠছিল। খাঁচার ভেতর থেকে একটা ফোঁসফোঁস শব্দ আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু আগেই তো বলেছি প্রত্যেকটা শব্দ কেমন ফাঁপা—আর তার অদ্ভুত এক প্রতিধ্বনিময় রেশ কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

'একটু পরেই দোকানদার কাউণ্টারের কাছে এসে উদয় হল। তার মুখ আরও বিবর্ণ, আরও ফ্যাকাসে লাগছে। ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝা যায় কান্না-টান্নার শব্দ সে মোটেই শুনতে পাচ্ছে না। অথবা, শুনতে পেলেও আমল দিচ্ছে না।

'লক্ষ্য করলাম, তাকে ঘিরে এখনও সেই রহস্যময় কুয়াশা। আর সেই সঙ্গে একটা নতুন জিনিসও চোখে পড়ল। চার-পাঁচটা ডুমো ডুমো নীল মাছি তার মাথার কাছে ভনভন করছে, কখনও মুখে-চোখে বসে পড়ছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল, লোকটা মোটেই মাছিগুলিকে তাড়াচ্ছে না। ওগুলি মুখের ওপরে বসে আছে তো বসেই আছে।

'লোকটা এক ডজন পেনসিল নির্বিকারভাবে এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি টাকা দিতেই ঠোঁট বেঁকিয়ে সামান্য হাসল। তারপর এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল, বলল, এ-টাকা চলবে না। এমনিই নিয়ে যান।

'না, লোকটার কথা আমি শুনতে পাইনি, তবে ওর ঠোঁট নাড়া দেখেছি। আর তাই থেকেই হয়তো কথাগুলি আন্দাজ করে নিয়েছি। তা যাই হোক, পেনসিলগুলি মুঠো করে হাতে নেওয়ামাত্রই আমি একটা ধাক্কা খেলামঃ নীল রঙের পেনসিলগুলি বরফের মতো ঠাণ্ডা। তাছাড়া কোহিনুর পেনসিল নীল রঙের হয় বলে কখনও শুনিনি।

'আমি হঠাৎই ভয় পেয়ে গেলাম। দোকান ছেড়ে রওনা হয়ে গেলাম চটপট। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শানবাঁধানো চত্বরটা পেরিয়ে একটা পিচের রাস্তায় পা দিতে আমার ঘোর কেটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই রোজকার চেনাজানা শব্দের ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার দু'কানে। ভাল করে চেয়ে দেখি আমি বহুদিনকার চেনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি।'

কথার মাঝে একটু ফাঁক পেয়েই তাতা জিজ্ঞেস করল, 'পিছন দিকে তাকিয়ে দোকানটাকে দেখতে পেলে না?'

রুমুকা বিমূঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। সবকিছু আগের মতোই। কোথাও কোন শানবাঁধানো চত্বর নেই। পুরনো দোকান, লম্বা সাইনবোর্ড, নকশা-কাটা থাম—কিছুই চোখে পড়ল না আমার। যেন গোটা ব্যাপারটাই আমার মনের ভুল।'

রুমুকা শেষদিকের কথাগুলি বিড়বিড় করে বলছিলেন। কান পেতে বেশ কষ্ট করে শুনতে হচ্ছিল। আমি রুমুকার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলাম, 'ঠিকই ধরেছ তুমি। গোটা ব্যাপারটাই তোমার মনের ভুল।'

রুমুকা মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না রে, মনের ভুল নয়, এর অন্তত দুটো প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে—'

'কী প্রমাণ?' একরোখা গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'পেনসিলগুলি তোরা একবার দ্যাখ, তাহলেই খানিকটা বুঝতে পারবি।'

এই কথা বলে রুমুকা দেয়ালের তাকে রাখা দু'থাক বইয়ের ফাঁক থেকে কয়েকটা নীল রঙের পেনসিল বের করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

পেনসিলগুলি নতুন, এখনও কাটা হয়নি।

রুমুকা বললেন, 'কোম্পানির নামটা পড়ে দ্যাখ—'

আমি আর তাতা ঝুঁকে পড়ে নামটা পড়লাম। এফ. এন. গুপ্ত কোম্পানি। এই কোম্পানির পেনসিলের কথা কখনও আমরা শুনিনি।

রুমুকা বললেন, 'ব্রিটিশ আমলে, আমাদের ছোটবেলায়, এই পেনসিল চালু ছিল। এফ. এন. গুপ্তদের কারখানা ছিল নর্থ ক্যালকাটায়—সিঁথিতে। এই পেনসিল কমপক্ষে চল্লিশ বছর হল বাজার থেকে উঠে গেছে। এখন কোন দোকানে এই পেনসিল পাওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া....'

'তা ছাড়া কী?'

রুমুকা কোন উত্তর না দিয়ে কয়েকটা করে পেনসিল আমার আর তাতার হাতে দিলেন। ওগুলি ধরামাত্রেই আমরা চমকে উঠে একটা ভয়ের শব্দ করে ফেললাম, ওগুলি সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিলাম বিছানায়।

পেনসিলগুলো যেন বরফ দিয়ে তৈরি।

রুমুকা বিড়বিড় করে বললেন, 'এটাই বলতে চাইছিলাম। সেইদিন থেকেই এই পেনসিলগুলি এরকম কনকনে ঠাণ্ডা—এটাই একটা প্রমাণ যে, ব্যাপারটা আমার মনের ভুল নয়।'

বুক কাঁপানো শব্দে মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। বৃষ্টির শব্দ কয়েক গুণ বেড়ে গেল যেন। রুমুকার টেবিল-ঘড়িতে রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। আমরা বাড়ি

ফিরব কী করে কে জানে! মা-বাপি নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন। কিন্তু রুমুকার দিশেহারা মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর অন্য কোন কথা ভাবতে পারছিলাম না।

তাতা ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আর একটা প্রমাণ কোন্‌টা?'

রুমুকা নড়েচড়ে বসলেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে নামিয়ে রাখলেন বিছানায়। আঙুল দিয়ে বেশ কয়েকবার চোখ ঘষলেন, নাকের গোড়াটা ম্যাসাজ করলেন। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের সিলিং-এর দিকে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে তাতার প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'ওই মাছিগুলি। ওগুলিই দ্বিতীয় প্রমাণ যে, সেদিন আমি ভুল দেখিনি।'

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'রুমুকা, তুমি সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভেবেছ? তুমি যদি ভুল না দেখে থাকো, তাহলে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটার কী মানে হতে পারে? একটা কিছু মানে তো নিশ্চয়ই থাকবে।'

রুমুকা মাথা নাড়লেন একমত হয়ে। চশমাটা চোখে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে একটু অন্যরকমভাবে বসলেন। তারপর বললেন, 'সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে আমি বোধহয় কম করেও কয়েক হাজার বার ভেবেছিরে ঝুনঝুনি। তাতে যে-মানেটা বারবার বেরিয়ে আসতে চাইছে সেটা খুব ভাল নয়। শুনলে তোদের মন খারাপ হয়ে যাবে...'

আমি জেদী গলায় বললাম, 'হোক মন খারাপ, তোমাকে বলতেই হবে। তুমি একা একা এরকম কষ্ট পাচ্ছ, আমার একটুও ভাল লাগছে না।'

'তাহলে শোন। আমার যা মনে হয়েছে বলছি।' রুমুকা ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের মহাবিশ্বে যে-সময়ের স্রোত, তারই কোথাও একটা গরমিল হয়ে গিয়েছিল সেদিনের সেই মেঘলা দুপুরে। এ-ধরনের ব্যাপারকে অনেকে টাইম-স্লিপ বলেন। এই টাইম-স্লিপের জন্যেই হয়তো সেদিন হঠাৎ করে আমি ১৯০৬ সালে স্থাপিত হয়েছে এমন একটা দোকানঘর দেখে ফেলেছিলাম। দোকানটার সবকিছুই অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো—এমনকি ওই দোকানদার, পেনসিল, খাঁচা, মাছি সবই পুরনো আমলের। সুতরাং বলতে পারিস কোন এক ঘটনাচক্রে এখনকার সময়ের সঙ্গে পুরনো সময়ের একটা যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল—'

'তাহলে কি বলতে চাও পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ওই দোকানটার জায়গায় ওইরকম একটু ভূতুড়ে দোকান ছিল?'

'আমি প্রথমটায় তাই ভেবেছিলাম। তাই ও-পাড়ায় গিয়ে খোঁজখবরও করেছিলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি। শুধু এটা জেনেছি, এখনকার

দোকানটা আঠেরো বছরের পুরনো। তার আগে ওখানে একটা চীনে লন্ড্রি ছিল।'

'আচ্ছা, রুমুকা, মাছিগুলি ওরকমভাবে উড়ছিল কেন? এমনিতে তো মরা মানুষের মুখে ওরকম মাছি বসে—'

রুমুকা ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন, বললেন, 'সেটাই তো ভারী অদ্ভুত। আমার যা মনে হয়েছে সেটা ভাল নয়—তবু তোরা যখন জোর করছিস তখন বলি। আমার ধারণা, ওই দোকানদার ভদ্রলোক—ঠিক ইয়ে—মানে, জীবিত মানুষ ছিলেন না—হয়তো সদ্য মারা গেছেন। দোকানের ভেতর থেকে সেইজন্যেই হয়তো কান্নাকাটি আর খোল-করতালের শব্দ ভেসে আসছিল। সেই সঙ্গে অগুরুর গন্ধ, কুয়াশা আর মাছি..সব মিলিয়ে আমার মন বলছে লোকটা সাধারণ মানুষ ছিল না—অন্য কিছু ছিল। তার ঠোঁট আর মুখের ভেতরটা টকটকে লাল ছিল কেন আমি বলতে পারব না। আর কালো কাপড়ে ঢাকা ঐ খাঁচায় কী ছিল তাও আমি আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু যতই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি ততই আমার ভয় করতে থাকে।

'সময়ের বিশাল একটা ফারাক ডিঙিয়ে আমার কিছুক্ষণের জন্যে যোগাযোগ হয়েছিল পুরনো সময়ের সঙ্গে। সেখান থেকে, কেমন করে জানি না, পেনসিলগুলি আর মাছিগুলি চলে এসেছে আমার কাছে। এই দুটো প্রমাণ সবসময় আমাকে ওই মেঘলা দুপুরটার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া তোরা তো জানিস, ক'মাস ধরে আমি একটা দোকান খোলার কথা ভাবছি। দোকান খোলার পর আমি থাকব কাউন্টারের ওপাশে, দোকানের ভেতরে। তখন টাইম-স্লিপের দুর্ঘটনায় কোন আগামী দিনের খদ্দের হয়তো এসে দাঁড়াবে আমার দোকানে—এক ডজন পেনসিল চাইবে। তখন...' হঠাৎই থেমে গিয়ে মাথার চুলের গোছা চেপে ধরলেন রুমুকা, অদ্ভুত গলায় বললেন, 'জানিস, যখন আমি এইসব কথা ভাবি তখন যেন পাগল-পাগল লাগে। মনে হয়, মনে হয়...'

আমি ঝুঁকে পড়ে রুমুকার হাত চেপে ধরলাম। টের পেলাম, ওঁর হাত ঘামছে। আমি বললাম, 'তুমি এসব আজগুবি চিন্তা ভুলে যাও। তোমার কোন ভয় নেই, তোমার কিচ্ছু হবে না।'

রুমুকা অবসন্ন গলায় বললেন, 'ভুলতে হয়তো পারতাম। কিন্তু পারছি না শুধু ওই মাছিগুলির জন্যে। ওরা সুযোগ পেলেই আমার কাছে চলে আসে।

ক্যামেরা

নীলাঞ্জন নন্দী

১০ই মে' ৯৫

নিয়মিত ডায়রি লেখার অভ্যেস আমার নেই। তবে কখনো কোন ঘটনা তেমন ভাবে নাড়া দিলে তার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখি। এ অভ্যেস বহুদিনের। ১৯৯০-এ যখন বাবা মারা গেলেন, তখন ডায়রি লিখেছিলাম। ভীষণ একা লাগত তখন। আমার দিদি সরমার ১৯৮৭-তে বিয়ে হয়ে যায় দিল্লীতে। কালেভদ্রে কলকাতায় আসে। ঠাকুর্দার তৈরি এই বিশাল বাড়িটায় এখন আমি আর কাজের লোক রাধারমণ। মাত্র দুটি প্রাণী। মাঝে মাঝে বাড়িটার হাঁ করা ক্ষুধার্ত মুখটা যেন আমায় গিলতে আসে। যতটা সম্ভব নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখি। মডেলিং অ্যাসাইনমেন্টের ছবিগুলি বাড়িতে বসেই ঝাড়াই-বাছাই করি। এতে দিব্যি সময় কেটে যায়।

কিন্তু হঠাৎই গত শুক্রবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনার অপ্রত্যাশিতায় এতটাই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম যে এ ক'দিন ডায়রি লিখতেও বসতে পারিনি। সেদিন সকাল থেকেই আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। কখনও মুষলধারে আবার কখনও বা ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে চলেছিল। দশটা নাগাদ স্নান সেরে, খাটের তলা থেকে ডাকব্যাকের জলনিরোধক জুতো জোড়া বের করে পায়ে পরলাম। ক্যামেরার ব্যাগটা গোছাতে গিয়েই মাথার ব্যথাটা টের পেলাম। সারা কপালটা জুড়ে একটা চিনচিনে ব্যথা। তার সঙ্গে শুরু হল চোখের জ্বালা। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—জ্বর আসছে। থার্মোমিটারটা ভাল করে ধুয়ে জিভের তলায় মিনিট খানেক রাখতেই দেখলাম ১০২° উঠেছে। অফিস যাওয়ার চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে, জামা-প্যান্ট ছেড়ে, পাজামাটা পরে নিলাম। তারপরে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাধারমণকে বলে দিলাম, আমায় বিরক্ত কোর না। আজ দুপুরে কিছু খাব না। শুধু একটু বিশ্রাম চাই এখন।

বেশি জ্বর হলে লক্ষ্য করেছি, নাক-মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোতে থাকে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। যখন ঘুমটা ভাঙল, তখন বেড-সাইড টেবিলের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম দুটো পাঁচ। এর মধ্যেই বৃষ্টিটা ধরে এসেছিল। জানালা দিয়ে বাইরে

তাকাতে চোখে পড়ল কৃষ্ণচূড়া গাছটা। তার ডাল থেকে বৃষ্টির জল পাতা বেয়ে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছিল। আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

নীচে রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে যদিও জল জমেনি। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা গাড়ি, ভেজা পিচে ছড়-ড়-ড় শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে। দু'একটা রিকশার চাকা এই ঝিমধরা দুপুরের শান্তিকে, তার ঢকর-ঢকর আওয়াজে নষ্ট করছে।

ঠিক এমন সময় আমার বাবার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল ডায়রিটার কথাও।

বাবার ডায়রি লেখার অভ্যেস ছিল। উনি নিয়মিত লিখতেন। শুনেছি ঠাকুর্দাও নাকি ডায়রি মেনটেন করতেন। আমার দিদিকেও ডায়রি লিখতে দেখেছি সেই ছেলেবেলা থেকে। অন্তত বিয়ের আগে পর্যন্ত দেখেছি। এখন আর সে অভ্যেস আছে কি না, জানি না।

গত মাসে দোতলার স্টোররুমটা পরিষ্কার করাচ্ছিলাম। তখনই বাবার চারটে ডায়রি হাতে আসে। ১৯৬৩-১৯৬৬। চার বছরের এক এক দিনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আমার জন্ম ১৯৬৩-তেই। যখন আমি মায়ের পেটে, তখন থেকে শুরু করে আমার জন্মের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটা দিনের লিপিবদ্ধ করা প্রতিটি লেখা পড়েছি। বাবার স্বপ্ন, আশা আর আশঙ্কার স্পষ্ট ছবি, মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। '৬৩, '৬৪ আর '৬৫ সালের ডায়রি পড়া হয়ে গেছিল। '৬৬-র ১৭ই মার্চ পর্যন্ত এগিয়েছিলাম। হঠাৎই জানি না কেন বাবার কথা মনে পড়তেই, '৬৬-র ডায়রিটা তখনই পড়তে ইচ্ছা হল।

জ্বর দেখেই ক্রোসিন ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেছিলাম। তাই এখন শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। চোখে জ্বালাও নেই। শুধু মাথাটা একটু ধরে আছে। দুই রগে সামান্য ব্যথা রয়েছে।

দেরাজ থেকে স্টোররুমের চ্যাপ্টা পেতলের চাবিটা বের করে দোতলায় নেমে এলাম। দরজাটা খুলতেই সেই চাপা গন্ধটা নাকে এসে লাগল বহুদিনের ধুলো আর বন্ধ পরিবেশের গন্ধ। আলোটা জ্বালালাম। একসঙ্গে দুটো একশো ওয়াটের বাল্ব জ্বলে উঠল, সবুজ শেডে। ঘরটা আসলে বাবার 'স্টাডি' ছিল। ঠাকুর্দার মতো ব্যবসায় মাথা ছিল না ওনার, তবে ডাক্তারি করে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিলেন। ঠাকুর্দা অবশ্য এতে কোন আপত্তি করেননি। বাবাকে বিলেতে পাঠিয়ে এফ. আর. সি. এস করিয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে বাবার পসারও জমে ওঠে ভালই। প্রথমে আর. জি. কর., তারপরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস।

ঘরের তিনটে দেয়াল জুড়ে কাঁচের পাল্লা দেওয়া আলমারি। বইয়ে ঠাসা। মেঝেতে ছড়ানো-ছিটোনো নানান রঙের ও আকারের বাক্স, সুটকেস আর গাদা গুচ্ছের মেডিক্যাল জার্নাল। ঘরে দুটো জানালা। রঙিন সার্সি বসানো তাতে। সেটা বছরভর বন্ধই থাকে। আমি চাই না এই বন্ধ ঘরটায় কোন পাখি এসে বাসা বাঁধুক। জানালার পাশেই বড় টেবিলটার ওপরে '৬৬-র ডায়রিটা রেখেছিলাম। সার্সিগুলি খুলে দিয়ে চেয়ারটা টেনে বসলাম। বাইরে মৃদু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ কানে এলো। খোলা জানালা দিয়ে মেঘলা দিনের আলো এসে ঘরে পড়ছে। ঠাণ্ডা একটা হাওয়াও যেন আসছিল। ডায়রিটা খুলে পড়তে শুরু করলাম ১৮ই মার্চ থেকে। বাবা লিখছেন...

১৮ই মার্চ '৬৬

আজ হঠাৎ বীরেন সকালে টেলিফোন করেছিল। বলল কাল নাকি পার্ক স্ট্রিটের 'ওয়াল্টার্সে' নীলামে যাবে। আমি তো প্রত্যেক রবিবারই যাই। বীরেন জিজ্ঞেস করছিল ও সরাসরি যাবে, নাকি আমি ওকে তুলে নিয়ে যাব? আমি বললাম, ওকে যাওয়ার পথে তুলেই নিয়ে যাব। কাল ভুবনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওঁর ছেলের অপারেশনটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করিয়ে ফেলব। সেন্ট আর্থার্স চ্যারিটি ফান্ড থেকে বোধহয় অপারেশনের জন্য অর্ধেক টাকা যোগাড় করতে পারব! ভুবনবাবুর ছেলের ছবি চাই। ওদের দপ্তরে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ভুবনবাবুর মতো একটা নীলামের দোকানের কেরানীর পক্ষে দশ হাজার টাকা যোগাড় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ঠিকই। এরকম মানুষদের সাহায্যের জন্যেই সেন্ট আর্থার্সের মতো সংস্থা রয়েছে। আমার মন বলছে ওরা টাকাটা দেবে।

১৯-এ মার্চ '৬৬

একটু আগে নীলাম থেকে ফিরলাম। বীরেন একটা উনিশ শতকের ফরাসী কলম কিনেছে, ষাট টাকায়। তেমন সস্তা নয়। তবুও ও খুশিই হয়েছেন। প্রথমদিকে নীলামে এসে পটাপট দর চড়িয়ে ভেবেছে, 'আমি কী যেন একটা করলাম! আরও বারকয়েক ওখানে গেলে বোধকরি ও আরও বিবেচনা করে দর হাঁকবে। ফেরার পথে বীরেনকে নামিয়ে দিয়ে এলাম।

বাড়িতে এসে স্টাডিতে ঢুকে হাতের মোড়কটা খুললাম। আজ একটা ক্যামেরা কিনেছি বেশ পুরনো জার্মান ক্যামেরা। ১২০ ফরম্যাটের—'ফিশার'। এই কোম্পানি শুনেছিলাম কয়েক বছর ব্যবসা করেই উঠে যায়। তবে ক্যামেরার

সুনাম আছে। আজ নীলামের টেবিলে এটাকে দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। একশো পঁচিশে কিনে ফেললাম। মনে তো হয় সস্তাই পড়েছে। ছবি তোলার নেশা আমার বহুদিনের। একটা 'জাইসাইকন' আছে। তবুও আরও ক্যামেরা কেনার ইচ্ছে। এই ক্যামেরাটা বেশ ভারী। সম্পূর্ণ কালো রঙের। লম্বায় প্রায় ইঞ্চি সাতেক, চওড়ায় ইঞ্চি চারেক। লম্বাটে চেহারা। অনেকটা 'ইয়াশিকা-৩০'-এর মতন। আগামীকালই একটা ফিল্ম কিনে ভরতে হবে। অজিতের বছর তিনেক বয়স হল। ওর ছবি দিয়েই এটার ওপেনিং করব।

২০-এ মার্চ '৬৬

আজ হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে হঠাৎই রাস্তায় ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উনি ছেলের সঙ্গে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে হাঁটছিলেন। আমি ড্রাইভারকে ওঁদের পাশে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বললাম। আমায় দেখে একগাল হেসে উনি বললেন, আপনার বাড়ির ওদিকেই যাচ্ছিলাম। অন্নদা স্টুডিওতে। কাল যে বললেন ছেলের ছবি তোলাতে হবে! দেখি ভুবনবাবুর ছেলে পলাশ মুখ টিপে হাসছে। যেন ছবি তোলার কথায় খুব মজা পেয়েছে। আমি গাড়ির দরজা খুলে ওঁদের ভেতরে ডাকলাম। বললাম, স্টুডিওতে ছবি তুলে কোন লাভ নেই। মিছিমিছি পয়সা খরচ হবে। তার চেয়ে বরং আমিই তুলে দিচ্ছি ছবি। বাড়িতে চলুন। গাড়িতে বসেই কথাবার্তা বলতে বলতে জানতে পারলাম ভুবনবাবুরা শ্যামপুকুরে থাকেন।

বাড়িতে এসে গতকাল নীলামে কেনা ক্যামেরাটা বের করলাম। আর জাইসাইকনও। দুপুরে ওয়ার্ড-বয় নবীনকে দিয়ে একটা 'ইলফোর্ড' ফিল্ম কিনে আনিয়েছিলাম। সেটাই ভরে ফেললাম ফিশারটায়। জাইসাইকন ফিল্ম আছে।

ভুবনবাবু আর ওনার ছেলে পলাশকে নিয়ে ছাদে উঠে এলাম। এখনও অনেক আলো বাকি আছে। চৈত্র মাসের শেষ বিকেলের রোদ ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব চরাচরে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। পলাশকে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে পর পর দুটো ছবি তুললাম। একটা নতুন ফিশারে, আর একটা জাইসাইকনে। বলা যায় না, নতুন ক্যামেরায় ছবি কেমন উঠবে! তাই, টু বি অন দি সেফ সাইড, জাইসাইকনেও একটা তুলে রাখলাম। ছবি তোলার পর ওঁরা বাড়ি চলে গেলেন।

২১শে মার্চ '৬৬

কোত্থেকে কী যে হয়ে যায়, বলা যায় না! হঠাৎই আজ সকালে ভুবনবাবু ছুটে এলেন আমার কাছে। কারণ জানতে চাওয়াতে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

জানতে পারলাম আজ ভোরে হঠাৎই ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে অসাবধানতায় পা পিছলে পড়ে পলাশ গুরুতররূপে আহত হয়েছে। মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আর. জি. করের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করেই আমার কাছে এসেছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না!

দুপুর পর্যন্ত চেষ্টা করেও পলাশকে বাঁচানো গেল না। মাথাটা ফেটেছিল ঠিকই। তবে স্টিচ আর ইঞ্জেকশনগুলি পড়ার পর কন্ডিশানটা স্টেবল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু না! ঠিক দুটো দশে পলাশ মারা গেল। আমার আর কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না। আজ এই পর্যন্তই।

২২শে মার্চ '৬৬

কাল পলাশ মারা যাওয়ার সময়ে ওর মৃত্যুর কোন সঠিক এক্সপ্লেনেশন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবে এখন বোধহয় পারছি। আমি ডাক্তার হলে কি হবে? সর্বজ্ঞ নই। বিশ্বের সমস্ত কিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই হয়তো আমি মনে মনে ঈশ্বর, শয়তান, মিরাকেল, কালা-জাদু বা ভূতেও বিশ্বাস করি। জানি না কেন আমার মনে হয়—পৃথিবীতে, অগোচরে অনেক কিছুই লুকিয়ে আছে, যা আমাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে।

গতকাল বেলা তিনটেয় ডেথ সার্টিফিকেট লিখে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসি। আসলে আমিও তো সন্তানের বাবা! মা-মরা ছেলের বাবা। ভুবনবাবুর মুখটা দেখার মতো কলজের জোর আমার ছিল না। কী করে আর এক পিতার নির্মম দুঃখটাকে...!

বাড়িতে ফিরে স্টাডিতে ঢুকে নতুন কেনা ক্যামেরাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। আর ভাবছিলাম পলাশের কথা। ওর শেষ ছবিটা এই ক্যামেরাতেই বন্দী রয়েছে। মাত্র বারোটা বসন্ত কাটাল ছেলেটা—এত তাড়াতাড়ি চলে যাবার কি খুব দরকার ছিল?

স্ক্যালপেল (অপারেশনের ছুরি) হাতে নিলেই যেমন কাটা-ছেঁড়া করতে মন চায়, ঠিক তেমনই হাতে একটা ক্যামেরা থাকলে আপনা হতেই ডান হাতের তর্জনীটা ছটফট করে। অজিতের ডায়রিয়া হয়েছে, বেচারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ওর ছবি তোলাটা মুলতুবি রইল।

বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি ঠিক এমন সময় জানালার ফ্রেমে একটা পায়রা এসে বসল। দুধসাদা গায়ের রঙ, তবে ডানায় একটা ধূসর দাগ। এরা দল বেঁধে এই বাড়িরই তিনতলায় কোথাও একটা থাকে। এদের বকম-বকম ডাকও শুনেছি। হাতের কাছে এমন এক লিভিং সাবজেক্ট পেয়ে, পট করে একটা ছবি

তুলে নিলাম নতুন ক্যামেরাটায়। কে জানে কেমন উঠবে? পায়রাটা কিছুক্ষণ পর ডানা ঝটপটিয়ে উঠে গেল। হয়তো পাশের বাড়ির কার্নিশে।

আজ সকালে এক মেজর অপারেশন ছিল। মোটামুটি ভালই হয়েছে। বিকালে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই নীচে আমার নীল রঙের মরিসের পাশে সাদা মতো কি একটা পড়ে থাকতে দেখলাম। পেছনের চাকার ডান দিকে।

নীচে নেমে দেখি একটা পায়রা—ডানাগুলি ছড়ানো, মরে কাঠ। সারা শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। দুধসাদা পায়রাটার ডানায় একটা ধূসর দাগ। চেনা লাগল। গতকালই মনে হয় এর ছবি...

হঠাৎই পিঠ বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। মনে মনে ভাবলাম, ওই ফিশার ক্যামেরাটা দিয়ে পলাশের ছবি তুললাম—ও মারা গেল! ওই ক্যামেরায় পায়রাটার ছবি তুললাম, সেও মারা গেল! তবে কি...! ভাগ্যে অজিতের ছবি তোলা হয়নি! না জানি কী হত—ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম জানালাম।

ক্যামেরাটার ইতিহাস কী? কোত্থেকে এসেছে ওটা? এই প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে। পুরোপুরি সিওর না হলেও, আমার মনে হয় ক্যামেরাটা ভূতুড়ে!...

ওটাকে কিছুক্ষণ আগে বি. ও. এ. সি'র সবুজ এয়ারব্যাগটায় খবরের কাগজ মুড়ে তুলে রেখেছি। ওটাকে আর কোনদিন ব্যবহার করব না। কোনদিনও না।

২৩শে মার্চ '৬৬

গতকাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। বিছানায় শুধু এপাশ-ওপাশ করেছি। ছোট্ট অজিত পাশে অকাতরে ঘুমিয়েছে। সকালে হসপিটালে বেরোবার আগে ও জিজ্ঞেস করেছিল ক্যামেরাটার কথা—ও ওই ক্যামেরায় ছবি তুলতে চায়! ওইটুকু বাচ্চা ছেলে, ওকে আসল কথা বলি কী করে? তাই বলেছি ক্যামেরাটা খারাপ হয়ে গেছে। অজিত বরাবরই শান্ত। এ নিয়ে আর আমায় বিরক্ত করেনি।

হসপিটাল থেকে আজ একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়েছিলাম। ড্রাইভার রামরতনকে গাড়িটা একটু জোরে চালাতে বললাম। গন্তব্য ওয়ান্টার্সের নীলামের দোকান। ফিশারের ইতিহাস না জানা অবধি শান্তি পাচ্ছি না। ওই ক্যামেরার পেছনে কী কাহিনী থাকতে পারে?

আর. জি. কর. থেকে পার্ক স্ট্রিট। বেশ অনেকটা পথ। যখন ওয়ান্টার্সের দোকানে ঢুকছি আলো প্রায় মরে এসেছে। রাস্তার উল্টো দিকে ফ্লুরিসের কেক-পেস্ট্রির দোকান। দোকানের রঙিন সাইন-বোর্ডে ছোট ছোট আলো নেচে নেচে যাচ্ছে।

দোকানে ঢুকে ভুবনবাবুকে দেখতে পেলাম না। উনি ক'দিনের ছুটি নিয়েছেন। কে জানে? একমাত্র ছেলের মৃত্যুশোক কি এত তাড়াতাড়ি ভোলা যায়? ঠিক কতদিন লাগে কারও অস্তিত্বকে মন থেকে মুছে ফেলতে? কেউ কি বলতে পারে?

দোকানের মালিক রাজন মেহেরোত্রা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। আমি ওনার পুরোনো খদ্দের। আমার শুকনো মুখ দেখে উনি কারণটা জানতে চাইলেন। সবিস্তারে সব বললাম ওনাকে। ততক্ষণে টেবিলে এলাচ দেওয়া চা এসে গেছে। ভুরভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে। রাজনবাবু চিন্তিত মুখে কাপটা তুলে নিয়ে একটা লম্বা চুমুক দিলেন। তারপরে বললেন—এরকম ব্যাপার...আপনার কোন ভুল হয়নি তো? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে না বলাতে, উনি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলে একটা পুরানো কালো খাতা বের করে সামনে রাখা ছোট প্যাডে খসখস করে কী যেন লিখলেন। কাগজটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। বললেন—ক্যামেরাটা ওনারই ছিল। কাগজটায় লেখা ঃ পিটার লরেন্স , ১৩২নং পেমেন্টাল স্ট্রিট।

রাস্তাটা চেনাই ছিল। আমার এক বুড়ো গোয়ানিজ পেশেন্ট থাকতেন সান্ডেল স্ট্রিটে, পেমেন্টাল স্ট্রিটের পাশেই। এলাকাটা নোংরা, অন্ধকার আর গোলকধাঁধার মতো। রাজ্যের সরু গলি এসে মিশেছে একটা আরেকটার সঙ্গে। জায়গাটা রিপন স্ট্রিটের দক্ষিণে, যত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বাস।

রাজনবাবু বললেন, পিটার সাহেবের বয়স প্রায় আশি। একমাত্র মেয়ে জোসেফিনা গত বছর মারা যাবার পর বাড়ি থেকে তেমন একটা আর বেরোন না। দিন পনেরো আগে হঠাৎই একদিন বিকেলে এসে ওই ক্যামেরাটা উনি ভুবনবাবুকে দিয়ে যান। একটা ছোট কাগজে আমার উদ্দেশ্যে কয়েকটা লাইন লিখে গেছিলেন। এত আঁকাবাঁকা হাতের লেখা, যে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল পড়তে। তাতে লেখা ছিল ক্যামেরাটা বেচে দিন। যা দাম পাব তাতেই আমি খুশি।

চিঠিটা পড়ে ভেবেছিলাম ওনার বোধহয় অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তাই যত তাড়াতাড়ি পেরেছিলাম, ক্যামেরাটাকে বেচে ওনাকে সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু আপনি যে ঘটনা শোনালেন—আমার তো মাথা ঘুরে যাচ্ছে। সত্যিই যদি ক্যামেরাটার পেছনে কোন কাহিনী থাকে, সেটা পিটার সাহেব জানতে পারেন।

রাজনবাবুর সঙ্গে আর কথা বাড়াইনি। চলে গেলাম পিটার লরেন্সের কাছে। ভাঙা-চোরা একটা প্রায় পোড়ো বাড়ির দোতলায় উনি থাকেন। অপরিষ্কার কামরা। অপর্যাপ্ত আলো আর অসহ্য একটা নাম-না-জানা জান্তব গন্ধ পরিবেশটাকে ভারী করে রেখেছিল। সারা ফ্ল্যাটটায় কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম

না। বোধহয় উনি একাই থাকেন। বৃদ্ধ পিটার লরেন্স একটা তুলো-ওঠা, রঙ-চটা সোফায় বসে আমায় লক্ষ্য করছিলেন। আমার কাছে ঘটনাগুলি শুনে বললেন— আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। আমি আপনার জীবনে বিপদ ডেকে এনেছি। স্বার্থপরের মতো কাজ করেছি নিজেকে বিপদমুক্ত করতে। উনি বললেন, ক্যামেরাটা আমার দাদার ছিল। ডেরেক লরেন্সের। সে খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না। চার্চে যেত না, বাইবেল ছুঁত না। যখন ওর প্রায় ২৫ বছর বয়েস, ও হঠাৎ চুপিচুপি একটা স্যাটানিক গ্রুপের মেম্বার হল। গ্রুপটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা করত। পরিবারের সকলে ওকে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউই সফল হয়নি। দাদার ভীষণ প্রিয় ছিল এই ক্যামেরা। বীভৎস সব বলির ছবি ও তুলেছিল ওই ক্যামেরাটা দিয়েই। শুনেছি ওখানে মানুষ, পশু-পাখি সব বলি দেওয়া হতো।

স্যাটানিক গ্রুপে যোগ দেবার পর, ও আরও অন্যরকম হয়ে গেল। চুপচাপ, শান্ত। মনে হয় বড় বেশি শান্ত। ঝড় ওঠার আগের মুহূর্তে যেমন সব শান্ত থাকে।

একদিন ওই শয়তানের ঘাঁটিতে পুলিশ হানা দিল। গ্রেপ্তার হল ডেরেক। কেউ পুলিশকে খবরটা দিয়েছিল।

বুড়োর কথা নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে গিলছি আমি।

বুড়ো বলে চলেছে—ওকে ছাড়ান গেলো না। শত চেষ্টাতেও না। অবশেষে ওর কেস কোর্টে গেল। বিচারে ওর ফাঁসির হুকুম হল। গলায় পরানোর ঠিক আগে দাদা বলেছিল—আমার শরীরের মৃত্যু হতে চলেছে ঠিকই, কিন্তু আমার আত্মা থাকবে। কোন না কোন বস্তুর মধ্যে আমি ফিরে আসব। আবার খুন করবো। প্রাণনাশের আনন্দের কোন বিকল্প নেই।

এতটা বলে পিটার সাহেব থামলেন। ওনার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছিল। পাশের র‍্যাক থেকে জলের জগটা পেড়ে, এক নিশ্বাসে অনেকটা জল খেয়ে ফেললেন। নোংরা, মলিন শার্টের হাতায় ঠোঁট দুটো মুছে বললেন—আপনি ওসবে বিশ্বাস করেন কি না জানি না, তবে টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ, আই থিংক দ্যাট ক্যামেরা ইজ পোসেস্‌ড। ডেরেকের প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মা ওই ক্যামেরায় রয়েছে। আমি ওটা দিয়ে কোনদিন ছবি তুলিনি। বাড়িতে এমনিই পড়ে ছিল। গতবছরে হঠাৎই একদিন আমার মেয়ে জোসেফিনা ওর এক বন্ধুকে দিয়ে নিজের একটা ছবি তোলায় ওই ক্যামেরায়। আর তারপরেই ও মারা যায়। তাই...

সেদিন রাতে পিটার লরেন্সের বাড়ি থেকে ফিরে আর স্টাডিতে ঢুকিনি। সবুজ বি. ও. এ. সি'র ব্যাগটার দিকে তাকাবার ইচ্ছে ছিল না। তবে ক্যামেরাটা আমি বেচব না। অন্য কারও জীবনে কালো ছায়া নেমে আসুক এটা আমি চাই না।

আমার লেখা এই ডায়রি সরমা বা অজিত বড় হয়ে পড়বে আশা করি। তখন ওরাও ক্যামেরাটার সম্বন্ধে জানতে পারবে। সব পড়ার পর আমার মনে হয় ওরা ক্যামেরাটাকে নিছক কৌতূহলে ব্যবহার করবে না জোসেফিনার মতন।

১০ই মে '৯৫ (শেষাংশ)

এই পর্যন্ত পড়ে আমি থামলাম। মাথার দু'পাশটা আবার দপ দপ করছিল। ক্রোসিনের প্রভাব কি তবে কমে এলো? কপালে হাত দিয়ে দেখলাম, ঘাম। আমি অবাক হয়ে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। মনে মনে অনেক কথা ভাবছিলাম—বাবা কেন ক্যামেরাটাকে নষ্ট করে ফেললেন না? বাবা কি ভয় পেয়েছিলেন? এতগুলি ভাবনা-চিন্তা-প্রশ্ন মনে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই পেছনে ফিরে মেঝের দিকে তাকালাম। মনে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের লড়াই চলেছে পুরোদমে। ডাঁই করে রাখা জিনিসপত্রের ভিড়ে, সবুজ বি. ও. এ সি'র এয়ারব্যাগটা চোখে পড়ল। তালা লাগানো ছিল না। খুলতেই বেশ কিছু ওষুধের বিজ্ঞাপনের বোর্ডের নীচে একটা লম্বাটে প্যাকেট দেখতে পেলাম। পুরোনো ছেঁড়া খবরের কাগজে মোড়া। প্যাকেটটা খুললাম। ক্যামেরাটাকে দেখে তো মনে হয় এখনও দিব্যি চলে। হঠাৎই মাথায় একটা প্রশ্ন এলো, বাবার মনের ভুল নয়তো? সবটাই নিছক কল্পনাও তো হতে পারে...!

কিন্তু বাবা তো বেশ কম কথার মানুষ ছিলেন। মনগড়া ঘটনার কোন মূল্য ওনার কাছে ছিল না। তবে কি...!

মাথায় একটা বুদ্ধি বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল। একটা পরীক্ষা করতে হবে। ক্যামেরাটাকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে এলাম। ফিল্ম ডায়ালে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তিন লেখা রয়েছে। অর্থাৎ '৬৬-তে তোলা সেই পায়রা আর ভুবনবাবুর ছেলে পলাশের ছবি রয়ে গেছে এর অভ্যন্তরে। ফিল্মটা বোধহয় অকেজো হয়ে গেছে। সেই দুটো ফটো তোলার পর আর ব্যবহারই হয় নি এ ক্যামেরাটা।

ক্যামেরাটাকে খাটের উপরে রেখে নিকনের ব্যাগটা থেকে স্টিলজ্-এর স্ট্যান্ডটা বের করলাম। ক্যামেরাটাকে তার উপরে বসিয়ে সেল্ফ-টাইমারের বোতামটায় দম দিয়ে দিলাম। আর তারপরে শাটারটা টিপলাম। এভাবে, আপনা আপনিই ছবি ওঠে। ফটোগ্রাফারের দরকার পড়ে না!

হঠাৎ কানে এলো কির-র-র-র-কির র-র-র শব্দ। শাটারটা পড়তে আর বড়জোর সেকেন্ড ছয়েক বাকি! যেন র‍্যাটল স্নেকের গা-হিম করা ঝুমঝুমির শব্দ।

লেন্সটা সোজা, নিজের নিরেট কালো শরীরের দিকেই তাক করা! ক্যামেরাটা যেন নিজেই নিজের ছবি তুলবে। আসলে, ক্যামেরাটাকে আমি বসিয়েছি আয়নার সামনে। পুরোনো দিনের আলমারির এক পাল্লায় বেলজিয়াম মিরর। ক্যামেরার প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখা যাচ্ছে। আমি ঘরের এক কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। মন বলছে আজ যদি এই হতচ্ছাড়া শয়তানের যন্ত্রটার মনে প্রতিহিংসা জাগে, জাগে মরণের নেশা, তো ব্যাটা নিজেকেই মারুক!

খুট! চিড়-বিড়-ড়-ড়-ড়-ড়! দুম! তিনটে শব্দ পরপর হল। অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

খুট! শাটারটা পড়ল।

চিড়-বিড়-ড়-ড়! আয়নায় আড়াআড়ি ভাবে একটা চির ধরল! ফেটে গেল!

দুম! শব্দটা এলো ক্যামেরার ভেতর থেকে। জানি, হয়তো কান পাতলে মরে ভূত হয়ে যাওয়া ডেরেকের চাপা আর্তনাদও শুনতে পেতাম। ঠিক তারপর—

ক্যামেরার লেন্সটায় একটা ফাটল ধরল। এক্সপোজার, ফোকাস রিং খসে পড়ল মাটিতে। পেছনের ডালাটা খুলে গিয়ে ফিল্মটা বেরিয়ে পড়ল—পেট থেকে বেরিয়ে পড়া নাড়িভুঁড়ির মতন। মৃত্যু হল ওটার! যেন ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটার কয়েকদিন পর একটা ফ্যাশন অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। নিকনের ব্যাগটা খুলতেই আঁতকে উঠলাম। আমার সাধের পনেরো হাজার টাকা দামের স্টিলজ্-এর স্ট্যান্ডটা বেঁকেচুরে গেছে। স্ক্রুগুলিতেও মরচে পড়েছে। ঝকঝকে ক্রোমিয়াম স্টিলের এই মজবুত স্ট্যান্ডটা কীভাবে যে...

আসলে ভুলটা তো আমারই! ভূতুড়ে ক্যামেরাটাকে এই স্ট্যান্ডের ওপরে তুলেই মরণ শাটারটা টিপেছিলাম। ক্যামেরাটা তো নষ্ট হলই—আমার স্ট্যান্ডটাও অকেজো আর বাতিল হয়ে গেল। চিরকালের জন্য। কারণ, শাটারটা পড়ার সময়, আয়নায় স্ট্যান্ডটারও প্রতিবিম্ব পড়েছিল!!

মুখে বরফের কুচি গুঁড়িয়ে গেল

সুচিত্রা মিত্র

ভূত আছে কি না আছে—এমন কথা বলতে চাই না। কারণ ভূত বললেই মনে হয় গল্পকথা। কিন্তু Spirit বলে কিছু একটা আছে এটা আমি বিশ্বাস করি। আর এ নিয়ে তো গবেষণা চলে আসছে—চলছে। কিন্তু সে কথা থাক। আমার জীবনে কয়েকবার যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল তারই একটা বলি। বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা? সে আপনাদের মর্জি। বহুবছর আগে ১৯৪৫-৪৬ সাল হবে। আমি বি. এ. পড়ি স্কটিশ চার্চ কলেজে। গান গাই, ছাত্র রাজনীতি করি, টিউশানি করি, আড্ডা মারি—এমনই বয়স তখন। সময়টা ছিল শীতকাল। কলেজের শেষে পার্টির cell meeting ছিল গোয়াবাগানে এক ছাত্রনেতার বাড়িতে। সেখান থেকে যখন পথে নামলাম তখন বিকেল সাড়ে ছটা হবে। কিন্তু শীতের বিকেল তো—তাই অন্ধকার নামে তাড়াতাড়িই। গোয়াবাগানের কাছেই সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট। সেখানে আমার এক সহপাঠিনীকে economics-এর একটা বই, কিছু নোট্স দিয়ে বাড়ি ফিরব—এমনই বলা ছিল বাড়িতে। এখনকার কথা বলতে পারি না, কিন্তু তখন সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ছিল খুবই সরু আর নোংরা। যাইহোক বন্ধুর বাড়িতে কাজ এবং আড্ডা সেরে যখন রাস্তায় বেরুলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। বাড়ি ফিরলে কপালে বকুনি আছে নির্ঘাত—ফলে জোর কদমে হাঁটা শুরু করলাম। ওই সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ধরে এঁকে বেঁকে কিছুটা হাঁটলেই কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, তারপর 2B বাস ধরে ভবানীপুরের বাড়িতে। তখনও কলকাতা শহরে কিছু কিছু রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলত। সন্ধ্যের একটু আগেই কাঁধে মই নিয়ে লোক এসে গ্যাস জ্বালাত আবার ভোরবেলা ওইভাবে এসেই নিভিয়ে যেত। এ রাস্তায়ও গ্যাসের আলো। একে শীতের রাত্তির তায় গ্যাসের আলো পথটা খুব আলোকিত নয়। একটা গ্যাসপোস্ট থেকে আর একটার দূরত্বের মধ্যে শীতের রাতের ধোঁয়াশা এবং ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল। একটু হয়তো অন্যমনস্কই ছিলাম। হঠাৎ মনে হল পেছনে কে জানি আসছে। তখন চুরি, ছিনতাই এসবের হাঙ্গামা ছিল না। তাই সে ভয় আমার হয়ইনি। কিন্তু 'পেছনে কে আসছে' এই বোধ হতেই গা ছম্‌ছমিয়ে উঠল। আমি ভীতু এ বদনাম আমার নেই। ছোট থেকেই আমি ডাকাবুকো। কিন্তু সে রাত্তিরে কী যে হল—ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দেখব যে তাও পারলাম না। মনে হল ঘাড়টা যেন স্ক্রু দিয়ে

হাঁটা। হাঁটার বেগটা বাড়ালাম। একটা গ্যাসপোস্ট পেরিয়ে জমাট অন্ধকারের কবলে...আর ঠিক সেইসময়েই পেছনে (কি বলব তাকে আজও জানি না) প্রাণীটি হনহনিয়ে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল। ওরেঃ বাস! কি ঢ্যাঙা! আপাদমস্তক সাদা কোন কাপড়ে জড়ানো—বোধকরি শীতের জন্যে। আর পাশ দিয়ে যখন গেল তখন যেন মুঠো মুঠো বরফের কুচি আমার ওপর ছড়িয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

চোখদুটো রইল সামনের গ্যাসপোস্টের দিকে—প্রাণীটিকে ওই আলোয় আর একবার দেখবার ইচ্ছেয়। কিন্তু ওমা! গ্যাসের আলোয় যাবার আগেই প্রাণীটি কোথায় উবে গেল। 'উবে গেল' বলছি এই কারণেই যে তাকে আর আলোর তলায় দেখলাম না। যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝালাম হয়তো কোন বাড়িতে ঢুকে গেছে নয়তো বা আশেপাশের কোন গলিতে। জোরে হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু কোথায় কি? আমার বাঁপাশে একটা খাটাল আর ডানপাশে একটা বাড়ির উঁচু টানা দেয়াল। এছাড়া কোন বাড়ির দরজা বা সরু গলি নেই। তারপর? তারপর বুকের ধকধকানি মাথায় বয়ে কেমন করে যে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম—তা মনে নেই। বলতে পারেন চোখের ভুল। হতে পারে। কে জানে? যেমন ধরুন না কেন— এই যে সারাদিন কাজের পর রাত বারোটায় টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে যখন লেখাটা লিখছি মনে হচ্ছে কে যেন ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়ে, কি লিখছি, পড়ছে। ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসও আমার গালে লাগছে... কেমন যেন একটা uncanny feeling, একে কি বলবেন আপনারা? এমন অভিজ্ঞতা আমার আরও অনেক...কিন্তু থাক। সেগুলি পরে কোন সময় না হয় বলা যাবে।

শয়তানের শেষ অভিযান

বরুণ দত্ত

প্রথমে ট্রেন, তারপরে বাস এবং অবশেষে নৌকোয় খেয়া পার হয়ে সুদেব যখন মামার বাড়ির গ্রামে পৌঁছুল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সুদেবের বয়স যদিও কৈশোরের সীমা পেরোয়নি, তবু তার মনে নানা যুক্তি-তর্ক-জিজ্ঞাসা। সব কিছু জানার ও বোঝার জন্য দারুণ কৌতূহল। এজন্য মামাবাড়িতে সুদেবের সমাদরও যথেষ্ট।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে বসল গল্পের আসর। তার অনেক আগেই চারদিক নিঃঝুম হয়ে পড়েছিল। কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব সেই গ্রাম্য রাতের অন্ধকারে।

দিদা, মামীমা, মামা—সকলের কাছে একই রকম বর্ণনা শুনে সুদেব ভাবতে থাকল ঘটনাটা কি হতে পারে! ভূত বলে তো আর সত্যি সত্যি কিছু নেই, তাছাড়া 'নিশি', 'অতৃপ্ত আত্মা' এসব প্রচলিত কথাগুলিও যুক্তি-তর্কে টেঁকে না। কিন্তু যা ঘটে চলেছে, তাকেও অস্বীকার করা যাচ্ছে না সম্পূর্ণভাবে। বিশেষ করে বিভিন্ন রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে করতে মেজমামা থেকে বড়মামার বড় ছেলে দীপনদাদা পর্যন্ত সকলের চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল ভয় এবং অসহায়তা।

সুদেব ছাদের চিলেকোঠায় একা শুতে চাইলে ওঁদের সবার চোখ কপালে উঠল। একযোগে সবাই বললেন, 'না। তা হবে না। দস্যি ছেলে, তুমি কালই ফিরে যাও কলকাতায়। নাহলে কি হতে কি ঘটিয়ে বসবে!'

সুদেব অবাধ্য হতে পারল না বড়দের কথার। শুতে হল দীপনদাদার সঙ্গে একই বিছানায়, দোতলার ঘরে। কথা বলতে বলতে দীপনদাদা একসময়ে হারিয়ে গেল ঘুমের দেশে। সুদেবের কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। পুরনো আমলের বিশাল দেয়াল ঘড়িতে একটা শব্দ হল ঢং করে। সুদেব ঘড়ি দেখল টর্চ জ্বেলে—সাড়ে বারোটা। পাশ ফিরে শুল, ঘুম আসছে এবার। সারাদিন ধকলটা কম যায়নি শরীরের উপর দিয়ে।

সবেমাত্র দু চোখের পাতা এক করেছিল সুদেব, ঠিক তখনই শুনতে পেল সেই শব্দ—শক্ত মাটিতে খড়ম পায়ে কেউ যেন হেঁটে চলেছে। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছিল সেই শব্দ।

গ্রামের আরাধ্য দেবতা বাবা পঞ্চাননের মন্দিরের দিক থেকে শব্দটা উঠে ক্রমশ স্পষ্ট ও কাছাকাছি হতে হতে একসময় আবার পুবদিকে শেষ সীমা খেয়াঘাটের দিকে চলে গেল। ক্রমে মিলিয়েও গেল। এর পরে অন্তত এক ঘন্টা জেগে থেকেও আর কোন শব্দ পেল না সুদেব। নানা চিন্তা ভিড় করে আসছিল ওর মাথায়।

পরদিন বেশ দেরিই হল ঘুম ভাঙতে। দিদা জানতে চাইলেন, 'শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো ভাই?''

সুদেব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, দিদা। এমনিই একটু দেরি করে উঠলাম। কলকাতায় স্কুলের জন্যতো রোজই তাড়াতাড়ি উঠতে হয়। এখানে এসে তাই একটু আরাম করে নিচ্ছি।'

'তা হ্যাঁরে, কাল রাতে তোরা দুটিতে তো অনেকক্ষণ গল্প করছিলি, কোন শব্দ-টব্দ শুনিসনি?

'না তো দিদা!' চটপট উত্তর দিল সুদেব। উদ্দেশ্য দিদাকে সত্যি কথা বলবে না। কিন্তু যেভাবেই হোক আজ রাতে ওকে ছাদে থাকতেই হবে। বৃথা সময় নষ্ট করা চলে না। ঐ একটা অজানা শব্দ গ্রামের সকলকে ভয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে।

দিদা ওর মনের কথা টের পান না। তাই বললেন, 'কিন্তু ভাই, আমরা তো শুনেছি!'

'ও বোধহয় হাওয়ায় বাঁশবনে গাছে গাছে ঘষটানির শব্দ।' ব্যাপারটা চাপা দিতে চায় সুদেব। কিন্তু দিদার মুখের দিকে চেয়ে বুঝল যে দিদা ওর উত্তরে খুশিও হননি, বিশ্বাসও করেননি।

সেদিনই দিদার অলক্ষ্যে ছাদের দরজার চাবিটি হস্তগত করল সুদেব এবং মনে মনে তৈরী হয়ে থাকল সেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। দীপনদাদা ঘুমিয়ে পড়তেই খুব সাবধানে মশারি সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে ছাদে উঠে এল। তালা খোলার সময় একটু ভয় ভয় করছিল, পাছে শব্দ হয়! না, দারুণ সাক্সেসফুল হয়েছে সুদেব প্রথম চেষ্টাতেই। নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজাটা।

ছাদের উপরে পা ফেলতে থাকল আরও সাবধানে। আকাশে একফালি চাঁদ, হালকা বেশ মিষ্টি বাতাস মধ্যরাতের পরিবেশকে মায়াময় করে তুলেছে। ছাদের কোনদিকই তেমনভাবে পরিষ্কার নয়—জামরুল, সবেদা, আম, বেল, কাঁঠাল গাছের জটলা সব দিকেই। তবু তার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে তুলল সুদেব পঞ্চাননতলার দিকে।

অধীর প্রতীক্ষা। কলকাতার মতো মশার উপদ্রব নেই, তাই রক্ষে, নাহলে

এতক্ষণে তার প্রানই ভেস্তে যেত।

কালকের মতো ঠিক একটা ঘন্টা বাজল দোতলার ঘড়িতে, এটা রাত একটার শব্দ। সচকিত হল, উৎকর্ণ হলো সুদেব। টের পেল ভেতরে ভেতরে সে নিজেই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, গাছগাছালির আঁকাবাঁকা ছায়ায় দেখল একজন দীর্ঘদেহ মানুষ পঞ্চাননতলার পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রথমে যেন একটু থমকে দাঁড়াল। শব্দটাও তখন নেই। থমকে থেমে কিছু বুঝি যাচাই করে দেখছিল সেই ছায়ামূর্তি। তারপর হেঁটে চলল খেয়াঘাটের পথের দিকে। অমনি আওয়াজ উঠল খট্...খট্...খট...।

সুদেব নিজের চোখকে সইয়ে নেবার আগে পর্যন্ত ভেবেছিল ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় গাছগাছালির ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠছে, তা থেকেই একটি মনুষ্যদেহের আকার নিচ্ছে। এই আলো-আঁধারিতে কত মানুষ তো ভয় পেয়েছে, ভূত দেখেছে! সে যাই হোক, সুদেব নিজের চোখ-কানের উপর নির্ভর করে ছাদের রেইনপাইপ বেয়ে তরতর করে নামল বেশ ঝুঁকি নিয়ে। তারপর যতদূর সম্ভব দ্রুতপায়ে খুব সাবধানে এগোতে লাগল শব্দের পিছু পিছু। শব্দটা কিন্তু মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে হচ্ছে। শব্দ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু শব্দের উৎস কি তা ধরতে পারছে না, আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হল, সব পথটাতো ইঁটবাধানো নয়, তবে কি করে অমন কঠিন শব্দ উঠছে!

হঠাৎ চমকে উঠল সুদেব। যাকে আবিষ্কার করে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল ও, সে গেল কোথায়? খেয়াঘাটে নৌকোটা তো বাঁধাই রয়েছে, জলও নিস্তরঙ্গ! তবে কি সুদেব যে তাকে এভাবে অনুসরণ করছে তা বুঝতে পেরে কোন ঝোপঝাড়ে ঢুকে পড়ে ওকেই লক্ষ্য করছে!

গ্রামের মানুষরা, বিশেষ করে প্রাচীনরা, বড় বেশি দৈবনির্ভর, ভয়ই তাঁদের ভক্তির কারণ। আর তাই বিভিন্ন সময়ে এঁরা ঠকেনও কিছু লোভী মানুষের ছল চাতুরির কাছে।

আশাহত হয়ে সুদেব শেষ পর্যন্ত ফিরে এল বিছানায়—একই পথে, একই পদ্ধতিতে। তখন তার শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে। তবু সে বিশ্বাসে দৃঢ় হল—এ রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হবেই।

পরদিন আর একটু হলেই সুদেব ধরা পড়ে যাচ্ছিল দিদার কাছে। কোনরকমে পালিয়ে বাঁচল। না হলে দিদার জেরার মুখে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়তো সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ত। কারণ মিথ্যে কথায় অভ্যস্ত নয় সুদেব। প্রয়োজনে তাই

নীরব থাকে তেমন হলে।

এই দেড়দিন সুদেব গ্রামের কারুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেনি, সে যে গ্রামে এসেছে তাই-ই বুঝতে দেয়নি। কিন্তু আজ সারাদিন যেন ব্যস্ত নেতার মতোই জনসংযোগ করল সাহসী কজন সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ঘুরল বনজঙ্গল, মন্দির, খেয়াঘাট, খেলার মাঠ, নদীর পাড়ের শ্মশান পর্যন্ত। সবাই দেখল স্যান্যালদের ডানপিটে ভাগ্নে সুদেব গ্রাম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার বন্ধুদের সঙ্গে। এই বলছে ফিস্ট করবে, এই বলছে এবার গাজনে যাত্রা করবে, তার রিহার্সালের জায়গা কে দেবে বলো?

ছেলেটা বড় ভাল। তাই তার এসব হুজুগে কেউ কখনও বিরক্ত হয় না—বরং খুশিই হয়। শুধু কি তাই! এ বাড়িতে ডেকে চা-ওমলেট খাওয়ায় তো আর এক বাড়িতে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ। আর তাতে কোন আপত্তি বা সংকোচ নেই সুদেবের। শুধু দিদার অনুমতিটুকু ছাড়া আর কোন বাধা নেই তার।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হয়েছে, হয়েছে কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রাও। সুতরাং বিকেল বিকেল খুশমেজাজে সুদেব আবার বেরিয়ে পড়ল গ্রাম পরিক্রমায়। খুঁজে খুঁজে দেখল খড়মের দাগ কোথাও কোথাও আঁকা আছে মাটির বুকে।

পুরোহিত নাকি সবাইকে সাবধান করে বলেছেন, 'শব্দ শুনে কেউ বাইরে যাবে না। কিছু অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য দেখলেও চিৎকার করবে না। তাতে সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারাতে হতে পারে।'

পুরোহিত ঠাকুরের দীর্ঘ ঋজু চেহারা, চোখ দুটি বিশাল, নাক-মুখ কাটা কাটা, কেউ তাঁর মুখের দিকে সোজা তাকাতেই পারে না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কেউ তর্কে যেমন যাচ্ছে না, অবিশ্বাসও করছে না। তাই একটা ভয় এবং অজানা প্রশ্নে মানুষের মন রাতের দ্বিতীয় প্রহরের পর থেকেই ভারী হয়ে ওঠে।

ক্রমে মানুষের মন জিজ্ঞাসায় ভরে উঠতে থাকে। বাতাসে ছড়াতে থাকে কত না সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী। এই সময়েই সুদেব এসে জমিয়ে বসেছে তার মামাবাড়িতে। তার বাউণ্ডুলে স্বভাব আর দস্যিপনা নিয়ে দিদার তাই সারাক্ষণ চিন্তা।

সেদিন রাতে পূর্বব্যবস্থামতো চারিদিকে সতর্ক ও সাহসী প্রহরা চলছে খুবই সন্তর্পণে। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, তবু শোনা যাচ্ছে না সেই বিশেষ শব্দ। চাঁদের আলোচ্ছায়ায় এগিয়ে যাচ্ছে না কোন সাদা কাপড় পরিহিত দীর্ঘ দেহ।

প্রায় এক ঘন্টা পরে শোনা গেল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বিশেষ শব্দ। কিন্তু দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না কোন ছায়ামূর্তি বা কিছুই।

পলকহীন সুদেবের দৃষ্টি, কান তার সজাগ, বুকে উৎকণ্ঠার ধুকপুক শব্দ। অধৈর্য হয়ে খুবই সাবধানে পা টিপে টিপে এগোতে থাকল সে। এতদিনের পরিকল্পনা, হিসেব-নিকেষ, আশা কি মিথ্যে হবে! তাহলে যে ভবিষ্যতে আর ওকে বিশ্বাস করবেন না শিবসুন্দর।

ভয় কিছুটা ছিল, যদি ছুরি মেরে দেয় বা চালিয়ে দেয় পিস্তল! কিন্তু উত্তেজনায় এসব কিছুই নিরস্ত করতে পারল না সুদেবকে। সামান্য শব্দেই সচকিত হয়ে দেখল কালো একটা ছায়া প্রায় পৌঁছে গেছে খেয়াঘাটে।

সুদেব দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যান্ত্রিকগতিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছায়ামূর্তির উপরে। জাপটে ধরল আলখাল্লায় ঢাকা গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলির এতদিনের আতঙ্কের জীবটিকে এবং ঠোঁটে চেপে ধরা বাঁশিও বাজিয়ে দিল প্রাণপণ শক্তিতে।

সুদেবকে কাহিল করে প্রায় উঠে পড়েছিল রাতের অজানা অতিথিটি, কিন্তু ততক্ষণে চারিদিক থেকে জ্বলে উঠেছে ছ'সাতটা টর্চের জোরালো আলো। শুধু তাই নয়, সুদেবের পূর্বনির্দেশ মতো দুজন মূর্তির চোখের উপরে ধরে রাখল টর্চের তীব্র আলো। ফলে অজানা সেই অতিথির সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

প্রকাশ পেল সব কথা। গ্রামের পুরোহিতকে সকলে সন্দেহ করলেও তিনি প্রকৃত দোষী নন, প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র।

ক্রমে জানা গেল সেই আসল দোষী একজন পুরাতত্ত্ববিদ্, শিক্ষিত, জানে দেশি-বিদেশী অনেকগুলি ভাষা। কিন্তু পুরাতত্ত্ব সম্পদের চোরাই ব্যবসা তার বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার নেশা ও পেশা হচ্ছে গ্রামে-গ্রামান্তরে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহরে, তীর্থে, ভগ্ন পরিত্যক্ত মন্দিরে ঘুরে বেড়ানো এবং সময় বুঝে সেখানকার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি আত্মস্মাৎ করা। সহজ পথে না হলে বাঁকা পথে নিতেও সে পিছপা হত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসে ডুবতে বাধ্য হল এই গোষ্পদে! কোনভাবেই কল্পনা করতে পারেনি যে এই সুদূর গ্রামে সে মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে, তাও কাজ সম্পূর্ণ করার আগে।

হিসেবমতো দেখা যাচ্ছে সুদেবের মামাবাড়ির গ্রামের এই মন্দিরটির বয়স কমবেশি একশো ষাট বছর। পর পর তিন বছর গাজনের মেলায় দর্শক হয়ে এসে ঐ বহিরাগত সব হিসেবই সংগ্রহ করে নিয়েছিল আগে। তারপর গ্রামের মানুষকে

খুতের ভয় দেখিয়ে কাবু করে তবেই হাত দিয়েছিল 'অপারেশনে'। কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হল না।

শহর থেকে এতদূরে, এমন শান্ত গ্রাম্য পরিবেশেও যে কোন পুরাতাত্ত্বিক চোরের দৃষ্টি পড়তে পারে তা শুনে গ্রামের শিক্ষিত মানুষরাও প্রায় বোবা হয়ে রইলেন, বিস্ময়ের ঘোরে। কিন্তু শত জেরার মুখেও সে নিজের নাম 'শয়তান' ছাড়া আর কিছুই বলল না।

'শয়তান'-কে নিয়ে শিবসুন্দর তাঁর দলবলকে রওনা করে দিয়েছেন শহরের পথে। তারপর সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বিবৃত করলে উপরের কাহিনী। পরে বললেন, 'এই সফলতা সম্ভব হয়েছে একটি কিশোরের অদম্য কৌতূহল ও অবিশ্বাস্য সাহসিকতায়। এই কেসটি নিয়ে ঐ কিশোর তিনটি কেসে সম্পূর্ণ সফল হল। কিশোরটি কে, আশা করি তা আপনারা সকলেই অনুমান করতে পারছেন। এখনও সে ছাত্র। ছাত্র হিসেবেও সে দারুণ মেধাবী। ভবিষ্যতে সে আমাদের এই পেশায় আসতে আগ্রহী। পরিণত বয়সে সে যে একজন সফল ও বিখ্যাত গোয়েন্দা হবে, এ বিষয়ে আমরা একশো ভাগই নিশ্চিত।

'এই দেখুন শয়তানের হালকা সহজ যন্ত্রটি—যা দিয়ে এতদিন সে আপনাদের আতঙ্কিত করে রেখেছিল।' বলে শিবসুন্দর ছোট্ট দুটি যন্ত্র দেখালেন। সবাই সে ক্ষুদ্র যন্ত্র দেখে এবং তা থেকে সৃষ্ট শব্দ শুনে বিস্ময়ে হতবাক।

স্বনামধন্য গোয়েন্দা শিবসুন্দর এবার সেই সব কিশোর-যুবকদের সঙ্গে সহাস্য করমর্দন করলেন যারা সুদেবের এই সফলতার সঙ্গী হয়েছিল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সব শেষে হাত বাড়িয়ে দিলেন সুদেবের দিকে। চোখে-মুখে তখন তাঁর প্রশংসা ও প্রশ্রয়ের হাসি। তারপর বিদায় নেবার আগে বলে গেলেন, এই মন্দিরের সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা তিনি করবেন, এবং অনতিবিলম্বেই।

এক বিশাল জনতা খেয়াঘাট পর্যন্ত এসে শিবসুন্দরকে আন্তরিক ও সশ্রদ্ধভাবে বিদায় জানাল। সুদেব ও শিবসুন্দরের চোখে চোখে কথা হল। সুদেব সকলের কান বাঁচিয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে বলল, 'কলকাতায় ফিরেই আমি আপনার কাছে যাব পরবর্তী নির্দেশের জন্য।'

মানুষ এক ছায়া দুই

চিরঞ্জীব সেন

সেই কবে, এখন থেকেই আড়াই হাজার বছর আগে অর্থাৎ যীশু খৃষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে খ্যাতনামা গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর 'হিস্টরিক' নামে গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমে কারাকোরাম মালভূমি অঞ্চলে একরকম 'পিপীলিকা' তাদের বাসা তৈরী করবার সময়ে মাটি খোঁড়বার সময়ে প্রচুর বালি বার করে, আর সেই বালির সঙ্গে মিশে থাকে প্রচুর সোনা। ঐ সব অঞ্চলের জঙ্গি উপজাতিরা মাটি খুঁড়ে সোনার বালি সংগ্রহ করে।

কিন্তু হেরোডোটাস একটু ভুল করেছিলেন। তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন কোন পারসিক পুঁথি থেকে। তিনি লিখেছিলেন এই পিপীলিকা "শেয়ালের চেয়ে বড় কিন্তু কুকুরের চেয়ে ছোট"। পিপীলিকা কখনই এত বড় হয় না। আসলে ওগুলি কাঠবেড়ালীর মতো এক প্রকার প্রাণী।

অধুনা ডঃ মাইকেল পাইসেল নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী হিমালয়ের ঐ অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে ঐ প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন ও তারা যে সোনার বালি আহরণ করে তাও তিনি দেখেছেন। অতএব হেরোডোটাসের ঐ তথ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হেরোডোটাসের কাহিনী পড়ে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এবং সুলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট স্বর্ণ আহরণকারী পিপীলিকার সন্ধানে অভিযান চালিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ডঃ মাইকেল পাইসেলের এই আবিষ্কারের খবর পেয়ে একজন ভারতীয় দুঃসাহসিক অভিযাত্রী স্থির করেছেন তিনি ভারত সীমান্তে লাহুল ও স্পিতির দুর্গম অঞ্চলে অভিযানে যাবেন। ঐ অঞ্চলে নাকি স্বর্ণ আহরণকারী ঐ প্রাণী দেখা যায়। ঐ অভিযাত্রী যার নাম নটরাজন। তিনি ভারত সরকারের অনুমতি লাভ করেছেন।

যে কাহিনী লিখতে যাচ্ছি সেই কাহিনীর সঙ্গে এই অভিযান জড়িত তাই হেরোডোটাস ও ডঃ মাইকেল পাইসেলের নাম উল্লেখ করতে হল।

আমি একজন লেখক। কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছি। বই লিখে আমার ভালই আয় হয়। পৈত্রিক সম্পত্তি ও কিছু গচ্ছিত অর্থ আছে। বাবা ও মা

কবেই গত হয়েছেন। আমি বিয়ে করার আগে পর্যন্ত আমার বোন ললিতা সংসার দেখাশোনা করত।

ললিতাকে সুন্দরী বলা যায়। শান্ত, কম কথা বলে, নিয়মনিষ্ঠ। কিন্তু বেচারী একটা গোপন ব্যথা লুকিয়ে রাখে। তাকে দেখলে আমার ও আমার স্ত্রীর কষ্ট হয়।

আমার বিয়ের পর ললিতা অনেকটা সহজ হয়েছিল। বৌদির সঙ্গে তার খুব ভাব। আমার ছেলেদুটিও ললিতাকে আণ্টি বলতে অজ্ঞান। ললিতার ঐ গোপন ব্যথাটুকু ছাড়া আমাদের ছোট পরিবার সুখী পরিবার।

বিজন আমার স্ত্রীর পিসতুতো ভাই। আমার বিয়ের সময়ে বিজনের সঙ্গে ললিতার পরিচয় হয়।

বিজন ছেলেটা ভাল। স্বাস্থ্যবান, বিজ্ঞানে স্নাতক, হালে দার্জিলিং এ মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে পর্বতারোহণে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে। তার আগে ও পরে হিমালয়ে ট্রেকিং করেছে।

বিজন একটা চাকরি করে তবে সে চাকরিতে সে সন্তুষ্ট নয়। সে এমন একটা চাকরি চায় যাতে তাকে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতে হবে। কোন অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হতেও তার আপত্তি নেই।

একদিন রঞ্জন তাকে ঠাট্টা করে বলে, বিজু তুমি অ্যাডভেঞ্চার চাও তো আমি রেলইয়ার্ডে সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ওয়াগন ব্রেকারদের সঙ্গে অনেক অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ পাবে। গুলি ছুট্‌বে দনাদন্‌ দনাদন্‌, বলে বিজনের মুখের সামনে দুই হাত বাড়িয়ে বন্দুক চালাবার ভঙ্গি করে।

তবে রঞ্জন একটা কাজ করল। রঞ্জন চিত্রশিল্পী, ছবি আঁকে। সব রকম ছবি সে আঁকতে পারে। প্রদর্শনীতে তার ছবি বিক্রিও হয়। অনেক ক্যালেণ্ডারে তার আঁকা ছবি দেখা যায়। সে বিজনের একখানা পোর্টেট এঁকে ফেলল। শুধু দুই রঙে, কালো আর নীল। কোমরে দুটো হাত রেখে বিজন সোজা দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি। ভালই চেনা যাচ্ছে। ছবিখানা সে ললিতাকে উপহার দিল।

ললিতা ছবিখানা পেয়ে ভারী খুশি। সেখানা সে বাঁধিয়ে ডাইনিং স্পেসের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখল।

দুই ভাই ললিতাকে লতি বলে ডাকে। বোনটি তাদের বড় আদরের আর বিজনও তাদের ভাইয়ের মতো। বিজন ভাল চাকরী পেলে বিয়ে হবে।

ললিতা ভারী সুন্দর গান গায়, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানগুলি তার খুব প্রিয়। রজনীকান্তের ও রামপ্রসাদী গান সে নিখুঁত সুরে গাইতে পারে। ঘরখানি সে সুরে ভরিয়ে দেয়।

এই ভাবে চলছিল। আমরা ভালই আছি। আমরা অল্পে সন্তুষ্ট, অভাব অভিযোগ নেই।

এমন সময়ে একদিন সকালে বিজন একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ হাতে হাজির, বেশ উত্তেজিত।

জিজ্ঞাসা করি, কি খবর বিজন? কোন গরম খবর? রেডিওতে তো সেরকম কিছু শুনলুম না।

না, দাদা, কোন গরম খবর নয়, তবে আমি একটা চাকরি পাচ্ছি এই সঙ্গে আমার জিগরি দোস্ত রমেশও একটা চাকরি পেতে পারে। এই যে বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখুন।

বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন জনৈক ডঃ নটরাজন। হিমালয়ে দুর্গম লাদাখ, লাহুল ও

স্পিতি অঞ্চলে অভিযান চালাবার জন্যে বটানি ও জুওলজিতে একজন সায়েন্স গ্রাজুয়েট চাই। পর্বতারোহণে ও ট্রেকিং-এ অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকা চাই। এ ছাড়া একজন ডাক্তার চাই। হিমালয়ের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় থাকলে অগ্রাধিকার। কলকাতার এক হোটেলে ডঃ নটরাজনের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।

বিজনের জন্যে চা এসে গিয়েছিল। সে কাপে চুমুক দিচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি দেখা করবে নাকি?

নিশ্চয়, এ চাকরি আমার হবেই সঞ্জয়দা, ওরা লোক পাবে কোথায়? সব কোয়ালিফিকেশন আমার আছে। আর আমার বন্ধু রমেশ তো ডাক্তার। মিলিটারিতে ডাক্তারের চাকরি করেছে। আমরা দুজনেই আজই হোটেলে ডঃ নটরাজনের সঙ্গে দেখা করব।

সঞ্জয় আর রঞ্জন দুই ভাই ভেবেছিল তাদের বোন ললিতা বোধহয় বাধা দেবে কিন্তু সে বিজনকে উৎসাহ দিল।

বিজন হেসে বলল, ডঃ নটরাজন আমার কথা ভেবেই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আজ বিকেলেই সুখবর পাবে। আমার প্রিয় খাবার গরম ফুলকো লুচি আর হিং দেওয়া আলুরদম খাওয়াতে হবে। আমি এখন যাই।

বিকেলে হাসিমুখে ফিরে এল বিজন, সঙ্গে তার বন্ধু রমেশকেও এনেছে। ঘরে ঢুকেই বলল, ময়দা মাখা হয়েছে? সুখবর গুড নিউজ। আমরা দুজনেই মনোনীত হয়েছি, আপাতত যেতে হবে দেরাদুন, সেখান থেকে যাত্রা শুরু হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম কিসের অভিযান এবং কোথায় হবে?

বিজন সংক্ষেপে বলল লাদাখের লাহুল এবং স্পিতি অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় কাঠবেড়ালীর মতো একরকম প্রাণী আছে।

তারা পাহাড়ের গায়ে গর্ত খুড়ে বাসা তৈরী করে। গর্ত খুঁড়ে তারা যখন ওপরে মাটি তোলে তখন বালিও ওঠে আর সেই বালিতে থাকে স্বর্ণচূর্ণ, সোনার বালি।

রঞ্জন পাশের ঘরেই ছিল। বেরিয়ে এসে বলল, সব শুনতে পেয়েছি। তোমার তো একটা ক্যামেরা আছে না। আমার জন্যে পাহাড়ের কিছু ছবি তুলে আনবে যা দেখে আমি ছবি আঁকতে পারব।

বিজন যখন উৎসাহভরে সকলের সঙ্গে কথা বলছিল আমি তার বন্ধু রমেশকে লক্ষ্য করছিলুম। দেখলুম সে শুধু ললিতাকেই দেখছে, ললিতা ছাড়া তার কোনদিকেই মন নেই। এটা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু কিছু বলতেও তো পারি না। রমেশ ললিতার দিকে এই বিশেষ মনোযোগ না দিলেও যুবকটিকে আমার

পছন্দ হচ্ছিল না।

এরপর কয়েকটা দিন কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন বিজন এসেছিল। তার কাছ থেকে জানা গেল ওরা ডঃ নটরাজনের কাছ থেকে চিঠি ও টাকা পেয়েছে। সঙ্গে কি কি জিনিস নিতে হবে তার একটা তালিকাও পেয়েছে আর বিশেষভাবে বলা হয়েছে লাইফ ইন্সিরিওরেন্স করা না থাকলে তা যেন যাত্রার আগে করে নেওয়া হয়। প্রিমিয়াম জমা দেবার টাকা অভিযাত্রী দল থেকে পাওয়া যাবে। নিয়মিত কোন বেতন হবে না, অভিযান শেষ হলে একটা থোক টাকা দেওয়া হবে। বিজন বলল, টাকা কে চায় আমি কি টাকার জন্যে যাচ্ছি নাকি?

যাত্রার একটা তারিখ ঠিক করে দেওয়া হয়েছে তবে আলমোরা থেকে নয়। ওদের যেতে বলা হয়েছে দিল্লি। দিল্লি থেকে ওরা প্লেনে চড়ে যাবে লাদাখ, যেখানে আছে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ বিমানক্ষেত্র। এটা সামরিক দিক বিচার করে করা হয়েছে। লাদাখে সাতদিন থাকতে হবে, সেখানে কিছু প্রশিক্ষণ নিতে হবে তারপর লাহুল ও স্পিতির দিকে যাত্রা। তারপর সেখান থেকে মূল অভিযান শুরু হবে, যেতে হবে দুর্গম অঞ্চলে।

সেদিন মার্চ মাসের চার তারিখ। মার্চ মাসেরই সাত তারিখে ওরা কলকাতা থেকে যাত্রা করবে। ডঃ নটরাজন দিল্লি চলে গেছেন।

মার্চ মাসের ছয় তারিখে বিকেল হবার আগেই রমেশকে নিয়ে বিজন এল। তখন চায়ের সময় হয়েছে। আমাদের ছোট বাড়ির সংলগ্ন ছোট একটা বাগান ছিল। সবুজ ঘাসের ছোট লন ঘিরে মরশুমি ফুলের বেড়া। এই সময়ে নানারকম রঙিন ফুল ফুটেছে, ফ্লক্স, সলভিয়া, সুইট পি, ডায়াস্থাস ইত্যাদি। রঞ্জন বলল, দাদা বাগানের লনে সবাই মিলে চা খাওয়া যাক। সে নিজেই বেতের চেয়ার ও মোড়া এবং একটা ছোট টেবিল বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। রমেশও সাহায্য করতে এগিয়ে এল। টেবিল ঘিরে ছ'টা চেয়ার ও মোড়া সাজান হল।

যথাসময়ে দিপালী ও ললিতা দু'জনে মিলে টি-পট ইত্যাদি সাজিয়ে দিল। কিছু খাবারও তৈরী করেছিল, তাও এনে সাজাল। রমেশ যেন দিপালীকে নয়, লতুকে সাহায্য করতে অতি মাত্রায় ব্যস্ত। এটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। লতুর মুখেও বিরক্তি ফুটে উঠছিল।

চা পর্ব শেষ হবার পর বিজনদের আসন্ন অভিযান নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

সময় কেটে যায়। নানারকম কথা হয়। ললিতার ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা হয়।

হারু এসে বলে টেবিলে খাবার সাজানো হয়েছে। ডাইনিং স্পেসে ঢুকে দেখি রঞ্জন আর রমেশ এসে গেছে। দিপালী একটা চেয়ারে বসে কিছু টুকি টাকি কাজ করছিল।

রমেশ একটা চেয়ারে বসে। তার বিপরীতে ছিল রঞ্জনের আঁকা বিজনের সেই ছবি। ছবিখানায় আলো পড়ে চকচক করছিল। রমেশ উঠে ললিতার পাশের চেয়ারে বসে বলল, ছবিতে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে।

তা নয়, আমি রমেশের মতলব ধরতে পেরেছি, সে ললিতার পাশে বসতে চায়। খেতে খেতে আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলুম কিন্তু রমেশ প্রায় ললিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে কি বলে যাচ্ছে। ফলে বেচারী ললিতা খেতেই পারছে না তাছাড়া সে রীতিমতো বিরক্ত। রমেশের বকবকানি সে কিছুক্ষণ সহ্য করল তারপর সে হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, বড়দা আমার মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। আমি শুতে যাচ্ছি। বৌদি তোমরা কিছু মনে কোরো না। পরে আমি খাব এখন।

ললিতার উঠে যাওয়াটা আমাদের ভাল লাগল না। ঘরের আবহাওয়া যেন গুমোট হয়ে গেল।

আবহাওয়া হালকা করবার জন্যে রঞ্জন উঠে তার স্টিরিওতে একটা চটুল গান বাজিয়ে দিল। আমার মনে হল রমেশ এমন কিছু বলেছে যা লতু সহ্য করতে পারেনি। রমেশ জানে না লতু মোটেই হালকা মেয়ে নয়। পরে জানা যাবে কি বলেছে কিন্তু রমেশ বিজনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাকে আমরা কিছু বলতে পারি না। আমাদের সকলের মন খারাপ হয়ে গেল।

যাই হোক খাওয়া শেষ হল। এবার ওরা যাবে। আমিই বিজনকে বললুম, লতুর সঙ্গে দেখা করে যাও। দোতলায় লতুর একটা নিজস্ব ছোট ঘর আছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিজন ফিরে এল। তার মুখ থমথম করছে। রমেশের দিকে একবার চাইল। কিছু বলতে যেয়েও কিছু বলল না।

আমাকে ও রঞ্জনকে বলল, দাদা, ছোড়দা, কবে ফিরব বলতে পারছি না তবে আমার জন্যে শুভকামনা করো যেন সফল হয়ে ফিরতে পারি।

রমেশ বলল, হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল থেকে আমরা ফিরব কিনা বলতে পারি না। আমার তিন কুলে কেউ নেই, লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাগুলি কে পাবে! তবুও একজনের নাম লিখে তাকেই নমিনি করেছি, বলে হো হো করে হেসে উঠল।

আমরা কিছু না বলে ওদের খানিকটা এগিয়ে দিলুম। বিজন, সুযোগ পেলে খবর দেবার চেষ্টা করো।

বিজন একবার পিছন ফিরে ওপরের দিকে চাইল। জানালায় ছলছল মুখে ললিতা দাঁড়িয়ে ছিল।

দিল্লি পৌঁছবার পর বিজন আবার আমার স্ত্রী দিপালীকে একখানা চিঠি দিয়েছিল। তারা পরদিনই লাদাখ অভিমুখে যাত্রা করবে। লাদাখে পৌঁছেও বিজন

আমাদের প্রত্যেকের নামে চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল মার্চ মাস হলেও ওদের তুষার ঝড়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। এর প্রায় দশদিন পরে আমরা আরও একখানা চিঠি পেয়েছিলুম এবং সেইটেই তার শেষ চিঠি।

এরপর তিন চার মাস কেটে গেল। বিজন বা অপারেশন গোল্ড-ডিগারের কোন খবর নেই। তবে তিন মাস পরে একটা ছোট খবর পাওয়া গেল। যারা এই অভিযানের আয়োজন করেছিল দিল্লিতে তাদের একটা অফিস ছিল। ঠিকানা ও ফোন নম্বর বিজন আমাদের জানিয়েছিল। রঞ্জন দিল্লিতে তাদের অফিসে ফোন করল। তারা বলল, তারাও বিশেষ কিছু জানে না। গত সপ্তাহে তারা একটা খবর পেয়েছে যে সকলে নিরাপদে আছে। কাঠবেড়ালী জাতীয় সেই প্রাণীটির সন্ধান পাওয়া গেছে, বেশ কয়েকটা দেখাও গেছে কিন্তু সোনার বালি এখনও পাওয়া যায়নি। এর বেশি ওরা কিছু জানে না বা আমাদের জানাল না।

তবে ওরা বলেছে খবরের কাগজের পাতায় নজর রাখতে। অভিযাত্রীদল সফল হলে খবরের কাগজ মারফত তা জানান হবে। তারপর থেকে আমরা প্রতিদিনই খবরের কাগজের ওপর নজর রাখতে লাগলুম।

এরপর প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন দুপুরে ললিতা ডাইনিং স্পেসে বসে একখানা বই পড়ছিল আর মাঝে মাঝে বিজনের সেই ছবিখানা দেখছিল। হঠাৎ সে দাদা, বৌদি, ছোড়দা বলে চিৎকার করে উঠল। রঞ্জন তখন বাড়ি ছিল না। আমি আর দিপালী ছুটে এলুম। লতুর মুখে কথা নেই। তার দুই চোখ বিস্ফারিত, দরদর করে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ছবির দিকে তর্জনি তুলে কি যেন দেখাচ্ছে।

আমরা দুজনেই জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে রে লতু, ভয় পেলি কেন?

তোমাদের চোখ নেই? ছবিখানা ভাল করে চেয়ে দেখ না। বিজুর ঠোঁটের হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে। হাত দুটো ঝুলে পড়েছে, যেন হতাশ। দাদারে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরা হল না, বলেই সে টেবিলে দুই হাত রেখে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

দিপালী তার পাশে বসে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, তুই ভুল দেখেছিস লতু, তাই কখনও হয় নাকি? মিছে ভাবিস না, সব ঠিক আছে। বিজু ঠিক ফিরে আসবে।

লতু কিছুই ভুল দেখেনি। আমরাও সভয়ে দেখলুম ছবির বিজনের মুখ ম্লান, দুই হাত দুই পাশে ঝুলছে। আমি ভুল দেখছি না, ঠিকই দেখছি।

রঞ্জন বাড়ি ছিল না। সে ফিরতেই তাকে সংক্ষেপে ঘটনা বলে বললুম, তুই এখনি অপারেশন গোল্ড-বিভাগের দিল্লি অফিসে ফোন কর।

লতু কোথায়?

সে ওপরে নিজের ঘরে।

রঞ্জন তখনি দিল্লিতে ফোন করল। যে সংবাদ আমরা শুনতে চাইনি সেই গভীর বেদনাদায়ক সংবাদ আমাদের শুনতে হল। এক দুর্ঘটনায় বিজন মারা গেছে। দুর্ঘটনা কি এবং কি করে ঘটল তা এখনও জানা যায় নি। দিপালীকেও ডেকে দুঃসংবাদ জানান হল। বেচারী ভীষণ মুষড়ে পড়ল। কান্না রোধ করতে পারল না। বলল, এই খবর আমি লতুর কাছ থেকে কি করে লুকিয়ে রাখব।

আমি বললুম, লুকিয়ে রাখতে হবে, লতু অনুমান করেছে তবুও খবরটা বেচারীকে শোনাতে চাই না।

সময় বসে থাকে না। আমরা অভিনয় করে যাচ্ছি। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। লতু অস্থির, নিজেকে বেঁধে রাখতে পারছে না। আমাদের ক্রমাগত বলছে, দাদা, ছোড়দা তোরা বিজুর খবর আনতে পারছিস না?

রঞ্জন বলল, ওদের দিল্লি অফিসে কয়েক বার ফোন করেছিলুম, কোন সাড়া পাইনি। খবরের কাগজেও কিছু পাইনি।

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। লতু নিজের ঘরে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে। নীচে কদাচিৎ নামে।

তখন দুপুর। আমি নীচে আমার ঘরে বসে প্রুফ দেখছি, এমন সময় ঘরে ঢুকল রমেশ। প্রথমে তাকে চিনতে পারি নি। লোকটা যেন কুঁজো হয়ে গেছে। দাড়ি বেশ বড় হয়েছে। দৃষ্টি বিহ্বল। একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল দেখে মনে হল সে রীতিমতো ভীতিগ্রস্ত। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে কি যেন দেখছে।

জিজ্ঞাসা করলুম কি ব্যাপার, পাহাড়ে কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? বিজন কি করে মারা গেল? কবে ফিরলে?

লোকটাকে আমরা পছন্দ করি না। তবুও বিজনের খবর জানবার জন্যে ওকে তাড়িয়ে দিলুম না।

রমেশ বলল, বলছি, এক গ্লাস জল।

হারু বেচারা তখন ঘুমোচ্ছিল। আমি নিজেই তাকে জল এনে দিলুম। জল পান করে গেলাস নামিয়ে রেখে রমেশ বলল, আমাদের অনুসন্ধান কাজ বেশ ভালই চলছিল, যে প্রাণী মাটি খুঁড়ে সোনার বালি তুলে আনে সেই প্রাণীর সন্ধানও পেয়েছিলুম। এই কাজ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কীট-পতঙ্গ, প্রজাপতি, ও গাছপালার নমুনা সংগ্রহ করছিলুম। ফটোও তুলছিলুম। একটু দম নিয়ে বলল, তখন আমরা তিব্বত সীমান্তে। তিব্বতের সীমানা অতিক্রম করা যাবে না। সেদিন আমি ও বিজন অনুসন্ধান কাজ চালাচ্ছি। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে

চলেছে। মাঝে মাঝে কুয়াশা হচ্ছে। তখন আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এইরকম একবার কুয়াশা সরে যেতে আমরা দুজনে আবার চলতে আরম্ভ করলুম। বিজন হঠাৎ থেমে গেল। আঙুল তুলে আমাকে একটা গাছ দেখাল। গভীর খাদের ধারে একটা গাছ, পাঁচ ছ'ফুট উচ্চতা, কুলগাছের মতো পাতা। অজস্র ফল ধরেছে। আকারে সুপুরির মতো, রং উজ্জ্বল হলদে। এমন গাছ আমরা দেখিনি। শুধু তাই নয়, গাছটির ডালে ডালে অনেক প্রজাপতি। বিজন গাছের দিকে তাকাল। প্রজাপতি সংগ্রহ করবে, গাছের ফল ও পাতাও চাই।

বিজনকে এগিয়ে যেতে দেখে আমি বললুম, সাবধান বিজন, পাশেই গভীর খাদ, সাবধান, নাই বা গেলে।

বিজন শুনল না। গাছের কাছে যেতেই প্রায় সব কটা প্রজাপতি উড়ে গেল। দু একটা বড় রঙিন প্রজাপতি তখন বসেছিল। একটা বড় চ্যাপ্টা পাথর ছিল। বিজন সেই পাথরে উঠল। আর বলব কি? বিজন সেই পাথরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা উল্টে গেল আর বিজন চকিতে অদৃশ্য। সে সেই খাদে পড়ে গেল।

এই পর্যন্ত বলে রমেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। আমিও স্থাণুর মতো বসে আছি। রঞ্জন বাড়ি নেই। চোখের সামনে শুধু লতুর মলিন মুখ ভাসছে।

রমেশ আবার আরম্ভ করল। আমি তখনি প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে আমাদের ক্যাম্পে যেয়ে সেই দুঃসংবাদ শোনালুম। হৈ চৈ পড়ে গেল। কিন্তু মুশকিল হল যে তখুনি উদ্ধার কাজ আরম্ভ করা গেল না। গভীর কুয়াশা। কুয়াশা যখন কাটল তখন সন্ধ্যা হয়েছে। অতএব সেদিন কিছু করা গেল না।

পরদিন সকালে রোদ উঠতে না উঠতে আমরা দল বেঁধে খাদের দিকে যাত্রা করলুম। অনেক পরিশ্রম করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা সেই খাদে পৌঁছে খাঁনিকটা নীচে নামতে পারলুম। কিন্তু নীচে কিছু দেখা যাচ্ছে না। একজন একটা পাথর ফেলল পাথর পড়বার কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। তবুও আমরা বেলা তিনটে পর্যন্ত অনেক চেষ্টা চালালুম কিন্তু বৃথা। আমাদের বিজন চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল। আমরা পারলুম না। আমাদের ক্ষমা করবেন।

শোনো রমেশবাবু, সব শুনলুম। আমার বলার কিছু নেই। তবুও একটা কথা বলছি তুমি আমাদের বাড়ি আর এসো না, ললিতার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা কোরো না। কথাটা মনে রেখো।

রমেশ চলে গেল। আমার মনের ভিতরে কেন যেন বলল, রমেশ সত্যি কথা বলেনি। ওর বলবার ধরনটাই কি রকম। বেশ সন্দেহজনক। এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে ডঃ নটরাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা। মনে হয়, তিনি দিল্লি ফিরেছেন।

রঞ্জন ফিরতেই তাকে বললুম দিল্লিতে একবার ফোন করতে।

সৌভাগ্যক্রমে ডঃ নটরাজনকেই পাওয়া গেল। তিনি বললেন দলবল নিয়ে তিনি গতকাল মাত্র দিল্লি ফিরেছেন। হ্যাঁ, অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। বিজন মারা গেছে। দু-তিন দিনের মধ্যে আমি প্রেস কনফারেন্স ডাকব। খবরের কাগজ পড়লে সব জানতে পারবেন। রমেশ? হ্যাঁ তার মাথায় মনে হয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে। বন্ধুকে হারিয়ে এমন হতেই পারে।

ডঃ নটরাজন বোধহয় কোন কারণে ব্যস্ত ছিলেন। বেশিক্ষণ কথা বলা গেল না।

তিন-চার দিন কেটে গেল। বিজন যে মারা গেছে এ খবর যথাযোগ্য চেষ্টা করে চেপে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে লতু আজকাল খবরের কাগজ পড়ছে না। কোন কিছুতেই তার আগ্রহ নেই। তাকে একরকম জোর করে খাওয়াতে হয়। ওপরে নিজের ঘরেই থাকে। নীচে নামলেও ডাইনিং স্পেসে এসে বিজনের ছবির দিকে ফিরে চেয়ে থাকে। তার বৌদিকে বলে, তোমরা আমাকে না বললে কি হবে, আমি জানি বিজু আর কোনদিন আমার কাছে ফিরে আসবে না।

ডঃ নটরাজনের প্রেস কনফারেন্সের রিপোর্ট কাগজে প্রকাশিত হয়েছে এবং হেরোডোটাসের তথ্য সত্য প্রমাণিত হওয়ায় হৈচৈ পড়ে গেছে। এ বিষয়ে খবরের কাগজে আরও নিবন্ধ এবং চিঠিপত্রও ছাপা হচ্ছে।

একদিন দুপুরে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা লিখে ক্লান্তি বোধ করলুম। কফি খাবার ইচ্ছে হল। হিটারে জল গরম করে নিজেই কফি বানিয়ে বিজনের ছবির সামনে একটা চেয়ারে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি। বিজনের ছবিখানা দেখছি, রঞ্জন মন্দ আঁকেনি। বিজনের নাকের ডান দিকে ছোট্ট একটা বাদামী রঙের আঁচিল আছে, সেটাও আঁকতে ভোলেনি।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ঘরের মধ্যে খুব একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল। আমার কাপ ধরা হাত কেঁপে উঠল। কাপটা নামিয়ে রাখলুম। ছবির দিকে চোখ পড়ল। এ কি? বিজন কোথায়? এ তো একটা কঙ্কাল। কঙ্কাল মিলিয়ে গেল। শীতল হাওয়াও চলে গেল। তারপর দেখলুম বিজনের ছবির ওপর দু'ফোঁটা লাল রক্ত। ছবিতে কোথাও লাল রং নেই তো, রক্তের ফোঁটা কোথা থেকে এল। কফি শেষ করে আমি ছবির কাছে যেয়ে দেখলুম রক্তের ফোঁটা নয়। ক্ষুদ্র দুটি পোকা।

হাত দিতেই আমার হাতে লাল রং লেগে গেল। পোকা দুটোর রং সাদা। হাতের লাল রং মুছে আমি পোকা দুটোকে তুলে আমার ঘরে এনে ছোট একটা কাঁচের গেলাস চাপা দিয়ে আমার টেবিলের একপাশে রেখে দিলুম। লতুকে কিছু বললুম না। যাতে তার চোখ না পড়ে এই জন্যেই আমি পোকা দুটোকে সরিয়ে

নিয়ে গেলুম।

পরদিন দুপুরে আমি বেরিয়েছিলুম। বেহালায় একজন ফিল্ম প্রযোজক ও ডিরেকটরের সঙ্গে মিটিং ছিল। এঁরা আমার একটা গল্পের ছবি তুলবেন। টিভি পর্দার জন্য আমার একটা উপন্যাস সিরিয়াল করতে চায়।

রঞ্জনও বাড়ি নেই। সে দিপালীকে বলে গেছে তার ফিরতে রাত্রি আটটা হবে। বাড়িতে আছে শুধু লতু, দিপালী আর আমাদের কাজের লোক হারু।

বাড়ি ফিরতে আমার সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ি ঢুকেই টের পেলুম একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। টের পেলুম আমার ঘরে ঢুকে। ঘরে একটা ছোট তক্তপোশ আছে। লিখতে লিখতে ক্লান্ত লাগলে আমি সেই তক্তপোশে শুই। দেখি কি সেই তক্তপোশে রমেশ শুয়ে রয়েছে। বিড়বিড় করে কি বকছে আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে।

আমি ওকে গ্রাহ্য না করে ঘর থেকে বেরিয়ে, ভেতরে ঢুকলুম। আমি বাড়ি ফিরেছি তা দিপালী ও লতু টের পেয়েছিল। তাই তারা কিছু বলবার জন্য উত্তেজিত ভাবে আমার দিকে এগিয়ে এল।

বেশ জোরেই বললুম, রাসকেলটাকে আসতে আমি বারণ করেছিলুম, এল কেন? রাসকেলটার কি হয়েছে? ব্যাটাকে দেখছি মেরে তাড়াতে হবে।

দাদা ঐ শয়তানটা একটা কুগ্রহ। কি করেছে জান? বাইরের দরজার কড়া নাড়তে হারু দরজা খুলে দিয়েছিল। বৌদি তখন নীচে চা করছিল। আমি ঐ চেয়ারটায় বসেছিলুম। শয়তানটার এত সাহস যে সোজা এখানে চলে এসেছে। আমরা নীচে থাকলে ওপরেই উঠে যেত। আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে কিনা, ললিতা বিজন তো আর নেই, আমি আগে যে প্রস্তাব করেছিলুম সেটা কি তোমার মনে আছে, বলতে বলতে বিজুর ছবির নীচে ঐ চেয়ারটায় বসে আমাকে বলছে, আমি তোমাকে আমার ঘরণী করতে চাই। যেই না এই কথাটা বলা সঙ্গে সঙ্গে বিজুর ছবিটা ওর ওপর পড়ল। ছবির ভারী ফ্রেমের কোণ লেগে ওর কপাল ফেটে গেল। তারপর ডেভিলটা চেয়ার থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। হারুর সঙ্গে ওর ভাইপো দেখা করতে এসেছিল। দুজনে ধরাধরি করে তোমার ঘরে তক্তপোশে শুইয়ে দিয়েছে।

দিপালী বলল, লোকটা ঘরে ঢোকার পর থেকে মাঝে মাঝে নিজের পিছন দিকে চেয়ে দেখছিল। তুমি বিশ্বাস করবে না, লোকটা যখন লতুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তখন আমি দেখেছিলুম দুটো ছায়া, একই মানুষের দুটো ছায়া কি করে হয়? এই আলো ওর গায়ে পড়েছিল তাতেই ছায়া পড়তে পারে কিন্তু দুটো ছায়া কি করে হয়? ভুল দেখেছি?

বিজনের ছবিখানা তখনও টাঙানো হয়নি, দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল।

ছবির দিকে চাইলুম, কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম না।

দিপু আমাকে চট্ করে একটু চা করে দাও। গলা শুকিয়ে গেছে। চা খেয়ে ব্যাটাকে তাড়াতে হবে। হারু তোকে বললেই ক্লাব থেকে নরেন আর দুলালকে ডেকে আনবি। ব্যাটাকে উত্তমমধ্যম না দিলে ওর আক্কেল হবে না।

চা খেয়ে আমি ঘরে ঢুকে দেখি রমেশ উঠে বসেছে। আমি ঘরে ঢুকতেই জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, আপনি ঐ পোকা দুটো কোথায় পেলেন? আঙুল দিয়ে দেখাল।

কেন? যেখান থেকেই পাই না কেন? তোমার কি দরকার? তুমি ভালয় ভালয় আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

যাব, ঐ পোকা এখানে কি করে এল? হিমালয়ের যে অঞ্চলে আমরা অভিযান চালাচ্ছিলুম সেখানে এই পোকা অজস্র, মাঝে মাঝে ওরা দেহ থেকে লাল রং-এর কিছু মোচন করে। বরফের ওপরেও এই পোকা দেখেছি, সেই পোকা এদেশে কি করে এল?

রমেশ জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিল। মাঝে মাঝে দু হাত দিয়ে মাথা টিপছিল আর পিছন দিকে বেঁকিয়ে চেয়ে দেখছিল।

আমি তেড়েমেড়ে বললুম পোকা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি বিদেয় হও, ছিঃ ছিঃ তুমি বিজনের বন্ধু। তোমার এমন আচরণ, লজ্জা করে না। গেট আউট।

রমেশ উঠে দাঁড়াল, তার পা টলছে। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখল। আমিও দেখলুম দুটো ছায়া, ছায়া দুটো রমেশেরই।

রমেশ দাঁড়িয়ে পড়ে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, বিজন ভাই আমাকে মুক্তি দে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তখন আমার ঘাড়ে শয়তান চেপেছিল। শয়তান আমাকে বলল, একটু ঠেলা দে। বিজন খাদে পড়বে আর মরবে, তোর পথ পরিষ্কার। আমিও ঠেলা মারলুম প্রাণের বন্ধুকে, ভাই বিজন আমাকে মুক্তি দে...।

আরও কিছু বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় নামল, রাস্তায় আলো জ্বলছে। দুটো ছায়া তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে।

আমার পাশে এসে দিপালী আর লতু দাঁড়িয়েছিল। তারাও দেখল, মানুষ এক ছায়া দুই।

যাক আপদ বিদায় হল এবং চিরতরে। পরদিন সকালে দেখা গেল আমাদের বাড়ি থেকে কাছেই একটা গাছের ডালে দড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে রমেশ ঝুলছে।

এদিকে বিজনের ছবিতে তার দুটো ঠোঁটে সেই হাসি ফিরে এসেছে।

ভূতেরা বিজ্ঞান চায় না

অদ্রীশ বর্ধন

চাণক্য চাকলাদার চিরকালই উটের মতো হাঁটে। কিন্তু সেদিন দু দুটো চাণক্য চাকলাদারকে পিঠ কুঁজিয়ে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ কপালে তুলে ফেললাম।

একেবারে একই রকমের চাণক্য চাকলাদার—এক জোড়া। যেন সন্দেশের ছাঁচ থেকে তৈরী। আমি চোখ গোল গোল করে দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছি দেখে দুজনেই হাসল। এবং তখনি লক্ষ্য করলাম পার্থক্যটা।

একজন হাসল কাষ্ঠহাসি, আড়ষ্ট বদনে। আর একজন হাসল উল্লাসের হাসি, উৎফুল্ল আননে।

দ্বিতীয় জনই তাহলে আসল চাণক্য। চাণক্য চিরকাল হাসে এবং হাসায়। একটু গুলপট্টি মারে ঠিকই, তা আমার গা সওয়া হয়ে গেছে।

অতএব কেশে গলা সাফ করে নিয়ে (আসলে ঘাবড়ে যাওয়াটা কাটিয়ে নিয়ে) বললাম তেড়েমেড়ে আসল চাণক্যকে—ছদ্মবেশী দু নম্বরকে এনেছ কেন? মতলবটা কী?

উৎফুল্ল চাণক্য আমার টেবিলের কোণে বসে পড়ে লম্বা ঠ্যাং দুটোকে দোলাতে দোলাতে ম্রিয়মাণ চাণক্যকে ধমকে বললে—দাদা রেগেছেন দেখতেই পাচ্ছ। তখনই বললাম পেছন পেছন এসো না। যাও, ওই চেয়ারটায় বসো। কাছে এসো না।

সুড়সুড় করে নকল চাণক্য গিয়ে বসল আমার ভাঙা চেয়ারটায়। চেয়ারের বেত ছিঁড়ে গেছে। গর্তের মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গিয়ে আটকে গেল এবং সেইভাবেই হাঁটু দুটো প্রায় চিবুকে ঠেকিয়ে বসে রইল। জুলজুলে চাহনি কিন্তু আটকে রইল নাম্বার ওয়ান চাণক্যর দিকে।

আমি এবার বললাম—"বৎস, চাণক্য, কহ অকস্মাৎ কেন এহেন রঙ্গ?"

আসলি চাণক্য বলল—"দাদা, ক্লোনিং সম্ভব হয়েছে শুনেছেন নিশ্চয়?"

"ক্লোনিং?"

"আকাশ থেকে পড়লেন মনে হচ্ছে।"

"না, না, আকাশ থেকে পড়ব কেন? ডেভিড রোরভিক এর 'ইন হিজ

ইমেজ' বইটা আমারও পড়া আছে, এই তো সেদিন, মানে ১৯৫২ সালে রবার্ট ব্রিগস আর টমাস কিন্তু আফ্রিকান চিতা ব্যাঙ-এর নকল তৈরী করেছেন গবেষণাগারে। প্রকৃতিকে টেক্কা মেরেছেন।"

"শুরুটা হয়েছিল প্রফেসর এফ সি স্টুয়ার্ডের কর্নেল ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে—১৯৬০ সালে। মনে পড়ে?" হাসল চাণক্য। হাসিটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। কিরকম যেন গা ছমছম করতে লাগল।

চাণক্য যেন আমার মনের ভয় আঁচ করে নিয়ে হাসির ধরন পাল্টে নিল চট করে। মোলায়েম হেসে বললে—"গাজরের গা থেকে কোষ চেঁচে নিয়ে নারকেলের দুধ মিশোনো পোস্টাই সলিউশনে ডুবিয়ে রেখেছিলেন প্রফেসর। আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়ে ছেড়েছিলেন। কোষ থেকে সত্যিকারের গাজর তৈরী হয়েছিল।

"এর নাম ক্লোনিং," বলেছিলাম আমি।

ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ চোখদুটো শক্ত করে চাণক্য (মানে আসল চাণক্য) বললে—"১৯৬৮ সালে ক্যালটেক বায়োলজিস্ট ডক্টর রবার্ট এল সিনশিমার বলেছিলেন, আর বছর দশেকের মধ্যেই মানুষ ক্লোন সম্ভব হবে। মানে এ মানুষের কোষ চেঁচে নিয়ে হুবহু ঐরকম গাদা গাদা মানুষ কারখানায় তৈরী করা যাবে।"

নড়েচড়ে বললাম—"কিন্তু হুঁশিয়ার করেছিলেন জেমস ওয়াটসন, ডি এন এ গবেষণায় নোবেল পুরস্কার জিতেও তাঁর মাথা ঘুরে যায়নি। মানুষ ক্লোন করতে বারণ করেছিলেন।"

চোখ পাকিয়েই বলল চাণক্য—"চোখের রঙ, নাকের গড়ন, ব্রেন, মন—সবই এক হবে, কিন্তু আত্মা তো এক হবে না। ফ্রাঙ্কেস্টাইনের গড়া দানব সৃষ্টি হতে পারে—এই ভয় করেছিলেন।"

ঠিক কথা। কিন্তু জে. বি. এস হ্যালডেনের মতো বৈজ্ঞানিক মনে করতেন মানুষ-ক্লোন অনেক অসাধারণ গুণের অধিকারী হবে। রাত্রে দেখতে পাবে যন্ত্রণাবোধ থাকবে না, আলট্রাসোনিক সমরাস্ত্রর আওয়াজ শুনতে পাবে না, বেঁটে বামন গড়ে তুলতে পারলে মানুষ-ক্লোন বড় বড় গ্রহের মাধ্যাকর্ষণকে কলা দেখিয়ে কলোনি গড়ে তুলতে পারবে—

এবার দাবড়ানি দিয়ে বসল চাণক্য (কখনো আমাকে অন্তত দেয় না)—"থামুন, থামুন, প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে এমন তথ্য থাকে যা দিয়ে গোটা শরীরটাকে ফের গড়া যায়—লাখে লাখে গড়া যায় তাও মানছি—কোষের জেনেটিক অ্যাপারেটাসের সুইচটা বন্ধ রেখেছেন প্রকৃতি যাতে এই অঘটন না ঘটে—মানুষ ঘটাতে চায় সেই বিপর্যয়। গোপনে মানুষ-ক্লোন তৈরী করে ফেলেছে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

চাণক্যর কটমটে চাহনি আর সহ্য হল না। খেপে গিয়ে বললাম—তাতে অত চেল্লাচেল্লি করার কি আছে? আইনস্টাইনের রেখে দেওয়া ব্রেনের একটা কোষের বায়োকেমিক্যাল সাপ্রেসর হটিয়ে দিয়ে লাখ লাখ আইনস্টাইন তৈরী করা যাবে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে চাণক্য বললে—"মিশরীয় ম্যমী রাজা তুতানখামেনের দেহে যেটুকু ডি এন এ এখনও আছে, তা থেকে লাখ লাখ তুতানখামেনও তৈরী করা যাবে।"

"অ্যাঁ"!

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা যদি মানুষ-ক্লোন করতে আরম্ভ করেন, আমরাও তাহলে কবরের মড়া তুলে লাখে লাখে জ্যান্ত মড়া বানিয়ে চলব।"

"তো-তো-তোমরা মানে?" আড়চোখে তাকালাম দুনম্বর চাণক্যর দিকে। সে দেখলাম একেবারে নীল হয়ে গেছে। মুখে রক্ত-টক্ত কিচ্ছু নেই।

অট্ট হেসে এবার বললে আসল চাণক্য (সেকী অট্টহাসি ..... হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল আমার)—"দাদা, বিজ্ঞান নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বারণ করুন। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও যা জানে না, আমরা তা জানি। আমাদের ভাত মারতে এলে সর্বনাশ করে ছাড়ব।" জবাব একটা দিলাম বটে, কিন্তু চিঁ-চিঁ গলায়—"কি-কি জানো তোমরা?"

হাইপার গ্র্যাভিটি নিয়ে খুব তো লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ছে আপনাদের বৈজ্ঞানিকরা। পৃথিবীর মাটি থেকে ছ'শ ফুট উঁচু পর্যন্ত সব কিছুকেই মাধ্যাকর্ষণের উল্টো একটা শক্তি ওপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিব্বতের সাধুরা অনেক আগেই জানত এই হাইপার-গ্র্যাভিটির খবর। যোগাসনে বসে শূন্যে উঠে পড়ত। জানি আমরাও। দেখবেন?

বলেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চাণক্য টেবিল ছেড়ে বসা অবস্থাতেই ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেল কড়িকাঠের কাছে। আবার নেমে এল টেবিলের ওপর।

বললে—"দেখলেন? এরই নাম লেভিটেশন। আপনাদের উজবুক বৈজ্ঞানিকদের দেওয়া নাম। এসব শক্তি আমাদের হাতের মুঠোয় বলেই আমরা—

গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে চেয়ে দেখি চেয়ারে গেঁথে থাকা চাণক্য অজ্ঞান হয়ে গেছে।

দেখে কেমন জানি মায়া হল টেবিলে বসে থাকা চাণক্যর।

"বেচারা! ঐ তো মুরোদ। ক্লোনিং নিয়ে খুব কপচাচ্ছিল গাছতলায় বসে। গাছটা যে নিমগাছ খেয়াল নেই। আমি ভূতলৌকিক কমিটির প্রেসিডেন্ট মগডালে বসে অলৌকিক আর অপবিজ্ঞানের গবেষণা করছি জানেও না। প্রফেসর ঝিঁ ঝিঁ ঝাঁকতালের সঙ্গে চ্যাংড়ামি! দিলাম একটা ডোজ দিয়ে। হুবহু আর একখানা চাণক্য চাকলাদার হয়ে লাফিয়ে নামলাম সামনে।"

"তারপর?" গালে হাত দিয়ে বললাম আমি।

"তখনি অক্কা পেলে ল্যাটা চুকে যেত, দলভারী করা যেত। বজ্জাত মানুষ বৈজ্ঞানিকগুলো এমন সব দাওয়াই বার করছে, মানুষ আর মরছেও না—ভূতদের পপুলেশন বাড়ছে না। তা আপনার এই আখাম্বা লম্বা সাগরেদটা 'দাদারে বাঁচান বাঁচান' বলে অসভ্যের মতো এমন চেঁচাতে লাগল যে আপনাকেও একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে কললাম। চলে এলাম ঠিকানা নিয়ে। কিরকম বুঝছেন?"

"খু-উ-ব ভাল", বললাম কষ্টেসৃষ্টে। "ভূতেদের আজকাল দর্শন পাওয়াও ভার। এত ভীতু—মানুষের ভয়ে দেশছাড়া, আবার আম্বাকত—লাখে লাখে মড়া জাগাবে। ছোঃ!"

তড়াক করে লাফিয়ে মেঝে থেকে কড়িকাঠের কাছে পৌঁছে গেল চাণক্যরূপী

প্রফেসর ঝিঁ ঝিঁ ঝাঁকতাল। কড়িকাঠে মাথা লাগিয়েই লাট্টুর মতো ঘুরতে লাগল বন্ বন্ করে।

দেখলাম সেই অসম্ভব অবিশ্বাস্য দৃশ্য। ঝাঁকতালের ঘূর্ণ্যমান দেহ থেকে রাশি রাশি চাকলাদার ছিটকে যাচ্ছে ঘরময় এবং ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে মেঝের ওপর। দেখতে দেখতে ঘর গিজগিজ করতে লাগল অজস্র চাণক্য চাকলাদারে। একই রকম দেখতে। একই রকম চাহনি। একই রকম হাঁটা।

এইটুকু ঘরে এত জনের জায়গা হবে কি করে যখন ভাবছি, প্রফেসর ঝিঁ ঝিঁ ঝাঁকতাল চোঁ করে নেমে এল আমার টেবিলের ওপর। বডি ঘোরা থেমে গেছে। শুধু চোখদুটো অদ্ভুদভাবে চর্কিবাজির মতো ঘুরছে (রাগে নিশ্চয়) আর কোটর থেকে ফুলকি ঠিকরোচ্ছে!

পাছে আবার অপবিজ্ঞানের খেলা দেখিয়ে বসে, তাই তাড়াতাড়ি বললাম—"মাই ডিয়ার প্রফেসর, মাঝে মাঝে আসবেন। পি সি সরকারের ম্যাজিক টিমে আপনাকে ঢুকিয়ে দেব। এখন বিদেয় হোন—চ্যালাচামুণ্ডাদের গায়ে ঢুকিয়ে নিন। চামসে গন্ধ ছাড়ছে।"

"আর হবে না তো?" ভৌতিক খোনো স্বরে বললে ঝাঁকতাল।

"কি হবে না?"

"মানুষদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা?"

"বলে দেখব। যা ঠ্যাটা ওরা।"

"ভূতসাম্রাজ্য গড়ে তুলব গোটা পৃথিবীতে—খেয়াল থাকে যেন।"

"থাকবে প্রফেসর, থাকবে। এখন নিমগাছে ফিরে যান—গবেষণা অসমাপ্ত রেখে এসেছেন—"

"তাই তো!" আঁৎকে উঠল প্রফেসর ঝিঁ ঝিঁ ঝাঁকতাল—পচা মাছের টনিকটার গেল বোধহয় বারোটা বেজে। গন্ধ শুঁকলেই শরীর যাদের নেই, তারা শরীরী পাবে এখন থেকে। একটোপ্লাজমের দরকারই হবে না। গুডনাইট, দাদা।"

"গুডনাইট, ঝাঁকতাল।"

একটা ঝড় বেরিয়ে গেল ঘরের ভেতর থেকে বাইরে। কালো ঝড়।

চেয়ারের গর্ত থেকে উঠে বসল আসল চাণক্য চাকলাদার—যাকে এতক্ষণ নকল মনে করেছিলাম।

বললে—"অজ্ঞান হইনি। মটকা মেরে পড়েছিলাম।"

"চ্যাংড়ামি করতে গেছিলে কেন?" এতক্ষণে ফাটলাম বোমার মতো।

"না করলে এমন একখানা গল্প পেতেন কোথায়?" বলে একটা লম্বা চুরুট ধরাল চাণক্য।

হাওয়া বাতাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেবার পুজোর সময় আমার মামাবাড়ির ছোট বড় সবাই মিলে হিমালয় ভ্রমণে গেলে বাড়ি পাহারার দায়িত্ব পড়েছিল আমার কাঁধে। অবশ্য আমি একা নই, বাড়ির পুরনো কাজের লোক রামলালও ছিল। লোকটা রাঁধুনী হিসাবে খাসা। দুজনে মনের আনন্দে যথেচ্ছ খেতুম আর ক্যারাম পিটতুম। শুধু রাতের বেলাটা..।

সে কথা বলতেই এক গল্প।

বাড়িটা শহরতলি এলাকায়। একেবারে সুনসান নির্জন আর গাছপালা পুকুর-ডোবাও প্রচুর। মনেই হবে না শহরের নাকের ডগায় এমন পাড়াগেঁয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া খুব পুরনো আমলের বাড়ি। চারদিকে বাগান, পুকুর একটা বাঁশবন পর্যন্ত।

রামলালের বয়স হলেও শরীরখানা এখনো জোয়ানের মতো তাগড়াই বোঝা যায়, একসময় রীতিমতো ব্যায়াম বীর ছিল। আর এখন মানুষ কাছে থাকলে পরিবেশ যাই হোক, কোনরকম ভয়-ভাবনা থাকার কথা নয়। চোর ডাকাতের সামনে রামলাল গোঁফে তা দিয়ে দাঁড়ালেই লেজ তুলে পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।

হ্যাঁ প্রথমদিন সে কথাই মনে হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে বাইরের গেট বন্ধ করতে গিয়ে যখন রামলাল আমাকে ডেকে বলল, দাদাবাবু, আপনি একটু দাঁড়ান তো এখানে আমার কেমন ডর বাজছে—তখনই আঁচ করলুম, লোকটাকে যতটা সাহসী ভেবেছিলুম, ততটা হয়তো নয়।

গেট বন্ধ করে ঝটপট ঘরে ঢুকে রামলাল একটু হেসে বলল, চোর, গুণ্ডা, ডাকু—তাদের সঙ্গে একহাত লড়া যায় দাদাবাবু! কিন্তু হাওয়া-বাতাসের সঙ্গে তো লড়া যায় না।

অবাক হয়ে বললুম, তার মানে? ও রামলাল, হাওয়া-বাতাস ব্যাপারটা কী?

রামলাল চোখ টিপে বলল, সে আছে। কর্তাবাবু যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ততক্ষণ কোন ঝামেলা হয় না। রাতবিরেতে উনি বাড়ি না থাকলে ব্যাটা পেয়ে বসে।

কেমন অস্বস্তি হল ওর কথাটা শুনে। বললুম, কার কথা বলছ, খুলে বল তো রামলাল।

রামলাল ফের চোখ টিপে বলল, আছেন তো, মালুম হয়ে যাবে।

হয়ত মালুম খানিকটা হল কিছুক্ষণ পরেই। দোতলার একটা ঘরে বসে ফের একদফা চা খেতে খেতে একটা গোয়েন্দা উপন্যাস সবে খুলেছি। রামলাল নীচের তলায় কিচেনে রাতের জন্য রান্না করছে এবং মাঝে মাঝে তার হেঁড়ে গলায় গানও শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ একটা বাতাস উঠল শনশনিয়ে। বাগানের দিকে যেন হুলুস্থুল শুরু হল। তারপর বাঁশবন থেকে বিচ্ছিরি ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ শোনা যেতে লাগল। ঘরের জানালার কপাটগুলো ঘটঘট করে নড়তে থাকল। আর সেই সময় গেল আলো নিভে। সারা এলাকা অন্ধকার হয়ে গেল দেখে বুঝলুম লোডশেডিং। কিন্তু ততক্ষণে রামলালের গানটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর সিঁড়িতে ধুপধাপ দুদ্দাড় শব্দ করে, সে এসে হাজির হল হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, কিচেনে হেবিকেন ছিল। খুঁজে পেলুম না। শিগগির মোম জ্বালুন দাদাবাবু!

টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে মোমবাতি বের করে জ্বেলে নিলুম। আশ্চর্য বাতাসটা আর নেই। বললুম, কী ব্যাপার রামলাল, তুমি কি ভয় পেয়েছ?

রামলাল কাচুমাচু মুখে হাসল, বলল, পাইনি, আবার পেয়েছিও। বুঝলেন না দাদাবাবু, হাওয়া বাতাসের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল। দেখুন না, গালটা এখনও বরফ হয়ে আছে। হাওয়া বাতাসের চড় বলে কথা।

বিরক্ত হয়ে বললুম, হ্যাত্তেরি, তোমার হাওয়া বাতাসের নিকুচি করেছে। তুমি কি বলতে চাইছ, বুঝতে পারছি না।

রামলাল তেমনি চোখ টিপে রহস্যময় হেসে বলল, আছেন যখন এ বাড়িতে সব মালুম হয়ে যাবে। এখন কৃপা করে একটু কিচেনে এসে বসুন দাদাবাবু! ব্যাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।

ওর কথা শুনে এবং ভাবভঙ্গি দেখে অস্বস্তি বেড়ে গিয়েছিল। তবে লোকটা গায়েগতরে যেমন সাহসের বেলায় মোটেও তেমনটি নয় তাহলে। রান্না এবং খাওয়া শেষ হলে ওপরের ঘরে শুতে এলুম। আমিই ওকে এঘরে শুতে বলতুম, কিন্তু কিছু বলার আগে রামলাল নিজেই অনুরোধ করল, আমার ঘরেই মেঝেতে শুতে পারলে রাতের ঘুমটা তার হবে। নইলে নাকি ঐ হাওয়া বাতাস তাকে ঘুমুতেই দেবে না। বাতাসের কি প্রাণ আছে, বাতাস কী ভাবে এবং কেন মানুষকে জ্বালাতন করবে আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না। ততক্ষণে আলো এসেছে। মেঝের সতরঞ্জির ওপর চাদর পেতে রামলাল নাক ডাকতে শুরু করেছে। ভিন্ন জায়গায় আমার সহজে ঘুম আসে না। তাছাড়া ঐ অস্বস্তি। বিছানায় শুয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় গোয়েন্দা উপন্যাসটা পড়ার চেষ্টা করছি। এমন সময় আবার সেই উটকো বাতাসটা বাগানের দিকে শনশনিয়ে উঠল। তারপর জানালা খটখটিয়ে

ঘরে ঢুকল। জোরে ফ্যান চালিয়ে দিয়েছিলুম মশার অত্যাচারে, ভাবলুম, ভালই হল, বাইরের এই হতচ্ছাড়া বাতাসটা এসে মশাগুলোর দফা রফা করুক।

কিন্তু ফের সেই লোডশেডিং। তারপর বাঁশবনের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজের মধ্যে ক্রমশ যেন যন্ত্রণাকাতর মানুষের গোঙানি শুনতে পেলুম। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল, এ কখনও কানের ভুল নয়। তাছাড়া ঘরের ভেতর বাতাসটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চারদিকে, বাইরে এবং ভেতরে প্রচণ্ড হুলুস্থূল চলছে। আমি কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম। উঠে জানালা বন্ধ করার সাহসও হল না।

তারপর আচমকা নীচের তলায় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা পড়ে গেল শুনলুম, পড়ার শব্দে বিকট ঝনঝন শব্দ; বুঝি প্রকাণ্ড একটা কাঁচ ভেঙে গুড়িয়ে গেল। আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। ডাকলুম, রামলাল! রামলাল! ওঠ, শিগগির ওঠ তো।

অবাক হয়ে দেখি, রামলাল কখন জেগে গেছে। সে ভারী গলায় বলল, চুপসে শুয়ে থাকুন দাদাবাবু। ও কিছু না। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, কী বলছ তুমি? নিশ্চয় নীচের কোন ঘরের জানালা খুলে গেছে। ছবিটবি পড়ে ভেঙ্গে গেছে।

"বলেন কী দাদা! বেঠিক মাথায় এত নির্ভুল কাজ হয়? হালুইকর ঠাকুরদের পর্যন্ত আগাম কিছু দিয়ে বায়না করে রেখে গেছেন, পানের দোকানে অর্ডার বুক করে রেখে গেছেন। আগে থেকে সব কাজ করে রাখাই ছিল বুড়োর 'হবি'। রাত নটার ট্রেন ধরতে সকাল নটায় স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতেন। আচ্ছা আমি উঠি, অনেক জায়গায় যেতে হবে। লম্বা লিস্ট। বাদটাদ পড়ে গেলে শেষে ভূতে ঘাড় মটকাবে বাবা! ও হ্যাঁ, ভাল কথা। ইশ!, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি। আপনার নামে একটা প্যাকেট দিয়ে গেছেন।"

"আমার নামে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আপনিই তো সাহিত্যিক বেদব্যাস বটব্যাল? পদবিটা ভারী মজার, না? শুনলেই কেমন 'ব্যাটবল-ব্যাটবল' মনে হয়?

হাতের ব্যাগের মুখ খুলে ছেলেটা আষ্টে-পৃষ্ঠে গালা-মোহর করা একটি প্যাকেট বার করে বেদব্যাসের দিকে এগিয়ে দেয়। মনে হচ্ছে, একটা চটি-বই।

"আচ্ছা, নমস্কার। আসবেন তা হলে ওইদিনে আমাদের গ্রামে। শুধু আমাদের কেন, আপনারও গ্রাম।"

ছেলেটা চলে যাবার পর বেদব্যাস একটু লজ্জিত ভাবে ভাবতে থাকে, উনি মনে করে আমার জন্যে কিছু রেখে গেছেন। অথচ আমি তো ওঁকে। ...

খুলে ফেলে প্যাকেটটা।

বই নয়, একখানি বাঁধানো খাতা। তার সঙ্গে একটা চিঠি। বেদব্যাসের নামে।

চিঠিটাই আগে খুলে পড়তে থাকে বেদব্যাস।

পরম কল্যাণবরেষু,

শ্রীমান বেদব্যাস, আশা করি তোমার সর্ববিধ কুশল। পরে লিখি যে, তুমি আমার পরমবন্ধু 'ফুলু'র নাতি। সেই হিসাবে আমারও নাতি। সেই দাবিতেই এই পত্র।

শুনিয়াছি, তুমি লেখক হইয়াছ, ম্যাগাজিনে-ম্যাগাজিনে তোমার রচনা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাদিও ছাপা হইয়াছে, তাই তোমার উপরই ভার দিতেছি।

দীর্ঘজীবনের ফলে একে একে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়জন সকলেই বিদায় লইতেছে। আমার কালের কেউই আর বাঁচিয়া নাই। অথচ এ-কালের যাহারা, তাহারা আমাকে মানুষ বলিয়া গণ্যই করে না। হাসে, ব্যঙ্গ করে। প্ল্যান্টচেটে আমার পরলোকগত বন্ধুদের নামাইয়া আনিতে থাকি, এবং ক্রমশ তাহাদিগের সঙ্গে পূর্বকালের মতোই মজলিশ করি, আড্ডা জমাই, দাবা খেলি।

আমার প্রথম চেষ্টা সফল হয় ফুলুকে ডাকিয়া। ক্রমশ ফুলুই আমার পরলোক ও নরলোকের মধ্যে 'ডাকবিভাগ' খুলিয়া দিয়া সর্বদা আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত

করিয়া দেয়। ক্রমেই আমি আমার গৃহে আমার সমস্ত মৃত পরিচিতজনকে নামাইয়া আনিয়া সমীক্ষা চালাইতে ছিলাম। পরলোক জায়গাটা কী রূপ, সেখানে বসবাসের অবস্থা কেমন, সেখানে গিয়া ইহলোকের জন্য মন কেমন করে কি না ইত্যাদি। এই সমীক্ষার ফলে পরলোক সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলাম। জানিলাম, সেখানেও জমির ভীষণ ডিমান্ড, একটি 'আত্মাপ্রমাণ' জমিও প্রায় দুর্লভ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আত্মারা ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করিয়া জীবন কাটাইতেছে। এই খবরে উদ্বিগ্ন হইয়া আমি ফুলুকে দিয়া আমার জন্য একটু জমি অগ্রিম বুক করিয়া রাখিয়াছি। সেই জমিতে যে বাড়ি করিয়া লইব তাহার প্ল্যানও প্রস্তুত। তবে মুশকিল এই, এখান হইতে বাড়ি বানাইবার মালমশলা বা টাকাকড়ি কিছুই লইয়া যাইবার উপায় নাই। যাহা হউক, সবই শোনা কথা। নিজে গিয়া না দেখিলে কিছুই বোঝা সম্ভব নয়।

আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি সেখানে গিয়া ইহলোকের কোন সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইব, যেরূপ এখন এখানে 'রাজধানীর চিঠি' বা 'লন্ডনের চিঠি' ইত্যাদি দেখিতে পাই সেইরূপ সপ্তাহে সপ্তাহে পরলোকের চিঠি নামক একটি ফিচারের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তোমাকেই তাহার সহায়ক হইতে হইবে।

বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইতেছে, বিজ্ঞানীরা মহাকাশযান পাঠাইয়া মহাকাশের তথ্য জানিয়া ফেলিয়াছে, অথচ কেহই আজ পর্যন্ত তুচ্ছ একটি 'পরলোক সার্ভিস' খুলিতে পারিল না। তো, এই অভাব নিরসনের জন্য সম্প্রতি আমি 'ভূত নামাইবার সহজ পদ্ধতি' আবিষ্কার করিয়া একটি পুস্তক রচনা করিয়াছি। সেই পুস্তক দেখিয়া, যে কেহ অতি সহজে ভূত নামাইতে পারিবে ও সরাসরি সেখানের খবর সংগ্রহ করিতে পারিবে। অপরকে সে খবর সাপ্লাই করিতেও পারিবে মনে হইয়াছে, এই কাজের যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি তুমিই। তুমি আমায় নামাইয়া ফেলিয়া তথ্য সংগ্রহ করিবে এবং চটপট সেগুলি গুছাইয়া লিখিয়া পত্রপত্রিকায় পাঠাইবে। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতেছি যে পত্রিকায় ইহা ছাপা হইবে তাহা হটকেকের মতো বিক্রয় হইবে। কারণ ইতিপূর্বে কেহ পরলোক হইতে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়ে নাই। যে যা লেখে অনুমানে ও কল্পনায়। আর এ একেবারে তাজা সত্য।

অবিলম্বে কোন পত্রিকার সহিত যুক্তি করিয়া লও। চিঠির সঙ্গে তোমার কাগজ, কলম, আলপিন, পেপারক্লিপ ইত্যাদির জন্য কিছু টাকা রাখিতেছি, গ্রহণ করিও। কিছু মনে করিও না।

আর বলি, অতি অবশ্য করিয়া তোমার নুটুঠাকুর্দার শ্রাদ্ধের ভোজে যোগ দিবে। সারাজীবন কেবল অপরের বাড়ির নানা ঘটাপটায় মোচ্ছবের খাওয়া

রামলাল বলল, ও হাওয়া বাতাসের কাণ্ড দাদাবাবু! চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

খাপ্পা হয়ে বললুম, নিকুচি করেছে তোমার হাওয়া বাতাসের।

মামাবাবু এসে যদি দেখেন, এভাবে আমরা বাড়ি পাহারা দিয়েছি, তোমারও চাকরি যাবে, আমিও মুখ দেখাতে পারব না। ওঠ, চল দেখি কী ভাঙল। রামলাল অন্ধকারে বলল, আপনি গিয়ে দেখুন দাদাবাবু। আমি যাব না।

রাগ হলে মানুষের সাহস বাড়ে। বালিশের পাশ থেকে টর্চ নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলুম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় টের পেলুম বাতাসটা হঠাৎ থেমে গেছে।

বাতাস বলা আর উচিত হবে না। একে ঝড় বলাই ভাল। শরৎকালে এমন ক্ষণিক ঝড় ভারী অদ্ভুত বটে। বছরের এসময়টা ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিও হয় এবং তা একনাগাড়ে কয়েকদিন থাকে। কিন্তু এই আচমকা ঝড়ের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক মিনিট। তাছাড়া একফোঁটা বৃষ্টি নেই। আকাশ সারাদিন প্রায় নির্মেঘ ছিল। রাতেও তাই। আকাশভরা তারা ঝকমক করছে দেখছি। নীচের তলায় পৌঁছে মনে পড়ল, যাঃ চাবির গোছাটা আনতে ভুলে গেছি। মামাবাবু সব চাবির ডুপ্লিকেট দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, প্রতিদিন সব ঘর যেন রামলালকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিই। পরিচ্ছন্নতার বড় বাতিক ওর।

টর্চের আলো বসার ঘরের দরজায় পড়তেই চমকে উঠলুম। দরজা হাট করে খোলা। মরিয়া হয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। যা ভেবেছি তাই। ঘরের দেয়ালে প্রকাণ্ড সব বিদেশী পেন্টিং টাঙানো ছিল। দাদামশাইয়ের মস্ত একটা ছবি ছিল। মহাপুরুষদের ছবি ছিল খানকতক। একটাও দেওয়ালে আর নেই। মুখ থুবড়ে নীচে পড়ে খানখান হয়ে গেছে সব কাচ। ফ্রেম পর্যন্ত ভেঙ্গে গেছে।

আরও অদ্ভুত ব্যাপার, সারা ঘরে যেন হুলুস্থূল লড়াই করেছে কারা। সোফাগুলো উল্টে পড়েছে। ডিভানটা কাত হয়ে রয়েছে। বইয়ের দুটো আলমারি টানাটানি করে স্থানচ্যুত করেছে কারা।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি ব্যাপার দেখে। অবশ্য আঙুল টর্চের বোতাম থেকে সরে যেতেই অন্ধকারে ঘিরে ফেলল এবং তখন সচেতন হয়ে আবার বোতাম টিপলুম।

উজ্জ্বল একঝলক আলো কোণের দিকে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডে রক্ত ঝলকে উঠল। সারা শরীর হিম হয়ে গেল যেন, কোণের মেঝে ও দেয়ালে চাপচাপ টাটকা রক্ত জ্বলজ্বল করছে।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার বা ব্যাপারটা ভাল করে দেখার সাহস হল না। তক্ষুনি [illegible] কাঁপতে কাঁপতে এবং টলতে টলতে প্রায় দৌড়ে চললুম।

সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে টর্চটাও গেল বিগড়ে। চেঁচিয়ে উঠলাম। রামলাল। রামলাল।

রামলাল মোম হাতে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলল, কী হল দাদাবাবু?

ভাঙা গলায় অতিকষ্টে বললুম, নীচের ঘরে কাকে খুন করা হয়েছে।

রামলাল আশ্চর্য, ফিক করে হাসল। আগের ভঙ্গীতে বলল, ও কিছু না। হাওয়া-বাতাসের কাজ। চলে আসুন, দাদাবাবু।

সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক এবং ভয়ঙ্কর। কিন্তু সকালে দুরুদুরু বুকে নীচের সেই ঘরে গিয়ে আমি অবাক হয়ে দেখি, রাতের সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের এতটুকু চিহ্ন নেই কোথাও। কোথাও এক ফোঁটা রক্ত কেন, এতটুকু লাল দাগ পর্যন্ত নেই।

তাহলে কি ব্যাপারটা নিছক দুঃস্বপ্ন?

মোটেও না। একই স্বপ্ন দুজনে তো একসঙ্গে দেখা অসম্ভব। তাছাড়া রামলাল বলল, কর্তাবাবু বাড়ি না থাকলে এমনটা হয়। বাড়ির ছোট বড় সবাই তো জানে। তাই রাতের ঘটনা নিয়ে আমার মতো কেউ মাথা খারাপ করে না।

শরতের উজ্জ্বল রোদে বাড়ি এবং পরিবেশ কী সুন্দর আর নির্দোষ দেখাচ্ছিল। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল রাতের ঘটনাগুলো। হাওয়া নেই। কেমন একটা গুমোট ভাব। বিকেল অব্দি রামলালের সঙ্গে সেই বসার ঘরে ক্যারাম খেললুম। তারপর রোদ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি জেগে উঠল। রাত হলেই এই বাড়িটা জেগে উঠবে। তাকে জাগিয়ে তুলবে এসে এক অদ্ভুত ঝোড়ো হাওয়া। বড় অবিশ্বাস্য লাগে।

এরাতে শোবার সময় মনে মনে ঠিক করেছিলুম, যা কিছু ঘটুক, রামলালের মত নির্বিকার থাকব। রামলাল যথারীতি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করল। কিন্তু আমি জানি, ঘটনা শুরু হলে' সে জেগে যাবে, যথারীতি লোডশেডিং চলছে। বাইরে চারদিকে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। যেন মঞ্চের পর্দা ওঠার প্রতীক্ষায় স্থাবর জঙ্গম রুদ্ধশ্বাসে রয়েছে। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার বাগানের দিকে শনশন শব্দ শুনতে পেলুম। অমনি একটা জেদ এসে গেল। নীচের ঘরটাতে কাল রাতে যেন এক হত্যাকাণ্ডের শেষ দৃশ্যে উপস্থিত হয়েছিলুম। আজ গোড়া থেকে উপস্থিত থাকার ইচ্ছে পেয়ে বসল।

পাছে রামলাল বাধা দেয়, তাই টর্চ নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেলুম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ততক্ষণে সেই অদ্ভুত রহস্যময় ঝোড়ো বাতাস হুলুস্থুল করিয়েছে এসে। সিঁড়িতে পা রাখা দায়। ঝড়ের ধাক্কায় টাল খাচ্ছি শুধু।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমেই আলো ফেললুম বসার ঘরের দরজায়। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না, যা দেখলুম, ঘরের দরজাটা পুরনো এবং

প্রকাণ্ড। মচমচ খটাং খট শব্দে দুটো কপাট খুলে গেল। বাতাসটা শনশন করে ঢুকে গেল তক্ষুনি। ভেতরে তোলপাড় শুরু হল। একলাফে নেমে ঘরে ঢুকে পড়লুম। টর্চের আলোয় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভেসে উঠল পাতা চাপা ঘাসের মত ফ্যাকাসে বেঁটে একটা শরীর, মানুষেরই শরীর। পরনে প্যান্ট শার্ট আর মাথায় টুপিও যেন আছে, সে একটা ছবি টেনে নামাচ্ছিল। আমার দিকে ঘুরল। মুখটা যেন চীনাদের মতো। সেই মুহূর্তে টর্চটা বিগড়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলুম, রামলাল! রামলাল!

তারপর টের পেলুম অসম্ভব ঠাণ্ডা হিম দুই হাতে কেউ আমার গলা টিপে ধরেছে। জ্ঞান হারানোর মুহূর্তেও রামলালকে ডাকার চেষ্টা করেছিলুম ....। জ্ঞান হলে দেখি রামলালের বিষণ্ণ মুখ। সে আস্তে বলল, শরীর ঠিক হয়েছে তো দাদাবাবু?

প্রথমে ঘড়ি দেখে নিলুম, বারোটা পঁচিশ বাজে। ঘরে উজ্জ্বল আলো। বিদ্যুৎ এসে গেছে। শরীর খুব ক্লান্ত। গলায় সেই ঠাণ্ডা স্পর্শটা এখনও লেগে আছে। দুঃস্বপ্ন নয়, যা ঘটেছে, সবই সত্যি তাহলে।

ব্যাপারটা রামলালকে বলতে যাচ্ছিলুম, সে বাধা দিয়ে বলল, চুঁপসে নিঁদ কারন দাদাবাবু। বুঝলেন তো হাওয়া বাতাসের ব্যাপারটা কী। এবাড়ি কর্তামশাই কেনার পর প্রথম প্রথম আমি খুব লড়ার চেষ্টা করেছিলুম। পারিনি। তবে কর্তামশাইও এ বাড়িতে আর থাকতে চান না। বলে গেছেন, ফিরে এসে বেচে দেবেন।

বললুম, নীচের ঘরে একজন চীনা আমার গলা টিপে ধরেছিল।

রামলাল বলল, চীনা নয় দাদাবাবু, জাপানী, শুনেছি, ব্রিটিশ আমলে জাপানের সঙ্গে লড়াই বাঁধলে লোকটা নিজের পেটে ছোরা মেরে আত্মহত্যা করেছিল। এবাড়িটা ছিল তারই। তবে ব্রিটিশ সোলজাররা এসে লাশটা ওই বাঁশবনে ফেলে দিয়েছিল। তখনও নাকি ধড়ে প্রাণটা ছিল। এখনও রাত বিরেতে বাঁশবনে শুয়ে কাঁদে।

চমকে উঠে বললুম, তাহলে সেই রক্তই দেখেছি। হার কিরির রক্ত।

হাই তুলে রামলাল বলল, ছেড়ে দিন, আপনাকে বলেছিলুম দাদাবাবু, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, হাওয়া-বাতাস থেকে গা বাঁচিয়ে চললে কোন ক্ষতি হবে না! লড়তে গেলেই যত ঝামেলা! বুঝলেন তো?

বুঝলুম, জাপানী ভদ্রলোক হারাকিরি করে মারা গেছেন বটে, এখনও ব্রিটিশদের ওপর রাগটা মেটেনি। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, এদেশ ছেড়ে ব্রিটিশরা কতকাল আগে চলে গেছে। আমার বিশ্বাস সেটা বুঝলেই উনি স্বদেশে চলে যাবেন।

জীবন্ত পুতুল

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের মানুষের চোখে ঘুম নেই। একটা অজানা আশঙ্কায় তারা সবসময়ই কাঁপছে। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি, কখন যে কি হয় কিছুই বলা যায় না। সেদিনটা গোটাই কেটে গেছে ঝড়-বৃষ্টিতে, রাতও অনেক হয়েছে, সোমার কাকু তার ঘরে বসে লেখাপড়া করছে, হঠাৎই তার মনে হল, সোমা যেখানে পুতুল রাখে, সেখান থেকে কে যেন চলে গেল বারান্দার দিকে। চোখের ভুল মনে করে আবার পড়ায় মন দিল, কিন্তু তার মনে হল বারান্দার দিক থেকে বাড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল। সুতরাং দেখতেই হয়। পড়া ছেড়ে উঠে বারান্দায় গেল সোমার কাকু। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন ফিরে আসছে, তখন ওর নজরে এল নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে আসছে কয়েকটা মশালের আলো। খুব ভয় পেয়ে গেল সোমার কাকু। নিশ্চয় খান সেনারা টের পেয়েছে তাদের গ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা লুকিয়ে আছে। রাতের অন্ধকারে তাই তারা আসছে আক্রমণ করতে। মুহূর্তমাত্র আর দেরি না করে সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

খবরটা গ্রামময় রটে গেল। সবাই তৈরি হয়ে নিল আক্রমণকারীদের রুখতে। ঘরের চালে, বাড়ির বারান্দায়, গাছের ওপর উঠে সকলেই সেই মশালের আলোগুলিকে দেখে নিয়ে সংকেত দিল। কিন্তু আলোগুলি যেদিক দিয়ে আসছিল সেদিক দিয়ে আর না এগিয়ে পিছন দিকে দৌড় দিল। দেখে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বটে তবু তারা অপেক্ষা করতে লাগল। কারণ অনেকে ভাবল এটা ওদের কোন ফন্দি হতে পারে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, যে-যার ঘরে চলে গেল।

ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। বারান্দার দিকে জানালা দুটো খুলে দিয়ে, আলো নিভিয়ে শুতে যাবে ঠিক তখনি সোমার কাকু লক্ষ্য করল বারান্দায় নেমে কে যেন সোজা বাড়ির ভেতর চলে গেল। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে সোমার কাকু ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনল নদীর ধারে বেশ কিছু পোড়া মশাল আর দুটো লাশ পাওয়া গেছে, গলা টিপে তাদের মারা হয়েছে। সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে তারা কেউ নদীর ধারে যায়নি, খান সেনারাও আক্রমণ করেনি, তাহলে দুজন লোককে গলা টিপে মারল কে? প্রশ্নের

উত্তর খুঁজতে সারাদিন কেটে গেল।

সন্ধ্যে হতে না হতেই খবর এল আক্রমণকারীরা দলে আরও ভারী হয়ে আসছে দুজনের মৃত্যুর বদলা নিতে। আজ অন্য পথ দিয়ে তাদের আসার সম্ভাবনা বেশি। যে কোন সময়ে গ্রাম আক্রমণ করতে পারে। সমস্ত মানুষ শলাপরামর্শ করে মেয়েদেরও বঁটি, কাটারি নিয়ে তৈরি থাকতে বলল। পুরুষরা সড়কি, লাঠি, বল্লম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সারা রাত তারা পালা করে পাহারা দিল কিন্তু আক্রমণকারীদের পাত্তা নেই। দেখেশুনে গ্রামবাসীরা আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল কারণ তাদের কাছে সঠিক খবর ছিল যে, আজ একটা হেস্তনেস্ত হবেই। তবে কি ওরা অন্য ফন্দি আঁটছে।

রাত ফুরিয়ে সকাল হতেই জানা গেল বউদীঘির পাড়ে পাঁচ-ছটা লাশ পড়ে আছে সকলে যত না অবাক হল তার চেয়ে ভয় পেল আরও বেশি। এবার আর তাদের রক্ষে নেই। খবর আসতেও দেরি হল না। খান সেনারা দ্বিগুণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছে। ঠিক হল, সন্ধ্যের পরই, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদের গ্রাম থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গের হিলি সীমান্তে। সঙ্গে যাবে শক্তসমর্থ কিছু যুবক।

অমাবস্যার রাত। তাই জঙ্গলের মধ্যে, অন্ধকার আরও বেশি। এগিয়ে চলেছে শঙ্কিত ভয়ার্ত মানুষগুলি। ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসার জন্যে সকলেরই চোখে জল। সশস্ত্র পুরুষরা পেছনে ও আগে। এই জঙ্গলের পথটাকে আগেও দেখে গেছে তারা। সেই চিহ্নিত করা পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে ছোট্ট দলটা। মাঝে-মাঝে খুবই সন্তর্পণে টর্চের আলো ফেলে ওরা পথের নিশানা ঠিক করে নিচ্ছে। সোমা কিন্তু তার প্রিয় ডল পুতুলকে আনতে ভোলেনি। এই পুতুল সোমার প্রাণ। ওর প্রাণের বন্ধু সাকিলা জলে ডুবে মারা যাওয়ার পর থেকে এই পুতুলটাকে সোমা আঁকড়ে ধরেছে। এখন পুতুলই ওর বন্ধু। সেটা তার নিজের কাছে রেখেছে।

পথে ময়নাঘাটের শ্মশান, মিয়াবিবির কবর, জবাইদীঘি ও পুঁটেকালীর মন্দির পড়বে, আর এই মন্দির থেকে মাইল চারেক হাঁটতে পারলেই পশ্চিমবঙ্গের হিলি সীমান্ত। অনেকটা পথ পেরিয়ে প্রায় শ্মশানের কাছাকাছি পৌঁছে দলটা একটু বিশ্রাম নিতে বসল। সোমার কাকু, পুতুলটাকে মাটিতে তার পাশেই নামিয়ে রাখল। তারপর একটুর জন্য সে অন্যমনস্ক হতেই হঠাৎ তার মনে হল, গা ঘেঁষে কেউ যেন উঠে চলে গেল সামনের দিকে। আলো জ্বালার উপায় নেই, তাই সে বসে রইল। বিশ্রামের পরে আবার হাঁটার পালা। ওঠবার সময় কাকু পুতুলটাকে

নাতে গিয়ে দেখল সেটা নেই। এবার আলো জ্বালতেই হল, কিন্তু কোথাও পুতুলটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পুতুলের দুঃখে সোমা চিৎকার করে কাঁদতেও পারল না পাছে তার কান্না সীমান্তরক্ষীদের কানে যায়। তার মা সোমার মুখটা চেপে ধরে অনেক কষ্টে সামলিয়ে ও বুঝিয়ে সকলের সঙ্গে এগিয়ে চলল। সোমা তার মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সামনেই শ্মশান, জোনাকির আলোগুলি শুধু ছোটাছুটি করছে। হঠাৎই ওদের কানে এল বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে কারা যেন ওদেরই সঙ্গে হেঁটে চলেছে। ভয়ে সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাহলে কি সীমান্তরক্ষী বাহিনী ওদের আসা টের পেয়েছে! নিঝুম নিস্তব্ধ রাত, কোথাও আর কোন সাড়া নেই কিন্তু অতগুলি
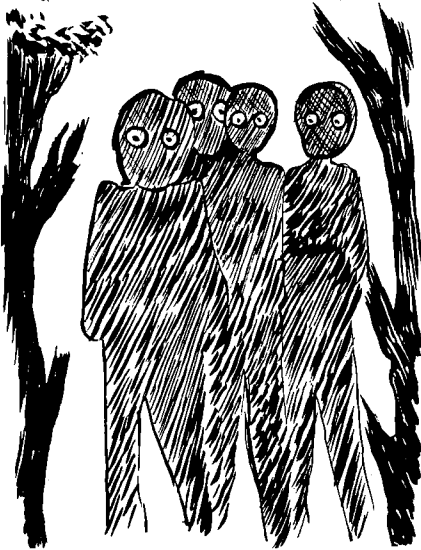
আলো তাদের সামনে এল কোথা থেকে! আলোগুলি যেন বাতাসে ভাসছে এবং নিভছে আর জ্বলছে। কর্কশ স্বরে একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। আলোগুলি কি কোন জন্তু-জানোয়ারের জ্বলন্ত

চোখ! আচমকা একটা অট্টহাসিতে সমস্ত জঙ্গলটা কেমন যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। ওদের মনে হল চারধারেই যেন অট্টহাসি আছড়ে পড়ছে। ছোট্ট দলটার কারও মধ্যে যেন প্রাণ নেই, এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা গ্রাস করেছে সবাইকে।

অন্ধকারের মধ্যে সেই আলোগুলি ক্রমশ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। সোমা তার মাকে আঁকড়ে ধরে মা বলে চিৎকার করে উঠতেই সোমার কাণ্ড মরিয়া হয়ে টর্চ জ্বেলে ফেলল। সবাই দেখল কতকগুলি ছায়ামূর্তি হাওয়ায় দোল খাচ্ছে আর তাদের চোখগুলি বীভৎসভাবে জ্বলছে। ভূত, প্রেত, দৈত্য কি দানব বোঝার উপায় নেই। ওরা এগিয়ে আসছে...চলৎশক্তিহীন কতকগুলি মানুষ চেয়ে আছে অসহায় চোখে...

হঠাৎ একটা মিষ্টি হাসির শব্দে সম্বিৎ ফিরলো সকলের। এ হাসির মধ্যে তো ভয়ের কোন লক্ষণ নেই, কে হাসছে এমন করে?

অদৃশ্য কারুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কোন ভয় নেই, এগিয়ে যাও। কতকগুলি প্রেতাত্মা কিছুতেই তোমাদের জীবন্ত রাখবে না বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু আমি তাদের আটকেছি। তোমরা এগিয়ে যাও।

এ-কি তবে ঈশ্বরের করুণা! সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরকে প্রণাম জানিয়ে আবার শুরু হল যাত্রা।

দলের সকলেই খুব ভয় পেয়ে গেছে। একমাত্র হীরু আর সোমার কাণ্ড ছাড়া। তারাই সাহস দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দলটাকে। নির্বিঘ্নে মিয়াবিবির কবরস্থান পেরিয়ে, জবাইদীঘির কাছে পৌঁছে কয়েক পা এগোতেই একটা দমকা হাওয়ায় ওরা ছিটকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। হাওয়াটা যেন ওদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। একটা চাপা আর্তনাদ এবং সেইসঙ্গে বাঁচাও—বাঁচাও বলে করুণ আবেদন আছড়ে পড়ল এদের চারপাশে। কেউ কোথাও নেই। গাছের পাতাও নড়ছে না। এ কী বিভীষিকা ঘিরে ফেলল আবার! তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার, তারপর আবার সেই মিষ্টি গলা, ভয় নেই এগিয়ে যাও। একদল খুনীর প্রেতাত্মা নিজেদের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল। তোমাদের দেখে ওরা ভেবেছিল তোমাদেরও নির্মমভাবে খুন করবে ওদের দলবৃদ্ধির জন্যে। আমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। ভয় নেই এগিয়ে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

দৈবশক্তির আশ্বাসে আবার শুরু হল এগিয়ে চলা।

পুঁটেকালীর মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই একদল শিয়াল চিৎকার করে ছুটে এল এদের দিকে। টর্চের আলো ফেলতেই কোথায় হারিয়ে গেল তারা। ঠাণ্ডা বরফের মতো হাওয়ায় সকলেরই ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠল। বারবার ভয় পেয়ে

এইবার কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে দলটা। আবার জ্বলে উঠল টর্চের আলো আর সেই আলোয় সবাই দেখল কয়েকটা ছায়া ছায়া কবন্ধ ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কেউ চীৎকারও করছে না বা অট্টহাসিও হাসছে না। শুধুমাত্র তাদের দিক থেকে ভেসে আসছে বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া। আবার সেই আগেকার হাসি এবং হঠাৎই সেই কবন্ধগুলি যেন ছুটতে লাগল। এরা বুঝল সেই দৈবশক্তির আগমন ঘটেছে।

ওরা আবার চলতে শুরু করল সীমান্তের দিকে।

মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সোমা বলে উঠল, মা, আমার সেই পুতুলটাকে আমরা কি আর ফিরে পাব না?

মা কিছু বলার আগেই কে যেন খুব কাছ থেকেই বলে উঠল, সাকিলাকে আর খুঁজে পাবে না।

সোমা বলল, সাকিলা, তুই কোথায় রে?

আমি তোদের সঙ্গেই আছি। নদীতে ডুবে গিয়ে মারা গিয়েছিলাম, নদীর ধারেই থাকতাম একদল প্রেতাত্মার সঙ্গে। একদিন দেখলাম তুই একটা পুতুল কিনে নদীর ধার দিয়ে তোর কাকুর সঙ্গে ফিরছিস। বুঝলাম মেলা থেকে পুতুলটা কিনেছিস। তোকে তো আমি খুব ভালবাসতাম তাই ইচ্ছে হল, তোর কাছে যাই, তোর কাছে থাকি। অন্য প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি সেই পুতুলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তোদের গ্রামে যতবারই আক্রমণ হবে জেনেছি, ততবারই আমি পুতুল থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে অন্য প্রেতাত্মাদের সঙ্গে নিয়ে আক্রমণকারীদের মেরেছি। নদীর ধারে বা দীঘির পাড়ে যারা মরেছে—আমরাই তাদের মেরেছিলাম। নইলে তোরা কেউ বাঁচতিস না। রাত শেষ হয়ে আসছে, তোরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যা, আমি এখন চলি।

দূরের সূর্যটা তখনও লাল আবীরের রং আকাশে ছড়ায়নি, পুঁটেকালীর মন্দির ছাড়িয়ে আরও চার মাইল পথ পেরিয়ে ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত দলটা দূরে হিলি সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়াটা দেখতে পেল। আনন্দে সবাই চিৎকার করে উঠল, আমরা পৌঁছে গেছি। ওইতো সামনে দেখা যাচ্ছে সীমান্ত, চল সবাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো।

গোটা দলটা সাকিলার ভালবাসার শক্তি নিয়ে হিলি সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় যখন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখল, তখন প্রিয় বান্ধবী ও প্রিয় পুতুলের শোকে কেঁদে উঠে সোমা মাকে জড়িয়ে ধরল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, দূর থেকে আরও দূরে হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রিয় পুতুলটা।

পর্যটক রহস্য

অজেয় রায়

গ্রাম থেকে বেরিয়ে দীপক যখন বাসরাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন শেষ বিকেল। স্টপেজে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেও কিন্তু বোলপুরগামী বাসের দর্শন মিলল না। দীপক অস্থির হয়ে উঠল। কি ব্যাপার?

রাত নেমে গেছে। বোলপুর শহর অন্তত মাইল পাঁচেক পথ। একজন সাইকেল চালিয়ে এল উল্টো দিক থেকে। ওই গ্রামের আর একটি লোকও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল বাস স্টপেজে। বোঝা যায় বোলপুরের দিকে যাবে। সাইকেল-আরোহী গ্রামের লোকটিকে চেঁচিয়ে বলল, 'কি কত্তা, বাসের অপেক্ষায়? দেখুন কখন আসে? আসবে কিনা তাই ঠিক নেই।'

'কেন কি হয়েছে?' গ্রামের লোকটি জিজ্ঞেস করে।

সাইকেল চালক গতি কমিয়ে জবাব দেয়, 'খুব গণ্ডগোল। শুনলেম, রাস্তা অবরোধ করছে নানুরে। অ্যাকসিডেন্ট করেছে বাস, ধাক্কা মেরেছে সাইকেলকে। বাস আটকে দিচ্ছে পাবলিক।' বলতে বলতে সে এগিয়ে যায় স্টপেজ ছাড়িয়ে।

'ধুত্তেরি। কাজটা মাটি হল। কাল যাব'— বকবক করতে করতে গাঁয়ের লোকটি ফিরে গেল।

রীতিমতো ভাবনায় পড়ল দীপক। সত্যি আর বাস না এলে কি করবে? এই অচেনা গ্রামে সে কোথায় রাত কাটাবে? নিরুপায় হয়ে আশ্রয় চাইলে এখানে যাহোক কিছু হয়তো মিলে যাবে কিন্তু নিজের বাড়িতে চিন্তা করবে খুব। আজই ফিরে আসবে বলে এসেছে। তার চেয়ে বরং হেঁটেই যাওয়া যাক। বেশি রাত হবার আগেই পৌঁছে যাবে বোলপুর। লম্বা হাঁটা অভ্যেস আছে তার সঙ্গে টর্চ নেই বটে। তবে পিচ রাস্তা। মেঘহীন আকাশে অজস্র তারা আর ফালি চাঁদের আবছা আলোয় চলতে অসুবিধা হবার কথা নয়। বাসের প্রতিক্ষায় আর না থেকে দীপক বোলপুরের উদ্দেশ্যে পা চালাল।

কিছুক্ষণ বাদেই দীপকের মনে হল যে সে ভুল করেছে। রাতটা ওই গ্রামে কাটিয়ে দিলেই ভাল হত।

চারপাশ কি ভীষণ নিঝুম, জনমানবহীন! পথের দু পাশে খোলা মাঠ। ধানক্ষেত। দুধারে অনেক গ্রাম আছে বটে কিন্তু বসতিগুলি বেশির ভাগই

বাসরাস্তা থেকে তফাতে। কিছু দূরের মাঠ-ঘাট গ্রাম সব রাতের আঁধারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পথের ধারে ধারে ঝাঁকড়া গাছগুলি যেন জমাট অন্ধকারের স্তূপ। কোথাও অলোর চিহ্ন নেই। নানান কীট-পতঙ্গের বিদঘুটে আওয়াজে গা ছমছম করে। এই পথে ইদানীং প্রায়ই ছিনতাই ডাকাতি হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় হাঁটা দেবার আগে মনে ছিল না দীপকের। এখন আপসোস হচ্ছে। সঙ্গে অবিশ্যি টাকাকড়ি আছে সামান্যই। তবে হাতঘড়ি আর ক্যামেরাটা মোটামুটি দামী। ওই গ্রামে একটা প্রাচীন বিশাল জমিদারবাড়ি আছে। দীপক গিয়েছিল সেই বাড়ি আর পরিবারের ইতিহাস জানতে। ভগ্নপ্রায় অট্টালিকাটির বর্তমান বাসিন্দাদের ইন্টারভিউ নিতে। কিছু ফোটো তুলতে বাড়িটার।

দীপকের চলার গতি কমে। রাস্তায় প্রচুর গর্ত। মেরামতি হয়নি বহুকাল। একবার হোঁচট খাবার পরেই সে সাবধান হয়ে যায়। এখন পা মচকালেই চিত্তির। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বোলপুর অবধি পৌঁছানো অসম্ভব। মাইলখানেক পেরিয়েছে দীপক। এতক্ষণ রাস্তায় একটিও লোকের দেখা মেলেনি। তিনটে ট্রাক শুধু পেরিয়ে গেছে—একটা নানুরের দিকে, আর দুটো উল্টো দিক থেকে। তীব্র হেডলাইট জ্বেলে গর্জন করতে করতে দৈত্যের মতন ছুটে গেছে পাশ দিয়ে।

চলতে চলতে একবার পিছনে তাকিয়ে চমকে ওঠে দীপক। একজন হেঁটে আসছে হাত কুড়ি-পঁচিশ তফাতে। বেশ লম্বা। বড় বড় পা ফেলে এগুচ্ছে। হঠাৎ কখন দীপকের পিছু নিয়েছে খেয়াল হয়নি তো! একেবারে নিঃশব্দ চরণ। যেন হাওয়ায় ভেসে আসছে।

দীপক দ্রুত চিন্তা করে। লোকটার মতলব কি? বদলোক নাকি? তক্কে তক্কে আছে। হয়তো সুযোগমতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাছে অস্ত্র আছে নিশ্চয়। পেছন থেকে আচমকা আক্রমণ করলে আত্মরক্ষা করা কঠিন। লোকটাকে এগিয়ে যেতে দিই। রাস্তার কিনারে সরে গিয়ে অল্প ঝুঁকে পায়ে হাত রাখে। তার সারা শরীর টানটান। বেগতিক বুঝলেই পাল্টা আঘাত হানবে।

পিছনের লোকটি হনহন করে এসে দীপকের কাছে থেমে যায়। মৃদু গলায় প্রশ্ন হয়, 'কি হল?'

সেই আবছায়ায় পিছু নেওয়া লোকটিকে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে দীপক জবাব দেয়, 'জুতোটায় লাগছে। বোধহয় কাঁকর ঢুকেছে।'

লোকটি বলল, 'শক্ত চামড়ার জুতো বুঝি? বেশি হাঁটতে রবারসোল, ক্যাম্বিসের জুতো ভাল। এই আমার মতন।'

ওর কথা শুনে আর-একটুক্ষণ দেখে নিয়ে লোকটি সম্বন্ধে দীপকের ধারণাটা

কিন্তু পাল্টে যায়। ভয় কেটে যায়। একে তো মোটেই ছিনতাইবাজ দুষ্টুলোক মনে হচ্ছে না। বরং তারই মতন এক ভদ্র যুবক। তারই বয়সী মনে হয়। পরনে ফুলপ্যান্ট-শার্ট। পিঠে ঝোলানো হ্যাভারস্যাক জাতীয় বড়সড় একটা ব্যাগ। কথার ভঙ্গি ও স্বর মার্জিত। যদ্দুর বোঝা গেল কাটা কাটা মুখ।

খানিক ভরসা পেয়ে দীপক খাড়া হয়ে সহজ সুরে বলে, 'বোলপুর যাব। বাসের অপেক্ষায় ছিলাম। আসছে না অনেকক্ষণ। পাবলিক নাকি বাস আটকাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে হাঁটা দিয়েছি। আপনি কদ্দুর?'

'আমিও বোলপুর।' জানায় যুবকটি।

'আমার মতো বাস পাননি বুঝি?'

যুবকটি বলল, 'নাঃ। আমি গাড়ি চড়ি না। হেঁটে ঘুরি।'

'এ্যাঁ, হেঁটে!' দীপক তাজ্জব, 'কোত্থেকে আসছেন?'

'লাভপুর।'

'হেঁটে হেঁটে?'

'হ্যাঁ।'

'উরি ব্বাস!'

চাপা হাসে যুবক। বোধহয় দীপকের বিস্ময় উপভোগ করে।

যুবকটির পোশাক, কাঁধের ব্যাগ, চলার ধরন, কথা ইত্যাদি বিচার করে একটা সম্ভাবনা চকিতে উদয় হয় দীপকের মনে। তবু নিশ্চিত হতে প্রশ্ন করে, 'আপনার বাড়ি বোলপুর?'

'না।'

'কোথায় তবে?'

'বজবজ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়।'

'বোলপুরে কদ্দিন থাকবেন?'

'থাকব না। আজ রাতে শুধু হল্ট করব।'

এবার অনুমানটা বলে ফেলে দীপক, 'আপনি কি পর্যটক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সবিনয়ে নিবেদন করে যুবক।

'বাঃ!'

এই নির্জন পথে এমন সঙ্গী পেলে খাসা হয়। দীপক যুবককে বলে, 'চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক গল্প করতে করতে। আপত্তি নেই তো?'

'না না। চলুন যাই। খুব ভাল লাগবে।' যুবকের কণ্ঠে খুশির ছোঁয়া।

দু কদম হেঁটেই দীপক বলল, 'আমি কিন্তু আপনার স্পিডে চলতে পারব না।

জুতোটা বাগড়া দিচ্ছে।' এবার ভণিতা নয়, সত্যি কথাই জানিয়েছিল দীপক।

'ঠিক আছে, আমি আপনার স্পিডেই হাঁটছি।' যুবক সানন্দে রাজী।

হালকা মনে চলতে চলতে দীপক প্রশ্ন করে, 'আপনি কত দেশ ঘুরেছেন?'

'অনেক। ইন্ডিয়ার সব রাজ্য। তাছাড়া গেছি শ্রীলঙ্কা, আফ্রিকা।'

'সমুদ্র পেরোলেন কি পায়ে হেঁটে?'

'না না', হেসে ফেলে যুবক, 'জল পেরিয়েছি জাহাজে-নৌকোয়। তবে ডাঙায় গাড়ি চড়িনি এ পর্যন্ত। পায়ে হেঁটেই ঘুরেছি।'

'আপনার নাম?' জানতে চায় দীপক।

'মানিকলাল মণ্ডল।'

নামটা দীপকের অচেনা। তা হতেই পারে। দীপক জানে এ জগতে কত বিচিত্র শখ, কত বিচিত্র পেশা, কত বিচিত্র গুণ আছে। তাদের ক'জনেরইবা নাম প্রচার হয় তেমন! অন্যেরা জানতেই পারে না তাদের গুণ, তাদের বিচিত্র সব পেশা বা নেশা। পারে জানতে, যদি তাদের নিয়ে প্রচার হয় খবরের কাগজে, পত্রপত্রিকায়, রেডিও, টিভিতে। তখন তাদের নাম ছড়ায়। কিন্তু বিচিত্র মানুষগুলির ক'জনের আর সে সৌভাগ্য ঘটে। হয়তো সারা জীবনই তারা অখ্যাত থেকে যায়। কখনো কখনো মৃত্যুর পরে তাদের কারও কারও বিষয়ে প্রচার হয় বটে। তখন তাদের নিয়ে হৈ-চৈ-ও হয়।

দীপক হাতজোড় করে বলে, 'নমস্কার। আমি দীপক রায়। বোলপুর শহর থেকে পাবলিশ্‌ড 'বঙ্গবার্তা' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার একজন রিপোর্টার।'

ও, রিপোর্টার। মানিকলাল উৎসুক ভাব দেখায়।

'আপনি কদ্দিন ধরে ঘুরছেন?' জানতে চায় দীপক।

'তা ছ'-সাত বছর। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে একা একা পায়ে হেঁটে মাস দুই ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। তখনই নেশাটা ধরে। তারপর থেকেই লম্বা লম্বা পাড়ি দিচ্ছি বারবার।'

'তা হয়েছে বৈকি।'

ঝট করে দীপকের মাথায় একটা আইডিয়া খেলে। পর্যটক মানিকলালের অভিজ্ঞতার ঝুলিটা যদি সত্যি সত্যি চমকপ্রদ হয় তাহলে বঙ্গবার্তায় ছাপা যায় ধারাবাহিকভাবে। কিছুদিন ধরে বঙ্গবার্তার সম্পাদক দীপককে খোঁচাচ্ছেন নতুন ধরনের কোন ইন্টারেস্টিং স্টোরির জন্যে। দেখা যাক—

দীপক বলল, 'আপনার ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা শোনাবেন একটা?'

মানিকলাল একটুক্ষণ চুপ। বুঝি স্মৃতি হাতড়ায়। তারপর শুরু করে—

'বছর চারেক আগে। গ্রীষ্মকাল। দুপুর বেলা। মধ্যপ্রদেশে একটা জঙ্গলের ধার ঘেঁষে চলেছি। একেবারে নিরালা পথ। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে চারটে লোক আমায় ঘিরে ধরল। বাপরে কি চেহারা তাদের। ইয়া লম্বা-চওড়া। ইয়া মোচ আর গালপাট্টা। বাবরি চুলের ওপর কারও টুপি, কারও পাগড়ি। ফুলপ্যান্ট-শার্ট পরা দুজনের গায়ে শার্টের ওপর হাতকাটা জ্যাকেট। সবারই পায়ে বুট জুতো। সবচেয়ে পিলে চমকানো ব্যাপার হল, প্রত্যেকের হাতে বন্দুক আর বুকে ঝুলছে কার্তুজের মালা। হিংস্র চোখগুলি যেন জ্বলছে।

'বুঝলাম যে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি। ওই বনে ডাকাতের আস্তানা আছে শুনেছিলাম। তা আমার থেকে নেবার মতো আছে কি? পকেটে তো মাত্র গোটা দশেক টাকা সম্বল। বেশি টাকাকড়ি নিয়ে আমি ঘুরি না কক্ষনো। যেখানে যাই নিজের পরিচয় দিয়ে আতিথ্য ভিক্ষা করি। আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনাই। তাতে খুশি হয়ে যেখানে যেমন খেতে দেয়, শুতে দেয়, মানে ফ্রি-তে, তাতেই সন্তুষ্ট। কোথাও দারুণ খানাপিনা, বিছানা জোটে। কোথাও হরিমটর খেয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ি, চাদর বা কম্বল মুড়ি দিয়ে, কোথাও লোকে দু-চার টাকা চাঁদা তুলে হাতে দেয় পথখরচা হিসেবে। সেই রকমই দশটা টাকা ছিল সঙ্গে। ক্যামেরা বা কোন দামী জিনিস রাখি না কাছে। রিস্টওয়াচটাও নেহাতই কমদামী। আর এই ব্যাগে থাকে অতি সাধারণ গামছা চাদর কম্বল ইত্যাদি তুচ্ছ কটা জিনিস। এসব নিলে ডাকাতদের খাটুনি পোষাবে না। আমারও তেমন গায়ে লাগবে না।

'তবে অন্য একটা কারণে ভয় পেলাম। এসব ডাকাত বড় নিষ্ঠুর। বেশি টাকাকড়ি বা দামী জিনিস না মিললে সেই রাগেই আমায় না খুন করে।

লোকগুলি ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ক্রমাগত প্রশ্ন করছিল। তাদের ভাষাটা হিন্দী কিন্তু সে হিন্দী ঠিক ধরতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টে বুঝলাম যে জিজ্ঞেস করছে আমি কে? কোথায় যাচ্ছি, কি উদ্দেশ্যে?

'দেশ থেকে বেরুনোর সময় আমার একটা ফোটোসুদ্ধ পরিচয়পত্র নিয়েছিলাম পুলিশের থেকে। সেটা সবসময় কাছে রাখি। আর একটা খাতা থাকে সঙ্গে। যেখানেই যাই সেখানকার কোন মাতব্বর লোক, উঁচুদরের সরকারি কর্মচারী বা পঞ্চায়েত প্রধানের কাছ থেকে দু-এক ছত্র লিখিয়ে নিই খাতাটায়, তাঁর সীল লাগিয়ে। যাতে প্রমাণ থাকে, আমি ওই সব জায়গায় সত্যি গিয়েছি।

'ব্যাগ থেকে সেই আইডেন্টিটি কার্ড আর খাতাখানা বের করে ডাকাতদের হাতে দিলাম। তারা আমার ছবি মেলাল। গম্ভীর বদনে খাতাটা উল্টেপাল্টে

লেখা। ভাব দেখে মনে হল যে তারা পড়তে জানে না। খাতায় নানা ভাষায় লেখা। তবে হিন্দী আর ইংরেজিতেই বেশি।

'এরপর এক ডাকাত খপ করে পেছন থেকে আমার কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরল। অন্যরা মোটা কাপড় দিয়ে আমার চোখ বাঁধল। দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধল। তারপর হেঁচকা টানে আমায় মাটি থেকে সটান তুলে কাঁধে ফেলল। একজন আমার পায়ের দিকে আর একজন আমার মাথার দিকে বয়ে নিয়ে হনহন করে হাঁটা দিল।

অমনি অনেকক্ষণ চলে এক জায়গায় আমায় নামাল। দাঁড় করিয়ে চোখ খুলে দিল। চারপাশে চেয়ে আমি অবাক!

বনের ভেতর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে পাঁচটা তাঁবু পড়েছে। অন্তত জনা পঞ্চাশ লোক রয়েছে সেখানে। বেশির ভাগই পুরুষ, তবে তিন-চারজন এই পঁচিশ-তিরিশ বয়েসের মেয়েকেও দেখলাম। দুটো ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউ নেই।

পুরুষগুলির চেহারা সাংঘাতিক। অনেকের পিঠেই বন্দুক ঝুলছে। কিছু গরু-ভেড়াও রয়েছে আশেপাশে।

'পা খুলে দিয়ে চার ডাকাত আমায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল এক জবরদস্ত দেখতে মাঝবয়সী লোকের সামনে। মনে হল সে সর্দার। একটা পাথরের ওপর বসেছিল সে। দলের লোকদের কাছে আমার কথা শুনে সর্দার লালচে চোখে আমার আপাদমস্তক নজর করে আমার আইডেন্টিটি কার্ড আর খাতাখানা খুঁটিয়ে দেখল। মনে হল লোকটি পড়তে পারে। এরপর সে আমায় একগাদা প্রশ্ন করল কর্কশ মোটা গলায়—কোথায় বাড়ি? কেন এসেছি এ তল্লাটে? এই সব। ওরা আমায় পুলিশের গুপ্তচর ঠাউরেছিল। যাহোক আমার জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে সর্দারের মুখ প্রসন্ন হল। সে গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে তারিফ জানাল, 'হাঁ, তুমহারা বাত তো সাচ্চা মালুম হোতা। স্রিফ পায়দলসে দেশ ঘুমনা, আজিব শখ! ঠিক হ্যায়, আজ ইঁহা থোড়া আরাম করো।'

'এরপর ডাকাতদের কাছে যা আতিথ্য জুটল না, দারুণ। রাতে খেতে দিল গরম গরম চাপাটি ডাল সব্জি দুধ। ঘিরে বসে অনেকে আমার দেশ ভ্রমণের গল্প শুনল। সর্দারের আগ্রহটাই ছিল বেশি। মাটিতে খোলা আকাশের নীচেই বেশির ভাগ লোক চাদর পেতে শুয়ে পড়ল। আমিও তেমনি ঘুমালাম। পরদিন সকালে চোখ বেঁধে, কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে ওরা আমায় আবার রেখে এল বনের বাইরে। বিদায় নেবার আগে সর্দার আমায় সাবধান করে দিল, খবরদার যেন পুলিশকে

এই গোপন ডেরার হদিস না দিই। বেইমানি করলে, তার লোক যেখানেই থাকি গিয়ে আমায় খতম করে আসবে। ওই পথে আর যাওয়া হয়নি।'

মানিকলালের গল্প শেষ হয়।

'বাঃ গ্রান্ড!' দীপক মুগ্ধ। এরকম গল্প কয়েকটা ছাপালে বঙ্গবার্তার কাটতি বাড়বে, মানিকলালও বিখ্যাত হয়ে যাবে। সে জিজ্ঞেস করে, 'এরকম অভিজ্ঞতা আরও হয়েছে?'

'তা হয়েছে।'

'লিখে ফেলুন।'

'লিখেছি কিছু' জানায় মানিকলাল, 'এক খাতা ভর্তি। তবে আরও ঢের আছে এমনি ঘটনা।'

'সেগুলিও লিখে ফেলুন।'

'ইচ্ছে তো হয়, হচ্ছে না।'

'কেন?'

'সুস্থির হয়ে বসতেই পারি না যে।'

'কেন?'

'এই ঘোরার নেশায়।'

পিছনে অনেক দূরে একটা গাড়ির জ্বলন্ত হেডলাইট দেখা যায়।। দীপক নজর করে বলে, 'বাস মনে হচ্ছে। যদি প্যাসেঞ্জার নেয় আমি উঠে পড়ব। পায়ে লাগছে। আর হেঁটে পৌঁছতে বড্ড দেরি হবে। বাড়িতে ভাববে। কিছু মনে করবেন না। এই গ্রামটার মুখে একটু দাঁড়াই। এটাই স্টপেজ।'

'ঠিক আছে, চলে যান বাসে। আমার ধর্ম তো হন্টন।' মানিকলালের সরস কণ্ঠ শুনে দীপক নিশ্চিন্ত হয় যে ও কিছু মনে করবে না ফেলে গেলে।

বাসরাস্তার খানিক তফাতে মস্ত গ্রামটা তখন একেবারে নিঝুম, অন্ধকারে লেপা। রাস্তার গায়ে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। তার ঝাঁপ পড়ে গেছে বটে কিন্তু ভিতরে মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে দরমার ফাঁক দিয়ে। হয় দোকানী একাই কোন কাজ করছে অথবা তাসের আসর বসেছে।

দীপক চটপট কাজের কথা সারে। মানিকলালকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা যেটুকু লিখেছেন সেই খাতাটা কোথায়?'

'বোলপুর শহরে আছে।'

'বোলপুরে!'

'হ্যাঁ, মডার্ন প্রেসে। রেলব্রিজের কাছে। লেখাগুলি বই করে ছাপালে কেমন

খরচ লাগবে হিসেব করতে গিয়েছিলাম। আর ফেরত নেওয়া হয়নি।'

'তা লেখাটা দিন না আমায়। বঙ্গবার্তায় ছাপব কয়েক সংখ্যায়। তারপর বই করতে পারেন। কী, রাজী আছেন?'

'পত্রিকায় ছাপা হবে? এ তো খুব ভাল কথা। অনেকে পড়বে, জানবে আমার এক্সপিরিয়েন্স। তাই তো ইচ্ছে। চেনাশুনা তো নেই। ভাবতাম কে বা ছাপবে? আপনি অফার করছেন—এ আমার সৌভাগ্য।' মানিকলাল রীতিমতো উৎফুল্ল।

বুদ্ধিটা লেগেছে; তাই মহাখুশি দীপক বলল, 'তাহলে কাল প্রেস থেকে খাতাটা নিয়ে নিন। আপনি কোথায় উঠেছেন? যাব দেখা করতে। তখন নেব লেখাটা।'

মানিকলাল বিব্রতভাবে বলল, 'সরি। বলেছি তো কাল খুব ভোরে বোলপুর ছাড়ছি। খাতা নেবার সময় পাব না। ও খাতা আপনি মডার্ন প্রেস থেকে নিয়ে নেবেন।'

'আমায় দেবে কেন?'

'দেবে, দেবে। আমার নাম করে চাইলেই দেবে। পড়ে দেখুন। পছন্দ হলে ছাপুন। সত্যি কৃতজ্ঞ হব।'

বাসটা কাছে এসে গেছে। দীপক হাত তুলল বাস থামাতে। হেডলাইটের আলোয় মানিকলালকেও ভাল করে দেখে নিল। তারপর মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রাতে থাকছেন কোথায়?'

উত্তর হল, 'ঠিক নেই। আমার ভরসা করবেন না।'

হুড়মুড় করে এসে বাসটা থামল।

কন্ডাকটার চেঁচাল, 'বোলপুর।'

বাসের পাদানিতে উঠে দীপক ফের কথা কইবার চেষ্টায় ঝুঁকে দেখে যে মানিকলাল হনহন করে এগোচ্ছে। সে একবারও মুখ ঘোরায় না বাসের দিকে।

চলন্ত বাসের সিটে বসে দীপক বেজায় ধন্দে পড়ে। মানিকলাল যেন জোর করে এড়িয়ে গেল তাকে! খাতাটার ব্যাপারে যেন কি রহস্য লুকিয়ে আছে। ওর রাতের আস্তানা জানাতে এত আপত্তি কিসের! আর মোটে দেখা করতে চাইছে নাই বা কেন?

পরদিন সকালে মডার্ন প্রেস খুলতেই দীপক হাজির। ছাপাখানার মালিক দীপকের পূর্বপরিচিত। মানিকলালের খাতা চাইতেই প্রেসমালিক রেগে বললেন, 'নিয়ে যান মশাই খাতা। দু বছর হল দিয়ে গেছে আর পাত্তাই নেই। আচ্ছা লোক। এরপর হারিয়ে যাবে। একটা আলাদা কাগজে বই ছাপার খরচ এস্টিমেট করে

রেখেছি। খাতার ভেতর আছে, দিয়ে দেবেন তাকে। তবে বলবেন যে, এই দু বছরে আরও ফিফটিন পারসেন্ট মতো খরচা বেড়ে গেছে।'

মানিকলালের খাতাখানা নিয়ে বিকেলবেলা দীপক বঙ্গবার্তা অফিসে হাজির হল। বঙ্গবার্তার সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি তখন নিজের কুঠুরিতে বসে প্রুফ দেখছিলেন। দীপক কামরায় ঢুকতে আড়চোখে চেয়ে নিজের কাজে মন দিলেন।

দীপক সামনের চেয়ারে বসে একবার গলাখাঁকারি দিয়ে কথা শুরু করল, 'একটা খাতা পেয়েছি, একজন বাঙালী পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত। পায়ে হেঁটে ঘুরেছে গোটা ইন্ডিয়া। আফ্রিকা-সিলোনেও গেছে। দারুণ সব অভিজ্ঞতা। বঙ্গবার্তায় ছাপালে বেশ হয়। তারও খুব ইচ্ছে ছাপানো।

'লেকিন—'

'কি?' প্রুফ থেকে নজর না তুলেই প্রশ্ন করেন সম্পাদক।

'মানে কেস থোড়া গড়বড় লাগতা।'

'কেন?' একইভাবে বলেন। কুঞ্জবিহারী।

'মানে লেখাগুলি সত্যি এক্সপিরিয়েন্স না বানানো গপ্পো? মায় পর্যটকটি স্বয়ং আসল না মেকি? বড্ড অল্পক্ষণের আলাপে ঠিক যাচাই করার সুযোগ পাইনি। শেষে কেমন এড়িয়ে গেল। ওর পরিচয়পত্র দেখাল না। বোলপুরের ঠিকানাও চেপে গেল। যদিও লেখাটা ছাপাতে খুব আগ্রহ।'

'কি নাম পর্যটকটির?' মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে জানতে চান সম্পাদক।

'মানিকলাল মন্ডল। বাড়ি বজবজ।'

'এ্যাঁ! মানিকলাল মণ্ডল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কুঞ্জবিহারী খাড়া হয়ে বসেন। তাঁর ছাঁটা গোঁফ ফুলে উঠেছে। মুখ থমথমে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'ওর সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল?'

'কাল সন্ধ্যায়। মানে তখন প্রায় রাত হয়ে গেছে।'

'কথা হল?'

'হ্যাঁ।'

'দেখতে কেমন?'

কুঞ্জবিহারীর হাবভাবে এক গোপন রহস্যের আঁচ পায় দীপক। বলে, 'বেশ লম্বা। আমার চেয়েও। ছিপছিপে। রং ফর্সা। বয়স বছর তিরিশ। মুখ কাটা কাটা সুশ্রী। চোখা নাক। শার্ট-প্যান্ট পরেছিল।',

কুঞ্জবিহারী গোল গোল রক্তাভ চোখে একটুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে

ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'মানিকলাল মণ্ডল মেকি নয়, সাচ্চা পর্যটক। ও বছর দুই আগে একবার বঙ্গবার্তা অফিসে এসেছিল। আমি নিজের চোখে ওর পরিচয়পত্র এবং নানা দেশ ঘোরার রেকর্ড দেখেছি। কিন্-তু—'

কুঞ্জবিহারী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পাশের তাকে রাখা পুরনো বঙ্গবার্তার বাঁধানো ফাইল একটার পর একটা টেবিলে নামিয়ে পাতা উল্টিয়ে কি জানি খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ গর্জন ছাড়লেন, 'এই দেখ।' একটা খোলাপাতা তিনি এগিয়ে দেন দীপকের সামনে।

দীপক পড়ল, প্রায় দু বছর আগেকার বঙ্গবার্তার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটা নিউজ হেডলাইন—দুর্ঘটনায় পর্যটক মৃত। এরপর পাঁচ-ছয় লাইন। সংবাদটির সারমর্ম হচ্ছে—গত বুধবার দুপুরে ঝড়বৃষ্টির পর দুর্গাপুরের কাছাকাছি পিচরাস্তার ধারে ফাঁকা মাঠে তরুণ বাঙালী পর্যটক মানিকলাল মণ্ডলের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঝলসানো দেহ দেখে মনে হয় যে বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটেছে। তিনি পায়ে হেঁটে বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। আপাতত বোলপুর থেকে বর্ধমান যাচ্ছিলেন।

খবরটা পড়ে দীপক খানিকক্ষণ থ হয়ে থেকে বলল, 'এ নিউজটা তো আমি আগে দেখিনি!'

'কারণ তখন তুমি ছুটিতে ছিলে। দিল্লী গেছলে বেড়াতে।' জানালেন কুঞ্জবিহারী। তারপর তিনি বারকয়েক চোখ পিটপিট করে নির্বিকার কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'বলছ, ওর ভ্রমণকাহিনীগুলি বেশ ইন্টারেস্টিং?'

'হ্যাঁ।' দীপক কেমন ঘোরের মধ্যে ঘাড় নাড়ে।

'গুড। তাহলে ছাপা যাবে, 'বললেন সম্পাদক, 'ওর বাড়ির একটা পারমিশন দরকার। সে আনিয়ে নেব। আমার কাছে ওর ঠিকানা আছে। তুমি লেখাগুলি এডিট করে দিও। বেচারির একান্ত ইচ্ছেটা পূরণ হোক।'

লালকুঠিতে ডাক্তারবাবু

মহাশ্বেতা দেবী

লালকুঠি বাড়িটা যখন তৈরি হয়েছিল, তার চারিদিকে ছিল খোলামেলা জমি। তবে রাঁচিতেও এখন জমির দাম যথেষ্ট। লালকুঠির বাড়িটা এক সময়ে বাইশ বিঘা বাগানের মধ্যে শোভা পেত। রাঁচির পেয়ারা, লিচু, আম থেকে একশো রকম ফুলের গাছ ছিল।

এখন লালকুঠির জমি আর বাড়ি এক বিঘা জমিতে। বাবুরা সব বেচে দিয়েছেন। বাড়িও বিক্রি হব হব। কলকাতার ডাক্তারবাবু এ বাড়িতে প্রসূতিসদন করবেন। এ বাড়ি পোড়ো বাড়ি, এ বাড়ি ভূতের বাড়ি। কোন কথাই তিনি শুনতে রাজি নন।

বেজায় নাস্তিক এই ডাক্তারবাবু ভূত প্রেত দেবতা দানব, কিছু মানেন না। ভূতের কথা শুনে বলেছেন, ভূতগুলোকে চাকরি দেব, খাটিয়ে নেব, ভূত থাকা তো ভালই।

বাড়ির দুই কেয়ারটেকার বাহাদুর আর গোপাল এ সব শুনে মনে বেজায় দাগা পেল। কালে কালে হল কি? সবাই জানে রাত একটা বাজলে বড়বাবু ছবির ফ্রেম ছেড়ে নেমে আসেন। স্টাফ করা পেয়ারের কুকুরটা লাফিয়ে ওঠে। কুকুর নিয়ে উনি বাগানে বেড়ান।

সবাই জানে। বাহাদুর আর গোপাল স্বচক্ষে দেখেনি, তবু জানে। সন্ধের পর ওরা দোতলায় ওঠেই না। দুজনেই দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকে। ভূত আছে এটা জানাই যথেষ্ট, ভূতকে স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছে ওদের নেই।

বড়বাবুর নাতি কলকাতা থেকে এসে বলে গেল, যত সব বাজে কথা! তাতেই খদ্দের জোটে না। তোমাদের ব্যবস্থা তো করেই দিয়েছি। ডুরাণ্ডাতে বাড়ি। টাকাও পাবে আজীবন।

—সে তো তোমার বাবার ব্যবস্থা।

—ওই হল। তিনবার খদ্দের ভেগে গেছে। এবার যেন ডাক্তারকে ভয় দেখিও না। বেশি বদনাম হলে বাড়ি বিক্রি হবে না। তখন আমি করব কি?

—মা বলছেন বাড়ি বিক্রি কর?

—মা? তিনি তো বলছেন ঠাকুরদার নামে কোন ভাল কাজে বাড়ি দান করে দে। বললেই হল? জমি বেচেছি, বাড়ি বেচব, স-ব বেচে দেব।

বাহাদুর কি বলবে? বাড়ির গালিচা, আসবাব সবই তো বিক্রি করেছে নাতিবাবু। ওপরে দুটো শোবার ঘর সাজান আছে। কখনো সখনো এলে ওরা থাকে। নীচে বসার ঘরে অবশ্য সব সাজান। বড়বাবু বাঁচলে একশো ষাট বয়স হত। মারা গেছেন সেও আশি বছর বয়সে। দোতলায় ছবি রাখলে মাঝরাতে ছবি থেকে নামো, সিঁড়ি ভেঙে একতলায় এসো, অত কি পারা যায়?

মানুষটাও ছিলেন বেজায় বিলাসী। পালকের লেপ, পালকের বালিশ, হাতির দাঁতের কাজ করা পালঙ্ক, এ সব ছাড়া চলত না। বাহাদুরের এ বাড়িতে তিন পুরুষ হয়ে গেল। ওর ঠাকুরদা বলত, বড়বাবু সায়েবদের নিয়ে শিকারে যেত। মাঝে মাঝে বাড়িতে জলসা হত। রাঁচিতে কত জঙ্গলমহল ছিল, কত জমিদার।

রাঁচির এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেত না। আশ্চর্য কি যে এখনো তাঁর আত্মা এ বাড়িতেই আছে!

বড়বাবুর ছেলেই জঙ্গলমহল জমিদারি সব বেচে দিয়ে কলকাতা চলে গেল। নাতি বেচে দিল বাড়ির যত জিনিসপত্র। তবে বাড়ি বেচতে পারেনি।

প্রথম যে জন কিনতে এল, সে যে কি দেখেছিল, কি হয়েছিল, তা বলতেই পারেনি। 'সব উলটা পালটা হে!' এ কথা বলতে বলতেই বেচারা অজ্ঞান হয়ে যায়।

শেষবার যে এল, সে অযথা ভয় পেল। তার বাথরুমের দরজার সামনে নাকি স্টাফ করা কালো বুল ডগটা বসেছিল।

তাতেই ভয় পেয়ে ....

বাহাদুর নাতিবাবুকে বলল, বড়বাবুর এ বাড়ির ওপর খুব টান ছিল। সে চায় না বাড়ি বিক্রি হোক।

নাতিবাবু বলল, বটে? বাড়ি আমি বিক্রি করবই। বড়বাবুর ভূত কি করে তা দেখে নেব। বাড়ি কিনবে এক ডাক্তার। সে ডাক্তার ভূতপ্রেত মানে না।

ডাক্তার নিজেই এসে হাজির হল। নিজেই বলল, ভূত আবার কি? আমার নাম ভূতনাথ। বুঝলে? ভূত দেখলেই ধরব। আর মাইনে দিয়ে চাকর রাখব।

ছি ছি বাবু! বড়বাবুর নামে অমন কথা বলবেন না। তিনি কুড়িটা চাকর রাখতেন, মালী, দরোয়ান, সহিস, ড্রাইভার, রাজার মতো লোক ছিলেন।

—"ছিলেন, এখন তো নেই।"

—সবাই বলে রাতে তিনি ......

—রাতে বুঝি ভয় দেখান?

হো হো করে হাসলেন ডাক্তারবাবু। বললেন, রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোই। বড়বাবু আমার ঘুম ভাঙাতেও পারবেন না। আরে, একবার পাটনায় ঘরে

বন্যার জল ঢুকে গেল। চৌকি ভাসতে লাগল। আমার নাকটা ঘরের ছাতে ঠেকতে তবে না ঘুম ভাঙল। আমি হলাম নিদ্রাবীর।

—চলুন বাবু, কোন্ ঘরে থাকবেন দেখুন।

—যে কোন ঘরে।

—দুটো ঘরে তো শোবার ব্যবস্থা আছে শুধু। অন্য সব ঘর তো খালি।

গোপাল বলল, চা জলখাবার?

—না না, আমি স্টেশন থেকে খেয়ে এসেছি। নাও, টাকা রাখ। দিনে টাটকা মাছ আর ভাত। রাতে কচি মুরগির পাতলা ঝোল আর তিনটে রুটি।

—আগে বাড়িটা দেখি। ছয় লাখ টাকা খরচ করব। বাড়িটা দেখব না? ঘর কখানা?

গোপাল বেজায় চেঁচায়। সে বলল, আজ্ঞে এদিকে কুড়িটা ঘর। আটটা বাথরুম, দশটা বারান্দা, দোতলা মিলিয়ে। পেছনে রান্না বাড়ি, ভাঁড়ার বাড়ি, চাকরদের ঘর, সে ষোলটা। উঠোন, বাথরুম, সাতটা কুয়ো, জলের পাম্প ....

ডাক্তারবাবুর চোখ স্বপ্ন হয়ে গেল।

কুড়িটা ঘর ষাটটা ঘর হয়ে যাবে। পেছনে হবে স্টাফের কোয়ার্টার ওঃ! স্বপ্ন! স্বপ্ন! ভাল কথা, তোমরা কোথায় থাক?

—আমরা নীচে থাকি বাবু।

—বড়বাবুর ভূত আসে না?

বাহাদুর একটু হেসে বলল, বড়বাবু তো জানে যে আমরাই বাড়িটা দেখেশুনে রেখেছি। আমাদের ভয় দেখাবে কেন? আমরা হলাম পুরনো লোক!

ডাক্তারবাবু সে সব শুনলেন না। বললেন, এত চওড়া বারান্দা, এত চওড়া প্যাসেজ, সিঁড়ির নীচে এত জায়গা, তখনকার লোকের কোন বুদ্ধি ছিল না। এত জায়গা নষ্ট করে?

—বাবু কি হাসপাতাল বানাবেন।

—নার্সিংহোম হে! বাড়ির চেহারা পালটে যাবে। সামনের গাছগুলো কেটে ফেলব। দুটো অ্যামবুলেনস, গাড়ি, বড় গ্যারেজ চাই।

—ওগুলো মেহগনি গাছ বাবু।

—জানি জানি। গাছের খদ্দেরও ঠিক করেছি। গাছের দাম থেকেই অনেক খরচ উঠে আসবে।

বাহাদুর বোবা হয়ে গেল।

—চল, ওপরটা দেখি।

মাঝে চওড়া প্যাসেজ, এ দিকে পাঁচটা ওদিকে পাঁচটা ঘর। সব ঘরই খালি পড়ে আছে। শুধু সবচেয়ে সামনে উত্তরের আর দক্ষিণের ঘর দুটো সাজান গোছান।

—উত্তরের ঘরটায় বড়বাবু ঘুমোতেন।

—হ্যাঁ ...... নীল পর্দা, নীল গালচে, নীল বেডকভার, বুড়োর সখ ছিল খুব।

—হ্যাঁ বাবু ..... খুব সখ ছিল।

—ঘর নয় তো হল ঘর।

—ও ঘরটা দেখবেন?

দাঁড়াও, জানলাগুলো খোল। এ হে হে, প্রতি ঘরের সঙ্গে গোল বারান্দা, কি জায়গা নষ্ট! পাশে ওগুলো কি অ্যাঁ? বদখত বাড়িগুলো?

—রোহতগীদের মোটর গ্যারেজ, আটতলা বাড়িটা এক ডাক্তারের, ওটা একটা প্রাথমিক স্কুল।

—যাকগে, চোখ খুলতেই এসব দেখতে হবে। চল তো অন্য ঘরটা দেখি।

দক্ষিণের ঘরটা ঠিক এক রকম। তবে এ ঘরে সবই গোলাপী। পর্দা, গালচে, বিছানার ঢাকা।

জানলা খুলতে সামনে মোষের খাটাল। তারপরে একটা যোগব্যায়াম বিদ্যালয়। আরেকটা মোটর গ্যারেজ।

—না না, বড়বাবুর ঘরেই শোব। তা, এদিকটা এমন সাজিয়ে রেখেছ?

—মালিকেরা এলে এ দুটো ঘরেই থাকেন।

—বাপ রে, গোলাপী বাথটব, নীল বাথটব।

—বড়বাবুর সখ ছিল খুব।

—যাক, আমি একটু ঘুরে আসি। উকিলের বাড়ি যাব। তারপর .... মোমবাতি আছে তো?

—কেরোসিনের ল্যাম্প দেব।

—লোডশেডিং খুব?

—তা হয়।

—নাও, কেরোসিনের টাকা নাও। ঠাণ্ডা-জলে স্নান করা যাবে তো?

—বলেন তো গরম জল দেব।

—না না, তেমন ঠান্ডা পড়েনি। এ কি, বারান্দায় তুলসি গাছের টব রাখল কে?

—গিন্নি মা তো আসেন মাঝে মাঝে। উনি গাছে জল দেন, বারান্দায় বসেন।

—জানি জানি। তিনি তো বাড়ি বেচতেই দেবেন না। শুধু বলেন দান করে দে, দান করে দে।

বাহাদুর দেখতে থাকল, বড়বাবুর সখের সোফায় ডাক্তারবাবু তাঁর ব্যাগ রাখলেন, জুতোর ধুলো মুছলেন গালচেয়, খাটের ছত্রীতে টাঙালেন গামছা আর লুঙ্গি। তারপর দেয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, এ ঘরে শিবের ছবি, ও ঘরে কালীর ছবি, ও সব কি? কে রেখেছে?

—পুরনো দিন থেকেই আছে।

—বটে! বড়বাবু খুব ভক্ত ছিলেন!

—তাই হবে বাবু।

—স-ব চলে যাবে। এই ঘর দুটো হবে আমার কোয়ার্টার। ভাবছ কি? দশটা ডাক্তার, তিরিশটা নার্স, একেবারে বাজার বসিয়ে দেব।

—খাওয়ার জল দিয়ে যাই?

—দাও, দাও।

ডাক্তারবাবু মহা খুশি। ছেলে দুবাই থেকে টাকা পাঠাচ্ছে, নার্সিংহোম এখন একটা ব্যবসা। রাঁচির এক বড় ডাক্তার ওর বেয়াই। তাঁর পরামর্শেই .....

বাড়ির বর্তমান মালিক খুবই রাজি। তবে তার মা হলেন বেয়াড়া মহিলা। তিনি সমানে বলে যাচ্ছেন, খোকা! বারবার চেষ্টা করে দেখলে, বাড়ি বিক্রি হল না। তোমার বাবা বলেছিলেন, ও বাড়ি বিক্রি হবে না। ডাক্তার মহেশ্বর লাল ওখানে বসে আছেন। তাঁকে সামনে রেখে লালকুঠিকে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করে দাও। এবার যদি বাড়ি বিক্রি না হয়, তোমাকে তাই করতে হবে।

ডাক্তারবাবু আনন্দে হাসেন। এবার বাড়ি বিক্রি হবেই। দাতব্য চিকিৎসালয়! না কি পলিক্লিনিক হবে।

তিনি চান ব্যবসা। নার্সিংহোমের একদিকে প্রসূতিসদন, একদিকে রীতিমতো নার্সিংহোম। লাখ লাখ টাকা আসবে। অসম্ভব বড়লোক হতে হবে। এ বাড়িটা পেলে .....

মাছের ঝোল রাঁধতে রাঁধতে গোপাল বলল, এবার কি করবে দাদা?

—মা যেমন বলেছেন, তেমনি করব।

—এ লোক ভয় খাবে না।

—তবে বাড়ি বিক্রি হবেই হবে।

—না হলে ....

—মা বলেছেন ডুরাণ্ডায় থাকবি। গরু কেনার টাকা দেব। দুজনে দুধ বেচবি।

—সে আর কপালে নেই।

ডাক্তারবাবু আরাম করে স্নান করলেন। মাছের ঝোল ভাত খেয়ে বড়বাবুর

বিছানায় গড়ালেন।

বিকেলে চা খাবার সময় দেখলেন বেড়ালটা। চিনেমাটির একটা হতকুচ্ছিত বেড়াল টেবিলে।

—এটা কোত্থেকে এল?

বাহাদুর এক গাল হেসে বলল, বরাবরই আছে। কেন, ওর জোড়া কালো বেড়ালটা ও ঘরে দেখেননি? গিন্নিমা চিনেমাটির কত বেড়াল, গরু, বাঁদর ...

—কই, চল তো দেখে আসি।

গোলাপী ঘরের টেবিলে কালো বেড়াল, নীল ঘরে সাদা বেড়াল। সব ফেলে দেবেন ডাক্তারবাবু।

—ঘরে আলো ঠিক করে রেখ।

—হ্যাঁ বাবু। বাতি দেব, আলমারি থেকে চাদর, মশারি বের করব, খাবার জল রাখব।

—না, তোমাদের ব্যবস্থা বেশ ভাল।

—আদরযত্ন তো সবাইকেই করলাম বাবু! ওরা আপনার মতই সকালের ট্রেনে এলেন। খরচপত্র ওনাদেরই, তবু প্রথম জনকে মাংস পরোটা খাওয়ালাম, পরের বাবুকে মাছের ফ্রাই, তার পরের জনকে মাংসের কিমার খিচুড়ি, কেউ তো এক রাতের বেশি থাকলেন না।

তোমাদের রান্নার হাত খুব ভাল।

—দুজনেই রাঁধতাম তো।

—ওনাদের তোমরাই ভয় দেখাওনি তো?

—রাম রাম বাবু! আমরা নিজেরাই, যাকে বলে বাড়ি বিক্রি হলে বাঁচি। ভূতের বাড়িতে বাস!

—তা, তোমাদের তো কিছু করে না ভূত।

—তা করে না। তবু ভয় তো থাকে।

বিকেলে রিকশা চেপে রাঁচি শহর ঘুরে বেড়িয়ে ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন। সন্ধের পর খানিক রেডিও শুনলেন। না, ছয় লাখ টাকায় এমন সম্পত্তি পাওয়া সোজা কথা নয়। নেই নেই করেও খানিক জমি আছে। নীচে গিয়ে একবার বড়বাবুর ছবি দেখে এলেন। স্টাফ করা কুকুরটা যেন ওর দিকেই চেয়ে আছে। সব ফেলে দেবেন।

ভয় ওর শরীরে নেই। ঘুমের ওষুধটি খাবেন, তার আধ ঘন্টা বাদে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়বেন। তারপর একটা কেন, হাজারটা ভুত নাচুক না, ওর কিছু

এসে যায় না। কড়া ওষুধ না খেলে ঘুম হয় না। তা, না ঘুমনোর চেয়ে ওষুধ খেয়ে ঘুমনো ভাল।

ডাক্তারের গিন্নির কথা মনে পড়ল।

—ওগো! আগে পুজো দিয়ে বাড়িতে ঢুকব। একটি মাস আরাম করে থাকব, তারপর নার্সিংহোম কোর। শীতকালে রাঁচিতে থাকব, আমার বড্ড সাধ।

হবে সব হবে। এক মাস তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। গিন্নি এমন খাট পালঙ্ক, এমন বাথটব, এমন কায়দার পর্দা, এসব দেখে খুব খুশি হবেন।

জানলার ওপারে মোটর গ্যারেজ, আটতলা বাড়ি, কি ভয়ানক শব্দ যন্ত্র রে বাবা! ভি ডি ও-তে ছবি চলছে। ক্যাসেট বাজছে কারা যেন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছে।

তা করুক, পালকের গদীতে ডুবে গেলেন ডাক্তারবাবু, পালকের বালিশ বা কি ব্যাপার। এগুলো নয় দাম দিয়েই কিনে নেবেন। পায়ের দিকে টেবিলে সাদা বেড়ালটা, আর মাথার কাছে শিবের ছবি, এগুলো বিদায় করবেন।

মশারিটাও নীল। গায়ের ঢাকাটাও নীল। বাপ রে বাপ, বড়লোকের ব্যাপার। বড়বাবু করে রেখে গেছে, এরাও সেই নিয়ম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সব রীতিমতো....

ভাবতে ভাবতেই ডাক্তারবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের অতলেই যেন ডুবে গেলেন। ভীষণ গাঢ় ঘুম।

ঘুমটা হয়তো ভাঙত না। কিন্তু হাতির মতো পেল্লায় দশটা মোষ যদি গাঁ গাঁ করে ডাকে তাহলে তো কুম্ভকর্ণের ঘুমও ভাঙবে। ডাক্তারবাবু তো কুম্ভকর্ণ নন।

ঘুম ঘুম চোখে ভাবলেন, বাজল কটা?

বিছানার নীচে হাত চালিয়ে ঘড়ি বের করলেন, চশমা পড়লেন। পাঁচটা বাজে।

কিন্তু এ কি?

পায়ের দিকে টেবিলে একটা চিনেমাটির কালো বেড়াল কেন? আর, মশারিটা রীতিমতো গোলাপী।

ডাক্তারবাবু উঠে বসলেন।

বিছানা গোলাপী, পর্দা গোলাপী, সব কি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে? মাথার দিকের দেয়ালে...

লকলকে জিভ ঝুলিয়ে কালীর ছবি।

এ ঘরে তো তিনি শোননি। এ কি হল? উঠে বিছানা থেকে বেরিয়ে জানালার পর্দা সরালেন।

আটতলা বাড়ি কোথায়? কোথায় রোহতগী মোটর গ্যারেজ? জানলার বাইরে মোষের খাটাল .... যোগ ব্যায়াম বিদ্যালয় ... ডাক্তারবাবু কি পাগল হয়ে যাবেন?

কাল নীল সোফায় ব্যাগ রেখেছিলেন, আজ গোলাপী সোফায় ব্যাগ। কাল নীল গালচেয়ে চটি রেখেছিলেন, আজ গোলাপী গালচেয়ে চটি। লুঙ্গি তো পরেই আছেন, গামছাও ঝুলছে খাটের ছত্রীতে। এ কি ভীষণ গণ্ডগোল, এ সব কার ষড়যন্ত্র? নিশ্চয় ওই চাকর দুটোর। ওদের ডাকা দরকার, এখনি ডাকা দরকার। কিন্তু দরজা তো খুলছে না। দুটো দরজাই বন্ধ যে! বাইরে থেকে বন্ধ। মুখে চোখে মাথায় জল দেবেন?

কোনমতে বাথরুমের ভারী দরজা খুললেন।

এ কি? স্টাফ করা বুল ডগটা এমন ভীষণ চোখে চেয়ে আছে কেন? এটা এল কি করে?

না, এসব সত্যি নয়, এসব সত্যি নয়, বলতে বলতে কুকুরটাকেই লাথি মারলেন।

কুকুরটা গর গর করে উঠল।

ডাক্তারবাবু সেখানেই মূর্ছা গেলেন।

তারপর সে কি কাণ্ড, সে কি কাণ্ড! বাহাদুর তো ডাকাডাকি করে মোটর গ্যারেজের লোকজন এনে ফেলল। উত্তরের ঘরে বিছানার মতো বিছানা পড়ে আছে, মানুষ নেই। আর দক্ষিণের ঘরের বাইরে দেয়ালের গায়ে চাবি যেমন ঝোলে তেমন ঝুলছে, ভেতরে সব নিশ্চুপ।

ভয়ে ভয়ে ঘর খুলল বাহাদুর।

তারপর বাথরুমের কাছে গিয়ে সেও চেঁচিয়ে উঠল। তাজ্জব, ভীষণ তাজ্জব। উত্তরের ঘরে যে মানুষ দরজা বন্ধ করে ঘুমলো দক্ষিণের ঘরে সে এল কেমন করে?

ডাক্তারবাবুকে বিছানায় শুইয়ে জল ছিটিয়ে বাতাস করতে থাকল বাহাদুর। ওর দুচোখে জল। এসব কাণ্ডকারখানার ব্যাখ্যা কি? ও ঘরে দরজা বন্ধ ছিল। কে ঢুকতে পারে ও ঘরে? কোন মানুষ তা পারে কি?

সব চেয়ে অবাক করলেন ডাক্তারবাবু।

জ্ঞান ফিরতে উনি ভোঁ হয়ে বসে থাকলেন। তারপর হঠাৎ উঠে লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবী চাপিয়েই ব্যাগ নিয়ে রওনা দিলেন। আজ না হয় তাঁকে এ ঘরে থেকে ও ঘরে চালান করল "কে যেন"। রোগীদের যদি এ ঘর থেকে ও ঘর .... তাঁর

গিন্নিকে যদি এ ঘর থেকে ও ঘর......

দরকার নেই, ফিরে গিয়ে লিখে জানাবেন যে অনিবার্য কারণে বাড়িটি উনি কিনতে পারছেন না।

গ্যারেজের লোকরাও বাহাদুরকে বলল, বড়াবাবুকা হিচ্ছা নেহী হ্যায় কেয়া কোঠি বিক্‌ যায়ে।

সে তো বাহাদুরও বোঝে, কিন্তু নাতিবাবু না বুঝলে?

যাকগে, তোমরা বুঝতেই পারছ যে এরপর লালকুঠিকে "দাতব্য" করতেই হচ্ছে।

নাতিবাবু বাহাদুর আর গোপালকে তাড়িয়ে ছেড়েছে। ওরা ডুরাণ্ডায় কাঁচা ইট আর খোলার চালের পোক্ত বাড়িতে এখন যাকে বলে রীতিমতো দুখা ব্যবসায়ী।

স্টাফ করা কুকুরটা নাতিবাবুর বাড়ি গেলেই দেখতে পাবে। গলার কাছে ধাক্কা দিলে ওর গলায় বসানো যন্ত্রটা গরগর করে।

উত্তরের ঘরের বাথরুমের জানলা দিয়ে গোপাল বা বাহাদুর ঢুকেছিল, এমন সন্দেহ ডাক্তারবাবুর পরে হয়েছিল বটে।

তা বলবেন কাকে?

ভূত ওকে টেনে নিয়ে গেল?

কোন্‌টা বলবেন?

ওই "অনিবার্য কারণ"টাই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাই চালিয়ে যেতে হবে।

শান্তির গল্প

কবিতা সিংহ

কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পর তিনটে বাড়ি বদল হল। যদি একটাও বাড়ি বাবা আর মা দুজনের পছন্দ হয়। বাবার হলে মায়ের হয় না, মায়ের হলে বাবার হয় না। শেষ পর্যন্ত ওল্ড বালিগঞ্জ-এ একটা চমৎকার গড়নের বহু পুরোনো আমলের একতলা খোলামেলা মফস্বলের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি পেয়ে মা বাবা দুজনেই খুশি আর মিলু-পলি খুশি চমৎকার গাছপালায় ঝুপ্‌সি পড়ো বাগান পেয়ে। বাড়ির চিলেকোঠায় ছোট্ট একটি ঘরে কেবল মরচে পড়া একটা তালা আটকানো।

বাবা কথা দিলেন বড় আমগাছটায় দুটি চওড়া হ্যামক বেঁধে দেবেন। যাতে পরীক্ষার পর—দুই ভাইবোন বাগানে রোদে ছায়ায় আরাম করে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে পারে।

বাবা অফিসে বেরিয়ে পড়ার পর মা মাঝে মাঝে রাঙা পিসিকে নিয়ে বাজারে বেরোন। তখন শুধু—আয়া চুম্‌কি আর কাজ করার লোকেরা আর রাঁধুনী শ্যামা মাসীর রাজত্ব।

খুব কড়াকড়ি।

সেদিন কি একটা উপলক্ষ্যে মিলু-পলির ছুটি ছিল। বাগানে মাটি খুঁড়ে উনুন বানিয়ে, লুচিপাতার তরকারি আর লাল কাঁকরের ডাল বানিয়ে মিলু-পলি পুতুলের পিক্‌নিক করছিল। হঠাৎ দেখে নীচু ঝুপ্‌সি ফণীমনসার ঝোপের পাশ থেকে তাদের সমবয়সী একটি মেয়ে উঁকি দিচ্ছে। কি সুন্দর মায়া মাখানো বড় বড় চোখ, লম্বা লম্বা নরম পল্লবে ঘেরা। ফ্যাকাশে ফরসা মুখ। পাতলা দুটি ঠোঁট। গালে একটি তিল, ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ওর খুব খেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। মিলু-পলি ডাকলেই আসে। মিলু আর পলিও খুব খুশি। বলল,—এসোনা ভাই আমাদের পিক্‌নিকে।

মেয়েটি এগিয়ে এল।

—তোমার নাম কি ভাই?

—আমার নাম শান্তি—

—কোথায় থাকো ভাই?

—এই তো, কাছেই—

খুব কেতাদুরস্ত পোশাক পরা মেয়ে শান্তি। পরনে ফুলহাতা সাদা সিল্কের গাউন। জুতোয় ঝক্‌ঝকে বখলশ লাগানো। হাঁটু পর্যন্ত মোজা। ফ্রকের কোমরে বেল্ট লাগানো। ওপরে ভেলভেটের জ্যাকেট্ পরা। চুলে মস্ত ফুল করা সার্টিনের রিবন বাঁধা। শান্তি ওদের পাশেই বসে পড়ল। তারপর চলল পুরোদমে পুতুলের পিক্‌নিক্।

শান্তি একদিনেই মিলু-পলির প্রাণের বন্ধু হয়ে গেল।

সবচেয়ে মুস্কিল হল বাবা মা আর রাঙা পিসির। বাবাকে খবরের কাগজ পড়া ফেলে, মাকে সেলাই ফোঁড়াই ফেলে, এক নাগাড়ে ওই শান্তির গল্প শুনতে হত। রাঙা পিসির তো কলেজের পড়াই বন্ধ। শান্তি কি ভাল মেয়ে। শান্তি কি মজার গল্প করে। শান্তিদের খুব সুন্দর রোলস্ রয়েস্ গাড়ি আছে, খুব বড় ফিটন গাড়ি আছে। সেই গাড়িতে ওয়েলার ঘোড়া লাগানো। ঘোড়ার ঝক্‌মকে পেতলের গয়না। মাথায় পালক দেওয়া টায়রা।

বাবা ভুরু তুলে বলেছিলেন সত্যি।

মিলু-পলি সমস্বরে বলল, হ্যাঁ বাবা। তারপর পলি বলল,—আমি শব্দ শুনেছি ঘোড়ার গাড়ির। ঘোড়ার গলার ঝুমুরগুলি কেমন ঝুম ঝুম শব্দ' করে।

মিলু বলল—একদিন শান্তি রোলস্-রয়েস্‌টায় চেপেও এসেছিল। রূপোলি রঙের গাড়ি।

গাড়ির ফুটবোর্ডের ওপর একটা শোয়ানো পেতলের সাপ সেই আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত চলে গেছে। তার হাঁ করা মুখে একটা আলোর বাল্‌ব লাগানো।

এবার মা অবাক!—ভিনটেজ কার? তোদের শান্তিকে একবার আনিস না এখানে। বলিস মা আলাপ করতে চেয়েছে।

রাঙা পিসি বলল,—হ্যাঁ গল্প শুনে কৌতূহল হচ্ছে দেখবার জন্যে।

মিলু বলল,—আমরা তো কতবার বলেছি, বাগানে কেন ভাই, আয়না বাড়ির ভিতর খেলব! ও কিছুতেই আসতে চায়না। ওর ভারী লজ্জা!

মা বললেন,—বেশ। ও যখন আসবে তোদের একজন এসে চুপিচুপি আমায় খবর দিস, আমি গিয়ে আলাপ করে আসব।

মিলু-পলি বলল,—আচ্ছা!

বাজার থেকে ফিরে এসে মা সেদিন মিলু-পলিকে ডাকলেন।

—আচ্ছা, তোদের শান্তি ও পাড়ায় কোন্ বাড়িতে থাকে?

মিলু শুধাল, কেন মা?

—এ পাড়ায় পুরোনো আমলের বাসিন্দা দেবীর সঙ্গে আলাপ হল মনিহারী স্টোরে, উনি বললেন, এ পাড়ায় কারও রোল্‌স্‌ রয়েস্‌ গাড়ি নেই। ওয়েলার লাগানো ফিটন গাড়িও নয়।

পলি বলল,—হতেই পারেনা। শান্তি তো বলেইছে ওর বাড়ি হল ফিরোজা মঞ্জিল। ওদের বাড়ির রঙ হালকা ফিরোজা, আর জানালার রঙ গাঢ় গোলাপী। মা বললেন,—এ পাড়ায় এমনি দেখতে বাড়ি কোথায়? আমি তো দেখিনি।

পলি বলল,—ঠিক আছে, আজ বিকেলে শান্তি এলে আমরা ওর সঙ্গে গিয়ে ওর বাড়ি দেখে আসব!

মা বললেন,—তার আগে তোমরা আমাকে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও।

কিন্তু সেদিন বিকেলে শান্তি এল না।

পরদিন বিকেলে মিলু-পলি ছুটতে ছুটতে ওপরে এলো। তাদের হাতে গরম গরম সদ্য ভাজা আনন্দ নাড়ু কয়েকটি।

—মা, মা, দ্যাখো, টাটায় আমাদের সোনাপিসি এখন আনন্দ-নাড়ু ভাজছেন এই সেই নাড়ু!

মা বাবা রাঙা পিসি তো হতবাক। তোমরা কি করে নাড়ু পেলে?

—শান্তি এনে দিল। ও ম্যাজিক জানে। ওকে বলছিলাম টাটায় আমাদের একজন পিসি আছেন। তিনি আমাদের খুব ভালবাসেন। কথাটা শুনেই শান্তি বলল দাঁড়াও খবর এনে দিচ্ছি তোমাদের সোনাপিসির! তারপর এই নাড়ু এনে দিল। বাবার হাত থেকে খবরের কাগজটা ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। তিনি বললেন, ডেট্‌ আর টাইম দিয়ে আমি এক্ষুনি সোনাকে চিঠি লিখছি যে সত্যিই সে এখন আনন্দ-নাড়ু ভাজছে কিনা! চাপা গলায় মা বললেন,—তোমরা আর শান্তির সঙ্গে মিশবে না!

পরদিন বাবা মা রাঙা পিসি আর মিলু-পলি বড় বসবার ঘরটায় বসে আছে হঠাৎ টেবিলে রাখা ভিজিটার্স প্যাডের ওপর সুতোয় বাঁধা পেনসিলটা গড়গড় করে গড়াতে লাগল। মা কাঁপা হাতে পেনসিলটা তুলে নিতেই কে যেন প্যাডে তাঁর হাতটা আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিল। আঁকাবাঁকা কাঁচা হাতের লেখায় ফুটল, "মাসীমা, মিলু-পলিকে আমার সঙ্গে খেলতে দেবেন। আমি বড় একা, আমি কখনো কারও ক্ষতি করিনি। করবও না। শান্তি।

এরপর মা পাতার পর পাতা লিখে যেতে লাগলেন। প্রশ্ন মা-ই করছিলেন শান্তি কেবল উত্তর দিচ্ছিল। আমার নাম শান্তি। আমি সত্তর বছর আগে এই পাড়ায় এই বাড়িতেই থাকতাম। এই বাড়ির ভাঙা গেটের থামটা উল্টে ফেললে

দেখবেন পাথরের ট্যাবলেটে বাড়ির নাম লেখা আছে। আমার বাবা আর মা ছিলেন। ছোট্ট একটি ভাই-ও ছিল। আমার কালাজ্বর হয়। এগারো বছর বয়সে আমি মারা যাই। সব বেচে দিয়ে আমার বাবা মা চলে যান সিমলা পাহাড়ে। আমার বাবা মা আরও দশ-বারো বছর বেঁচেছিলেন। ভাইটি এখন অতি বৃদ্ধ। ও থাকে বিদেশে। আমি বাবা মাকে দেখতে পাইনা। ভাইকে কখনো কখনো দেখে আসি। সবার সঙ্গে কথাও বলতে পারি না। শরীরও ধরতে পারি না। মিলু-পলির বয়সী কারও কারও সামনে পারি।

মা প্যাড রেখে দিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মিলু-পলি, যাও, শান্তির সঙ্গে খেল গিয়ে। মিলু-পলি চলে যাবার পর বাবা মাকে বললেন,—এ তুমি কি বললে বীণা? মা বললেন, আহা, মেয়েটার কষ্টের কথা ভাব তো?

রাঙা পিসি বলল, তা বলে জেনে শুনে—

মা বললেন—বেশতো, তোমার দাদার যদি এতই ভয় হয় গয়ায় যাক না, ভূত ুণ্ডে পিণ্ডটা দিয়ে আসুক। মেয়েটা উদ্ধার পাক।

তিনদিন বাদে বাবা প্রেতকুণ্ড থেকে পিণ্ড দিয়ে ফিরলেন। ইতিমধ্যে টাটা থেকে সোনাপিসির চিঠিও এসেছে। হ্যাঁ ওই তারিখে, ওই সময়ে সোনা পিসি আনন্দ নাড়ু ভাজছিলেন।

মিলু পলির কিন্তু খুব দুঃখ। আর শান্তি আসে না। ঘোড়ার গাড়ির ঝুমুর ঝুমুর নেই। রোলস্ রয়েসের শব্দ নেই। শেষ পর্যন্ত বাড়িটি মা বাবার এত পছন্দ হয়ে গেল যে বাড়িটা কিনেই নেওয়া হল। বাড়ি সারানোর আগে চিলেকোঠায় সেই মরচে পড়া তালা ভাঙা হল। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে মা বাবা আবিষ্কার করলেন অনেক পুরোনো ছবি, কিছু ভাঙা খেলনা আর একটি পুতুলের বাক্স। পুরোনো ছবির মধ্যে চোখে পড়ল শান্তির একটি ছবি যে পোশাক পরে সে মিলু-পলির কাছে আসত অবিকল সেই পোশাক।

এখনও তোমরা যদি মিলু-পলিদের বাড়ি যাও, তাহলে ওদের ঘরের দেয়ালে টাঙানো শান্তির ছবিখানি দেখতে পাবে। ছবির মধ্যে থেকে হাসছে শান্তি। মিলু-পলির সত্তর বছর আগের বেঁচে থাকা প্রাণের বন্ধু।

অবুঝ ভূতের গল্প

বাণী রায়

সবুজ সাহিত্যের পাতায় নানা অবুঝ ভূতের গল্প পড়ে পড়ে আমার মনেও **অবুঝ** ভূতের গল্প দানা বাঁধে। 'অবুঝ' মানে ঠিক বুঝেছ, পাঠক-পাঠিকা? এমন **গল্প**, যার কোন যুক্তিগত অর্থ খোঁজা শক্ত।

এমনি একটি শোনা ভূতের গল্প লিখছি আজ। প্রথমেই বলে নিচ্ছি সত্য মিথ্যা প্রমাণের দায়িত্ব আমার নয়। পশ্চিমে বহুদিন প্রবাসিনী আমার জ্যাঠাইমা সম্পর্কিতা এক চমৎকার মজলিসী মহিলার মুখে গল্পটি শুনেছিলাম। বিচিত্র গল্পটি মনেও রেখেছি, বহুবার বহু লোককে শোনানোর পরেও।

পশ্চিমের কোন একটা শহরে কোন এক ভদ্রলোকের কথা।

লোকটি অফিসে চাকরি করত। বাড়িতে একমাত্র স্ত্রী ছিল। অফিস থেকে একদিন ফেরার পর বড় গরম বোধ হতে লাগল ওর। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

সে স্ত্রীকে ডেকে বলল, "ওগো, আমি একটু বাইরে ঘুরে ঠাণ্ডা হয়ে আসি গে। তুমি রুটি বানাও, ফিরে এসেই একেবারে রাতের খাওয়াটা সেরে নেব।" স্ত্রী গজ্ গজ্ করতে লাগল, "অফিস থেকে ফিরে মাত্র এককাপ চা খেয়ে আবার বার হচ্ছ? তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু। আমি এক্ষুনি রান্নাবান্না সেরে রাখছি।"

লোকটি রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে খানিকটা দূরেই চলে এল। রাস্তা তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ও অঞ্চলের টিম্‌টিমে গ্যাসবাতি তখনও জ্বলেনি।

রাস্তার পাশে মাঠ। দুদিকে রাস্তায় বড়-বড় গাছ লাগানো। আধো-অন্ধকারে এক ঝাঁকড়া ঝুরি-ঝোলানো বটগাছের তলায় চানাচুরওয়ালাকে দেখা গেল।

লোকটি ভাবল ঃ পায়ে-পায়ে অনেকটা দূরই এসেছি। আবার অনেকটা দূরই ফিরতে হবে। একঠোঙা চানাচুর কিনে খেতে খেতে যাই। খালি পেটে খিদের জ্বালা এখন বোঝা যাচ্ছে। বউ-এর কথা শুনে নিলেই হত।

চানাচুরওয়ালার কাঠের বারকোষে ঠকাস্ করে একটা দোয়ানী রেখে (তখন দোয়ানী ছিল, হালের পয়সার আমল নয়) লোকটি চাইল একঠোঙা চানাচুর।

চানাচুরওয়ালার ময়লা জামায় গা-ঢাকা, মাথায় সাদা ময়লা কান-ঢাকা টুপি। মাথা নামিয়ে একমনে গরম চালায় ঝাল-ঝাল মশলা মাখছে। গাছের ঝুরি-ঝোলা আবছা অন্ধকারে লোকটির দিকে দেখছ। মুখে কোন কথা নেই।

গরম গরম লাল্‌চে মটরের দানা অন্ধকারেও দেখা যায়। লোকটি ক্ষুধার্ত ও লোভার্ত হয়ে হাত বাড়িয়েই চমকে উঠল।

চানাওয়ালা দু'হাতে ঠোঙা ধরেছে। তখন দু'আনার চানা বেশ অনেকটা হত। যে হাত দু'খানি ঠোঙা ধরে এগিয়ে দিচ্ছে, চানাওয়ালার সেই হাত দু'খানি মোটেই হাত নয়।

ওরে বাবা!

আগাগোড়া মানুষের চেহারা চানাওয়ালার। হাত দু'খানি কব্জি পর্যন্ত মানুষের।

তারপরেই গলদ!

কব্জী থেকে হাতের পাতা আর হাত নয়। ঘোড়ার ক্ষুর দু'খানা।

লোকটি ভয়ে-বিস্ময়ে পাগল হয়ে বাড়ির পথে ছুটে ফিরতে লাগল। চানার ঠোঙা যেমন তেমনি পড়ে রইল।

খানিকটা পথ এসে দেখল এক পাহারাওয়ালা চারিদিকে দৃষ্টি রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গদাইলস্করী চাল। হাত প্যান্টের পকেটে পোরা। যেন পুরো সাহেব।

পাহারাওয়ালাকে দেখে লোকটির দেহে প্রাণ এল ফিরে। এইবার একটা ভরসা পেলাম, বাবা!

সে তাড়াতাড়ি পাহারাওয়ালার কাছে এগিয়ে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ও দাদা, এক কাণ্ড হয়েছে!"

লোকটি সমস্ত খুলে বলল যা দেখেছে।

পাহারাওয়ালার মুখে হাসি।

লোকটি অধীর হয়ে বলল, "না দাদা, হাসবেন না। আমি মোটেই ভুল দেখিনি। চোখ রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে দেখেছি। প্রথমটা চোখকে বিশ্বাস করিনি কিনা।"

এবার পাহারাওয়ালার অট্টহাসি। হাসতে হাসতে সে ধীরে-সুস্থে প্যান্টের পকেট থেকে নিজেই হাত দু'খানা বার করে লোকটির নাকের ডগায় ধরে জিজ্ঞাসা করল, "ভায়া, দেখতো এই হাত নাকি?"

সেই ঘোড়ার ক্ষুর!

পাহারাওয়ালার কব্জিতে বসানো সেই একজোড়া নালবাঁধা ঘোড়ার ক্ষুর!

"ওরে বাবা, গেছি, মরেছি!"

লোকটি ছুটতে ছুটতে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "খোলো, দরজা খোলো।"

লোকটি পাগলের মতো দরজায় ঘা দিতে দিতে চিৎকার করতে লাগল।

যদিও চানাওয়ালা বা পাহারাওয়ালা একবারও তাকে তাড়া দেয়নি, তবু সে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কী জানি ধরে ফেলে যদি?

তার বাড়িটি শুধু নিরাপদ। এখানে স্ত্রী আছে, গরম খাবার আছে। আর সে বাড়ি থেকে বেরোবে না। কালই সে এ শহর ছেড়ে বউকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও।

স্ত্রী চট্ করেই দরজা খুলে দিল। বেচারী বোধহয় স্বামীর পায়ের শব্দের আশায় বসেছিল।

লোকটির তখন কথা বলার সাধ্য নেই। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে সে হাঁ করে। মোটা মানুষ, তার বয়স চল্লিশ হয়েছে। এক ছুটে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে এতটা পথ ঠেঙিয়ে ছুটে এসে বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে।

মুখে কথা সরছে না। তবু বউকে দেখে লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, "জানো, কি হয়েছে? কী ভয়ানক সব পথে দেখলাম!"

কোন মতে গল্পটা সে বলে দিল।

স্ত্রী তখন কাপড়ের মধ্যে থেকে নিজের দু'খানা হাত বার করে তার চোখের সম্মুখে মেলে ধরল।

"দেখ তো, এই হাত নাকি?"

লোকটির আর কথা বলার ক্ষমতা হল না। এক চীৎকার দিয়ে সে ধরাস্ করে পড়ে গেল দরজায়।

শব্দ শুনে তার আসল স্ত্রী রান্নাঘর থেকে এসে দেখল, সে আর নেই, সে মরে গেছে। একা পড়ে আছে দরজায়।

এখানেই গল্পটা শেষ। যে-কোন ভূতের গল্পে নাই। কিন্তু 'অবুঝ' অংশটা যে, লোকটির অভিজ্ঞতার কথা অন্য কেউ জানল কেমন করে? চানাওয়ালার হাতে ক্ষুর দেখে সে বলল পাহারাওয়ালাকে। পাহারাওয়ালা তো ভূত। আবার পাহারাওয়ালার হাতে ঘোড়ার ক্ষুর দেখে সে বলল কাকে? স্ত্রীকে। যে-স্ত্রী সেজে এসেছে আবার ওই ভূতই। আসল স্ত্রী যখন এল, তখন সে তো বলাকওয়ার অতীত হয়ে গেছে।

তবে এটা নিছক গল্প? যে লেখক সমস্ত অদেখা জিনিস দেখতে পান, সমস্ত অজানা জিনিস জানতে চান, তিনি এটি সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু, বিজ্ঞানের যুগে তোমরা মেনে নেবে। 'অবুঝ' অংশ থেকেই যায় তাহলে। যুক্তি দিয়ে বোঝা যাক।

লোকটির শরীর সারাদিন অফিসের পরিশ্রমে ও গরমে খারাপ হয়েছিল।

তাই সে বিকালের জলখাবার না খেয়েই ঠাণ্ডা হতে গেল মাঠে ঘাটে।

অসুস্থ শরীরে আবছা আলোয় সে ভুল দেখেছিল। যে চানাওয়ালার হাতে ঘোড়ার ক্ষুর বসানো। ভয় পেয়ে এসে আরও মাথা গুলিয়ে গেল ওর। পাহারাওয়ালা হেসে হেসে ঠাট্টা করে নিজের হাত দেখাল। সে হাতে নিশ্চয় নূতন ধরনের দস্তানা আঁটা ছিল। চল্লিশ বছরে চোখে চাল্‌সে পড়ে কিনা।

আরও ভয় পেয়ে যখন সে বাড়ি এল তখন তার অবস্থা চরমে। আধ-বুড়ো লোকটা অসুস্থ মোটা দেহ নিয়ে গরমে অতটা ছুটেছে। স্ত্রীও ঠাট্টা করে নিজের হাত দেখিয়েছিল নির্ঘাত। আজগুবি কথা শুনলে সবাই তাই করে থাকে। আসল স্ত্রীই দরজা খুলেছিল। তখন লোকটা চোখে-কানে দেখছিল না ভয়ে আর অসুস্থতায়। যা দেখছে তাতেই ঘোড়ার ক্ষুর আঁকা দেখছে। একে বিকার বলে।

মোটা প্রৌঢ় লোক ছুটে বেদম হয়ে ভয় পেয়ে হার্টফেল্‌ করে মরল।

এর মধ্যে ভূত কোথায়?

যাইহোক, শৈশবে শোনা আমার জ্যাঠাইমা 'নেবুর মা' নামে খ্যাত তরুলতা রায়ের মুখে শোনা গল্পটার এমনি এক যুক্তি ভিত্তি নিজের মনে খাড়া করলাম।

তোমরা যা ইচ্ছা ভেবে নাও।

অলৌকিক ছুরি

পূর্ণেন্দু পত্রী

গরম তেলে পাঁচ ফোড়নের মতো চিড়বিড়িয়ে উঠলেন একদিন শুকুর মা।

—হ্যাঁরে, সামনে পরীক্ষা। অথচ হোহো টোটো করে দিন কাটাচ্ছিস। গত বছর ফেল করতে করতে পার পেয়ে গেছিস কোন রকমে। এবারে কী ফেল না করে ছাড়বি না?

—বাঃ রে, কেউ আবার ইচ্ছে করে ফেল করে নাকি?

—তাহলে মন দিয়ে পড়াশোনা আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর যেন পাশটা করতে পারিস।

—ঠাকুর কে?

—ঠাকুর মানে ভগবান। তাঁর কাছে এক মনে চাইলে মানুষ যা চায় সব পায়।

—তুমি পেয়েছ কখনো?

—কেন পাব না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম, হে ঠাকুর, তিন তিনটে মেয়ে দিলে। এবার একটা কোল আলো করা ছেলে দাও। তারপরই তো তুই হলি।

শুকু মায়ের কথাটা মাথায় নিয়ে সেদিন সন্ধে থেকেই বসে যায় বইপত্র নিয়ে পড়তে। কিন্তু বেশিক্ষণ পড়তে পারে না। অল্প সল্প পড়ার পরেই ঘুমে ঢুলে পড়ে মাথাটা। সামনে হ্যারিকেন। একবার তো হ্যারিকেনের উপরই উপুড় হয়ে যায় মাথাটা। আর একটু হলে পুড়ে যেত মুখটা। ঘুম পাওয়ার কারণ ছিল অবশ্য। ফুটবল খেলেছে সারা বিকেল, স্কুলের মাঠে। খেলার ধকলেই শরীর ক্লান্ত।

—শুকুর মা খানিকটা খুশি হয়েছিলেন ছেলের পড়তে বসা দেখে। এখন ঘুমে ঢলে ঢলে পড়া দেখে আবার বিরক্ত।

—এই তোর পড়া হচ্ছে। বইয়ে-মুখে হতে না হতেই ঘুম?

শুকু ধড়ফড়িয়ে আবার পড়া শুরু করে। কিন্তু পারে না। ঘুম তাকে যেন কুমীরের হাঁ দিয়ে গিলে ফেলে। শুকুর মা রেগে বলেন—

—যা, আর পড়তে হবে না আজ, আজকের মতো ছুটি দিলাম। কাল যেন এমন না হয়। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। ভোর রাতে উঠে পড়তে বসবি।

খেয়ে-দেয়ে শুকু তার শোবার ঘরে শুতে গিয়ে তখুনি শুয়ে পড়ে না। আলোনেভানো ঘরে বিছানায় বসে দুহাত জড়ো করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে যায় এক মনে।

—হে ঠাকুর, রঘুর ছুরি আছে, ভাকুর ছুরি আছে, দামুর ছুরি আছে, মিলনের ছুরি আছে, মধু—হীরু—শানু—বকু সকলের ছুরি আছে, আমার নেই। বাবাকে বললেও কিনে দেয় না। ছোট ছেলেদের নাকি ছুরি রাখতে নেই। তুমি আমাকে একটা ছুরি দেবে ঠাকুর? আমি ছুরি দিয়ে কাউকে মারব না। তবে যদি অন্যায় ঘটে, তাহলেই ব্যবহার করব শুধু। বাকি সময় পেনসিল কাটব, কাগজ কাটব, পেয়ারা কাটব, আমলকি কাটব আর গুলতি বানাবো।

পরের দিন সকাল। শুকু চলেছে স্কুলে। রোজ যে রাস্তা দিয়ে যায় আজ সে রাস্তায় গেল না।

কাল খেলার সময় তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে ভাকুর সঙ্গে। হ্যাণ্ডবল করেও স্বীকার করতে চায় নি। তাই নিয়ে চেঁচামেচি। মারামারি হওয়ার মতো। ভাকু রেগে গিয়ে পকেট থেকে ছুরিও বের করেছিল প্রতিপক্ষদের মারবে বলে। শেষ পর্যন্ত রক্তারক্তি হয় নি। রোজ যাওয়ার রাস্তা দিয়ে গেলে যেতে হবে ভাকুর বাড়ির সামনে দিয়ে। তখন হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে ভাকুর সঙ্গে। শুকুর দল ঠিক করেছে ভাকুকে বয়কট করবে পুরোপুরি। কথা বলবে না। খেলতে ডাকবে না। মিশবে না। সেইজন্যে অন্য রাস্তা।

কামারশালার কাছে বিরাট তেঁতুলগাছ। তলাটা ছায়ায় কালো। শুকু কামারশালার কাছাকাছি পৌঁছবার মুখে দেখতে পেল তেঁতুলগাছের তলায় একটা কাঁচা তেঁতুল খসে পড়ে আছে। অবাক হল সে। এখন তো তেঁতুল ফলার সময় নয়। অথচ সোনার মতো চকচক করছে একটা লম্বা কাঁচা তেঁতুল। তেঁতুলটা তুলবে বলেই সে এগিয়ে চলল গাছটার দিকে। পড়ে-থাকা তেঁতুলটা তুলতে গিয়ে চমকে উঠল সে। বিস্ময়ে চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে বুঝি। কী দেখছে সে? একী সত্যি? সোনার বাঁটওলা একটা লম্বা ছুরি তার সামনে। তাহলে কী সত্যিই ঠাকুর প্রার্থনা মঞ্জুর করল তার? ছুরিটা তুলে নিয়ে বইয়ের ব্যাগে ভরে নিয়ে স্কুলের দিকে হাঁটা দিল যখন, তার বুকের মধ্যে গাজনের বাজনা।

স্কুলের ছুটির পর আবার খেলার শুরু। ভাকুকে বাদ দিয়েই দল তৈরি। খেলা শুরু হবে হবে। লাট্টু মুখে হুইসেল নিয়ে রেফারি হয়ে রেডি। এমন সময় ভাকু তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লাট্টুর সামনে এসে দাঁড়াল।

—ভাকুকে বাদ দিয়ে খেলা চলবে না।

লাট্টু মুখ থেকে হুইসেল নামিয়ে গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে—নিতে পারি ও যদি কালকের ঘটনার জন্যে ক্ষমা চায়।

—ক্ষমা চাইবে কেন? দোষ করলে তো ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন। ও কী দোষ করেছে শুনি। হ্যাণ্ডবল করে নি, তবুও জোর করে হ্যাণ্ডবল করেছে বলে তাকে মারতে আসতে বরং দোষ হয়েছে তোদের।

—আমি রেফারি। কে হ্যাণ্ডবল করেছে, না করেছে সেটার বিচার করব আমি। বাইরের লোকের তা বিচার করার রাইট নেই।

—এর ফল কিন্তু ভালো হবে না বলছি।

—কি হবে? তোরা কি দল বেঁধে মারামারি করতে এসেছিস নাকি?

—মারামারি করতে আসি নি। তবে ভাকুকে গায়ের জোরে বাদ দিয়ে খেলা শুরু করলে বাধ্য হয়েই মারামারি করতে হবে।

—তাই নাকি? এ্যাই কে আছিস আমার হকি স্টিকটা নিয়ে আয় তো।

—হকি স্টিক দিয়ে আমাদের পেটাবে? সে সুযোগ পাবে কি?

তখুনি যেন হিন্দী সিনেমার একফালি দৃশ্য। ভাকু আর তার পাঁচ বন্ধু গোল হয়ে ঘিরে ফেলল লাট্টুকে। প্রত্যেকের হাতেই খোলা ছুরি। লাট্টুর মতো ডাকাবুকো ছেলেও ভয় পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা। মাঠের খেলোয়াড়রা ভয়ে জড়োসড়ো। কি হয়! কি হয়!

শুকু গোলকিপার। ইঁটের গোলপোস্ট। সেই জমানো ইঁটের কাছে একদিকে তার স্কুলের ব্যাগ। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আজকেই কুড়িয়ে পাওয়া সোনালী বাঁটের ছুরিটার কথা। সে দ্রুত তার ব্যাগ থেকে ছুরিটা বের করে দৌড়ে যায় মাঠের মাঝখানে। ছুরিটা ছুঁড়ে দেয় লাট্টুর হাতে। লাট্টু ক্রিকেটের ক্যাচ ধরার মতো লুফে নেয় ছুরিটা। আর কোথায় কি একটা চাপ দিয়ে টিপতেই ছুরির বাঁটের ভিতর থেকে সড়াৎ করে বেরিয়ে এল একটা লম্বা ফলা। ছুরির ফলার মতই আকৃতিতে। কিন্তু আগুনের মতো টকটকে লাল। যেন আগুন দিয়ে তৈরি। ওরকম ছুরি শুকু তো শুকু, শুকুদের গ্রামেরও কেউ কোনদিন দেখেনি। তাকালেই মনে হয় কামারশালার গরম লোহার পাত। ঐ ছুরি দেখামাত্রই ভাকুর দলের লোক দে দৌড়, দে দৌড় চম্পট।

লাট্টু শুকুর দিকে তাকিয়ে বললে—ওঃ, তোর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেলাম। ভাগ্যিস সময় মতো ছুঁড়ে দিয়েছিলি ছুরিটা। কিন্তু এ ছুরি তুই পেলি

কোথায়? তোর তো ছুরি ছিল না কোনদিন।

শুকু মিথ্যে করে বললে—

—বাবা এনে দিয়েছেন কলকাতা থেকে।

—কলকাতা থেকে? কলকাতায় এরকম ছুরি পাওয়া যায় নি তো কখনো?

সেই সময় এগারো এগারো বাইশজন খেলোয়াড় লাট্টুকে ঘিরে। কেউ কেউ বায়না ধরলে তারা আবার দেখবে ছুরির আগুনে ফলাটা। দূরে ছিল বলে অনেকে দেখতে পায় নি। লাট্টু ছুরিটার বোতাম টেপে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে লম্বা ফলা। কিন্তু সে ফলা লাল নয় আদৌ। সাধারণ ছুরির ফলা যেমন হয় তেমনিই। লাট্টুর চোখ উঠে যায় কপালে।

—এ কী রে? এ যে দেখি অলৌকিক ছুরি! একটু আগে গনগন আগুনে দেখলাম। কোথায় গেল সে আগুন?

শুকুও অবাক! অবাক হলেও সে বুঝতে পারছে কারণটা। ঠাকুরের দেওয়া ছুরি তো। তাই হয়তো এরকম। কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়ার কথা কাউকে বলে না। বললে সকলেই তো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে পেয়ে যাবে এই রকম সব ছুরি।

বাড়িতে ফিরে ছুরির কথা কাউকে বলে না শুকু। নিজেও ভয়ে ভয়ে হাত দেয় না ছুরিতে। লুকিয়ে রাখে বইয়ের পিছনে। যদিও মাঝে মাঝেই প্রবল ইচ্ছে করে ছুরিটা হাতে নিয়ে বোতাম টিপে দেখতে। যদি আবার বেরিয়ে আসে আগুনের ফলা।

তিন চার মাস পরের কথা।

ডাকাত পড়ল শুকুদের পাশের বাড়িতে। প্রথমে বোমার আওয়াজ পর পর কয়েকটা। বোমা ফাটিয়ে পাড়াপড়শিকে ভয় দেখানো। যাতে কেউ না এগিয়ে আসে লাঠি-সোটা নিয়ে। বোমার শব্দেই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় শুকুদের বাড়ির সকলের। সেদিন রবিবার। শুকুর বাবাও বাড়িতে। শুকুর বাবা বারণ করে।

—আলো জ্বালতে হবে না। আজকালকার ডাকাতরা ফেরোসাস। আমরা আলো জ্বেলেছি দেখে হয়তো আমাদের উপরেই হামলা করবে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শুকুদের বাড়ির উঠোনের দিকটা আলোয় আলো। তারপর আবার অন্ধকার। বারণ করা সত্ত্বেও আলো জ্বালানো হয়েছে দেখে শুকুর বাবার বিকট চিৎকার। শুকুর মা বলেন—

—কই আমি তো জ্বালাই নি কিছু। শুকু জ্বালাল নাকি?

শুকুর শোবার ঘরে গিয়ে দেখা গেল শুকু নেই। শুকুর বাবা মা কাঠ। তাহলে আলো জ্বালিয়ে ডাকাতদেরই কেউ এসে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল নাকি শুকুকে? কান্নায় ফেটে পড়ার মতো অবস্থা। তবুও ডাকাতদের ভয়ে কাঁদতে পারেন না কেউ। শোকার্ত হয়েও অন্ধকার বিছানায় বসে থাকেন চুপচাপ আর চোখের জল ফেলেন নীরবে। তাঁদের কান্না শুনে শুকুর বোনও কাঁদে। বাড়ির ঝি-চাকর সকলেই ফোঁসফোঁস। একটু পরেই হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে বিকট চিৎকার। শুকুর বাবা মা শিউরে ওঠেন। বোধহয় পাশের বাড়ির লোকজনদের খুন করছে ডাকাতরা। আরও একটু পরে বিকট চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম হাঁক-ডাক। এমন কি কেউ যেন গলা ছেড়ে ডাকছে শুকুর বাবাকে। শুকুদের অন্য পাশের বাড়ির ভূষণবাবু। বাইরে এসে শুকুর বাবা দেখতে পান পাশের বাড়ির ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আলো। আর বাড়ির লোকজন দৌড়-ঝাঁপ করছে উপরে নীচে। সাহস পেয়ে শুকুর বাবা বাড়ি থেকে বেরোন শুকুর মা-এর জ্বেলে-দেওয়া হ্যারিকেন হাতে। ক্রমে অন্যান্য আরো সব পাড়াপড়শিরাও দল বেঁধে আসে ডাকাত-পড়া বাড়ির দিকে। বাড়ির উঠোনে গ্রামের মানুষ জমা হয়ে দেখল যমদূতের মতো তিনটে ডাকাত আধমরার মতো শুয়ে আছে একতলার বারান্দায়। তাদের মাথায় লাল ফেট্টি আর হাতের খড়্গ ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে সেখানে। বাড়ির কর্তা বংশীবাবু ও বড় ছেলে যখন সকলের সামনে এসে দাঁড়াল লোকের মুখে উৎকণ্ঠ জিজ্ঞাসা—

—কি করে ধরা পড়ল এরা?

—কিছুই বুঝলাম না। আমাদের তো আটকে রেখে দিয়েছিল ঘরে। ভিতরে আটকে থেকেও যেটুকু বুঝতে পেরেছি, কোথা থেকে প্রচণ্ড একটা আলো এসে ঢুকল আমাদের বাড়িতে। তারপরেই ডাকাতদের ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার। আর কে যেন এসে খুলে দিল আমাদের দরজা। আমরা বাইরে বেরিয়ে আর দেখতে পেলাম না সে আলো।

এই সময় ভিড়ের ভিতর থেকে সামনে এগিয়ে এল লাট্টু। সে বললে—

—আমি জানি কি ঘটেছে ঘটনাটা।

—তুই কি করে জানবি। তুই কি তখন ছিলি এখানে?

—না থাকলেও বুঝতে পারছি সবটা। ডাকাতদের কাৎ করেছে শুকু।

—শুকু? ঐটুকু ছেলে শুকু কি করে কাৎ করবে এই রকম ষণ্ডামার্কা তিনজনকে। কিন্তু শুধু তো তিনজনই আসে নি। বাকি সাকরেদ পালিয়েছে ডাক

ছেড়ে। তবে এ তিনজন যে আসল সেটা বোঝা যাচ্ছে বেশ।

সকলের চেয়ে অবাক হয় শুকুর বাবা।

—বল কি? শুকুতো পয়লা নম্বরের ভিতু। এত ভিতু যে অনেকবার চেয়েছে, তবুও ওকে একটা ছুরি পর্যন্ত কিনে দিই নি কখনো। পাছে ভয় পেয়ে নিজেই না কেটে বসে নিজের হাত পা।

লাট্টু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—

—আপনি কিনে দেন নি ছুরিটা? তাহলে ঐ অলৌকিক ছুরিটা পেল কোথায়?

—ছুরি? অলৌকিক ছুরি? আমি কিনে দিয়েছি। কি বলছ তুমি?

—আজ্ঞে নগেন কাকা, ঠিক বলছি আমি এই ডাকাতরা যে কাৎ হয়েছে সেটা শুকুর অলৌকিক ছুরিতেই। ছুরিটার মজা হল, এমনি সময় খুললে ফলাটা দেখা যাবে সাধারণ। কিন্তু কোন অন্যায়ের প্রতিবিধানে খুললে তার ফলা থেকে আগুন ঠিকরোয়।

—তাই নাকি? পৃথিবীতে আছে নাকি এরকম ছুরি? থাকেও যদি, শুকু পেল কোথায়? ডাকাত-পড়া বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরেই শুকুর ডাক। শুকু উঠে আসে তার বিছানা থেকে।

—পাশের বাড়ির ডাকাতদের কাৎ করেছিস নাকি তুই?

শুকু চুপ করে থাকে। শুকুর মা আঁতকে ওঠেন।

—ওমা সেকি কথা! ও কি করে ডাকাত পাকড়াবে? হ্যাঁরে, তোর বাবা যা বলছে সত্যি?

শুকু মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

—সে কি রে, কি করে?

শুকু তার অলৌকিক ছুরির কথা স্বীকার করে।

—কোথায় পেলি তুই অমন ছুরি?

তুমি বলেছিলে ঠাকুরের কাছে এক মনে প্রার্থনা করলে সব কিছু পাওয়া যায়। আমি প্রার্থনা করেছিলাম। পরের দিনই কামারশালার কাছে তেঁতুলতলার ছায়ায় কুড়িয়ে পাই এটা। তবে কাউকে বলবে না কিন্তু প্রার্থনার কথাটা, তাহলে সকলেই প্রার্থনা করবে।

—আচ্ছা, তা না হয় বলব না। কিন্তু এবার তুই প্রার্থনা কর যেন ঠাকুর পড়াশোনায় মতি দেয় তোর।

শুকু চলে যাচ্ছিল তার শোবার ঘরে। মা ডাকল।

—হ্যাঁরে, ছুরিটা দেখতে কেমন দেখাবি না আমাদের একবার?

—আনছি।

শুকু চলে গেলে শুকুর মা তার বাবাকে বলে—

—ঐ তখন যে আলো জ্বালালে বলে চিৎকার করে উঠলে তুমি, তখন তাহলে শুকুর ঐ ছুরি থেকেই জ্বলে উঠেছিল আলোটা।

শুকুর বাবা গম্ভীর মুখে বলেন—

—সেটা বুঝতে এতক্ষণ সময় লাগল তোমার?

গল্পটা এখানেই শেষ। তবে এর একটা পুনশ্চ আছে। আসলে বাকি রয়ে গেছে দুটো কথা।

এক, ডাকাত ধরার ব্যাপারে শুকুর দুঃসাহসিকতা আর তার অলৌকিক ছুরির ঘটনা মুখে মুখে রটতে রটতে ছড়িয়ে পড়েছে সারা তল্লাটে। সে এখন তল্লাটের হীরো। রোগা পটকা শুকু এখন বীরত্বের প্রতীক।

দুই, শুকু ছুরি পেল। ছুরি তাকে বিখ্যাত করল। কিন্তু সে ছুরি কোনদিন নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারল না বলে তার মনের মধ্যে চাপ বেঁধে রইল আগেকার সেই ছুরি না-থাকার দুঃখ। অমন অলৌকিক ছুরি থাকা সত্ত্বেও এখনো কাগজ কাটতে, পেয়ারা কাটতে ছুরি চাইতে হয় সকলের কাছে।

খাইয়া আসিয়াছি, নিজের জীবনে কখনও তেমন মোচ্ছব বসাইবার কোন অপারচুনিটি পাই নাই। এখন মরণে একবারের জন্য সে অপারচুনিটি জুটিল। সেই ভাবিয়া নিশ্চয় আসিবে। স্নেহ-ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমার পরলোকগত
নুটুঠাকুর্দা

চিঠির খামের মধ্যে মোটা একগোছা একশো টাকার নোট। অন্তত খানপঞ্চাশেক তো বটেই।

বেদব্যাস কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে থাকে। তারপর সেই খাতাখানি খোলে। দ্যাখে, খাতার হেডিংই হচ্ছে, 'আত্মা নামাইবার সহজ পদ্ধতি'। যথা ঃ

যাকে নামাবার ইচ্ছা আগে তাকে বেশ ভালভাবে চিন্তা করে নিয়ে ঘর অন্ধকার করে, সাদা কাগজে একটি বড় বৃত্ত আঁকবে। তারপর তার মধ্যে আর একটি বৃত্ত আঁকবে, তারপর তার ভিতরে আর একটি বৃত্ত আঁকবে ... তারপর আর একটি, তারপর আর একটি, তারপর, তারপর, তারপর, ... পাতার পর পাতা 'তারপর'...

বেদব্যাসের মাথা ঘুরতে থাকে। তারপর-এর পাতাগুলি উলটে দ্যাখে, অতঃপর একমুঠো সাদা সর্ষে প্রতিটি বৃত্তের মধ্যে দশটি করে স্থাপন করবে। অতঃপর—কালো তিল দিয়ে প্রতিটি বৃত্তের মধ্যে ...

বেদব্যাস দ্যাখে পাতার পর পাতা 'অতঃপর'।

বেদব্যাসের চোখ জ্বালা করতে থাকে। অতঃপরের পৃষ্ঠাগুলো উলটে ফেলে। দেখতে পায়, 'তৎপরে'।

চলতে থাকে এই তৎপরে।

তৎপরের অধ্যায় শেষ হলে 'এইবার' ...

পাতার পর পাতা চলতে থাকে 'এইবার'। ভূত বা আত্মা নামাবার এই সহজ পদ্ধতিটি দেখতে দেখতে বেদব্যাসের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে, চোখে ধোঁয়া দেখতে থাকে, বুক-ধড়ফড় করতে থাকে, কান-কটকট আর পেট ব্যথা করতে থাকে।

বেদব্যাস শুয়ে পড়ে ভাবতে থাকে, টাকাটা কোন সহজ পদ্ধতিতে নুটুঠাকুর্দাকে ফেরত দেওয়া যায়। না দিতে পারলেই তো বিবেকের অথবা ভূতের কামড়।

আলো জ্বালিয়ে গিয়েছিল

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সরাসরি ভূত দেখার দুর্ভাগ্য আমার না থাকলেও আমি খুব ভূতের ভয় পাই। যে ঘটনার কথা বলছি সেটা এই কয়েকদিন আগের। আমার বাড়িতে একজন কাজের মেয়ে ছিল—তিন চার মাস কাজ করার পরে সে বাচ্চা হতে গিয়ে মারা যায়। তারপর রাত্তিরে আমি একেবারেই একলা থাকতে পারতাম না। মনে হত ওকে ঠিক দেখতে পাব। আগেই বলেছি আমি একদমই একলা শুতে পারি না। গত কয়েকদিন আগে আমি আমার মেয়ের ঘরে একটা ক্যাম্প খাট পেতে শুয়েছিলাম, ঠিক সেই জায়গায় যেখানে ওই কাজের মেয়েটি শুত। পাশের খাটে মেয়ে ঘুমোচ্ছে। রাতে হঠাৎই ঘরের আলোটা আপনা-আপনি জ্বলে উঠল। আমার মনে হতে লাগল ঘরে আমি ছাড়াও অন্য কেউ আছে। এরপর আমার স্ত্রী এসে আলোটা নিভিয়ে দেন। ভেবেছিলেন আমি বোধহয় ভয় পেয়ে আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার স্ত্রী চলে যাওয়ার পরে আবার আলোটা জ্বলে ওঠে—, পাখাটা বন্ধ হয়ে যায়। আমি উঠে গিয়ে আলোটা নেভাবার সময় দেখি সুইচটা লুজ হয়ে গেছে কিনা। অথচ বেশ শক্তই ছিল—গায়ের জোরে জ্বালাতে হচ্ছিল। এরপর আমি ও ঘর ছেড়ে চলে যাই। আমার বিশ্বাস ওই মেয়েটির আত্মা বা ভূত যাই বলি না কেন, ওই সময়ে ওই জায়গায় এসেছিল। ওর জায়গায় আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে—নানাভাবে আমাকে বিরক্ত করছিল যাতে জায়গাটা ছেড়ে দিই। এরপরে আর কখনও ওই ঘরে শোওয়ার কথা ভাবতেই পারিনি।

ভূতের সঙ্গে খেলা

শক্তিপদ রাজগুরু

প্রথমে যেতেই চাইনি আমরা।

কিন্তু শেষ অবধি পটলার কথাতে রাজী হতে হল। তবু হোঁৎকা বলে—হেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের শীল্ড ফাইনালে খেলতে যামু?

পটলা বলে—ওদের ক—কথা দিয়েছি। দুতিনটে খেলা—জিতবই। ইয়া শীল্ড পাবি। নগদ ক-ক্যাশ পাবি হাজার আর খাওয়াবেও খুউব।

হোঁৎকার টাকার চেয়ে, খাওয়ার দিকেই নজর বেশী। এমনিতেই পেটুক সে। বলে—খাওয়াইব?

পটলা শোনায়—খাসির মাংস করছি। ভেড়ির ইয়াস-সাই্ জের গ-গলদা-

হোঁৎকা কি ভেবে বলে—এই চল!

পটলার পিসেমশাইদের গাঁ, হাসনাবাদ লাইনের একটা ছোট্ট কি স্টেশনে নেমে ইট বিছানো পথ, চারদিকে ফাঁকা মাঠ, দু'একটা গ্রামও পড়ে একেবারে যেন বনে ঢাকা, নিঝঝুম। ওই পথে ভ্যান রিক্সায় উঠে আছাড় খেতে খেতে যেতে হয়।

প্রথমবার গিয়েই ওই ভ্যানে চড়ে মনে হয় কাঠখোলায় যেন খই ভাজা হচ্ছে, ওলটপালট খেতে থাকি আছাড়ের চোটে। হাতপায়ের হাড় গোড় যেন ছিটকে যাবে।

ফটিক বলে—এর চেয়ে হেঁটেই চল।

ফুলটিম নিয়েই গেছি। অবশ্য প্রথম দিন থেকেই ওই গোবিন্দপুরের লোকরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা পটলার ফর্দমত তেমন না রাখলেও খারাপ রাখেনি।

এবার ফাইন্যাল খেলা—তারপর ওখানে নাকি জোর খাবার ব্যবস্থা আর রাতেও অন্য অনুষ্ঠান হবে। রাতে থাকতে হবে।

হোঁৎকা বলল—শীল্ডও নিতি হইব সিওর।

অন্যদিকে ফাইন্যালে উঠেছে শ্যামনগরের কোন্ টিম। আমাদের ফুটবলের ক্যাপটেন গোবর্ধন ওরফে গোবরার চেহারাটা দশাশই। ব্যাকে খেলে। বল যায় যাক, কোন প্লেয়ারকে সে গলতে দেবে না। গোবরা বলে—জিতেই গেছি ধর।

মহাসমারোহ শুরু হয়েছে ওই বনে ঢাকা দূর ওই গোবিন্দপুরে।

এবার আমাদেরও বিশেষ খাতির করে স্টেশন থেকে গোটা পাঁচেক ভ্যানে করে নিয়ে যায়। আর সকালে গিয়ে, গ্রামখানাকেও দেখি।

সরু ইট ফেলা পথ—অনেক পথ একেবারে মাটিরই। বর্ষাকাল, চারিদিকে আকাশমণি, চটকা-দেওদার-আমড়া নানা গাছের ঘন জঙ্গল। আর বর্ষার জলে নীচে গজিয়েছে কালকাশিন্দা, বন ধুধুল—তেলাকুচা নানা লতাগাছের জঙ্গল। ওই বনের মধ্যেই বাড়িখানা।

এককালে বিশালই ছিল। এই অঞ্চলে তখন নীলের চাষ হত প্রচুর। বিস্তীর্ণ এলাকার নীলচাষের তদারকি করার জন্য সাহেবরা এখানেই তাদের আস্তানা গেড়েছিল। বিশাল এলাকা সাজানো বাগান, বিশাল বাড়ি—লাগোয়া অফিস ঘর, আস্তাবল এসব তো ছিলই আর পাশেই ছিল কুঠি। চিমনিটা এখনও বনজঙ্গল ভেদ করে আকাশে মাথা তুলে রয়েছে। তাতে গজিয়েছে বট অশ্বত্থের গাছ।

সামনের বাগান এর শেষ চিহ্ন হিসাবে মাথা তুলে রয়েছে দুতিনটে বইল পাম—আর একটা প্রাচীন বকুল গাছ। বাকী সব ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি। মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ গেছে ও বাড়ির দিকে।

পিছনদিকটার অধিকাংশই ভেঙে পড়েছে। এই সামনের দিকে কিছুটা রয়েছে। কোনমতে মেরামত করে কয়েকখানা ঘর ব্যবহারের যোগ্য করা আছে, দোতলার সাবেক আমলের কাঠের সিঁড়ি।

এটাতে ওই ক্লাবই একটা প্রাইমারী স্কুল চালায়, নীচের একটা ঘরে দাতব্য চিকিৎসালয়ও চলে।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ওই বাড়ির দোতলায় একটা বড় হলঘরেই, বিশাল সাবেকী আমলের দরজা জানালাগুলিই বেশ বড় বড়। ঘরের মেঝেতে টানা গদি বিছিয়ে চাদর পেতে শয়নের ব্যবস্থা হয়েছে।

নীচের একটা চালায় রান্নার আয়োজন চলছে। হোঁৎকা এমনিতে সাহসী, আর ওর মাথায় নানা ফন্দী ফিকিরও বের হয়। ফটিক এসে ফরাসে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে বলল,—বাব্বাঃ—এ যে সিনেমার হলঘর রে!

আমাদের গোলকিপার নন্দ বলে—কোথায় আনল ফটিকদা, এ যে একেবারে বনস্পুরী। চারিদিকে পেল্লায় জঙ্গল, সাপখোপের রাজ্যি—ভয় আমারও হয়।

এতকালের পুরোনো বাড়ি—পিছনের দিকটাতো প্রায় ধ্বংস স্তূপের মতোই। হোঁৎকার মতো সাহসীরও যেন বুক কাঁপে। বলে সে,—

—সাপটাপ ছাড়া ইয়ে ত্যানারা নাই তো?

—মানে! আমার কথায় নন্দ বলে—ভূত-টুত-নাইতো!

গোবরা গর্জে ওঠে—সব কাওয়ার্ড তোরা। এখন খেলার কথা ভাব। আর

ত্যানাদের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিন গোলে জিততে পারি—

হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে চমকে চাইলাম। যেন বর্ষার জরাজীর্ণ বাড়ির কিছু ধ্বসে পড়ল। নাহ—দমকা হাওয়ায় ভারী দরজাটা আছড়ে পড়ছে, সারা বাড়ি যেন ওই শব্দে কেঁপে ওঠে। আমরা অবাক হই, ঝড়ও নাই। ভারী পাল্লাটা আছড়ে পড়ছে।

গোবরা বলে—খেলার ছকটা কষে নে! ওদের বাঁদিকের প্লেয়ারগুলি একটু কমজোরী—এ্যাটাক ও দিক থেকেই করতে হবে।

খেলার জন্য গোবিন্দপুর যেন ভরে উঠেছে।

মাঠের ওদিকে বিরাট মঞ্চ, খেলার পর ওখানে অনুষ্ঠান হবে। খেলাও শুরু হয়।

শ্যামনগরের টিম তো দশমিনিটের মাথায় প্রথম গোল করে দিল, কি উল্লাস দর্শকদের। আমরা যেন জলকাদার মাঠে মিইয়ে গেছি। তারপর আর একখানা গোল।

আমাদের দফা রফা হয়ে গেল। হাফটাইমের আগেই আমরা যে হেরেই গেছি ধরে নিয়েছে সবাই।

হোঁৎকা বলে—শ্যাষ ম্যাষ ছিল এই কপালে? ওই অপয়া বাড়িতে উঠছি তাই গেল গিয়া শীল্ডখান্—গোবরা কি ভাবছে।

হঠাৎ মনে হয় ওই গাছগুলো যেন নড়ছে, ঝড়ো হাওয়া এসে পড়ে কোথা থেকে—মেঘও জমেছে। আর গোবরা হঠাৎ যেন হুঙ্কার দিয়ে বলে—জিতবই। নাম এবার।

কি যেন এক প্রত্যাদেশই পেয়েছে সে। খেলা শুরু হল। আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের এগারোজন প্লেয়ার হঠাৎ যেন এগারোটা আগুনের গোলায় পরিণত হয়েছে। গতিবেগও বেড়ে গেছে দলের।

আর ব্যাক থেকে গোবরা ব্যাককিক্ করছে বল এসে পড়ছে ওদের গোলপোস্টে। আমিও বুঝতে পারছি না যেন হাওয়ায় উড়ছি। বল আমি মারার আগেই কে যেন আগেই মারছে আর পড়ছে গিয়ে ওই কোণে আমাদের প্লেয়ারের পায়েই। সেও আকাশে লাফিয়ে উঠে হেড দেয় বলটা ফিরে আসে আমার কাছে, মনে হয় কে আমাকে শূন্যে তুলে দেয়, বলটা মাথায় লেগে বাঁদিক দিয়েই গোলে ঢোকে।

সকলেই হতভম্ব। এভাবে গোল হয় তা ভাবতেও পারে না। রেফারির বাঁশী বাজে। গোওল—এবার আকাশ ফাটানো শব্দ ওঠে। সেন্টার থেকে বল আর আমাদের দিকে আসে না। মনে হয় আমাদের পাশে পাশে আর কোন দলই

খেলছে। শ্যামনগরও টিমের ব্যাক হেড করার আগেই নিজের পায়ে লেগে নিজেই ছিটকে পড়ে। সেই ফাঁকে ফটিক সেকেণ্ড গোল করে।

এবার শ্যামনগর লড়ছে, কিন্তু নিজেরাই ছিটকে পড়ে—কি যেন তাদের ঠেলে ফেলছে—তাদের বল নিয়ে আমরাই পরপর আরও দুখানা গোল ঠেসে দিলাম।

শীল্ড জেতাও হল।

শ্যামনগরের দল রানার্স কাপ নিয়ে চলে গেল। গোপালপুর আমাদের নিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সারা গাঁয়ের কাদাপথে হাঁটাল।

হৈ চৈ চুকতে প্রায় রাত নটা বেজে গেল। তারপর এলাহি ভোজ। হ্যাঁ। হোঁৎকা নিজে প্রায় গোটা ছয়েক ইয়া সাইজের গলদার মালাইকারি খেল। মাংসও খেল তেমনি। গোবরা বলে,—

—এত খাসনে।

হোঁৎকা বলে—কমই খাইছি। নাঃ মাছ তো ভালই—চমচমও খাসা করছে।

রাতের অন্ধকারেই বৃষ্টি নেমেছে। আর সারা গ্রাম এখন নিশুতি। এদিকে জনমানবও নাই। বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হয়েছে ঝড়, উথালপাতাল ঝড়। বিশাল গাছগুলির ঝুঁটি ধরে কে যেন নাড়া দিচ্ছে। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানালাগুলি খুলে যায়।

বিজলিবাতি এখানে নেই। দুটো হ্যারিকেন দিয়েছিল—একটায় তেল নাই, অন্যটা এক কোণে টিম টিম করে জ্বলছে। হঠাৎ ওই ঝড়ের রাতে কার আর্তনাদ শোনা যায়।

যেন কার গলা টিপে ধরেছে কেউ—আর সে প্রাণপণে চিৎকার করছে। জেগে উঠেছি আমরা।

হোঁৎকা বলে—মার্ডার করছে না তো? ওই—একটা মাত্র টর্চ, পটলা বলে ওঠে—যাস নে—যা—যাস্ নি—নে—উত্তেজিত হলে ওর তোতলামি আরও বেড়ে যায়। ওদিকে ঘরে যেন তাণ্ডব চলেছে। দরজা জানালাগুলি দুমদাম শব্দে আছড়ে পড়ছে। সিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ ওঠে। কারা যেন একযোগে তেড়ে আসছে। সারা বাড়ি—ঘরগুলিতে যেন কাদের আনাগোনা—দাপাদাপি শুরু হয়েছে।

হোঁৎকাও ঘাবড়ে যায়। বলে—ভূত—ভূতই হইবে।

রাম নাম—

আর কথা বলতে পারে না সে। কে যেন তার মুখ টিপে ধরেছে, যাতে ও রাম নামও উচ্চারণ করতে না পারে।

আর পিছন দিক থেকে ওই ধ্বংসস্তূপ ফুঁড়ে যেন কয়েকজন ঘোড়সওয়ার বের হয়ে ঘোড়াগুলিকে নিয়ে বাগানে দাপাদাপি করছে।

গোবরা আমি—নন্দ—অন্যরা হতচকিত হয়ে দেখছি ওই বিচিত্র দৃশ্য। চারিদিকে আর্তনাদই ওঠে। ওই ঘোড়সওয়ারের দল দড়ি দিয়ে বেঁধে অনেক মানুষজনকে এনেছে, আর সেই হাত-পা বাঁধা লোকগুলিকে কয়েকজন বিদেশী পোশাক পরা—টুপি পরা লোক চাবুক দিয়ে মারছে নির্দয়ভাবে। কেউ আর্তনাদ করে—কেউ ছিটকে পড়ে। তবু সেই লোকগুলি সমানে চাবুক মেরে চলেছে নির্দয়ভাবে।

আমরা কেউ কথাই বলতে পারছি না। জড়াজড়ি করে এককোণে সমবেত হয়েছি। ওদের ওই তাণ্ডব দেখছি।

হঠাৎ দরজাটায় ধাক্কা মেরে কে যেন ঢোকার চেষ্টা করছে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ঢোকার উপায় নেই। কিন্তু লোকটাকে দেখে অবাক হই। দীর্ঘদেহ—মজবুত স্বাস্থ্য। পরনে হাফপ্যান্ট—জারসী, পায়ে হোস—বুট। একেবারে ফুটবল খেলোয়াড়ের পোশাক, পিছনে আরও দুতিনজন প্লেয়ার।

একজন বলে—খেললাম আমরাই। তোরা তো দুগোল খেয়েছিলি আগেই, পরেও আরও দুতিনখানা গোল দিয়ে তোদের গোহারান করে দিত। আমারই এখানে আছিস জেনে দয়া করে খেলে তোদের জিতালাম। তোরা তো নড়তেই পারছিলি না। তাই তোদের হয়ে খেলে শীল্ড পাইয়ে দিলাম।

ওদের কথায় অবাক হই। মনে হয় আমরা তো হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। জিতব ভাবিনি। কিন্তু জিতেছি, আর মনে হয় মাঠে আমরা দৌড়েছিলাম, প্রতিপক্ষের প্লেয়ারদের আর কেউ যেন চার্জ করে ছিটকে ফেলেছে—আর বলগুলি গোলের মুখে এসে পড়তে যেন যাদুবলে গোলে ঢুকেছে। জিতেছি আমরা।

ওই লোকটা বিজাতীয় ভাষায় বলে—তোরা বেইমান। শীল্ড নিয়ে নাচনকোঁদন করলি, ওই হোঁৎকা হাফডজন ইয়া গলদা চিংড়ি—এত এত মাংস খেল, রসগোল্লা খেল, আমাদের কিছুই দিলি না।

গোবরা বলার চেষ্টা করে—তোমরা কে? কোথায় থাকো?

—সাট আপ্। বেইমানের দল। সবকটাকে ঘরে বন্ধ করে চাবকে সিধে করব।

ভয়ে কাঁপছি। একটু আগেই ওদের চাবকানোর ব্যাপারটা দেখেছি। ওই কাজ ওরা ভালই করে। গোবর্ধন বলে, ওরে বাবা! বাঁচাও ভূত বাবাজী।

—ভূত! আমরা ভূত?

হোঁৎকা জীবনে এমন পাল্লায় পড়েনি। বলে সে—ভূত কইছে না, পোলাপান গো'গোর কথা ছাড়ান দ্যান।

গর্জে ওঠে লোকটা—তোমার ওই কিচিরমিচির কথা বুঝিনি। ইউ সাট আপ।

মনে হয় এসব ভূত বাঙ্গাল কথা বোঝে নি। তাই বলি।—আমরা দেখিনি তোমাদের আগে। তোমরাও কিছু বলনি, তাহলে খাবার সময় নিশ্চয়ই ডাকতাম।

একটা ভূত বলে—সব খেলি তোরা। পড়ে আছে মাংসের হাড় আর গলদা চিংড়ির খোলা।

পটলা বলে—তোমাদের ভ-ভরপেট মাংস—গ—গ গলদা চি—চি—

গর্জে ওঠে লোকটা—কি চি চি করছ ইউ বয়েজ—মশাই—ওর জিবটা আলটাকরায় মাঝে মাঝে সেট হয়ে যায় সাহেব। ও বলছে তোমাদের ভরপেট মাংস ইয়া সাইজের গলদা চিংড়ি খাওয়াবে। এবারের মতো ছেড়ে দাও আমাদের।

ওরা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে। বলে—ঠিক তো?

পটলা বলে—আপন্ গড বলছি।

গর্জে ওঠে লম্বা ভূত—সাট আপ। ওসব অপবিত্র নাম কদাপি আমাদের সামনে বলবে না। আর মাংস মাছ না খাওয়ালে তোমাদের সব কটার ঘাড়ই মটকে খাব। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

পটলা বলে—সিওর খাওয়াব।

—হ্যাঁ। সাত দিনের মধ্যে। সেভেন ডেস। মনে থাকে যেন। তারপরই দেখি আমাদের সাধের শীল্ডখানা খোলা জানালা দিয়ে যেন ডানা মেলে বের হয়ে গেল।

আর ওই অন্ধকার বাগানে তখন ব্যাণ্ড বাজছে—ঝড় বৃষ্টির মাঝেই আলো জ্বলছে—ওই শীল্ডখানা যেন কোন অদৃশ্য কেউ মাথায় নিয়ে ঘুরছে। ওই ভূতের দলই এবার তাদের জয়ের পরিচয় হিসাবে শীল্ডটা নিয়ে শোভাযাত্রা করছে বাদ্যভাণ্ডসহকারে। আর নাচন কোঁদনও চলছে সমানে।

আমরা ভয়ে কাঁপছি—

এরপর আবার কি কাণ্ড করে ওই অশরীরীর দল কে জানে। হোঁৎকা বলে—শীল্ড লই গেছে যাউক—চল পরানটা থাকলি এমন শীল্ড অনেক পামু। —

কি করবি? আমিও বুঝতে পারছি না এসময় কি করা উচিত। গোবরা শীল্ডের মায়া ছাড়তে পারে না।

বলে সে—আমাদের শীল্ড। এত কষ্ট করে পেয়েছি—এমনিই ফেলে যাব।

ফটিক বলে—তুই যা। তোকেও ভূত বানিয়ে, দলে নেবে। শীল্ড নিয়ে পড়ে থাক তুই।

হোঁৎকা বলে—চল, কাইটা পড়ি পিছন দিই।

মালপত্র রইল পড়ে। চাচা আপন পরান বাঁচা, সেই কথা মতই ওই ঘর থেকে বের হলাম।

পিছনে সবই ভাঙা চোরা, বৃষ্টির জলে কাদা—পিছল।

কিন্তু প্রাণের দায়ে মানুষ করতে পারে না হেন কাজ নেই। ওই ভাঙা বাড়ি-সাপখোপের রাজ্য, তবু কোনমতে পাঁচিল বেয়ে—বেড়া টপকে কোনমতে বাঁশবনে এসে পড়লাম।

অন্ধকার চারদিকে—জোনাকি জ্বলে। তখনও বৃষ্টি কমলেও ঝড় সমানে চলছে। কোনমতে ওই ভূতের এলাকা থেকে বের হয়ে এলাম গ্রামের পথে। কোন্‌দিকে যাবো জানি না—। হোঁৎকা বলে—বড় রাস্তা ধইরা চল। উঃ—কোনখানে আইছিরে। পটলাও পথ চেনে না।

বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছি—হঠাৎ কার ডাকে থমকে দাঁড়াই। এ আবার কোন ভূত কে জানে!

ভূত নয়—টর্চের আলো পড়ে।

ওদিকে ক্লাবের ঘর, কিছু ছেলেও বের হয়ে আসে। তারা আমাদের ওই অবস্থা দেখে অবাক। ভোর হয়ে আসছে—লোকজন জেগে ওঠে। দু একজন বয়স্ক লোকও এসে পড়ে। তারা সব শুনে বলে—ওখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলি? ওই ভূতুড়ে সাহেব কুঠিতে! ইস—জোর বেঁচে গেছ তোমরা।

সকালে দলবল নিয়ে যাই, দেখি কুঠি শুনশান। তখন বৃষ্টিও থেমেছে। জনমানব নেই, দোতলার ঘরে আমাদের মালপত্র-মায় ফুলের মালা পরানো শীল্ডটা অবধি যথাস্থানেই রয়েছে। কোথাও সেই হৈ চৈ হুঙ্কার-আর্তনাদও শোনা যায় না।

তবু কেমন গা ছমছম করে। তখনই মালপত্র নিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। পটলা বলে—ব্যাটা ভূতদের খাওয়াব বলেছি।

হোঁৎকা বলে—সাতদিন যাইতে দে। তারপর আমরাই খামু ওই মাংস উইথ গলদা চিংড়ি।

—সেকি।

আমার কথায় হোঁৎকা বলে—ওই অজ পাড়াগাঁয়ের ভূতরা কলকাতায় আইসা তম্বি হাম্বি করতি পারবে না। এখানের ভূতগোর সাথে ওগোর ফাইট বাইধা যাবে।

সাতদিন কেন সাতাশদিন কেটে গেছে আর কোন অঘটন ঘটেনি। সেই রাতের কথা ভুলিনি।

বছর কুড়ি আগে

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

এই গল্প যারা পড়বে তারা সকলেই হয়তো একবাক্যে বলবে এটা স্রেফ চমক সৃষ্টিকারী মস্তিষ্কপ্রসূত একটা ঘটনা মাত্র। কিন্তু এই গল্প যিনি আমাকে বলেছিলেন তাঁকে অবিশ্বাস করার মতো মানসিকতা আমার অন্তত নেই। ঘটনাকালও খুব বেশি পুরনো দিনের নয়। মাত্র বছর কুড়ি আগেকার কথা। মৌলালীর কাছে রতিকান্ত পোদ্দার নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। খুবই অভাবী লোক। স্ত্রী এবং দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দরিদ্রের সংসার। ভদ্রলোক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় চাকরি খুইয়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ভদ্রলোক। একেই চাকুরিহীন হয়ে মন মেজাজের ঠিক ছিল না, তার ওপর স্ত্রীর গঞ্জনা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে রতিকান্তবাবু ঠিক করলেন আত্মহত্যা করে এই কলহ ও দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই নেবেন তিনি।

এই ভেবে এক রাতে রতিকান্তবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবার অলক্ষ্যে কাছাকাছি এক বিখ্যাত কবরখানায় ঢুকে পড়লেন। পকেটে কাগজে মোড়া বিষও ছিল। এটা খেলেই সব জ্বালার অবসান হয়ে যাবে। নিরাপদে দেহ রক্ষার জন্য নির্জন কবরখানাই হচ্ছে উপযুক্ত স্থান। এখানে কেউ চেঁচামেচি করবে না, বাধা দেবে না, অথচ শান্তিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া যাবে।

তখন গরমের দিন। তায় ফুটফুটে জ্যোছনার রাত। রতিকান্তবাবু কবরখানায় ঢুকে চাঁদের আলোয় আলোকিত জায়গাটার ভেতরের রূপ দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চিরকাল এর বাইরে দিয়েই যাতায়াত করেছেন তিনি। ভেতরে কখনো ঢোকার প্রয়োজন মনে করেন নি। আজ ভেতরে ঢুকে এক গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠল তাঁর মন প্রাণ। অন্য সময় হলে কবরখানায় ঢোকার কথা সজ্ঞানে চিন্তাই করতে পারতেন না তিনি। কিন্তু মৃত্যুর জন্য যে মানুষ তৈরি, তার আর ভয় কিসের?

কবরখানায় ঢুকে এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। কত বিচিত্র রকমের স্মৃতিসৌধ যে আছে তা তাঁর ধারণারও বাইরে ছিল। অবশেষে অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটি খুব সুন্দর সোপানযুক্ত

বড়সড় স্মৃতিসৌধর ওপর বসে পড়লেন। ফুরফুর করে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ায় ঘুম নেমে আসছে চোখে। কত মানুষ তো এর ভেতরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। কাজেই এর ওপর শুয়ে যদি কেউ একটু ঘুমোয় তো কার কি বলার আছে? এই ভেবে তিনি কবর সৌধর মসৃণ পাথরের চাতালে শুয়ে পড়লেন। কেউ কোথাও নেই। নিস্তব্ধ নিঝুম চারিদিক। শুধু আগাছার জঙ্গলে ভরা। মাঝে মধ্যে দু' একটা কেঁদো কুকুরের ছুটোছুটি ছাড়া আর কারো অস্তিত্বও নেই। শুয়ে থাকতেই ঘুমে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন খেয়ালও নেই তাঁর। হঠাৎ একজনের ধমকে ঘুম ছুটে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই দেখলেন তাঁর সামনে একজন দীর্ঘ দেহ খাঁটি ইংরেজ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোছনার আলোয় সাহেবের গায়ের রঙে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরোচ্ছে। আর নীল চোখ দুটো যেন কাচের গুলির মতো চিকচিক করছে।

রতিকান্তবাবুকে উঠে বসতে দেখে কড়া গলায় সাহেব বললেন—হোয়াট নন্‌সেন্স ইজ দিস! গেট ডাউন।

রতিকান্তবাবু সাহেবের ধমক খেয়ে কবরের চাতাল থেকে মারলেন এক লাফ।

সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলায় গলার স্বর কঠিন করেই বললেন—কি নাম আছে টোমার?

—আজ্ঞে আমার নাম রতিকান্ত পোদ্দার।

—এটো রাটে তুমি কবরখানায় মড্যে আসিয়াছো কেন?

—আমি ভুল করে এসে পড়েছি সাহেব। আর কখনো আসব না।

—আর কখনো আসিবার সময় টুমি পাইলে টো আসিবে। হামি টো এখুনি টোমাকে গোলি করিয়া মারিয়া ডিবে।

রতিকান্তবাবু আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—আমাকে এবারের মতন ক্ষমা করুন সাহেব। আমি এর আগে কখনো এখানে আসি নি। মা কালীর দিব্যি আর কখনো আসবও না। বড্ড দুঃখে এখানে এসেছিলাম, বলে পকেট থেকে কাগজে মোড়া বিষটা বার করে বললেন—দেখুন, আমি এটা খেয়ে স্যুইসাইড করব বলে এসেছিলাম।

—কী ওটা?

—এটা বিষ।

—কই ডেকি?

রতিকান্তবাবু সাহেবের হাতে বিষটা দিতেই সাহেব সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—এটা খাইলে ইঁডুর ছুচা মরিবে। টুমি মরিবে কেন? ডু'একবার বমি করিলেই টো বাঁচিয়া উঠিবে টুমি। একদম ভেজাল চীজ আছে।

—টবে না টো কি? টোমরা স্বডেশীরা আসল মাল খাওয়াইবে লোককে? টা যাক। কিন্টু টুমি স্যুইসাইড করিটে আসিয়াছিলে কেন? আমি মরিয়া যেখানে বাঁচিয়া উঠিতে চাহিটেছি টুমি বাঁচিয়া সেখানে মরিয়া যাইটে চাহিটেছ কি কারণে?

রতিকান্তবাবু তো লাফিয়ে উঠলেন—আ-আপনি বাঁচতে চাইছেন? মা-মা-মানে আপনি বেঁচে নেই? তার মানে আপনি মি-মি-মৃত?

—হ্যাঁ, আমি মৃটো। বাঁচিয়া ঠাকিলে হামি এই রাট ডুপুরে টোমার সঙ্গে এইখানে কি নক্সা মারিতে আসিটাম? টুমি যে কবরের উপর শুইয়া আছ এইটাই আমার কবর।

রতিকান্ত বললেন—অ। বুঝেছি। তা আপনি কতদিন আগে মরেছেন সাহেব?

—তাহা শুনিয়া টোমার লাভ কি? টোমরা স্বডেশীরাই একডিন হামাকে গোলি করিয়া মারিয়াছিলে।

—তা হতে পারে। তবে আমি কিন্তু স্বদেশী ফদেশী নই সাহেব। দেশ এখন স্বাধীন হয়ে গেছে। আমি আপনাকে মারি নি। মা কালীর দিব্যি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন সাহেব।

—ড্যাম ফুল ব্লাডি ইডিয়ট। টুমি মরিটে আসিয়াছো যডি টো বাঁচিবার জন্য এমন ছটফট করিটেছ কেন? কান ঢরিয়া ওঠ্‌বোস্ করো। রতিকান্তবাবু তাই করলেন।

—স্টপ্। এইবার হামাকে সোট্‌টো করিয়া বলোটো টুমি এইখানে মরিটে আসিয়াছিলে কেন?

রতিকান্তবাবু বললেন—আমার দুঃখের কথা কি আর বলব সাহেব, বড় কষ্টে দিন কাটছে আমার। খুব গরীব লোক আমি। তার ওপর চাকরিটা খোয়ালাম।

—চাকরি খোয়াইলে? কেন? চুরি করিয়াছিলে না ঘুষ খাইয়াছিলে?

—ওসব কিছু নয় সাহেব। কোম্পানীটা উঠিয়া গেল।

—ফের মিট্‌টা কঠা বলিতেছ? উঠিয়া গেল না উঠাইয়া ডিলে? কোন কোম্পানী কি শুঢু শুঢু উঠিয়া যায়? যাক। টুমি টাহলে বলিটে চাও চাকরি খোয়াইয়া টুমি অসুবিঢায় পড়িয়াছ। পেট ভরিয়া খাইটে পাও না।

—হ্যাঁ, আমার বউ ছেলে মেয়ে সব আছে। আমি এখন এমনই অভাবে পড়েছি যে নিজেও খেতে পাই না, তাদেরও খেতে দিতে পারি না।

—অ। এইজন্য টুমি মরিটে আসিয়াছিলে?

—ঠিক তাই।

—মরিয়া টুমি ভূট হইটে আর আকাশ হইটে খাবার পাড়িয়া উহাডের খাইটে ডিটে, এই টো?

—হ্যাঁ।

—ইডিয়ট। টোমার কি ধারণা সব লোক মরিলেই ভূট হয়?

—জানি না সাহেব।

—ঠিক আছে। আমি টোমার সব কঠা শুনিলাম। টোমার স্যুইসাইড করিবার প্রয়োজন নাই। আমি টোমাকে একটি গিনি ডিটেছি। টুমি এইটি লইয়া যাও। এইটি বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাইবে টুমি। ঐ টাকায় টোমরা পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিবে। টাকা ফুরাইলে টুমি আবার আসিবে আমার কাছে। আমি টোমাকে আবার গিনি ডিবো। কিন্টু এই কঠা টুমি কাউকে বলিবে না। যডি বলো, আমি টোমাকে মারিয়া ফেলিব।

রতিকান্তবাবু গিনিটা পকেটে পুরেই কবরখানার বাইরে এসে একবার গিনিটা বার করে দেখলেন সত্যিই সেটা পকেটে আছে কিনা। কেননা এতক্ষণ যা ঘটে গেল তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হাত দিতেই ধাতব গিনিটা হাতে ঠেকল। এই তো, এই তো রয়েছে। তবে তো মিথ্যে নয়। কেননা তাঁর বার বারই মনে হচ্ছিল এতক্ষণ তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু চকচকে গিনিটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল এতক্ষণ যা তিনি দেখেছেন তা সত্যই।

রতিকান্তবাবু গিনিটা পরদিনই একটি জুয়েলারীর দোকানে বিক্রি করে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি অর্থ লাভ করলেন। কারণ গিনিটির ধাতব মূল্যের থেকেও এর প্রাচীনত্বের দাম ছিল অনেক।

দোকানদার রতিকান্তবাবুর পূর্ব পরিচিত। গিনি দেখেই বললেন—কী ব্যাপার রতিকান্তবাবু, এ মাল কোথায় পেলেন?

—কোথায় আর পাব মশাই? আমারই ছিল। বাবা জাহাজে কাজ করতেন। সাহেবদের নেকনজরে পড়ে গিয়েছিলেন। দু' একদিন ছাড়াই সাহেবরা বাবাকে একটা করে গিনি উপহার দিতেন। তারই কিছু কিছু জমানো ছিল। এতদিন বেচিনি। এখন অভাবের জ্বালায় বেচতে এসেছি।

—তা বেশ করেছেন। তবে একটা কথা, আপনার যখনই ওগুলো বেচবার দরকার হবে তখন আমার দোকানেই আসবেন, কেমন? কেননা এ জিনিস আমরা

দাম দিয়ে কিনলেও এগুলো আমরা নষ্ট করব না। এতদিন আপনার সঞ্চয়ে ছিল এখন আমার সংগ্রহে থাকবে, এই আর কি।

রতিকান্তবাবু গিনি বিক্রির টাকা গৃহিণীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। গৃহিণী অবাক হয়ে বললেন, 'ও বাবা! এত টাকা! কোথায় পেলে তুমি? এই যে শুনলুম তোমার চাকরি নেই।'

—চাকরি সত্যিই নেই। আপাততঃ ছোটো খাটো কাজ একটা জুটিয়ে নিয়েছি। তবে দিনমানে নয়, রাতে।

—রাতে! কোন খারাপ কাজ নয় তো?

—না। আর হলেও তোমার তাতে কি? খারাপ কাজ করলে তার ফল আমিই ভোগ করব। তুমি তো করবে না। আমি টাকা আনব, তুমি সংসার চালাবে। আমি কি করছি না করছি সে ব্যাপারে তুমি একদম মাথা গলিও না।

গৃহিণী চুপ করে গেলেন।

রতিকান্তবাবু সাহেবের কথামতো গিনি প্রসঙ্গও তুললেন না, সাহেবের কথাও বললেন না। তবে পরদিন থেকে রোজই সন্ধ্যের পর চাকরি করতে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা কবরখানায় চলে যেতেন এবং সাহেবের স্মৃতিসৌধ নিজে হাতে পরিষ্কার করে দিতেন। সাহেবও রোজই একবার করে দেখা দিতেন রতিকান্তবাবুকে এবং প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে একটি করে গিনি উপহার দিতেন।

এই ভাবেই দিন যায়।

একদিন হঠাৎ গিনি বিক্রি করতে গিয়ে রতিকান্তবাবু হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলেন সাদা পোশাকের পুলিশের হাতে। দোকানদারের কারসাজিতেই হোক বা অন্য কোনভাবেই হোক রতিকান্তবাবু পুলিশের শিকার হলেন।

পুলিশ নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে জানতে চাইল রতিকান্তবাবুকে, এগুলো চোরাই মাল, না সত্যিই তাদের পিতৃপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি। যদি তাই-ই হয় তবে তার পরিমাণ এখনো কত?

রতিকান্তবাবু কি আর বলেন? তিনি একই কথা বার বার বলতে লাগলেন—এসব চোরাই মাল নয়, সবই তাঁর পিতৃদত্ত ধন। এমন কি এও বললেন আজকের এই গিনিটি ছাড়া তাঁর সঞ্চয়ে আর একটি গিনিও অবশিষ্ট নেই। পুলিশ তবুও তাঁর কথা বিশ্বাস করল না। কেননা এই গিনিগুলির একটির সাথে আর একটির মিল নেই। যথেষ্ট সময়ের ব্যবধানে এগুলি তৈরী হয়েছিল। কাজেই একই লোকের কাছে বিভিন্ন সময়ের এতগুলি গিনি কি করে থাকতে

পারে? এটা একটা রীতিমতো সন্দেহের ব্যাপার। তাই পুলিশ রতিকান্তবাবুকে অ্যারেস্ট করে তাঁর বাড়িতে এসে ঘরদোর তছনছ করে চারিদিক তন্ন তন্ন করে নেড়ে ঘেঁটে কিছুই না পেয়ে ফিরে গেল। ফিরে গিয়েও লক আপে রাখা রতিকান্তবাবুকে ভীতি প্রদর্শন করে কথা আদায়ের চেষ্টা করতে লাগল। রতিকান্তবাবু অনেক কাঁদাকাটা করলেন। দারোগাবাবুর হাতে পায়ে ধরলেন। কিন্তু কোন ফল হল না তাতে। রতিকান্তবাবুর গৃহিণী এসেও হাতে পায়ে ধরলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দারোগাবাবু বললেন—যতক্ষণ না সত্যিকথা বলবেন উনি, ততক্ষণ ওনাকে ছাড়া হবে না।

রতিকান্তবাবুর গৃহিণী স্বামীর কাছে গিয়ে কেঁদে বললেন—আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চয়ই তুমি কোন খারাপ কাজ করছ। কেন ও কাজ করতে গেলে তুমি? রোজ সন্ধ্যেবেলা তুমি চাকরি করতে যাবার নাম করে বেরোতে আর ফিরতে রাত্ বারোটার পর। এখন আমি কি করি?

রতিকান্তবাবু তখন সাহেবের নিষেধ সত্ত্বেও সব কথা খুলে বললেন গৃহিণীকে। এবং বললেম, যে ভাবেই হোক সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে এই বিপদের কথাটা জানিয়ে আসতে।

গৃহিণী তো ভয়েই সারা। শোনা মাত্রই আঁৎকে উঠে বললেন—ওরে বাবা। কবরখানায় ঢুকে সাহেব ভূতের সঙ্গে আমি কি করে কথা বলব গো! একেই আমার ভূতের ভয়।

রতিকান্তবাবু বললেন—তা অবশ্য ঠিক। তবু তুমি এক কাজ করো, আমি বরং একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি সেটা সাহেবের কবরের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে এসো। তবে খুব সাবধান। ভুলেও যেন কারো কাছে বলো না একথা।

—না না, তা বলব না। কিন্তু আমি সাহেবের কবর চিনব কি করে?

—সে সব বলে দিচ্ছি আমি। বলেই রতিকান্তবাবু একটা সাদা কাগজে দু' এক ছত্রে নিজের বিপদের কথা জানিয়ে লিখে দিলেন 'প্লিজ হেল্প মি', তারপর গৃহিণীকে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে কোন্‌খানে যেতে হবে। এবং এও বলে দিলেন ঐ কবরখানার সবচেয়ে বড় স্মৃতিসৌধটাই সাহেবের। রতিকান্তবাবুর গৃহিণী দিনের আলো থাকতে থাকতেই রক্ষীদের নজর এড়িয়ে ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে কবরখানায় ঢুকে পড়লেন। তারপর রতিকান্তবাবু যেভাবে যেমন করে যেতে বলে দিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই গিয়ে এখানকার সবচেয়ে বড় স্মৃতিসৌধটির কাছে পৌঁছলেন। তারপর বিশেষ চিহ্ন আঁকা দীর্ঘ এপিটাফের নীচে একটি পাথর চাপা দিয়ে চিঠিটা রেখে চলে এলেন। রাত তখন একটা।

থানার লক-আপের ভেতরে দারোগাবাবু রতিকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছেন। আর রতিকান্তবাবুও সেই একই উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন—বিশ্বাস করুন আপনারা, আমি চুরি করিনি। এ সবই আমার পিতৃদত্ত ধন। যা ছিল সবই বেচে দিয়েছি। তাছাড়া আপনারা তো আমার বাড়ি তল্লাস করে দেখেই এসেছেন, তবুও কেন অবিশ্বাস করছেন আমাকে?

—অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই করছি। এই সব দুষ্প্রাপ্য গিনিগুলি আপনার পিতৃদত্ত ধন হলে আপনার এই রকম দশা হত? আপনি তাহলে ভাড়া বাড়িতে টিনের ঘরে থাকতেন? চালাকির জায়গা পাননি? রতিকান্তবাবু নীরব। সত্যিই তো। কী উত্তর দেবেন তিনি?

এমন সময় হঠাৎ এক কান্ড।

রুদ্র মূর্তিতে ঝড়ের বেগে যিনি এসে সেখানে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখেই চমকে উঠলেন সকলেই। দরোয়ান থেকে ও. সি. পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে স্যালুট করলেন তাঁকে। সেই অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন সবাই। কে ইনি? পুলিশ কমিশনার? না। তিনি তো বাঙালি। তবে কি সেন্ট্রাল থেকে এসেছেন কোন ব্রিগেডিয়ার? তাই বা কি করে হবে? ইউনিফর্ম তো পরে আছেন উচ্চপদস্থ সার্জেন্টের। তাহলে? কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। কী ভয়ানক তাঁর নীল চোখের চাহনি। কী হিংস্র তাঁর লাল টকটকে মুখ। খাঁটি ইংরেজ সাহেব। কে পাঠাল এঁকে। কোথা থেকে এলেন? সাহেব এসেই গটগট করে ও. সি.র ঘরে ঢুকলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ক্রুদ্ধ চোখে ঘরের চারদিক একবার তাকিয়ে দেখলেন। টেবিলের কাগজপত্তরগুলো একটু নাড়াচাড়া করলেন। চেয়ারটা টেনে নিয়ে একবার বসতে গিয়েও বসলেন না। জুতোসুদ্ধ একটা পা চেয়ারের ওপর রাখলেন। তারপর টেবিলে রাখা ময়লা ছোপ ধরা কাচের গেলাসটা ঘরের কোণে আছাড় মেরে বোমার মতো ফেটে পড়লেন—আমার ঘরের এই রকম অবোসঠা কে করিয়াছে? তারপর ও. সি.র দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন—হু আর য়্যু?

ও. সি. সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন—স্যার, আমি বর্তমানে এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

—ইউ ব্লাডি ফুল। টেল মিস্টার টেগার্ট। ইউ আর রিয়্যালি আনফিট ফর দিস পোস্ট।

তারপর গোটা থানার চারিদিক ব্যাঘ্র বিক্রমে ঘুরে ফিরে দেখে লক-আপের কাছে এসে রতিকান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে ও. সি-কে বললেন—এই লোকটাকে টোমরা ঢরিয়া রাখিয়াছ কেন?

—একে আমরা স্মাগলার সন্দেহে ধরে রেখেছি স্যার।

—ব্লাডি ফুল। হি ইজ এ ভেরি গুড্ ম্যান। আই নো হিম। যডি ভালো চাও টো টোমরা ইহাকে এখুনি ছাড়িয়া ডাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হল রতিকান্তবাবুকে।

লক আপ থেকে বেরিয়ে রতিকান্তবাবু দেঁতো হেসে সাহেবকে একটা স্যালুট করে দিলেন।

সাহেব রতিকান্তবাবুকে ধমকালেন—গেট আউট অফ হিয়ার।

রতিকান্তবাবু সাহেবের এ রকম মূর্তি কখনো দেখেন নি। এমন ইউনিফরম্ পরা বদমেজাজি পুলিশি চেহারা কখনো না। তাই ধমক খেয়ে কোনরকমে কাছা কোঁছা গুটোতে গুটোতে দৌড়ে পালালেন।

রতিকান্তবাবু চলে যাবার পর সাহেবও চলে গেলেন ঝড়ের বেগে।

আর থানাসুদ্ধু লোক ভয়ে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। সাহেব যাবার আগে পুলিশের খাতায় খসখস করে কি যেন সব লিখে গেছেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সবাই একটু প্রকৃতস্থ হয়ে খাতার পাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সাহেব যা লিখে গেছেন 'দি ম্যান ইজ নোন টু মি এ্যান্ড অ্যাজ সাচ আই অ্যাম রিলিজিং হিম।' লেখার শেষে নিজের নামও সই করে গেছেন সাহেব।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে এমনই সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে সবাই যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করার মতো মনোবলও ছিল না কারো। যাই হোক। সে রাতের সেই অবাস্তব অভিজ্ঞতার সত্যা-সত্য যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেল টেগার্ট যখন পুলিশ কমিশনার তখন এই থানায় এই নামাঙ্কিত ব্যক্তি ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। পুরনো নথিপত্রের সইয়ের সঙ্গে সে রাতের সেই রহস্যময় মানুষটির সইয়ের হুবহু মিল পাওয়া গেল। শুধু তারিখেরই যা হেরফের হল। এবং অনুসন্ধানে এও জানা গেল এই সাহেবটি তৎকালীন সময়ে স্বদেশীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

ভূত নেই ভূত আছে

প্রফুল্ল রায়

বাজু একসঙ্গে মাথা আর হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'না দাদাই, ভূত-টুত বলে কিস্‌সু নেই! স্রেফ গাঁজা।'

বাজুর বন্ধু বিট্টুও ঠোঁট উল্টে দিয়ে বলে, 'একদম বোগাস।'

ফি বছর বাজু পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি আসে। পুরো ছুটিটা কাটিয়ে একেবারে ভাইফোঁটার পর নিজের বাড়ি ফিরে যায়।

বাজুর অবশ্য আপন মামা নেই। তবে মাসি আছে, দাদাই আছেন, দিদন আছেন। বেড়িয়ে, গল্প করে, মজার মজার বই পড়ে ছুটিটা তোফা কেটে যায়।

এ বছর বাজুর সঙ্গে এসেছে তার প্রাণের বন্ধু বিট্টু। দু'জনের গলায় গলায় ভাব। একই স্কুলে তারা ক্লাস ফোরে পড়ে। দু'জনেরই বয়স দশ।

দুই বন্ধুই লেখাপড়ায় দারুণ। হাফ ইয়ারলিতে বাজু ফার্স্ট হলে, অ্যানুয়েলে বিট্টু। দু'জনেরই দারুণ বুদ্ধি আর সাহস।

বাজু মামাবাড়িতে এলে সন্ধ্যের পর রোজ ছাদে আলো নিভিয়ে শতরঞ্জিতে আরাম করে বসে গল্পের আসর জমানো হয়। গল্প বলেন অবশ্য দাদাই অর্থাৎ দাদামশাই। মামাবাড়িতে অজস্র বই, আট দশটা আলমারি একেবারে বোঝাই। তবু প্রতি মাসেই দাদাই প্রচুর বই কেনেন। কত রকমের বই তার ঠিক নেই। দেশবিদেশের ইতিহাস, সায়েন্স ফিকশান, কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী, রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার, প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই সব বইয়ের প্রতিটি পাতা দাদাইয়ের মুখস্থ। ছুটিতে বাজু মামাবাড়ি এলে তিনি তাকে এই বইগুলির গল্প শোনান।

গল্পের আসরে শ্রোতা শুধু একা বাজুই নয়—মাসি, দিদন এবং মামাবাড়িতে চারপাশে যারা থাকে যেমন বুম্বা, পাপাই, বুবলা—এরাও। বুম্বাদের সঙ্গেও খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বাজুর। দিন তিনেক আগে এবার পুজোর ছুটি পড়েছে আর আজই দুপুরে বাজু বিট্টুকে সঙ্গে করে মামাবাড়ি চলে এসেছে। বাজুর মা-ই তাদের পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

দিনের বেলাটা হৈ হৈ করে কাটিয়ে এখন এই সন্ধ্যেবেলায় ছাদে গল্পের আসর বসিয়েছে বাজুরা। এতদিন যারা গল্প শুনে আসছিল বিট্টু আসায় এবার তাদের সংখ্যাটি বেড়েছে।

এবার মামাবাড়িতে পা দিয়েই বাজু খবর পেয়েছে, ইদানীং কিছুদিন ধরে দাদাইকে ভূতে পেয়েছে, ইংরেজি আর বাংলায় ভূতপ্রেত নিয়ে যত বই বেরিয়েছে, সবই কিনে ফেলেছেন। এগুলি রাখার জন্য নতুন আলমারিও করতে হয়েছে।

কাজেই দাদাইয়ের গল্পে ভূত যে এসে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী! বেশ জমিয়ে খাস বিলেতের এক ঢ্যাঙা সাহেব ভূতের কীর্তিকলাপ যখন তিনি বলতে শুরু করেছেন সেই সময় বাজু আর বিট্টু প্রবল চেঁচামেচি জুড়ে দেয়।

তাদের দেখাদেখি শিয়ালের পালের মতো পাপাইরা কোরাসে বলে ওঠে, বাজে, বাজে, বাজে। আমরা ভূত বিশ্বাস করি না।'

দাদাই চোখ কুঁচকে সবাইকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করেন, 'কর না তো?'

'না, না, না।'

'কেন কর না?'

'আমরা কেউ ভূত দেখিনি, তাই।'

দাদাই কী একটু ভাবেন। তারপর বলেন, 'যদি তোমাদের ভূত দেখিয়ে দিতে পারি, তাহলে করবে?'

সবাই গলা মিলিয়ে বলে, 'করব, করব।'

এদের মধ্যে বাজু এবং বিট্টুর উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। তারা বলে, 'কবে দেখাবে? কখন দেখাবে?' তাদের আর তর সইছে না যেন।

দাদাই বলেন, 'দু-একদিনের ভেতর দেখতে পাবে।'

'দিনের বেলা, না রাত্তিরে?'

'রাত্তিরে।'

'কোথায় দেখাবে?'

দাদাইদের বাড়ির পেছনে অনেকটা ফাঁকা মাঠ। মাঠটা ঝোপঝাড় আগাছায় ভর্তি। তারপর রেললাইন চলে গেছে। আর রেললাইনের ধারে একটা প্রকাণ্ড পুরনো ভাঙাচোরা জমিদার বাড়ি কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটায় লোকজন থাকে না, আলোটালো নেই। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ওটাকে ভূতুড়ে দেখায়। বাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দাদাই বললেন 'ঐ বাড়িটায় রাত বারোটার সময় দোতলার দক্ষিণের শেষ ঘরটায় পরশু যদি যাও, ভূত দেখতে পাবে।' তারপর ক্ষুদে শ্রোতাদের দিকে ফিরে পরপর সবাইকে দেখতে দেখতে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে কে যেতে চাও, বল।'

পাপাই, বুম্বা আর বুবলার মুখ চুপসে গেছে।

তাদের বুকের ভিতরটা ভীষণ টিব টিব করছিল।

বুম্বা ঢোক গিলে বলে, 'আমাদের বাড়ির গেটে রাত দশটায় তালা লাগানো হয়। আমি যে বেরুতে পারব না।'

পাপাই বলে, 'কাল সকালে চন্দননগরে পিসির বাড়ি যাচ্ছি। ফিরব চারিদিন বাদে। পরশু ভূত দেখতে যাব কী করে?'

বুবলা বলে, 'ন'টা বাজলেই আমার ঘুম পেয়ে যায়। বারোটা পর্যন্ত আমি বাবা জেগে থাকতে পারব না।'

মুচকি হেসে দাদাই বলেন, 'বুঝেছি তোমরা কেমন বীরপুরুষ।' তারপর বাজুদের জিজ্ঞেস করেন,'কী, তোমরাও বুবলাদের দলে নাকি?'

বাজু এবং বিট্টু লাফ দিয়ে দাঁড়ায়। বুক ফুলিয়ে মোটা গলায় বলে, 'নেভার।'

নিতান্ত ভালমানুষের মতো দাদাই জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে তোমরা পরশু রাতে ওখানে যাচ্ছ?'

বাজু বলে, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু—'

'কী?'

'পরশু রাত বারোটায় ওখানে গেলে ভূত দেখতে পাব, কী করে জানলে?'

'আমি জানি, পরশু হল বুধবার। প্রতি বুধবার রাত বারোটায় ওখানে গেলে তাকে দেখা যায়।'

বিট্টু বলে, 'তুমি দেখেছ দাদাই?'

দাদাই বলেন, 'নিশ্চয়ই। না হলে তোমাদের অত জোর দিয়ে বলছি কী করে?'

বাজু আর বিট্টু এবার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে গাদা গাদা প্রশ্ন করে যায়। তাকে দেখতে কেমন? কথা-টথা বলেছে কিনা? বললে কী বলেছে? ইত্যাদি।

দাদাই বলেন, 'আমি কিছু বলব না। সাহস থাকলে নিজেরা গিয়ে দেখবে।'

'ঠিক আছে। আমরা পরশু যাচ্ছি।'

দিদন কিন্তু খুব রেগে যান। দাদাইকে বলেন, 'কেন বাচ্চা দুটোকে ঐ হানাবাড়িতে পাঠাচ্ছ? শেষে ভয়টয় পেয়ে যদি কিছু হয়ে যায়?'

বাজু আর বিট্টুর ওপর দাদাইয়ের দারুণ বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'ওরা ভয় পাবার ছেলে নয়। তুমি ভেব না। দু'জনে ঠিক পরশু রাত বারোটায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারবে।'

দিদনের দুশ্চিন্তা কাটে না। তিনি বলতে থাকেন, 'কী যে তোমার অলুক্ষুণে কাণ্ড বুঝতে পারি না। এই বাচ্চাদের কেউ অমন করে উঁসকে দেয়!'

দিদন এবং মাসির ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও বুধবার রাত বারোটায় মাঠ পেরিয়ে দুই বন্ধু পোড়ো জমিদার বাড়িতে চলে আসে। তাদের দু'জনের হাতে রয়েছে বড় টর্চ আর লাঠি। পিঠে বাঁধা আছে এয়ারগান।

বাড়িটার সামনে বাজুরা থমকে যায়। কেউ কোথাও নেই, চারিদিক একেবারে সুনসান। এধারে ওধারে ঝিঁঝিরা একটানা ডেকে চলেছে।

অনেক দূরে, রেললাইনের ওপারে কোথায় যেন মিহি, নানা সুরে ঝাঁকে ঝাঁকে কুকুর ডেকে ওঠে। এছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

এ লাইনে লাস্ট ট্রেন চলে যায় পৌনে বারোটায়। তারপর এদিকটা একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে।

সব দেখেশুনে বিট্টু একটু দমে যায়, 'কি রে বাজু, ভেতরে যাবি?'

বাজু বলে, 'নিশ্চয়ই। এই পর্যন্ত এসে যদি ফিরে যাই, দাদাই ঠাট্টা করে করে আমাদের জ্বালিয়ে মারবে।' বলে টর্চ জ্বালে।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দশ বারো ফিট দূরে ভাঙা লোহার গেট। সেটার একটা পাল্লা নেই, অন্য পাল্লাটাও ভেঙে হেলে পড়েছে। গেটটাকে ঘিরে প্রচুর বুনো ঘাস আর কাঁটার ঝাড়।

বাজু বলে, 'চল, ভেতরে ঢুকি।'

টর্চ জ্বেলে রেখেই দু'জনে ঘাস এবং ঝোপঝাড় ঠেলে বাড়ির ভেতরে চলে আসে।

গেটের পর মস্ত বাঁধানো চাতাল। তারপর দশ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে মোটা মোটা থামের ভেতর টানা বারান্দা। থামে এবং বারান্দায় ফাটল ধরে ভেতরের ইট বেরিয়ে পড়েছে। ফাঁকে ফাঁকে বট অশ্বত্থের চারা গজিয়ে উঠেছে।

দোতলায় উঠে দক্ষিণের শেষ ঘরখানায় যেতে হবে বাজুদের। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিঁড়িটা বের করে তারা ওপরে উঠতে থাকে। হঠাৎ নাকে ভক করে একটা বোঁটকা দুর্গন্ধ এসে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ফর ফর করে অগুণতি চামচিকে মাথার ওপর উড়তে থাকে। এদের দু-একটা আবার বাজু এবং বিট্টুর নাকে মুখে নখের আঁচড় বসিয়ে যায়।

দু'হাতে লাঠি আর টর্চ ঘোরাতে ঘোরাতে চামচিকেদের আক্রমণ ঠেকিয়ে কোনরকমে দোতলায় উঠে আসে বাজু আর বিট্টু। চারপাশে আলো ফেলে ফেলে দক্ষিণ দিকটা ঠিক করে নেয়। টানা একটা বারান্দা সোজা ওদিকে চলে গেছে, যার শেষ মাথার ঘরটায় যাবার কথা বলে দিয়েছেন দাদাই।

বাজুরা পা বাড়াতে যাবে, কোথায় কোন অদৃশ্য ঘুলঘুলির ভেতর থেকে

আওয়াজ ওঠে 'তক্‌খো-তক্‌খো-' অর্থাৎ তক্ষক ডাকছে।

তক্ষকটাকে ভেংচি কেটে বাঁ পাশের সিলিংয়ের কোণ থেকে কারা যেন ভারী গম্ভীর গলায় হুমকে ওঠে,'ভুতুম-ভুতুম-'

অমন যে দুর্জয়ী সাহসী বাজু, তার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ছমছম করে ওঠে। হাত-পা তার ভীষণ কাঁপছে। আরেকটু হলে তার হাত থেকে টর্চ আর লাঠি খসে পড়ত। কোনরকমে নিজেকে সামলে নেয় সে।

বিট্টুর বুকটাও গুরগুর করছিল। বাজুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে কাঁপা গলায় বলে, 'কী ব্যাপার রে?'

বাজু বলে, 'দাঁড়া, দেখছি।'

সিলিংয়ের যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে, আন্দাজ করে মুখ তুলে সেখানে তাকায় বাজু। আর তখনই দেখতে পায় চারজোড়া জ্বলন্ত চোখ সেখানে স্থির হয়ে আছে। বিট্টু 'বাবা গো' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে মেঝেতে বসে পড়ে। বাজুও পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে পড়তে সেই চোখগুলির ওপর টর্চের আলো ফেলে। তখনই দেখা যায়, সিলিংয়ে লোহার বীমের ওপর সারি সারি চারটে পেঁচা বসে আছে।

বাজু হাত ধরে বন্ধুকে টেনে তুলতে তুলতে বলে, 'ভয় নেই বিট্টু, ওগুলি পেঁচা রে। ওঠ।'

বিট্টু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। পেঁচাগুলিকে দেখে তার ভয় অনেকটা কেটে যায়। বলে, 'আর দাঁড়াস না। চল—'

পা টিপে টিপে বারান্দা ধরে দুই বন্ধু এগিয়ে যায়। তাদের বাঁ পাশে সারি সারি ঘর। বেশিরভাগ ঘরেরই দরজা-জানালা লোপাট হয়ে গেছে। বিরাট বিরাট ফোকরগুলি দিয়ে বাইরের ঝাপসা আলো ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সেদিকে তাকালে মনে হয়, কারা যেন ঘরগুলির মধ্যে ওত পেতে বসে আছে, যে কোন মুহূর্তে তারা ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বিট্টু ফিসফিসিয়ে বলে, 'কি রে ভেতরে ঢুকবি?'

বাজু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ঘরের ভেতর থেকে খোনা গলায় কেউ বলে ওঠে, 'ঢুঁকবে বৈঁকি, অ্যাঁদ্দুর এঁসে নাঁ ঢুঁকলে চঁলে? এঁসো, এঁসো, তোঁমাদের সঙ্গে এঁকটু গঁল্প-টঁপ্প কঁরি।'

দুই বন্ধুর হৃৎপিণ্ড বলের মতো লাফাতে থাকে, তারা কী করবে, ভেবে পায় না।

ঘর থেকে সেই গলাটা আবার ভেসে আসে, 'কী হঁল, দাঁড়িয়ে রঁইলে কেঁন?

তোঁমাদের তোঁ দাঁরুণ সাঁহস। চঁলে এঁসো। আঁমি দেঁখতে পাঁচ্ছি, তোঁমাদের সঁঙ্গে টর্চ, আঁর এঁয়ারগাঁন রঁয়েছে। ওঁগুলি বাঁইরে রেঁখে এঁসো।

অন্ধকারে দুই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর 'দেখাই যাক না, কী হয়'— এমন একখানা ভাব করে খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে পড়ে।

বাইরের থেকে ঘরের ভেতরটা বেশি অন্ধকার। একটা দেয়ালের কাছে সেই অন্ধকার যেন আরও জমাট বেঁধে আছে। মনে হয় লম্বা কালো কোট পরে বেজায় ঢ্যাঙা কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে। কম করে সে আট ন' ফিট লম্বা তো হবেই, মাথা প্রায় সিলিংয়ে গিয়ে ঠেকেছে। সেটার গায়ে দুটো জ্বলন্ত চোখ আটকানো। আর যা চোখে পড়ে তা হল দশ বারো ইঞ্চি মাপের বিরাট বিরাট ধবধবে ক'টা দাঁত।

দাঁত এবং চোখ দেখে দুই বন্ধুর দাঁতকপাটি লেগে যাবার অবস্থা। তাদের গলার ভেতর থেকে 'আঁক' করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

সেই গলাটা আবার শোনা যায়, 'কী নাঁম তোঁমাদের?'

ম্যালেরিয়া হলে যেমন হয়, ভয়ে তেমনি ঠকঠক করে কাঁপছিল বাজুরা। তারই মধ্যে কোনরকমে দু'জনে নাম বলে।

'তোঁমরা কোঁথায় থাঁকো?'

বাজু বলে, 'সেলিমপুরে।' বিট্টু বলে, 'ট্রাঙ্গুলার পার্কের কাছে।'

'এখানে কোঁথায় এসেছিলে?'

কোথায় এসেছে, বাজুরা জানায়।

'ওঁ মাঁমাবাঁড়িতে বেঁড়াতে এঁসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'রাঁত দুপুরে এই হাঁনাবাড়িতে ঢুঁকেছিলে কেন?'

'এই—মানে, মানে—'

'বুঁঝতে পেঁরেছি। ভূঁত দেঁখতে এঁসেছ।'

তোঁমাদের মঁতো সাঁহসী ছেঁলে আঁর দেঁখিনি। আঁলাপ কঁরে ভাঁরী খুঁশি হঁলাম।

কাঁপতে কাঁপতে বাজুরা বলে, 'আমরাও।'

সেই গলাটি শোনা যায়, 'তোঁমাদের সাঁহসের জঁন্যে কিঁছু উঁপহার দিঁচ্ছি। এঁই নাঁও।

দুটো বেজায় লম্বা কালো হাত বাজু আর বিট্টুর দিকে এগিয়ে আসে। সেই হাতে কাজু বাদামের প্যাকেট, বড়-চকোলেট বার ইত্যাদি রয়েছে।

বাজুরা নেবে কি নেবে না যখন ভাবছে, সেই সময় গলাটা ফের কানে আসে, 'নাঁও, নাঁও—'

কাঁপতে কাঁপতে বাজু আর বিট্টু কাজু বাদাম আর চকোলেট তুলে নিয়ে বলে 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'থ্যাঁঙ্কস তোঁ আঁমার দেঁবার কঁথা। আঁচ্ছা, এঁবার তোঁমরা বাঁড়ি যাঁও। নঁইলে দাঁদাই দিঁদন আঁর মাঁসি ভাঁববে।

পোড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজুরা আবার সেই ফাঁকা নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে ফিরে আসে।

মাসি আর দিদন গেটের কাছে দুটো জোরালো আলো জ্বেলে বসেছিলেন। বাজুদের দেখে দৌড়ে আসেন। দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে বলেন, 'তোদের জন্যে ভেবে ভেবে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিছু হয়নি তো তোদের?'

বাজু এবং বিট্টু একসঙ্গে জানায়, 'কী আবার হবে?'

মাসি বলে, 'ভয়-টয় পাসনি তো?'

ভয় যে যথেষ্টই পেয়েছে তা কি আর বাজুরা স্বীকার করে? তারা বলে, 'কিসের ভয়? ধুস—'

দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল মাসির। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখলি ওখানে?'

দিদন চান না পোড়ো বাড়ির ব্যাপারে আজ কোন কথা হোক। তিনি মাসিকে বলেন, 'যা শোনার কাল শুনিস। রাত দেড়টা বাজে। ওদের ঘুমনো দরকার। আয় বিট্টু, আয় বাজু—' দুজনকে তাদের ঘরে নিয়ে যান তিনি।

ওরা যখন হাত পা-ধুয়ে জামা প্যান্ট পাল্টে শুয়ে পড়েছে আর দিদন ওদের মশারি গুঁজে দিচ্ছেন সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে দাদাই এসে হাজির। তিনি বলেন, 'কি বাজুদাদা, বিট্টুদাদা—মোলাকাত হল?'

দুই বন্ধু বলে, 'তা হয়েছে। আমরা ভাল ভাল প্রেজেন্টও পেয়েছি, কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কোন খটকা লাগছে?'

'হুঁ।'

'কী?'

একটু চিন্তা করে বাজু বলে, 'কাল বলব।'

'ও. কে.। কালই শুনব। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

দাদাই দিদন আর মাসিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ভোরবেলা, তখনও রোদ ওঠেনি, আকাশটা আবছা মতো, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় বাজুর। রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোতে পারেনি সে। বার বার পোড়ো বাড়ির ঘটনাগুলি মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। পোড়ো বাড়িতে তারা যা দেখেছে তার মধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে, গোলমালটা কী ধরনের সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দুই বন্ধু একটা প্রকাণ্ড খাটে পাশাপাশি শুয়েছিল। আস্তে আস্তে বাজু বাঁদিকে কাত হতেই দেখতে পায় বিট্টু মশারির চালের দিকে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে আছে। সে ডাকে, 'এই—'

বিট্টু সাড়া দেয়, 'কী বলছিস?'

তক্ষুণি উত্তর দেয় না বাজু। কী যেন ভেবে কিছুক্ষণ বাদে বলে, 'আচ্ছা, ভূতেরা তো শুনেছি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে খালি ভয় দেখায়।'

'হুঁ'।

'কিন্তু কাল রাত্তিরে কি হল? আমাদের সঙ্গে ভাল ভাল কথা বলল,কাজু চকোলেট দিল। জানিস আমার কিরকম যেন মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই। রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি, খালি এইসব কথা ভেবেছি।'

'খানিকক্ষণ চুপচাপ।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কিছু চিন্তা করতে থাকে বাজু। তারপর বলে, 'এক কাজ করি চল—'

বিট্টু বলে, 'কী রে?'

'কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি এখন একবার ঐ পোড়ো বাড়িটায় যাই চল। আমার মনে হয় কোন একটা ক্লু-টু পেয়ে যাব।'

দুই বন্ধু অজস্র ডিটেকটিভ গল্প পড়েছে। তাদের ধারণা, শার্লক হোমস্, কিরীটি রায়, ফেলুদার মতো তারাও একেকটি দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা। পোড়ো বাড়ির ভূতটিকে মেনে নিতে তাদের আটকাচ্ছে। নিশ্চয়ই এর ভেতর কোন রহস্য আছে।

'আমিও তাই ভাবছিলাম। চল, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি।' বিট্টু প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে।

মামাবাড়িতে এখনও কেউ ওঠেনি। বিট্টু আর বাজু নিঃশব্দে গেট খুলে বেরিয়ে পড়ে। পোড়ো বাড়ির দোতলায় সেই ঘরটিতে এসে দেখতে পায়, দেয়ালের কাছে যেখানে কাল দুটো জ্বলন্ত চোখ আর লম্বা লম্বা সাদা দাঁত দেখেছিল সেখানে অনেকগুলি ইট থাকে থাকে সাজিয়ে উঁচু বেদির মতো করা

হয়েছে। তার ওপর কালো কাপড়ের বিরাট এক আলখাল্লা পড়ে আছে। সেটা তুলে ধরতে দেখা যায়, দু'জায়গায় গোল করে কী যেন লাগানো রয়েছে। আবছা অন্ধকারে সে দুটো যেন জ্বলছে।

বাজু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলে, 'ফসফরাস। কাল রাত্তিরে এই দেখে মনে হয়েছিল ভূতের চোখ।'

এদিকে বিট্টু সাদা শোলার তৈরি দাঁতের পাটি আবিষ্কার করে ফেলে। বলে, 'এই দ্যাখ, ভূতের দাঁত। কাল এগুলি চোখের নীচে আটকে আমাদের ভয় দেখানো হয়েছিল।'

খোঁজাখুঁজি করতে করতে দুই বন্ধুর চোখে পড়ে ঘরের মেঝের ধুলোতে তাদের জুতোর ছাপ ছাড়াও বড় কেডসের দাগ পড়ে আছে।

দাগগুলির পাশে বসে দুই বন্ধু অনেকক্ষণ ঝুঁকে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণ ব্যস্তভাবে বাজু বলে, 'তুই এখানে থাক, আমি দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি।' বলে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে যায়।

দশ মিনিটও লাগে না, তার অনেক আগেই একজোড়া কেডস নিয়ে ফিরে আসে বাজু। তারপর পুরনো দাগগুলির পাশে কেডস রেখে চাপ দিতেই নতুন দাগ হয়ে যায়। আগের দাগ আর এই দাগ হুবহু এক। অর্থাৎ বাজু যে কেডস নিয়ে এসেছে সেটা পরে কাল কেউ এখানে এসেছিল।

বাজু দাগগুলি দেখিয়ে বলে, 'বুঝতে পারছিস তো?'

বিট্টু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'হুঁ।'

'চল, এবার ফেরা যাক।'

কালো আলখাল্লা, দাঁত, কেডস ইত্যাদি নিয়ে যখন বাজুরা মামাবাড়িতে ফিরে আসে, দাদাই আর দিদন সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। মাসিকে অবশ্য দেখা যায় না। সে একেবারে লেট লতিফ, সাড়ে আটটার আগে কোনদিনই তার ঘুম ভাঙে না।

বাজুদের দেখে অবাক হয়ে যান দাদাই আর দিদন। দাদাই বলেন, 'এ কী, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?'

বিট্টু বলে, 'ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল, তাই ভাবলাম ঐ পোড়ো বাড়িটায় একবার ঘুরে আসি।'

দাদাই চমকে ওঠেন, 'গিয়েছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ, গেলাম। ভাবলাম দেখি যদি কালকের সেই মক্কেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।'

'কী সর্বনাশ।'

বাজু বলে, 'দেখা হল না। তবে তার জার্সিটা নিয়ে এসেছি।' বলে সেই আলখাল্লাটা এবং দাঁতগুলি তুলে ধরে।

তারপর সেগুলি নামিয়ে রেখে সেই কেডস দুটো দেখিয়ে বলে, 'পোড়ো বাড়ির ঐ ঘরটার ধুলোর ওপর এগুলির অনেক ছাপ রয়েছে।' চোখের কোণ দিয়ে দাদাইকে দেখতে দেখতে বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে এই কেডস দুটো তোমার। এ দুটো পরে তুমি বিকেলে লেকের দিকে বেড়াতে যাও না?'

ঢোক গিলেই দাদাই বলেন, 'হ্যাঁ, আমারই তো। কিন্তু—'

'আমরা কোত্থেকে নিয়ে এলাম, জানতে চাইছ কি?'

'হ্যাঁ।'

'ছাপের সঙ্গে মেলাবার জন্যে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বাজু বলতে থাকে, 'দিস ইজ ব্যাড দাদাই। আমাদের বিশ্বাস করাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ভূত সাজতে হল!'

দিদন হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে দাদাইকে বলেন, 'ছি ছি, এ কী করেছ তুমি! যদি কিছু একটা হয়ে যেত! তোমার কি আক্কেল নেই!'

দাদাই কাঁচুমাচু মুখে বলেন, 'ওদের সাহস কতখানি সেটাই পরখ করছিলাম। ওখানে গিয়ে তো ক্ষতি হয়নি, কাজু বাদাম পেয়েছে, চকোবার পেয়েছে।'

বাজু বলে, 'ভূত যে আছে, তা কিন্তু প্রমাণ করতে পারনি দাদাই। আমাদের স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছ।'

দাদাই বলেন, 'তা হয়তো দিয়েছি। কিন্তু একটা কথার জবাব দাও তো দাদারা—'

'কী?'

'কাল জ্বলন্ত চোখ আর লম্বা লম্বা দাঁত দেখে তোমরা ভয় পাওনি?'

বাজু, বিট্টু দু'জনেই হকচকিয়ে যায়। বলে, 'মিথ্যে কথা বলব না, সত্যি ভয় পেয়েছিলাম।'

দাদাই এবার হেসে হেসে বলেন, 'ভূত-টুত নেই, আবার আছেও। কোথায় আছে জানো? আমাদের মনের ভেতর। ভয় পেলেই সে তোমাকে চেপে ধরবে, যেমন কাল ধরেছিল। ভয় না পেলে তোমাদের একশ' মাইলের ভেতরে সে ঘেঁষবে না।'

তেত্রিশ নাম্বার ঘর

দিব্যেন্দু পালিত

ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। আশেপাশে সামনে পিছনে জ্যান্ত মানুষজন নিয়েই এতো ব্যস্ত ও কখনো বা বিব্রত থাকতে হয় যে বুঝতেই পারি না দিনের চব্বিশটা ঘণ্টা কেটে যায় কীভাবে। এর ফলে ক্লান্তও থাকতে হয় এবং দয়া করে ঈর্ষা করবেন না আমাকে, বিছানায় শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি কম বেশি, তিন মিনিট সতেরো সেকেণ্ডের মধ্যে। এইভাবেই চলছে বছরের পর বছর। তবে রোজই কি আর এরকম হয়! মাঝে মাঝে অফিসের কাজে এখানে ওখানে গেলে হোটেলের বিছানায় শুয়ে দেখেছি চট করে ঘুম আসে না চোখে। হয় বেশি ঝরঝরে লাগে, না হয় ক্লান্ত। তবে দুটোর ফলই এক। ঘুম ডেকে আনার জন্যে সত্যিই সাধ্যসাধনা করতে হয় তখন।

এ হেন ব্যক্তির পক্ষে ভূতের সান্নিধ্য সত্যিই কঠিন। ভূতে বিশ্বাস করাও। তবে ভূতে বিশ্বাস-না করলেও ভূত নিয়ে গল্প আমি কম শুনিনি বা পড়িনি। ছোটবেলায়, স্কুলে আমাদের সহপাঠী গোবিন্দর নতুন বউদিকে যে ভূতে পেয়েছিল এবং সেই ভূত ছাড়াতে ওঝা ডাকতে হয়েছিল। এবং তারপর ভূত নামাবার কয়েকমাসের মধ্যেই একটি ফুটফুটে বাচ্চা হল নতুন বউদির এবং আড়ালে অনেকেই সেই শিশুটিকে ভূতের বাচ্চা বলে ডাকত, সে-গল্প তো করেছি আপনাদের কাছে! আর একবার, দুষ্টুমি করে কবরের গায়ে হিসি করতে গিয়ে মাঝপথে হিসি আটকে যায় আমাদের কলেজ টিমের রেগুলার হাফব্যাক নিতাই দত্তর—তাকে নিয়ে বিস্তর ঝামেলায় পড়তে হয় সকলকে এবং দেড়দিন পরে ক্যাথেটিয়ার দিয়ে হিসি করানোর পরে ডাক্তার বলেছিল, ভূতেরও অপমানবোধ থাকে—এবার থেকে হিসি করার সময় জায়গাটা দেখে নিও। সেই থেকে কবর দেখলেই মুখ শুকিয়ে যেত নিতাইয়ের, প্রণামের ভঙ্গিতে হাতদুটো উঠে যেত কপালে।

এইরকম আরও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা শুধু আমার কেন, আরও অনেকেরই থাকবে। তাছাড়া ভূতে আমার বিশ্বাস নেই বললেই যে ভূতের অস্তিত্ব নেই এ-কথা কে বলবে! যারা ভূত দেখে এবং দেখা বর্ণনা করে, তাদের সকলকেই মিথ্যাবাদী বলে উড়িয়ে দেবার সঙ্গত কারণ নেই কোন। ভূতবিদ্যা সম্পর্কে একটি বইয়ে পড়েছিলাম ভূত তারাই দেখে যারা ভূতে বিশ্বাস করে। এমনকি এ-কথাও শুনেছি যে ভূতে যাদের বিশ্বাস নেই তারাও ভূত দেখেন, কিন্তু ঘটনাটাকে অন্য

ভাবে ব্যাখ্যা করে এড়িয়ে যেতে চান ভূতের অস্তিত্ব।

ঠিক জানি না, আমিও হয়তো ওই শেষের দলে পড়ি। তা না হলে সে-বছর শীতে দিল্লীতে যা ঘটেছিল তার পরেও ভূতে অবিশ্বাস করব কী করে!

ঘটনাটা খুলেই বলি।

সেদিন দিনটাই বোধহয় ছিল গোলমেলে। কোন এক রবিবার। পরের দিন সকাল নটায় এক বড়োসড়ো সরকারী আমলার সঙ্গে জরুরী মিটিং। রাতের প্লেনে গেলেই হত; কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লী যাবার ইভনিং ফ্লাইট প্রায় দেরী করে বলে, ভোরের ফ্লাইটেই যাবো ঠিক করেছিলুম। আর কিছু না হোক, তাতে হাতে থাকত পুরো একটি দিন, সময়টা কাজে লাগানো যেত অন্যভাবে—তারপর ধীরে সুস্থে পরের দিন যাওয়া যেত মিটিংয়ে।

কিন্তু গোড়াতেই হয়ে গেল গণ্ডগোল। ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল ঘড়িতে। ঘুম যখন ভাঙল দেখি সাড়ে পাঁচটা। তার মানে অ্যালার্ম বাজে নি। ডিসেম্বরের ভোর সাড়ে পাঁচটায় অন্ধকার ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে চারিদিক—সেটা সান্ত্বনার বিষয় নয় কোন; ছ'টা পনেরোর ফ্লাইট কাঁটায় কাঁটায় উড়ে যাবে ঠিকই। ফাঁকা রাস্তায় তীব্র গতিতে ট্যাক্সি ছুটলেও আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে কম করেও আধঘণ্টা লাগবে। যাই হোক, এইসব ভাবনা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখলুম যা ভয় পেয়েছিলাম তাই; চেক-ইন কাউণ্টার ফাঁকা। একজন অফিসার বললেন, দশ মিনিট আগে এলেও উপায় ছিল। প্লেন টেক-অফের জন্যে রওনা হয়ে গেছে, মিনিট খানেকের মধ্যেই উড়ে যাবে আকাশে।

টিকিটটা যাতে বাতিল হয়ে না যায় এবং সীট পাওয়া যায় সন্ধ্যার ফ্লাইটে, সেই ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরতে হল অগত্যা। তবু ভাবনা গেল না। আর কিছু নয়, হোটেল বুক করা আছে সকাল থেকে; অন্তত সেখানে জানিয়ে দেওয়া দরকার বুকিংটা যাতে ক্যানসেল না করে। ছোটোখাটো কোম্পানী আমাদের; দিল্লীতে ব্রাঞ্চ নেই কোন। ওখানকার কাজকর্ম দেখার জন্যে আছে একজন লিয়াঁজ অফিসার সদাশিব রায়! দিন তিনেক আগে কোন কথা বলার সময় সদাশিব বলেছিল দিল্লীতে এখন হোটেলে জায়গা পাওয়া মুশকিল—একে ট্যুরিস্টদের মরশুম, তার ওপর একই সঙ্গে চলেছে ট্রেড ফেয়ার, কমন-ওয়েলথ্ কনফারেন্স আর টেস্ট ক্রিকেট। যাইহোক, লোধি এস্টেটের কাছাকাছি একটা মাঝারি হোটেলে আমার জন্যে রুম বুক করে সদাশিব বলল পালামে আসবে। ফ্লাইট মিস করে ঘণ্টা দেড়েক পরে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে শুধুই মনে হতে লাগল, হয়রানি

আমার চেয়ে বেশী সদাশিবের—ফ্লাইট ল্যাণ্ড করার সময় হয়ে এলো প্রায়; বেচারা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে এয়ারপোর্টে পৌঁছে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে! তখনই ঠিক করে নিলুম, আরও কিছুক্ষণ পরে, অর্থাৎ সদাশিবকে বাড়িতে ফেরার সময় দিয়ে ট্রাঙ্ককল করব দিল্লীতে। উদ্দেশ্য দুটো। এক, ব্যাপারটা বিস্তারিত জানানো এবং হোটেল বুকিংটা যাতে ক্যানসেল না হয় তা দেখা। অবশ্য ক্যানসেল হলেই যে রাস্তায় ঘুরতে হবে তার কোন মানে নেই। সদাশিব ওর বাড়িতেই উঠতে বলেছিল। তা ছাড়া দিল্লীতে থাকে আমার এক জ্যেঠতুতো দাদা এবং এক মাসীও; ঠিকানা জানা আছে, তেমন দরকার হলে দুটো জায়গার যে কোন একটিতে ওঠা যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। তবে কিনা অফিসের কাজে গিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠা আমার ঠিক পোষায় না।

ট্রাঙ্ককল করতে গিয়েই পড়লুম ঝামেলায়। বলেছি না, দিনটাই ছিল গোলমেলে—হঠাৎ একেকটা দিন যেমন হয় আর কী; নিজের ইচ্ছে, পছন্দ ও প্রয়োজন মতো যা করতে যাওয়া হয় তাতেই পড়ে বাগড়া! ঘণ্টা তিনেক ট্রাঙ্ক লাইনে সদাশিবকে পাবার অপেক্ষা করে যখন আবার তাগাদা দিলুম, ওদিক থেকে ট্রাঙ্ক অপারেটর মিষ্ট গলায় জানিয়ে দিল, লাইন পাওয়া যাচ্ছে না—দিল্লীর সমস্ত লাইন ডাউন!

আপনারা যাঁরা ভূতের গল্প মনে করে পড়তে শুরু করেছিলেন এই গল্প, এরই মধ্যে তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছেন এসব ঘটনার সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক কী? যে কোন সিজন্ড এয়ার ট্র্যাভেলারই এক আধবার ফ্লাইট মিস করার অভিজ্ঞতায় ভুগেছেন—কলকাতার রাস্তার ভয়াবহ জ্যাম যে-কোনো দিনই যে-কারুর সামনে ঘটিয়ে তুলতে পারে এই ধরনের পরিস্থিতি! আর টেলিফোনের লাইন না-পাওয়া নিয়েও এত হা-হুতাশ করার মানে হয় না কোন—না পাওয়াটাই বরং অনেক বেশি ন্যাচারাল। এই সব ঘটনার সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক নেই কোন। কিন্তু আপনাদের অবগতির জন্যে সবিনয়ে নিবেদন করি, সবকিছু জেনেশুনেও ভূতের গল্পে ফ্লাইট মিস করা এবং টেলিফোন না-পাওয়ার প্রসঙ্গ অবতারণার কারণ আছে। অসুবিধে হল, ভূত সম্পর্কে আমাদের ধৈর্যের অভাব এতোই প্রকট যে ভূত বলার সঙ্গে সঙ্গেই যদি না শুরু হয়ে যায় ভূতের নৃত্য, তাহলেই ধরে নিই ভূতের আবির্ভাবজনিত সমস্ত ভূমিকাই আজগুবি। এটা ঠিক নয়। ধৈর্য্য ধরে এবং একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে বোঝবার চেষ্টা করলেই আমরা বুঝতে পারব, ভূতকে অবহেলার চোখে দেখার যুক্তি নেই কোন। বয়স ও অভিজ্ঞতায় ভূত মানুষের চেয়েও প্রাচীন—কে না জানে, ভূতে পরিণত হবার আগে ভূতকে পেরোতে হয় মানুষের আয়ুষ্কাল। তাহলে ধরেই নেওয়া যেতে পারে মানুষকে মানুষের চেয়ে

বেশি চেনে ভূত। তাহলে—এতোদূর প্রাজ্ঞতা অর্জন করার পরও ভূতকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মধ্যে আমাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। আমার তো ধারণা, এই পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে তার মধ্যে সত্যিই আছে কিংবা ছিল, একটা ভূতুড়ে ব্যাপার।

যাইহোক সেদিন দিনটা ছিল গোলমেলে এবং সেই কারণেই, হাজার চেষ্টাতেও যোগাযোগ করা গেল না সদাশিবের সঙ্গে। ভাবলুম, যা থাকে কপালে, সন্ধ্যের ফ্লাইটে দিল্লী না পৌঁছুলেই নয়। আগামীকালের মিটিংটা খুবই জরুরী। চাকরির স্বার্থে অনেক অসুবিধে ও হতাশাই মেনে নিতে হয়।

দিনটা যে গোলমেলে তার আর একটি প্রমাণও পেয়ে গেলুম। সকালে আমার দেরিতে পৌঁছানোর জন্যে এক মিনিটও অপেক্ষা করেনি ফ্লাইট। কিন্তু সন্ধ্যায়, রিপোর্টিং টাইমের আধঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছে শুনলুম, বোম্বের ফ্লাইট আসছে দু ঘণ্টারও বেশি দেরিতে—সেই এয়ারক্র্যাফট'ই কলকাতার যাত্রী নামিয়ে ও তুলে দিল্লী যাবে; সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত আড়াই তিন ঘণ্টার পরে ছাড়বে দিল্লীর ফ্লাইট। হতাশ বোধ করলেও হাল ছাড়লুম না আমি। বুকশপ থেকে নিক কার্টারের একটা সস্তা থ্রিলার কিনে জড় হয়ে বসলুম লাউঞ্জে। তখনই ভাবলুম সদাশিব নিতান্তই বোকা লোক নয়। কাজটা কত জরুরী বুঝলে এটাও বুঝতে পারবে কোন কারণে সকালে না এলেই রাত্রে ঠিকই পৌঁছে যাব। কর্মী লোকেরা চান্স ও রিস্ক্ দুটোই নিতে ভালবাসে।

অবশেষে সত্যি সত্যিই যখন প্লেন থেকে নামলুম দিল্লীতে, রাত তখন প্রায় দেড়টা। ল্যাণ্ড করার পরই হোস্টেসের ঘোষণা শুনে বুঝেছিলুম জব্বর শীত পাব বাইরে। প্লেনের বাইরে আসতেই টের পেলুম শীত কাকে বলে। হঠাৎই যেন কেউ একটা বরফের মুখোশ এঁটে দিল মুখে। অবশ হয়ে আসছে চামড়া, হাত, পা। অবশ্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না তা নয়। গলা-উঁচু পুলওভারটা কানের কাছে টানাটানি করে যতটা সম্ভব ঢেকে ফেললুম ঘাড়ের পিছনটা। কনকন করে উঠল স্যুটকেস-ধরা বাঁ হাতের আঙুলগুলি। এমনিতে ব্যস্ত দিল্লী এয়ারপোর্ট সম্ভবত ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ—এই মাত্র এসে পৌঁছুনো কলকাতার যাত্রীদের তাড়াহুড়ো ও খাপছাড়া কথাবার্তার শব্দে জেগে উঠতে না উঠতেই শান্ত হয়ে গেল আবার। এতো রাতে, এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে নির্দিষ্ট খবর না পেয়েও সদাশিব অপেক্ষা করবে আমার জন্যে এমন আশা করি নি। তবু এয়ারপোর্টের বাইরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলুম কিছুক্ষণ। আশেপাশে দাঁড়ানো যাত্রীদের ভিড় কমতে লাগল ক্রমশ। মনঃস্থির করে নিলুম আমি। এত রাতে খবর না দিয়ে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে ধাওয়া করা উচিত হবে না। হোটেলেই যাব। যতই ভিড় থাকুক, রাত কাটাবার জায়গা পাব না এমন

হতে পারে না। একান্তই যদি কোন কারণে বুকিং ক্যানসেল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হোটেল থেকেই বরং ফোন করা যাবে সদাশিবকে।

এইসব ভেবে স্যুটকেসটা হাতে চেপে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলুম। হোটেলের নাম বলতে মাফলারে কান-মাথা-মুখ ঢাকা বেঁটেখাটো চেহারার ড্রাইভারটি একবার তাকাল আমার দিকে। তারপর আর কিছু না বলে কুয়াশার ভিতর দিয়ে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল গাড়িটা।

অল্প গা ছমছম করলেও ভয় কেটে গেল যখন মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যেই আমাকে হোটেলের সামনে পৌঁছে দিল ট্যাক্সিওয়ালা! কিছু বাড়তি সমেত ভাড়া মিটাতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল আমার, সকাল থেকে যতগুলি যাত্রার মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয়েছে আমাকে তার মধ্যে এই ট্যাক্সি চড়ার ব্যাপারটা ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। এমনও হতে পারে, ভাবলুম, ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরোবার পরই শুরু হয়ে গেছে আর একটা দিন। গতকালের দিনটি গোলমেলে ছিল বলে আজকের দিনটাও যে একই রকম হবে তার মানে নেই কোন। বোধ হয় ফাঁড়া কেটে গেল। এখন একটা রুম পেলেই হল। একবার ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারলেই বিছানায় ছুঁড়ে দেওয়া নিজেকে। তারপর ঘুম। ঘুম। ঘুম। ভাবতে ভাবতেই শরীর কাঁপিয়ে উঠে এলো লম্বা এক হাই।

সদাশিবের ঠিক-করা হোটেলটা যে মাঝারি ধরনের তা আগেই বলেছি। পাঁচ-তারা হোটেলের রমরমা নেই এখানে। যেটুকু না জ্বাললেই নয় তার বেশি আলো নেই কোথাও। আলো অন্ধকারে নিঃশব্দে পড়ে আছে লবি—একটিও লোক নেই সেখানে। শুধু লম্বা একটি সোফায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে ঘুমোচ্ছে একটি লোক। ঢাকা বলেই মুখ চোখ দেখা যায় না কিছু। এইসব দেখতে দেখতেই রিসেপশন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলুম আমি।

কাউন্টারের ভিতর দিয়ে চেয়ারে বসে গল্প করছিল দুটি যুবক। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

'ইয়েস স্যার, হোয়াট ক্যান উই ডু ফর ইউ?'

দু জনের মধ্যে এই যুবকটি লম্বা ও বেশ স্বাস্থ্যবান। অন্যজন বেঁটে ও রোগা—হাতের মুঠোয় আড়াল করে ধরা সিগারেট। গাল ভাঙা ও চোখের নীচে ক্লান্তি ছায়া। এক পলক দুজনকেই দেখে নিয়ে নিজের পরিচয় দিলুম আমি, বললুম 'বুকিং আছে আমার নামে—একটা রুম চাই—'

'কনফার্ম করা আছে!' যুবকটি অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর কাউন্টারের পিছনে র‍্যাকের ওপর রাখা বড়ো মাপের একটা বাঁধানো খাতা টেনে

নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। বুঝলুম বুকিং রেজিস্টার। খানিক পরে বলল, 'আপনার বুকিং ছিল সকালে। না আসার জন্য ক্যানসেল হয়ে গেছে। উই হ্যাড নো ফারদার ইনফরমেশন!'

'ক্যানসেল হয়ে গেছে।' দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলুম নিশ্চিত শুকিয়ে গেছে আমার মুখ। বললুম, 'ফ্লাইট মিস করেছিলুম বলেই আসতে পারি নি। অন্তত রাতটা কাটানোর জন্যে কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না আপনারা?'

'রুম খালি থাকলে নিশ্চয়ই করতাম, স্যার। উই আর হিয়ার টু হেল্‌প ইউ!'

বাঁধা বুলি। প্রত্যাখানেও মিশে আছে সৌজন্যের হাসি। আমার রাগ হল; সঙ্গে সঙ্গে ছেঁকে ধরল এক ধরনের অসহায়তা। কী করব বুঝতে পারছি না। একটা ট্যাক্সি পেলে অবশ্য চলে যাওয়া যায় জ্যেঠতুতো দাদা কিংবা মাসীর বাড়ি। একটা চাণক্যপুরী এবং অন্যটা চিত্তরঞ্জন পার্কে; সে জায়গাগুলিও কম দূর নয় এখান থেকে। ট্যাক্সি অবশ্য ফোন করলেই পাওয়া যায় দিল্লীতে। কিন্তু, এতো রাতে? না, সদাশিবের ওখানেও যাওয়া যায় না। ভাবতে ভাবতেই আমি তাকালুম প্রায়ান্ধকার লবির দিকে। ওইখানেই শুয়ে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যায় কি না ভাবলুম। বন্ধ কাচের দরজা দিয়ে বাইরে তাকালেই কুয়াশার দেয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। লম্বা যুবকটি রিসিভার কানে লাগিয়ে কী শুনল যেন, তারপর বলল, 'সরি। উই আর ফুল্‌লি বুকড।'

মনঃস্থির করতে না পেরে আমি বললুম, 'একটা ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে?'

'দেখছি—!' লম্বা যুবকটি বলল, 'আপনি বসুন লবিতে —'

আমি লবিতে গিয়ে বসলুম। এতোক্ষণে কানে এলো ঘুমন্ত লোকটির মৃদু নাক ডাকার শব্দ। কান পর্যন্ত ঢাকা পুলওভারের নীচে ঘামতে লাগলুম আমি।

ইতিমধ্যে কাউণ্টারের বেঁটে যুবকটির সঙ্গে লম্বা যুবকটি নিজেদের—সম্ভবত পাঞ্জাবি—ভাষায় কী বলাবলি করল বুঝতে পারি নি। লম্বা যুবকটি হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'সকাল আটটার আগে ছেড়ে দিলে এখন আপনাকে একটা ঘর দিতে পারি—'

'ও-কে।' আমি উঠে দাঁড়ালুম, 'সকাল হলে আমি অন্য হোটেল খুঁজে নিতে পারি—'

'এখানেও কোন গেস্ট চলে যেতে পারে, তখন আপনাকে অন্য রুম দেওয়া যাবে। তবে আটটার মধ্যে বম্বে থেকে আসবে একজন। তার জন্যে একটা রুম কনফার্ম করা আছে—'

তখনকার যা অবস্থা তাতে যে-কোন শর্তেই আমি রাজী। পিছনের কী

হোলের গায়ে লাগানো হুক থেকে একটা চাবি নিয়ে বেঁটে যুবকটির হাতে দিল লম্বা যুবকটি। বেঁটে যুবকটি কাউণ্টারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে—'

ঘরটা দোতলায়। নাম্বার তেত্রিশ। বেঁটে যুবকটি দরজায় চাবি লাগিয়ে তালা খুলে আলো জ্বালল। তারপর আমার হাতে চাবিটি দিয়ে 'গুট নাইট' বলে চলে গেল। দেখলুম, সিঁড়ির বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে বেঁটে ও রোগা একটি চেহারা। যেমনই ব্যবহার করুক, শেষ পর্যন্ত আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে যুবক দুটির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলুম আমি। ঘরটা খারাপ নয়। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলুম দরজাটা। স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখলুম লাগেজ বক্সের ওপর। ঘুম পাচ্ছে। অবশ্যই ঘুম ছাড়া আর কোন কাজ নেই এখন। তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে গেলুম টয়লেটে। ব্র্যাকেটে ঝুলছে একটা ব্যবহার-করা তোয়ালে, সাবানটাও ব্যবহৃত। বাথটাবের মাথা থেকে অগত্যা টেনে নিতে হল ভাঁজ-করা বাথ টাওয়েলটা। তেষ্টা পেয়েছিল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে ফ্লাস্ক থেকে গ্লাসে জল ঢালতে গিয়ে দেখি ফ্লাস্কটা ভর্তি নয় পুরোপুরি। তখন মনে হল, হয়তো কিছুক্ষণ আগেও এই তেত্রিশ নাম্বার রুমে আর কেউ ছিল। চলে যাবার পর বিছানা ইত্যাদি পরিপাটি করে রাখা হলেও যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করা হয়নি ঘরটা—নতুন আগন্তুকের জন্যে নতুন জিনিসপত্রও দেওয়া হয় নি। রিসেপশনের যুবকটি অবশ্য বলেছিল সকালে কেউ আসবে বম্বে থেকে, তার জন্যেই আলাদা করে রাখা আছে ঘরটি। হয়তো সকালেই পরিষ্কার করত! আমি তো উটকো লোক! ঘরটা যে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল এটাই ভাগ্যের ব্যাপার।

বেড সুইচ জ্বেলে, নিভিয়ে দিলুম বড়ো আলোটা। তখনই চোখে পড়ল কাচের জানালার পর্দা টানা নেই। এগিয়ে গিয়ে পর্দা টানার আগে কাচে মুখ চেপে বাইরেটা দেখে নিলুম আমি। অন্ধকারে ঘন গাছগাছালি নিয়ে থমকে আছে লোধি গার্ডেনস্—দৃষ্টি ছড়ানো যায় না। রিল দেওয়া পর্দাটা টানতে টানতে গভীর ক্লান্তিতে হাই উঠে এলো আমার। বিছানায় এসে চাদর জড়ানো কম্বলের ভিতর শরীরটা সেঁধিয়ে দিলুম আমি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে ভাবে শুরু হয়েছিল দিনটি, শেষ অন্তত সেভাবে হয়নি। তিনটে বাজে প্রায়। শীতের দিল্লীতে সাতটা সাড়ে-সাতটার আগে সকাল হয় না। তার মানে ঘণ্টা চারেক ঘুমোতে পারব অন্তত। হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ টিপতেই অন্ধকার ছেয়ে গেল ঘরে। মনে হল ঘুম আসছে। জ্বর আসার মতো—হু হু করে, সারা শরীরে ঘুমের আবির্ভাব টের পেলুম আমি!

কতক্ষণ জানি না। ঘুম না তন্দ্রা, কোন্ ঘোরে ছিলুম তাও বুঝতে পারলুম না ঠিক। চমকে উঠে বসলুম বিছানায়। না, ভুল হয়নি। আমারই ঘরের টয়লেটে

ঘটাং করে ফ্ল্যাশ টানার শব্দ পেয়েছিলুম। তারই জেরে এখনো পাচ্ছি কমোডে জল গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। অদ্ভুত! শব্দটায় ধাতস্থ হতে যেটুকু সময় লাগে, তার আগেই বেড স্যুইচ্‌ টিপে আলো জ্বালালাম আমি। উঠে গিয়ে টয়লেটের দরজা খুলতে চোখে পড়ল না কিছুই। ঝিরঝির শব্দটাও মিলিয়ে গেছে তখন। বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হল রাতের নৈঃশব্দ্যে দূরের শব্দও অনেক সময় চলে আসে কাছে—হয়তো পাশের রুমের ফ্ল্যাশ টানার শব্দটাকেই ঘুমের ঘোরে ভুল করেছি। মাঝ থেকে ঘুমটা ভেঙে গেল!

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম আবার। এবং ঘুমিয়েও পড়েছিলুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না। আচ্ছন্নতার মধ্যেই মনে হল জানালার পর্দাটা বেশ জোর দিয়ে টেনে সরিয়ে দিল কেউ—ঘড়ঘড় শব্দ হল রিলের। মনে হলেও গা করলুম না তেমন; ঘুমের আগ্রহে পাশ ফিরলুম। শীতে জুড়িয়ে আসছে সারা শরীর। কিন্তু, এইভাবে কিছুক্ষণ আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে পড়ে থাকতে থাকতেই টের পেলুম, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ জড়িয়ে পড়ছে নিঃশ্বাসে। অস্বস্তি বেশি হওয়ায় পরিষ্কার ঘুম থেকে জেগে উঠলুম আমি। আর তখনই বিস্ময় আর আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে এলো আমার। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলুম, জানালার পর্দাটা সত্যিই সরানো। আর রাইটিং টেবিলের সংলগ্ন চেয়ারটিতে বসে জানালার দিকে মুখ করে সিগারেট টানছে কেউ। অন্ধকার বলেই আদল স্পষ্ট হয় না কোন। কিন্তু লাল জ্বলজ্বলে এক টুকরো সিগারেটের আগুন চোখে পড়ছে ঠিকই। পোড়া সিগারেটের গন্ধ ক্রমশ আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে।

সম্ভবত চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছিলুম আমি। গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না কোন। আতঙ্কের শেষ অবস্থায় পৌঁছে বেড স্যুইচটা টিপে আলো জ্বালতে পারলুম শুধু। আশ্চর্য! সব ঠিকঠাক আছে। জানালার পর্দাটা যেমন টানা ছিল তেমনিই টানা—চেয়ারটা চেয়ারের জায়গায়। সিগারেটের ধোঁয়ারও নামগন্ধ নেই কোনখানে!

ঘামছিলুম। সেই অবস্থাতেই মনঃস্থির করে ফেললুম, আর ঘুমোবার দরকার নেই। আলোটা জ্বলুক। অন্তত ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই জেগে থাকতে হবে আমাকে।

ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। শব্দহীন চারিদিকে ঘুমের নিশুতি। আমি জেগে আছি।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সদাশিবকে ফোন করে বললুম সব। সদাশিব বলল, 'কী আশ্চর্য, ওই তেত্রিশ নাম্বার ঘরটাই দিয়েছিল আপনাকে।'

'কেন!'

সদাশিব বলল, 'পরশু রাত্রে ঘরে মোহিনী চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেছেন। আজকের কাগজেই আছে খবরটা—'

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারী বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানীতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের-পরা খুকী। তখন এত সব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেই রকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায়সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো এক-নাগাড়ে তিন চার কিম্বা সাতদিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট নজন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলে-মেয়েরা সবাই তখন ছোটোছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারী সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচু গাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশী নয়। এক ধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনসটিটিউট ছিল, সেখানে প্রতি বছর দু-তিন বার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড় সাহেবরা সে-খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোটো আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকীপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, "এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভাল নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে দোরে ঢুকতে দেবেন না।" কিম্বা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত-গিন্নী এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, "নতুন

এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলে-পুলেদের সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভাল নয়।"

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, "কাদের কথা বলছেন দিদি?"

পালিত-গিন্নী শুধু বললেন, "সে আছে, বুঝবেনখন।"

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন। একদিন হল কী, পুরোনো ঝি সুখিয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। একমাসের ছুটি নিয়ে সুখিয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধাবয়সী বউ এসে বলল, "ঝি রাখবেন?"

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত গিন্নী একদিন সকালে এসে বললেন, "নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে।"

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নী মিচকি হাসি হেসে বললেন, "ওকে ওরকমই ধারা। ঝিটার নাম বলুন তো?"

দিদিমা বললেন, "কমলা"।

পালিত-গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন, "চিনি, হালদার-বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।"

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো।"

পালিত-গিন্নী শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, "সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোন্‌টা মানুষ আর কোন্‌টা মানুষ নয় তা চেনা ভারী মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।"

এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নী, আর দিদিমা আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

সে মাথা নীচু করে বলল, "মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই!"

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খট্‌কা-ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতিরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই

ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশনমাস্টারেরা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলা-ঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইশল দিল, গাড়িও ক্যাঁচকোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাই পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসার ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল! ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয় আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে

টর্চের আলো ফেলবেন না ... ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনো শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচন্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা—ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখবাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য প্রফেসর ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সঙ্কোচের কিছু নেই, আমি বাঘ ভাল্লুক নই, ... ইত্যাদি। সে সময়ে হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো-কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, কী হয়েছে। অ্যাঁ কী হয়েছে। তারপর তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তাঁর মুখ থেকে সাপের জিভের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনো দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো-কাঁদো মুখে চার পাঁচ সাত গ্লাসজল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়।

তখনকার মফস্বল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলাটেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, "আপনার খেলা গণপতির চেয়ে ভাল। অতি আশ্চর্য খেলা।"

ভট্টাচার্যও বললেন, "হাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি!"

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, "সে কী? এ তো আপনিই দেখালেন! ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বলেন, "তা বটে। আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য।"

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, "তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?"

সবাই বলল, "আঁশটে গন্ধ! কৈ, আমরা তো পাচ্ছি না।"

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পন্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, "আলবাৎ আঁশটে গন্ধ। শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলুম। পুরো এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।"

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারী মুশকিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখেশুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক, সে ভাল।

কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশী করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এ-বাড়িতে থাকে কী করে?"

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, "এসব কী কথা বলছেন মাসীমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?"

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তা বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ঐ দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।"

"কারা?" দিদিমা তবু অবাক।

"বুঝবে বাপু, রোসো।" বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকের বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোন লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই-পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, "ওরে, কে আছিস?" বলামাত্র একটা

ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, "যা, এটা ডাকে দিয়ে আয়।" দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?" সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, "না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কি। খুব ভাল ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই।"

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহি গলায় মেয়েলী পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদৌল্লা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরীশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপচাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত, যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেনি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, "দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি।"

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, "মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?"

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, "সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।"

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়মাসী তখন কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা-মাসীরা নাবালক নাবালিকা। মার বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসী রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক্ দিত, "আয় রে।" অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সীই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, সেই বড়ো আর মেজো মামা যেত বল খেলতে। দুটো পাট্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশী লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, "কে খেলবি আয়।" অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সীই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কান্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী

দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালী টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভাল খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরও একখানা দিয়েছে। এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারীকে বলল, "ওরা বারোজন খেলছে।" রেফারী গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারীই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, "তোমাদের টিমে চার পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে।"

দুর্দান্ত সাহেব-রেফারী, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, "গুনে দেখুন। রেফারী গুনে দেখে আহাম্মক। এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরো তিনটে গোল দিয়েছে। রেফারী আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, "দেয়ার আর অ্যাট লীসট্ টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম।"

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায়, "এগারোজন, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিম্বা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিল্‌পিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারী দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভাল করে দেখে বললেন, "শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কই? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?"

দোমোহানীর ক্যাপ্টেন মিন মিন করে সাফাই গাইল, তাতে রেফারী আরো রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফ্‌সে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, "আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?"

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, "ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।"

"কে? কাদের কথা বলছ?"

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ্য করতেন, আর বলতেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বৌমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট্

বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ্ করে সব মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?"

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশী উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, "এ ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায়ঘাটে লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, "রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তারপর কথাবার্তা।" এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায় ঘাটে বা হাটেবাজারে যেসব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত। যেমন বড়মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারী ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ঐ বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না থাকে। তাঁর কিছু বেশী ছিল। সন্ধ্যের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধ্যেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া-বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে পারেন না—আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতরবাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই শুনছিস?"

অমনি একটা সমবয়সী ছেলে এসে দাঁড়াল, "কী বলছ?"

"আমি একটু বাথরুমে যাব, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।"

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি, বলল, "দাঁড়াব কেন? তোমার কিসের ভয়?"

বড়মামা ধমক দিয়ে বলেন, "ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।"

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়মামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, "কিসের ভয় বললে না?"

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূতের।"

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়মামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "খুব ফাজিল হয়েছ তোমরা।"

তা এইরকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতের মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে সিঙ্গি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমসিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি। এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয় ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, "এ তো ভাল কথা নয়! গন্ধটা খুব সন্দেহজনক! তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা?"

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সেও বলল, "এ তো ভাল কথা নয়। গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?"

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তার প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ঐ কথা বলে গেছে ভাবা যায়?

রাতটা ছিল দুর্যোগের

সমরেশ মজুমদার

দিনটা ছিল দুর্যোগের। আকাশে আলো ছিল না একফোঁটা। ঠাণ্ডা বাড়ছিল হু-হু করে। পোড়া কাঠের মতো মেঘগুলি চাপ হয়ে ঝুলছিল, যেন টোকা মারলেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। দিন ফুরোবার আগেই রাত নামল। সেইসঙ্গে দাঁতাল হাওয়ারা নেমে এল খোলা পৃথিবীতে। এখনও বৃষ্টি নামেনি, এই রক্ষে!

রাস্তায় এই আবহাওয়ায় মানুষ থাকার কথা নয় বলেই নেই। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলি ডাইনির চোখ হয়ে জ্বলার চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল দ্রুত হাঁটতে। তাঁর বয়স চল্লিশের ওপরেই, একটু মোটাসোটা ভালমানুষ গোছের চেহারা। হনহনিয়ে হাঁটছেন আর বারংবার পেছন ফিরে দেখছেন। যেন কে তাঁকে অনুসরণ করছে।

স্ট্রিটল্যাম্পের নীচ দিয়ে তিনি যখন হেঁটে গেলেন, তখন তাঁর মুখটা চকখড়ির মতো সাদা দেখাল। সেটা ঠাণ্ডায় যতটা নয়, আতঙ্কে ঢের বেশি। ওঁর শরীরে শীতের পোশাক আছে। তার ওপর একটা কালো চাদরে মাথা-গলা ঢেকে রেখেছেন। সম্ভবত কানে যাতে হাওয়া না ঢোকে, তাই সতর্কতা। হাতে একটা ব্যাগ। যেসব ব্যাগ নিয়ে মহিলারা অফিসে যান, সেইরকমের। পায়ে মোজা এবং পাম্প-শু গোছের জুতো।

দ্রুত চলার জন্যই ভদ্রমহিলা হাঁপাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যে-কোন মুহূর্তেই বসে পড়বেন। দু'পাশের বাড়িগুলির দরজা-জানালা বন্ধ। একটুও আলো চোখে পড়ছিল না। বাঁক ঘুরতেই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনে একটা বাড়ির দোতলার জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। কাচের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে কথাও বলছে। ভদ্রমহিলা আর দেরি না করে ছুটে গেলেন একতলার দরজায়। প্রাণপণে বেলের বোতাম টিপে ধরলেন। সেই মুহূর্তেও তাঁর চোখ পেছন দিকে চলে গেল। দূরে কুয়াশায় কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে গলা ভেসে এল, "কে?" দয়া করে দরজা খুলুন। প্লিজ। আমাকে বাঁচান।" ভদ্রমহিলা আর্তনাদ করলেন।

দরজাটা খুলে যেতেই একদঙ্গল আলো রাস্তায় ভদ্রমহিলার শরীর ভাসিয়ে লাফিয়ে নামল। একজন মধ্যবয়সী মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'আপনি?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'একটু যদি ভেতরে আসতে দেন, তা হলে বলছি।''

ভদ্রলোকের স্ত্রী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আসুন, নিশ্চয়ই আসবেন।''

ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে ঢুকতেই ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করলেন। ওঁরা ভদ্রমহিলাকে ওপরে নিয়ে এসে বসতে বললেন। সেটা খুবই প্রয়োজন ছিল ওঁর। একটা চেয়ারে বসে বড়-বড় নিশ্বাস ফেললেন তিনি। ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি কি অসুস্থ?''

''অ্যাঁ? না, ঠিক, আসলে দৌড়ে আসছিলাম বলে, অভ্যেস তো নেই।'' ওঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল!

''দৌড়চ্ছিলেন কেন?''

''মনে হচ্ছিল, হচ্ছিল বলব কেন, স্পষ্ট দেখেছি, কেউ যেন আমাকে ফলো করছিল। রাস্তায় তো আজ একটাও লোক নেই তাই ভয়ে—'' ভদ্রমহিলা কথা শেষ করতে না পেরে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

ভদ্রলোক বললেন, ''সে কী! এ-পাড়ায় কে অমন কাজ করার সাহস পাবে?'' তিনি সোজা জানালার কাছে গিয়ে রাস্তাটা দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, ''নাঃ কেউ নেই।''

''কিন্তু ছিল!'' ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করলেন।

''বেশ, থাকেও যদি, তা হলে আর আপনার ভয় নেই। আমার স্বামী সরকারি অফিসার। সবাই ওঁকে চেনেন।'' স্ত্রী পরিচয় দিতেই স্বামী এগিয়ে এলেন, ''শোনো, আমার মনে হয় ওঁকে এককাপ গরম দুধ দিলে ভাল হয়।''

ভদ্রমহিলা আপত্তি করলেন, ''না, না, দুধ আমি খাই না।''

ভদ্রমহিলা আরও সঙ্কুচিত হলেন, ''না না। আমার এসব লাগবে না।''

ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ''আচ্ছা, এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?''

ভদ্রমহিলা মুখ নীচু করে মাথা নাড়লেন, ''কাজে। আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে অনুপস্থিত হলেই মাইনে কাটে। টাকার প্রয়োজন বলেই এই আবহাওয়াতেও সকালে বেরিয়েছিলাম।''

ভদ্রলোক সমব্যথীর গলায় বললেন, ''সকালে অবশ্য আবহাওয়া এত খারাপ ছিল না।''

ওঁর স্ত্রী বললেন, ''তা হলে আপনি চাকরি করেন। বাড়িতে আর যাঁরা

আছেন...।"

"আর কেউ নেই ভাই।" ভদ্রমহিলা মুখ তুলছিলেন না। তিনি রুমালে চোখ মুছলেন।

ভদ্রলোক ইশারায় স্ত্রীকে নিষেধ করলেন এ-বিষয়ে কথা চালাতে। স্ত্রীর সেটা ভাল লাগল না। একটু সময় যেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—,

"আপনার স্বামী..." প্রশ্নটা ইচ্ছে করেই শেষ করলেন না।

তিনি মারা গিয়েছেন অ্যাক্সিডেন্টে। এইরকম খারাপ আবহাওয়ার সন্ধ্যে ছিল সেদিন।

ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

"উনি অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন, এই সময় একটা কালো গাড়ি এসে ওঁকে চাপা দেয়।'

"ইস্।"

"কিন্তু আমি জানি, উনি কখনও অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তায় হাঁটতেন না।"

"আমার কথা পুলিশ বিশ্বাস করেনি। কালো গাড়িটাকেও ধরতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখেছি।" "দেখেছেন মানে?"

"যখনই আমি একা-একা এই রাস্তায় হেঁটে যাই, তখনই দেখি একটা কালো গাড়ি আমার পেছন-পেছন আসছে। যতক্ষণ না সেটা বেরিয়ে যায়, ততক্ষণ আমি রাস্তা পার হই না।"

"গাড়িতে কে থাকে দেখেছেন?"

"না। মুখ দেখতে পাইনি।"

"আজও কি গাড়িটা পেছনে ছিল?"

"হ্যাঁ। প্রথমে গাড়িটাকে দেখলাম। একবার। তারপর মনে হল, কেউ যেন দরজা খুলে নেমে আমার পেছন-পেছন আসতে লাগল।"

ভদ্রলোক আবার জানালায় চলে গেলেন। ভাল করে রাস্তাটা দেখে ফিরে এলেন তিনি, "আচ্ছা, আপনি কতদূরে থাকেন?"

"সামনের রাস্তা ধরে মিনিট চারেক গেলে বাঁ দিকের তিনতলা কাঠের বাড়িটায় থাকি আমি।"

"ও। সামান্যই পথ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।"

"না, না। আপনি কেন যাবেন। ছি ছি, এসেই বিব্রত করেছি, তার ওপর।"

"মোটেই বিব্রত করেন নি।" ভদ্রলোক বড় গলায় বললেন।

"প্রতিবেশীকে যদি সাহায্য না করি, অন্যের প্রয়োজনে যদি না লাগি, তা হলে

মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন?"

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, "আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।"

"কর্তব্য বুঝলেন, এসব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।" ভদ্রলোক উদার গলায় বললেন।

ওঁরা উঠে দাঁড়াতেই স্ত্রী স্বামীকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে, চাপা গলায় বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?"

স্বামী অবাক হলেন, "কেন? কী করেছি?"

"তুমি ওঁকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছ! এই আবহাওয়ায় একটা কুকুরও রাস্তায় নেই।"

ভদ্রলোক আড়চোখে বাইরের দিকে দেখলেন, "তোমার কিস্‌সু মনে নেই।"

"মানে?"

"আমার একটা কালো গাড়ি ছিল এবং আমিও একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম।"

"কিন্তু তুমি তো বলেছিলে লোকটা মরেনি।"

"তাই মনে হয়েছিল, পরে তো দেখতে যাইনি, খবরও নিইনি।"

"তার মানে, তোমার গাড়িতেই..."

"নাও হতে পারে। এখনও সেই কালো গাড়িটা ওঁকে ফলো করে।"

স্ত্রীর উত্তেজনা কমল। তিনি মনে করে বললেন, "তুমি তখন বলতে, গাড়িটা যেন কীরকম!"

"হ্যাঁ। সবসময় ড্রাইভারের কথা শুনত না। তাই তো বিক্রি করে দিলাম।" ভদ্রলোক বললেন, "চলি। উনি অনেকক্ষণ বসে আছেন।"

"শোনো যে-জন্যে তোমাকে ডাকলাম, রিভলভারটা নিয়ে যাও।"

"রিভলভার?"

"হ্যাঁ। যাচ্ছই যখন তখন সাবধান হয়ে যাওয়াই ভাল।"

"বেশ।" ভদ্রলোক আলমারির দিকে এগোলেন।

ভদ্রমহিলা দরজার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, "আপনার কোন ভয় নেই। উনি পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আচ্ছা, আপনার বাড়ির ফোন নম্বর কত?"

"আমার বাড়িতে তো ফোন নেই।"

"ওঃ! বাড়ি পৌঁছে একটা ফোন করলে নিশ্চিন্ত হতাম, তাই বললাম। ওই অ্যাক্সিডেন্টটা কতদিন আগে ঘটেছিল?" খুব সাধারণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন

ভদ্রলোকের স্ত্রী।

"বছর দুই আগে।"

ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ওঁরা নীচে নেমে গেলে ভদ্রলোকের স্ত্রী দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এখন রাস্তায় ঘন কুয়াশা। স্ট্রিটল্যাম্পগুলোকে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। ভদ্রমহিলা লজ্জিত গলায় বললেন, "দেখুন তো, আমার জন্যে আপনার কি কষ্ট হচ্ছে!"

"কষ্ট কেন বলছেন! এটা কর্তব্য।"

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রমহিলা পেছন ফিরে তাকালেন। সেটা লক্ষ্য করে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। তাঁর কোটের পকেটে রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরে লক্ষ্য করলেন, কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি না। না পেয়ে বললেন, "কেউ নেই তো!"

"পায়ের আওয়াজ শুনলাম।"

"ঠিক আছে, আপনি এগোন, আমি একটু পিছিয়ে আপনাকে ফলো করব। কেউ যদি কাছে এসে পড়ে, তা হলে আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না।"

"না, না। তার দরকার হবে না। ওই যে জুতোর দোকানটা এসে গেছে, আমি ঠিক যেতে পারব। আপনি চলে যান।" ভদ্রমহিলা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বললেন।

এই সময় গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। তারপরেই দুটো হেডলাইটকে কুয়াশা চিরে এগিয়ে আসতে দেখলেন ওঁরা। ভদ্রলোক রিভলভার বের করে তৈরি হলেন। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়াল না। সমান গতিতে তাঁদের পেরিয়ে চলে গেল। দু'জনেই দেখতে পেলেন গাড়িটার রং সাদা।

ভদ্রমহিলা স্বস্তিতে বলে উঠলেন, "নাঃ।"

"হ্যাঁ, আমিও...।" ভদ্রলোক রিভলভার আর ঢোকালেন না, "চলুন আপনাকে পৌঁছে না দিয়ে আমি ফিরব না।"

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার স্বামী কী করতেন?"

"মাস্টারমশাই ছিলেন।"

"কী রকম বয়স ছিল?"

"এই, আপনারই বয়সী।"

ভদ্রলোক ঢোক গিললেন, "ও। উনি কি দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। পুলিশ তাই বলেছিল।"

কিছুদূর যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি এসে গিয়েছি। আর চিন্তা নেই।"

"ও। বাড়িটায় আলো জ্বলছে না।"

"পুরনো বাড়ি। দোতলায় আমি ছাড়া কেউ থাকে না।"

"চলুন, আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, না। কোন দরকার নেই। আমি ওই সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলেই ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে যাব। আর আমার কোন ভয় নেই।"

"বেশ। তা হলে চলি।"

"হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ!" বলেই ভদ্রমহিলা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। তিনি যতক্ষণ চোখের আড়ালে না গেলেন, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ির পথ ধরলেন।

কয়েক পা হাঁটার পরই মনে হল, কেউ যেন তাঁর পেছনে পেছনে আসছে। স্পষ্ট গলায় শব্দ শুনতে পেয়েছেন তিনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন। কুয়াশা এখন এমন ঘন হচ্ছে যে, কাউকে দেখতে পেলেন না। রিভলভারটা উঁচিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই গাড়ির শব্দ কানে এল। একটা গাড়ি যেন আসছে, কিন্তু তার হেডলাইট নেভানো। সেটা জ্বললে তিনি দেখতে পেতেন। দ্রুত ফুটপাতের শেষপ্রান্তে চলে এলেন তিনি। গাড়িটা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাক, তারপর তিনি যাবেন। কিন্তু সরে আসামাত্র শব্দটা থেমে গেল। কুয়াশারা এখন পাক খাচ্ছে সর্বত্র। স্ট্রিটল্যাম্পগুলিকেও গিলে ফেলেছে তারা। তিনি আবার পা ফেলতেই গাড়ির শব্দ শুনলেন। যেন গাড়িটা ওত পেতে ছিল একপাশে, তাঁকে চলতে দেখেই সক্রিয় হয়েছে।

ভদ্রলোকের সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ওই ঠাণ্ডায় কুয়াশায় দাঁড়িয়েও হাতের মুঠোয় ধরা রিভলভারটা ভিজে উঠল। তাঁর মনে হল, এগোনোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তিনি এক দৌড়ে পেছন দিকে চলে এলেন। ভদ্রমহিলার বাড়ির কাঠের সিঁড়িটা দেখতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। না, কেউ নেই। তার মনে হল একা ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। ভদ্রমহিলা নিশ্চয় সাহায্য করতে পারেন। তিনি দ্রুত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, দোতলায় উনি একা থাকেন। অতএব ওকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। দোতলায় উঠে পা বাড়াতে গিয়ে কোনওমতে নিজেকে সামলে নিলেন ভদ্রলোক। সিঁড়ির সামনে বা করিডোর বলে কিছু নেই। কাঠগুলি অনেক, অনেক আগেই খসে পড়ে গিয়েছে। তবে কি ওপাশের দরজাটা ভাঙা এবং অন্ধকার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভদ্রমহিলা এই শূন্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন!...

বটুকদাদার পাখি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের বটুকদাদা পাখিদের দিয়ে কথা বলাতে পারতেন। পাখিরা যে সত্যি মানুষের মতন কথা বলতে পারে তা আমি নিজের কানে না শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না। রূপকথার শুকসারী আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প পড়েছি। কিন্তু রূপকথা তো রূপকথাই। পক্ষিরাজ ঘোড়া, মাছের পেটে মানুষ, আর মানুষখেকো দৈত্য যে সত্যি সত্যি কোথাও নেই, তা আমরা ছোটবেলা থেকে বুঝে গিয়েছিলুম। সেই রকমেই জানতুম যে কথা বলা পাখির কথা এমনি কথার কথা।

কিন্তু বটুকদাদা আমাদের অবাক করে দিয়েছিলেন। বটুকদাদা অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে হঠাৎ হঠাৎ একদিন উপস্থিত হতেন আমাদের বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে আসতেন মাথা ভর্তি গল্প আর ঝোলা ভর্তি খুচরা পয়সা। একবার তিনি নিয়ে এলেন একটা পাখি। খাঁচায় বন্দী করে নয়, পায়ে শিকল বেঁধেও নয়। পাখিটা বসেছিল বটুকদাদার কাঁধে।

সেটা ঠিক কি পাখি তা চেনা গেল না, দেখতে অনেকটা বেশ বড় সড় ঘুঘু পাখির মতন, কিন্তু গায়ের রং সবুজ। সেটাকে টিয়া পাখিও বলা যাবে না। কারণ টিয়া পাখির মতন লাল ঠোঁট নেই। অথচ সবুজ রংয়ের ঘুঘু পাখিতো আমরা কেউ কখন দেখিনি।

বটুকদাদা বললেন, ওটা একটা পাহাড়ী পাখি। কি করে যে একা একা এদিকে চলে এসেছে। আমি নৌকো করে আসছিলুম, পাখিটা প্রথমে উড়ে এসে ছই এর ওপর বসল। আমি আদর করে ডাকলুম, আয় আয়, কাছে আয়। আমার চোখ দেখে ঠিক বুঝেছিল। আমি তো পাখিদের ভালবাসি, তাই ওরা আমাকে ভয় পায় না।

বটুকদাদার সব কথাই তো অদ্ভুত, তাই এটাকে তো আমরা আর একটা অদ্ভুত কথা বলে ধরে নিলুম। অবশ্য পাখিটা যে শান্তভাবে বটুকদাদার কাঁধে বসে আছে, সেটাও তো ঠিক।

বটুকদাদা বললেন, দু'দিন ধরে নৌকোয় আসতে আসতে আমি পাখিটাকে কথা বলতে শিখিয়েছি। আমি তো পাখিদের ভাষা জানি তাই ওরাও আমার কাছ থেকে চট করে মানুষের ভাষা শিখে নেয়।

তাই শুনে আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলুম, কই, কই, আমরা পাখিটার

কথা শুনব! কথা শুনব!

বটুকদাদা হাত তুলে বললেন, শুনবি, শুনবি। এক্ষুনি না। এত নতুন লোক দেখে লজ্জা পেয়েছে। আমি চান খাওয়া করে নি, তারপর তোদের শোনাব।

আমাদের সেই গ্রামের বাড়িতে ছিল একটা বেশ মস্ত উঠোন। তার তিন দিকেই ছোট ছোট একতলা ঘর। বটুকদাদা এলে তাকে দেওয়া-হত উত্তর দিকের কোণের একটি ঘর। সেই ঘরের খুব কাছেই পুকুর ঘাট।

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বটুকদাদা বললেন, আমার পাখিটা ইচ্ছে মতন এখানে উড়ে বেড়াবে। তোরা ওকে আদর করে ডেকে কথা বলতে পারিস, কিন্তু ওর গায়ে হাত দিস না। পাখিদের গায়ে হাত দিতে নেই। এর নাম আমি দিয়েছি কেষ্ট।

তারপর বটুকদাদা পাখিটাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকার একটু পরেই স্পষ্ট শোনা গেল, কে যেন বলছে, বটুকদাদা ওঠো, ওঠো, ওঠো!

আমার ছোট ভাই বকু উত্তেজিত ভাবে বলল, ঐ যে, ঐ যে, পাখিটা কথা বলছে।

আমার ছোটদি মুন্নির খুব বুদ্ধি আর সব কিছুতেই সন্দেহ বাতিক। ছোড়দি ঠোঁট উল্টে বলল, ধ্যাৎ! ওটা আবার পাখির ডাক নাকি? আমাদের সঙ্গে মজা করার জন্য বটুকদাদা নিজেই ওরকম ডাকছে!

তক্ষুনি পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রান্না ঘরের পাশে, পুকুর ঘাটের কাছে তেঁতুল গাছটার একটা নীচু ডালে গিয়ে বসল। আমরা দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে বলতে লাগলুম, কেষ্টা, কেষ্টা আমরা তোমায় খুব ভালবাসি, আমাদের একটু কথা শোনাও তো!

পাখিটা যেন অবাক হয়ে আমাদের একটুক্ষণ দেখল। তারপর ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল অনেক দূরে।

আমরা বটুকদাদার ঘরের কাছে গিয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে বললুম, ও বটুকদাদা, তোমার পাখি উড়ে গেল! কোথায় যেন চলে গেল।

বটুকদাদা তখন ধুতি-পাঞ্জাবী খুলে পাজামা আর আলখাল্লা পরছেন, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, চিন্তা করিস না, ও আবার ঠিক আসবে। এখন ওর জল-খাবারের সময় তো!

অনেকখানি রাস্তা নৌকো করে এসেছেন বলে বটুকদাদা ক্লান্ত হয়েছিলেন, তাই দুপুরবেলা ঘুমিয়ে নিলেন। এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল বয়ে গেল, তখনও পাখিটার দেখা নেই। বটুকদাদার কাছে আমাদের গল্প শোনা হচ্ছে না বলে আমরা ছটফট করতে লাগলুম। বাড়ির বড়রা বটুকদাদাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে বারণ করেছেন।

আমরা একটা ঘরে বসে ক্যারাম খেলছি, হঠাৎ বকু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, কেষ্ট ফিরে এসেছে। কেষ্ট তেঁতুল গাছের ডালে বসেছে।

আমরা খেলা বন্ধ করে বাইরে আসতেই স্পষ্ট শুনতে পেলুম সেই পাখির মুখে মানুষের ভাষা। তেঁতুল গাছের ডালে বসে সে ডাকছে, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

আমাদের চ্যাঁচামেচি শুনে বাড়ির অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এলো। আমরা বললুম, ঐ শোন, পাখি কথা বলছে!

ঠাকুমা একগাল হেসে বললেন, ওটা নিশ্চয়ই একটা সবুজ রং করা ঘুঘু পাখি। ঘুঘু পাখির ডাক এক এক সময় ঐরকম শোনায়। মন দিয়ে শুনে দেখবি, ঘুঘু যেন বলছে, ঠাকুর গোপাল, ওঠো, ওঠো, ওঠো ......।

বটুকদাদা ঘুম ভেঙ্গে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে ডাকলেন, কেষ্ট! কেষ্ট।

অমনি পাখিটা তেঁতুল গাছ থেকে উড়ে এসে বসল বটুকদাদার কাঁধের উপর।

আমরা কাছে গিয়ে বললুম, ও বটুকদাদা, তোমার কেষ্ট ঐ একটা কথা ছাড়া আর কোন কথা বলে না?

বটুকদাদা গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে ঠিকমতন-খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো? এই জায়গাটা কেমন লাগছে?

পাখিটাও আবার বলল, ভালো, ভালো, ভালো। বটুকদাদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলি, এর আগেও আমি কত পাখিকে কথা বলা শিখিয়েছি। তোদের ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।

সেবারে যে দু'তিন দিন বটুকদাদা রইলেন, পাখিটাকে নিয়ে আমাদের খুব আনন্দে কাটাল। এত পোষমানা পাখি আমরা আগে দেখিনি। তার একটুও ভয় ডর নেই। সে আমাদের পড়াশুনোর সময় ঘরের মধ্যেও চলে আসে, একপাশে চুপ করে বসে যেন আমাদের পড়া শোনে।

ঠাকুমা বললেন, আহা রে, পাখিটা নিশ্চয়ই আগের জন্মে মানুষ ছিল। তাই মানুষের পাশে পাশে থাকতে এত ভালবাসে।

আমরা কেষ্টর গায়ে হাত দিই না, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলি। সে বেশি কথা বলতে পারে না বটে, কিন্তু আমাদের সব কথাই যেন সে বুঝতে পারে। অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তরে সে বলে, ভালো, ভালো, ভালো,। কিংবা না, না, না। প্রশ্নগুলো সেইভাবে সাজাতে হয়। যেমন আমরা যদি তাকে জিজ্ঞাসা করি, কেষ্ট, তোমায় কেউ কষ্ট দিয়েছে? অমনি সে বলে, না, না, না। কিংবা কেষ্ট, আজ কি বৃষ্টি হবে? সে বলবে, না, না, না।

তিনদিন বাদে বটুকদাদা যখন কেষ্টকে নিয়ে চলে গেলেন, তখন আমাদের

খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা নৌকোর ঘাট পর্যন্ত গিয়ে বটুকদাদাকে বললুম, বটুকদাদা, পরের বার যখন আসবে, তখন কেষ্টকে ঠিক সঙ্গে করে এনো কিন্তু!

বটুকদাদা ঘাড় হেলিয়ে বললেন, হ্যাঁ আনব। কিরে কেষ্ট, তুই আসবি না?

কেষ্ট এই কথার উত্তর দিলে না, কারণ সে হ্যাঁ বলতে পারে না।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম কেষ্ট, তুমি অন্য জায়গায় থেকে যাবে না তো?

কেষ্ট তখন বলল, না, না, না।

বটুকদাদা ফিরে এলেন দেড় মাস বাদে। এবারে তাঁর সঙ্গে রতন বলে একটা ছেলে এসেছে কিন্তু তাঁর কাঁধের ওপর পাখিটা নেই।

তা দেখে আমাদের বুকটা ধড়াস করে উঠল। কেষ্ট আসে নি! সে কি অন্য জায়গায় উড়ে চলে গেছে? বটুকদাদা একসময় বলেছিলেন যে আগেও তিনি অনেক পাখিকে কথা বলা শিখিয়েছেন বটে, কিন্তু একসময় তাদের আবার আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলুম, বটুকদাদা, কেষ্ট কোথায়? কেষ্টকে আনোনি?

বটুকদাদা বললেন, হ্যাঁ, এসেছে। কেষ্ট আছে। পরে দেখতে পাবি।

কিন্তু বটুকদাদার সঙ্গে কোন জিনিসপত্র নেই, কাঁধে শুধু একটা টাকা-পয়সা রাখার ঝুলি, তার মধ্যে তো একটা পাখিকে রাখা যায় না। তা হলে কেষ্ট কোথায়? সে কি আকাশ পথে আসছে?

বটুকদাদা বললেন, এবারে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, ওরে, দারুণ বিপদের মুখে পড়েছিলাম। দাঁড়া, একটু বিশ্রাম করে নিই, তারপর সব কথা শোনাব।

দুপুরবেলা বটুকদাদা ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনও কেষ্টর পাত্তা নেই। আমরা রতন নামে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলুম, এই, তুমি কেষ্টকে চেনো? তাকে দেখেছ? সে এখন কোথায় আছে বলতে পারো?

রতন বলল, হ্যাঁ আমি কেষ্টকে চিনি। অনেকবার দেখেছি। কিন্তু সে এখন কোথায় আছে তা তো বলতে পারব না।

বকু জিজ্ঞেস করল, তুমি যে এবারে বটুকদাদার সঙ্গে এলে, আসার পথে তাকে একবারও দেখতে পাওনি?

রতন হঠাৎ মুখ চুন করে বলল, না গো, কি করে দেখব বলো, গত হপ্তায় যে তাকে একটা বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।

আমরা সবকটি ভাইবোন একসঙ্গে আঁতকে উঠে বললুম, অ্যাঁ? বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে? কেষ্টকে? যাঃ, তা হতেই পারে না।

রতন বলল, আমি নিজের চোখে দেখেছি গো।

গত হপ্তায় আমাদের নৌকো বাঁধা হয়েছিল চাঁদপুরের ঘাটে। আমরা মুড়ি খেতে বসেছি,.কেষ্ট পাশেই বসে আছে। হঠাৎ ঘাট থেকে একটা হুলো বেড়াল লাফিয়ে পড়ে কামড়ে ধরল কেষ্টকে। তারপর তো তাকে মুখে নিয়ে উল্টো দিকে দিল একটা লাফ। আমি লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলুম বটে কিন্তু ততক্ষণে কেষ্ট মারা গেছে। পাখির প্রাণ কি বেড়ালের কামড়ে বাঁচে? বেড়ালটার মুখ থেকে কেষ্টর আধ খাওয়া দেহটা উদ্ধার করা হল, তারপর ভাসিয়ে দেওয়া হল নদীর জলে। বটুকদাদা সেদিন খুব কেঁদেছিলেন।

ভীষণ দুঃখে আমরা সবাই চুপ করে গেলুম। শুধু বকু মিন মিন করে রতনকে জিজ্ঞেস করল, তবে যে তুমি প্রথমে বললে, কেষ্ট কোথায় আছে তা তুমি জানো না?

রতন এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

বিকেল বেলা ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আর বাবা-কাকার আসরে চা-মুড়ি খেতে খেতে বটুকদাদা শোনালেন এবারের বিপদের গল্প। প্রত্যেকবারই তাঁর একটা না একটা গল্প থাকে। তবে এবারে নাকি তিনি নির্ঘাৎ প্রাণেই মারা যেতেন।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সেই পাখিটা কোথায় গেল? ছেলেরা বললে, তাকে নাকি ....।

ঠাকুমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বটুকদাদা বললেন, আগে এই ঘটনাটা শুনে নাও। তারপর কেষ্টর কথা বলব।

বটুকদাদা অন্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে একটু সুন্দরবনের দিকে গিয়েছিলুম বুঝলে? ওদিকে একটা খেয়াঘাট ইজারা নেবার কথা হচ্ছিল। ওদিকে বড্ড বাঘের ভয়, তাই সন্ধ্যের পর কেউ নৌকো চালায় না। আমিও বিকেল হতে না হতেই মোল্লাখালির ঘাটে নৌকো বেঁধে ফেলেছি। রাত্তিরে আর রান্না বান্নার ঝামেলা করিনি, কাছেই একটা হোটেল ছিল, সেখান থেকে খেয়ে নিলুম রতন আর আমি। রতনটা খুব ঘুম-কাতুরে, সন্ধ্যে হতে না হতেই ওর ঘুম পায়। আমিও আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়লুম, শুধু কেরোসিন পুড়িয়ে লাভ কি। পাশাপাশি তিন চারখানা নৌকো, ভয়ের কিছু নেই।

হঠাৎ একসময় আমার কানের কাছে কেষ্ট ডেকে উঠল, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

সেই ডাক শুনে আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলুম। অমনি কানে এলো হৈ হৈ শব্দ; ছই এর বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি পাশের নৌকোতেই ডাকাত পড়েছে। মশালের আলোয় চোখে পড়ল, একজন ডাকাত একজন মাঝিকে মারার জন্য খাঁড়া তুলেছে।

বুঝলে দাদা, এক মিনিট দেরি হলে সেই ডাকাতেরা আমার নৌকোতেও লাফিয়ে চলে আসত। কেষ্ট ঠিকসময় আমার ঘুম ভাঙিয়ে না দিলে প্রাণে মারা যেতুম। আমি সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর দড়ি খুলে দিয়ে একটা ধাক্কা মারতেই আমাদের নৌকো ভেসে পড়ল স্রোতে। ডাকাতরা আর ধরতে পারল না।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস্ করলেন, এটা কবেকার ঘটনা? বটুকদাদা বললেন, এই তো পরশু রাতেই .... তারপর সোজা চলে এসেছি তোমাদের এখানে।

ঠাকুমা বললেন, পরশু রাতেই? তাহলে যে ছেলেরা বলল, এক সপ্তাহ আগেই নাকি তোমার কেষ্ট পাখিকে বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে! সে পাখিটা তো মরে গেছে?

ঠাকুমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বটুকদাদা বললেন, মরে গেলেই কি সব কিছু শেষ হয়ে যায়? কেউ কেউ থাকে। কেষ্ট হারিয়ে যায় নি, সে এখনো আছে। সেই আমায় বাঁচিয়েছে!

ঠাকুমা কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বললেন, রাম, রাম!

গল্পটা শুনে আমাদের গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু ছোড়দি বলল, হয় ঐ রতনটা মিথ্যে কথা বলেছে, না হলে বটুকদাদা এই গল্পটা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

পরদিন ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙতেই আমি শুনতে পেলুম একটা পাখির গলার ডাক, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো।

কেষ্টকে আমি খুব ভালবাসতুম, কিন্তু ঐ ডাক শুনে আমার দারুণ ভয় হল। আমি পাশের ঘুমন্ত ছোড়দিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে বললুম, ছোড়দি ছোড়দি, শোনো ....।

ছোড়দি কান খাড়া করে শুনল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। বিড়বিড় করে বলল, মানুষ মরে গেলে কখনো কখনো ভূত হয় শুনেছি, পাখি মরে গেলেও ভূত হয়? ধ্যাৎ! যত সব বাজে কথা। চল তো গিয়ে দেখি!

ছোড়দির খুব সাহস, সে আমার হাত ধরে নিয়ে এলো ঘরের বাইরে। ডাকটা আসছে পুকুর ধারের তেঁতুল গাছটা থেকে। আমরা দুজনে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালুম। কোন পাখি চোখে দেখা গেল না। পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে। কিন্তু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে একটা ডাক, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বটুকদাদা। চোখ মুছতে মুছতে আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, ঐ যে কেষ্ট আমাকে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছিস? আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে তো, তাই কেষ্ট ডেকে তুলেছে।

এবারে ছোড়দিও কোন কথা বলতে পারল না।

সেই রাত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

একটা কথা আছে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। আমার ঠিক তাই হল। একে শীতকাল, তায় থাকার জায়গার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। অফিসের এক অর্ডারে চলে এসেছি অযোধ্যা পাহাড়ের ধারে পাণ্ডববর্জিত এই জায়গায়। এখানে সব আছে। সুন্দর সমান্তরাল একটি পাহাড়। সুন্দর একটি বন, যদিও পত্রশূন্য গাছপালা, কারণ সময়টা শীতের, বিশাল-বিশাল প্রান্তর, ছোট-ছোট আদিবাসী গ্রাম, অজস্র তুঁত গাছ। প্রতিটি গাছে লাক্ষা পোকা সব পাতা খেয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত আকৃতির জমাট জটলা তৈরী করেছে। পরে এর থেকে তৈরী হবে গালা। সন্ধ্যার আকাশপটে এই গাছগুলিকে দেখে গা আরও ছমছম করছে। একটি-দুটি সাঁওতাল পরিবার এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তা ছাড়া সব নির্জন। একটু পরে বাঘ না বেরোক, দস্যু, তস্করের আসতে কোন আপত্তি নেই। যথাসর্বস্ব কেড়ে তো নেবেই, মেরে ফেলতেও পারে।

কী করব ভেবে না পেয়ে চুপ করে বসে আছি একটা পাথরখণ্ডে। পাশ দিয়ে চলে গেছে পথ। যা হয় হবে। দেখাই যাক না ভগবান কী করেন। সন্ন্যাসীরা তো এর চেয়ে অনেক দুর্গম স্থানে ভগবান ভরসা করে চলে যান। আমি সন্ন্যাসী না হলেও আত্মসমর্পণ তো করতে পারি!

দূর থেকে একটা ঝকঝকে সাদা মোটরগাড়ি আসছে। পেছনে তাড়া করে আসছে শীত, শুকনো পথের ধুলো। গাড়িটা হুস করে আমার পাশ দিয়ে চলে গিয়ে কিছুটা দূরে থামল। দেখি ব্যাক করে আমার দিকেই আসছে। আমি বসে আছি। এতই পরিশ্রান্ত যে, ওঠার ক্ষমতা নেই।

চালকের আসন থেকে মুখ বাড়িয়ে সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "আপনার নাম কী পলাশ!"

এইবার উঠে দাঁড়ালুম, "হ্যাঁ, আমার নাম পলাশ!"

"আশ্চর্য! চিনতে পারছিস না! আমি সত্যেন!"

"সত্যেন! স্কটিশের সত্যেন!"

"স্কটিশের। মনে আছে, আমরা দু'জনে দশহারার দিন সাঁতরে গঙ্গা পার হয়েছিলুম!"

"খুব মনে আছে, তবে তুই আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছিস।"

"তুই কিন্তু যেমন ছিলি তেমনই আছিস। এখানে কি করছিস! নিশ্চিন্তে বসে আছিস! যেন তোর বাড়ির বৈঠকখানা!"

"কিছুই না, সামান্য সমস্যা, রাতটা কোথায় কাটাব ভাবছি! এখানে হোটেল, গেস্টহাউস, রেস্টহাউস কিছুই নেই।"

"উঠে আয় আমার গাড়িতে। ভাগ্যিস, এলুম এই পথে, নইলে হয় তোকে বাঘে খেত, নয় মানুষে টুকরো করত। এটা ডাকাতে- অঞ্চল! আর একনজরে তোকে আমি ঠিক চিনতেও পেরেছি, একই রকম আছিস বলে। একটুও পালটাসনি!"

গাড়িটা একেবারে ব্র্যাণ্ড নিউ। সত্যেন মনে হয় বড় মাপের ডাক্তার হয়েছে। ও লাইন চেঞ্জ করেছিল, এইটুকু খবর আমি রাখতুম। গাড়ি চালাতে-চালাতে আমাকে প্রশ্ন করলে, "কী কাজে এসেছিস এখানে?"

"গালার চাষ দেখতে। যারা চাষ করে তাদের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বিক্রির কাজে সাহায্য করতে। একটা প্রোজেক্ট।"

"আমি কী করছি জানিস!"

"এইটুকু বুঝেছি, এমন একটা কিছু করছিস, যাতে মানুষ মোটা হয়, আর ঝকঝকে নতুন গাড়ি হয়।"

"আজ্ঞে না, এই গাড়িটা আমাদের ফাউন্ডেশনের। এখানে বিদেশী টাকায় আমরা একটা হাসপাতাল করছি। আমি তার চার্জে আছি। এখনও অনেক কাজ বাকি। একটু একটু করে সব হচ্ছে। বিল্ডিংটা হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি অনেক এসেছে, আরও অনেক আসবে।"

কথা বলতে-বলতেই আমরা এসে গেছি। বিশাল একটা জায়গায়, শেষ বিকেলের আলোয় ঝকঝকে একটা বাড়ি। আর কোথাও কিছু নেই। লোকজনের বসবাস, দোকানপাট সব আমরা ছেড়ে চলে এসেছি। রুক্ষ জায়গা। গাছপালা তেমন কিছুই নেই। এই একটা অঞ্চল, যেখানে খুব জলকষ্ট। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম।

সত্যেন বলল, "আগে চা খাওয়া যাক, তারপর সব দেখাব। আমার লোকজন এখনও খুবই কম। সব আসবে একে-একে। এখানে একটা টাউনশিপ হবে। স্কুল হবে, রাস্তা হবে, পোস্টাপিস হবে। সব হতে আরও বছর পাঁচেক।"

চা এল। সঙ্গে একটা করে রোল, খুবই সুস্বাদু। তারিফ করতেই সত্যেন বলল, "মোটা হওয়ার কারণটা বুঝলি! এর জন্যে দায়ী আমাদের এই গজেন্দ্র!"

গজেন্দ্র নিতান্তই যুবক। ফরসা সুন্দর চেহারা। সে হাসছে। সত্যেন বলল, "হাসিস না। এত সাঙ্ঘাতিক ভাল রান্নার হাত, মোটেই ভাল নয়। হেল্‌থ সেন্টারের হেল্‌থ খারাপ করার তালে আছ! তোমার জন্যে আমার খাওয়া ডবল হয়ে গেছে। অন্য কোথাও গিয়ে খেতে পারি না। স্বাদ পাই না। শোনো, আমার অনেক দিনের দোস্ত এসেছে। কী খাওয়াবে!"

"জব্বর শীত পড়েছে। ভাবছি খিচুড়ি করব, সঙ্গে কিছু ফ্রাই।"

"তোমার সেই অসাধারণ খিচুড়ি! ও ওয়ান্ডারফুল! ওটার কোন জবাব নেই গজেন।"

সত্যেন আমাকে বলল, "এখানের জল মানুষের শত্রু। অ্যায়সা খিদে হয়! এই খাও, এই হজম! বিরক্তিকর ব্যাপার। পাশেই বিহার বেল্ট তো! তা গজেন, আর-একটা করে রোল হবে!"

"না, সার! হলেও দেব না। এখন আর লোভ করবেন না। রাতেরটা আজ একটু হেভি হবে।"

"দ্যাট্‌স রাইট, দ্যাট্‌স রাইট।"

সোয়েটার, শাল জড়িয়ে, হনুমান টুপি চড়িয়ে, গোটা এলাকাটা ঘুরে এলুম। একরের পর একর জমি! মেন বিল্ডিং ছাড়া সবই আন্ডার কনস্ট্রাকশন। জায়গায়-জায়গায় লোহালক্কড়, বালি, পাথর ডাঁই হয়ে আছে। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সব পরিষ্কার। দূরে বাঘমুন্ডি পাহাড়! দু-একটা বহু পুরনো কনস্ট্রাকশন, একটা পুরনো শেডও রয়েছে। কোনকালে হয়তো এখানে একটা কিছু ছিল! এত নির্জন, এত ফাঁকা, আমাদের মতো শহরের লোকদের ভাল লাগে না। ভয়-ভয় করে।

রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চুটিয়ে গল্প হল। পুরনো দিনের, পুরনো বন্ধুদের কলেজ জীবনের কথা। মাঝে একবার কফি হল। তারপর খাওয়া। কিমা, কড়াইশুঁটি দিয়ে এইরকম সুস্বাদু খিচুড়ি, এই আমার প্রথম খাওয়া, এই আমার শেষ খাওয়া। সঙ্গে ফিশফ্রাই। সেটাই মার-মার, কাট-কাট। গজেনটাকে মেরে ফেলা উচিত। একটু পরেই জানতে পারলুম—গজেন একজন জুনিয়র ডাক্তার। রান্নাটা তার হবি।

সত্যেন বলল, "তোর শয়নের ব্যবস্থা আমাদের নতুন সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে করেছি। নতুন খাট, বালিশ, বিছানা, মশারি। অ্যাটাচ্‌ড বাথ। সব নতুন।"

সত্যিই তাই। আমার ঘুমের অপারেশন দিয়ে কেবিনের উদ্বোধন। দেয়াল নেই বললেই চলে। চারদিকে বড়-বড় কাচের জানালা ঝকঝক করছে। নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। নেটের মশারি গুঁজে আলো

নিভিয়ে, দুর্গা বলে শুয়ে পড়লুম। সবই কাচ, চাঁদের আলোয় পানসির মতো ভাসছি। বাঁ পাশে খাট ঘেঁষে বিশাল জানালা। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। গ্রিল, গরাদে, কিছুই নেই। শুয়ে-শুয়েই দেখছি, ফাঁকা মাঠ, চাঁদের আলো, আর বহু দূরে সেই প্রাচীনকালের শেডটা। যত অন্ধকার ঘাপটি মেরে আছে সেখানে।

সারাদিনের ছোটাছুটি, ঘুম এসে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। অদ্ভুত একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, বাঁ পাশের জানালাটা খুব কাঁপছে। ঝড় উঠল না কী! ফুটফুটে চাঁদের আলো, ঝড় এল কোথা থেকে! শুয়ে-শুয়েই দেখছি। জানালাটা ছটফট করছে। তাকিয়ে আছি সেইদিকে। হঠাৎ দেখি, জানালার নীচের টাওয়ার বোল্টটা হঠাৎ ওপরদিকে উঠে, ডান দিকে ঘুরে গেল। জানালার একটা পাল্লা অক্লেশে খুলে গেল। মশারির ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি হাত বের করে পাল্লাটা বন্ধ করে দিলুম।

শুয়ে আছি। ঘুম চটকে গেছে। জানালার কাঁপুনি আবার। আড় হয়ে শুয়ে-শুয়েই দেখছি। নড়তে নড়তে তলার ছিটকিনিটা ওপর দিকে উঠেছে। ডানপাশে নিজের থেকে ঘুরে গেল, পাল্লাটা ধড়াস করে খুলে গেল।

ভূতের ভয় আমার নেই, তবে বদমাশ লোককে আমি সাজা দিতে চাই। উঠে পড়লুম। দুটো পাল্লাই খুলে দিলুম। কই, হাওয়া-বাতাস তো কিছুই নেই। নিস্তব্ধ রাত, চাঁদের আলো, গোটা দুই বড়-বড় তারা। দূরে-দূরে শীতকাতুরে কুকুরের ডাক।

কোন বদমাশের কাজ! ভয় দেখাতে এসেছে। পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। উঁচু ভিতের ওপর বাড়ি। ফুট চারেক নীচে জমি। কিছু ঘাস, কিছু কাঁকর। মারলুম লাফ।

কোথায় কী! কেউ নেই। আমি আর আমার এই রাত। চারপাশ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। কোথাও একটা কুকুরও নেই। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—লুক বিফোর ইউ লিপ। উত্তেজনায় সেই উপদেশ ভুলেছি। যে পথে নেমেছি, সে-পথে আর ফেরা যাবে না। এখন আমাকে ঘুরে ফ্রন্ট এনট্রান্সে যেতে হবে, ডাকাডাকি করে ওদের ঘুম ভাঙাতে হবে।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই আমার কেমন একটা ঘোর লেগে গেল, চাঁদের আলো ভরে গেল কুয়াশার মতো। জেগে আছি, ঘুমোচ্ছি না স্বপ্ন দেখছি! বোধের বাইরে। কেউ আমাকে চালাচ্ছে, হাঁটাচ্ছে। চলেছি সেই বিধ্বস্ত শেডটির দিকে। ক্রমশ অন্ধকার, আরও অন্ধকার। শেড়টার ভেতর চলে গেছি। ফাটাফুটো দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে। একপাশে অনেক ব্যারেল। কাঠকুটো। একটা কংক্রিট

মিক্সার। ভাঙা ফার্নিচার। কোন কিছুই মানছি না আমি। কলের পুতুলের মতো এগোচ্ছি। কেউ যেন আমাকে দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। গেঞ্জি আর পাজামা পরে আছি, তাও আমার শীত নেই।

হঠাৎ দেখি, সামনে কেউ ঝুলছে।

ওপরের কাঠের বিম থেকে ঝুলে আছে কেউ।

তার মাথা থেকে গলা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা। শরীরটা অল্প অল্প ঘুরছে। আলো-অন্ধকারে।

আর মনে নেই। যখন জ্ঞান এল, সকাল রোদ। সত্যেনের বিছানায় আমি। গায়ে কম্বল পায়ে হট ব্যাগ। গজেন আমাকে গরম দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। টেবিলের ওপর টোস্ট ওমলেট।

ইতিহাসটা পাওয়া গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা ছিল আমেরিকান আর্মিদের বেস ক্যাম্প। তখন এখানে এক অফিসারকে জার্মান স্পাই সন্দেহে 'কোর্টমার্শাল' করা হয়েছিল। পরে এখানকার অ্যামুনিশন ডাম্পে আগুন লেগে অনেক সৈনিক মারা গিয়েছিল, ছাউনি পুড়ে গিয়েছিল।

সত্যেন বলল, "এখন কেমন ফিল করছিস।"

"একটু ঘোর আছে।"

"ঠিক হয়ে যাবে। খুব বাঁচা বেঁচে গেছিস। নে, টোস্ট খা, গজেনের ডবল ডেকার ওমলেটেই চাঙ্গা হয়ে যাবি। তোর কী ভাগ্য পলাশ! আমি শুধু শুনেইছি, তুই কেমন অতীতটা বর্তমানে দেখে ফেললি! গজেন্দ্র।"

"ইয়েস স্যার!"

"আজ আমার ফ্রেণ্ডের অনারে...।"

"চেপে গেছে স্যার। কড়া মেনু।"

"গজেন্দ্র! তোমার তুলনা শুধু তুমিই।"

ভুতুরা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার বুঝি লেগেছে। রুমি, ঝুমি—দু-জনে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে রাধামোহন খুবই ঝাঁপড়ে পড়ে যান। তিনি দোতলায়, দৌড়ে নীচে নামতেও পারছেন না। বয়স হয়েছে। সিঁড়িতে পা হড়কে গিয়ে গেল বছর টানা একমাস বিছানায়। তিনি জানেন, রুমি, ঝুমি ক্ষেপে গেলে তাদের আয়াটি আরও দিশেহারা হয়ে যায়।

যমজ হলে বোধ হয় এই হয়! এই ভাব, এই মারামারি। এর পুতুল ও ধরলেই হাত কামড়ে, চুল টেনে ধুন্ধুমার কাণ্ড!

ঝুমিটাই মার খায় বেশি। তবে পেছনে লাগার স্বভাব ঝুমিরই বেশি। রুমি পুঁটিমাছ, রুমির নাক খাচ্ছি, মচমচে করে যেন নাক চিবোচ্ছে! ঝুমি, আর যায় কোথায়! লেগে গেল। রুমিটা দিন দিন একগুঁয়ে জেদি হয়ে উঠছে। যত আক্রোশ ঝুমির ওপর। সে তার কিছুতেই ঝুমিকে হাত দিতে দেবে না। একটা বড় গামলায় সব খেলনা—পুতুল, রেলগাড়ি, টিয়াপাখি, খরগোস, ব্যাঙ—সবই জোড়ায় জোড়ায়। জেদ চেপে গেলে রুমি, ঝুমিকে কিছুই ধরতে দেয় না। ধরলে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেয়।

তিনি সিঁড়ির মুখে এসে ডাকলেন, "এই আরতি, তুমি কোথায়!"

আরতির সাড়া নেই। ঠিক মেঝেতে ঘুমিয়ে আছে, আর খাটে দুটো মারামারি শুরু করেছে।

তিনি সিঁড়ি ধরে নামছেন—কী পড়ল, কীসের শব্দ! তিনি আর পারলেন না, "কী হচ্ছে রুমি!"

ঝুমির আর্ত চিৎকার, "দাদুমণি, আমাকে ভুতুরা বলছে।"

"কে ভুতুরা বলছে তোমাকে?"

"আমি ভুতুরা, দাদুমণি?"

"না, কখনওই না।"

নীচে নেমে দেখলেন, বিছানা লণ্ডভণ্ড। আরতি নেই, বাথরুমে থাকতে পারে, অথবা কলতলায়। কলতলায় চান করলে এ-ঘরের চেঁচামেচি শোনা যায় না। রান্নার মেয়েটিই বা কোথায়!

তাঁকে দেখেই বুঝি এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রুমিও। রুমির অভিযোগ, "আমি পুঁটিমাছ দাদুমণি!"

"তোরা ঘুমোসনি। মারামারি করছিস!"

"আমি ভুতুরা দাদুমণি?" ঝুমির অভিযোগ।

"না, কখনওই নয়।"

এতে রুমি ক্ষেপে গেল, অভিমান, দাদুমণি তাকে ভালবাসেন না। ঝুমিকে বুকে নিয়ে আদর করছেন, সহ্য হবে কেন। ঝুমি ভুতুরা নয় তবে কে ভুতুরা? দাদুমণি ভুতুরা। দাদুমণি, তুমি ভুতুরা।'

"ঠিক আছে, আমি ভুতুরা। এবার শুয়ে পড়ো। না, না, তুমি ঝুমির বালিশ ধরে টানছ কেন? ঝুমি এখানে শোবে। ঝুমি কত ভাল, কথা শোনে। ঝুমি, চোখ বোজো। এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে। রুমিও অবাধ্য হয় না, পেট ভরে খায়! রুমি পুঁটিমাছ হতেই পারে না।"

"আমি পেট ভরে খাই, না দাদুমণি?" রুমি দাদুমণির দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝুমি বলল, "আমিও পেট ভরে খাই, না দাদুমণি!"

"সবই খাও, এখন আর কথা না। চোখ বোজো। দরজা-জানালায় পরদা টেনে দিলাম। তোমরা দু'জনেই খুব ভাল। ঘুম থেকে উঠে আমরা পার্কে বেড়াতে যাব। খালধারের জঙ্গলটায় হরিণগুলি আছে, তারা কী বলছে জানো, রুমি, ঝুমি দাদুমণির হাত ধরে বেড়াতে আসবে। কী মজা। হরিণগুলিকে ঘাস খেতে দেবে না! বাচ্চা হরিণটা কেমন লাফায়।"

রুমি বলল, "আমাকে হরিণ দেবে দাদুমণি?"

"দেব।"

ঝুমিও উঠে বসল, "আমাকে হরিণ দেবে দাদুমণি?"

"ওঠে না। উঠতে নেই। এখন সবাই ঘুমোয়। দুপুরে খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোয়। না ঘুমোলে হরিণের দেখাই পাওয়া যাবে না।"

সঙ্গে-সঙ্গে রুমি, ঝুমি দু'জনেই মুখে আঙুল দিয়ে শুয়ে পড়ল।

"এই তো, কত ভাল মেয়ে। কথা শোনে।"

তারপর ঘুমিয়ে পড়লে তিনি রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। আরতি খেতে বসেছে।

"ওরা ঘুমিয়েছে মেসোমশাই!"

"তোমাদের এত দেরি কেন বলো তো, চান করতে, খেতে। জেগে গেলে ঘরে একা থাকতে ভয় পায়, জানো! এত করে বলি, চানটান সকালেই সেরে নেবে।"

রাধামোহন জানেন, আয়াটি জবাব দেবে না। সকালে তার এত কাজ, কখন চান করে নেবে! কিছু না বললেও রাধামোহনবাবুর বুঝতে কষ্ট হয় না চুপচাপ থেকে কী বলতে চায় আরতি।

সকাল ন'টার পর বাড়ি ফাঁকা। সবাই অফিস, না হয় স্কুলে। বাড়িটায় তিনি আর তাঁর দুই যমজ নাতনি। আয়ার ওপর ভরসা রাখা যায় না, রাধামোহনবাবুর কানখাড়া থাকে। বাচ্চাদের মা, বাবাও বোঝেন, তিনি তো আছেনই, নিশ্চিন্তে অফিসকাছারি করে রাত করে ফিরলেও অসুবিধে থাকে না।

দুই সাধের নাতনিকে নিয়ে তিনি ভাল আছেন কি মন্দ আছেন, বুঝতে পারেন না। তবে নাতনিদের বাহানার শেষ নেই। কিছুই মুখে দিতে চায় না। উঠতে-বসতে গল্প শোনা চাই। তিনি রাম-রাবণের গল্প বলেন, শূর্পনখার গল্প বলেন, দুষ্টু খেঁকশিয়ালের গল্প যখন বলেন, বড়-বড় চোখে তারা শোনে। দু'পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে যায়—যেন দুটো ডলপুতুল, চোখমুখ অতি সজীব। তখন লাফায় না, দৌড়য় না, দু'জন সত্যি খুব ভাল মেয়ে হয়ে যায়। আজগুবি যা কিছুই তিনি বলেন, রুমি, ঝুমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে।

স্কন্ধকাটার গল্প বললে দু'জনই তাঁকে জড়িয়ে ধরে, "তারপর দাদু?"

"তারপর সেই রাজপুত্র কী করে! বরফ পড়ছে।"

"বরফ কী দাদু?"

"বরফ—দেখাচ্ছি।" ফ্রীজ থেকে আইসক্রিমের ট্রে বের করে দেখান।

"আমাকে বরফ দেবে?"

"না, না, ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি-জ্বর হয় জানো—তারপর না, পাইনগাছগুলির পাতা ঝরে যাচ্ছে। বাগানে রাজপুত্রের কত গোলাপগাছ। চাই একটা গোলাপফুল। কিন্তু পাবে কোথায়। এত শীতে গোলাপগাছ বলল, ফুল দেব কী করে? দেখছ না, কী ঠাণ্ডা!"

"গোলাপফুল কেন দাদুমণি?"

"রাজপুত্র যে রাজকন্যার সঙ্গে নাচবে। রাজকন্যাকে গোলাপফুল যে দিতে পারবে, তার সঙ্গেই নাচবে।"

"আমি নাচব দাদুমণি।"

"গোলাপফুল ফুটুক। নাও এবারে হাঁ করো। হাঁ করলে গোলাপফুল ফুটবে।"

আরতি দুধ, ভাত, কলা চটকে চামচে ধরে আছে। হাঁ করতেই চামচ মুখে ঢুকে গেল।

"তারপর না সেই গুপি গায়েন বাঘা বায়েন ঢোল বাজাতে লাগল।"

"আমাকে ঢোল দেবে দাদুমণি?"

"দেব।"

"আমি ঢোল বাজাব।"

"বাজাবে। আবার হাঁ করো। হাঁ না করলে ঢোল বাজাবে কেন?"

আরতি আর-এক চামচ মুখে দিলে বললেন, "দেখি তো পেট দু'খানা তোমাদের কতটা ঢোল হল!" দু'জনই জামা তুলে পেট দেখালে বলেন, "এবারে ঢোল বাজবে। আর দু'চামচ খেলেই বাজবে।"

ঢোল বাজবে শুনেই দু'জনে যত দ্রুত পারল মুখের ভাত গিলে ফেলল। কারটা আগে বাজে! দু'বোনের রেষারেষি, কে আগে কতটা বেশি খাবে। কার আগে ঢোল বাজবে।

এই করে দুপুরের খাওয়া। আরতি দু'থালায় ভাত, ডাল, মাছ, শাক এবং বাটিতে দুধ নিয়ে খাওয়াতে বসলেই দু'জন দু'দিকে পালায়। একজন দরজার দিকে ছুটে গেল তো আর-একজন কলপাড়ে। ভাত খাওয়ানোটা রোজকার বিড়ম্বনা। তাই যত অসম্ভব আজগুবি গল্প বানিয়ে-বানিয়ে বলতে হয়। কখনও রাজপুত্র, কোটালপুত্র, কখনও অজগরের, হাতির গল্প, টিভি চালিয়েও খাওয়ানো হয়। বাঘ, হরিণ, ভোঁদড়, খেঁকশিয়াল কিছুই বাদ যায় না, গল্পের গোরু গাছে ওঠে। হাতির পাখা গজায়, "ওই দ্যাখ আকাশে একটা হাতি উড়ে যাচ্ছে।"

"কোথায়, কোথায়?"

"আগে হাঁ কর, তবে দেখাব।"

রাধামোহন আর পারেন না, আজগুবিরও শেষ আছে, তবে ইদানিং দুই বোনই বলছে, "ওই গল্পটা বলো দাদুমণি।"

"কোন্ গল্প?"

"রাজপুত্র নাচবে।"

তিনি বুঝতে পারেন, রাজপুত্র নাচলে তারাও নাচবে। গল্পটার মুশকিল, তাঁর সব ঠিকঠাক মনে নেই। বিদেশি গল্প কবে কোথায় পড়েছিলেন আবছা মতো তার কিছুটা মনে আছে। বিশেষ করে একটি নাইটিঙ্গেল পাখি সারারাত হিমের মধ্যে বুকে গোলাপ গাছের কাঁটা বিঁধিয়ে গান গেয়েছিল। রাজপুত্রের জন্য গোলাপগাছে ফুল ফুটিয়েছিল। শীতের ঠাণ্ডায় গোলাপগাছে ফুল না ফুটলে কী করা!

রাজার বাগানে এত গোলাপগাছ, অথচ ফুল নেই গাছে। গাছগুলির পাতা ঝরে গেছে। বরফে গাছপালা-নদী জমে গেছে, অথচ চাই একটি গোলাপফুল।

রাজপুত্র ফুলটি না পেলে রাজকন্যার সঙ্গে নাচতে পারবে না। এই পর্যন্ত তিনি মনে করতে পারেন। রাজকন্যার চাই গোলাপফুল।

হঠাৎ কী হল, এক দুপুরে দুই বোনেরই বায়না, "দাদুমণি, গোলাপফুল দেবে না! রাজপুত্র দেবে না?"

"ফুটুক। ফুল ফুটলে রাজপুত্রও চলে আসবে।"

"কবে ফুটবে!"

"এই ফুটবে। তোমরা না খেলে ফুটবে না। খাও।"

রোজ-রোজ এক কথা শুনবে কেন! কিছুতেই খাওয়ানো যাচ্ছে না। পালাচ্ছে, মুখে দিলে উগরে দিচ্ছে। শাসন করলে বাটি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আচ্ছা বিপদে পড়া গেল!

"গোলাপগাছ কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

"আচ্ছা। খাও। খাওয়া হলেই গোলাপগাছের কাছে নিয়ে যাব।" আসলে ঠিক ওদের অন্যমনস্ক না করে দিতে পারলে রক্ষা নেই।

"আমরা ফুল দেখব।"

জানালার পাশে একটি করবী ফুলের গাছটা দেখালেন, "এই তো ফুল, খাও।"

"ওটা তো করবী ফুলের গাছ।"

বাড়ির গাছপালা তাদের চেনা হয়ে গেছে। পেয়ারাগাছ দেখিয়েও বলার উপায় নেই, ওটা গোলাপ গাছ। তারা সত্যিকারের গোলাপগাছ না দেখতে পেলে কিছুতেই খাবে না। এখন তিনি কোথা থেকে যে গোলাপগাছ দেখান! টবের গোলাপ কিনে আনলে হয়। তিনি আর পারছেন না। আরতিও দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে কাহিল। তাঁর আজগুবি কথাবার্তা নাতনিরা আর মোটেও গ্রাহ্য করছে না।

শেষে বললেন, "চলো তো দেখি, গোলাপ ফুল খুঁজে পাওয়া যায় কি না!"

ওরা সঙ্গে-সঙ্গে দাদুর পায়ে-পায়ে সিঁড়িতে উঠে এল। ভাবলেন, ইস, বাজার থেকে একটা গোলাপগাছ কিনে রেখে দিলে পারতেন! তিনি সিঁড়িতে উঠছেন। রুমি, ঝুমিও দাদুর হাত ধরে উঠছে। বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। একটু কিছু মুখে দেওয়া গেল না, অন্য কিছু দেখিয়ে তারপরই মনে হল দোতলায় তাদের কাঠের ঘোড়াটি পড়ে আছে। তিনি বললেন, "আগে ঘোড়ায় চাপো। ঘোড়াটা আকাশে উড়লে গোলাপগাছটা দেখা যেতে পারে।"

"না, না ঘোড়াটা নড়ে না।"

"না, না, ঘোড়াটা ওড়ে না।"

"কোথায় পাই তবে বল! তোরা খেয়ে নে, তারপর না হয় সবাই মিলে গাছটা খুঁজব।"

"ফুল কোথায়?"

"গাছ কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

কী করেন রাধামোহন! বৃষ্টি নেই, বাদলা নেই, বাড়িতে একটা টবও নেই, টবে গাছও কেউ লাগায় না, কিন্তু চাই একটা গোলাপফুল। একটা গোলাপগাছ। তিনি এখন পান কোথায়!

ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি গাছের মোহ কাটানো যায়। তিনি দোতলার একটা জানালা খুলে দিলেন, দু'নাতনিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন জানালায়। তারা গ্রিল ধরে ঝুলছে। গ্রিল বেয়ে ওপরে উঠছে। গাছের কথা ভুলে গেলে তিনি রক্ষা পান। তিনি বললেন, "ওই যে স্কুলবাড়িটা দেখছ, সেখানে কিন্তু ভুতুরা থাকে। না খেলে ভুতুরা রাগ করবে।"

এরা ভুতুরা, স্কন্ধকাটা রাক্ষস-খোক্কসের নামে জড়সড় হয়ে থাকে। ভুতুরার ভয় দেখিয়ে যদি খাওয়াতে পারেন! হাতে থালা নিয়ে আরতি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেদ্ধ ডিম, মাখন, ভাতে চটকে গোল্লা তৈরি করে রেখেছে। হাঁ করলেই মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

দুজনেই মুখ ফিরিয়ে নিল। খেল না।

আবার সেই এক কথা।

"গাছ কোথায়? ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

নাও, এবার বোঝো ঠ্যালা। ভবি ভুলছে না। রেগেমেগে রাধামোহন বললেন, "যাও, ভাত খেতে হবে না। আরতি, ভাত নিয়ে চলে যাও। খাবে না। কতক্ষণ তোরা না খেয়ে থাকতে পারিস দেখি!"

দু'জনেই অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলল। গ্রীল বেয়ে নীচে নেমে দু' জনেই ঘরের দু' কোণায় মাথা নীচু করে বসে রইল। টসটস করে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। "গাছ কোথায়? ফুল কোথায়, রাজপুত্র কোথায়?"

"কাল নিয়ে আসব। বাজার থেকে নিয়ে আসব। লক্ষ্মী মেয়ে, খাও। তোমাদের মা এসে কষ্ট পাবে না, দুপুরে কিছু খাওনি শুনলে খারাপ ভাববে। জেঠু তোমাদের কত কিছু নিয়ে আসে। বড় মা তোমাদের কি ভালবাসে! রাইদিদি স্কুল থেকে ফিরে তোমরা খাওনি শুনলে মুখ ব্যাজার করে ফেলবে। খাও লক্ষ্মীটি।"

"গাছ কোথায়, ফুল কোথায়, রাজপুত্র কোথায়!"

গাছ আমার পেটের ভেতর। শয়তান হচ্ছে দিন-দিন! এ কে রে বাবা,

কিছুতেই গোঁ ছাড়বে না। এবারে কিন্তু মারব।" এতে রুমি, ঝুমি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, দাদুমণি বকেছেন, দাদুমণি তো সবসময় আদর করেন, দাদুমণিকে তারা রাগতেই দেখেনি। জোরে ধমক দিলে তারা না কেঁদে পারে! দু'বোনই জড়াজড়ি করে কাঁদতে বসে গেল। আর তখনই তিনি দেখলেন, দোতলায় খোলা বারান্দায় একটা ফুলের গাছ। কারুকাজ-করা সুন্দর টবে একটি গোলাপফুলের গাছ। অবাক বিস্ময়ে গাছটি দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই তো গোলাপগাছ। শিগগির আয় রুমি, ঝুমি"। দরজা খুলে বারান্দায় ছুটে গেলেন। রুমি, ঝুমিও দাদুর পায়ে পায়ে দৌড়ে গেল।

কাছে যেতেই দেখতে পেলেন, টবটির গায়ে চিত্র বিচিত্র কিছু ছবি, টবটি পেতলের হতে পারে, তামারও হতে পারে, মিনা-করা প্রাচীন ধাতুর সিলমোহর, ফারাওয়ের মুখ, পিরামিডের ছবি এবং কোন নদীর অববাহিকা টবের গায়ে আঁকা। চটা ওঠা, প্রাচীন মুদ্রার মতো বর্ণহীন টবটা এখানে কে রাখল? কে নিয়ে এল? গাছটা খুবই নির্জীব, পাতা নেই বিশেষ, যেন বরফের দেশ থেকে কেউ তুলে রেখে দিয়েছে। শীতে পাতা ঝরে গেছে। দুটো-একটা-যাও-বা আছে তারও রং হলুদ। গাছের কাঁটায় যেন শ্যাওলা জমে আছে। গাছটা দেখতে-দেখতে তিনি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই তো সেই গাছ!"

ততক্ষণে রুমি, ঝুমিরও কৌতূহল বেড়ে গেল।

"এটা কি দাদুমণি?"

"এটা গোলাপ গাছ।"

"এটা কী?"

"এটা পাতা।"

রুমি, ঝুমির স্বভাব এরকম। নতুন কিছু দেখলেই এটা কী, এটা কী করা?

"এটা কী?"

"এটা টব। ফুলের টব।"

"এটা কী?"

"এটা মাটি। এটা কাঁটা, এটা গাছ। গোলাপ গাছ।"

"পাতায় হাত দিয়ে ঝুমি বলল, ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

গাছটার পাতা ধরে রুমি বলল, "দাদু ছিঁড়ব।"

"না, ছিঁড়বে না। গাছটার কষ্ট হবে।" রুমি, ঝুমি গাছটার কাছ থেকে নড়তে চাইছে না। লাফাচ্ছে আর গাছটাকে দেখছে। রাধামোহন ভাবলেন, গাছটা এখানে কে নিয়ে এল! ভৌতিক কাণ্ড নয় তো! টবটাও বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না।

তিনিই-বা চেঁচিয়ে উঠলেন কেন, এই তো সেই গাছ! বড়ই ধন্ধে পড়ে গেলেন রাধামোহন।

"ফুল কোথায়, রাজপুত্র কোথায়?"

তখনই মনে হল, আরতি ওদের খাবারের থালা হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। জোর করেও খাওয়ানো যায় না। নিজে না খেলে কে খাওয়াতে পারে! দুধ অবশ্য জোর করেই খাওয়ানো হয়। তবে ইদানিং জোর করতে গেলেই রুমি, ঝুমি চেঁচাবে, "নিজে-নিজে খাব।"

"তবে খাও।" দুধের গ্লাস হাতে তুলে দিলে খায়, একটু খায়, আবার রেখে দেয়, পালায়, ছোটাছুটি, নিজে -নিজে খাব, খায় ঠিক, বড় সময় নেয়। কিন্তু দুপুরের ভাত তো আর গেলানো যায় না, না খেতে চাইলে আর কী করা!

ঝুমি, রুমি চঞ্চল হয়ে পড়ছে। ঝুঁকে গাছটা দেখছে। টবের চারপাশে গোল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিছু।

"ফুল কোথায়?"

"ফুটবে। তোমরা খাও, খেলেই ফুল ফুটবে।"

দৌড়ে আরতির কাছে চলে গেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এক গ্রাস মুখে নিয়ে ছুটে এসে বলল, "ফুল কোথায়?"

"সবটা শেষ করো, না হলে ফুল ফুটবে না।"

রুমি, ঝুমি দৌড়ে গেল আরতির কাছে। গবগব করে খেল। জল খেল, আবার দৌড়ে এল, "ফুল কোথায়! আমরা খেয়েছি দাদুমণি।"

"গাছটাকে বলো, তোমরা খেয়েছ।"

"আমরা খেয়েছি।" গাছটার কাছে মুখ নিয়ে দু'বোনেই চেঁচিয়ে কথাটা বলল।

বাচ্চা ভূতের খপ্পরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গল্পটা শুনেছিলুম বাজপেয়ীদার কাছে। পুরো নাম জগদানন্দ বাজপেয়ী। তবে পদবী থেকে যা মনে হয়, তা নন। কয়েক পুরুষ ধরেই এঁরা একেবারে আদ্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষ। বাজপেয়ীদা নিজে তো অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন, পরাধীনতার আমলে বহু বছর জেলে কাটান, সেই সময়ে ইংরেজদের হাতে শারীরিক নির্যাতনও কম ভোগ করেননি। তবে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে দেশ স্বাধীন হবার পরে। তখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন, আর আমি একজন উঠতি সাংবাদিক, ওই একই কাগজের রবিবাসরীয় বিভাগে কাজ করি।

কাজের ফাঁকে-ফাঁকে আমাদের রবিবাসরীয় বিভাগে তখন খুব আড্ডা জমত। বাজপেয়ীদাও সেই আড্ডায় এসে যোগ দিতেন। মুড়ি, তেলেভাজা আর চায়ের সঙ্গে চলত নানা রকমের গল্পগুজব। বাজপেয়ীদাকে সেই আসরেই আমি প্রথম দেখি। মুরশিদাবাদের মানুষ, যেমন টকটকে গায়ের রং, তেমন ছ'ফুট লম্বা চেহারা, বয়েস হয়েছে, কিন্তু পেটানো স্বাস্থ্য, শরীর এতটুকু টসকায়নি, তার উপরে আবার মুখে সবসময় এমন নির্মল একটুকরো হাসি খেলে বেড়াত যে, বয়েসের ভার যেন তাঁকে ছুঁতেই পারত না।

মজলিশি মানুষ ছিলেন, আর গল্প বলতেন চমৎকার। বেশির ভাগই ভূতের গল্প। এমন সব ভূতের গল্প, যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। আমি তো ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু বাজপেয়ীদা এমনভাবে গল্পগুলি বলতেন যে, শুনে মনে হত, কী জানি বাবা, হবেও বা! তা এখানে যে গল্পটা তোমাদের শোনাব, সেটা তাঁরই কাছে শুনেছিলুম, তাই তাঁরই জবানিতে সেটা বলা যাক।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে, পেয়ালাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বাজপেয়ীদা বললেন :

"আপনারা যে ভূতপ্রেত মানেন না, সে আমি খুব ভালই জানি। কিন্তু মুশকিল কী হয়েছে জানেন, আমার জীবনে অনেক সময় এমন সব ঘটনা ঘটেছে, যার কোন ব্যাখ্যা আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। যেমন ধরুন, আমাকে যখন জেলের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের

বাইরের বারান্দায় একজন লোক এসে দাঁড়ায়। আমার খুব চেনা লোক, মুরশিদাবাদের মানুষ, এক সময়ে আমাদের দলের হয়ে কাজকর্মও নেহাত কম করেনি। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে বলে, 'তোর তো ছাড়া পাবার সময় হয়ে এল।' বলে সে আর দাঁড়ায় না, বারান্দা দিয়ে হাঁটতে -হাঁটতে দূরে চলে যায়। খানিক বাদে তাকে আর দেখতে পাইনি।

"সত্যি বলি, লোকটিকে দেখে আমার মুখে কোন কথাই সরছিল না। আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। সে তো আমাদের মতো পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। তা হলে এই সন্ধ্যারাতে সে এখানে এল কী করে? এখন তো ভিজিটার আসার সময় নয়, জেল-ফাটক তো বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে? কিন্তু আমার অবাক হওয়ার আরও কিছু বাকি ছিল। পরদিনই জানতে পারি যে, আমার রিলিজ-অর্ডার এসে গেছে। অর্থাৎ লোকটি আমাকে মিথ্যে কথা বলেনি।

"তবে কিনা আসল ধাক্কাটা খাই দেশের বাড়িতে ফিরে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনি, মাত্র দু'দিন আগে জেলের বারান্দায় যাকে দেখেছি, শুধু দেখেছি নয়, আমাকে বারান্দা থেকেই জানিয়েছিল যে, আমার ছাড়া পাবার সময় হয়ে এল, সে নাকি হপ্তাখানেক আগে মারা গেছে।

"এখন বলুন, এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনারা। আরে মশাই, এর কি কোন ব্যাখ্যা হয়? ব্যাখ্যা হয় না। আসল কথা আত্মা আছে। তেমন ভূতও আছে। জেলখানায় যাকে দেখেছিলুম, সে কি রক্তমাংসের মানুষ? মোটেই না। সে হল আত্মা। তবে হ্যাঁ, যেমন ভাল আত্মা আছে, তেমন মন্দ আত্মাও আছে বই কী। আমি যাকে দেখা পেয়েছিলুম, সে হল ভাল লোকের ভাল আত্মা। তাই জেলখানায় ঢুকে মানুষের রূপ ধারণ করে আমাকে একটা খবর দিয়ে গেল। কী, আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না?"

বাজপেয়ীদার কথা শুনে বুঝলুম যে, আমরা যদি বলি, না, বিশ্বাস হচ্ছে না, তা হলে এক্ষুণি তিনি থামিয়ে দেবেন তাঁর গল্প। তাই হামলে পড়ে বললুম, "খুব বিশ্বাস হচ্ছে, খুব বিশ্বাস হচ্ছে। তবে কিনা ভাল আত্মার কথা তো শুনলুম, এবারে একটা খারাপ আত্মার গল্প শুনব। নাকি কখনও কোন খারাপ আত্মার খপ্পরে আপনি পড়েননি?"

"তাও পড়েছি বই কী," বাজপেয়ীদা বললেন, "অনেকবার পড়েছি। একবার তো হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গার ধারেই অতি বিচ্ছিরি এক আত্মার পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলুম। সেবারে যে কী ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলুম, সে আর

কহতব্য নয়। নেহাত ভাগ্যের জোর, তাই তার হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরতে পারি।"

"কী হয়েছিল?"

আর এক প্রস্থ চা এসে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। বাজপেয়ীদা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "বলছি।"

গল্পটা এবারেও তাঁরই জবানিতে শোনা যাক। চা শেষ করে, রুমালে মুখ মুছে, বাজপেয়ীদা বললেন ঃ

"আমাদের দেশের বাড়ি থেকে মাইল তিন-চার দূরে একটা হাট বসে। মস্ত হাট, নানা রকমের বিস্তর জিনিস আসে সেখানে। আনাজপত্র, মাছ ইত্যাদি তো আসেই, শৌখিন মনোহারি জিনিসও নেহাত কম আসে না। তা ছাড়া আসে দা কুড়ুল খন্তা কোদাল মায় লাঙল পর্যন্ত। অর্থাৎ গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছুই সেখানে মেলে। আমার অবশ্য এত সব জিনিসের দরকার নেই, স্রেফ হপ্তাখানেক চলতে পারে এইরকম আনাজপাতি কিনব। আর হ্যাঁ, হাট যেখানে বসে, তার আধমাইলটাকের মধ্যেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি, তার সঙ্গে এই ফাঁকে একবার দেখাও করব, তারপর সন্ধ্যে লাগার আগেই রওনা হব বাড়ির দিকে। অন্ধকারের ভয় নেই, শুক্লপক্ষের নবমী, আকাশে, জ্যোৎস্নার আলো থাকবে, গ্রামের রাস্তা হলেও খানাখন্দে ভরা নয়, ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে চেনা রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরা মোটেই শক্ত হবে না।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন বাজপেয়ীদা। তারপর বললেন, "রওনা হয়েছিলুম চারটে নাগাদ, স'পাঁচটার মধ্যে হাটে পৌঁছে যাই। পশ্চিমা যে ভৃত্যটি সঙ্গে ছিল, আনাজপাতি কিনে তার মাথার ধামায় তুলে দিলুম। সে বলল, যা দিয়ে সে বাগানের মাটি কোপায়, সেই কোদালের লোহার ফলায় মরচে ধরে গেছে, নতুন একটা ফলা কেনা দরকার। বন্ধুটির সঙ্গে দেখাও করে এলুম তার বাড়িতে গিয়ে। তার কাছে শ'তিনেক টাকা পাওনা ছিল, তাও মিটিয়ে দিল সে। তবে তার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বেরিয়ে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছল। তাই সন্ধ্যে লাগার আগে আর ফেরার পথ ধরা গেল না, পথে নেমে দেখি, সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। ভাবলুম, তা হোক, আকাশে দিব্যি চাঁদ উঠেছে, তখন আর ভাবনা কীসের। সঙ্গে অবশ্য কিছু টাকা রয়েছে, কিন্তু পথে তো আর চোর- ডাকাতের ভয় নেই, আর থাকলেই বা কী, আমি তো আর স্রেফ আমাদের ভৃত্যটিকে নিয়ে পথটা পাড়ি দেব না, হাট-ফেরতা আরও বিস্তর লোকজনকে নিশ্চয় সঙ্গে পেয়ে যাব। গ্রীষ্মকাল, দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, হাটুরে লোকজনদের সঙ্গে গল্পগুজব

করতে-করতে নিশ্চিন্তে এই তিন চার মাইল পথ চলে যাওয়া যাবে।

"কিন্তু খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েই ঠাহর হল যে, পথ একেবারে নির্জন, আমাদের ওদিক থেকে যারা হাটে এসেছিল, কেনাকাটা শেষ করে তারা ফিরে গেছে। নেহাতই দু'চারজন লোক আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল বটে, কিন্তু তারা কাছাকাছি থাকে, খানিকটা গিয়েই তারা ডাইনে-বাঁয়ে মাঠের মধ্যে নেমে যে-যার গ্রামের পথ ধরল। ব্যস আমরা একদম একা। সামনে আর পিছনে একটাও লোক নেই। সঙ্গী বলতে স্রেফ পশ্চিমা ভৃত্যটি, ওকে নিয়েই এখন বাদবাকি পথ আমাকে পাড়ি দিতে হবে।"

বাজপেয়ীদা আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "সত্যি কথাই বলি, এতক্ষণ যে ভয়টাকে আমল দিইনি, এইবারে সেটা হঠাৎ ফিরে এল। আর কিছু না, ডাকাতের ভয়। সঙ্গে তিনশো টাকা রয়েছে, এ যখনকার কথা বলছি, তিনশো টাকার দাম তো তখন নেহাত কম ছিল না। হঠাৎ যদি এই ফাঁকা পথে একদল লোক হঠাৎ রে-রে করে সামনে এসে দাঁড়ায় তো কী করব। শুনেছি এদিকে ডাকাতি বড়-একটা হয় না, কিন্তু হতে কতক্ষণ! হাতে একটা লাঠিও তো নেই। আশে পাশে নেহাতই কিছু কাঁটাঝোপ আর বাবলা গাছ ছাড়া বড় রকমের কোন গাছ পর্যন্ত নেই যে, তার ডাল ভেঙে মজবুত একটা লাঠির কাজ চালানো যাবে। তা হলে?

"এই সব ভাবছি, এমন সময় একটা বাঁকের মুখে খুবই মিহি গলার একটা কান্নার শব্দ কানে এল। একবার মনে হল, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যখন বাতাস বয়ে যায়, তখন অমন একটা শব্দ হয় বটে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলুম যে, না, এটা বাতাসের শব্দ নয়। ভৃত্যটিকে বললুম, 'শুনছিস?' দাঁড়িয়ে গিয়ে, শব্দটা ভাল করে শুনে নিয়ে সে বলল, 'কোই বাচ্চা রোতা হ্যায়।' অর্থাৎ কোন বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। বাঁকটা ঘুরে গিয়ে আর-একটু এগিয়ে দেখলুম, ঠিক তা-ই। রাস্তার ধারে ধুলোর মধ্যে বসে একটা তিন-চার বছরের ছোট্ট ছেলে হাপুস নয়নে কাঁদছে। গায়ে জামা নেই, পরনে ইজের নেই, একেবারে উদোম বাচ্চা, শুধু গলায় একটা ধুকধুকি।

"এদিকে, মানে মুরশিদাবাদ জেলার এই এলাকায়, বিহার থেকে আসা দেহাতি মিস্ত্রি-মজুর, কুলি-কামিন কিছু কম থাকেন না, বাচ্চাটার গলার ধুকধুকি দেখে মনে হল, তাদেরই কারও ছেলে হবে, কিন্তু ছেলেটাকে এইভাবে পথের মধ্যে ফেলে রেখে তারা গেল কোথায়? এ তো বড় বেখেয়ালি বাপ-মা, সম্ভবত হাটে এসেছিল, তারপর সওদাপত্র করে সামনে এগিয়ে গেছে, এদিকে বাচ্চা

ছেলেটা যে পিছনে রইল, সেই খেয়ালই নেই! গলা উঁচিয়ে দু'চার বার হাঁক ছাড়লুম, কিন্তু সামনে থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু বাচ্চাটাকে পথের মধ্যে এইভাবে ফেলে রেখে আমরাই বা এখন বাড়ি ফিরি কী করে? ফেলে রেখে গেলে তা মাঝরাত্তিরে শেয়াল বা হেড়োলই একে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলুম যে, সঙ্গে করে একে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব, রাত্তিরটা সেখানে থাকুক, তারপর কাল সকালবেলায় এর বাপ-মায়ের খোঁজে বেরোনো যাবে।

কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেকে এতটা পথ হাঁটিয়েই বা নিয়ে যাই কী করে? পশ্চিমা ভৃত্যটিকে বললুম, 'এই, তুই তোর ধামাটা আমায় দে, তারপর এই বাচ্চাটাকে তোর কাঁধে তোল্।'

তো তাই হল। ধামাটা আমি আমার মাথায় তুলে নিলুম, আর বাচ্চাটাকে কাঁধে নিয়ে ভৃত্যটি আমার পিছনে-পিছনে আসতে লাগল। হাঁটতে-হাঁটতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিলুম। দেখলুম, ভৃত্যের ঘাড় থেকে তার গলার দু দিকে পা ঝুলিয়ে বাচ্চাটি বেশ জুত করে বসেছে। এখন আর কাঁদছে না। মুখে যে হাসি ফুটেছে, চাঁদের আলোয় তাও চোখে পড়ল।

কিন্তু খানিকটা পথ গিয়েই খটকা লাগল একটা। ভৃত্যটি বারবার পিছিয়ে পড়ছে কেন? ওর তো ঠিক আমার পিছন-পিছনই আসার কথা। তা হলে? একবার জিজ্ঞেসও করলুম, হ্যাঁ রে ব্যাপার কী? যে-ভাবে হাঁটছিস, তাতে তো বাড়ি পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যাবে। তাতে সে বলল, বাচ্চাটা নাকি দারুণ ভারী। শুনে হেসে বললুম, 'আমার ধামার মধ্যে পাঁচ সের আলু, দশ সেরি একটা কাঁঠাল, সের কয়েক বেগুন আর মস্ত একটা কুমড়ো রয়েছে। বাচ্চাটার ভার কি তার চেয়েও বেশি নাকি রে?'

''এর পরে আর খানিকক্ষণ কোন কথা হল না। কিন্তু তার পরে যা হল, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। পিছন থেকে কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাক শুনলুম, 'বাবু!' ভৃত্যটির গলা, মনে হল সে খুব ভয় পেয়েছে। পিছন না ফিরেই বললুম, 'কেন রে, আবার কী হল?'

''তাতে ওই কাঁপা-কাঁপা গলাতেই সে বলল, 'বাবু, ইসকা টেংরি তো বাড়্হত্ চলি!'

''অর্থাৎ, এর পা ক্রমেই বেড়ে চলেছে!''

''এর পরে আর পিছন না ফিরে উপায় কী! কিন্তু পিছন ফিরে যা দেখলুম, তাতে আর আমার বাকস্ফূর্তি হল না, একেবারে ভিরমি খাওয়ার যোগাড়।''

বাজপেয়ীদা আবারও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা এদিকে অস্থির হয়ে উঠেছি। বললুম, "কী হল বাজপেয়ীদা, চুপ করে গেলেন কেন, পিছন ফিরে কী দেখলেন?"

"যা দেখলুম, তা আপনারা বিশ্বাস করবেন না ভাই।"

"বিশ্বাস করি বা না-করি, সে আমরা বুঝব। আপনি কী দেখলেন, সেইটে বলুন দেখি।"

"দেখলুম," বাজপেয়ীদা বললেন, "উঃ, সে-কথা ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়!"

"যাচ্চলে, কী দেখলেন, সেইটে বলুন না।"

"দেখলুম যে, ছেলেটা তো আমাদের বাড়ির চাকরের গলার দু'পাশ দিয়ে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ছিল, সেই ঠ্যাং দুটো লম্বা হয়ে গিয়ে একেবারে মাটিতে এসে ঠেকেছে।"

"তারপর?"

"তারপরেই চাকরের ঘাড় থেকে মস্ত একটা লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পাশের মাঠের ভিতর দিয়ে ছুট লাগিয়ে কোথায় যে সে মিলিয়ে গেল, কিচ্ছু বুঝলুম না।"

"আর আপনারা?"

"সঙ্গে-সঙ্গে মাথার ধামা মাটিতে নামিয়ে আমিও ছুট লাগালুম। চাকরটিও দৌড় লাগাল আমার পিছন পিছন। দৌড়তে-দৌড়তে একবারও আর পিছন ফিরে তাকাইনি। একেবারে বাড়িতে পৌঁছে তবে থামি।"

গল্প শেষ করে বাজপেয়ীদা বললেন, "আছে রে ভাই ভাল-মন্দ সব রকমের আত্মাই আছে, তা আপনারা বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন।"

স্বপ্নে কারা?

প্রীতি পালচৌধুরী

অনুরাধার মনে আজ বড় আনন্দ, কতদিন পর লাবণ্য আসছে নিজের বাড়িতে, কি খাবে না খাবে তা নিয়ে রাতে ঘুম ছিল না। ও বড় চিংড়ি মাছ খেতে ভালোবাসে, পোস্ত, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, কষা মাংস, তার সাথে বেগুনী, কেউ বাড়িতে আসবে তাকে যত্ন করে খাওয়ানো, খাওয়াতে বসিয়ে যে খাওয়ায় তার মনটা বড় খুশীতে ভরে থাকে। ভাবে এখনই মুখে তুলে বলবে আহঃ কি দারুণ হয়েছে। সত্যিই তোমার হাতের রান্নার তুলনা হয় না। প্রতিটা খাবারের তার ভালোবাসা ছুঁয়ে থাকে, শুনতে চায় তার রান্নার তারিফ। বলবে বাবা দারুণ তোমার রান্না হয়েছে। অনুরাধা নিজের মনে হাসে আর ভাবে এই সংসারে হেঁসেলঘরটাতো নারীদের পীঠস্থান। হেঁসেলের লক্ষ্মী হচ্ছে মেয়েরা। যত তৃপ্তি ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা সবতো এই রান্নার মধ্যেই জড়িয়ে থাকে যখন যে ভোজন করে তার মুখের অভিব্যক্তি দেখলেই বোঝা যায় এই রান্নাটা তার পছন্দ হয়েছে কিনা। তৃপ্তি করে খাচ্ছে কিনা। জিভের স্বাদ উপভোগ করছে কিনা। রাঁধুনীর এই দৃশ্য সবসময়ই খুঁটিয়ে দেখে, তবে মুখে বলে না। কিন্তু মনে মনে তারিফ শুনতে ভালোবাসে। নিজের মনে বলে আমার লাবু আসছে। সেই ছোট্ট লাবু। হাত হাত ধরে ঘুরে বেড়াতো, আর কত প্রশ্ন, কত বায়না বিস্ময়ভরা চোখ দুটো দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখত, কত আজব আজব প্রশ্ন ওর মনে।

অনুরাধা হলুদ নুন মাখা হাতটা তোয়ালে না মুছে নিজের শাড়িতেই মুছে নেয়। আজ ও একটু দিশাহারা। লাবণ্যর ঘরটা গুছিয়ে রাখে। শো-কেসটার সামনে অনুরাধা দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ছোট্টবেলার সব খেলনাগুলো বেশ যত্ন করেই রেখে দিয়েছে। কেন রাখবে না, নিজের কি কম আছে। এখনও সেই কচি হাতের লেখা চিঠিটা প্রাণে ধরে ছিঁড়তে পারেনি। কত বানান ভুল। তবুও লাবুর লেখা চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছে। মানুষটা কেমন হারিয়ে গেছে। কিন্তু বাবার চিঠিটা আজ গোপনভাবেই আছে। সব মানুষেরই গোপন কথা মনের মধ্যে লুকানো থাকে। এটা শুধু নিজের গোপনতা তার কি ভাগ হয়। টুকরো টুকরো কত স্মৃতি, কত কথা সবই বয়স্ক মনটায় থিতু হয়ে আছে। গোপনের স্তরভেদ করে মাঝে মধ্যে বেড়িয়ে আসে। তখন যেন মনে হয় আমার একটুও বয়সে বাড়েনি। আমি সেই ফ্রক পরে বেনুনী দুলিয়ে দুলিয়ে পিঠে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি। পুকুরের পাড় ধরে। ভরপুর পুকুর, কত লোক স্নান করছে, কেউ বাসন মাজছে, কেউ কাপড় কাচছে। ভীতু পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি। যদি জলে পড়ে যাই, সাঁতার জানি না। গেটের সামনে বদ্যিনাথের ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ, হীরার বাড়িটা ঠিক পুকুর পাড়ের সামনেই ছিল। সময় পেলেই ওদের বাড়িতে চলে যেতাম। ওরা আমাকে খেতে দিত, আর আমি মনের আনন্দে খেতাম।

হীরা বয়সে বড় ছিল, অনেক লম্বা ছিল, আমার গাল টিপতো। একদিন স্কুলে খবর রটল হীরা পালিয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস হয়নি। কি সুন্দর ভাল মেয়ে। স্কুলের শিক্ষকরা গোপনে ওর নামে কত কি বলতো। আমার কষ্ট হতো। মনে হতো হীরা পালায়নি। ও কারও বাড়িতে গেছে। আসলে ওদের অবস্থা ভাল ছিল না। কতদিন আমি স্কুল ছুটি হবার পর ওদের বাড়িতে যেতাম। হীরা গুড় রুটি খেতে দিত। মাকে বললে বলতো তুই হীরাদের বাড়িতে গুড় রুটি খাস, আর বাড়িতে কত বায়না তোমার পছন্দের খাবার না হলে তো মুখে রোচে না। তাহলে কেন?

আমি হেসে বলতাম জানিনা মা কেন যে আমার ওদের বাড়ির সব খাবারই ভাল লাগে। মা হাসতো আর বলতো আসলে ওরা তোকে ভালবাসে। আর ভালবেসে খেতে দেয়। তাই তোর মনটাও ভরে যায়, ভালবাসা মাখানো খাবার কখনো খারাপ হতে পারে, সব যেন অতীত হয়ে গেছে। কোথায় হীরা হয়তো জমিয়ে ঘর-সংসার করছে ও ছেলেমেয়েদেরও কি গুড়রুটি খেতে দেয় ভালবাসা মাখিয়ে। মা নেই, সেই কবে চলে গেছে। আর কোনদিনও আসবে না। যখনই কোন রান্না করি সবটায় মায়ের স্পর্শ থাকে। রাঁধতে গেলে মনে মনে ভেবে নিই,

এটায়তো মা পাঁচফোড়ন দিত। তারপর সব সাতলে মশলা কষিয়ে রান্না করতো। তাই না। আগে, আগে মাকে ফোন করে জানতাম। এখন কাকে বলব। বড়রা যখন বিদায় নেয়, তার পরের দলরা ভীত হয়ে পড়ে।

হঠাৎ সেদিন রাতে অনুরাধা অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখে। হীরা এসেছে ওর বাড়িতে। কত বয়স হয়ে গেছে হীরার। স্বপ্নের কথা সব কেমন মনে পড়ে না। তবে ও স্পষ্ট দেখেছে হীরা একটা মস্তবড় গাড়ি চড়ে এসেছে। গা ভর্তি গয়না। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। অনুরাধার দুচোখে বিস্ময়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হীরার দিকে। হীরা তুই এসেছিস। কত বছর পর তোকে দেখতে পেলাম। কোথায় ছিলি এতদিন? জানিস সেই স্কুল থেকে তোকে আমি খুঁজছি; পাইনি। সবাই বলে তুই পালিয়ে গিয়েছিস। কোথায় ছিলি। হীরার সেই অভ্যাস আমার গালটা টিপে বলে তোকেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছেরে অনুরাধা। তুই সেই আগের মতোই আছিস। সেই হাসিমুখ। এক মেয়ে তাই তোর লাবণ্য। লাবু বলে তুই ডাকিস তাই না। তোর বর রমেশ এখানে থাকে না। বিদেশে থাকে তাই না? হীরা তুই এতসব জানলি কি করে? তাহলে আমার খবর সবই তোর নখদর্পণে। আর তোর কোন কথাই জানি না। চুপিচুপি কারও কাছ থেকে এত খবর পেয়েছিস নিশ্চয়। বুলটির কাছ থেকে। একমাত্র বুলটির সঙ্গেই আমার যোগাযোগ আছে। আর কেউ নেইরে। বুলটি তো এখানে এখন থাকে না। কোথায় যেন চাকরি নিয়ে চলে গেছে। তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাই না। ও এখানে থাকলে আমার বাড়িতে আসত কত কথা বলতো। তুই জানিস হীরা....

হীরা ওর হাতটা তুলে থামিয়ে বলে জানি ওর বিয়ে হয়নি, ও বলে বিয়ে না করাই ভাল। এইতো বেশ আছি। খাচ্ছি-দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আসলে ওকে ওর প্রেমিক ঠকিয়েছে। তাকে আমি ছাড়বো না। বুলটি খুব ভাল মেয়ে, তাকে ঠকানো আমি সহ্য করবো না। বুলটির খুব কষ্ট। খুব কাঁদছিল। আমি ওর প্রেমিক অমরনাথকে ছাড়ব না।

অনুরাধার দুই চোখে ঘুম। চারিদিক কি গভীর নীল আলোয় ঝলমল। পাখিদের কিচিরমিচির রোদ নেই, আকাশটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ নেই। অমবস্যার গাঢ় অন্ধকার। হীরাটা ঠিক সেই আগের মতোই আছে। অন্যায় সহ্য করতে পারে না। অন্যায় দেখলে ওর মাথায় খুন চাপে। প্রতিবাদ করতেই হবে। অনুরাধা একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে হীরা তুই সেই আগের মত প্রতিবাদী নারীই রয়েছিস। এবার তোর কথা বল?

হীরা হাসে, এই হাসির মধ্যে মুক্ত ঝরে পরে, বলে কি ব্যাপার আমার কোন

কথা নেই, আমি ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারি, এটাইতো মজার, যেটা তোরা পারবি না। সেকি তোর সংসার, তোর ছেলেমেয়ে স্বামী এরা সব কোথায়? তুই একা এসেছিস কেনরে? ওদের নিয়ে এলি না? হীরা ঠাণ্ডা শীতল হাসি হাসে। বলে ওরা আমার সঙ্গেই আছে। ছায়ার মত আমার সঙ্গে, সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। ওদের ছেড়ে আমি যাব কোথায়? ওরা এখনই এসে পড়বে।

অনুরাধার হাতটা বাড়িয়ে দেয় হীরার দিকে হীরা ওর কনকনে ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে ধরে। অনুরাধার ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। অদ্ভুত এক অনুভূতি। সমস্ত শরীরটা যেন বরফে ঢেকে যায়। ও চায় না এই মিষ্টি স্বপ্নটা কেটে যায়। চোখদুটো বুঁজে থাকে। স্বপ্ন ভাঙলেতো আর হীরাকে দেখতে পাবে না। কতদিন পর দেখা পেল। না, না ওকে ছাড়া যাবে না। ওমা ওইতো হীরা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেমন হাসছে তবে ওর মুখটা কেমন ধূসর বর্ণের। শরীরটা শীর্ণকায়। অনুরাধা ওর শাড়ির ভিতর দিয়ে ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। একটা খাঁচা মাত্র। একি! বুকের ভেতরটা ধরফর করে ওঠে। চোখ দুটো ভাল করে কচলে নেয়, ডাকে এই হীরা, তুই কোথায় কাছে এসে বস, কতদিন পর দেখা বলত। আমাকে একটু সোহাগ করবি না। আয়-আয়। কি খাবি বলতো?

করুণ সুরে কে যেন বলে গুড়রুটি খাব। দেনারে। বড় খিদে পেয়েছে। অনুরাধা হাসিতে ফেটে পড়ে। বলে গুড়রুটি খাবি। এখনও সেই গুড়রুটি খাওয়ার অভ্যাস আছে তোর? গুড়রুটি কেউ খায়? না, না আমি তোকে চাইনিজ; মোগলাই, ইতালির খাবার খাওয়াতে পারি, বল কি খাবি? হীরার লম্বা হাতটা আমাকে ছুঁয়ে বলে শুধু গুড় রুটি। ঠিক আছে আমি তোকে তাই খাওয়াব। এই বলে অনুরাধা ওর জন্যে রুটি বানায়। ওকে খেতে দেয়। হীরা খুশি মনে গুড়রুটি খায়। অনুরাধা নিজের মনে বলে হীরাটা একটুও বদলায়নি। গাভর্তি গয়না, দামী শাড়ি পরেছে, আর দেখ খাচ্ছে গুড়রুটি। হীরা খাওয়া শেষ করে আঃ বলে এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও হীরার দেহের ভিতরটা অনুরাধা স্পষ্ট দেখতে পায়। অবাক হয়ে দেখতে থাকে। এটা কি করে সম্ভব। হীরার দিকে তাকায়। ওমা ওর মুখটা এমন পাংশুবর্ণ কেন? ফ্যাকাসে দেখলে মনে হয় ওর দেহের সব রক্ত কে শুষে নিয়েছে। হীরা কেমন হাসছে, চোখদুটো নীলচে আর ঘোলাটে। অনুরাধা বলে তোর ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসতে পারতিস না? দেখতে পেতাম।

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ। গেটের সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়ায়। ভাবি এত রাতে গাড়ি। আমি গেটের দিকে এগোই। হীরাও এগিয়ে আসে বলে ওইতো ওরা সব এসে গেছে, রামহরিকে বল দরজাটা খুলে দিতে। আমি বিস্ময়ে ওর দিকে

তাকাই, বলি এর মধ্যে তুই রামহরিকে চিনে ফেলেছিস, বাবাঃ তুই পারিসও, ওইতো রামহরি দরজাটা খুলছে। একটা কালো রংয়ের গাড়ি। ছোটো ছেলেটা ছুটে আসছে হীরার দিকে। হীরা ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। তারপর একজন লোক নেমে এল। কোটপ্যান্ট পরা গটগট করে এগিয়ে আসছে। আমি কত চেষ্টা করছি মুখটা দেখার, দেখতে পারছি না। মুখটা যেন কালো রংয়ে ঢাকা একটা কালো রুমাল দিয়ে মুখটা আড়াল করে রেখেছে। হীরা লোকটার হাতটা ধরে এগিয়ে আসে। বলে এই হচ্ছে অনুরাধা। আমার বন্ধু। তুমিতো ও কত গল্প শুনেছ মনে পড়ছে? লোকটা মাথাটা নাড়ে, আমার দিকে না তাকিয়েই ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে বহুবার শুনেছি। ভাল আছেন তো?

আমি বলি ভাল আছি। আপনি কি অসুস্থ? লোকটা তেমনি মুখটা আড়াল করে বলে এক কাপ ব্ল্যাক কফি পেলে ভালো হত? বহুক্ষণ ব্ল্যাক কফি পাইনি। একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হয়। আবার আমাদের যেতে হবে তো। ছেলেটা হীরাকে জড়িয়ে ধরে আছে, আমি ওর গালদুটো টিপে বলি কি খাবে সোনা, ছেলেটি হাসে, বলে চকোলেট খাব আন্টি। আমি ওকে ধরে নিজের কাছে আনতে চাই। কিন্তু ছেলেটা হীরাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, আসতে চায় না। বাচ্চাটার চোখদুটো জলে ভরা, হীরা আমার দিকে তাকিয়ে বলে কিছু ভাবিস না। ও আমার বড় ভক্ত। খুব ভালোবাসেরে। কথাগুলো বলতে বলতে হীরা কেঁদে ফেলে আমি একটু ঘাবড়ে যাই। বলি বাচ্চাতো মাকেই বেশি ভালবাসবে, আমার মেয়েটাকে দেখ না, এখনও কেমন মা, মা করে। বড়তো হয়েছে। এইতো আসবে। তোর মেয়েটা কোথায়? ওকে দেখছি না তো? আসবে না?

ও বেঁচে গেছে? ও হোস্টেলে থাকে, ওকে আনতেই যাচ্ছি। তোর মেয়ের নামটা যেন কি? লাবণ্য লাবু তাইতো? ওকে ওর বন্ধুরা লাভ বলে ডাকে তাই নারে?

হ্যাঁ ওর বন্ধুরাতো ওকে লাভ বলেই ডাকে। মেয়েটা বড় স্ফূর্তিবাজ, খুব হাসিখুশি, ও এলে বাড়িটা যেন ভরে যায়। কত কথা বলে, আর চলে গেলে মনটা খুব খারাপ লাগবে। তোর মেয়েটা নিশ্চয় তোর মত, খুব হাসিখুশি। একবার নিয়ে আসিস। হীরার চোখের তারায় জল। বলে ও আসবে।

আমি ওর কথা বুঝতে পারি না। তাকাই ওর দিকে, বলে ঠিক আসবে। ওকে ঠিখ আমার মতোই দেখতে। একেবারে ছোটোবেলার আমি। ও হচ্ছে ছোট্ট হীরা। আমি সবসময় ওর মধ্যে নিজেকে দেখতে পাই।

চটপট ব্ল্যাক কফি এনে দিই ওর স্বামীকে। মানুষটা আমার দিকে না তাকিয়ে

কফির কাপটা হাতে নেয়। তারপর কি জোরে জোরে সিপ করতে থাকে। এমন করে কেউ চা-কফি খায়? আমি অনেক চেষ্টা করি তাকে দেখতে পাই না। গলা থেকে মাথা মুখটা কেমন অন্ধকারে ঢাকা। কালো রুমালে আড়াল করা। ভাবি হয়তো কোন অসুবিধা আছে। ছেলেটার হাতে চকোলেট দিই, ও আপনমনে চকোলেট খেতে থাকে। ও মার সঙ্গে চেপে আছে। মাঝে মাঝে পেটের কাছে হাত দিয়ে মুখটা বিকৃত করছে। হীরা ওর ঠাণ্ডা শীতল হাতটা ছেলের পেটে বুলিয়ে দিচ্ছে। বলি ওর কি হয়েছে রে হীরা? পেট ব্যাথা করছে? হীরা কোন উত্তর করে না। বলে ছেলেটার পেটটা দুফালি হয়ে গেছে। সবতো চোখের সামনেই হল। আর আমি? আমি বিস্ময়ে বলি দুফালি। সেকিরে? তুই কি বলছিস হীরা। আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না। হীরা চোখের তারায় রহস্যের হাসি, কিন্তু চোখদুটো জলে ভরা। আমি আর কথা বাড়াই না। বলি কিছু খাবি না, তোরা কোথায় থাকিস বলতো? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না।

হীরার স্বামী সেই ফ্যাসফ্যাসে গলায় তাড়া দিয়ে বলে চল আমাদের ট্রেনটা ধরতে হবে। এখন না বের হলে ট্রেনটা মিস্ করবো। তাড়াতাড়ি চল, হীরা আমার দিকে তাকিয়ে বলে আর সময় নেই, এখনই যেতে হবে। মেয়েটাকে আনতে হবে না। পরে আবার দেখা হবে। আমি একটু অভিমানের সুরে বলি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি। কোথায় যাচ্ছিস তোরা? আবার কবে আসবি। তোর ঠিকানাটা হীরা আর কথা বলে না। ওরা তিনজনে গিয়ে গাড়িতে বসে। আমি ওদের কাছে যাই। ওর স্বামীর মুখটা কিছুতেই দেখতে পাইনা। হীরা ওর হাতটা জানলা দিয়ে বার করে আমাকে ছোঁয়, মনে হয় এক ফালি বরফ আমাকে স্পর্শ করছে। আমার হাতটা যেন জমে গেছে। ওদের গাড়িটা স্টার্ট দেয়। কিন্তু হীরার ওই বিশ্বাস লম্বা হাতটা আমার গলাটা জড়িয়ে থাকে, আমি কিছুতেই ওর হাতটা ছাড়াতে পারি না। প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকি। ওর হাতটা আমার কাছে দশ মণ ভারী মনে হয়। বলি হীরা আমাকে ছাড় আমি যে তোর বরফ জমানো হাতটা বইতে পারছি না। গাড়িটা চলতে থাকে। আমি চীৎকার করতে থাকি হীরা আমাকে ছাড়। হীরা, হীরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?

চেষ্টা করতে করতে আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে যায়। ঘুমটা ভেঙে যায়। বিছানায় উঠে বসি। বুকটা ধড়ফড় করতে থাকে। জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকি। জল খাই। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না। শরীরটা ভারী লাগে। ভাবি কিসব বাজে স্বপ্ন দেখলাম। এতদিন পর হীরাকে স্বপ্নে দেখলাম। প্রথমে মনে হল সব সত্যিই। তারপরই বাস্তবে ফিরে এলাম।

চারিদিকে তাকালাম, কোথায় হীরা। কোথায়ও নেই। বাইরে চাপ চাপ অন্ধকার, মনে হচ্ছে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ। মনটা খারাপ হয়ে যায়। নিজে বলি সবটাই স্বপ্ন। অথচ কি স্পষ্ট আর জীবন্ত। স্বপ্ন কখনও এমন হয়? দৌড়ে গেলাম বসার ঘরে ওমা টেবিলের উপর কফির কাপ রয়েছে। যাতে হীরাকে গুড়-রুটি দিয়েছে। দিয়েছিল। এই কফিকাপ, প্লেট, চকোলেটরে কাগজ সব এল কোথা থেকে, কে এসব এখানে এনে দিল। আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম। তাহলে স্বপ্নের মধ্যে এসব করেছি এ কি করে সম্ভব। আমি নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনটা কষ্টে ভরে গেল। কেন হীরাকে এইভাবে স্বপ্নে দেখলাম। ঘরে কে আর আছে যাকে কথাগুলো বলব। নিজেই নিজের মনে হাজার একটা প্রশ্ন করতে লাগলাম। মনটা যখন কষ্টে ভরাক্রান্ত তখন লাবুর মুখটা মনের মধ্যে ভেসে উঠল। আজ ও আসবে, ওর সঙ্গে সব শেয়ার করা যাবে। ও বাড়িতে থাকলে মনে হয় বাড়িটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

ঘড়িটার দিকে তাকায় ভোরতো হতে আর বাকী নেই। সারাটা মন জুড়ে স্বপ্নটা কেমন তোলপাড় করতে থাকে। কি অদ্ভুত স্বপ্ন। এত স্পষ্ট আর এত নিখুঁত। নিজের হাতে কফি বানিয়ে দিয়েছে। চকোলেট দিয়েছে। কতটা কফি ঢালতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। স্বপ্ন জিনিসটা মানুষের জীবনে ভীষণ মূল্যবান। মানুষ জানে স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না। তবু মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। পরে সেটা ভাবতে আরও ভালবাসে। মিষ্টি স্বপ্ন হলে তো কথাই নেই।

কয়েক ঘণ্টা পর লাবণ্য আসছে। বিছানা ছেড়ে ওঠে না, চুপটি করে শুয়ে থাকে। কাজের মেয়ে রাসমণি না আসা পর্যন্ত আজ উঠবে না। এই মুহূর্তে অতীতটাকে ভাবতে বেশ লাগছে। ভাবতে ভাবতে চোখদুটো জুড়ে আসে। শুধু হীরার গলাটা শুনতে পায়, কেমন ফিস্‌ফিস্ করে বলছে কি করে অণু ঘুমাচ্ছিস কেন? উঠবি না। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? তুই বড় ঘুমকাতুরে তাই না? ওঠ ওঠ আর ঘুমোতে হবে না। এই শোন আমার মেয়েটাকে দেখিস। বড় দুঃখীরে। ওকে নিজের মেয়ের মতো মেনে নিস। আমি জানি তুই ওকে দেখবি। ঘুমের মধ্যে অনুরাধার ঠোঁট দুটো জড়িয়ে আসে। তো, তো করতে থাকে। কোন শব্দ বের হয় না।

কলিংবেলের আওয়াজ কানে এসে লাগে। অনুরাধার ঘুমটা ভেঙে যায়। নিজের মনে বলে ফের স্বপ্ন দেখছিলাম। আজ আমাকে স্বপ্নে পেয়েছে। রাসমণিটা নিজেই একটা ঘড়ি। কেন বাবা একটু দেরি করে এলে কি হতো? আরও স্বপ্ন দেখতে পারতাম। দরজাটা খুলতেই রাসমণি ভারী গলায় বলে কি মনে হচ্ছে

কতদিন তুমি ঘুমাওনি। অনুরাধা রাসমণির দিকে তাকিয়ে বলে যাও, কাজটা সেরে ফেল। দিদি আসছে। সব তাড়াতাড়ি সারতে হবে। যাও, যাও সময় নষ্ট করো না। রাসমণি রান্নাঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলে বৌদি তুমি কি সব করেছ বলতো? এত কফি ফেলেছ? কেউ এসেছিল বুঝি?

অনুরাধা চমকে উঠে কি বললে কফি...... ও দৌড়ে যায় রান্নাঘরে, ওমা তাইতো। সেই স্বপ্নে চলকে যাওয়া কফি পরা, এইতো কফি পরে রয়েছে তাহলে.... সত্যিই কি ওরা এসেছিল, ওমা এইতো কফির কাপ-প্লেট পরে রয়েছে। তাহলে হীরারা সত্যিই এসেছিল। আমার মনে হচ্ছে সব স্বপ্ন তাড়াতাড়ি চলে গেল, মেয়ের জন্য মনটা কেমন উদাস হয়ে পরে। তাহলে ওরা এসেছিল। এটা স্বপ্ন নয়, নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মনটা ভারী হয়ে ওঠে। তার সাথে একটা শিরশিরে ভয় শরীরটাকে অবশ করে রেখে। এতক্ষণ ধরে যা মিথ্যে ভাবছিল তা সত্য হয়ে উঠেছে। কথা না বাড়িয়ে অন্য কাজে মন দেয়। কাজে মন দিলেও মনটা ভাল লাগে না। আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে আসে। লাবুর ফোন আসে, আমার আসতে একটু দেরি হবে। চিন্তা করো না। এসে সব কথা বলব। অনেক, অনেক কথা আছে। মনটা ভাল নেই। অনুরাধা লাবণ্যর ফোনটা পেয়ে সোফাটায় বসে পড়ে। কি হল মেয়েটার, গলার স্বরটা কেমন কাঁপছিল। মনে হয় মেয়েটা বিপদে পড়েছে, সব জানার জন্যে মনটা উতলা হয়ে ওঠে। ফোনটায় ডায়েল করেও কেটে দেয়; লাবণ্য বলেছে তুমি টেনশন করো না, ঠিক চলে আসব। আমরা পরের ফ্লাইটায় আসব। ট্যাক্সি করেই চলে আসব। তোমাকে আসতে হবে না। এলে সব কথা জানতে পারবে।

এত রান্নাবান্না করা হয়েছে। মেয়েটার দেখা নেই। দেখতে, দেখতে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। অনুরাধা চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটাকে কাছে পাবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ট্যাক্সির হর্ন কানে এসে বাজে। অনুরাধা ছুটে যায় নীচে। রামহরি লোহার গেটটা খুলে দেয়। লাবণ্য নামছে। তার সাথে একটা মেয়ে। লাবণ্য ওকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। অনুরাধা ছুটে যায় মেয়ের কাছে। ততক্ষণ ওরা ঘরের দিকে এগিয়ে এসেছে। অনুরাধার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না। ও বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে পাশের মেয়েটার দিকে। এই কি? মুখ দিয়ে নামটা বেরিয়ে আসে হীরা, তুই সেই ছোট্টো হীরা? লাবণ্য ছলছল চোখে তাকায় মার দিকে। বলে মা ওর নাম মুক্তমালা ও আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়ি। কথাগুলো বলতে বলতে ওরা সোফাটায় বসে পড়ে। মেয়েটিরা মুখে কোন কথা নেই। চোখদুটো জলে ভরা। মাথাটা নীচু করে

বসে আছে। অনুরাধা কি করবে ভেবে পায় না। মেয়েটার দিকে এগিয়ে যায়। লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে বলে কি হয়েছে ওর। ও কাঁদছে কেন? জানিস ওকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম আমার বন্ধু হীরার মত দেখতে।

মুক্তমালা মুখটা তুলে বলে আমার মার নাম হীরা। সবাই বলে আমাকে মায়ের মতই দেখতে। আপনি আমার মাকে চেনন? এই বলে ও কান্নায় ভেঙে পড়ে। লাবণ্য ওদের থামিয়ে বলে জান মা কাল ওর বাবা মা আর ভাই তিনজনে গাড়িতে করে আসছিল। অ্যাকসিডেন্ট হয়, তাতে তিনজনই মারা যায়। ভাবতে পার, ও তো পাগল হয়ে গিয়েছিল। আমি জোর করেই ওকে নিয়ে এলাম, তোমার কাছে এলে হয়তো ওর ভাল লাগবে। ও কি করবে বলতো? ওর ছোট্ট ভাইও মারা গেছে ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বাবার মুখটা চেনা যাচ্ছে না। ভাইটার পেটে বুকে চোট পেয়েছে আর আন্টির গোটা দেহটা পেষ্ট হয়ে গেছে। ওকে টিচাররা দেখতে দেয়নি। অনুরাধা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে মুক্তমালাকে জড়িয়ে ধরে বলে আয় মা কাছে আয়। কাঁদিস না, আমিতো আছি। আজ থেকে লাবণ্যের মতো তুমিও আমার একটা মেয়ে। আমি তোমার মাকে জানি। ও আমার ছোটোবেলার বন্ধু। কতদিন পর কাল দেখা হল, আমার বাড়িতে এসেছিল ওরা, মুক্তমালা বিস্ময়ে তাকায় বলে কাল এসেছিল? কি করে সম্ভব। এই ঘটনা তো দুইদিন আগে ঘটেছে।

অনুরাধার মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না। ওর শরীরটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। তাহলে কাল কারা এসেছিল। ওরা জীবন্ত ছিল না। ওই দুই হাতে নিজের কানদুটো ধরে বলে না, না এটা সম্ভব নয়। ওরা যে কাল এল। মুক্তমালা চোখের জল মুছে বলে মা আমার কাছেও এসেছিল বলেছে আপনার কাছে আসতে। তাইতো আমি লাবণ্যকে না বলিনি। চলে এসেছি। মা তোমাকে খুব ভালবাসতো। অনুরাধা ওর মাথায় হাত বোলায়, হঠাৎ ও অনুভব করে একটা লম্বা গাঢ় ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ওর পিঠের উপর পড়ছে। একটা ঠাণ্ডা হাত ওর পিঠে হাত রাখে। ও পিছন ফিরে দেখতে পায় হীরার একটা লম্বা মূর্তি অস্পষ্ট। চোখদুটো চক্‌চকে, তাতে জলের ধারা চোখে মুখে মিনতী আমার বাছাকে দেখিস। অনুরাধা চোখের তারায় আশ্বাস হীরা চোখদুটো কৃতজ্ঞতায় ভরা।

শুধু একজন

বেনেট কার্ফ

নিউইয়র্কের এক বুদ্ধিমতী সুন্দরী মেয়ে ক্যারোলিনায় তার এক দূর আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ পেল। মেয়েটির বয়স কুড়ি! আগে সে কোনদিন ক্যারোলিনায় যায় নি। সুতরাং থাকার সুযোগ পেয়ে মেয়েটি খুবই খুশী হল।

ক্যারোলিনায় আত্মীয়ের বিরাট খামার আর বাগিচা রয়েছে। যাবার দিন গুনতে লাগল মেয়েটি। বেশ কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে ফেলল। এসব হাল-ফ্যাসানের পোশাক দেখে দক্ষিণী ভাই-বোনেরা-আত্মীয়ের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে।

তারপর যাবার দিন এল, মেয়েটি নির্দিষ্ট দিনে পৌছল ক্যারোলিনায়। আত্মীয়ের বিরাট খামার আর বাগিচা দেখে সে অবাক হল। চারপাশের দৃশ্য, ম্যানর-হাউস, আত্মীয়দের ব্যবহার—সবই সুন্দর—সবই নিখুঁত। আত্মীয়টি যে বেশ অর্থবান তা বুঝতে মেয়েটির কোন অসুবিধা হ'ল না।

ম্যানর-হাউসের পশ্চিম পাশের একখানা ঘর মেয়েটির থাকবার জন্য দেওয়া হল। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে খুশী মনে সে চলল নিজের শোবার ঘরে।

পূর্ণিমার রাত। পূর্ণচন্দ্রের আলোর বন্যায় সমস্ত ঘরখানা যেন প্লাবিত। বাইরে নুড়ি ফেলা পথ। পথটা গিয়েছে ম্যানর হাউসের ফটকের দিকে। পথের দু'পাশে ফুলের বাগান। জ্যোৎস্নায় সব কিছু কেমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যে যেন ভরে গিয়েছে। মেয়েটির মনে হল বুঝি আর এ পৃথিবীতে নেই। কোন এক যাদুমন্ত্রবলে সে যেন চলে এসেছে স্বপ্ন-লোকের পরীদের দেশে। পৃথিবী যে এত সুন্দর—এত মায়াময়, তা যেন এতকাল মেয়েটির কল্পনারও বাইরে ছিল।

ঘরে বিরাট খাটে সুন্দর বিছানা পাতা রয়েছে। খাটে উঠতে গিয়ে মেয়েটি চমকে উঠল রাতের নিস্তব্ধতা ফেলে নুড়িফেলা পথে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এত রাতে ম্যানর-হাউসে আবার কে এল! জানলার কাছে গেল মেয়েটি। একখানা পুরানো কোচ ছুটে আসছে বাড়ীটার দিকে। গাড়িখানা টানছে চারটে মিশকালো ঘোড়া। ঝড়ের বেগে যেন গাড়িখানা উড়ে এল। থামল এসে মেয়েটির ঘরের জানালার সামনে।

কোচবাক্স থেকে এক লাফে নামল কোচোয়ান। উপরে জানলার দিকে তাকাল। একটা লম্বা অস্থিসার আঙুল তুলে ধরল মেয়েটির দিকে। লোকটা দেখতে অতি কুৎসিত—অতি ভয়ঙ্কর! ওর মুখখানা খড়ির মতো সাদা। বাঁ গালে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গভীর ক্ষতচিহ্ন। লম্বা নাকটা পাখীর ঠোঁটের মতো বাঁকানো।

শঙ্কা-বিহুল মেয়েটির দিকে অস্থিসার আঙুল তুলে সে প্রেতায়িত কণ্ঠে গুন্ গুন্ করে বলল ঃ

'আর মোটে একজনের জায়গা রয়েছে!'

দারুণ আতঙ্কে মেয়েটি জানলার কাছ থেকে পিছিয়ে এল। ওর সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। ওর আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে কোচ, ঘোড়াগুলো এবং বীভৎস দর্শন কোচম্যান মুহূর্তের মধ্যে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল! নুড়ি ফেলা পথটা পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। পথটা আগের মতই খালি।

সে রাতে মেয়েটির ভাল ঘুম হল না। সকালবেলা সোনালী আলোয় ওর মনে হল গত রাতে ও যা দেখেছে তা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। একে নতুন জায়গা তার উপর খাওয়া-দাওয়া একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই বোধহয় পেট গরম হয়ে এসব স্বপ্ন দেখেছে ও। এমনি করেই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে চাইল মেয়েটি। এ সম্পর্কে বাড়ীর কাউকে কিছু বলল না ও।

কিন্তু কি আশ্চর্য? পরের রাতে একই ঘটনার পুরনাবৃত্তি ঘটল। সেই একই কোচ ঝড়ের গতিতে ছুটে এল নুড়ি পথ ধরে। সেই একই কোচোয়ান নামল কোচবাক্স থেকে। মেয়েটির দিকে অস্থিসার আঙুল তুলে বীভৎস প্রেতকণ্ঠে সেই একই কথা বলল ঃ

'আর মোটে একজনের জায়গা রয়েছে!'

পরমুহূর্তেই গাড়ি, ঘোড়া, কোচোয়ান সবই অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটি এবার দারুণ ভয় পেয়ে গেল। নাঃ, এতো দুঃস্বপ্ন নয়! এ বাড়ী ছেড়ে ওকে চলে যেতে হবে। এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও আর দেখতে পারবে না। সহ্য করতে পারবে না এই বিভীষিকা। যদি সম্ভব হত মেয়েটি হয়ত সে-রাতেই ম্যানর হাউস ছেড়ে চলে যেত। কিন্তু এত রাতে তা সম্ভব নয়। ঠিক করল কাল ভোরেই ও চলে যাবে এ বাড়ী থেকে। কিন্তু ভোরের জন্যও ও যেন আর অপেক্ষা করতে পারছিল না।

সকাল হল। বাড়ীর কর্তা আর কর্ত্রীকে কোন রকমে একটা ছুতা দেখিয়ে ও ম্যানর-হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ীর কর্তা গিন্নী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু ওর ইচ্ছায় বাধা দিলেন না।

মেয়েটি সোজা চলে এল নিউইয়র্কে। স্টেশন থেকে বাড়ী না গিয়ে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ও চলে এল ওদের পারিবারিক চিকিৎসকের চেম্বারে। একখানা বহুতল বাড়ীর আঠারো তলায় ডাক্তারের চেম্বার। কাঁপা স্বরে মেয়েটি ডাক্তারকে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলল।

সহানুভূতির সঙ্গে ডাক্তার শুনলেন ওর কাহিনী। ডাক্তারকে সব কথা খুলে বলায় মেয়েটির উত্তেজিত স্নায়ুগুলো যেন শান্ত হল। কাহিনী শেষ হলে বর্ষীয়ান চিকিৎসক একটু হেসে বললেন ঃ

'তুমি একটা অদ্ভুত অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়েছ। যা দেখেছ, তাকে মনোবিজ্ঞানে 'অলীক প্রত্যক্ষণ' বা 'হ্যালুসিনেশন' বলা হয়। কোন ভয় নেই, এখন বাড়ী যাও। দু'একদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ডাক্তারের কথায় মেয়েটির মনের অস্বস্তি দূর হল। চেম্বার থেকে বেরিয়ে ও বাইরের টানা বারান্দায় চলে এল। এবার এই করিডোর দিয়ে একটু এগোলেই 'লিফট' পাওয়া যাবে।

লিফটের জন্য বেল টিপল মেয়েটি। উপর থেকে নেমে এল লিফট। একেবারে ভর্তি। ভিতরে লোক গাদাগাদি করে রয়েছে। ওর সামনে এসে থামল লিফট্টা। কোন-রকমে ভিতরে একটু জায়গা করে নেবার জন্য মেয়েটি এগোল, আর ঠিক সেই সময়েই ওর কানে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ঃ

'আর মোটে একজনের জায়গা রয়েছে।'

দারুণ আতঙ্কে পিছিয়ে গেল মেয়েটি।

ওর দিকে অস্থিসার আঙুল তুলে লিফট-চালক বলল কথাগুলো।

লিফট-চালক সেই রাতের দেখা কোচোয়ান। সেই খড়ির মতো সাদা মুখ, 'বাঁ গালের এ প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গভীর ক্ষতচিহ্ন, পাখীর ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক! এক! হুবহু এক! কোন ভুল নেই, সেই একই লোক!

লিফটের সামনে থেকে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল। ঝপাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা; লিফট ওকে রেখেই নীচে নেমে গেল।

আর এক মুহূর্ত পরেই ঝপ্.......ঝপাং.......ঝপ্....হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার শব্দে সেই বহুতল বিরাট বাড়ীটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। তার ছিঁড়ে লিফট্টা গিয়ে আছড়ে পড়ল আঠারো তলা নীচে।

একজন আরোহীও আর বেঁচে রইল না। তাদের দেহ পরিণত হল রক্তময় মাংসপিণ্ডে।

রাতের অথিতি

বেনেট কার্ফ

আকাশে চাঁদ নেই। মাথার ওপর তারা-জ্বলা আকাশ।

অন্ধকার পথে একজন পথিক এগিয়ে যাচ্ছে তার গন্তব্য-স্থানের দিকে। তারার আলো পথের অন্ধকার দূর করতে পারে নি। রাস্তার দু'পাশে লম্বা লম্বা গাছ, তার ফলে পথের অন্ধকার আরো ঘন—আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে পথিক, ওকে এখনও আরো অনেকটা যেতে হবে।

লোকটা একটু ভীতু প্রকৃতির। একে অন্ধকার, তার উপর নির্জন বনপথ। ফলে ওর ভয়টা যেন আরো বেড়ে গিয়েছে। ওর গা ছমছম করছে! কি নির্জন পথ! একটা লোকও কি থাকতে নেই রাস্তায়! রাত তো এমন কিছু বেশী হয় নি। কিন্তু কি আর করা যাবে, এ তো আর শহর নয়—পাড়াগাঁ। এখানে সন্ধ্যার পরই রাত নেমে আসে।

হঠাৎ উল্টোদিক থেকে আসা একটা লোকের সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগল। চমকে গেল পথিক। কি আশ্চর্য, এ লোকটা আবার কখন এল! অন্ধকারটা পথিকের চোখে মোটামুটি সয়ে গিয়েছিল। তারার আলোয় ও আবছাভাবে সামনের পথটা দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু এ লোকটার আসা তো ও দেখেনি।

ধাক্কা লাগায় চমকে গিয়েছিল পথিক। প্রথম চমকটা কাটবার পর সে বলল :

—'বাব্বাঃ! আপনি মশাই খুব চমকে দিয়েছেন, আমি তো ভাবলাম অন্ধকার পথে একটা কালো ভূতের সঙ্গেই বুঝি আমার ধাক্কা লাগল। সত্যি মশাই, আপনি খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছেন আমাকে।'

—'তাই বুঝি!' অদ্ভুত গলায় আগন্তুক বলল।

—'এমনি করেই লোকে ভয় পায়' পথিক বলল, 'আমি তো আপনাকে ভূতই ভেবেছিলাম।'

—'তা আপনার ধারণাটা পাল্টাল কি করে? এখনই বা কি করে ভাবলেন যে আমি ভূত নই।'

বিমূঢ় পথিকের বিস্ফারিত চোখের সামনে আঁধার রাতের কালো অন্ধকারে আগন্তুক হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল!

সেইরাত সেইসময়

বেনেট কার্ফ

নিউইয়র্ক থেকে যে প্রধান পথটা (এক নম্বর সড়ক) বেরিয়ে এসেছে, বাল্টিমোরের বারো মাইল দূরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের সঙ্গে তার ক্রশিং হয়েছে। এ ক্রশিংটা খুবই বিপদজনক! এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য পথচারীদের জন্য মাটির তলা দিয়ে একটা 'সাবওয়ে' তৈরী করবার কথা অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটা পরিকল্পনা স্তরেই রয়েছে। সরকারী লাল ফিতের বাঁধন কেটে এখনও পরিকল্পনাটা বাস্তবে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

শনিবার রাত। ডঃ একারমল এক গ্রাম্য ক্লাব থেকে গাড়ি করে ফিরছিলেন। ক্লাবে একটা নাচের আসর ছিল। ডাক্তার নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ক্রশিংটার কাছে এসে গাড়ির গতি কমিয়ে দিলেন ডাক্তার।

একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হলেন ডাক্তার; এত রাতে নির্জন পথে একটা মেয়ে! তার পরনে সান্ধ্য-গাউন। মেয়েটি গাড়ি থামাবার ইশারা করছে। ও নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে! বোধহয় কোন পার্টিতে গিয়ে সময়ের হিসেব রাখতে পারে নি! এখন যানবাহন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাড়ী ফিরতে পারছে না।

গাড়ি থামালেন ডাক্তার। বললেন ঃ

—'আপনি পিছনের সীটে বসুন। সামনে—আমার পাশে—গলফ্ খেলবার সাজসরঞ্জাম রয়েছে, এখানে আর বসবার জায়গা নেই।'

মেয়েটি গাড়িতে উঠল। ডাক্তার গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

—'এত রাতে আপনি এখানে কি করছিলেন? আপনার মতো এক তরুণীর পক্ষে এত রাতে একলা পথে থাকা কি খুব নিরাপদ?' গাড়ি চালাতে চালাতে ডাক্তার বললেন।

—'সে এক বিরাট কাহিনী,' মেয়েটির কণ্ঠস্বর মিষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ, অনেকটা শ্লেজ গাড়ির ঘন্টাধ্বনির মতো।

—'দয়া করে আমাকে বাড়ীতে পৌছে দিন। সেখানে আমি আপনাকে সব কথা বুঝিয়ে বলব,' মেয়েটির গলার স্বরে আকুলতা।

—'আপনার ঠিকানা?'

—'ঠিকানা! ঠিকানা হল....নং নর্থ চার্লস স্ট্রিট। মনে হয় আপনার নিজের পথ থেকে খুব বেশীদূর যেতে হবে না।'

—'ঠিক আছে। জায়গাটা আমার একেবারে অচেনা নয়।' ডাক্তার বললেন।

মেয়েটির শঙ্কাতুর মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল।

গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিলেন ডক্টর একারমল। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। মেয়েটির বাড়ীও ডাক্তারের নিজের বাড়ী থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ওকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ঘাড়ে চাপায় বাড়ী পৌঁছতে ডাক্তারের আরো মিনিট দশেক বেশী সময় লাগবে। যাক, কি আর করা যাবে! বিপন্ন মেয়েটিকে সাহায্য করা তো একটা নৈতিক এবং সামাজিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

নর্থ চার্লস স্ট্রিটে ঢুকে গাড়ীর গতি কমিয়ে দিলেন ডাক্তার। এবার দু'পাশের বাড়ীর নম্বরগুলি দেখতে দেখতে যেতে হবে। বেশী দূর যেতে হল না। একটু এগোতেই মেয়েটি যে নম্বরের কথা বলেছিল, সেই নম্বরের বাড়ীখানা পেয়ে গেলেন ডাক্তার। গাড়ি থামালেন।

—'এই যে, আমরা এসে গিয়েছি,' ডাক্তার পিছনের দিকে মুখ ফেরালেন।

কি আশ্চর্য! পিছনের আসন একদম ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে।

—'একি অদ্ভুত ব্যাপার!' আপনমনেই বললেন ডাক্তার, 'মেয়েটা নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে পড়ে যায় নি।...কর্পূরের মতো উবেও যেতে পারে না।

তবে কি এ রাস্তায় ঢুকে গাড়ির গতি যখন কমিয়ে দিলাম তখনই কি ও নেমে গেল? কিন্তু তাই বা নামবে কেন? গাড়ি তো ওর বাড়ীর দিকেই নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ীখানার দিকে এগোলেন ডাক্তার। সদর দরজা বন্ধ। ভিতরে একটি আলোও দেখা যাচ্ছে না। বাড়ীখানা নিঝুম ...নিস্তব্ধ! পোড়ো বাড়ী নাকি! কিন্তু না, তাও তো মনে হচ্ছে না।

হতবুদ্ধি ডাক্তার 'কলিং বেল' টিপলেন। এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে হয় নি। কোন সাড়া নেই। বাড়ীতে কোন লোক জন নেই নাকি! আবার 'বেল' টিপলেন ডাক্তার। এ রহস্যের মীমাংসা না করে তিনি যেতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত দরজা খুলল। একজন লোক চৌকাঠের ওপাশ থেকে ডাক্তারের দিকে তাকালেন। লোকটি বৃদ্ধ, তার মাথার চুল ধূসর। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ।

—'কাকে চাইছেন?' ক্লান্ত গলায় বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

—'দেখুন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে,' ডাক্তার বললেন, 'একটি অল্পবয়সী

মেয়ে আমার গাড়িতে উঠেছিল। সে এ বাড়ীর ঠিকানাই দিয়েছিল। আমি তাকে নিয়ে এলাম, কিন্তু এখন দেখছি...'

—'সে আর গাড়িতে নেই, এই তো?' বৃদ্ধ প্রশ্নের সুরে বললেন।

—'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

—'মেয়েটি কোথায় আপনার গাড়িতে উঠেছিল?'

—'দুটো হাইওয়ের ক্রশিং-এ,' ডাক্তার উত্তর দিলেন।

—'জানি,' ক্লান্ত স্বরে বৃদ্ধ বললেন, 'এই নিয়ে তিনবার হল। ও আমারই মেয়ে। তিন বছর আগে ঐ ক্রশিং-এর কাছে এক মোটর দুর্ঘটনায় ও মারা যায়। আজ ওর মৃত্যুর তারিখেই ও বাড়ী ফিরে আসতে চায়, কিন্তু পারে না। ওর গত দুই মৃত্যুদিনেও এমনি ঘটনা ঘটেছিল।'

বৃদ্ধের গলার স্বর কেঁপে উঠল। চোখের কোণে টলমল করে উঠল অশ্রুবিন্দু।

বিমূঢ় ডাক্তার গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

সাটিনের পোশাক

বেনেট কার্ফ

নিউইউর্কের লেখক মহলে কয়েক বছর আগে একটা গল্প খুব চালু ছিল। গল্পটা হল সাটিনের পোশাক পরা একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে। এ হচ্ছে এমনই এক ঘটনা যা নাকি সব বক্তারই খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো বোনের অথবা নিকটতম প্রতিবেশিনীর জীবনে ঘটেছিল। এ কাহিনীর সব কথকই এ সম্পর্কে শপথ করতে প্রস্তুত। অবশ্য আরও অনেকের পরিচিত মেয়ের জীবনে এ রকম ঘটনা ঘটেছিল, এমন কথাও শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা বলা হলে বক্তারা অত্যন্ত চটে যান—তাদের মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে হয়ে ওঠে।

যাক্ সে কথা। এবার আসল গল্পটি বলা যাক। কাহিনীটি হচ্ছে এই যে, একবার এক সুন্দরী কিন্তু গরীব মেয়ে একটা নাচের আসরে যাবার নেমন্তন্ন পেল। মেয়েটির পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন এক জগতে প্রবেশ করবার এ একটা বিরাট সুযোগ। সে অভিজাত সমাজের সঙ্গে মিশতে পারবে। হয়ত কোন্ সুশ্রী আর ধনী যুবকের সঙ্গে ওর পরিচয় হবে, আর সে পরিচয় পরিণত হবে ঘনিষ্ঠতায়। সেই যুবকই হয়ত বিয়ে করে বস্তির খুপ্ড়ি ঘর থেকে উদ্ধার করে ওকে নিয়ে যাবে নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। নেমন্তন্ন পেয়ে মেয়েটি এ রকম অনেক সুখ-কল্পনার জাল বুনল।

কিন্তু একটা মুশকিল আছে! মুশকিলটা বিরাট। অভিজাত ধনীদের এরকম নাচের আসরে যাবার মতো পোশাক মেয়েটির নেই। এ সমস্যার সমাধান কি হবে, অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও মেয়েটি তা ঠিক করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত এক বান্ধবীকে বলল তার সমস্যার কথাটা, সব শুনে বান্ধবীটি বলল ঃ 'এটা আর এমন কি সমস্যা, সেদিন সন্ধ্যার জন্য একটা পোশাক ভাড়া করলেই তো হবে।'

—'কোথায় ভাড়া পাওয়া যাবে?'

—'বন্ধকী দোকানে পাওয়া যেতে পারে। অসুবিধায় পড়লে অনেক সময় লোক পোশাক-পরিচ্ছদ বাঁধা দিয়েও টাকা ধার করে থাকে। এই তো আমাদের বাড়ীর কাছেই এ রকম একটা দোকান রয়েছে। তোকে নিয়ে যাব সেখানে। দেখা যাক সমস্যার সমাধান হয় কি না।'

বান্ধবীর সঙ্গে মেয়েটি গেল বন্ধকী দোকানে। কি সৌভাগ্য! একটা সাটিনের

তৈরী চমৎকার পোশাক ভাড়া পাওয়া গেল। দু'একটা জায়গায় একটু পিনের কারসাজি করলেই সাদা গাউনটা মেয়েটির গায়ে চমৎকার ফিট করবে। আর ভাড়াও এমন কিছু বেশী নয়। খুশী হয়ে বান্ধবীকে ধন্যবাদ দিল মেয়েটি। দোকানীকে কয়েকটা 'সেন্ট' অগ্রিম দিয়ে নির্দিষ্ট সন্ধ্যার জন্য পোশাকটা 'বুক' করে রাখল মেয়েটি।

নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যাবেলা সাদা সাটিনের সেই চমৎকার গাউনটি পরে মেয়েটি নাচের আসরে উপস্থিত হল। মেয়েটি দেখতে সুন্দর তার উপর এই সুন্দর পোশাকটি পরায় ওর সৌন্দর্য যেন কয়েক-গুণ বেড়ে গেল। আসরে আর সব মেয়েকে ম্লান করে দিয়ে এ মেয়েটি যেন ঝলমল করতে লাগল। ও আসবার পর যেন একটা সাড়া পড়ে গেল আসরে। অনেক তরুণই ওর সঙ্গে নাচবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল। মেয়েটি কাউকেই বিমুখ করতে চাইল না। ঠিক করল সব তরুণের সঙ্গে সে একের পর এক নাচবে। আজ তার ভাগ্য ফিরেছে—একটা অচিন-লোকের দুয়ার যেন খুলে গিয়েছে তার সামনে।

একের পর এক সুদর্শন তরুণের সঙ্গে নেচে চলল মেয়েটি। সময় যেন উড়ে যেতে লাগল পাখা মেলে। সন্ধ্যা শেষ হল। শুরু হল রাত। রাত এগিয়ে চলল গভীরতার দিকে। নেচে-নেচে মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

শুধু কি ক্লান্তি! তার সঙ্গে কেমন যেন একটা বমি-বমি ভাব! মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। মেয়েটির মনে হল সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। যতক্ষণ পারল ততক্ষণ এই অস্বস্তির ভাবটার সঙ্গে লড়াই করবার চেষ্টা করল মেয়েটি। ভাবল, একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু না, অস্বস্তিটা ক্রমেই বেড়ে চলল। শেষপর্যন্ত আর পারল না মেয়েটি; দু'টি নাচের মাঝখানের বিরতিতে চুপি-সাড়ে বেরিয়ে এল আসর থেকে। ওর সমস্ত শরীর তখন টলছে।

রাস্তায় এসে মুক্ত বাতাসেও ওর অস্বস্তি কমল না। কোন রকমে একখানা গাড়ি ধরে ও নিজের বাসায় ফিরে এল। কি করে যে টলমলো পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নিজের কামরায় ঢুকল তা ও নিজেই বুঝতে পারল না।

নিজের ঘরে এসে পোশাক না ছেড়েই মেয়েটি বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। গা বমি-বমি ভাবটা আরও বেড়ে গেছে—বেড়ে গেছে মাথার অসহ্য যন্ত্রণাটা। আচ্ছন্ন অবস্থায় ওর যন্ত্রণা-কাতর মাথার মধ্যে যেন একটা অপার্থিব কণ্ঠস্বর ঢুকতে লাগল। আচ্ছন্ন অবস্থায় ও শুনতে পেল নারীকণ্ঠে কে যেন বলছে, 'দে আমার পোশাক ফিরিয়ে দে.....দে আমার গাউন ফিরিয়ে দে.....এ পোশাক জীবিতের নয়.....এ পোশাক মৃতের....দে.....দে.....'

কি কর্কশ—কি বীভৎস....কি তিক্ত সেই কণ্ঠস্বর!

'দে.....দে.....দে......'

ছোট কামরাখানা ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই অমানুষিক কণ্ঠস্বরে।

— — —

পরদিন সকালে মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গেল বিছানার উপর। অস্বাভাবিক মৃত্যু দেখে করোনার ময়না তদন্তের আদেশ দিলেন। তদন্তে প্রকাশ পেল যে শব-সংরক্ষণের তরল পদার্থ শরীরে ঢুকে মেয়েটির সমস্ত দেহ বিষাক্ত হয়ে যায়। এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন উঠল এ রকম বিষাক্ত তরল পদার্থ ওর শরীরে ঢুকল কি করে? তদন্তে জানা গেল, ঢুকেছে সাদা সাটিনের গাউনটা থেকে। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেল ঐ গাউনের গায়েই তরল পদার্থটা মাখানো রয়েছে। নাচতে-নাচতে মেয়েটির শরীর যখন খুব গরম হয়ে গিয়েছিল তখন শরীরের রোমকূপের পথেই বিষ ঢুকে গিয়েছিল দেহের মধ্যে।

কিন্তু গাউনে কেন শব-সংরক্ষণের তরল পদার্থ মাখান থাকবে? মেয়েটি কোথা থেকে গাউনটা কিনেছিল বা ভাড়া করেছিল? মৃতার বান্ধবীর কাছ থেকেই বন্ধকী কারবারীর ঠিকানা পেল পুলিশ। ঠিকানা পাবার পর সেখানে যেতে পুলিশের আর দেরী হল না।

—'এ গাউনটা চেনেন?' তদন্তকারী অফিসার দোকানীকে প্রশ্ন করলেন।

—'হ্যাঁ, এটা আমার দোকানেরই জিনিস।'

—'গাউনটা কি দু'দিন আগে একটি মেয়ের কাছে বিক্রী করেছিলেন?

—'না, ভাড়া দিয়েছিলাম।'

—'কোথা থেকে জোগাড় করলেন এ পোশাকটা?'

—'বলতে পারব না, কতরকম জিনিসই তো দোকানে আসে।'

—'সে কি! কে কি বন্ধক রাখছে খাতাপত্রে তা লিখে রাখেন না?' অবাক হয়ে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

—'তা ত' লিখে রাখি, তবে যতদূর মনে হচ্ছে ওটা বন্ধকী জিনিস নয়। পোশাকটা আমি কিনেছিলাম।'

—'কিনেছিলেন? কার কাছ থেকে?'

কোন উত্তর না দিয়ে দোকানী চুপ করে রইল।

—'চুপ করে থাকবেন না, এর সঙ্গে একটা মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত আছে।'

—'মৃত্যুর প্রশ্ন?'

—'হ্যাঁ যে মেয়েটি পোশাক ভাড়া নিয়েছিল সে মারা গিয়েছে। মৃত্যুর কারণ বিষ, আর সে বিষ পাওয়া গিয়েছে পোশাকে।'

দোকানীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

—'বলুন, কার কাছ থেকে এ গাউনটা কিনেছিলেন? আপনি এখন চুপ করে থাকলেও ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীর অফিস আপনাকে ছেড়ে দেবে না।'

দোকানী এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেল। অফিসারের দিকে তাকিয়ে ভীরু গলায় সে বলল, 'পোশাকটা আমি কিনেছিলাম একজন 'আণ্ডার-টেকার'-এর—সহকারীর কাছ থেকে। কফিনের ডালায় পেরেক পুঁতবার ঠিক আগে সে মৃতদেহ থেকে গাউনটা খুলে নিয়েছিল'—

হানাবাড়ির অভিশাপ

বেনেট কার্ফ

মিঃ এলিসন হচ্ছেন এমন একজন লোক যিনি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় ব্যাপারটা ঘটল অন্যরকম। যুবকটি যখন বাসে উঠে তাঁর পাশের সীটে এলিয়ে পড়ল তখন মি: এলিসন কিছুতেই আর তার সান্ধ্য-কাগজখানায় মনঃসংযোগ করতে পারলেন না। নিউইয়র্ক থেকে স্ট্যামফোর্ডের পথে মি: এলিসন অনেকবার যাতায়াত করেছেন, কিন্তু এরকম ভেঙে পড়া যাত্রী তিনি কখনও দেখেন নি। যুবকটির হাত সাংঘাতিকভাবে কাঁপছিল, দারুণ আক্ষেপে ওর সমস্ত শরীরে মাঝে-মাঝে খিঁচুনী ধরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ও যেন ওর চারপাশে কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না! এমন কি এখন যে কোথায় রয়েছে সে সম্পর্কেও যুবকটির যেন কোন সচেতনতা ছিল না। মাঝে-মাঝে ও আপনমনে বিড়-বিড় করে কি যেন বলছিল! এ রকম অবস্থায় পাশে বসে খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করা অসম্ভব। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে এলিসন কাগজখানা ভাঁজ করে ফেললেন। এতে যুবকটি যেন কিছুটা আত্মস্থ হয়ে উঠল। সে এলিসনের কাছে নিজের অদ্ভুত আচরণের জন্য ক্ষমা চাইল।

'মাপ করবেন স্যার, আমার আচরণের জন্য আপনি বোধহয় কাগজে মন দিতে পারছেন না। কিন্তু কি করব...আমি এক হতভাগ্য! আমি এক শিকার...হ্যাঁ নিয়তির শিকার...'

নি: এলিসন কোন ভাবেই তাকে উৎসাহিত করলেন না। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে গেলেন যখন দেখলেন তিনি নিজেই যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে যুবকটির কাহিনী শুনছেন।

'আমাকে এ কাহিনী কাউকে বলতেই হবে...এ এক অদ্ভুত রহস্যময় অলৌকিক কাহিনী। আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী...'

—'ন' বছর আগে আমি আমাদের কলেজের এক 'ভ্রাতৃসংঘের' প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলাম,' যুবকটি বলতে লাগল, 'আমাদের ভ্রাতৃসংঘটি ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। কলেজের সবাইকে এর সদস্য পদ দেওয়া হত না। আমাদের সংঘের নিয়ম-কানুন বেশ কড়া ছিল। নিয়ম ছিল প্রতি বছর নতুন ছাত্রদের ভিতর

থেকে মোটে তিনজন ছাত্রকে সংঘের সদস্য করা হবে। এর ফলে আমাদের গোষ্ঠীতে এক ডজনের বেশী ছেলে হত না। আমাদের কাজকর্মে কেউ বাধা দিত না। সবাই স্বীকার করত আমরা হলাম ক্যাম্পাসের সবচেয়ে সেরা এবং সবচেয়ে ডাকাবুকো ছেলে। আমরা কত উঁচু ধরনের ছেলে তা প্রমাণ করবার জন্য আমাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এ চেষ্টার পিছনে বোধকরি আমাদের অবচেতন মনই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে আমাদের দলে সদস্যপদ প্রাপ্তির দীক্ষা ক্রমে জটিল এবং উদ্ভট হয়ে উঠতে লাগল।

আমি যেবার দলের নেতা হলাম, সে বছরও তিনজন নতুন ছেলেকে দলে নেবার ব্যবস্থা করা হল। তিনজন ছেলেকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হল। ঠিক হল চূড়ান্ত পরীক্ষার পর সদস্যপদে দীক্ষা দেওয়া হবে। তা এবারের পরীক্ষাটা কিরকম হবে? পরিকল্পনাটা বোধ করি আমার মাথাতেই প্রথম এসেছিল।

আমাদের কলেজ থেকে পনের মাইল দূরে একটা পরিত্যক্ত পোড়োবাড়ী ছিল। বাড়ীখানার দুর্নাম ছিল হানাবাড়ী বলে। ঠিক হল নতুন ছেলে তিনটিকে অন্ধকার রাতে ঐ হানাবাড়ীতে যেতে হবে এবং সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতে হবে। অবশ্য তিনজন একসঙ্গে যেতে পারবে না। একজন পোড়োবাড়ীতে কিছু সময় কাটিয়ে আসবার পর আরেক জন যাবে।

বাড়ীটা বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত। জানলা দরজার কপাট যে কোন্ কালে উধাও হয়ে গিয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। বাড়ীর ভিতরটা ভিজে স্যাঁতসেতে। বাড়ীখানার গড়ন বেঢপ ধরনের। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে একদা যে লোক এ বাড়ীর মালিক ছিল তার প্রেতাত্মাই নাকি এখনও এ বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়! লোকটা নাকি ছিল মহা পাজী! সে তার স্ত্রী আর দুই শিশু সন্তানকে হত্যা করে। এই অপরাধের জন্য বিচারে তার ফাঁসি হয়, কিন্তু মরে গিয়েও সে জীবিত মানুষকে নিষ্কৃতি দিল না। তার প্রেতাত্মা এ বাড়ীতে আর কোন মানুষকে থাকতে দিল না। আজও নাকি তার অশান্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় এই পরিত্যক্ত পোড়োবাড়ীর ঘরে ঘরে।

এক তারাহারা কালো রাতে নতুন ছেলে তিনটিকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজ রাতেই ওদের সাহসের পরীক্ষা হবে। সেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই ওরা আমাদের সংঘের সভ্যপদ পাবে। পথে যেতে যেতে আমরা ছেলে তিনটিকে একটার পর একটা আতঙ্কময় অলৌকিক কাহিনী শোনাতে লাগলাম। শুনতে শুনতে ওদের মন নিশ্চয়ই শঙ্কাতুর হয়ে উঠল। এই শঙ্কাকে কাটিয়ে ওরা পোড়োবাড়ীতে ঢুকতে পারে কিনা তারই তো পরীক্ষা করা হবে।

তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ ছেলেটিকে প্রথমে বাছলাম। ওকেই প্রথম

হানাবাড়ীতে যেতে হবে। ও একজন বিখ্যাত উপন্যাসিকের ছেলে। ওর বাবা আগের বছর 'পুলিৎজার প্রাইজ' পেয়েছিলেন সাহিত্যকর্মের জন্য। ছেলেটিও অসাধারণ মেধাবী। ওকে প্রতিভাশালীর পর্যায়েও ফেলা যায়। ওর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ও খুব ভয় পেয়েছে। কিন্তু এই ভয়ের ভাবটা যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্য ও আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

আমাদের সামনেই পোড়োবাড়ীটা। অন্ধকারের মধ্যে আরো অন্ধকারের মতো পোড়োবাড়ীখানা যেন এক শিকারী দানবের মতো ওঁত পেতে বসেছিল। যেন অকথিত স্বরে বলছিল 'ম্যাঁয় ভুখা হুঁ'।

ছেলেটিকে বললাম, 'এবার তোমাকে একলা ঐ বাড়ীখানার মধ্যে যেতে হবে। বেশীক্ষণ নয়, আধ ঘণ্টা থাকতে হবে ওখানে।'

ঠোঁট টিপে যেন মনের ভয়কে জয় করবার চেষ্টা করল ছেলেটি। তারপর পা বাড়াল অন্ধকার বাড়ীখানার দিকে। আমরা বাকী ক'জ'নে মিলে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে তার চারপাশে গোল হয়ে বসলাম। টেড্ উইলিয়ম্‌স সঙ্গে করে তার গীটারটা এনেছিল। বাজনার সঙ্গে আমরা সবাই গান ধরলাম। না সবাই নয়, বাকী নতুন ছেলেদু'টি আমাদের গান বাজনায় অংশ নিল না। তারা গম্ভীরভাবে এক কোণায় চুপচাপ বসে রইল। দু হাঁটু উঁচু করে দু'হাত নিয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে রইল ওরা।

আমি নিজে ছেলেটাকে পোড়োবাড়ীখানায় ঢুকতে দেখেছি। আমরা যেখানে আগুন জ্বালিয়ে বসেছিলাম সেখান থেকে বাড়ীখানা প্রায় দু'শ গজ দূরে। ছেলেটাকে বলেছিলাম বাড়ীর মধ্যে আধঘণ্টা থেকে আমাদের কাছে ফিরে আসতে। কিন্তু দেখতে দেখতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল। ছেলেটা ফিরে এল না। আমার মনে অস্বস্তি দেখা দিল। এই বোধহয় আমার অস্বস্তির শুরু।

—'ছেলেটা আমাদের সঙ্গে চালাকী করছে। ও ফিরে আসুক, ওকে মজাটা দেখাচ্ছি। দমবাজি করবার আর জায়গা পায়নি!'

নতুন ছেলেদের মধ্য থেকে দ্বিতীয় ছেলেটিকে এবার পাঠালাম। ওকে বললাম, 'ফিরবার সময় তোমার বন্ধুটিকে ধরে নিয়ে আসবে, বলবে, এরকম মজা করবার কোন অর্থ হয় না। আমরা খুব রেগে গিয়েছি।'

কোন কথা বলল না ছেলেটি। মাঠ পেরিয়ে অন্ধকার পোড়ো বাড়ীতে ঢুকল সে। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় ওকে ভাঙা ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেখলাম। দশ মিনিট কেটে গেল। কিছুই ঘটল না। কোথাও কোন শব্দ নেই। চারপাশ নিঝুম—নিস্তব্ধ! অগ্নিকুণ্ডের আগুন নিভু নিভু হয়ে আসছে। উইলিয়মস্ আর বাজাচ্ছে না, গীটারকে সরিয়ে রেখেছে একপাশে। আমরা বসে আছি। লক্ষ্য রাখছি

বাড়ীখানার দিকে। ছেলে দুটির জন্যে অপেক্ষা করছি।

অগ্নিকুণ্ডের আগুন আরো কমে এল। চারপাশে যেন নেমে আসতে লাগল অন্ধকারের কালো যবনিকা। মনের আকাশে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ জমতে লাগল। আমাদের সবাইকার মুখই ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল।

আঁধারদেহী অতিকায় দানবের মতো বাড়ীখানা কি আমাদের দুই নতুন সঙ্গীকে গ্রাস করে ফেলল! এরকম একটা অবাস্তব অদ্ভুত চিন্তা-ই যেন আমাদের সবাইকার মন আচ্ছন্ন করে ফেলল।

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'হতভাগা ছেলে দুটো! জাহান্নামে যাক ওরা! ওরা এত চালাক যে নিজেদের ভালও বোঝে না।'

তারপর তৃতীয় নতুন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ডেভিস এবার তুমি যাও। আগে ঐ হতভাগা দু'টোকে বাড়ীর বাইরে বের করে নিয়ে এস। মিথ্যে জাঁক দেখাবার চেষ্টা করলে কিন্তু তোমার জ্যান্ত শরীর থেকে চামড়া খুলে নেব।'

ডেভিসকে আমাদের সংঘের সদস্যপদ দেওয়া হোক—আমরা সবাই এটা চাইছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি ওর মতো ছেলে পাওয়া দলের পক্ষে ভাগ্যের কথা। ও দেখতে সুন্দর, ওর ওজন দু'শ পাউণ্ড। ডেভিসের লেখাপড়ার রেকর্ডও চমৎকার। এটা প্রায় নিশ্চিত যে আগামী বৎসরের সমগ্র আমেরিকার কৃতি ছাত্রদের তালিকায় ওর নাম স্থান পাবে। কি লেখাপড়ায়—কি খেলাধুলায়, ডেভিসের জুড়ি পাওয়া মুশকিল। এ হেন একটি ছেলে আমাদের সংঘে আসুক এটা আমরা সবাই চাইলেও নিজেদের নিয়মকানুনগুলোকে তো অগ্রাহ্য করতে পারছিলাম না। কাজেই পরীক্ষা না করে ওর মতো ছেলেকেও সদস্যপদে দীক্ষিত করা যাচ্ছিল না। ডেভিস ইতিমধ্যেই নতুন ছেলেদের ক্লাসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল।

—'আমি ঐ বদমাস দু'টোকে এক্ষুণি বের করে নিয়ে আসছি,' দাঁত বের করে হেসে ডেভিস বলল।

আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে ওর কণ্ঠস্বর শুনলাম। প্রথম আর দ্বিতীয় ছেলেদুটোকে উদ্দেশ্যে করে ও ডাক দিল, 'এই বোকারামেরা, বেরিয়ে আয়; আর মজা করতে হবে না!'

নতুন তিনজনই একে একে হানাবাড়ীতে ঢুকল। নিভু নিভু আগুনের পাশে আমরা বসে রইলাম। দশ মিনিট কেটে গেল। কিন্তু এই দশটা মিনিটকে এক ঘণ্টা বলে মন হল।

'এবার তাহলে আমাকেই যেতে হয়,' আমি বললাম, 'ছোঁড়াদের একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। সিনিয়র ছাত্রদের সঙ্গে ভবিষ্যতে এরকম ইয়ার্কি যাতে করতে না পারে, সেটা ওদের ভাল করেই সমঝে দেওয়া দরকার।'

আমার সঙ্গীরা কোন কথা বলল না। আগুনের পাশ থেকে উঠে আমি ধীরে ধীরে পা চালালাম পোড়ো বাড়ীখানার দিকে।

ভাঙা ফটক পেরিয়ে আমি হানাবাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম। প্রথম যে জিনিসটা আমায় আঘাত করল, তা হল একটা গন্ধ—একটা অতি বাসি, অতি পুরানো গন্ধ। পুরানো বইপত্তর আর খবরের কাগজে ভরা পরিত্যক্ত চিলেকোঠায় এ ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়!

ছেলে তিনটের নাম ধরে চীৎকার করে ডাকলাম। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। সঙ্গে 'ফ্লাশলাইট' ছিল, প্রত্যেক ঘরের প্রতিটি কোণায় আলো ফেললাম। কিন্তু না, কোথাও ওরা নেই। কোথায় গেল ছেলে তিনটে? দারুণ অস্বস্তিতে মনটা ভরে গেল। স্বীকার করতে লজ্জা নেই অন্ধকার হানাবাড়ীতে এসে গা-টাও একটু ছম-ছম করছিল। বাড়ীখানা একেবারে কবরভূমির মতো নিস্তব্ধ!

কিন্তু না একেবারে নিস্তব্ধ নয়। ট্যাপ....ট্যাপ.....ট্যাপ.....একটা অস্পষ্ট শব্দ আসছে মাথার উপরে—ছাদের দিক থেকে। পোড়োবাড়ীতে ক্রমাগত ঐ শব্দ শুনতে শুনতে মনটা দারুণ আতঙ্কে ভরে গেল। এ মানসিক আতঙ্কটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। ভয়কে জয় করে উপরে উঠে দেখতে হবে ওটা কিসের শব্দ! ঘুণে ধরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। পায়ের চাপে সিঁড়িতে মচ্ মচ্ শব্দ হতে লাগল। দোতলায় উঠে সিঁড়ি শেষ হয়ে গিয়েছে, ছাদে যেতে হলে মই বেয়ে উঠতে হবে। মই একখানা আছে বটে, কিন্তু তার অবস্থা শোচনীয়। সবগুলো ধাপ পর্যন্ত নেই। কি আর করব, দুরু দুরু বুকে সেই ভাঙা মই দিয়েই ছাদে উঠলাম।

বিরাট ছাদের এক প্রান্তে চিলেকোঠাখানা। ছাদে কোন লোক নেই। ট্যাপ ট্যাপ শব্দটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শব্দটা আসছে চিলেকোঠার ভিতর থেকে। শয়তান তিনটে তাহলে ওখানে ঢুকে আমাকেই পাল্টা ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। ভয়ের জায়গায় এল ক্রোধ।

'এই বেরিয়ে আয়...বেরিয়ে আয় তোরা।' কিন্তু আমার চীৎকার করাটাই সার হল, কেউ কোন সাড়া দিল না। দারুণ রেগে আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম। কিন্তু দরজা খুলল না,—ভিতর থেকে বন্ধ। বাঁদরগুলো তাহলে আগেভাগেই পরিকল্পনা করে আসরে নেমেছে। এ বাঁদরামির মজাটা ওদের হাড়ে-হাড়েই বুঝিয়ে দিতে হবে।

ছোট ঘরখানায় একটা 'স্কাইলাইট' রয়েছে। ভাঙা মইখানা টেনে এনে স্কাইলাইটের নীচে পাতলাম। তারপর মই বেয়ে উঠে তাকালাম ঘরের মধ্যে। বলা

বাহুল্য ফ্লাশলাইটটা আমার সঙ্গেই ছিল। আলো ফেললাম ঘরের মধ্যে।

'ঐ তো...ঐ তো ডেভিস! উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ছোকরাটা। ওর মাথার চুল বরফের মতো সাদা! চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত। মণি দুটো ঘুরছে। এতো সুস্থ মানুষের চোখ নয়। ওর চোখে তো বদ্ধ পাগলের দৃষ্টি! পাগল হয়ে গিয়েছে...হ্যাঁ, একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে ডেভিস, ওর হাতে একখানা রক্ত-মাখা হাতুড়ি। সেই হাতুড়ি দিয়ে ও টিনের নীচু দেয়ালে মাঝে মাঝে আঘাত করছে। অর্থহীন ছন্দহীন সেই আঘাত। এই আঘাতের শব্দই আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

চীৎকার করে ওকে ডাকলাম। কিন্তু আমার ডাক যেন শুনতেই পেল না ডেভিস। আমার দিকে ও ফিরেও তাকাল না। আপনমনে রক্তমাখা হাতুড়ি দিয়ে ঘরের টিনের দেওয়ালে আঘাত করতে লাগল।

কোনরকমে হানাবাড়ী থেকে বেরিয়ে সঙ্গীদের কাছে ছুটে গেলাম। তারপর সবাই মিলে চিলেকোঠা থেকে উন্মাদ ডেভিসকে নামিয়ে আনলাম। পরদিন সকালে কলেজ হাসপাতালে ও মারা গেল। মরবার আগে ও একটি কথাও বলে যেতে পারল না। কাজেই ও কি দেখেছে বা শুনেছে তার কিছুই জানা গেল না। অন্য দুটো ছেলে? তাদের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। বুভুক্ষু হানাবাড়ী যেন তাদের গ্রাস করে ফেলেছে...'

মিঃ এলিসন নিজের আসনে বসে অস্থির হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন না ছেলেটা একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছে কিনা। যুবকটা যে হতাশার ফলে মরিয়া হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লোকটা কি মাতাল না অন্য কোন মাদকদ্রব্যে আসক্ত নেশাখোর। ওর নিজের কাহিনী অনুসারেই এ ঘটনা ঘটেছিল ন' বছর আগে। নিশ্চয়ই এই দীর্ঘ ন' বছর ধরে এরকম মানসিক অবস্থায় ও থাকেনি! যে প্রশ্নটা মনের ভিতর জেগে উঠেছিল, সেটার উত্তরও পেয়ে গেলেন মিঃ এলিসন।

তার দিকে জ্বলজ্বল চোখ দুটি মেলে যুবকটি বলল, 'ঘটনাটা ঘটেছিল ন' বছর আগে, আর নতুন ছেলে তিনটিকে বাদ দিলে দলে ছিলাম আমরা ন'জন। সেই থেকে প্রতি বৎসর ঐ তারিখে আমাদের মধ্যে একজন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। সে অর্থহীন আবোল-তাবোল বকতে থাকে। রক্তমাখা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে থাকে ঘরের মেঝেতে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।

—'কাল, হ্যাঁ কালকেই হল সে রাতের ঘটনার নবম বার্ষিকী,' নীচু গলায় বাহুল্যবর্জিত ভাষায় যুবকটি বলল, 'সে রাতে যারা নতুন ছেলে তিনটিকে নিয়ে হানাবাড়ী অভিযানে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি....।'

সশঙ্ক শয়তান

ফ্রেডরিক ব্রাউন

নরক!...সেখানে শয়তানের প্রাসাদ পাণ্ডেমোনিয়াম। প্রাসাদে নিজের খাস কামরায় বসে আছেন শ্রীশয়তান। স্বর্গে দাসত্ব করবার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা ঢের ভালো—শয়তানের তাই ধারণা। আলো ঝিকিমিকি ডেস্কটার উপর ঝুঁকে পড়লেন শয়তান। খুট্ করে ইণ্টারকমের সুইচটা টিপলেন।

—'হ্যাঁ স্যার, বলুন।'

লিলিথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সে হল শয়তানের ব্যক্তিগত সচিব।

—'আজকে ক'জন এসেছে? শয়তান প্রশ্ন করলেন।

—'বেশী নয়, মোটে চারজন স্যার। ওদের একজনকে ভেতরে আপনার কাছে পাঠাব?'

—'হাঁ, পাঠাও...আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর।'

—'ঠিক আছে স্যার।'

—'ওরা এখন কোথায়?'

—'আমার কামরায় বসে আছে।'

—'তুমি ওদের মোটামুটি পরীক্ষা করে দেখেছ?'

—'হ্যাঁ স্যার।'

—'আচ্ছা, তোমার কি ওদের মধ্যে কাউকে একেবারে...স্বার্থপরতাহীন বলে মনে হয়েছে?'

—'একজনকে মনে হয়েছে।'

—'বল কি!' শয়তান চমকে উঠলেন।

—'কিন্তু তাতে কি হয়েছে স্যার? চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এক বিলিয়ন বা একশ' কোটি লোকের মধ্যে হয়ত একজন চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। আর সে ইচ্ছার সঙ্গেও স্বার্থের কোন সম্পর্ক থাকা চলবে না। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে হবে সেই ইচ্ছাকে। তাই তো?'

—'হ্যাঁ, তাই!' চূড়ান্ত ইচ্ছা এই শব্দ দু'টি শুনে নরকের অসহনীয় উত্তাপের মধ্যেই শ্রীশয়তান কেঁপে উঠলেন। শয়তানের মনে সব সময়ই এই দুশ্চিন্তা—কোনদিন কোন একজন হয়তো তার কাছে এমন এক চূড়ান্ত ইচ্ছার কথা বলবে

যে ইচ্ছার সঙ্গে স্বার্থপর কোন সম্পর্কই নেই। আর সেদিন—!'

হ্যাঁ, সেদিনই আসবে শয়তানের অমর জীবনে দারুণ বিপর্যয়। কি হবে? শয়তান শৃঙ্খলিত হয়ে পড়বেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে কাটাতে হবে সুদীর্ঘ এক হাজার বছর। হাজার বছর পরে শৃঙ্খল মোচন হলেও শাশ্বত কালের অনাগত দিনগুলিতে শয়তান হয়ে পড়বেন কর্মহীন। তাঁর কাছে আর কেউ আসবে না। অসহ্য! অসহ্য! অসহ্য সেই অবস্থার কথা শ্রীশয়তান ভাবতেও পারেন না।

কিন্তু সে সম্ভাবনা তো ক্ষীণ....অতি ক্ষীণ....এক বিলিয়ন লোকের মধ্যে একজনের সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা-বর্জিত চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করা...আবার কেঁপে উঠলেন শ্রী শয়তান।

না, এসব কথা ভেবে অনাবশ্যক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। লিলিথ ঠিকই বলেছে, সম্ভাবনা ক্ষীণ, খুবই ক্ষীণ। এটা অসম্ভব বললেও বোধহয় বাড়িয়ে বলা হবে না। মানুষ কখনও স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠতে পারে না।

আপনমনে এ কথাগুলো বলে শ্রীশয়তান নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিলেন।

হাজারে একজন লোক শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রী করে। এরা আত্মা বিক্রী করে ইচ্ছাপূরণের জন্য। শয়তান ইহজগতে এদের ইচ্ছাপূরণ করেন। তাঁর বদলে মৃত্যুর পর এদের আত্মা আসে শ্রী শয়তানের অধিকারে, ঐ আত্মাদের হয় অনন্ত নরকবাস। এদের ভিতরে কেউ কেউ যে স্বার্থহীন ইচ্ছা প্রকাশ করে না তা-ও নয়। কিন্তু সেসব স্বার্থহীন ইচ্ছাও তুচ্ছ, চূড়ান্ত ইচ্ছার ধারে-কাছেও তা যেতে পারে না। হয়তো আরও লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যাবে। শ্রীশয়তানের কাছে কেউ চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। হয়ত এই চিরন্তন কালপ্রবাহে কোনদিনই কেউ সে ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। এখন পর্যন্ত যারা শ্রীশয়তানের কাছে ইচ্ছাপূরণের জন্য আত্মা বিক্রি করতে এসেছে তারা সেই বিপজ্জনক ইচ্ছার ধারে-কাছে যেতে পারেনি। অতএব শ্রীশয়তান নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আবার ইন্টারকম-এর সুইচটা টিপলেন শ্রীশয়তান।

—'বলুন স্যার,' লিলিথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—'ঠিক আছে লিল্, একজন করে পাঠাও।'

—'এক্ষুণি পাঠাচ্ছি স্যার।'

—'শোন, যে লোকটিকে তোমার স্বার্থপর বলে মনে হয়নি তাকেই আগে পাঠাও। তার সঙ্গে কারবারটাই আগে শেষ করি।'

—'ঠিক আছে স্যার।'

শ্রীশয়তান আর একটা সুইচ টিপলেন। লিলিথের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হল!

যে লোকটি বিশাল দরজা পথে শ্রীশয়তানের খাস কামরায় এসে ঢুকল তাকে দেখে কিন্তু মোটেই বিপজ্জনক বলে মনে হল না। লোকটি বেঁটে। ওকে দেখলেই মনে হয় যেন খুব ভয় পেয়েছে। শ্রীশয়তান ভ্রূকুটি করলেন। লোকটির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—

—'তুমি কোথায় এসেছ জান?'

—'জানি,' মৃদুস্বরে লোকটি উত্তর দিল।

—'কার কাছে এসেছ জান?'

—'জানি,' ভীরু গলায় লোকটি বলল।

—'তুমি শর্তের কথা জান?'

—'হ্যাঁ,' বেঁটে লোকটি বলল, 'অন্ততঃ আমার ধারণা শর্তটা ভালোভাবেই বুঝেছি।'

—'কি বুঝেছ?'

—'আমি আপনাকে আমার একটা ইচ্ছার কথা বলব। আপনি আমার ইচ্ছাপূরণ করবেন, বিনিময়ে আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মা আপনার করতলগত হবে...এই তো?'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছ। এইবার বল তোমার কি ইচ্ছা? আমার কাছ থেকে তুমি কোন্ ইচ্ছাপূরণের বর চাও!'

—'মানে'....,' বেঁটে লোকটি বলতে লাগল, 'আমি অনেক ভাবনা-চিন্তা করে, অনেক সতর্কতার সঙ্গে আমার ইচ্ছাটা ঠিক করেছি এবং তারপর আবার অনেক...'

—'থাম, কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনতে চাই না, আমার সময়ের দাম আছে। বল তোমার ইচ্ছা কি?'

—'মানে তাহলে...তাহলে বলেই ফেলি ইচ্ছাটার কথা।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেই ফেল।' অধৈর্যের সুরে শয়তান বললেন।

—'ইচ্ছা পূরণ করবেন তো?'

—'নিশ্চয়ই।' গম্ভীর গলায় শ্রীশয়তান বললেন।

—'তাহলে বলি! আমার মধ্যে কোন পরিবর্তন না এনে আপনি আমাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে দুষ্ট, সবচেয়ে নির্বোধ আর সবচেয়ে দুঃখী মানুষে পরিণত করুন। এটাই আমার চূড়ান্ত ইচ্ছা।'

দারুণ আতঙ্কে শ্রীশয়তান আর্তনাদ করে উঠলেন তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

কবরের অভিশাপ

কাউণ্ট লুই হ্যামন

বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ নিপো কিরো একদিন নিজের বাড়ীতে বৈঠকখানায় বসে কাগজপত্র দেখছিলেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পরিচয়-পর্বের মধ্য দিয়ে কিরো জানতে পারলেন যে ভদ্রলোক আমেরিকাবাসী এবং তাঁর নাম হল হেনরী। শেয়ারের বাজারে দালালি করে ভদ্রলোক প্রচুর টাকা আয় করেছেন।

ভদ্রলোককে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হল। কিরো আন্দাজ করলেন নিশ্চয়ই কোন সমস্যায় পড়ে উনি তাঁর কাছে এসেছেন। কিন্তু সমস্যাটা খুলে বলতে তিনি যেন কুণ্ঠাবোধ করছেন। তাকে উৎসাহ দিয়ে কিরো বললেন,

—'বলুন, আপনার সমস্যাটা কি?'

—'আমি যে সমস্যায় পড়েছি, একথা আপনাকে কে বলল?' ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—'আপনিই বললেন।' মৃদু হেসে কিরো উত্তর দিলেন।

—'আমি'! ভদ্রলোক আরও বিস্মিত।

—'হ্যাঁ, আপনি নিজে না বলুন আপনার মুখ-চোখের ভাব কিন্তু সে কথাই বলছে।'

—'তাহলে এতদিনে আমি বোধহয় ঠিক জায়গায়ই এসেছি।' হেনরীর গলার স্বরে স্বস্তির সুর পাওয়া গেল।

—'এবার বলুন আপনার সমস্যাটার কথা, ইতস্ততঃ করবার কোন কারণ নেই।' কিরো ভদ্রলোককে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলেন।

—'আচ্ছা মি ঃ হ্যামণ' (কিরোর আসল নাম কাউণ্ট লুই হ্যামন। 'কিরো' হ'ল ছদ্মনাম।), আপনি তো দীর্ঘকাল প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে বহুকাল আগে মৃত কোন ব্যক্তির আত্মা প্রতিশোধ নেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠতে পারে?'

—'এ প্রশ্ন করছেন কেন?'

—'কারণ আছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক। বোধহয় যেসব কথা বলবেন সেগুলি

গুছিয়ে নিলেন মনে মনে তারপর সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে বললেন;

—'আমি কেবল দালালি করেই এ যাবৎ জীবন কাটাইনি, কিছুটা পড়াশুনাও করেছি। প্রাচীন ইতিহাস, বিশেষ করে প্রাচীন মিশরের ইতিহাস, ছেলেবেলা থেকেই আমার মনকে টেনেছে। মিশর সম্পর্কে কিছু দামী আর দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্রও আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে রয়েছে। কিন্তু শুধু বই পড়েই আমি তৃপ্ত হতে পারলাম না। স্বপ্নের দেশ মিশরকে চাক্ষুষ দেখবার জন্য আমি মিশরের পথে পাড়ি দিলাম।'

ভদ্রলোক থামলেন।

—'মিশর এবং তার প্রাচীন বিদ্যা সম্পর্কে আমার মনেও খুব কৌতূহল,— আমিও মিশরে গিয়েছিলাম।' কিরো বললেন।

—'তাই নাকি! তাহলে তো ভালই হল। দেখুন তো এ জিনিসটা চিনতে পারেন কি না?'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করলেন, তারপর প্যাকেট খুলে বের করলেন একখানা মূল্যবান হীরে। আলোর স্পর্শে হীরেখানা জ্বলজ্বল করে উঠল।

শুধু প্রেততত্ত্ব নয়, পুরাতত্ত্ব নিয়েও কিরো অনেক গবেষণা করেছেন। দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ওখানা মিশরীয় হীরে। মিশরের কোন ফ্যারাও-এর[২] ম্যমীর দেহের ব্যাণ্ডেজের বুকের কাছে হীরেখানা 'সিল' হিসেবে লাগান হয়েছিল। হীরেখানাকে কাটা হয়েছে এমনভাবে যে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন একটা বাদুড়ের মুখ। হীরেখানার এইরকম বিশেষ গড়ন দেখে কিরো বুঝতে পারলেন যে ওখানা ফ্যারাও 'খুফু'র বংশের কোন নরপতির সমাধি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কেননা ঐ বংশই অর্থাৎ মিশরের চতুর্থ রাজবংশই সাদা বাদুড়কে প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করত।

হেনরীর দিকে তাকিয়ে কিরো বললেন, 'জিনিসটা কি তা আমি বুঝতে পেরেছি। এর তাৎপর্যও আমার অজানা নয়। এখন প্রশ্ন হল জিনিসটা আপনার হাতে এল কি করে?'

কিরোর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উত্তেজিতভাবে হেনরী বলল, 'জানেন, এই অভিশপ্ত হীরেখানা আমাকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। আমার স্ত্রী অপঘাতে মারা গিয়েছেন, আমার প্রিয় বন্ধু আত্মহত্যা করেছে, আমার টাকা পয়সা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজেই হাত দিচ্ছি, আসছে কেবল ব্যর্থতা আর অসাফল্য। আমাকে ....হ্যাঁ আমাকেও হয়ত শেষ পর্যন্ত মান-সম্মান বাঁচাবার জন্য আত্মহত্যার

পথ বেছে নিতে হবে।'

উত্তেজিতভাবে এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে হেনরী হাঁফাতে লাগলেন।

—'কি করে হীরেখানা আপনার হাতে এল তা কিন্তু আপনি এখনও বলেন নি। আপনি সব কথা খুলে বলুন; আমি সাধ্যমতো আপনাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করব।'

কিরোর কথায় কিছুটা স্বস্তি পেলেন হেনরী। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আমার সব কথা আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু যা বলছি তার প্রতিটি কথা সত্য।'

—'অবিশ্বাস করব কেন? বলুন আপনার কাহিনী।'

—'আগেই বলেছি কিছুদিন আগে আমি মিশরে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি কেবল আলেকজান্দ্রিয়া আর কায়রোর বিলাসবহুল হোটেলে বসে দিন কাটাইনি। কর্ণাক, মেসফিস, থিবিস, পুক্সর ইত্যাদি প্রাচীন শহরে ঘুরেছি—ঘুরেছি মৃতের উপত্যকায়। ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো পিরামিড আমি দেখেছি।

'এসময় একদিন শুনলাম একটা পুরানো সমাধিভূমি নাকি খোঁড়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই আমি খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম যেখানে খনন হচ্ছে সেখানে অবশ্যই যেতে হবে কিন্তু ক'দিন বাদেই খবরের কাগজে একটা সংবাদ প্রকাশিত হল। যে জার্মান পণ্ডিত খনন কার্য পরিচালনা করছিলেন এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর নাকি মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় লোকদের ধারণা সমাধিভূমির গোপনীয়তা এবং পবিত্রতা নষ্ট করবার জন্যই ঐ জার্মান পণ্ডিতের উপর কবরের অভিশাপ নেমে এসেছে। ঐ সমাধি এখন যে খনন করবার চেষ্টা করবে তারই প্রেতাত্মার অভিশাপে অপঘাতে মৃত্যু হবে।

'ভগবানের দয়ায় আমার টাকার অভাব ছিল না। ঠিক করলাম জার্মান পণ্ডিতের আরব্ধ কাজ আমিই শেষ করব। 'কবরের অভিশাপ' জাতীয় কুসংস্কারে আমার কোন বিশ্বাস ছিল না।

'কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই মুশকিলে পড়লাম। মুশকিলটা হল কুলি-মজুর জোগাড় করা। স্থানীয় কোন শ্রমজীবিই সমাধিভূমি খননে রাজী হল না, ওদের মনে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে খুঁড়বার চেষ্টা করলে ওরাও মারা পড়বে।

—'আমার স্বভাবটা হল এই যে, যে কাজে আমি একবার হাত দিই, তা থেকে আর পিছিয়ে আসতে পারি না। কুলি মজুরদের ভয় দেখে আমার জিদ্‌টা যেন আরো বেড়ে গেল। অনেক টাকা খরচ করে অন্য জায়গা থেকে শ্রমিক এনে

আমি আবার সমাধি খনন শুরু করলাম। বেশীর ভাগ কাজ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, কাজেই আমাকে আর খুব বেশী খোঁড়াখুঁড়ি করতে হল না। কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা সমাধিকক্ষের বন্ধ দরজার সামনে এসে গেলাম।

এই কক্ষের মধ্যেই রয়েছে প্রয়াত ফ্যারাও-এর ম্যমী! এই দরজা খুলে এবার ভিতরে ঢুকতে হবে! এ পর্যন্ত কোন দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়নি আমাদের। কুলি-মজুরদের মনোবলও রয়েছে অটুট।

কিন্তু এই মনোবল অটুট রইল না যখন সমাধিকক্ষের দরজা খুলবার নির্দেশ দিলাম। কুলি-মজুরেরা এবার পিছিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে চার-পাঁচজন কুলিকে দরজা খুলবার কাজে লাগানো গেল। কিন্তু কথা দিতে হল তাদের আমি সমাধিকক্ষের ভিতরে ঢুকতে বলতে পারব না। দরজা ভাঙা হলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

'দরজা খুলল। আমি একাই ঢুকলাম সমাধিকক্ষে। দরজায় যে লিপি ছিল তা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে এই কক্ষই হল ফ্যারাও চতুর্থ 'খুফু'র শেষ বিশ্রামস্থল। মিশরীয় বিশ্বাস অনুসারে ওসাইরিসের' দরবারে শেষ বিচারের পূর্ব পর্যন্ত প্রয়াত ফ্যারাওকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।'

'স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, অন্ধকার সমাধিকক্ষে ঢুকে গা-টা কেমন ছমছম করতে লাগল! একবার মনে হল এরকম দুঃসাহস না করলেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ের ভাবটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম। আমি বিশ শতকের মানুষ, এসব প্রাচীন অযৌক্তিক কুসংস্কারে বিশ্বাস করব কেন! সঙ্গে টর্চ ছিল, বিশাল সমাধিকক্ষ। আমার টর্চের আলোয় সমস্ত ঘরটা দেখা গেল না। আলো আধো, আধো ছায়া। আলো-আঁধারীর লুকোচুরি যেন সমাধি-কক্ষের রহস্যময়তাকে আরো অনেক বাড়িয়ে দিল।

'টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগোলাম। বিশাল ঘরখানার মাঝামাঝি একটা উঁচু বেদী। তার উপরে একটা সোনার কফিন। ঐ কফিনের মধ্যেই চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন ফ্যারাও চতুর্থ খুফু। কফিনের পাশে একটা স্বর্ণ-পাত্রে নানারকম মূল্যবান মণি-মাণিক্য। দু'হাত ভরে সেই মণি-মাণিক্য তুলে পকেটে পুরলাম। মুহূর্তের জন্য মনে হল সমাধি-কক্ষের পাথুরে মেঝে যেন থরথর কেঁপে উঠল! চমকে উঠলাম! একি ভূমিকম্প! না না, এ আমার মনের ভুল! আমার আচ্ছন্ন মনের কল্পনা!

'পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম কফিনটার কাছে। তালা খুলে ফেললাম। আমার চোখের সামনে সাদা আবরণের ঢাকা ফ্যারাও চতুর্থ খুফুর ম্যমী। ম্যমীর বুকের

কাছে এই হীরেখানা 'সিল'-এর মতো লাগান। একটানে হীরেখানা খুলে ফেললাম।

'আচম্বিতে সমাধিকক্ষের পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। মনে হল হাজার হাজার বাদুড় যেন ডানা ঝটপট করতে করতে হিংস্রভাবে আমার দিকে উড়ে এল। মুহূর্তের জন্য বাদুড়গুলিকে যেন আমি দেখতে পেলাম। সাদা রঙের বাদুড়গুলোর চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে পরলোকের নীলাভ আলোক-রশ্মি। হাজার হাজার বাদুড়ের ডানার শব্দে বিশাল সমাধিকক্ষটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

'আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে আতঙ্কের একটা তুহিন-শীতল স্রোত যেন বয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য সমস্ত শরীরটা যেন অসাড় হয়ে গেল। বাদুড়গুলো যেন শূন্যপথে চক্রাকারে ঘুরছে আমার চারপাশে।

কোনরকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ছুটে সমাধিকক্ষের বাইরে চলে এলাম। লাখো লাখো সাদা বাদুড় যেন আমাকে তাড়া করে এল। ছুটতে ছুটতে কি করে যে তাঁবুতে এসে পৌঁছলাম, তা একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন।

তাঁবুতে ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরতে আমার সঙ্গীরা আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিল। হোটেলে আমার স্ত্রী ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকতে স্ত্রী চমকে গিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার, তোমার সঙ্গে যেন একটা বাদুড়ের ছায়া ঘরে ঢুকল!'

ওঁর কথা শুনে আরও ঘাবড়ে গেলাম। কোন কথা না বলে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। ঘরের ভিতর তাকাতেও আমার ভয় করছিল! যদি বাদুড়ের অপছায়াটা আমার নজরে আসে।

পিরামিডের ভিতরে ঢুকবার সাহস আর আমার হয়নি।

আমার শঙ্কা-বিহ্বল ভাব দেখে স্ত্রী বললেন, 'চল, আমরা এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।'

তাঁর কথামতো পরদিনই আমরা অন্য জায়গায় চলে গেলাম। ভাবলাম এ জায়গাটা ছেড়ে গেলে মন থেকে ভয়ের ভাবটা হয়ত ধীরে ধীরে কেটে যাবে।

কিন্তু তা আর কাটল কই! যেখানেই যাই সেখানেই এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠি। ভয় জিনিসটা বোধহয় সংক্রামক। আমার আতঙ্ক আমার স্ত্রীকেও যেন পেয়ে বসল। সব সময়েই মনে হয় কোন এক অদৃশ্য অজানা শত্রু সবজায়গায়ই আমাদের অনুসরণ করে চলেছে। মাঝে মাঝে বাদুড়ের ডানার আওয়াজ পাই। হাজার হাজার বাদুড় যেন শূন্যপথে উড়ে আসছে ঝাপটা মারবার জন্য। আমাদের ভয় দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। এই নিদারুণ আতঙ্কের কবল থেকে যে কি করে নিষ্কৃতি পাব তা ভেবে পেলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড সত্ত্বেও সমাধিকক্ষ থেকে সংগ্রহ করা ম্যমীর বুকের মূল্যবান হীরেখানা আমি হাতছাড়া করলাম না। সবসময় এখানা লুকিয়ে রাখলাম নিজের পোশাকের মধ্যে—বুকের কাছে। আমার স্ত্রীকেও হীরেটা সম্পর্কে কিছুই বলি নি। অবশ্য বলবার সুযোগও আর পেলাম না। কারণ ক'দিন পরে একদিন ভোরবেলায় বিছানায় পাওয়া গেল তাঁর মৃতদেহ। রহস্যজনক মৃত্যু! কিসে যে উনি মারা গেলেন তা ডাক্তারী পরীক্ষায়ও বোঝা গেল না!'

'শুরু হল আমার দুর্ভাগ্যময় জীবন। পর পর এক-একটা দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। আমার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। অথচ তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে আমার ব্যবসা দেখাশোনা করবার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। অনেক টাকাকড়ি নষ্ট করে সে শেষ পর্যন্ত লজ্জায় এবং দুঃখে আত্মহত্যা করল। আর....আর আমারও মনে হতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বাদুড় যেন সবসময়ই ডানা ঝট্‌পট্ করতে করতে আমার চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। আগে এই ভয়ংকর অনুভূতিটা মাঝে মাঝে হত, এখন সব সময়েই হয়......এই মুহূর্তেও হচ্ছে। বুঝতে পারছি আমার শেষের দিন আসন্ন হয়ে আসছে........অন্ধকার কবরের কালো অভিশাপ নেমে এসেছে আমার উপর। এর কবল থেকে আমার কি নিষ্কৃতি নেই মিঃ হ্যামন?'

একটানা এতক্ষণ কথা বলে হেনরী হাঁফাতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল থরথর করে। কিরো ভাবলেন এক্ষুনি কিছু একটা অ[illegible]ন না ঘটে যায়।

না, সেরকম কিছু অবশ্য ঘটল না। একটু পরেই হেনরী নিজেকে অনেকটা সামলে নিলেন; কিরোর টেবিলের উপর হীরেখানা রেখে তিনি বললেন,

'এই অভিশপ্ত জিনিসটা আর আমি নিজের কাছে রাখতে চাই না, এটা আপনার কাছেই থাকুক। দেখুন, এতে আপনার ভাগ্য পাল্টে যায় কি না।'

'বেশ তো, দেখুন হীরেখানা ত্যাগ করলে আপনার অবস্থার উন্নতি হয় কিনা।'

[illegible] কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে কিরো হেনরীকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'আমি একটু ভেবে-চিন্তে দেখি, আপনাকে দুর্ভাগ্যের রাহুগ্রাস থেকে উদ্ধার করবার কোন পথ পাওয়া যায় কিনা।'

সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে হেনরী তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

সেদিন রাতেই কিরো এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন।

দেখলেন তিনি যেন একটা পিরামিডের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। সমাধিকক্ষে যাবার জন্য তিনি ক্রমাগত নীচে নেমে চলেছেন। যেতে যেতে তিনি একটা বন্ধ জায়গায় এসে পড়েছেন। এখানে আলো নেই, বাতাস নেই। কিরোর দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটু বাতাস না পেলে তিনি দম আটকে মারাই যাবেন, কিন্তু এই মৃতের রাজ্যে বাতাস কোথায়? দারুণ আতঙ্কে কিরোর ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে মনে হল কে যেন এতক্ষণ তাঁর বুকের উপর বসে গলা টিপে ধরেছিল।

ঘরের মধ্যে গুমোট। বাতাস আসবার জন্য কিরো জানলা খুলে দিলেন। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে তাঁর শরীরটাকে শীতল করে দিল। কিন্তু জানলা খুলবার সময় মনে হল একটা সাদা বাদুড় যেন এতক্ষণ জানলার গায়ে বসেছিল। জানলা খুলতেই সেই নিশাচর বাদুড়টা শূন্যপথে উড়ে গেল। প্রাণীটার ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দও যেন শুনতে পেলেন কিরো।

পরদিন গলায় খুব ব্যথা হল। বাধ্য হয়ে ডাক্তার দেখালেন কিরো। ডাক্তার যা বললেন, তা শুনে অবাক হয়ে গেলেন কিরো। ডাক্তার বললেন, কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনেই গলার ব্যথাটা হয়েছে।

হেনরীর বাসায় এলেন কিরো। হীরেটা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'এখানা সত্যিই অপয়া। আপনি যেখানকার জিনিস সেখানেই রেখে আসুন। এ রত্ন ইহলোকের সম্পত্তি নয়, এ হল মৃতের রাজ্যের সম্পত্তি। ইহলোকে এই হীরেখানা যার কাছে থাকবে তারই সর্বনাশ ঘটবে।'

—'আমিও তো রেখে আসতে চাই, কিন্তু সেই সমাধিকক্ষে ঢুকবার সাহস আমার নেই।' কাতরভাবে হেনরী বললেন।

তাহলে উপায়? দুজনে ভেবে-চিন্তেও কোন উপায় বের করতে পারলেন না। কিরো বিদায় নিলেন।

হেনরীর সঙ্গে কিরোর আর দেখা হয় নি। তাঁর খবর কিরো জানতে পারলেন কিছুদিন পরে। প্যারীর এক অভিজাত হোটেলের একখানা কামরায় হেনরীর মৃতদেহ পাওয়া গেল। মাত্র আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি এই হোটেলে উঠেছিলেন। মৃত্যুটা রহস্যজনক! কিভাবে মৃত্যু হয়েছে ডাক্তার তা ঠিক করে বলতে পারলেন না। ফরাসী পুলিশের তদন্তও সমানভাবেই নিষ্ফল হল। অবশ্য একটা সূত্র পাওয়া গিয়েছিল। হেনরীর পাশের কামরার বাসিন্দা নাকি তাঁর ঘরে হাজার হাজার পাখীর ডানার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। কিন্তু এই ক্ষীণ সূত্র ধরে মৃত্যু-রহস্যের কোন সমাধান করা গেল না।

কিরো খোঁজ নিয়ে জানলেন মৃতের জিনিসপত্রের মধ্যে সেই অপয়া হীরেখানা পাওয়া যায় নি।

অভিশপ্ত হীরের কাহিনী কিন্তু এখানেই শেষ হল না।

কিরোর এক বন্ধু ছিলেন মিঃ স্টেড। তিনিও প্রেততত্ত্বের চর্চা করতেন। একদিন কিরোর কাছে এসে তিনি বললেন,

—'একটা অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি ভাই।'

—'কি জিনিস?' কৌতূহলী কিরো জিজ্ঞেস করলেন।

—'একখানা বাদুড়মুখো হীরে।'

চমকে উঠলেন কিরো, জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেলে?'

—'প্যারীতে গিয়েছিলাম। সেখানে যে হোটেলে উঠেছিলাম তার একজন 'ওয়েটার' আমার কাছে হীরেখানা বিক্রী করেছে।'

কিরো আরো চমকে গেলেন, বললেন, 'হীরেখানা সঙ্গে আছে?'

—'আছে। তোমাকে দেখাবার জন্যেই তো নিয়ে এসেছি' মিঃ স্টেড বললেন।

—'দেখাও দেখি।'

হীরেখানা দেখেই কিরো চিনতে পারলেন। এই তো সেই অপয়া রত্নখানা!

—'কি ব্যাপার? তোমার মুখখানা ওরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন?' মিঃ স্টেড জিজ্ঞেস করলেন।

মিঃ হেনরীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী সবিস্তারে খুলে বলে কিরো অনুরোধ করলেন, 'এই অপয়া রত্নখানা তুমি ফ্যারাও চতুর্থ খুফুর কবরেই রেখে এস, আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে এখানা নদীর জলে বিসর্জন দাও।'

বিদ্রূপের হাসি হেসে মিঃ স্টেড বললেন, তোমার ঐ হেনরী লোকটা ছিল একের নম্বরের বুদ্ধু আর নার্ভাস; তাই অমনি বেঘোরে প্রাণ হারাল। আমি হচ্ছি একজন প্রেততত্ত্ববিদ। ওসব ভূত-প্রেতের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা আমার আছে।'

—'কিন্তু হীরেখানা রাখলে আজ হোক কাল হোক তোমার উপর কবরের অভিশাপ নেমে আসবেই!' চিন্তিতভাবে কিরো বললেন।

—'তোমার ঐ কবরের অভিশাপ আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। মিশরীয় প্রেতদের আমি থোড়াই পরোয়া করি।'

—'কিন্তু কাজটা তুমি মোটেই ভাল করছ না।' কিরো মন্তব্য করলেন।

ক'দিন পরে মিঃ স্টেড আবার এলেন কিরোর কাছে, হাসতে হাসতে বললেন, 'কই হে, তোমার মিশরীয় প্রেত তো আমার কোন ক্ষতি করতে পারল

না! আমি একটু শক্ত লোক; মিশরের প্রেতপুরীর বাসিন্দারা বোধহয় আমাকেই ভয় পেয়েছে।'

—'কিন্তু সময় তো চলে যায়নি।' কিরো মন্তব্য করলেন।

—'মিশরীয় প্রেত বোধহয় আর আমার নাগাল পাবে না। আমি আমেরিকা যাচ্ছি। জান বোধহয়, টাইটানিক নামে একখানা বিরাট জাহাজ ক'দিন বাদেই আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে, আমি সেই জাহাজের একজন যাত্রী।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মিঃ স্টেড বিদায় নিলেন। কিরো কিন্তু তাঁর সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে রইলেন। হীরেখানা ত্যাগ না করলে মিঃ স্টেডের উপর কবরের অভিশাপ যে নেমে আসবেই এ সম্পর্কে কিরোর মনে কোন সন্দেহই ছিল না।

মিঃ স্টেডের সঙ্গে কিরোর আর কোনদিন দেখা হয় নি। ক'দিন পরেই টাইটানিক জাহাজ সমুদ্রযাত্রা করল। তারপর একটা সংবাদে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিশাল টাইটানিক জাহাজ তার সমস্ত যাত্রী আর নাবিকসহ তলিয়ে গেছে উত্তাল আটলান্টিকের অতল তলে। অপয়া হীরেখানাসহ মিঃ স্টেডের সলিল সমাধি হল। এমনি করেই নেমে এল কবরের অভিশাপ।

এ খবর পেয়ে কিরো মন্তব্য করলেন, 'বিধিলিপি কে খণ্ডাতে পারে!'

ভৌতিক

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

১ ফিফিলিমোর গার্ডেনস-এ রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে ভদ্রলোক যখন বাসায় ফিরছিলেন তখন বেশ রাত হয়েছে। এগার'টা অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে, ঘড়ির কাঁটা বারোটার কাছাকাছি। গার্ডেনস থেকে বেরিয়ে একটা ছোট রাস্তায় এসে পড়লেন ভদ্রলোক। রাস্তাটার নাম বোধহয় ফিলিমোর স্ট্রিট। এত রাতে রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বলতে গেলে ভদ্রলোক রাস্তায় প্রায় একা। অবশ্য একেবারে একা নন। সামনে কিছু দূরে এক মহিলা যাচ্ছেন, আরো খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে এক ভদ্রলোককে। ব্যস, রাস্তায় আর জনমানব নেই।

দূরের ভদ্রলোক যাচ্ছেন অত্যন্ত ধীর গতিতে। তাঁর তুলনায় ভদ্রমহিলার গতি দ্রুততর। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলা তাঁকে পেরিয়ে গেলেন। সামনে এগিয়ে ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে একবার তাকালেন মহিলা, সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চীৎকার বেরিয়ে এল মহিলার কণ্ঠ থেকে। দারুণ আতঙ্কে চীৎকার করতে করতে তিনি মোড় পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে পাশের একটা গলিপথে ঢুকে পড়লেন।

ব্যাপার কি? কি হল ভদ্রমহিলার। উনি হঠাৎ ওরকম ভয় পেলেন কেন? সামনের ঐ ধীরগামী লোকটিকে তো গুণ্ডা বা বদমাশ বলে মনে হচ্ছে না। উনি তো এখনও আপনমনে হেঁটে চলেছেন। তবে? নাঃ, ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

পিছনের ভদ্রলোক গতি দ্রুততর করলেন, উনি যখন সামনের লোকটির কাছাকাছি এসে পড়েছেন, তখন তিনি একটি বাড়ীর সামনে এসে থেমেছেন। বোঝা যাচ্ছে এ বাড়ীতেই তিনি যাবেন।

পকেট থেকে 'ল্যাচ্-কি' বের করলেন ভদ্রলোক, তারপর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। ভিতরে ঢুকবার সময় রাস্তার গ্যাসের আলোয় সামনের লোকটির মুখ দেখলেন পিছনের ভদ্রলোক। দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি। এ কি জীবিত মানুষের মুখ! এ মুখ তো মৃত্যু-পাণ্ডুর! ভদ্রমহিলা মিছে ভয় পান নি। মধ্যরাতে নির্জন পথে এ রকম একখানা মুখ দেখলে ভয় পাওয়াটা কিছু অন্যায় নয়।

বাড়ীর নম্বরটা দেখলেন পিছনের ভদ্রলোক তারপর একসময় ফিরে এলেন

নিজের বাসায়। খাওয়া-দাওয়ার পাট তো চুকেই গিয়েছে, কাজেই সোজা বিছানায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ভাল ঘুম হল না; সারারাত বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন ভদ্রলোক। কানে বাজতে লাগল ভদ্রমহিলার শঙ্কা বিহ্বল আর্ত কণ্ঠস্বর, চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে লাগল সামনের ভদ্রলোকের মরার মতো ফ্যাকাশে মুখখানা। শেষপর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন কাল নিজের দরকারী কাজকর্মগুলো সেরে নিয়েই তিনি ঐ বাড়ী আর তার বাসিন্দার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবেন। তা না নিলে তার নিজের মনেই শান্তি ফিরে আসবে না।

পরদিন বাড়ীখানা খুঁজে বের করতে ভদ্রলোকের কোন কষ্টই হল না। রাস্তার নাম আর বাড়ীর নম্বর তো তাঁর জানাই ছিল। বাড়ীর সামনে এসে দেখলেন দরজার মাথায় একখানা 'ঘর ভাড়া'র নোটিশ টাঙানো রয়েছে। এ নোটিশখানা কাল রাতে ছিল না।

'যাক ভালই হল, বাড়ীতে ঢুকবার একটা ছুতো পাওয়া গেল।' ভদ্রলোক আপনমনেই বললেন।

দরজায় বেল টিপলেন ভদ্রলোক। একটু পরে একজন বয়স্কা মহিলা দরজা খুলে দিলেন। মহিলার চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনার ছাপ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন ভদ্রলোকের দিকে।

—'বাড়ীভাড়ার নোটিশ দেখে খোঁজ-খবর নিতে এলাম।'

—'হ্যাঁ, আমার বাড়ীর কয়েকখানা ঘর ভাড়া দেওয়া হবে।'

—'ঘরগুলো একটু দেখতে পারি?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

—'নিশ্চয়ই পারেন, তবে আপনি দয়া করে আর একদিন আসুন। এই মুহূর্তে ঘরগুলো দেখাতে একটু অসুবিধা রয়েছে।'

—'দেখুন, আমি লণ্ডন ছেড়ে একটু বাইরে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগেই আমি ঘরের ব্যবস্থাটা পাকা করে যেতে চাই। ঘরগুলো না দেখলে সেটা সম্ভব নয়। আমার একটু তাড়া রয়েছে, এখন ঘর না দেখতে পারলে আমাকে হয়ত ভাড়া নেবার পরিকল্পনাটাই ত্যাগ করতে হবে।'

—'বেশ আসুন তবে।' ভদ্রমহিলা নাচারভাবে বললেন।

মহিলা ভদ্রলোককে উপরতলায় নিয়ে গেলেন। দেখালেন কয়েকখানা চমৎকার সাজানো গুছানো ঘর। সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে ঘরগুলোর মধ্যে। এসব জিনিস দিয়ে যে ঘর সাজিয়েছে সে জানে কি করে জীবনযাত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে হয়।

—'বাঃ চমৎকার! ঘরগুলো আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ আরামেই

থাকতে পারব এখানে। কিন্তু এসব জিনিসপত্র কার?'

—'এঘরে যিনি ছিলেন তাঁরই জিনিসপত্র এসব।'

—'তিনি এখন কোথায়?'

ভদ্রমহিলা প্রথমটা এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেলেন।

গত রাতের ঘটনা এবং বাড়ীওয়ালীর এড়িয়ে যাওয়া ভাবভঙ্গী দেখে ভদ্রলোকের মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। তিনি একটু কড়া গলায়ই এবার জিজ্ঞেস করলেন;

'বলুন, আপনার আগেকার ভাড়াটে কোথায়?'

শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়লেন মহিলা। কান্না-ভেজা গলায় বললেন, 'বলব মশাই, আপনাকে সব কথা খুলেই বলব। এ ফ্ল্যাটের ভাড়াটে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি অনেক বছর এ বাড়ীর ভাড়াটে ছিলেন। ওঁর আচার ব্যবহার যেমন চমৎকার ছিল তেমনি আমিও আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করিনি।'

'বছরের এ সময়টায় ভদ্রলোক এখানে থাকতেন না। প্রতি বছরই মণ্টি কার্লো-তে যেতেন। এবারেও গিয়েছিলেন প্রায় মাসখানেক আগে। আজ সকাল আটটায় একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি। তা থেকে জানতে পারলাম আমার ভাড়াটেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হোটেলের একখানা ঘরে পাওয়া গিয়েছে। ভদ্রলোক বোধহয় আত্মহত্যা করেছেন। কেননা মৃতদেহের হাতে একটা পিস্তল ছিল। গুলি মাথা ভেদ করে যাওয়ায় ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল রাত প্রায় পৌনে বারোটা নাগাদ।'

হ্যাঁ, গতকাল রাতে ঠিক এই সময়েই ভদ্রলোক মৃত ব্যক্তিকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিলেন, প্রয়াত মানুষটির আত্মা কি তার প্রিয় আবাসভূমির মায়া ত্যাগ করতে পারেনি?

এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

স্বপ্ন হল সত্যি

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

(১৮৮৯-৯০, এই সময়কার শীতকালে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স তাঁর বড় ছেলে চার্লসকে নিয়ে মাদিয়া গিয়েছিলেন। চার্লস খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাই হাওয়া বদলের জন্য হ্যালিফ্যাক্স ছেলেকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। নীচের কাহিনীটি তিনি শুনেছিলেন মাদিরাতেই।)

এইমাত্র এলেন ডক্টর গ্র্যাবহাম। নার্সটি আবার গেটে-বাতের আক্রমণে কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে দেখেই আমার কাছে এলেন ডাক্তার। কিছুক্ষণ রইলেন আমার কাছে। গল্পগুজব করলেন। সে সময়ই তিনি আমাকে এ কাহিনীটি বলেছিলেন। এ কাহিনী আমার মনকে এত নাড়া দিয়েছিল যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গল্পটি আমি লিখে ফেলেছিলাম। সদ্য সদ্য লিখবার কারণ গল্পের প্রতিটি খুঁটিনাটি যেন ঠিকমতো লেখা হয়। আর তা সম্ভব শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি লিখে ফেলা যায়। ডাক্তার বিদায় নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম তাঁর বলা এই অদ্ভুত গল্পটিকে লিপিবদ্ধ করবার জন্য। ডাক্তারের নিজের ভাষাতেই কাহিনীটি বলছি।

কয়েক বছর আগে মিঃ ফ্রীল্যাণ্ড নামে এক ভদ্রলোক মাদিরা দ্বীপে এসেছিলেন। তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশাতেই তিনি এখানে এসেছিলেন। উঠেছিলেন এখানকার একটা হোটেলে। কিন্তু একটা মুশকিল দেখা দিল। যে হোটেলে ফ্রীল্যাণ্ড উঠেছিলেন সেখানে একটা 'ব্যালে' নাচের আয়োজন করা হলঃ অথচ অসুস্থ মিঃ ফ্রীল্যাণ্ড হৈ চৈ একদম সহ্য করতে পারতেন না। হোটেল কর্তৃপক্ষ বোধহয় ভাবলেন যে একজন অসুস্থ বোর্ডারের জন্য তো আর অন্যসব হোটেলবাসীর আনন্দ মাটি করা যায় না। ফলে একটা বিরাট অসুবিধার মুখোমুখি হলেন অসুস্থ মানুষটি।'

'মিঃ ফ্রীল্যাণ্ড আমারই চিকিৎসাধীনে ছিলেন। তাঁর এই অসুবিধা দেখে আমি তাঁকে একটা প্রস্তাব দিলাম। বললামঃ 'আপনার অসুবিধা না হলে আপনি ক'দিনের জন্য আমার বাড়ীতে এসে থাকতে পারেন। নাচ-গানের হৈ চৈ মিটে গেলে আবার নিজের হোটেলে ফিরে যাবেন।'

এখানকার অন্য কোন হোটেলে জায়গা না পেয়ে অগত্যা আমার প্রস্তাবেই

রাজী হতে হল ভদ্রলোককে। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ভদ্রলোক আমার বাড়ীতেই উঠলেন। ভদ্রলোক নির্ঝঞ্ঝাট। তাকে নিয়ে আমারও কোন ঝামেলা হল না। আমার বাড়ীতে লোকজনও বেশী নয়, কাজেই লোকের ভীড়ে বা হৈ হট্টগোলে ভদ্রলোককেও কোন কষ্ট পেতে হল না।

একদিন রোগী দেখে বাড়ী ফিরতে আমার অনেক রাত হয়ে গেল দেখলাম, আমার অতিথি তখনও বৈঠকখানা-ঘরে বসে রয়েছেন। অসুস্থ ভদ্রলোকের তো রাত না জেগে এতক্ষণ শুয়ে পড়া উচিত ছিল।

মিঃ ফ্রীল্যাণ্ড বসে আছেন 'ফায়ার-প্লেস'-এর পাশে। অতিথি একলা থাকবেন—তাই ভদ্রতার খাতিরে মিসেস গ্র্যাবহাম বসে আছেন বৈঠকখানায়।

—'কি ব্যাপার? আপনি এখনও ঘুমোতে যান নি? অসুস্থ শরীরে এতটা রাত জাগা তো ঠিক নয়, অনেকক্ষণ আগেই আপনার ঘুমোতে যাওয়া উচিত ছিল।' একটু ভর্ৎসনার সুরেই কথাগুলো বললাম।

—'বিছানায় যেতে পারছি না।' একটু ইতস্ততঃ করে অতিথি উত্তর দিলেন।

—'কেন?' অসুবিধা হচ্ছে?' আমি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—'কাল রাতে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি। সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতির্টা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না। ভয় হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়লে আবার যদি সেই স্বপ্ন দেখি।

—'কি স্বপ্ন দেখেছেন?'

—'দেখলাম কে যেন একটা মৃতদেহ নিয়ে আসছে এ বাড়ীতে। দেহটাকে রাখছে এ বাড়ীর একতলার একখানা ঘরে।'

—'কি আশ্চর্য! এ সম্পর্কে কেউ তো কিছু জানে না—এমন কি মিসেস গ্র্যাবহামও কিছুই জানেন না এ সম্বন্ধে...অথচ এরকম একটা কাজই আমি করতে যাচ্ছি। কিন্তু কি আশ্চর্য ভবিষ্যৎ এসে ধরা দিল আপনার স্বপ্নের মধ্যে....বর্তমানের মধ্যে!' আমি যেন কিছুতেই আমার উত্তেজনাটা চেপে রাখতে পারছিলাম না।

আমার ভাবভঙ্গী দেখে স্ত্রী বললেন, 'কি ব্যাপার! কি সব বলছ!'

—'আশ্চর্য ব্যাপার! অদ্ভুত ব্যাপার!'

—'আহা, খুলেই বল না।'

মিঃ ফ্রীল্যাণ্ড কৌতুহলী হয়ে আমার দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকালেন।

শেষ পর্যন্ত খুলেই বললাম সব কথা।

—'আমার একজন রোগী হলেন অধ্যাপক ক্লিফোর্ড। বহুদিন থেকেই তিনি

ভুগছিলেন! রোগের হাত থেকে একটু আরাম পাবার জন্য তিনি এ দ্বীপে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য আর ফিরল না। এখন তিনি মরণের দোরগোড়ায় এসে পড়েছেন। তিনি এ দ্বীপে আসবার পর থেকে আমিই তাঁর চিকিৎসা করছি। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়েছেন আমাকে। তিনি এ দ্বীপের কোন খ্রীস্টান সমাধিভূমিতে সমাহিত হতে চান না। তিনি চান তাঁর দেহ সমাহিত হোক স্বদেশ ইংলণ্ডের কোন সমাধিভূমিতে।'

'অধ্যাপকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেবল রোগী আর ডাক্তার পর্যায়েই থাকেনি, আমাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছিল। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম, বললাম, 'আপনার অন্তিম ইচ্ছা যাতে পূর্ণ হয় তার ব্যবস্থা আমি করব।'

মৃত্যুপথযাত্রী অধ্যাপক আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর জানতে চাইলেন কি করে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ হবে।

আমি একটু রসিকতা করে বললাম, 'আপনি যদি এখানকার সমাধিতে প্রবেশ করতে চান তবে এ দ্বীপের সমাধিভূমিও আপনার দেহকে গ্রহণ করতে উৎসাহী হবে না। যাক সে কথা, আমি আপনার দেহকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। আপনার কফিন-বন্দী দেহ আমার বাড়ীর একতলার একখানা ঘরে থাকবে। তারপর প্রথম সুযোগেই ইংলণ্ডগামী কোন স্টীমার বা জাহাজে করে আপনার মরদেহকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেব।'

—'কিন্তু এ ব্যবস্থায় আপনার বাড়ীর লোকেদের আপত্তি হবে না?' অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন।

—বাড়ীর কেউ একথা জানতেই পারবে না। একতলার একখানা ঘরে কদিন একটা প্যাকিং-বাক্স থাকবে—এই আর কি!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মুমূর্ষু অধ্যাপক।

আমি থামলাম। মিসেস গ্র্যাবহাম এবং মিঃ ফ্রীল্যাণ্ড এতক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার বলা কাহিনী শুনছিলেন।

'মিঃ ফ্রীল্যাণ্ড পরদিনই আমার বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর মানসিক অবস্থা যেরকম দেখলাম, তাতে আর তাঁকে আটকানো সঙ্গত মনে করলাম না। অবশ্য সে রাতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে বিছানায় পাঠাতে পেরেছিলাম।'

—'ফ্রীল্যাণ্ডকে বিছানায় পাঠিয়েই আমি সোজা চলে এলাম অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের কাছে। তাঁকে বললাম আমার অতিথির অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের কথা। ভবিষ্যতের ঘটনা কি করে বর্তমানের স্বপ্নে ধরা পড়ল, তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একি অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত রহস্য!

অধ্যাপক ক্লিফোর্ডও এই স্বপ্নের কথা শুনে খুব কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। তিনি এই অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন। মিঃ ফ্রীল্যাণ্ড যে স্বাভাবিকভাবেই এরকম স্বপ্ন দেখতে পারেন তা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যায় আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

পরদিন কিম্বা তার পরদিন অধ্যাপক ক্লিফোর্ড মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর টনটনে জ্ঞান ছিল। আমি বললাম, 'আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার মৃত্যু হবে। আপনার কি লিখে যাবার মতো কিছু নেই?'

অধ্যাপকের উত্তর দিতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি আবার বললাম, 'আপনি কি এ জীবনে সম্পূর্ণ তৃপ্ত? সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট? আপনি কি জানেন মৃত্যুর অর্থ হল সব কিছুর পরিসমাপ্তি? আর এক কি দু'ঘণ্টা পরে আপনি আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না। তাই আপনার যদি কিছু বলবার বা লিখবার থাকে, আপনার যদি কোন অন্তিম ইচ্ছা পূরণের অভিলাষ থাকে তবে তা এখনই করে ফেলতে হবে। কেননা নষ্ট করবার মতো সময় আর নেই।'

'মনে হল অধ্যাপক এ জীবনে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত। তবে তিনি এই ঘর-জগৎ ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক। কিন্তু যেতে যখন হবেই তখন তা নিয়ে বৃথা দুঃখ করে লাভ কি! মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কিছুই বললেন না বা লিখলেন না। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে তিনি কাগজ কলম চাইলেন। দিলাম। কাঁপা কাঁপা হাতে অধ্যাপক তাঁর মেয়েদের উদ্দেশ্যে কিছু লিখলেন। বললেন, 'আমার এ লেখা একখানা খামে ভরে খামখানা সিল করে রাখবেন। ওরা সাবালিকা হলে এই খাম খুলবে—তার অগে নয়।'

—'ঠিক আছে, আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করব।'

—'আর এই কথাগুলো যেন আমার সমাধির উপরে লেখা থাকেঃ

'আমি তৃপ্ত নই এবং তৃপ্ত। আমি এই পৃথিবীতে ছিলাম এবং সামান্য হলেও কিছু কাজ করেছি। এখন আমি নেই—একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

প্রতিশ্রুতি মতো অধ্যাপকের মরদেহ আমি নিয়ে এসেছিলাম আমার বাড়ীতে তারপর কফিন- বন্দী তাঁর মৃতদেহ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর স্বদেশে—ইংল্যাণ্ডে।

(এ কাহিনীর শেষে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এই সংযোজন করেছেন। মিঃ ফ্রীল্যাণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন মাল্টা দ্বীপে। নিজের 'ইঅট্' বা প্রমোদ ভ্রমণের বাষ্পীয় পোতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি অত্যন্ত ধনী ছিলেন। উত্তরাধিকারীবিহীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর ডক্টর গ্র্যাবহামকে যেন পঞ্চাশ পাউণ্ড দেওয়া হয়।)

ভূতুড়ে বাংলো

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

(লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এ কাহিনীটি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর ভাগিনেয় চার্লস ডাণ্ডাসের কাছ থেকে। চার্লসের এক বন্ধুর জীবনে নাকি এ ঘটনাটি ঘটেছিল।)

আমার বন্ধু মিঃ ট্রোওয়ার্ড ভারতে চাকরী করতেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে চাকরীর খাতিরে তাঁকে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে যেতে হয়েছিল। তিনি যখন সস্ত্রীক হোসিয়ারপুরে পৌছলেন তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছে। একে বিদেশ-বিভুঁই, তায় আবার অচেনা জায়গা। খুবই অসুবিধায় পড়লেন ভদ্রলোক। রাত কাটাবেন কোথায়—এ প্রশ্নটা সবার আগে বড় হয়ে দেখা দিল।

ওখানে একটা ডাক-বাংলো ছিল ঠিকই, কিন্তু বাংলো ভর্তি। সেখানে জায়গা পাওয়া গেল না। আর পাওয়া গেলেই বা কি হত? মিঃ ট্রোওয়ার্ডের মতো একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী তো একদল সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক বাড়ীতে গাদাগাদি করে রাত কাটাতে পারেন না। তাঁর একটা পদমর্যাদা তো আছে। সেটাকে তো আর নষ্ট করা যায় না।

শেষপর্যন্ত খুঁজে পেতে একখানা ঘুণ-ধরা খালি বাংলো পাওয়া গেল। অগত্যা সেখানেই রাতের মতো আশ্রয় নেবার ব্যবস্থা করতে হল। চাকর-বাকরেরা তাড়াতাড়ি ঝাঁট-টাট দিয়ে দু'তিনখানা ঘর কোনরকমে রাত্রিবাসের উপযোগী করে তুলল। একখানা ঘরে স্বামী-স্ত্রীর জন্য পাশাপাশি দু'খানা ক্যাম্পখাট পাতা হল। সঙ্গে শুকনো খাবার ছিল। ওঁরা দু'জনে খেয়ে নিলেন। এবার নিদ্রাদেবীকে আরাধনা করবার পালা। পথশ্রমে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ক্লান্ত ছিলেন। কাজেই এবার ঘুমোবার জন্য তৈরী হলেন।

এমনি সময়ে ওদের ঘরে ঢুকল সঙ্গের চাকর-বাকরেরা। মিঃ ট্রোওয়ার্ড খুবই অবাক হলেন। এরা সবাই দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে রয়েছে। সহবৎ জানে। এরকম দল বেঁধে হুজুরের শোবার ঘরে চলে আসবার মতো বে-আদব তো ওরা নয়। ওদের খুব ভালো করে চেনেন বলে মিঃ ট্রোওয়ার্ড রাগতে পারলেন না। প্রশ্নভরা চোখে তাকালেন ওদের দিকে। সবার পক্ষ থেকে সর্দার খানসামা বললঃ

—'হুজুর, এ বাংলো-বাড়ীখানা ভাল নয়। আমাদের এখানে রাত কাটাতে

ভয় করছে!'

—'কেন?'

—'কেন বলতে পারব না, চারপাশ কি রকম থমথমে দেখছেন!'

—'থমথমে!'

—'হ্যাঁ, আশে পাশে কোন বাড়ী নেই—লোকজন নেই। শহর থেকে দূরে এই বাংলোখানা ভূতের মতো রয়েছে। মনে হচ্ছে আমরা যেন জ্যান্ত মানুষের জগৎ থেকে মরার রাজ্যে এসে পড়েছি! দেখছেন না একটুও হাওয়া নেই—গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না।'

মিঃ ট্রোওয়ার্ড মনে মনে সর্দার খানসামার কল্পনাশক্তির তারিফ না করে পারলেন না।

—'হুজুর, আপনি আর মেমসাহেব এখানে রাত কাটাবেন না। দয়া করে আমাদেরও এখানে থাকবার হুকুম করবেন না।'

—'এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন বল দেখি?'

—'হুজুর, এ বাড়ীখানা ঠিক স্বাভাবিক নয়, এখানে এমন একটা কিছু আছে যার অশুভ প্রভাব...আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না মালিক।'

বিপন্ন মুখে সর্দার খানসামা থামল।

—'দেখ, আমরা দু'জনেই খুব ক্লান্ত। এত রাতে জায়গার খোঁজে আবার কোথায় যাব! আর গেলেই যে পাব তার স্থিরতা কি! মাঝখান থেকে কেবল হয়রানিটাই সার হবে। এখন আর বাসা পাল্টাবার প্রশ্নই ওঠে না। আজ রাতে আমরা এখানেই থাকব।'

—'কিন্তু হুজুর, আমরা খুব ভয় পাচ্ছি!'

—'বেশ, ভয় পেলে তোমরা না হয় অন্য জায়গায় চলে যাও। আমরা দু'জন এখানেই রাত কাটাব।' একটু উষ্ণ স্বরেই মিঃ ট্রোওয়ার্ড বললেন।

—'হুজুরকে আর মেমসাহেবকে অচেনা অজানা জায়গায় ফেলে আমরা কোথাও যেতে পারি না।' লজ্জিত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে সর্দার খানসামা বলল।

—'বেশ তবে থাক এখানে।' মনে মনে খুশী হয়ে মিঃ ট্রোওয়ার্ড বললেন।

সেলাম করে সর্দার খানসামা আর তার সঙ্গীরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী ক্যাম্পখাটে আশ্রয় নিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত মিসেস ট্রোওয়ার্ড ঘুমিয়ে পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু ক্লান্ত হলেও সাহেবের চোখে ঘুম এসেও আসতে চাইছে না। সর্দার খানসামার কথাগুলো বারবার মনে পড়ছে। লোকটা ভীরু নয়। ওর কথাই ঠিক; সত্যিই কেমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ এখানে।

মানুষের জগতের মধ্যে থেকেও এ জায়গা যেন সেই জগৎ থেকে আলাদা। একটা অনির্দেশ্য অদৃশ্য রহস্য যেন ঘিরে রেখেছে এই পুরানো ঘুণে-ধরা বাংলোখানাকে! সেই অদৃশ্য রহস্য বুঝি যে কোন মুহূর্তেই দৃশ্যমান হয়ে উঠতে পারে। একটা অপার্থিব অশুভ শক্তির প্রবাহ বয়ে চলেছে এই আদ্যিকালের বাড়ীখানার মধ্যে। একে অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, কিন্তু বোঝা যায় না।

এরকম নানা কথা চিন্তা করতে করতে মিঃ ট্রোওয়ার্ডের দু'টি চোখে ঘুম নেমে এল।

মাঝরাতে গুলির শব্দ এবং স্ত্রী-কণ্ঠের আর্ত চীৎকারে মিঃ ট্রোওয়ার্ডের ঘুম ভেঙে গেল। দারুণ ভয়ে মিসেস ট্রোওয়ার্ড আর্তনাদ করে উঠেছেন। নিজের ক্যাম্প খাট থেকে লাফিয়ে নামলেন সাহেব। দেখলেন তাঁর স্ত্রীর মুখ আতঙ্ক-পাণ্ডুর। তিনি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন।

—'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' ব্যাকুল কণ্ঠে মিঃ ট্রোওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলেন।

—'সেই লোকটা....সেই লম্বা লোকটা চলে গিয়েছে?' স্খলিত স্বরে মিসেস জিজ্ঞেস করলেন।

—'কোন্ লোকটা?'

—'যে এসেছিল....গুলি ছুঁড়েছিল!' ভীতি-বিহ্বল চোখে মেম-সাহেব চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

—'কে আবার আসবে? দেখছ না ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে।'

স্ত্রীকে একথা বলে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেও মিঃ ট্রোওয়ার্ড কিন্তু ভুলতে পারছিলেন না যে গুলির শব্দ তিনিও শুনেছেন। সেই শব্দ আর আর্ত চীৎকারে তাঁর নিজেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

—'তবে...তবে কি স্বপ্ন দেখে ভয় পেলাম!' বিহ্বলভাবে মিসেস বললেন।

—'হ্যাঁ তাই, বন্ধ ঘরে কোন লোক আসবে কি করে? তুমি স্বপ্নই দেখেছ,' কথাগুলো বললেও মিঃ ট্রোওয়ার্ড নিজেই যেন নিজের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

—'তাহলে স্বপ্নই দেখেছি। কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! এত বাস্তব যে সত্যি বলেই মনে হয়েছে।'

—'কি স্বপ্ন দেখলে?' মিঃ ট্রোওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলেন। ততক্ষণে মিসেস ট্রোওয়ার্ড অনেকটা সামলে উঠেছেন। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে তিনি বললেনঃ

—'দেখলাম ধূসর রঙের স্যুট পরা একটা লম্বা লোক এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মাঝখানে। আমি আঁতকে উঠলাম। লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল

আমার খাটের দিকে। দারুণ আতঙ্কে আমার নড়বার শক্তিটুকু পর্যন্ত লোপ পেল। সম্মোহিতের মতো আমি তাকিয়ে রইলাম এগিয়ে আসা আগন্তুকের দিকে। আমার খাটের পাশে এসে থামল লোকটা, ঝুঁকে পড়ল আমার উপর। প্রেতায়িত কণ্ঠে বলল, 'চুপ করে শুয়ে থাকুন, একটুও নড়াচড়া করবেন না.....আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।' তারপর সেই অদ্ভুত লোকটা পিস্তল অথবা বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ল। গুলিটা গেল আমারই বিছানার উপর দিয়ে। আমার শায়িত দেহের একটু উপর দিয়ে গুলিটা গেল।

নিদারুণ আতঙ্কে শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে আমি চীৎকার করে উঠলাম। তারপর....তারপর তুমি এলে আমার কাছে।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁফাতে লাগলেন মেমসাহেব। তারপর আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে একটু সুস্থ হলেন।

পরদিন সকালে মিঃ ট্রোওয়ার্ডের প্রথম কাজ হল বাংলোখানা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া। খবর নিয়ে জানলেন, হোসিয়ারপুরের প্রাক্তন কমিশনার মিঃ দ্যকুচি একসময় ঐ বাংলোয় থাকতেন। একদিন মাঝরাতে তিনি নিজের দেহে পিস্তলের গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন। পুলিশি-তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু আত্মহত্যার কারণ জানা গেল না। তবে অনেকের ধারণা দাম্পত্য-কলহের জন্যই নাকি সাহেব আত্মহত্যা করেছিলেন। নিজের দেহে গুলি চালাবার আগে কমিশনারসাহেব স্ত্রীর বিছানার উপর ঝুঁকে তাকে বলেছিলেন—

'চুপ করে শুয়ে থাক, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমি আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।'

মিঃ ট্রোওয়ার্ড বাংলোর যে ঘরে সস্ত্রীক রাত্রিবাস করেছিলেন, এ ঘটনা নাকি ঘটেছিল সেই ঘরেই।

দেবীনষ্টচন্দ্র

জন আর ক্রসল্যাণ্ড

।। এক।।

একটি তাঁবু। তাঁবুর সামনে আগুনের পাশে বসে তিনটি মানুষ। গরমকালের রাত। আগস্টের প্রথম। স্থান মধ্য আমেরিকা। উত্তরে—দূরে—বহুদূরে আকাশের গায়ে আলোর আভা। ঐ আলো বলছে সভ্যতা বা জীবনের কথা। ঐ আলো মেক্সিকো নগরীর। দিগন্ত প্রসারী সমতল প্রান্তরের ওপারে সেই নগরী।

দক্ষিণে আকাশরেখা ঢেকে আছে একটা বিরাট কালো ছায়ায়। এ ছায়া এক বিশাল পিরামিডের। একটা নাতিউচ্চ পাহাড়ের উপর এই বিশাল পিরামিড। হ্যাঁ, মিশর নয়, মধ্য আমেরিকায়ও পিরামিড রয়েছে। এ পিরামিড এখানকার লাল মানুষদের তৈরি। শ্বেতকায় ইউরোপীয়রা আমেরিকায় আসবার আগে এই বিরাট মহান দেশে ছিল লাল মানুষদেরই আধিপত্য। আমেরিকায় গড়ে উঠেছিল মায়া, আজটেক আর ইনকা সভ্যতা।

পাহাড়ের উপরে একশ' ফুট উঁচু এই অতিকায় পিরামিডটা। পিরামিডের ছায়া তাঁবু আর মানুষ তিনটিকে কালো ছায়ায় ঢেকে দিয়েছে। সহসা ছায়াময় পিরামিডের ডান দিকে দেখা গেল একটা ভৌতিক দীপ্তি। দীপ্তিটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। অজান্তেই ওরা তাকাল আলোর দিকে। চন্দ্রোদয়। পিরামিডের ডান পাশে চাঁদের একটা কোণা দেখা যাচ্ছে।

একটু পরেই দিগন্ত প্রসারী উন্মুক্ত প্রান্তরে দেখা গেল রূপোলী আলোর বন্যা। সাদা তাঁবুটা ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

তিনটি মানুষের মুখও স্পষ্ট হয়ে উঠল চাঁদের আলোয়। দেখা গেল তিনটি অসমবয়সী ভিন্ন আকৃতির মানুষকে।

মাঝখানের লোকটি লম্বা, মেদহীন, চেহারা মাঝ বয়সী। তার মুখখানা সরু, সরু মুখে ছুঁচালো দাড়ি। লোকটির মাথায় টুপি নেই। চাঁদের আলোয় দেখা যায় মাথার চুলে ধূসরতার আভাস। লোকটি পাইপে ধূমপান করছিল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডান পাশের লোকটির দিকে তাকিয়ে মাঝবয়সী লোকটি বলল ঃ

—চাঁদ ওঠায় সমস্ত পরিবেশটাই যেন পাল্টে গেল। মনে হচ্ছে আমরা যেন

রূপকথার পরীদের জগতে এসে পড়েছি।'

ডান পাশের লোকটি আগুনের দিকে তাকিয়েছিল। মাঝবয়সী লোকটির কথা শুনে সে চমকে তার দিকে তাকাল। এ লোকটির বয়স কম। ওর চেহারা সুগঠিত। লোকটি লম্বা। চেহারাটা সৈনিকের মতো। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। দাড়ি গোঁফ কামানো। শক্ত দু'সারি দাঁতে কামড়ানো পাইপটাকে হাতে নিয়ে লোকটি ছাই ঝাড়ল, তারপর একটা লঘু হাই তুলে বলল ঃ

—হ্যাঁ, অধ্যাপক, অন্ধকারে জায়গাটাকে বড্ড ভূতুড়ে বলে মনে হচ্ছিল। স্বীকার করতে লজ্জা নেই কেমন একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠেছিল সমস্ত মন। বহুকাল আগে এখানে যে সব কাণ্ড ঘটত মনে হচ্ছিল তা যেন এক্ষুণি আবার ঘটতে যাচ্ছে! আমি যেন ওদের ধর্ম-উৎসবের মিছিল দেখতে পাচ্ছিলাম। বিচিত্র পোশাক পরা পুরোহিতেরা যেন মিছিল করে তাদের বলি নিয়ে চন্দ্রদেবীর মন্দিরের দিকে চলেছে। আমি যেন তাদের অদ্ভুত মন্ত্রপাঠ শুনতে পাচ্ছিলাম।'

অধ্যাপকের বাঁ-পাশে বসা তৃতীয় লোকটি লাফিয়ে উঠল। অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চাঁদের দিকে। ওকে লোক না বলে বালক বললেই ঠিক হয়। ওর বয়স কোন মতেই উনিশ কি কুড়ির বেশী নয়। ছেলেটির চেহারা রোগা—পাতলা। চাঁদের আলোয় মাথার চুলগুলি সোনালী বলে মনে হচ্ছে। মুখখানা মনে হচ্ছে পাণ্ডুর। দ্বিতীয় লোকটির দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বলল ঃ

—'আপনি ঠিক বলেছেন ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস। অন্ধকারে জায়গাটাকে সত্যিই ভূতুড়ে বলে মনে হচ্ছিল। কেমন যেন থমথমে-ছমছমে ভাব চারিদিকে। এখন চাঁদ উঠছে কিন্তু তবু পরিবেশটা কেমন যেন অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে না? মনে হচ্ছে না যে আমরা যেন পরিচিত—পৃথিবীটাকে ছেড়ে এক অজানা অলৌকিক জগতে এসে পড়েছি?'

—'তুমি বড্ড বেশি কল্পনাপ্রবণ।' অধ্যাপক একটু হেসে বললেন।

—'লাল মানুষেরা আর দোআঁশলা শ্রমিক আর কুলিরা যেসব ভূতুড়ে গল্প বলে তা কি আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন মামাবাবু?'

একটু হাসলেন অধ্যাপক। তারপর তরুণের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ গম্ভীর হল।

—'জিওফ্রে', অধ্যাপক বললেন, 'মাঝে মাঝে পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। পৃথিবীতে অনেক জিনিস আছে যা খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে এসব ঘটনার কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অবশ্য তার কারণ মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। মানুষের জ্ঞান যখন আরও বাড়বে তখন এইসব তথাকথিত

অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভবপর হবে বলে আমি মনে করি। আর এইসব কুলিদের গালগল্পে আমার খুব একটা আস্থা নেই। কেন না সত্যি মিথ্যেয় মিলিয়ে ওরা যে কাহিনী বলে সেগুলোর ভিতর থেকে মিথ্যের মিশেল বাদ দিয়ে সত্যিটুকুকে বের করা খুবই মুস্কিল। এরা এক অদ্ভুত জাত! এই মুহূর্তে সত্যি কথা বলল তো পরমুহূর্তে মিথ্যে কথা বলবে। আজ যার সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব করল, কাল সুযোগ পেলে বিনা দ্বিধায় অবলীলাক্রমে তাকে খুন করতে পারে এরা।'

—'কিন্তু ওরা বার বার একই গল্প বলে কেন প্রফেসর বেকার?' ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা ঘুরে-ফিরে সেই একই নরবলি আর রক্ত উৎসর্গের গল্প বলে। আর সেসব গল্প ওরা এমন ভয়ঙ্করভাবে বলে যে শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওরা রাতের পর রাত একই গল্প করে—আমি ওদের বাসস্থান তদারক করতে গিয়ে ঐ একই গল্প বার বার শুনেছি।'

—'একটা কথা মনে রাখতে হবে ক্যাপ্টেন, এদেশী কুলিদের বেশির ভাগই হল অজ্ঞ, অশিক্ষিত। ওরা লিখতে জানে না—পড়তেও জানে না। এখানে ওদের আমোদ-প্রমোদেরও কোন উপকরণ নেই। তাই অবসর সময় কাটায় অতীতের গল্প বলে। একসময় ব্রিটেনে আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এমনি করেই সময় কাটাতেন।'

জিওফ্রে বেলিউ চোখ বড় বড় করে ক্যাপ্টেন আর অধ্যাপকের কথা শুনছিল। ওর শরীরটা ভাল নেই। মধ্য আমেরিকার উত্তাপ ওর দুর্বল রোগা শরীরটাকে অসুস্থ করে তুলেছে। ভীত এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে সে বলল ঃ

—'আমাদের দোভাষী কুইকিসটো আজ আমাকে একটা ভয়ঙ্কর গল্প বলেছে....।'

—'কি বলছে কুইকিসটো?' তীক্ষ্ণস্বরে অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন।

—'বলেছে কাল রাতে এখানে নাকি প্রেতের মিছিল হবে,' একটু ইতস্তত করে জিওফ্রে বলল।

হো-হো করে হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস, হাসতে হাসতে বললেন, 'আমাদের কুইকিসটো দেখছি কেবল মিথ্যেবাদীই নয়, সে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাপুরুষও বটে। আমি তাকে একবিন্দুও বিশ্বাস করি না।'

—'কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে, সে একজন দক্ষ দোভাষী। তিন-তিনবার আমরা এ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান করেছি, কিন্তু এরকম দক্ষ দোভাষী আর পাইনি। তাছাড়া লাল আর দোআঁশলা কুলি-কামিনদেরও বেশ বশে

রাখতে পারে।'

—'জানেন মামাবাবু, কি করে ও লোকগুলোকে বশে রাখে?'

—'কি করে?'

—'যাদু দিয়ে।'

—'যাদু!'

—'হ্যাঁ।'

—'কি বলছ তুমি!' অধ্যাপক বেকার এবার সত্যিই বিস্মিত।

—'আমি নিজের চোখে ওর যাদু দেখেছি,' তরুণ জিওফ্রের গলা উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল।

অধ্যাপক উঠলেন। সস্নেহে হাত রাখলেন জিওফ্রের কাঁধের উপর, বললেন, 'চল, এবার আমাদের মশারীর নীচে কম্বলের তলায় যাওয়া দরকার, ঘুমুতে হবে। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে। সারাদিন অনেক কাজ। পিরামিডের তলাটা পরিষ্কার করা হয়েছে, কাল আমাদের চূড়ায় উঠতে হবে। চন্দ্রদেবীর মন্দির রয়েছে পিরামিডের চূড়োয়। ঐ মন্দিরের পবিত্র বেদীর সামনেই এককালে নরবলি দেওয়া হত। কাল মন্দির আর বেদী ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। কুইকিসটোর গাল-গল্প নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না বাপু...স্বদেশী মানুষেরা এরকম অনেক গাল-গল্পই করে থাকে।'

জিওফ্রে চুপ করে রইল।

একটু চুপ করে থেকে অধ্যাপক বেকার বললেন, 'ঘুমুতে যাবার আগে তোমাকে 'ডাবল ডোজ' কুইনাইন খেয়ে নিতে হবে জিওফ্রে। আজকেও তোমার জ্বর হয়েছিল। কালকে জ্বর হলে মুশকিলে পড়ব। আমি একই সঙ্গে ডাক্তার আর প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজ করতে পারব না। এখন সময়টা মূল্যবান। কুইনাইন খেয়ে নিয়ে ভাল করে বিশ্রাম কর। চল তোমায় তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি আর ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস একটু পরেই যাচ্ছি।'

জিওফ্রে বেলিউকে তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে অধ্যাপক স্ট্যাণ্ডিসের কাছে ফিরে এলেন একটু পরেই। ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস তখন অলসভাবে বসে নিভন্ত কাঠকয়লাগুলোতে পদাঘাত করছিলেন।

ক্যাপ্টেনের পাশে বসতে বসতে অধ্যাপক বললেন ঃ

—'জিওফ্রেকে নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে দেখছি।'

—'আমি কদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, 'ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস বললেন, 'ওর আমাদের সঙ্গে আসাটাই ঠিক হয়নি। এই জঘন্য উত্তাপ আর কীট-পতঙ্গের

উৎপাত ওর মোটেই সহ্য হচ্ছে না। ওর আবার জ্বর হবে। আপনি কেন ওকে সঙ্গে নিয়ে এলেন অধ্যাপক?'

—'আনতে হল, কারণ ও একজন বেলিউ। পারিবারিক ব্যাপার বুঝলেন ক্যাপ্টেন—পারিবারিক ব্যাপার। নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন না, ঈশ্বর আমাকে আত্মীয়দের হাত থেকে রক্ষা করুন বা এই জাতীয় একটা কিছু। জিওফ্রে বেলিউ হল আমার একমাত্র বোনের একমাত্র ছেলে। ও কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনা করছে। রেজাল্ট নেহাত খারাপ করেনি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ওর ভগ্নস্বাস্থ্য। ডাক্তারের উপদেশ হল ওকে সমুদ্রযাত্রা আর ভ্রমণ করতে হবে। তাহলেই নাকি ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। তাই আমার বোন এল্‌সা এসে আমায় ধরল। আমি তাকে বোঝাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম। বললাম, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না—কাজে যাচ্ছি, কিন্তু আদুরে ছোট বোন আমার কোন কথাই শুনতে রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই আমাকে রাজী হতে হল। একমাত্র সন্তান—তাই এল্‌সা ওকে একা বা অচেনা-অজানা লোকদের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে পাঠাতে ভয় পাচ্ছিল। ওকে সঙ্গে আনবার আগে আমি ভাল ডাক্তার দিয়ে ওর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছি। ডাক্তার কিন্তু বলেছেন যে ও সমুদ্রযাত্রা আর ভ্রমণেরে ধকল সহ্য করতে পারবে।'

—'তবুও ওর উপর নজর রাখা দরকার,' ক্যাপ্টেন বললেন, দুপুরের গরমে ওকে তাঁবুর বাইরে যেতে দেবেন না। আর..'

—'বলুন ক্যাপ্টেন, কোন সঙ্কোচ করবেন না।'

—'আমার কথাটা হয়ত একটু অদ্ভুত শোনাবে...তবু বলছি...কুইকিসটোর সঙ্গে ওকে বেশি মেলামেশা করতে দেবেন না।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে অধ্যাপকের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, অধ্যাপক মাথা নেড়ে বললেন ঃ

—'আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস, ছেলেটা অল্পবয়সী—কল্পনাপ্রবণ, যে যা বলে সহজেই তা বিশ্বাস করে ফেলে। তাছাড়া ওর শরীর-স্বাস্থ্যও ভাল নয়। কুইকিসটো ওর কোন উপকারই করতে পারবে না। তাকে আমি সাবধান করে দেব—জিওফ্রের সাথে সে যেন আর ওসব আজগুবী ভূতুড়ে গল্পগুলো না বলে। আসুন এবার কালকের কাজকর্ম নিয়ে 'প্ল্যান' করা যাক।'

অধ্যাপক আর ক্যাপ্টেন আরও অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললেন। যখন উঠলেন তখন আকাশ-সাগরের নৌকো বেয়ে চাঁদ প্রায় মাঝ আকাশে পৌছে গেছে। চাঁদের আকৃতি প্রায় গোল।

।। দুই ।।

অধ্যাপক বেকার হলেন এই প্রত্নতাত্ত্বিক দলের নেতা। মধ্য আমেরিকার এই বিরাট 'ঢিবি'-টার চারপাশে এ'কদিন কাজ হয়েছে। ঢিবিটাকে পরিষ্কার করবার পর দেখা গেল ওটার আকৃতি একটা পিরামিডের মতো, বিরাট পিরামিড! একশ' ফিটের উপর উঁচু। চার পেশে! তিনশ' ফিট স্কোয়ারের উপর জায়গা জুড়ে পিরামিডটা। পিরামিডের উপর চন্দ্রদেবীর মূল মন্দির। কত হাজার বছর আগে শত শত হতভাগ্য দাসের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে এই পিরামিড আর মন্দির তৈরি করা হয়েছিল।

পিরামিডের-মন্দিরটা উঠেছে তিন থাকে! প্রত্যেক থাকের পর চারপাশে ঘেরা 'গ্যালারী' বা 'প্ল্যাটফর্ম'। প্রতি গ্যালারীর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে চারটে করে মুখ। দক্ষিণ মুখ দিয়ে চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে মূল মন্দিরের দিকে। সিঁড়ির ধাপগুলি চওড়া—উঁচু এ পিরামিড মন্দির যে কালে তৈরী হয়েছিল তখন মেক্সিকোর লাল মানুষেরা পাথরের টুকরো থেকে যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার পর্যন্ত তৈরি করতে শেখেনি। তিন বছরে তিনবার অভিযান করে অধ্যাপক বেকার পিরামিডটার গায়ে জমাট বাঁধা পুরু লাভার স্তর পরিষ্কার করিয়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভার আবরণে ঢেকে গিয়েছিল পিরামিড মন্দিরটা। এখন সব পরিষ্কার হয়েছে। এবার আসল কাজ শুরু হবে। এ বিরাট মন্দির-পিরামিডের মধ্যে কত ঘর, কত পথ কে জানে। হয়ত এর ভিতরে পাওয়া যাবে লাল-মানুষদের শিল্প কলার বহু নিদর্শন!.....দেওয়ালে পাওয়া যাবে কত চিত্রলেখা। হয়ত মধ্য আমেরিকার লাল মানুষদের সভ্যতার উপরেই নতুন করে আলোকসম্পাত হবে। হয়ত নতুন করে লিখতে হবে লাল মানুষদের ইতিহাস।

স্থানীয় শ্রমিকদের কাজে লাগিয়েছেন অধ্যাপক বেকার। শ্রমিকদের কাজের তদারকি করছেন ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস। জিওফ্রের উপর কোন নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া নেই। তার হাতে প্রচুর সময়। সে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখে আর কুলিদের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। দোভাষী কুইকিসটোর সঙ্গে তো তার খাতির বেশ জমেই উঠেছে। পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে অধ্যাপক আর ক্যাপ্টেন তাঁবুর দিকে চললেন।

কুলি-কামিনদের গান আর হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে এল দূর থেকে। ওরা পিরামিডটার ওপাশে ক্যাম্প করেছে। দোভাষী কুইকিসটোও আছে ওদের সঙ্গে।

অধ্যাপক এবং ক্যাপ্টেন নিজের নিজের ক্যাম্পখাটে আশ্রয় নিলেন।

পরদিন সকালে জিওফ্রেকে অনেক স্বাভাবিক মনে হল। কিন্তু অধ্যাপক বেকার তাকে 'ঢিবি'-র দিকে না গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন। জিওফ্রের সারাটা সকাল কাটল বই পড়ে আর তাঁবুর ছায়ায় শুয়ে-বসে।

বিকেলবেলায় রোদের তেজ কমতে জিওফ্রে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছু করবার নেই। তাঁবুর আশেপাশেই ঘুরঘুর করতে লাগল ও। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে মুখ তুলল জিওফ্রে। কুইকিসটো আসছে। কুইকিসটোর পরনে আঁটো-সাঁটো খাটো সুতীর পোশাক। মাথায় একটা বিরাট 'স্ট্র হ্যাট'। টুপির ছায়া যেন ওর কালো মুখখানাকে আরো কালো করে তুলেছে। কুইকিসটো শুধু দোভাষীই নয়, সে কুলি-কামিনদের সর্দারও বটে। মন্দির-পিরামিডের কাছে এখন পুরোদমে কাজ চলছে। এসময় সেখানে না থেকে ও এখানে কেন?

দীর্ঘ খেলোয়াড়ী পদক্ষেপে কুইকিসটো জিওফ্রের কাছে এগিয়ে এল। মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল ওকে।

—'কি ব্যাপার?' কিছুটা বিরক্ত হয়েই কুইকিসটোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল জিওফ্রে।

—'ক্যাপ্টেন বলছিলেন আপনি নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই দেখতে এলাম।...এখন কি কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন?'

—'হ্যাঁ অনেকটা সুস্থ বোধ করছি, কিন্তু তুমি শুধু আমার খবর জানবার জন্য এসেছ?'

কুইকিসটো আরো কাছে এল। জিওফ্রের মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'না, আমি কিছু খবর জানাতেও এসেছি।'

—'কি খবর?'

—'মিঃ বেলিউ আজ পূর্ণিমা, তাই না?'

—'তা হতে পারে, কাল রাতে চাঁদকে প্রায় গোল দেখেছি।'

—'আজকের রাত যাদুর রাত। আজ রাতে চাঁদের আলোয় অশরীরীরা নেমে আসবেন পৃথিবীর বুকে। মন্দির-পিরামিডে অনেক...অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটবে। আপনি কি সেসব দেখতে চান?'

—'কি বলছ তুমি!' জিওফ্রের কণ্ঠে একই সঙ্গে বিস্ময় আর প্রশ্ন।

—'ঠিকই বলছি। বছরে একবার করে পূর্ণিমার রাতে বিদেহী আত্মারা মাটির মায়ের কোলে ফিরে আসেন। শুরু করেন তাঁদের নানা আচার-অনুষ্ঠান। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, ভাবছেন কি সব আজগুবি কথা বলছি, বেশ তো, আজ

রাতে চলুন আমার সঙ্গে। নিজের চোখে সব কিছু দেখবেন। দেখবেন বহুকাল আগে প্রয়াত মানুষেরা কেমন করে চন্দ্রদেবীর পুজো করেছেন।'

প্রলোভনটা সাংঘাতিক। বেলিউ বয়সে তরুণ! দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য কম থাকলেও ওর রক্তে রয়েছে 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর নেশা।

বাবা ছিলেন দুঃসাহসী নাবিক আর মামা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযাত্রী। কিন্তু এই অদ্ভুত মানুষটার আজগুবি কথাগুলো বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? ওর কথায় উৎসাহ না দেখালেই বোধহয় ভালো। আচ্ছা, আগে ভাল করে শোনাই যাক না ওর কথাগুলো। শুনতে তো আর কোন দোষ নেই।

—'আচ্ছা শোনা যাক, তুমি কি বলতে চাইছ, তুমি যা বলছ, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ছল-চাতুরী বা কৌশল রয়েছে।'

—'কিছু না, কিছু না, কোন ছল-চাতুরী বা কৌশল নেই। সত্যি বলছি আজ রাত হল যাদুর রাত। শুনুন—কুইকিসটো তার মুখ নিয়ে এল জিওফ্রের কানের কাছে, অদ্ভুত সুরেলা গলায় বলল, 'শুনুন...আজ হল পূর্ণিমা—বহু বহু বছর আগে এমনি রাতে এখানকার লাল মানুষেরা মিছিল করে আসত চন্দ্রদেবীর পিরামিড মন্দিরে। উৎসব হত...বিরাট!...বিপুল উৎসব!...নরবলি দেওয়া হত দেবীর উদ্দেশ্যে। বছরের একটি দিনে এমনি পূর্ণিমা রাতে এখনও সেসব দেখা যায়। ছায়া-শরীরীরা নেমে আসে মাটির টানে...আজ সেই রাত মিঃ বেলিউ আজ সেই রাত..আপনি দেখবেন সেসব? আপনি দেখবেন? আমি...হ্যাঁ আমিই আপনাকে সেসব দেখাব...দেখবেন অতীত কেমন করে জীবন্ত হয়ে উঠছে, ছায়া কেমন করে কায়া ধরছে...সেই ছায়া কায়ার মায়াপুরে আমি আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি যাবেন তো...নিশ্চয়ই যাবেন...নিশ্চয়ই যাবেন...যেতেই হবে আপনাকে...''

বেলিউ হেসে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে ওর মনেও যাদুর ছোঁয়া লেগেছে।

—'আপনি হাসছেন!' আহত স্বরে কুইকিসটো বলল।

—'হাসব না তো কি, বহুকাল আগে হয়ত এদেশীয়রা এখানে মিছিল করে আসত, চন্দ্রদেবীর পূজা দিত, নরবলি হত। কিন্তু আজ রাতে আর কি ঘটবে? সেসব আচার-অনুষ্ঠান তো কতকাল আগে শেষ হয়ে গেছে। সেসব পুরোহিতই বা এখন কোথায়?'

স্থির দৃষ্টিতে কুইকিসটো তাকিয়ে রইল জিওফ্রের চোখের দিকে। কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না! কুইকিসটোর দৃষ্টিটা যেন অন্তর্ভেদী। বেলিউ-র মনের গহন গোপন কোণে কি রয়েছে তা ও দেখতে পাচ্ছে। সেই দৃষ্টির পরশে ওর মনের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত উৎসাহের আলোড়ন উঠল। ধীরে ধীরে জিওফ্রের সজাগ

মনের চিন্তা-ভাবনাগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। কুইকিসটো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জিওফ্রের দিকে। সে একটুও নড়ল না, কোন কথাও বলল না।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। দুজনেই নিস্তব্ধ। শেষপর্যন্ত কুইকিসটো তার ডান হাতখানা তুলল। জিওফ্রের মুখের সামনে দিয়ে তুলল হাতখানা তারপর ধীরে ধীরে নামাল। ওর হাতের তালু জিওফ্রের চোখ আর মুখের সামনে দিয়ে নামল। জিওফ্রে যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ল। সে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দোভাষীর দিকে। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কুইকিসটো বিড়বিড় করে বলল।

'—আপনি আসবেন...আপনাকে আসতেই হবে। আজ রাতে পিরামিড-মন্দিরে সিঁড়ির গোড়ায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

—'দেখা হবে,' যেন মন্ত্রমুগ্ধের সুরে শব্দ দুটি উচ্চারণ করে জিওফ্রে।

—'চাঁদ উঠবার সময় আমাদের দেখা হবে,' সাপ-খেলানো সুরে কুইকিসটো বলল।

—'চাঁদ উঠবার সময় আমাদের দেখা হবে,' সম্মোহিতের মতো জিওফ্রে কুইকিসটোর কথাগুলোই আওড়ে গেল।

বিচিত্র ভঙ্গীমায় জিওফ্রের মুখের সামনে আবার হাত নাড়ল কুইকিসটো। তারপর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলে গেল সেখান থেকে। আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইল জিওফ্রে।

একটু পরে হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল জিওফ্রে। চোখ কচলালো। তাকাল চারপাশে। কেউ নেই। সে একা। তাঁবু থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছে। সে এখানে এল কেন? এখানে তো তার আসবার কথা নয়, তবে? আগের কয়েক মুহূর্তের কথা মনে করবার চেষ্টা করল জিওফ্রে। সব অস্পষ্ট...সব আবছা...সব যেন কুয়াশায় ঢাকা। কি একটা ব্যাপার যেন মনে এসেও আসছে না...না না, ব্যাপার নয়, কি একটা নাম...কার নাম?...কার নাম? ভেবে লাভ নেই কিছুতেই মনে পড়ছে না। আচ্ছা তাঁবু থেকে এতদূর এসে ওকি কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

টলতে টলতে তাঁবুর দিকে এগোল জিওফ্রে। তাঁবুতে পৌঁছেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। আবার বোধহয় কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। মাথাটা ঘুরছে, কেমন যেন বমি বমি ভাব। সারা শরীরে কেমন যেন অস্বস্তি।...একসময় ঘুমিয়ে পড়ল জিওফ্রে।

সারাদিনের কাজের শেষে অধ্যাপক বেকার আর ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস যখন

তাঁবুতে এলেন তখন জিওফ্রে বেলিউ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

—'ঘুমোক, ওর এখন বিশ্রামেরই প্রয়োজন', ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস বললেন। অধ্যাপক এবং ক্যাপ্টেন দু'জনেই একটু ঝুঁকে জিওফ্রের দিকে তাকিয়েছিলেন।

অধ্যাপক জিওফ্রের নাড়ী দেখে বললেন, 'হুঁ', নাড়ী তো দেখছি প্রায় স্বাভাবিক। ঠিকই বলেছেন আপনি, ওর এখন দরকার প্রচুর বিশ্রাম আর ঘুম। তা-ই হল ওর সবচেয়ে বড় ওষুধ। ও ঘুমোক, আমরা বাইরে গিয়ে আজকের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করি। কালকের কাজের পরিকল্পনাটাও ছকে ফেলা যাবে সেইসঙ্গে।

গত রাতের মতো আজও ওরা আলোচনা শুরু করলেন নানা বিষয় নিয়ে। এবারের অভিযানে কতদিন কাজ করবে...আজকে যা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেল সেগুলির প্রকৃত মূল্যায়ন ক্যাম্পে বসে কতটা করা সম্ভব...যে চিত্রলেখা পাওয়া গিয়েছে তার সঙ্গে এ যাবৎ জানা কোন চিত্রলেখার মিল আছে কিনা—থাকলেই বা কতটা আছে...এসব ব্যাপার নিয়ে ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিসের মনেও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহ এবং কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার হলেও প্রত্নবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর একটা মোটামুটি প্রাথমিক জ্ঞানও ছিল।

দুজনে আলোচনায় মশগুল। কতটা সময় কেটে গেল সে সম্পর্কে ওঁদের কোন হুঁশ রইল না। হঠাৎ একসময় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে ওঁরা সচেতন হলেন।

জিওফ্রে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁবুর বাইরে। আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও। একটু নড়ন চড়ন নেই। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা পাথরের তৈরি মূর্তি।

অধ্যাপক বেকার গেলেন জিওফ্রের কাছে, বললেন, 'এখন কেমন লাগছে, শরীরটা একটু ঝরঝরে মনে হচ্ছে তো বাবা?'

যেন চমকে উঠল জিওফ্রে, তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। আর দিন দুয়েক বিশ্রাম নিলেই মনে হয়, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠব।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ উঠবেই তো, তা বাবা, তোমার নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে। আগে কিছু খেয়ে নাও! তোমার জন্যে ফ্লাস্কে চা রয়েছে।'

—'হ্যাঁ, সত্যিই আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।'

—'যাও যাও আর কথা নয়, আগে ভাল করে খেয়ে-দেয়ে নাও।'

তাঁবুর মধ্যে ঢুকল জিওফ্রে। বেশ পেট পুরেই খাওয়া-দাওয়া করল।

খাদ্যদ্রব্যও খারাপ নয়। এসব দিকে অধ্যাপকের বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। উনি নিজেও একটু ভোজন-বিলাসী। টিন-বন্দী খাবার তো প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন, তাছাড়া রয়েছে স্থানীয় সরবরাহ।

খাওয়া শেষ করে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল জিওফ্রে।

—'খেয়েছ?' অধ্যাপক বেকার জিজ্ঞেস করলেন।

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে এবার বস এখানে। আজকে যে জিনিসগুলো পাওয়া গিয়েছে, শরীর সুস্থ থাকলে কাল তুমি সেগুলির প্রাথমিক 'ক্লাসিফিকেশন' করবে। তুমি প্রত্নতত্ত্ব পড়ছ, কাজেই কাজটা তোমার পক্ষে খুব একটা শক্ত হবে না। তোমার কাজ শেষ হলে আমি তা দেখব। ভুল-ভ্রান্তি হলে তা শুধরে দেব। এটা তোমার একটা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং হবে।'

—'বেশ।'

—'এখন বস এইখানে, কুইকিসটোর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করতে যেও না। লোকটা দোভাষী হিসেবে খুবই ভাল, কিন্তু বড্ড বেশি গাল-গল্প করে।'

—'আমি বরং এখন একটু ঘুরে আসি। এখন তো গরম নেই, তাছাড়া আমার শরীরটাও বেশ ঝরঝরে লাগছে।'

—'ঠিক আছে, তবে বেশি দূর যেও না। একটু পরেই মাটি থেকে একটা ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব উঠবে, তার আগেই ফিরে এস। যাও ঘুরে এস একটু।'

ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল জিওফ্রে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল টিবিটার দিকে।

।। তিন।।

পিরামিড-মন্দিরটার কাছে এসে পড়ল জিওফ্রে। ভাবল, এবার কি করণীয়! কেন যে এ পথে ও এল তা জিওফ্রে বুঝতে পারছিল না। ওকি স্বেচ্ছায় এসেছে? দূর, এসব কি উদ্ভট উৎকট চিন্তা! ও নিজেই এসেছে। শরীরটা বোধহয় এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি তাই এইরকম মনে হচ্ছে। ঐ তো পিরামিডটা। কেমন একটা প্রাগৈতিহাসিক অতিশয় জন্তুর মতো মনে হচ্ছে পিরামিডটাকে। ওর বুঝি বিশ্বগ্রাহী ক্ষুধা। সামনে যা পাবে তাই গ্রাস করে ফেলবে। নাঃ, আবার উদ্ভট চিন্তাটা ওকে পেয়ে বসেছে! এরকম কথা ও আর ভাববেই না।'

মন্দির-পিরামিডের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল জিওফ্রে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণচন্দ্র। আজ পূর্ণিমা।

কি একটা কথা জিওফ্রের মনে মনে আসি আসি করেও আসছে না।

একি সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা লোক বসে আছে না! লোকটার আপাদমস্তক একখানা রঙীন কম্বলে ঢাকা।

জিওফ্রে সিঁড়ির কাছে আসতেই লোকটা উঠে দাঁড়াল। কম্বলখানা খুলে ভাঁজ করে রাখল কাঁধের উপর।

কুইকিসটো!

—'কুইকিসটো কি করছ এখানে?'

—ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল কুইকিসটো। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল জিওফ্রের দিকে।

—'তাহলে! মিঃ বেলিউ তাহলে এলেন শেষ পর্যন্ত। ভাল...ভাল...খু...উ...ব ভালো। আজ রাত যাদুর রাত। নিঝুম রাতে প্রেতপুরীর বিদেহী বাসিন্দারা আজ নেমে আসবেন এখানে। পুজো করবেন চন্দ্রদেবীর...বলি দেবেন...মৃত আজ জীবন্ত হয়ে উঠবে। আমরা দেখব সেসব...আমি দেখাব আপনাকে। ভয় পাবেন না...ভয় কি?...আমি তো রয়েছি আপনার সঙ্গে। আপনি মহাভাগ্যবান। অবিশ্বাসীরা এসব দৃশ্য দেখতে পায় না। আমি জানি আপনার মনে বিশ্বাস আছে...তাই তো আপনাকে দেখাব। এবার আসুন! আসুন আমার সঙ্গে।

হাত তুলল কুইকিসটো, যাদুকরের ভঙ্গীতে হাতখানা ঘুরিয়ে নিল জিওফ্রের মুখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে জিওফ্রের সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল, মুখ হল কৌতূহলহীন—একেবারে ভাবলেশহীন।

এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল। মাটি থেকে উঠতে লাগল উত্তপ্ত বাষ্প। একটা অতিকায় কালো বাদুড়ের ডানায় মুহূর্তের জন্য ঢেকে গেল চন্দ্রগোলক। সমস্ত পরিবেশটাই যেন আচম্বিতে প্রেতায়িত হয়ে গেল।

এবার পিরামিডটার দিকে এগোল কুইকিসটো। নিশির ডাকে ঘুমন্ত মানুষ যেমন পথ চলে ঠিক তেমনিভাবে তাকে অনুসরণ করল জিওফ্রে বেলিউ। তার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছার এক ফোঁটা যেন আর অবশিষ্ট নেই। কুইকিসটোর ইচ্ছাই এখন তার ইচ্ছা। কুইকিসটো এখন তাকে যেমন করে চালাবে সে তেমনিভাবে চলবে।

সিঁড়ি দিয়ে পিরামিডে উঠতে লাগল দু'জনে। প্রথম প্ল্যাটফর্মটায় পৌছল। তারপর কুইকিসটো ঘুরল ডান দিকে। বিশাল পিরামিড মন্দিরের একটা পাশ সম্পূর্ণ ঘুরে সে এসে থামল একটা জায়গায়। তারপর খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট করেই একখণ্ড পাথরের উপর শরীরের সমস্ত চাপ দিল। ধীরে ধীরে পিরামিডের

গায়ে একখানা চৌকো পাথর ঘুরে গেল। দেখা গেল একটা সংকীর্ণ দ্বারপথ। কুইকিসটো ঢুকল সে পথে। জিওফ্রেকে সঙ্গে আসতে ইশারা করল। নিঃশব্দে অনুসরণ করল জিওফ্রে।

পিরামিডের ভিতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। এ অন্ধকার বুঝি হাতে ধরা যায়। এ অন্ধকারে বুঝি মাথা ঠুকে যায়। পকেট থেকে দেশলাই বের করল কুইকিসটো। একটা মশাল জ্বালাল। ও আগেভাগেই সব সাজ-সরঞ্জাম ঠিকঠাক করে রেখে গিয়েছিল। মশালটাকে ও দেওয়ালের একটা ফাটলে গুঁজে দিল, তারপর মশালটা ভাল করে জ্বললে ফাটল থেকে বের করে সেটাকে হাতে নিল। এক হাতে মশালটাকে উঁচু করে অন্য হাতে জিওফ্রের হাত ধরে সামনের দিকে এগোল কুইকিসটো।

পিরামিডের গর্ভে আঁকাবাঁকা পাথুরে পথ! মশালের আলো সম্বল করে সে পথে এগোল দু'জনে। শেষ পর্যন্ত ওরা এসে পৌছল একখানা ঘরে। ঘরখানা কুড়ি ফিট বাই বারো ফিট। দেওয়ালের দু'খানা পাথরের মাঝখানে একটা সংকীর্ণ ফাটল। সেই ফাটলে মশালের গোড়াটা গুঁজল কুইকিসটো—নতুন একটা মশাল জ্বালাল। এ মশালটাকেও আগেভাগেই ঘরের ভিতরে এনে রাখা হয়েছিল।

ঘরখানি খালি—কোন জিনিসপত্র নেই। কিন্তু দেওয়ালে খোদাই করা রয়েছে প্রাচীন আমলের সূক্ষ্ম কারুকার্য। ঘরের চারপাশের দেওয়ালে মেঝে থেকে এক গজ উঁচু পড়ন্ত জায়গায় রয়েছে অপূর্ব সব চিত্র-কলার নিদর্শন। তার উপরে দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা রয়েছে নানা দেবতা আর পুরোহিতদের মূর্তি। ঘরের সিলিং-এ খোদাই করা বিশাল চন্দ্রগোলক। তার মধ্যে চন্দ্রদেবীর প্রতিমূর্তি।

নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল বেলিউ। সে যেন একটা যন্ত্র। যন্ত্রীর পরশের অপেক্ষায় রয়েছে। যন্ত্রীর ছোঁয়া পেলেই যন্ত্র হবে সচল..হবে প্রাণবন্ত।

কুইকিসটো দেরি করল না। সে ঘরের কোণ থেকে একটা ফ্লাস্ক নিয়ে এল। জিওফ্রের মুখের সামনে কয়েকবার হাত ঘুরিয়ে সে 'ফ্লাস্ক' থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢালল একটা পানপাত্রে, তারপর পানপাত্রটা জিওফ্রের দিকে এগিয়ে ধরে সাপ খেলানো সুরে শুরু করল ঃ

—'পান করুন মিঃ বেলিউ...পান করুন... এরকম জিনিস আগে কখনও চোখে দেখেননি...আমরা লাল মানুষেরাই কেবল এরকম পানীয় তৈরি করতে পারি...এ পানীয় তৈরি করা হয় বিশেষ প্রয়োজনে...আমি নিজের হাতে আপনার জন্য এ অমূল্য সুরাসার তৈরি করেছি...পান করুন...পান করুন...।'

জিওফ্রে পান করল।

ঘুম—ঘুম—ঘুম! জিওফ্রের দু'চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসছে। কে যেন ঘুম পাড়ানিয়া গান গাইছে—ঘুমোও—ঘুমোও—ঘুমোও—আয় ঘুম আয়—তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ঘুম আয়—চাঁদের আলোর বন্যায় সাঁতার কাটতে কাটতে ঘুমের দেশ থেকে ঘুম পরীরা নেমে আয়—আয় ঘুম আয়—

অন্ধকার! অন্ধকার! সবই এখন অন্ধকার! মশালের দীপ্তি হারিয়ে ফেলছে—ওগুলো নিভে আসছে। ও কে? নিজেকে বুঝি হারিয়ে ফেলেছে জিওফ্রে। ও কোথায়? ও কেন এসেছে এখানে? কেন? কেন? মাথার মধ্যে তরল অন্ধকারের স্রোত। মাথাটা অসার হয়ে আসছে। আর কিছু ভাবতে পারছে না জিওফ্রে।

জিওফ্রে পড়ে যাচ্ছিল। দু'খানা শক্ত হাত বাড়িয়ে কুইকিসটো ধরে ফেলল ওর অবচেতন দেহটাকে। পাথুরে মেঝের উপর ভাল করে শুইয়ে দিল জ্ঞানহারা জিওফ্রেকে।

।। চার।।

কোথায় যেন একঘেয়ে সুরে মন্ত্রপাঠ হচ্ছে। সুরের সঙ্গে তাল রেখে হাত তালি দিচ্ছে যেন কারা। আচম্বিতে উচ্চগ্রামে কেমন যেন ঢেউ খেলানো সুরে কে যেন গান শুরু করল। গান চলছে তো চলছেই—থামবার কোন লক্ষণ নেই। মন্ত্র বা গানের ভাষা জিওফ্রে বুঝতে পারছে না। কিন্তু এ সুর এ মন্ত্রের ধ্বনি রক্তে কেমন মাতন ধরিয়ে দিচ্ছে। দেহের ভিতর উঠছে যেন প্রচণ্ড ঝড়।

পিরামিড মন্দিরের সবচেয়ে উঁচু প্ল্যাটফর্মটার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে বেলিউ। নীচের দিকে তাকালে দেখা যায় জনস্রোত। হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হয়েছে পিরামিডের পাদদেশে। চারদিক থেকে আরও জনতার প্রবাহ আসছে!

আকাশে পূর্ণচন্দ্র। আকাশ নির্মেঘ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎ যেন প্লাবিত।

সিঁড়ির নীচে হাজার হাজার লালচে-বাদামী মানুষ দেখে বেলিউ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল। লোকগুলো অর্ধনগ্ন প্রায় নগ্ন। তারা শূন্যে হাত তুলছে। হাত নাড়ছে। চীৎকার করছে। প্রত্যেকটা মানুষ উত্তেজনায় উন্মত্ত।

উইঢিপি ভেঙে দিলে যেমন পিল পিল করে উই পোকারা বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনি করে দলে দলে বেরিয়ে আসছে মানুষ—জড়ো হয়েছে পিরামিডের নীচে, সিঁড়ির প্রথম ধাপের কাছে।

জিওফ্রে পিছন ফিরল। সে দাঁড়িয়ে আছে একটা মন্দিরের প্রবেশ পথের

কাছে। এ মন্দির চন্দ্রদেবীর মন্দির। মন্দিরের থাম আর দেওয়ালে দেবীর খোদাই করা মূর্তি। দামী পোশাক পরা অনেক পুরোহিতের মূর্তিও খোদাই করা রয়েছে এখানে ওখানে। পুরোহিতেরা নতজানু। ওরা বোধহয় আকাশের রাণীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

মন্দিরের মাঝখানে একখানা বিশাল গোলাকার প্রস্তরখণ্ড। প্রস্তরখণ্ডের উপর বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য। গোল পাথরখানার মাঝখানে একটা বিরাট গর্ত। গোলাকার পাথরখানার তিন পাশে তিনজন পুরোহিত। চন্দ্রদেবীর পুরোহিত। ওরা তিনজনই প্রথম শ্রেণীর পুরোহিত। ওদের হাতে হাড়ের তৈরী অত্যন্ত ধারাল তিনখানা ছুরি। কিছুটা নিশ্চল। ওরা অপেক্ষা করে আছে। কিসের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা?

নীচের জনতার তুমুল কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল। কোথাও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। চারিদিক নিঝুম থমথম...! একটা অলৌকিক-অপার্থিব পরিবেশ যেন ঘনিয়ে আসছে!

জিওফ্রে তাকাল নীচের দিকে। লাল মানুষেরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে! ওদের মাঝখানে এখন পথের মতো একটা ফাঁকা জায়গা। পথটা চলে গিয়েছে সিঁড়ি পর্যন্ত। স্ট্যাচুর মতো নিশ্চল পুরোহিতেরা হঠাৎ যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। আঙ্গুল দিয়ে ছুরির ধার পরীক্ষা করল তারা। তাকাল নীচের সিঁড়ির দিকে।

হঠাৎ জিওফ্রের মনে হল তার পাশে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে! তাকিয়ে দেখল এক অর্ধনগ্ন মূর্তি। লোকটার মুখখানা কেমন চেনা-চেনা লাগছে! হ্যাঁ হ্যাঁ, এতো দোভাষী কুইকসিটো। ও এখানে কি করে এল? আগের কতকগুলো ঘটনা যেন মনে এসেও আসছে না!

ফিস ফিস করে বলতে লাগল কুইকিসটো, 'আসছে...সে আসছে মিঃ বেলিউ।...বলি আসছে...চন্দ্রদেবীর বলি। আকাশের দিকে তাকান...দেবী গোল হয়েছেন...সম্পূর্ণ গোল...শুভ মুহূর্ত এগিয়ে আসছে।'

চমৎকার ইংরাজীতে কথা বলছে কুইকিসটো। ওর ইংরেজী তো ভাঙা ভাঙা। এত চমৎকার ভাষায় তো ও বলে না। কিন্তু জিওফ্রে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছে যে কুইকিসটোর মুখে এমন পরিশীলিত ভাষা শুনেও অবাক হল না, বরং নিজেই ফিস ফিস করে বলল, 'বল আমায় আরো বল। দেখ, নীচে সিঁড়ির দিকে একজন লোক এগিয়ে আসছে।'

—'ঐ তো বলি মিঃ বেলিউ। বছরের এ সময় পূর্ণিমা-তিথিতে দেবী যখন মাথার উপর দিয়ে উঠে আসেন তখন আমাদের বন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর—

সবচেয়ে শক্তিমানকে বেছে নেওয়া হয় বলির জন্যে। বলির আগে তাকে এক মাস স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সম্পদ দেওয়া হয়। সেই একমাস আমাদের সবকিছু তার হয়ে যায়। অবশ্য সে যাতে পালাতে না পারে সেদিকে নজর রাখা হয়। এখন এই বলির শুভ মুহূর্তে তাকে এগিয়ে আসতেই হবে। দেখুন।'

দু'দল জনতার মাঝখানের ফাঁকা পথে একটা মিছিল এগিয়ে এল। মিছিলটা এসে থামল সিঁড়ির সামনে। লম্বা, সুগঠিত নমনীয় দেহের একজন মানুষ এগিয়ে এল। লোকটার মাথায় কোন পাখীর পালকের মুকুট নেই। উর্ধাঙ্গে কোন বসন নেই, নিম্নাঙ্গে সাদা কৌপীনের মতো একখণ্ড কাপড়।

ধীরে ধীরে লোকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে থেমে একবার করে পাথরে পদাঘাত করতে লাগল।

—'কি করছে লোকটা?' ফিস ফিস করে বেলিউ জিজ্ঞেস করল।

—'প্রত্যেক ধাপে মাটির বাঁশি ভেঙে আসবার অনুকরণ করছে।' ফিসফিস করেই উত্তর দিল কুইকিসটো।

—'তার অর্থ?'

—'এ মরজগতে ও যে সমস্ত গান—সমস্ত আনন্দ ফেলে যাচ্ছে, ঐ পদাঘাত হল তারই প্রতীক।'

বলি ততক্ষণ প্রথম প্ল্যাটফর্মে পৌছে গেছে। এখানে সে একটু থামল। তাকাল নীচের দিকে। নীচের উন্মত্ত জনতা তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল। হাত নেড়ে এবং নানা অঙ্গভঙ্গি করে বলিকে সামনে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল। বলি তাকাল উপরের মন্দিরের দিকে। তারপর আবার উঠতে লাগল। দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মটায় পৌছে সে আবার থামল। বেলিউর মনে হল সে বলির মুখখানা দেখতে পাচ্ছে। সুন্দর মুখ। সে মুখে সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের ছাপ।

দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে লোকটা আবার উঠতে লাগল। এটাই শেষ পর্যায়ের ওঠা। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় বেলিউ এবার লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠেছে ও। ওর ঘামে ভেজা শরীরটা চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। সুগঠিত শরীরে পেশীগুলো তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে সিঁড়ি ভাঙবার সময়ে।

লোকটা এবার তৃতীয় প্ল্যাটফর্মটার কাছাকাছি এসে পড়েছে। মন্দিরের তিন পুরোহিত প্রতীক্ষা করে আছে ব্যগ্রতা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে। প্রধান পুরোহিত ডান হাতের শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছে হাড়ের ছুরিখানা। চাপা উত্তেজনায় তার বাঁ হাতের মুঠি একবার খুলছে...একবার বন্ধ হচ্ছে।

বেলিউ আর তার সঙ্গীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দীর্ঘদেহী বলীয়ান বলি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল তিন পুরোহিতের দিকে। নীচের জনতার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল সে।

নীচ থেকে ভেসে এল তুমুল কোলাহল শব্দ। উন্মত্ত জনতা দুর্বোধ্য ভাষায় তিন তিনবার যেন গর্জন করে উঠল।

তারপর সব চুপ। কোনদিক থেকে ক্ষীণতম শব্দটুকু পর্যন্ত আসছে না। এ এক অসহ্য স্তব্ধতা!

বলি এগিয়ে এল প্রধান পুরোহিতের কাছে। অভিবাদনের জন্য মাথা নীচু করে বলিষ্ঠ এবং পেশীবহুল দু'খানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরল বিনীত প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

প্রধান পুরোহিত গতিহীন—নিশ্চল। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বলির চমৎকার পৌরুষময় সুগঠিত দেহখানার দিকে। এইবার চন্দ্রদেবীর কাছে ওকে বলি দেওয়া হবে। আকাশের রাণী তৃপ্ত হবেন।

জিওফ্রে ফিসফিস করে তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলঃ

—'লোকটাকে নিয়ে এখন কি করা হবে?'

—'এবার পুরোহিতেরা ওকে হত্যা করবে, তারপর দেহটাকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে নীচে—জনতার কাছে।'

—'শয়তানের দল!' জিওফ্রের কণ্ঠস্বর হিসহিস করে উঠল।

—'কে শয়তান?' কুইকিসটো জিওফ্রের মুখের সামনে একবার ডান হাতখানা ঘুরিয়ে নিল।

জিওফ্রের সমস্ত দেহটা এবার থর থর করে কেঁপে উঠল।

—'কে শয়তান? কে শয়তান?' তীব্রস্বরে কুইকিসটো আবার প্রশ্ন করল।

—'কেউ নয়, কেউ নয়..।'

—'বলুন কে শয়তান? কারা শয়তান?' তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করল।—'সাদা মানুষেরা শয়তান। তারা আমাদের দেশ কেড়ে নিয়েছে। আমাদের সভ্যতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা যারা আছি, তারাও এখন নিজদেশে পরবাসীর মতন। নিছক বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের ঘৃণ্য দাসত্ব বরণ করতে হয়। শয়তান ঐ সাদা মানুষেরা আজ আমাদের প্রভু! কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না। জ্যোতির্ময় মহান সূর্য-দেবতা আর দীপ্তিময়ী মহান শক্তিধারিণী চন্দ্রদেবীর বরে আবার আমরা জেগে উঠব...আবার আমাদের অভ্যুত্থান হবে। আজটেক আর ইনকা সভ্যতার বিলুপ্ত গৌরব—বিগত মহিমা

আমরা ফিরিয়ে আনব।' উত্তেজনায় এবং আবেগে কুইকিসটোর গলার স্বর থর থর করে কাঁপতে লাগল

—'তুমি! তুমি কে! আচ্ছন্নের মতো জিওফ্রে জিজ্ঞেস করল!'

—'আমি? কেন আমি দোভাষী কুইকিসটো!'

—'না না, তোমার সত্য পরিচয় কি?'

—'আমি লাল মানুষদের শেষ রাজার শেষ বংশধর। আমার দেহের শিরায় শিরায় বইছে রাজরক্ত—খাঁটি লাল মানুষের রক্ত। তোমরা আমাকে বর্ণশংকর ভেবেছ, আমি কিন্তু মোটেই তা নই বিদেশী।'

কিছুটা আত্মস্থ হল কুইকিসটো। তারপর বললঃ

—'এক্ষুণি বলি হবে। অনুষ্ঠানটা ভাল করে দেখুন মিঃ বেলিউ।

—'বলির দেহটা নিয়ে কি করা হবে?'

—'নীচের জনতা ওর দেহটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে!

বলি মাথা নীচু করে হাত দুখানা সামনে বাড়িয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছুরি তুলে প্রধান পুরোহিত এগিয়ে এল। হতভাগ্য বন্দীর কাছ থেকে পুরোহিত এখন মাত্র এক পা দূরে। বলির গলাটা চেপে ধরবার জন্য প্রধান পুরোহিত বাঁ হাতখানা বাড়ালেন..

।। পাঁচ ।।

আচম্বিতে বন্দী সোজা হয়ে উঠল। বিদ্যুৎগতিতে সে এক লাথি মারল প্রধান পুরোহিতের পেটের উপর। আচমকা লাথি খেয়ে পুরোহিতের মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ হল শুধু। সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল পাথুরে মেঝেতে।

বাকী দু'জন পুরোহিত ছুরি উঁচিয়ে লাফিয়ে এল বলির দিকে। কিন্তু প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে ওদের একজন ঘুরে পড়ে গেল। তৃতীয় পুরোহিত তার ছুরি বসিয়ে দিল বাহুমূলে। কিন্তু এটাই তার শেষ কাজ। বাহুমূলে ছুরি গিঁথে গেলেও অসীম শক্তিশালী বন্দী দুই হাতে তৃতীয় পুরোহিতের গলা টিপে ধরে তাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে—জনতার মাঝখানে।

জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। জনতার ধারণা হল বলিকে তাদের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। কয়েকজন তো দারুণ উত্তেজনায় ছুটতে ছুটতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে খানিকটা উপরেই চলে এল।

এদিকে চেতনা ফিরে পেয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল প্রধান পুরোহিত। ছুরি তুলে সে বলির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। বলির মুখ সামনের দিকে। সে কিছু বুঝে

উঠবার আগেই পুরোহিত তার পিঠে আঘাত করতে চাইল।

কিন্তু না, প্রধান পুরোহিত এবারও বলিকে আঘাত করতে পারল না। ছুটে গিয়ে পুরোহিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জিওফ্রে বেলিউ। আচমকা বেলিউর পল্কা দেহের ধাক্কায় প্রধান পুরোহিতের ভারী দেহটা ঘুরে গেল। পুরোহিতের উদ্যত হাতখানাকে টেনে নামাল বেলিউ। বলির পিঠে আর ছুরির আঘাত করা হল না।

পুরোহিতের হাত থেকে ছুরিখানা পড়ে গেল। সে এবার জাপটে ধরল বেলিউকে। দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়ল মন্দিরের মেঝেতে।

বন্দী বলি চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ঘুষি খেয়ে অচৈতন্য দ্বিতীয় পুরোহিতের দেহটাও সে ছুঁড়ে দিল নীচের দিকে। এবার সে এগিয়ে এল বেলিউকে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু বেলিউ আর প্রধান পুরোহিত তখন জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে প্রথম প্ল্যাটফর্মের কিনারায় এসে পড়েছিল। এক মুহূর্ত ওরা কিনারায় রইল। তারপর জড়াজড়ি করে ওরা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল নীচে।

'বলি হতবাক!

।। ছয়।।

'বেলিউ কোথায় গেল?' সারা রাত অধ্যাপক বেকার আর ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস পরস্পরকে বারবার একই প্রশ্ন করলেন। সমস্ত ক্যাম্পটাকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। সন্ধানকারী দল পাঠানো হয়েছে নানান দিকে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত জিওফ্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কুইকিসটো? সে হতভাগাই বা কোথায় গেল? জিওফ্রে কি কুইকিসটোর সঙ্গেই কোথাও গেল নাকি? ছেলেটাও তো আচ্ছা অবিবেচক— কাউকে কিছু না জানিয়ে—

সকাল হল। জিওফ্রের দেখা নেই। অধ্যাপক বেকার এবং ক্যাপ্টেন ক্লান্ত— তাঁদের মনে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠছে।

কোনরকমে নমো নমো করে প্রাতঃরাশ সেরে অধ্যাপক দলের সমস্ত কুলি-কামিনকে ডেকে পাঠালেন। এবার কুইকিসটোকেও দেখা গেল।

—'ক্যাম্প ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে কাল?' ক্রুদ্ধস্বরে ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলেন।'

—'আজ্ঞে, বিশেষ প্রয়োজনে একবার গাঁয়ে যেতে হয়েছিল।'

—'জানিয়ে যেতে পারোনি?' অধ্যাপকের কণ্ঠে ক্রোধ।

—'আজ্ঞে খবরটা শুনে হঠাৎ চলে যেতে হল, জানিয়ে যাবার সময় পেলাম না,' মাথা চুলকে কুইকিসটো বলল, 'আবার ফিরে এসে শুনছি মিঃ বেলিউকে নাকি—'

—'পাওয়া যাচ্ছে না,' উৎকণ্ঠিত স্বরে অধ্যাপক বললেন, 'ঠিকই শুনেছ। শোন এবার কি করতে হবে—'

—'বলুন!'

—'তোমার লোকজনদের ছোট ছোট দলে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ভাগকে এক একটা এলাকায় খুঁজতে হবে। হ্যাঁ, তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে।—প্রতিটি ইঞ্চি জমি খুঁজতে হবে।—সন্ধানকারীদের পাঠিয়ে তুমি সোজা এখানে চলে আসবে। ক্যাপ্টেন, তুমি আর আমি যাব পিরামিডের দিকে। জিওফ্রে ওদিকটায় খুব ঘুরঘুর করত। যাও, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে এস!'

নানাদিকে সন্ধানকারী দল পাঠিয়ে পনের মিনিটের মধ্যেই ফিরল কুইকিসটো।

—'আর এক মুহূর্ত দেরি নয়, চলো বেরিয়ে পড়ি। কুইকিসটো, মিঃ বেলিউ কোন্‌দিকে যেতে পারে বলে মনে হয়? জানো ওর শরীর সুস্থ নেই।' অধ্যাপক বললেন।

কুইকিসটোর মুখ ভাবলেশহীন। যেন মরার মুখোশ পরে আছে ও। অধ্যাপকের কথা শুনে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল কুইকিসটো, তারপর বললঃ

—মিঃ প্রফেসর, মিঃ বেলিউকে যে খুঁজে পাবে তাকে আপনি টাকা দেবেন—এরকম একটা ঘোষণা যদি আমার লোকজনদের মধ্যে করা যায় তাহলে বোধহয় সুফল হবে। পুরস্কারের লোভে প্রত্যেক সন্ধানকারীই তখন ভাল করে খুঁজে দেখবে।'

—'এটা মন্দ বলনি। জিওফ্রেকে যদি জীবিত অবস্থায় ফিরে পাই, তবে পুরস্কার দিতে আমার আপত্তি নেই।'

—'আমি আমার লোকজনদের কাছে পুরস্কারের কথাটা ঘোষণা করেই এসেছি। ভেবেছি এতে আপনার কোন আপত্তি হবে না—আপত্তি হবার কথাও নয়।' নির্বিকারভাবে কুইকিসটো বলল।

—'পুরস্কার ঘোষণা করেই এসেছ! কত ঘোষণা করেছ?'

একটু তেরছা হাসি হাসল দোভাষী, তারপর বললঃ

—'বেশি বলিনি মিঃ প্রফেসর। আপনারা দেশ ছেড়ে বিদেশ বিভুঁই-এ এসেছেন—যে কাজে এসেছেন—তাতে কত টাকার দরকার আপনাদের—আমার

তো একটা বিবেচনা আছে।'

—'তবু শুনি কত বলেছ?'

—'বললাম তো বেশি নয়, মোটে একশ' পাউণ্ড।'

টাকার অঙ্কটা শুনে খাবি খেলেন অধ্যাপক। কিন্তু পরক্ষণেই অনুসন্ধানের গুরুত্ব বুঝতে পেরে বললেনঃ

—'এমনি দুঃসময়ে তুমিও ঘাড়ে কোপ মারলে, ঠিক আছে, যে লোক জিওফ্রেকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে তাকে আমি একশ' পাউণ্ড পুরস্কারই দেব।'

'পিরামিডটার দিকে চলুন,' ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস বললেন, আমরা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। এই নির্বোধটার কাছ থেকে খুব যে একটা সাহায্য পাওয়া যাবে তাতো মনে হয় না।'

কুইকিসটোর চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। মুখে সে কোন প্রতিবাদ করল না।

দ্রুত এগিয়ে গেল কুইকিসটো। অধ্যাপক আর ক্যাপ্টেন তাকে অনুসরণ করলেন। পিরামিডের সিঁড়ির কাছে এসে থামল দোভাষী। অপেক্ষা করতে লাগল ওদের দু'জনের জন্য।

—'মিঃ বেলিউ হয়ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছেন।'

—'তা হতে পারে,' ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস স্বীকার করলেন।

—'রাতের বেলা কোন এদেশী মানুষই এই পিরামিডের কাছে খুঁজতে আসবে না। বিশেষ করে কাল ছিল পূর্ণিমার রাত—চন্দ্রদেবীর রাত।'

—'আশ্চর্য! এসব কুসংস্কার এতদিন পরেও টিকে আছে!' অধ্যাপক বেকার মন্তব্য করলেন।

—'কুসংস্কারটাও সংস্কার, সংস্কারের মৃত্যু সহজে হয় না। গম্ভীরভাবে ক্যাপ্টেন বললেন।

প্রথম প্ল্যাটফর্মটায় এসে ওরা থামলেন। কারণ অধ্যাপক হাঁপিয়ে পড়েছেন।

—'শোনো কুইকিসটো,' আবেশের সুরে ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস বললেন, 'অধ্যাপক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। উনি একটু বিশ্রাম করুন এখানে, আমরা দু'জনে একটু খুঁজে দেখি। প্ল্যাটফর্ম ধরে তুমি একদিকে যাও, আমি অন্যদিকে যাচ্ছি। দেখ, পিরামিডের উপর কোন মানুষের পায়ের ছাপ বা চলে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যায় কিনা। উত্তর দিকে পৌঁছে তিনি দেখলেন কুইকিসটো তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ক্যাপ্টেনকে দেখেই কুইকিসটো উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে উঠলঃ

—'আসুন মিঃ ক্যাপ্টেন দেওয়ালের গায়ে একটা গর্ত দেখতে পাচ্ছি। গর্তের ভিতর বেজায় অন্ধকার। আপনাদের সঙ্গে দেশলাই আছে তো?'

এক লাফে ক্যাপ্টেন এগিয়ে এলেন দোভাষীর কাছে, উত্তেজিতভাবে বললেনঃ

'—দেওয়ালের গায়ে গর্ত? কোথায়?'

গর্তের কাছে এসে দেশলাই জ্বাললেন ক্যাপ্টেন। গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সত্যিই ভিতরে জমাট বাঁধা নিরন্ধ্র অন্ধকার। শ্বাস নিলেন ক্যাপ্টেন।

—'ভিতরে কেউ গিয়েছে। গহ্বরের আবদ্ধ বাতাসে কেমন যেন পোড়া পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। এস, এগিয়ে দেখা যাক।'

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোলেন দু'জনে। মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন দেশলাই-কাঠি জ্বাললেন। কিন্তু মুশকিল হল ক্যাপ্টেনের দেশলাই-এ বেশী কাঠি নেই, তাই হিসেব করে কাঠি খরচ করতে হচ্ছে।

শেষপর্যন্ত সম্মোহিত জিওফ্রেকে কুইকিসটো যে ঘরে নিয়ে এসেছিল সেখানে এসে পড়লেন ওরা।

ক্যাপ্টেন আর একটা কাঠি জ্বেলে উঁচু করে ধরলেন। তাঁর পিছনে কুইকিসটো। তার লাল মুখে ধূর্ততার বাঁকা হাসি।

—'হায় ভগবান! ঐ তো জিওফ্রে!' উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন।'

কাঠি পুড়ে আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগাতে ক্যাপ্টেন কাঠির গোড়াটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি আর একটা কাঠি জ্বাললেন। এবার তিনি দেখলেন দেওয়ালের ফাটলে আটকানো আধপোড়া মশাল দুটো।

—'এখানে কোন দারুণ শয়তানীর কাজ হয়েছে,' কুইকিসটোর দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর সেই রুদ্র রূপ দেখে চমকে উঠল কুইকিসটো।

বেলিউর অচেতন দেহের উপর ঝুঁকে পড়লেন স্ট্যাগুিস। ওকি বেঁচে আছে! ওর দু'হাতের আঙুলের গাঁটগুলো ক্ষতবিক্ষত। রক্ত শুকিয়ে জমে আছে সেখানে।

এক টানে জিওফ্রের সার্টটা ছিঁড়ে ফেলে ওর বুকে কান রাখলেন ক্যাপ্টেন। হৃদপিণ্ড থেমে যায়নি। স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। তবে দুর্বল—খুবই দুর্বল!

—'ভগবানের দয়া, ও এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু ওকে এক্ষুণি এই অন্ধকূপের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এস, আমায় সাহায্য কর।'

দেশলাই-এর বাক্স প্রায় শেষ। হাত বাড়িয়ে দেওয়াল থেকে একটা আধ-পোড়া মশাল তুলে নিয়ে সেটাকে জ্বাললেন ক্যাপ্টেন। তারপর মশালটা দিলেন

কুইকিসটোর হাতে।

মশালের আলোয় ঘরখানা আলোকিত হয়ে উঠল।

হঠাৎ নীচু হয়ে ঘরের মেঝে থেকে একটা ছোট জিনিস তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন, রাখলেন নিজের পকেটে।

কুইকিসটোকে মশাল হাতে এগোবার ইঙ্গিত করে ক্যাপ্টেন জিওফ্রের অচেতন দেহটাকে তুলে নিলেন।

গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার খোলা বাতাসের রাজ্যে এসে পড়লেন ওরা। সেই প্রথম প্ল্যাটফর্মটার উপরে। অধ্যাপক বেকার তখন হতাশভাবে সেখানে পায়চারী করছিলেন।

—'অধ্যাপক এই যে আমরা এখানে—জিওফ্রেকে খুঁজে পেয়েছি। ও বেঁচে আছে।

ছুটে এলেন অধ্যাপক। তাঁর চোখে-মুখে স্বস্তি আর কৃতজ্ঞতার ছাপ।

অচৈতন্য জিওফ্রেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে বেশ কষ্টই হল ক্যাপ্টেনের। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওরা নিরাপদেই নীচে নেমে এলেন। তারপর আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে চলে এলেন নিজেদের তাঁবুতে। জিওফ্রেকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ওর দু'ঠোঁট ফাঁক করে ফোঁটা ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি দেওয়া হল ওর মুখে। আধঘণ্টা উৎকণ্ঠার মধ্যে অপেক্ষা করার পর অধ্যাপক আর ক্যাপ্টেনের মনে একটু আশা দেখা দিল। জিওফ্রের বন্ধ দু'চোখের পাতা থির থির করে কেঁপে উঠল। তারপর চোখের পাতা খুলল—ফুলের কুঁড়ির মতো একটু একটু করে।

শূন্য দৃষ্টিতে জিওফ্রে তাকাল চারপাশে। দুর্বোধ্য ভাষায় বিড় বিড় করে কি যেন বলল! কিছুক্ষণ পরে ওর কথাগুলো বোধগম্য হল। কিন্তু ওর অস্পষ্ট কথাগুলোর তাৎপর্য ঠিক বোঝা গেল না।

—'বলি কি ওদের হাতে ধরা পড়ল?...শয়তানের দল! আমরা একসঙ্গে নীচে পড়ে গিয়েছিলাম...পুরোহিতটা বেজায় শক্তিশালী...ওর সঙ্গে লড়াই করা কি সোজা!'...

আধো তন্দ্রা আধো জাগরণে এসব কথা বলতে বলতে জিওফ্রে আবার গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

কিন্তু আগের রাতে কি হয়েছিল সেকথা জিজ্ঞেস করা হলে ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, কোন জবাব দিতে পারল না। আগের রাতের ঘটনা ওর মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। একটা রাতের সময়ের হিসেব হারিয়ে গেছে ওর জীবন থেকে।

ক্যাপ্টেন স্ট্যাগুিস কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। রাতের রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত কিছুতেই মানসিক স্বস্তি পাবেন না—এ কথাটাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ঠিক করলেন যে পিরামিডের ভিতর ঘটনাস্থলে আবার যেতে হবে। সেখানেই পাওয়া যাবে রহস্যভেদের চাবিকাঠি।

ঘনায়মান সন্ধ্যায় একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। গন্তব্যস্থল পিরামিড মন্দির।

।। সাত।।

বাতি হাতে প্রথম প্ল্যাটফর্মটায় উঠলেন ক্যাপ্টেন। একটা লোক! কি যেন খুঁজছে লোকটা!

'কে?' আদেশের সুরে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন। লোকটা চমকে উঠলেও পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে।

—'আমি, মিঃ ক্যাপ্টেন।'

—'কুইকিসটো! হ্যাঁ, আমি এরকমই আশা করেছিলাম।' ধীরে ধীরে কুইকিসটো এগিয়ে এল ক্যাপ্টেনের কাছে।

—'মিঃ বেলিউ কেমন আছেন, মিঃ ক্যাপ্টেন? তিনি ভালো আছেন তো?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল আছেন।' ব্যঙ্গের সুরে ক্যাপ্টেন বললেন।

—'বেশ বেশ।'

—'তা তুমি এসময় এখানে কি করছ?'

—'আমি...মানে...আমি একটু ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম,' আমতা আমতা করে কুইকিসটো উত্তর দিল। কিন্তু উত্তরটা ওর নিজের কাছেই কেমন যেন দুর্বল মনে হল।

—ঘুরে ফিরে দেখছিলে! আর কোন উদ্দেশ্য নেই তো তোমার?'

—'না না আর কি উদ্দেশ্য...আর কি উদ্দেশ্য!' একটু যেন দ্রুততার সঙ্গেই জবাব দিল কুইকিসটো।

কিছুক্ষণ কুইকিসটোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে কুইকিসটো যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর নীরবতা ভেঙে কুইকিসটো বলল, 'মিঃ ক্যাপ্টেন একটা কথা বলছিলাম—'

—'বল,' গম্ভীরভাবে ক্যাপ্টেন বললেন।

—'মানে...বলতে গেলে আমিই তো মিঃ বেলিউকে খুঁজে পেলাম। আমিই

তো পিরামিডের গায়ে গর্তটা আবিষ্কার করেছি। সেই পথে গিয়েই তো মিঃ বেলিউকে খুঁজে পাওয়া গেছে...।'

—'তার মানে পুরস্কারের টাকাটা তুমিই চাইছ, এই তো?' ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের কোণায় রহস্যময় হাসি।

—'হ্যাঁ মিঃ ক্যাপ্টেন, পুরস্কারটা তো আমারই প্রাপ্য।'

—'কুইকিসটো, তুমি বোধহয় এখানে কিছু খুঁজছিলে।'

চমকে উঠল দোভাষী।

—'দেখতো এটা খুঁজছিলে কিনা,' চট করে পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে কুইকিসটোর মুখের সামনে সেটা তুলে ধরলেন ক্যাপ্টেন।

একটা কানের রিঙ—'যে ঘরে আধ-পোড়া মশাল ছিল—যে অন্ধকূপ থেকে অচেতন জিওফ্রেকে উদ্ধার করা হয়েছিল—সে ঘরের মেঝেতে আমি এটা কুড়িয়ে পেয়েছি। তোমার এক কানে রিঙ রয়েছে, অন্য কানে নেই...এটা তো তোমার কানের অলঙ্কার—তাই না কুইকিসটো?'

দোভাষীর চোখে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল।

—'যারা লুকিয়ে রাখে তাদের পক্ষেই খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। শয়তান! তুমিই—হ্যাঁ তুমিই জিওফ্রেকে ওখানে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে। তারপর 'হারিয়ে যাওয়া' জিওফ্রেকে খুঁজে পেয়ে এখন পুরস্কারের টাকা চাইছ। তোমাকে আমি একটু ভালোভাবেই শিক্ষা দিতে চাই।'

কুইকিসটো পালাবার জন্য ছুটল। কিন্তু এক লাফে এগিয়ে ক্যাপ্টেন তার দু'কাঁধ চেপে ধরলেন। ওর আর নড়বার ক্ষমতা রইল না।

হতভাগ্য দোভাষীর দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। কুইকিসটো যেন শিকারী বিড়ালের হাতে পড়া বেচারা ইঁদুর।

—'আমায় ছেড়ে দিন মিঃ ক্যাপ্টেন, আমি কিছুই জানি না!'

—'ছেড়ে দেব? হ্যাঁ, ছেড়ে তো দেবই! তোমার মতো ছুঁচোকে মেরে আর কি হবে! তবে তোমায় একটু শিক্ষা দেব—'

দুম করে কুইকিসটোর মুখে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

কুইকিসটোর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন আবার ঘুষি মারলেন—আবার—আবার—

কুইকিসটোর দুটো দাঁত ভেঙে গেল—ঠোঁট কেটে গেল দাঁতের আঘাতে।

—'দয়া করুন ক্যাপ্টেন, আমায় ছেড়ে দিন—আমি আর কখনও এমন কাজ করব না—আমি অন্যায় করেছি—আমাকে এবারকার মতো ছেড়ে দিন—'

অস্পষ্ট স্বরে কুইকিসটো বলতে লাগল।

—'হ্যাঁ এই যে ছেড়ে দিচ্ছি,' দুম দুম করে কুইকিসটোর বুকে আর দুটো ঘুষি মেরে এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

থর থর করে কাঁপছে কুইকিসটো। ওর নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। চোখের দৃষ্টি হয়ে গেছে ঝাপসা।

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কুইকিসটো টলতে টলতে এগোল সিঁড়ির দিকে। ও হাঁফাচ্ছে।

কিন্তু সিঁড়ির উপর পা ফেলতে পারল না আচ্ছন্নদৃষ্টি কুইকিসটো। তার একখানা পা গিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মের বাইরে—শূন্যে। বিদ্যুৎগতিতে কুইকিসটোকে ধরবার জন্যে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

কিন্তু না, বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

একটা আর্ত চিৎকার! হতভাগ্য দোভাষীর দেহটাকে মুহূর্তের জন্য দেখা গেল শূন্যপথে।

তারপর নীচে থেকে ভেসে এল ধপ্ করে একটা শব্দ। ক্যাপ্টেন স্ট্যাণ্ডিস নির্বাক।

আকাশে প্রায় পূর্ণ চন্দ্রগোলক। রাতের রাণী তাঁর বলি গ্রহণ করলেন।

তবে পূর্ণিমায় নয়, কৃষ্ণা প্রতিপদে।

স্বীকারোক্তি

ব্রেড স্ট্রেজেন

পুলিশ যখন ফ্রাঁসোয়া বাট্রাণ্ডকে জঘন্যতম অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করল তখন তার সহকর্মী সৈনিকেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অপরাধগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরীতে—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।

ফ্রাঁসোয়া বাট্রাণ্ড ছিল ফরাসী সৈন্যবাহিনীর একজন সার্জেন্ট। ঘটনাকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ। সুদর্শন, বুদ্ধিমান সংবেদনশীল আর স্বল্পবাক এই যুবকটিকে সৈন্যদলে ঠিক যেন মানাত না! তার নরম শরীরটাও ঠিক পোড় খাওয়া সৈনিকের দেহের মতো ছিল না। কিন্তু তার মধ্যে বিনয়, ভদ্রতা এবং সৌজন্যের কোন অভাব ছিল না।

তার মতো মানুষ কেন যে এই জঘন্য অপরাধগুলো করল তা তার সহকর্মীদের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য।

আর অপরাধ! সে কি একটু আধটু! সে অপরাধগুলো গোটা প্যারিস শহরকে আহত করেছিল—কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

কেউ কি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল যে বাট্রাণ্ডই হল প্যারিসের সেই পিশাচ—যে একের পর এক কবরভূমিগুলির পবিত্রতা নষ্ট করে যাচ্ছে। অথচ এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছিল যে ফ্রাঁসোয়া বাট্রাণ্ডই হল পিশাচ-কবলিত যন্ত্রনা-পীড়িত সেই হতভাগ্য মানুষ যে কবর খুঁড়ে কফিন থেকে মৃতদেহ বের করে নরমাংসে তার বিকৃত ক্ষুধার নিবৃত্তি করে।

কেন যে সে এরকমের জঘন্য অপরাধ করে? তার রুচি এত বিকৃত কেন? বাট্রাণ্ডকে এসব প্রশ্ন করে কোন লাভ হয়নি। কেননা এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর সে দিতে পারেনি ফরাসী পুলিশ 'সুরেৎ'-এর কাছে। সে অসংলগ্নভাবে যেসব কথা বলেছে তা থেকে যে কথাটা বেরিয়ে আসে তা হল মোটামুটি এরকম ঃ

এরকম জঘন্য অপরাধ করবার সময় বাট্রাণ্ড নাকি কোন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়। এই শক্তি সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ শক্তি যখন তার উপর ভর করে তখন সে পৈশাচিক শক্তির নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হয়। অন্য কোন কিছু করবার শক্তি বা ক্ষমতা আর তার থাকে না। অদৃশ্য পৈশাচিক

শক্তি তাকে বাধ্য করে কবর খুঁড়তে.....কফিন ভেঙে মৃতদেহ বের করতে আর তারপর—

উঃ! এর পরের ব্যাপারটা সার্জেন্ট বাট্রাণ্ড সুস্থ অবস্থায় ভাবতেই পারে না।

দু'হাতে মুখ ঢাকে পিশাচ-তাড়িত যন্ত্রণা-কাতর হতভাগ্য বাট্রাণ্ড।

যখন পাগলামী পেয়ে বসে—যখন পিশাচের ভয় হয় তখন বাট্রাণ্ডের হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়, সমস্ত শরীরটা ভয়ঙ্করভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে চায়—সামরিক ছাউনি থেকে সবার অলক্ষ্যে সে বেরিয়ে পড়ে। শুরু হয় তার পৈশাচিক নৈশ অভিযান। সে ছুটে যায় কোন অরক্ষিত কবরভূমির দিকে। বেছে বেছে বের করে সদ্যসমাহিত কারোর কবর। যে রকম কবরের মাটি এখনও আলগা রয়েছে। ঝুরু ঝুরু মাটি সরিয়ে সে কফিনটাকে টেনে বের করে। তারপর কফিন ভেঙে বের করে মৃতদেহটাকে। তরবারির আঘাতে মৃতদেহটাকে খণ্ড খণ্ড করে সে। তারপর? তারপর আরম্ভ হয় তার নরমাংস ভোজন। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী' হতভাগ্য বাট্রাণ্ড রাতের পর রাত এই জঘন্যতম অপরাধ করতে বাধ্য হয়।

কাজ শেষ হয়ে গেলেই কেমন একটা নিষ্কৃতির ভাব এসে পড়ে তার মনে। চট করে মাথার অসহ্য যন্ত্রণাটা কমে যায়—শরীরের কাঁপুনিও থামে। বাট্রাণ্ড হয়ে ওঠে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। নিজের কাজ দেখে সে তখন শঙ্কা-বিহ্বল হয়ে পড়ে—ছুটে পালিয়ে যায় কবরভূমি থেকে।

একদিন বাট্রাণ্ড একজন সাথী সৈনিকের সঙ্গে একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তারা শহরের জনবিরল উপকণ্ঠে এসে পড়ল। রাস্তাটা একটা কবরখানার পাশ দিয়ে গিয়েছে। বুঝি নিজের অজ্ঞাতসারেই বাট্রাণ্ডের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কারখানার উপর আর সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল।

একটা নতুন কবর।

বাট্রাণ্ডের মাথায় যন্ত্রণা শুরু হল, সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকল থরথর করে!

—'কি হল? তোমার কি শরীরটা খারাপ লাগছে? উৎকণ্ঠিতভাবে সঙ্গী সৈনিক জিজ্ঞেস করল।

—'না না ও কিছু নয়—ও কিছু নয়—এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে,' বাট্রাণ্ড স্বাভাবিকভাবে কথা বলবার চেষ্টা করল।

—'তোমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে, এক্ষুনি আমাদের ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। একখানা গাড়ি ডাকি, তুমি ক্যাম্প পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে না?'

—'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগছে, এক্ষুনি হয়ত ঠিক হয়ে যাবে,' দৈহিক যন্ত্রণার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে বাট্রাগু আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

—কিন্তু বাট্রাগুের মন বারবার ছুটে যেতে লাগল ছোট্ট সমাধিভূমির সদ্য খোঁড়া কবরটার দিকে। ও বুঝতে পারল আজ রাতে ওকে এখানে আসতেই হবে। আসতে ও বাধ্য।

শীতকাল। তার উপর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া বইছে। টিপ টিপ বৃষ্টি বইছে, সঙ্গে তুষারপাত। কনকনে ঠাণ্ডা। চারপাশ যেন হিমশীতল হয়ে গেছে। ছাউনির সৈনিকেরা গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে রয়েছে নিজেদের বিছানায়।

কিন্তু এমনি দুর্যোগের রাতে ছাউনির একজনের চোখে ঘুম নেই। ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে সেই মানুষটি। যত দুর্যোগের রাতই হোক না কেন তাকে যেতে হবে—যেতেই হবে সেই কবরভূমিতে—কবর খুঁড়তে হবে—কফিন ভেঙে বের করতে হবে মৃতদেহ—তারপর সেই শবদেহকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে—না না দেরী করা যায় না-আর দেরী করা যায় না—এক্ষুনি—এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে...

কিন্তু সামরিক ছাউনির প্রহরীরা যদি বেরোতে দেখে ফেলে? না না, তাদের দেখতে দেওয়া হবে না। যে ভাবেই হোক তাদের নজর এড়িয়ে ছাউনির বাইরে যেতে হবে। একবার এখান থেকে বেরোত পারলে আর ওকে পায় কে! ছুটতে ছুটতে ও চলে যাবে সেই সমাধিভূমিতে।

প্রহরীদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার জন্য বাট্রাগুকে সাঁতরে পরিখা পার হতে হল। পরিখার জলে তখন বড় বড় বরফের খণ্ড ভাসছে। দারুণ ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। সেই ঝড়ো রাতে ভিজে পোশাক পরেই ফ্রাঁসোয়া বাট্রাগু ছুটে চলল কবরখানার দিকে। উঁচু পাঁচিল টপকে তাকে ঢুকতে হল সমাধিভূমিতে।

কবরখানার ঝুপসী গাছগুলোর মধ্য দিয়ে সোঁ সোঁ করে বয়ে যাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া। যেন প্রেতলোকের অদৃশ্য বাসিন্দারা দারুণ আক্রোশে মানুষের পৃথিবীটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে অন্ধকার প্রেতলোকের দিকে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। কোন অদৃশ্য দানব যেন অগ্নিময় খড়্গ দিয়ে কালো আকাশটাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে চাইছে।

এতক্ষণ বৃষ্টি পড়ছিল টিপ টিপ করে। এবার আকাশ ভেঙে মুষলধারায় নামল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তুষারপাত।

কিন্তু আবিষ্ট বাট্রাণ্ডের এসব বাধা কোন বাধাই নয়। অভিশপ্ত মানুষটা উন্মাদের মতো ছুটে গেল নতুন কবরটার দিকে।

হঠাৎ প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকে সমস্ত আকাশটা যেন ঝল্‌সে উঠল। শোনা গেল বজ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন। দূরে কোথায় যেন বাজ পড়ল।

পরদিন সকালে কিশোরী মেয়েটির মা-বাবা ফুল আর মালা নিয়ে মেয়ের কবরের কাছে এসে দেখল এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কবর খুঁড়ে মেয়ের মৃতদেহ বের করা হয়েছে—শুধু কি তাই! সে দেহ কাটা হয়েছে খণ্ড খণ্ড করে। আর অনেকগুলো খণ্ড থেকে কে যেন মাংস খুবলে নিয়েছে—সেখানে রয়েছে শুধু হাড়।

সার্জেন্ট বাট্রাণ্ড কয়েক ডজন কবর খুঁড়ে তার অমানুষিক বিকৃত ক্ষুধার নিবৃত্তি করেছিল। ক্রমে এই কবর অপবিত্র করার ব্যাপার নিয়ে প্যারিসে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গেল।

শহরের জনসাধারণ প্যারিস-পুলিশের অপদার্থতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করতে আরম্ভ করল, যে বীভৎস পিশাচ কবরভূমিতে—প্রিয়জনদের শেষ শান্তির স্থানে পৈশাচিক উৎপাত শুরু করেছে প্যারিসের জনসাধারণ অবিলম্বে তার গ্রেপ্তার চাইল।

ফরাসী পুলিশ কবরখানাগুলিতে পাহারাদার বসাল।

এক কবরখানার প্রহরীরা এক রাতে হাতে-নাতে ধরে ফেলল ফ্রাঁসোয়া বাট্রাণ্ডকে। সে তখন আবিষ্ট বা সম্মোহিত অবস্থায় তার বিকৃত ক্ষুধার নিবৃত্তি করছিল মৃতদেহের মাংস দিয়ে।

উঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! প্রহরীদের দলপতি দু'হাতে চোখ ঢাকল। ইস্! এ বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

পুলিশের কাছে ফ্রাঁসোয়া বাট্রাণ্ড যে বিবৃতি দিয়েছিল তা এরকম ঃ

'জানি না কেন আমি এরকম কাজ করেছি, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে আমি নিজের কাজ দেখে নিজেই সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়তাম। ভয় পেয়ে ছুটে পালাতাম কবরখানা থেকে । বিশ্বাস করুন, স্বাভাবিক আমি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। অশালীন কথাবার্তা এবং আচরণে আমি সত্যই বেদনা বোধ করি। আমার সহকর্মীদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন। তারা বোধহয় কেউই আমাকে অসভ্য, অমার্জিত বা অভদ্র বলবে না। কি যে হয়ে গেল আমার জীবনে! আজ সবার কাছেই আমি এক ঘৃণ্য জীব। অথচ বিশ্বাস করুন, এই পৈশাচিক কাজের জন্য

আমি দায়ী নই। অন্ততপক্ষে আমার সচেতন সত্তা দায়ী নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না যে এরকম জঘন্য কাজ আমি করেছি। এক অদৃশ্য শয়তান আমার উপর ভর করত আর আবিষ্ট অবস্থায় আমি ধর্মবিরোধী পৈশাচিক কাজ করে গিয়েছি। শয়তান আমাকে দিয়ে এসব কাজ করিয়েছে। আমার জীবনটা অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমি বিন্দুমাত্র চেষ্টা করব না। আমি যা করেছি তাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা যায় না—করা উচিতও নয়। যে শাস্তি আমাকে দেওয়া হবে আমি তাই মাথা পেতে নেব।'

প্যারিসের নরমাংসভুক পিশাচ ফ্রাঁসোয়া বাট্রাণ্ডের বাকী জীবনটা কেটেছিল ফ্রান্সের এক পাগলা গারদে।

অকাল বোধন

অজ্ঞাত

ব্রিমেন। শতধা বিচ্ছিন্ন জার্মানির এক রাজ্যখণ্ড। এ রাজ্যের একজন মন্ত্রীর নাম সেবালডাস ব্যেরলিন। গ্রীষ্মকালের এক সন্ধ্যায় সেবালডাস নিজের বাড়ির একখানা ঘরে বসে বিশ্রামসুখ ভোগ করছিলেন। ঘরখানি সুসজ্জিত। সেবালডাস বসেছিলেন জানালার পাশে—একখানা গদিমোড়া চেয়ারে। আর একটা জানলার পাশে একখানা কৌচের উপর বসেছিলেন তাঁর বৃদ্ধা পিতামহী, মহিলার বয়স আশি পেরিয়ে গেছে। তিনি আপনমনে কাঁপা কাঁপা গলায় বাইবেলের স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন। মন্ত্রীমশাই-এর স্ত্রী ক্যাথারিন বাচ্চাদের জন্য পশমের জামা বুনছিলেন।

ঘরের আর একদিকে মন্ত্রীর বড় মেয়ে সিগিস মুত্তা ছোট ভাইবোনদের ভূতের গল্প বলছিল। বাচ্চারা গভীর মনোযোগে দিদির কাছ থেকে গল্প শুনছিল। ঘরের বাইরে একখানা টুলের উপর বসেছিল পুরানো এক চাকর। বসেছিল আদেশের অপেক্ষায়।

সব নিয়ে এ যেন এক সুখী পরিবারের চমৎকার একখানা ছবি।

গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত নটা বাজল। মন্ত্রীমশাই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। তারপর টুপি আর ছড়ি হাতে করে তিনি দরজার দিকে এগোলেন।

স্ত্রী ক্যাথারিন বললেন,'তুমি বাইরে যাচ্ছ নাকি? একটু দাঁড়াও, আমি আলো নিয়ে আসি—সিঁড়ির কাছটা যে অন্ধকার!'

স্ত্রীর কথার কোন উত্তর দিলেন না সেবালডাস। তিনি দ্রুতপায়ে নীচে নেমে সদর দরজা খুলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

বৃদ্ধা পিতামহী স্তোত্র পাঠ থামিয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই রাত-বিরেতে ছেলেটা আবার কোথায় গেল?'

—'রাতে বেরোবেন না এমন কথাই তো বলেছিলেন। বোধহয় কাছাকাছি কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে গিয়েছেন—এক্ষুনি এসে পড়বেন। আপনি চিন্তা করবেন না ঠাকুরমা!' ক্যাথারিন উত্তর দিলেন।

—ছেলে মারা যাবার পর থেকে নাতিটিকে নিয়ে বড় বেশি দুশ্চিন্তা বৃদ্ধার। নাতিটিও যে প্রায় পৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পৌছেছে এ কথাটা বৃদ্ধার যেন মনেই থাকে না।

ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধা, তারপর আবার স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন।

রাত দশটা বাজল। রাতের খাবার সময় হল। সেবালডাস ফিরে এলেন না! এটা একটু আশ্চর্যের ব্যাপার, কেননা প্রতিদিন রাত দশটায় সবাই মিলে এক টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া করেন। সবাই খেতে বসলেন। বাড়ির কর্তার আসন শূন্য রইল, সবাই ভাবলেন এক্ষুনি সেবালডাস ফিরে আসবেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, কিন্তু মন্ত্রীমশাই ফিরে এলেন না।

এবার চাকর-বাকরদের পাঠান হল বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী। তারা অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে জানাল যে কর্তা কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে যাননি।

স্বামীর এরকম আচরণে ক্যাথারিন রসিকতা করে কিছু বললেন, কিন্তু তাঁর রসিকতায় কেউই হাসল না। বৃদ্ধা পিতামহী তো মুখ গম্ভীর করেই বসে রইলেন। তাঁর শরীরটা কদিন ধরে সুস্থ যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন,

'আমার যা শরীরের অবস্থা—তাতে কখন আছি কখন নেই তা কিছু বলা যায় না। মরবার সময় যদি সেবালডাসকে দেখতে না পাই তবে আমি মরেও শান্তি পাব না। এত রাত্রিতে ওর বাইরে বেরোন ঠিক হয় নি ।

'ও রকম অলুক্ষণে কথা বলবেন না ঠাকুরমা; আপনার নাতি এখনই ফিরে আসবেন, আপনি কেন অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা করছেন?'

বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একথা বললেও ক্যাথারিন নিজেও কিন্তু মনে মনে একটু চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন, চিন্তার কারণও ছিল। তাঁর, স্বামী অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ মানুষ। নিয়মভঙ্গ করাটা তাঁর ধাতের মধ্যে নেই। তবে আজ কেন নিয়মভঙ্গ করলেন? ব্যাপার কি?

বৃদ্ধার প্রার্থনা শেষ হলে ক্যাথারিন তাঁকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েরাও যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ল। সারা রাত্রি জেগে রইলেন শুধু ক্যাথারিন। জেগে রইলেন স্বামীর অপেক্ষায়। সময় আর মনের উদ্বেগ কাটাবার জন্য সেলাই-এর কাজ করতে লাগলেন।

ঢং ঢং—। একি গীর্জার ঘড়িতে রাত বারোটা যে বেজে গেল! কিন্তু স্বামী তো এখনও এলেন না। রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে রাতের পাহারাদার পুলিশদের বাঁশির আওয়াজ। পাশের এক বাড়ী থেকে নারীকণ্ঠে কান্নার শব্দ আসছে। সে বাড়ীতে একজন লোক মারা গিয়েছে। কাল সকালে মৃতদেহটিকে সমাহিত করা হবে। লোকটির স্ত্রী কাঁদছে। দেহটি কফিন-বন্দী করা হয়ে গেছে। বোধহয় কফিনের পাশেই বসে কাঁদছে বেচারা বৌটি। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে

দু'একটি ম্লান তারা উঁকি ঝুঁকি দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

এক অজানিত আশঙ্কায় মন ছেয়ে গেল। সেলাইয়ের জিনিসপত্র সরিয়ে রেখে খোলা জানলার পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাথারিন।

হু হু করে হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া। ঝড় আসছে। পথঘাট একেবারে নির্জন। ক্যাথারিন আবার সেলাই-এর টেবিলে এসে বসলেন। কিন্তু সূচীকর্মে আর মন বসল না, স্বামীর কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি। এরকম তো তাঁর স্বামী কোনদিন করেন নি। কোন কথা না বলে—তাঁকে কিছু না জানিয়ে এত গভীর রাত পর্যন্ত সেবালডাস তো কখনও বাইরে থাকেন নি। স্বামী বলেছিলেন আজ রাতে তিনি আর বাইরে যাবেন না। কিন্তু হঠাৎ মত পরিবর্তন করলেন কেন? নিশ্চয়ই কোন জরুরী কাজে তাঁকে বেরোতে হয়েছে। কিন্তু ক্যাথারিনকে কিছু বলে গেলেন না কেন? বলে যাওয়া উচিত ছিল—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই উচিত ছিল। বলে গেলে তো ক্যাথারিনকে এত দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হত না।

ক্যাথারিন ভাবতে লাগলেন স্বামীর সঙ্গে সাম্প্রতিককালে তাঁর কোন মনোমালিন্য বা কথা কাটাকাটি হয়েছে কিনা। হয়ত সে জন্যই স্বামী তাঁকে কিছু না জানিয়ে বাইরে গিয়েছেন, কিন্তু কই সেরকম তো কিছু মনে পড়ছে না। মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি, মতান্তর হয় ঠিকই, কিন্তু শীগগীর তো সেরকম কিছু হয়নি।

তবে?

নিজের মনটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ক্যাথারিন এ প্রশ্নটার উত্তর পেলেন না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা ক্যাথারিনের মনে এল। তাঁর স্বামী এ রাজ্যের একজন মন্ত্রী। তাঁর শত্রু থাকা সম্ভব। তবে কি শত্রুরাই তাঁকে গুম করল?

না না না, তা হতে পারে না, ক্যাথারিন যেন নিজের মনকেই প্রবোধ দিলেন। তাঁর স্বামী মানুষ হিসাবে সাচ্চা। তিনি সদাশয়—সদালাপি। তিনি এ রাজ্যে খুব জনপ্রিয়। তাঁর সে রকম শত্রু থাকবার সম্ভাবনা খুবই কম।

তাহলে?

ঘুর ফিরে আবার সেই একই প্রশ্ন।

আচ্ছা সরকারী কাজ করতে গিয়ে তাঁর স্বামী কোন মারাত্মক ভুল বা অন্যায় করে বসেন নি তো? হয়ত সেই ভুল বা অন্যায়ের জন্য রাজরোষে পড়তে হবে একথা ভেবে তিনি পালিয়ে যান নি তো?

কিন্তু না জেনেশুনে অন্যায় করবার মতো মানুষ তাঁর স্বামী নন। আর ভুল? তা তো মানুষ মাত্রেই হতে পারে। ক্যাথারিন তাঁর মন থেকে এ আশঙ্কাটাকে

ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন।

ক্যাথারিন আর স্থিরভাবে থাকতে পারলেন না। নানা দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কা তাঁর মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল। মাথাটা গরম হয়ে উঠতে লাগল তাঁর। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে দু'টি প্রশ্ন কেবল ঘুরপাক খেতে লাগল,'কোথায় গেল সেবালডাস? কি হল তাঁর?

সারারাত জেগে কাটালেন ক্যাথারিন। ঘুম নেই। দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কা তাঁর দুটি চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

পুবের আকাশে লাগল লালের ছোপ। আকাশকন্যা বিদ্যুৎ বর্ণা লাল চেলীর লালিমা যেন রাঙিয়ে দিল পুব দিগন্তকে। ক্যাথারিন ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন। সারারাত জেগে তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত।

সকাল হল। ছেলে মেয়েরা জাগল। হাত-মুখ ধুয়ে তারা প্রাতঃরাশের টেবিলে গিয়ে বসল। শুকনো কাশির শব্দে বোঝা গেল বুড়ো ঠাকুরমাও জেগেছেন।

প্রাতঃরাশের টেবিলে স্বামীর ফিরে না আসবার কথা ক্যাথারিন কাউকে বললেন না। সবাই ভাবল কর্তা অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে এসেছেন—তাই এখনও ঘুমোচ্ছেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ স্বামীর অন্তর্ধানের কাহিনী গোপন রাখা গেল না।

হের সেবালডাস একজন মন্ত্রী—তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তাঁর কাছে নানা লোক নানা কাজে আসে। লোকজনের আগমন শুরু হল। রাজপ্রাসাদ থেকেও মন্ত্রীকে ডাকবার জন্য একজন পদস্থ কর্মচারী এলেন। শেষপর্যন্ত ক্যাথারিনকে আসল কথাটাই বলতে হল। বলতে হল কাল রাত ন'টার ঘন্টা বাজবার পরই তাঁর স্বামী সেই যে বেরিয়েছেন, এখনও আর ফিরে আসেন নি। মন্ত্রীমশাই কোথায় গিয়েছেন এ প্রশ্নের উত্তরে ক্যাথারিন কিছুই বলতে পারলেন না।

সারাটা দিন কেটে গেল, সেবালডাস ফিরে এলেন না। চারিদিকে অনুসন্ধান করেও তার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। নানা রকম গাল-গল্প শুরু হল মন্ত্রীকে নিয়ে। কেউ কেউ রটাতে লাগল মন্ত্রীমশাই জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। কেননা তার টুপি আর ছড়ি নাকি নদীর পাড়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। আবার এমন কথাও শোনা গেল যে পাশের রাজ্যের গুপ্তচরেরা নাকি এ রাজ্যের সুদক্ষ এবং জনপ্রিয় মন্ত্রী সেবালডাস ব্যেরলিনকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। রাতে শহরের পাশে জঙ্গলে নাকি রিভলবারের শব্দও শোনা গিয়েছে।

এসব নানা রটনা আর গুজব শুনে মন্ত্রীর পরিবারের সবাই দিশেহারা হয়ে

পড়লেন। বুড়ি ঠাকুরমাকে প্রথমে ব্যাপারটা জানান হয়নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত জানতে পেরে তিনি শয্যা নিলেন।

ক্যাথারিনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর স্বামী ফিরে আসবেন। কিন্তু দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেটে গেল মন্ত্রীমশাই ফিরে এলেন না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, রাজপ্রসাদ থেকে নানাভাবে অনুসন্ধান চালানো হল, কিন্তু সেবালডাসের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। সে রাতে মন্ত্রীমশাইকে কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে নি—রাস্তায় হাঁটতেও দেখেনি। মন্ত্রী সেবালডাস ব্যেরলিন যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

এক এক করে সুদীর্ঘ তিনটি বছর কেটে গেল। সেবালডাস ফিরে এলেন না, ধীরে ধীরে তাঁর অদৃশ্য হবার প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। ধীরে ধীরে সেবালডাসের কথা ভুলেই গেল জনসাধারণ। তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারটা আর জনসাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তু রইল না।

।। দুই।।

আগন্তুক

চতুর্থ বৎসর। গ্রীষ্মকাল। রাত দশটা। একটি লোক মন্ত্রী সেবালডাসের বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা দিল। লোকটির মুখ পাণ্ডুর, দেখলেই মনে হয় সে অত্যন্ত ক্লান্ত। কিন্তু সে যে অভিজাতবংশীয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

অনেক ধাক্কা-ধাক্কি করবার পর দরজা খুলে গল। কর্মচারী গোছের একজন যুবক দরজা খুলে রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করল, 'কি চাই? কাকে চাই?'

প্রশ্ন শুনে আগন্তুক বিস্মিত হল। যুবকের দিকে তাকিয়ে সে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি কে? তোমাকে এ বাড়ীত কে ঢুকতে দিল?'

—'কি বলছেন আপনি? আমি তো এ বাড়িতে থাকি।'

—'এ বাড়িতে থাক? আমার বাড়িতে কে তোমাকে থাকতে দিল আর কেনই বা দিল?'

—'আপনার বাড়ি!' তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদমস্তক দেখে কর্মচারী যুবকটি বলল, 'আপনার বাড়ি! মশাই কি পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছেন?'

—'মুখ সামলে কথা বল! জানো তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?'

—'পাগলাগারদ দেখে না থাকলে আপনাকে এক্ষুনি সেখানে পোরা দরকার।'

—'থামো!' আগন্তুক গর্জন করে উঠল, 'আর একটিও কথা নয়, আমার বাড়িতে এসে তুমি আমাকেই অপমান করছ।'

—'আপনার বাড়ি?—মশাই, এই কথাতেই তো আপনার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ হচ্ছে।'

—'তুমি বলতে চাও এ বাড়ী আমার নয়!'

—'ঠিক তাই।'

—'এখানা তবে কার বাড়ি?'

—'হের ভ্যান পিটার্সের।'

—'মদ ব্যবসায়ী ভ্যান পিটার্স?'

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি কে?'

—'আমি ভ্যান পিটার্স সাহেবের কেরাণী।'

—'কেবল পাগল নয়, তুমি একটা আস্ত বুদ্ধু। আমি বুঝি জানি না কোথায় ভ্যান পিটার্স থাকে।'

—'তিনি তো এ বাড়ীতেই থাকেন।' যুবক দৃঢ়ভাবে বলল।

—'আর আমি বুঝি নিজের বাড়ি চিনি না।' ব্যঙ্গের সুরে আগন্তুক বলল,'তুমি আমাকে চেনো? জানো আমি কে?

—'আমার জানবার তো কোন দরকার নেই, এবার আপনি আসুন।' যুবক কর্মচারীটি দরজা বন্ধ করবার উপক্রম করল।

—'সরে যাও,' ক্রুদ্ধ স্বরে যুবককে সরিয়ে দিয়ে আগন্তুক বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ল, তারপর লন পেরিয়ে খোলা দরজা পথে ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। কর্মচারীটি অপরিচিত আগন্তুককে আটকাতে গিয়েও আটকাতে পারল না।

সোজা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল আগন্তুক, ঢুকে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল, বিভিন্ন ঘরের আসবাবপত্র, ছবি সবই নতুন—সবই তার কাছে অপরিচিত। সত্যিই তো কোথায় এসে পড়ল সে? কর্মচারীটার কথাই কি তবে সত্যি? এ কি সত্যই তার বাড়ি নয়? না না, এতবড় ভুল হয় কি করে! তার তো সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে যায় নি!

ঐ তো সামনেই বসবার ঘরখানা। ঐ ঘর থেকেই তো সে কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ এখনও নিশ্চয় ও ঘরে রয়েছে। বসবার ঘরের ভেজান দরজা খুলতে গেল আগন্তুক। ঘরের ভেতর থেকে হো হো করে হাসির শব্দ ভেসে এল।

এরকম অসভ্যের মতো হাসছে কারা? লোকগুলোকে বাড়ির মধ্যে ঢোকালোই বা কে? দরজা খুলে ফেলল আগন্তুক। কতকগুলো মাতাল রয়েছে ঘরের মধ্যে! মাননীয় মন্ত্রী হের সেবালডাস ব্যেরলিনের ঘরে একদল মাতাল ভূতেরা নৃত্য শুরু করেছে। জানলার পাশে যে নরম গদি মোড়া মূল্যবান চেয়ারখানায় ঠাকুরমা বসেন, সেখানে একটা হোঁৎকা মাতাল বসে মদ খাচ্ছে। লোকটাকে দেখলেই পীপের কথা মনে পড়ে।

স্তম্ভিত হয়ে আগন্তুক খোলা জানলা পথে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশের দৃশ্য মোটামুটি একইরকম রয়েছে। কেবল বাঁকা চাঁদ দিগন্তের দিকে আর একটু ঢলে পড়েছে। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে আগন্তুক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি ওলোট-পালোট হয়ে গেল কি করে? আগন্তুক ভাবতে লাগল সে কি জেগে আছে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছে!

একটা অচেনা লোককে ঘরের মধ্যে দেখে মাতালগুলো আরও জোরে হো হো করে হেসে উঠল, তারা যেন একটা দারুণ মজা পেয়েছে।

—'এই থামো তোমরা,' আগন্তুক গর্জন করে উঠল, 'অসভ্যতা করবার আর জায়গা পাওনি! এ বাড়িতে ঢুকলে কি করে? বাড়ির লোকজনই বা কোথায়?'

মাতালদের মধ্যে একজন আগন্তুকের কাছে এসে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকে দেখল তারপর আঁতকে উঠে বলল,'সর্বনাশ! এ যে আমাদের মন্ত্রীমশাই! হুজুর এতকাল আপনি কোথায় ছিলেন?'

সব কটি মাতাল ভয় পেয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাদের নেশা ততক্ষণে ছুটে গিয়েছে।

একখানা বেঞ্চির উপর বসলেন সেবালডাস।

লোকগুলো সসম্ভ্রমে দূরে সরে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে মদ ব্যবসায়ী ভ্যান পিটার্সও ছিল।

সেই সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? তিন বছর ধরে নানা দিকে খোঁজ-খবর করেও আমরা আপনার কোন সন্ধান পাই নি।'

—'তি...ন....ব....ছ....র!' দারুণ বিস্ময়ে মন্ত্রীমশাই যেন ভেঙে পড়লেন। বিস্ময়ের প্রথম চমকটা কাটবার পর স্খলিত স্বরে তিনি বললেন,'কি বলছ তুমি! আমি তিন বছর এখানে ছিলাম না?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।'

—'কিন্তু আমার তো ধারণা আমি ঘন্টাখানেক আগে বাড়ির বাইরে গিয়েছি।'

—'আজ্ঞে না, আপনার ধারণাটা ঠিক নয় হুজুর।'

—'আমার বাড়ির লোকজনেরা কোথায়?

—'এ বাড়ি আর আপনার নেই।'

—'আমার নেই।' স্খলিত স্বরে সেবালডাস বললেন।

—'আজ্ঞে না, আপনি অদৃশ্য হবার দু'বছর পরে আপনার স্ত্রী আমার কাছে এ বাড়ী বিক্রি করেছেন! অনেক খোঁজ-খবর করেও যখন আপনার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না তখন আপনার স্ত্রী এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শহরতলীতে একখানা ছোট বাড়ি কিনে সেখানে থাকতে শুরু করলেন, তিনি এখনও সে বাড়িতেই আছেন।'

—'আমার ঠাকুরমা?'

—'তিনি মারা গেছেন।'

—'কবে?'

—'আপনি অদৃশ্য হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই।'

—'আমার ছেলেমেয়েরা?'

—'তারাও মারা গেছে।'

—'আঁ.........!' হের সেবালডাস কোন কথা বলতে পারলেন না, তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল থর থর করে।

—টলতে টলতে তিনি দরজার দিকে এগোলেন।

—ভ্যান পিটার্স তাঁকে ধরে ফেলল, না ধরলে হয়ত সেবালডাস কাঁপতে কাঁপতে পড়েই যেতেন।

—ঠাকুরমার নরম গদি মোড়া চেয়ারখানায় সেবালডাসকে বসিয়ে দিলেন পিটার্স। সেবালডাস তখন বিড়বিড় করে বলছেন, 'একি হল? কিছু বুঝতে পারছি না..... আমার মাথায় কিছুই আসছে না.......আমি তো মোটে ঘন্টাখানেক আগে......এর মধ্যেই সব ওলোট-পালট হয়ে গেল......'

—ভ্যান পিটার্স সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন হুজুর?'

ক্লান্তস্বরে সেবালডাস বললেন, 'আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। কি দেখলাম আমি? কি দেখলাম? ফিরে এসেই বা কি দেখলাম? আমার দিনও শেষ হয়ে এসেছে এবার আমি ঘুমোব.... ঘুমোব—'

বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন সেবালডাস।

—ভ্যান পিটার্স আর তার কেরাণী সেবা-শুশ্রূষা করে মন্ত্রীমশাই-এর চেতনা ফিরিয়ে আনল। তারপর তিনি একটু সুস্থ হয়ে উঠলে গাড়ী করে তাঁকে নিয়ে গেল তাঁর স্ত্রীর কাছে। ভ্যান পিটার্স নিজেই নিয়ে গেল তাঁকে।

।। তিন ।।

সে এক বিচিত্র কাহিনী

স্বামীকে ফিরে পেলেন ক্যাথারিন। তিন বছর ধরে নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার পর একটুখানি সুখের মুখ দেখলেন তিনি। বিধবার পোশাক ছাড়লেন মন্ত্রীজায়া। স্বামীকে আদর-যত্ন করেও তিনি শেষ পর্যন্ত কিন্তু স্বামীকে কাছে রাখতে পারলেন না। সেবালডাসের ভবিষ্যৎবাণীই সফল হল, তাঁর দিন সত্যি সত্যিই শেষ হয়ে এসেছিল। কয়েক সপ্তাহ স্ত্রীর সেবাযত্ন ভোগ করে তিনি মারা গেলেন। ক্যাথারিনকে এবার সত্যি সত্যিই বিধবা হতে হল।

মৃত্যুর আগে হের সেবালডাস স্থানীয় গির্জার পাদ্রী এবং এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের কাছে তিনি বললেন এক বিচিত্র কাহিনী। তাঁর অনুরোধে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হল। লিপিবদ্ধ করার পর সেই অসাধারণ কাহিনীর তলায় নিজের নাম সই করলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই কাহিনীর বক্তা যে তিনিই—তার সাক্ষ্য হিসাবে সই করতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা সই করলেন। তারপর ব্রিমেন শহরের একজন ম্যাজিস্ট্রেট সেই দলিলে আদালতের ছাপ মেরে নিজেই সই করলেন।

এই দলিলখানা আজও ব্যেরলিন পরিবারে যত্নের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই দলিলে যে বিচিত্র কাহিনী রয়েছে তা সংক্ষেপে বলা হল।

'আমি সেবালডাস ব্যেরলিন, ব্রিমেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, গির্জার মাননীয় পাদ্রীমশাই, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং ব্রিমেনের একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এই অসাধারণ এবং বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করবার পর লিপিবদ্ধ করিয়েছি।

'সেদিন ছিল রবিবার। হ্যাঁ ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ট্রিনিটি', রবিবার। আমি বৈঠকখানা ঘরে বসেছিলাম। রাত প্রায় ন'টার কাছাকাছি। ঠাকুরমা বাইবেলের স্তোত্র পাঠ করছিলেন, আমার স্ত্রী ব্যস্ত ছিলেন সূচিকর্মে আর আমার বড় মেয়ে সিগিস মুত্তা ছোট ভাই-বোনের কাছে ভূতের গল্প বলছিল। কোন উত্তেজনা নেই—শান্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশ। গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত ন'টা বাজল। ঘন্টার শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আমি বাইরের দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনতে

পেলাম। এখন আবার কে কোন কাজে এল? একটু বিরক্তই বোধ করলাম। মন্ত্রী হয়েছি বলে আমাকে কি দিনরাত সরকারী কাজ বা লোকের কাজ করতে হবে? আমার কি একটা পারিবারিক জীবন থাকবে না? রাত দিন কেবল কাজ কাজ আর কাজ!

সদর দরজায় আবার ধাক্কার শব্দ শোনা গেল।

ভাবলাম বৈঠকখানা ঘরের বাইরে যে চাকরটি আমাদের ছোটখাট ফাই-ফরমাশ খাটবার জন্য বসেছিল সেই সদর দরজা খুলে দেবে এবং তারপর কে এসেছে তা জেনে আমাকে এসে বলবে। কিন্তু ক্রমাগত ধাক্কার আওয়াজ সত্ত্বেও ঘরের কোন লোক তা শুনতে পাচ্ছিল বলে আমার মনে হচ্ছিল না। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে নিজ নিজ কাজ করতে লাগল। আমি অবাক হলাম। এমন সময় কে যেন আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ওঠ—ওঠ, টুপি আর ছড়ি নাও—বেরিয়ে এস।'

চমকে তাকালাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। কে বললে এ কথা? কিন্তু আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল একটা কথা,—বেরোও বেরোও, বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস। আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। কোন এক অদৃশ্য আর অলৌকিক শক্তির তাড়নায় আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। কে যেন আমার হাতে টুপি আর ছড়ি ধরিয়ে দিল, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এ সময় আমার স্ত্রী ক্যাথারিন বোধহয় আমাকে কিছু বলেছিলেন কিন্তু তাঁর কোন কথা আমি শুনতে অথবা বুঝতে পারি নি।

এমনিতে আমাদের সিঁড়িটা অন্ধকার। কিন্তু আমি যখন নামছিলাম তখন একটা অস্পষ্ট নীলাভ দ্যুতিতে সিঁড়ির অন্ধকারটা কেটে গিয়েছিল। দেখলাম সিঁড়ির নীচে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয় সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

আমি নীচে নামতেই সে পরিষ্কার গলায় বলল, ' আমার পিছনে এসো।' লোকটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার কাছে তার কিসের প্রয়োজন আমি সেটুকুও জানতে চাইলাম না। বৈঠকখানা ঘর থেকে বের হয়ে আসবার পর আমার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি যেন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল! বিনা দ্বিধায় আমি লোকটির পিছন পিছন চললাম। কোথায় যাচ্ছি? কার সঙ্গে যাচ্ছি? এ সব কোন প্রশ্নই আমার মনে জাগল না। রহস্যময় আগন্তুক যেন আমাকে পুরোপুরি আবিষ্ট—পুরোপুরি সম্মোহিত করে ফেলেছিল।

বাড়ির কম্পাউণ্ড পেরিয়ে সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম।

লোকটি এগিয়ে চলল, আামিও চললাম পিছু পিছু।

কতক্ষণ চললাম জানি না, কেননা আমার সময়বোধ চলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ যাবার পর আমরা একটা সরু নদীর পাড়ে এসে পড়লাম। নদীর জলের রং মিশকালো। এত কালো রঙের জল আমি আগে কখনও দেখিনি। নদীর উপর কোন সেতু ছিল না, ছিল দুখানা সরু হাল্কা তক্তা। আমার পথ-প্রদর্শকের শরীর বোধহয় পাখীর পালকের মতো হাল্কা। সে স্বচ্ছন্দে ওরকম তক্তার উপর দিয়েই নদী পার হয়ে গেল। তার অদৃশ্য টানে আমিও তক্তার উপরে উঠলাম। কিন্তু আমার ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হল আমার দেহের ভারে এক্ষুনি এই হালকা-পলকা তক্তা দুখানা ভেঙে পড়বে। আর আমি গিয়ে পড়ব ঐ কালো জলের মধ্যে। যাইহোক শেষপর্যন্ত ঐ তক্তা ধরেই নদীর ওপাড়ে গিয়ে পৌছলাম!

মনে হল এক বিরাট তেপান্তরের মাঠের মধ্যে এসে পড়েছি। পিছন ফিরে তাকালাম। পিছনের সবকিছু যেন ঘন কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মাত্র একটি পরিচিত বস্তু আমার নজরে এল এবং তা হল ব্রিমেন শহরের সুউচ্চ গির্জার চূড়া।

যে তেপান্তরের মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম সেখানে কোন ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট বা গাছপালা কিছুই ছিল না। মাঠের মধ্যে কেবল ঘাসের গোড়া। আর সে ঘোড়াগুলো যেন ঝলসে গিয়েছে আগুন লেগে। ঐ বিশাল প্রান্তর যেন সদ্য অগ্নিস্নান করে উঠেছে।

সেই অগ্নিস্নাত মরা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এক সময় আমি যেন আমার হারানো ইচ্ছাশক্তির কিছুটা ফিরে পেলাম। রহস্যময় পথ প্রদর্শককে জিজ্ঞেস করলাম,

—'আমি কোথায় যাচ্ছি?'

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

—'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

এবারেও কোন উত্তর না দিয়ে পথপ্রদর্শক আমাকে অনুসরণ করবার ইঙ্গিত করল। আমার জাগ্রত ইচ্ছাশক্তি আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সম্মোহিতের মতো আমি নীরবে সেই রহস্যময় মানুষটিকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

ক্রমে আকাশ আর পৃথিবী ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল। মনে হল পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে আমি এক ভিন্ন জগতে এসে পড়েছি। আমার সামনের লোকটি আর আমি—এ দু'জন ছাড়া এ নতুন জগতে আর কোন জনমানব নেই।

এই কুহেলীময় জগৎ কবরভূমির মতই নিস্তব্ধ। কোন দিক থেকে কোন শব্দ

আমার কানে আসছিল না। এমনকি আমাদের দু'জনকার পায়ের শব্দটুকু পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলাম না।

এ যেন এক অসাধারণ, অলৌকিক আর অতীন্দ্রিয় জগৎ, এ জগতে কেউ আমাকে স্বাগত জানাবে না।

মাঝে মাঝে হু হু করে হাওয়া বইছিল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। বাতাসের ঝাপটায় আমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আর,তাছাড়া আর একদিক থেকেও সেই ঠাণ্ডা বাতাস মোটেও প্রীতিকর ছিল না। কেননা বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছিল একটা অদ্ভুত দুর্গন্ধ—যেন বহু দিনের পচা কাদার দুর্গন্ধ।

সেই কুহেলী-মলিন জগতের ধূসর কুয়াশার মধ্য দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে যাবার পর আমরা একখানা প্রাসাদের সামনে এসে থামলাম! কুয়াশাও পাতলা হয়ে গেল। সেই বিরাট প্রাসাদের আশেপাশে আর কোন বাড়ি দেখতে পেলাম না। প্রাসাদে অসংখ্য জানলা। জানলাগুলি দিয়ে ভিতরের আলো বাইরে এসে পড়ছে।

'এ কার প্রাসাদ? এমন বিরাট জমকাল প্রাসাদ—ব্রিমেন কেন, আশেপাশের আর কোন রাজ্যে আছে বলে তো আমার জানা ছিল না।

পথপ্রদর্শক আমাকে প্রাসাদে ঢুকবার জন্য ইঙ্গিত করল, আমি বললাম,'এ প্রাসাদের মালিক কে জানি না। তবে যিনিই মালিক হোক না কেন, তিনি আমার অপরিচিত। অপরিচিত লোকের বাড়িতে কি করে ঢুকব?'

—' তা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' আমার রহস্যময় সঙ্গী গম্ভীর স্বরে বলল, 'কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি এ বাড়ির মালিক বা যাদের দেখবে তাদের কাউকে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। যদি প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরবার ইচ্ছা থাকে তবে কোন কথা না বলে সব কিছু নীরবে দেখে যাবে। তবে হ্যাঁ, যা দেখবে তা খুব মনোযোগ দিয়েই দেখবে। সেগুলো যেন তোমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে থাকে।'

আমরা দু'জনে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। হাজার হাজার মোমবাতির আলোয় প্রাসাদের ঘরগুলো যেন প্রায় দিনের মতই আলোকিত। ভেতরে জমকালো সাজ-পোশাক পরা অনেক নর-নারী বসে আছেন—গল্প-গুজব করছেন। আমরা ঢোকামাত্র তারা আমাদের দিকে তাকালেন কিন্তু কোন কথা বললেন না। দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা অভিজাত বংশের নর-নারী। এঁদের কাউকে আমি কোনদিন দেখিনি।

পথপ্রদর্শক আমাকে তাঁদের দিকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে নিজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। একটু ইতস্ততঃ করে আমি লজ্জিতভাবে এগিয়ে গেলাম।

একদল অভিজাত নর-নারীর সামনে গিয়ে আমি তাঁদের অভিবাদন করলাম। কিন্তু তাঁরা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমার দিকে তাকাবার ফুরসতটুকু পর্যন্ত তাঁদের হল না।

কিন্তু আমি তাঁদের ভালভাবে দেখবার সুযোগ পেলাম। কি আশ্চর্য প্রত্যেকটি নারীর গলা ঘিরে লাল দড়ির মতো একটা চিহ্ন রয়েছে। পুরুষদের দিকে তাকালাম। তাঁদের গলা গলবন্ধ ঢাকা, কিন্তু গলবন্ধের উপরেই লাল দড়ির স্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে। আমি ঐ লাল দাগের কোন অর্থই বুঝতে পারলাম না।

আর একটা ব্যাপার দেখে আমি আরো চমকে গেলাম। আমার সামনেই একদল নর-নারী তাস খেলায় মত্ত, কিন্তু যে তাসগুলি নিয়ে তাঁরা খেলছেন সেগুলি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে।

দারুণ অস্বস্তিতে আমার মনটা ভরে গেল। এ কোথায় এলাম আমি? কাদের মাঝখানে এলাম?

সে ঘরখানা ছেড়ে আমি পাশের ঘরে ঢুকলাম। এ ঘরখানা আরও চমৎকারভাব সাজানো। ঘরের চারপাশে লাল ভেলভেট, দরজায় দামী কারুকার্য করা পর্দা। ঘরের মধ্যে একখানি সুদৃশ্য সোফা। সেই সোফায় অভিজাত বংশীয় পুরুষ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছেন।

কিন্তু ঘরের মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আমি আঁতকে উঠলাম। আমার বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডটা যেন ধ্বক্ করে লাফিয়ে উঠল।

রক্ত! রক্ত! রক্তের স্রোত বইছে ঘরের মেঝেতে। রক্তস্রোতের গতি পাশের ঘরের দিকে। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পাশের ঘরে চলে এলাম। কিন্তু একি! এখানে তো একটি লোকও নেই। এই তো— মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে এখানে কত নারী-পুরুষ দেখে গিয়েছি; তারা সব কোথায় গেল? তারা কি কর্পূরের মতো উবে গেলেন! কিন্তু না, কর্পূরও তো এত তাড়াতাড়ি উবে যেতে পারে না।

হঠাৎ ঘরের উজ্জ্বল আলো ম্লান হয়ে এল, শোনা গেল সুমধুর যন্ত্র-সঙ্গীত। কিন্তু কোন মানুষকে দেখতে পেলাম না। অথচ ঐ চমৎকার সঙ্গীত যে এই বিশাল ঘরখানার মধ্যে কোথাও হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কি করব তা বুঝতে না পেরে এ ঘর ছেড়ে আবার পাশের ঘরখানায় যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এবার আর পাশের ঘরে যেতে পারলাম না। দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিলাম, দরজা খুলল না। দরজার মাথায় কালো রঙে ফুটে উঠল কয়েকটা সংখ্যা ঃ

১ ৭ ৮ ৯

এর কোন অর্থই আমি বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করলাম। দারুণ ঘুমে আমার চোখ দু'টি যেন জড়িয়ে এল। ঘুম ঘুম....সাত রাজ্যের যত ঘুম তা যেন এসে ভর করল আমার দুটি চোখের পাতায়। সামনেই একখানা নরম গদি-মোড়া আরাম কেদারা। বসলাম। গা এলিয়ে দিলাম কেদারায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। একটা ভয়ঙ্কর গণ্ডগোলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ইস্ অনেক রাত হয়ে গেছে। বাড়ির কথা মনে পড়ল, বাড়ির সবাই কত চিন্তা করছে আমার জন্য। বোধহয় বুড়ি ঠাকুরমা পর্যন্ত এখনও ঘুমোতে পারেননি! কিন্তু এখান থেকে যাব কি করে? এ তো সম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গা। এখানকার পথঘাট তো কিছুই জানি না। বাড়ি যেতেই বা কত সময় লাগবে কে জানে! সেই পথপ্রদর্শক কোথায় গেল?

গণ্ডগোলটা বাড়তে লাগল। আমি পথপ্রদর্শকের খোঁজে এ ঘর ও ঘর করতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত তাকে পেয়েও গেলাম। সে ঠিক একইভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে ইঙ্গিতে তার কাছে যাবার জন্য বলল। গেলাম। আমাকে নিয়ে পথপ্রদর্শক প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এল।

আবার সেই দিকচিহ্নহীন ধূসর কুয়াশার রাজ্য।

নানা পথ ধরে একটা জায়গায় এসে পথ-প্রদর্শক আমাকে বলল, 'এবার তুমি নিজেই যেতে পারবে।'

আমাকে অভিবাদন করে পথ-প্রদর্শক বিদায় নিল। ধূসর কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল সে। তার পরিচয় আমার কাছে অজানাই রয়ে গেল।

আমি ভীত, ক্লান্ত, অবসন্ন। টলতে টলতে বাড়ির দিকে এগোলাম। ভয় হচ্ছিল এই বুঝি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। কেন জানি বাড়ির সদর দরজার কাছে এসে আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম।

মাননীয় ধর্মযাজক, মাননীয় ভদ্রোমহোদয়গণ, এই হল আমার বিচিত্র কাহিনী। আপনারা এ কাহিনী বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা। কিন্তু আমি যে কোন শপথ করে বলতে পারি যে, যে কাহিনী আমি বললাম, তার প্রতিটি ঘটনা দিনের আলোর মতই সত্য। এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যা, জালজোচ্চুরী বা ধাপ্পাবাজী নেই। কাহিনী লেখাও শেষ হয়েছে। এবার আমি আপনাদের সবাইকার সামনে লেখার তলায় স্বাক্ষর করব।

ব্রিমেনের প্রাক্তন মন্ত্রী হের সেবালডাস ব্যেরলিনের বিচিত্র কাহিনী এখানেই শেষ হয়েছে।

কথা শেষের পর

কোথায় গিয়েছিলেন সেবালডাস ব্যেরলিন? ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বন্ধ দরজার সামনে থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন। সময়ের অদৃশ্য স্রোত ধরে তিনি কি চল্লিশ বছর এগিয়ে গিয়েছিলেন? রহস্যময় পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে তিনি কি পৌঁছে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতে—ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্ লগ্নে? যে অভিজাত নর-নারীদের তিনি সেই বিরাট প্রাসাদের মধ্যে দেখেছিলেন তারা কি ফরাসী অভিজাত নর-নারী? গলায় লাল দাগ, তাস থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, ঘরের মধ্যে রক্তস্রোত, এ সবই কি আসন্ন রক্তক্ষয়ী ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব সঙ্কেত? কাল এক—অবিচ্ছিন্ন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এ সবই আপেক্ষিক ধারণা। ভবিষ্যতের পর্দাটা কি কিছুক্ষণের জন্য সরে গিয়েছিল হের সেবালডাসের সামনে থেকে? তিনি কি পেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ ফরাসী বিপ্লবের আভাস?

সেই রহস্যময় পথ-প্রদর্শকই বা কে? সে কি কালপুরুষ? তাকেই কি বলে নিয়তি?

এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। রহস্যময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত রহস্যই তো আজও আমাদের অজানা। সেসব ভেদ করা তো আজও আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

দ্বীপের নাম অজানা

উইলিয়ম সামব্রট

(এ কাহিনীটি রচিত হয়েছে একটি গ্রীক কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে। এক অপূর্ব অলৌকিক কাহিনী। মূল কাহিনীর কেলি এলিয়টই হল বর্তমান কাহিনীর কৃষ্ণেন্দু)

উঁচু দেওয়ালের গায়ে একটা ফাটল। ফাটলে চোখ রাখল কৃষ্ণেন্দু; ভিতরের দিকে তাকাল। ওর কাঁধে, পিঠে লুটিয়ে পড়ছে ইজিয়ানের অগ্নিবর্ষী খর রৌদ্র। রোদের তাপ গ্রাহ্য করল না কৃষ্ণেন্দু।

ইজিয়ান সাগরের সুনীল জলরাশির বুকে এক টুকরো নুড়ির মতই ছোট্ট এই দ্বীপটি। এই অখ্যাত অজানা দ্বীপে এই বিশাল পাঁচিল তৈরী করল কারা। উঁচু পাঁচিলের আড়ালেই বা কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা জানবার জন্যই কৃষ্ণেন্দুর এখানে আগমন।

ওপাশে ছোট্ট একটি ঝরণা। ঝির ঝির করে জল পড়ছে। ঝরণার পাশে দু'টি মূর্তি—মা আর ছেলে। মায়ের কোলে উঠবার চেষ্টা করছে ছেলেটি।

পাথরের তৈরী মূর্তি দুটি। কিন্তু পাথর? এতদূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট দূরবীন বের করল কৃষ্ণেন্দু। এবার ফাটলের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে চমকে উঠল ও।

কি অপূর্ব সুষমামণ্ডিত পাষাণময়ী নারী মূর্তি। মাথাটি একটুখানি হেলান, চোখ দু'টি বিস্ফারিত। গভীর বিস্ময়ে দৃষ্টিহীন পাষাণ চোখ দু'টি যেন তাকিয়ে রয়েছে এক মহা রহস্যের দিকে। কি সে রহস্য? মায়ের হাঁটু ধরে কোলে উঠবার চেষ্টা করছে ছেলেটি। এক দুরন্ত দামাল ছেলে যেন মাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে মায়ের কোলে। তার গতিবেগ—তার দেহভঙ্গীমা—তার অপার আনন্দ—সব কিছুকেই নিখুঁতভাব ফুটিয়ে তুলেছেন ভাস্কর।

মূর্তি দু'টি যেন জীবন্ত। কোন মহাশিল্পী তৈরী করেছেন এই নিখুঁত ম্যাডোনা? কোন্ যুগে? কোন্ কালে? পৃথিবীর কোন 'ক্যাটালগে'ই তো এ মাতৃমূর্তির কথা লেখা নেই।

কোনরকম পূর্ব-পরিকল্পনা না নিয়ে হঠাৎই এই নাম-না-জানা দ্বীপভূমিতে এসে পড়েছে কৃষ্ণেন্দু। ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করতে এসেছিল ও, পড়াশুনা শেষ

হতে দেশে ফিরবার আগে একবার কন্টিনেন্ট ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা হল ওর মনে।

ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার লীলাভূমি রোম আর গ্রীস সম্বন্ধে ওর মনে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল। ফ্রান্সের মার্সাই থেকে ইটালির রোম, তারপর দ্রুতগতিতে ইটালি ঘুরে ও এসে পৌঁছল গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে। গ্রীসের মূল ভূখণ্ড থেকে যাত্রীবাহী জাহাজ ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করে। এমনি একখানা জাহাজেই চেপে বসেছিল কৃষ্ণেন্দু। জাহাজখানা জরাজীর্ণ—কোনরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে ইজিয়ানের সুনীল জলরাশি ভেদ করে এগিয়ে চলেছিল দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে। লেসবস থেকে শিয়স্,শিয়স্ থেকে শ্যামস্, সেখান থেকে ইকারিয়া দ্বীপ ছুঁয়ে জাহাজখানা এগিয়ে চলেছিল দক্ষিণে—সাইক্লাডিস দ্বীপমালার দিকে!

প্রাচীন প্রাচ্যের সংস্পর্শে এসে ইজিয়ান সাগরের দ্বীপমালার সভ্যতার স্ফুরণ হয়েছিল সুপ্রাচীনকালেই। গ্রীক পুরাণের অনেক দেবতারই বিচরণভূমি এই দ্বীপগুলো। প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের দিক থেকে দেখতে গেলেও এ অঞ্চলের অনেক দ্বীপই খুব সমৃদ্ধ। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণেন্দু কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও সংগ্রহ করেছিল।

ইকারিয়া থেকে জাহাজ ছাড়বার পর সমুদ্রে ছোটখাট একটা ঝড় উঠেছিল। ঝড়ের সময় ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বাতাসের ধাক্কায় জাহাজ যাচ্ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। ঝড় থামতে ইঞ্জিন আবার চালু হল। পুরোনো হাঁপানী রুগীর মতো কাশতে কাশতে ইঞ্জিনখানা আবার জরাজীর্ণ জাহাজখানাকে চালিয়ে নিয়ে চলল। জাহাজে রেডিও ছিল না। কিন্তু এ নিয়ে ক্যাপ্টেনের মনেও কোন চিন্তা-ভাবনা ছিল না। কেননা অসংখ্য দ্বীপে ভরা ইজিয়ান সাগরে দিকভ্রষ্ট হয়ে কে আবার হারিয়ে যায়?

সাগরের সুনীল জলরাশি ভেদ করে একটা জলের পোকার মতই জাহাজখানা এগিয়ে চলেছিল। আবার এ সমুদ্রেই দূর দিগন্তসীমায় নুড়ির মতো এই ছোট্ট দ্বীপটা কৃষ্ণেন্দুর নজরে এল। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে চমকে উঠল ও। এক বিরাট উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছে। দ্বীপের প্রায় অর্ধেক অংশই আড়াল করে রেখেছে উঁচু দেওয়ালটা। এ কোন্ দ্বীপ? কৌতূহলী হয়েই ক্যাপ্টেনের খোঁজে পা বাড়াল কৃষ্ণেন্দু।

ক্যাপ্টেন ডেকে-ই ছিলেন, কয়েকজন লস্করকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

—মিঃ ক্যাপ্টেন, দূরে একটা ছোট দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন হাসলেন, তাকালেন সমুদ্রের দিকে।

—একটা বিরাট উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছে দ্বীপটার মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সমুদ্রের দিক থেকে।

—ও কিছু নয়,' একটু যেন কর্কশ স্বরেই ক্যাপ্টেন বললেন, অল্প কয়েক ঘর গরীব লোক ওই দ্বীপে থাকে। ওরা ছাগল চরিয়েই দিন গুজরান করে। দ্বীপটার কোন নাম পর্যন্ত নেই।

—কিন্তু একটা বিরাট উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছে যে, দেখুন না—ক্যাপ্টেনের দিকে বাইনোকুলারটা এগিয়ে ধরে কৃষ্ণেন্দু বলল।

—না না, দেখবার দরকার নেই, অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গে ক্যাপ্টেন বললেন, ও একটা ধ্বংসাবশেষ। ইজিয়ানের দ্বীপগুলোতে তো এরকম কতই দেখা যায়।

—ওখানে একবার যাওয়া যায় না?

—ওখানে যাবেন? গিয়ে কি করবেন? ওখানে কোন জাহাজঘাট নেই, দ্বীপে কেউ যায় না। ও দ্বীপ আপনার পছন্দ হবে না। হোটেল নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই, তাছাড়া....,ক্যাপ্টেনের বাক্যস্রোত সহসা থেমে গেল।

—আমি ঐ পাঁচিলটা আর ওপাশে কি আছে দেখতে চাই।

স্থির দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন তাকালেন কৃষ্ণেন্দুর দিকে। দেখা গেল তিনি বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন।

—পাঁচিলের ওপাশে কিছু নেই, এ খুব পুরোনো জায়গা, সভ্যতার সব চিহ্নই বহুকাল ধুয়ে মুছে গেছে।

—আমি পাঁচিলটা দেখব। শান্ত অথবা দৃঢ়স্বরে কৃষ্ণেন্দু বলল।

—কিন্তু জাহাজ তো ও দ্বীপে যাবে না।

—বেশ তো আমায় একখানা নৌকো দিন, আমি একলাই ঘুরে আসব দ্বীপ থেকে।

—কিন্তু দ্বীপটা তো অনেক দূরে, আপনি যাবেন—আসবেন, অনেক সময় তো চলে যাবে। জাহাজ কতক্ষণ অপেক্ষা করবে আপনার জন্য?

—অপেক্ষা করবার দরকার নেই, আমি ইজিয়ানের দ্বীপগুলো দেখতেই বেরিয়েছি। পছন্দ হলে দ্বীপটায় আমি রাত্রিবাসও করতে পারি।

—তবে আপনি ফিরবেন কি করে?

—সে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই, এ দ্বীপের লোকেরা কি আর বাইরের সঙ্গে মোটেই যোগাযোগ রাখে না। আপনি শুধু একটা লোক দিন আমাকে যে নৌকোয় করে আমাকে দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—কোন লোকই ও দ্বীপে নামতে চাইবে না।

—নামতে হবেও না, আমায় শুধু পৌঁছে দিয়ে আসলেই হবে।

—আপনার কি যেতেই হবে, না গেলে হয় না। ক্যাপ্টেনের গলার স্বরে যেন মিনতি ঝরে পড়ল।

—এ কথা বলছেন কেন? মনে হচ্ছে আমার দ্বীপে যাওয়াটা আপনার মোটেই পছন্দ নয়।

—না, বলছিলাম এতটা ঝুঁকি নেবার দরকারই বা কি? অপ্রস্তুতভাবে ক্যাপ্টেন বললেন।

শেষপর্যন্ত একজন মাল্লাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নৌকো করে বেরিয়ে পড়ল কৃষ্ণেন্দু।

কৃষ্ণেন্দুকে দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে মাল্লাটা যেভাবে পড়িমরি করে নৌকো নিয়ে চলে গেল, তাতে বেশ অবাকই হল ও।

ওর সামনে গ্রামের পথ। পথ জনহীন। কয়েকখানা পাল-তোলা ছোট নৌকো দেখা যাচ্ছে ঘাটে। এ নৌকোগুলোর বাইরের জগতের সঙ্গে এই নামহীন দ্বীপের একমাত্র সংযোগসূত্র। সামনে একটা সরাইখানা দেখা যাচ্ছে না? একটু দূরে নীচু পাহাড়গুলোর গায়ে আর মাথায় ছাগল চড়ছে।

না, ক্যাপ্টেন বোধ করি ঠিকই বলেছেন। এ এক পুরোনো আর ভুলে যাওয়া দ্বীপ। ইজিয়ান মালবের দ্বীপমালায় একদা যে মহান সভ্যতার স্ফূরণ হয়েছিল তার মূল স্রোত থেকে এ দ্বীপ বহু দূরে, এখানে বোধহয় কোনদিন পদপাত ঘটে নি। কিন্তু পরক্ষণেই কৃষ্ণেন্দুর মনে পড়ল পাঁচিলটার কথা। অত বড় বিশাল পাঁচিল, যা দ্বীপের প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে, তা তৈরী করল কারা? কারিগরি বিজ্ঞানে উন্নত মানুষ ছাড়া এমন স্থাপত্যকর্ম তো কেউ করতে পারে না। না, কৌতূহল বেড়েই যাচ্ছে, এ দ্বীপে এসে কৃষ্ণেন্দু ঠিক কাজই করেছে।

দ্বীপের একমাত্র সরাইখানাটায় উঠল কৃষ্ণেন্দু! যেমন দ্বীপ তেমনি তার সরাইখানা। খদ্দেরের ভীড় একদম নেই। এক কাপ গরম ছাগলের দুধ খেয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। এখনই একবার পাঁচিলটার দিক থেকে ঘুরে আসা যাক।

সরাইখানা থেকে খানিকটা দূরে একটা গোল টিলা আর তার ঠিক ও পাশে পাঁচিলটার একটা বাঁক, এখান থেকেই 'সার্ভে ওয়ার্ক' শুরু করল কৃষ্ণেন্দু।

পাঁচিল বরাবর হাঁটতে লাগল ও। উদ্দেশ্য ভিতরে ঢুকবার 'গেটটা খুঁজে বের করা। এ পাঁচিল এত উঁচু এবং এর গা এত মসৃণ যে টপকে ভিতরে যাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু না, পাঁচিলটার গায়ে কোথাও কোন দরজা নেই। এমনকি পাঁচিলের কোন জায়গা ভেঙে গিয়ে ঢুকবার কোন পথও তৈরী হয় নি। ঘেরা

জায়গাটা একটা উপদ্বীপাকৃতি ভূখণ্ড। এ উপদ্বীপের এক মাথায় ছোট ছোট টিলা। সিন্ধু শকুনের ঝাঁক মাথায় নিয়ে বিক্ষুব্ধ অশান্ত সমুদ্রে বিরামহীন তরঙ্গ ভঙ্গকে প্রতিহত করছে। উপদ্বীপাকৃতি ভূখণ্ড সংকীর্ণ হয়ে যেখানে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে সেখানটাতে কোন পাঁচিলের আবরণ নেই। কেবল ওখান থেকেই বাগানে ঢোকা যায়। কিন্তু নৌকো ছাড়া ওখানে যাবার উপায় নেই।

প্রায় গোটা পাঁচিলটা ঘুরে হতবুদ্ধি হয়েই ফিরে আসছিল কৃষ্ণেন্দু, হঠাৎ ও শুনতে পেল জলের মৃদু কলতান সঙ্গীত। শব্দটা উঁচু দেওয়ালের ভিতর থেকেই আসছে। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ফাটলটা আবিষ্কার করল কৃষ্ণেন্দু। তারপর দূরবীণে চোখ দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে ও স্তম্ভিত হয়ে গেল।

এ দ্বীপে আসা সার্থক হয়েছে, গ্রীক ভাস্কর্যের কি অপূর্ব নিদর্শন—কি সার্থক শিল্প-সৃষ্টিই ও দেখছে। ফাটল থেকে চোখ সরাতে পারল না কৃষ্ণেন্দু।

কিন্তু কি আশ্চর্য! পৃথিবীর কোন পুঁথি-পত্রে এই আশ্চর্য মাতৃমূর্তির বিবরণ নেই কেন? এ দ্বীপে কি কোনদিন কোন অনুসন্ধানী প্রত্নবিদ আসেন নি? এশিয়া বা ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে এ দ্বীপ তো খুব বেশি দূরে নয়। আর পথও তো এমন কিছু দুর্গম বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু ঘটনা এই যে, এ নাম না জানা দ্বীপখণ্ডের উঁচু পাঁচিলের আড়ালে যে অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে, তা বাইরের দুনিয়ার মানুষের কাছে একেবারেই অজানা।

একটা আবিষ্কারের আনন্দে কৃষ্ণেন্দুর বুকটা দুলে উঠল। সভ্যজগৎ এবার জানবে এই মাতৃমূর্তির কথা। কৃষ্ণেন্দু পাবে আবিষ্কারকের গৌরব। মা আর ছেলের মূর্তি দুটিকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। মূর্তি দু'টির প্রকৃত স্থান হচ্ছে পৃথিবীর কোন বিখ্যাত যাদুঘর।

কিন্তু এই পাঁচিলঘেরা বাগানের মালিক কে? তার সঙ্গে তো আগে কথাবার্তা বলতে হবে। মালিক হয়ত জানেই না মানুষের শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে মূর্তি দু'টি কত মূল্যবান।

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে দেওয়ালের ফাটল থেকে চোখ সরিয়ে গ্রামের পথ ধরল কৃষ্ণেন্দু। ধুলো ভরা পথ চলতে চলতে, মা আর ছেলের কথাই বার বার মনে আসতে লাগল ওর। এ মূর্তি দু'টির ভাস্কর নিঃসন্দেহে দেবদুর্লভ শিল্পপ্রতিভার অধিকারী। কিন্তু কে সেই মহান শিল্পী?

গ্রামে এসে সরাইখানার সামনে থামল কৃষ্ণেন্দু। উঃ, ধুলোয় বালিতে জুতোজোড়ার কি অবস্থা হয়েছে! জুতোর মধ্যেও বালি আর কাঁকড় ঢুকে গেছে। জুতো খুলে একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক।

নিজের কামরায় এসে ব্যাগ থেকে কালি আর বুরুশ বের করল কৃষ্ণেন্দু।

—আমি করে দিচ্ছি।

চমকে উঠে মুখ তুলল কৃষ্ণেন্দু। দরজায় একটি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। তার এক হাতে একখণ্ড ছেঁড়া ন্যাকড়া, অন্য হাতে জুতো পালিশ করবার সাজসরঞ্জাম। কৃষ্ণেন্দুর অনুমতির কোন অপেক্ষা না রেখেই ছেলেটি জুতো পালিশ করতে শুরু করল।

খাটের উপর বসে কৃষ্ণেন্দু তাকিয়ে রইল ছেলেটার দিকে।

ছেলেটির বয়স হবে বছর পনের। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। বয়সের তুলনায় একটু বেঁটে। আগের যুগ হলে ছেলেটি কোন চিত্র-শিল্পী বা ভাস্করের মডেল হতে পারত। ছেলেটির মাথার গড়ন চমৎকার। মাথাভরা কোঁকড়া চুল। দু'থোকা চুল এসে লুটিয়ে পড়েছে কপালের দু'পাশে, যেন চারণভূমি, পশুপাল আর বনভূমির গ্রীক অধিদেবতা প্যান-এর ছোট ছোট দু'টি শিং। খাঁটি গ্রীসিয়ান প্রোফাইল। কিন্তু না, মস্ত একটা খুঁত রয়েছে। ছেলেটির নাকের পাশ থেকে উপরের ঠোঁটের কোণা পর্যন্ত এসে একটা গভীর ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। এ ক্ষত অতীতের কোন দুর্ঘটনার সাক্ষী। ক্ষতের ফলে চামড়ায় টান পড়ে উপরের ঠোঁটটা ডান পাশে একটু উঠে গেছে। মুক্তোর মতো সাদা দাঁতের ঝলক দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে।

না অতীতের কোন শিল্পীই প্যান দেবতার মডেল হিসেবে এ ছেলেটিকে নির্বাচন করতেন না।

গ্রামের বাইরে ওই পাঁচিলঘেরা বাগানবাড়ির মালিক কে? গ্রীক ভাষায় কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করল। ইংলণ্ডে পড়াশুনা করবার সময়ই ও ভাল করে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিখে নিয়েছিল।

ছেলেটি চমকে মুখ তুলল। একটা ছায়া যেন নেমে এল ওর দুটি কালো চোখে। আস্তে আস্তে ও মাথা নাড়ল।

—তুমি নিশ্চয়ই জান, কৃষ্ণেন্দু আবার বলল, দ্বীপের গোটা দক্ষিণ দিকটা জুড়ে এই পাঁচিলঘেরা বাগানটা কার? এ বাগানের মালিক কে?

—ও পাঁচিলঘেরা বাগানটা চিরকালই এখানে আছে, প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ছেলেটি বলল।

—চিরকাল মানে তো অনেক সময়, কৃষ্ণেন্দু হাসল, সম্ভবতঃ তোমার বাবা জানেন।

—আমার বাবা নেই—মা নেই—কেউ নেই—আমি একলা।

—আহা-হা শুনে দুঃখ পেলাম। কিন্তু তুমি কি সত্যিই জান না ও বাগান-বাড়িতে কারা থাকে?

ছেলেটি জড়িত স্বরে কি একটা নাম বলল।

—কি বললে? গরডন? ঝুঁকে পড়ে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, তুমি বলছ গরডন নামে এক ইংরেজ পরিবার ওই পাঁচিলঘেরা সম্পত্তির মালিক? কৃষ্ণেন্দু যেন বেশ আশাহত হল। যদি কোন ইংরেজ পরিবার ও সম্পত্তির মালিক হয়, তবে মূর্তি দুটো পাবার আশা খুবই কম।

—তারা ইংরেজ নয়।

—তবে? আমি ও বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—অসম্ভব। ওখানে যাবার কোন পথ নেই।

—জানি দ্বীপের দিক থেকে কোন পথ নেই। কিন্তু সাগরের দিক থেকে তো যাওয়া যেতে পারে। ওদিকটায় তো পাঁচিল নেই।

ছেলেটি কোন কথা বলল না, কেবল মাথা নাড়ল।

ইতিমধ্যে একজন দুজন করে গ্রামবাসী জড়ো হয়েছিল দোর গোড়ায়। তারা চুপচাপ ওদের কথোপকথন শুনছিল।

ছেলেটির জুতো পালিশ শেষ হল। কৃষ্ণেন্দু ওর হাতে পঞ্চাশ লেপটা'-র একটা মুদ্রা গুঁজে দিল। ছেলেটি হাসল। সুন্দর এক কমনীয় কিশোর মূর্তি—সুন্দর, কিন্তু নিখুঁত নয়।

দোরগোড়ায় যারা এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন বুড়ো গোছের লোককে কাছে ডাকল কৃষ্ণেন্দু।

আমি গ্রামের বাইরের উঁচু পাঁচিলঘেরা বাগানের মালিকের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারবে?

আঁতকে উঠে লোকটা দু'পা পিছিয়ে গেল। তারপর কৃষ্ণেন্দুর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

কৃষ্ণেন্দুর মনে হল পয়সা না দিলে বোধহয় এদের মুখ খুলবে না, তাই দোরগোড়ায় যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সবাইকে শুনিয়ে ও বলল, আমি জানি যে সাগরের দিক থেকে ছাড়া ও পাঁচিলঘেরা জায়গাটায় ঢুকবার কোন পথ নেই। যে আমাকে নৌকো করে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে তাকে আমি পঞ্চাশ 'ড্রাকমা'—না পুরোপুরি একশ 'ড্রাকমা-ই দেব।

গরীব দ্বীপবাসীদের কাছে এ অনেক টাকা। ওদের মধ্যে কেউ-ই এক সঙ্গে এতগুলো টাকা হাতে পায় নি। এ টাকা হয়ত একজন দ্বীপবাসীর সারা বছরের উপার্জনের সমান।

এ অনেক টাকা। তবু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরা কোন উচ্চবাচ্য কর[illegible] কেবল একে অন্যের দিকে তাকাল।

বল কে যেতে রাজী আছ?

কেউ কোন কথা বলল না। একে একে ওদের সবাই চলে গেল দোরগোড়া থেকে। পিছন ফিরেও একবার কেউ তাকাল না।

সারা গ্রাম ঘুরে একটা লোক জোগাড় করতে পারল না কৃষ্ণেন্দু। কেউ নিয়ে যেতে রাজী হল না ওকে। সর্বত্রই সেই একই ধরনের রহস্যময় অস্বীকৃতি। কে ওটাকে তৈরী করেছে বা কারা ওখানে থাকে বলা তো দূরের কথা, দ্বীপবাসীরা যেন পাঁচিলটার উল্লেখ পর্যন্ত করতে অনিচ্ছুক। ওদের কাছে পাঁচিলঘেরা বাগানটার যেন কোন অস্তিত্বই নেই—ওটা যেন একান্তই অবাস্তব।

সন্ধ্যাবেলায় হতাশ হয়ে সরাইখানায় ফিরে এল কৃষ্ণেন্দু। খাবার টেবিলে বসে অপূর্ব মূর্তি দু'টোর কথাই ভাবতে লাগল। দেওয়ালের ওপাশের 'মা আর ছেলে'কে এতক্ষণে আসন্ন অন্ধকার ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে, একটা গভীর বেদনা বোধ ঘনিয়ে এল মনের আকাশে। মূর্তি দুটো বোধহয় পাওয়া যাবে না।

রাত গভীর হল। সরাইখানার ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগল না কৃষ্ণেন্দুর। পেন্সিল-টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। নিঝুম নিস্তব্ধ গ্রাম্যপথ। সারা গ্রাম ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনমনেই সমুদ্রের দিকে হাঁটতে লাগল ও।

হঠাৎ পিছনে একটা লঘু পদশব্দ শুনে চমকে পিছন ফিরে তাকাল কৃষ্ণেন্দু। একটি ছেলে আসছে। হ্যাঁ, সেই জুতো পালিশ করা ছেলেটিই তো। তারার আলোয় ছেলেটির চোখদুটি ঝক ঝক করছে। ছেলেটি কাঁপছে। কিন্তু রাতটা তো চমৎকার। বাতাসে তো হিমের পরশ নেই। তবে কেন কাঁপছে ও।

ছেলেটি এসে কৃষ্ণেন্দুর হাতে হাত রাখল। আঙ্গুলগুলো যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা।

—আমি আপনাকে আমার নৌকোয় করে নিয়ে যাব, কাঁপা কাঁপা গলায় ফিস ফিস করে ও বলল।

কৃষ্ণেন্দু হাসল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক থেকে। এ ছেলেটির কথা ওর আর একটু ভাবা উচিত ছিল।

বাঃ এতো বেশ কথা. কখন আমরা যাব?

ভাটার আগে।

সেটা কখন?

সূর্য উঠবার ঠিক একঘণ্টা আগে।

ঠিক আছে, আমি তৈরী থাকব।

—আমায় একশ' 'ড্রাকমা' দেবেন তো?

—নিশ্চয়ই।

—আমি আপনাকে নিয়ে যাব ঠিকই, কাঁপা কাঁপা গলায় ছেলেটি বলল, কিন্তু ছোট টিলাগুলো পর্যন্তই আমি যাব, তার ও পাশে কিন্তু আমি কিছুতেই যাব না। ভাটার টানে যতক্ষণ না জল সরে যায় ততক্ষণ আপনাকে টিলার উপরই অপেক্ষা করতে হবে। ডাঙা জাগলে বাকী পথটুকু আপনাকে হেঁটে যেতে হবে।

—এত ভয় পাচ্ছ কেন বল দেখি? অনধিকার প্রবেশের সব দায়-দায়িত্ব তো আমার, যদিও মনে হয় না......

ঠাণ্ডা আঙ্গুলে কৃষ্ণেন্দুর হাতখানাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ছেলেটি। তারপর ফিসফিস করে বলল, আপনি—আপনি কিন্তু কাউকে বলবেন না যে আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।

—বেশ তো তা-ই হবে। তুমি যদি না চাও, তবে একথা আমি কাউকে বলব না।

—না না, বলবেন না, ছেলেটির কাঁপা কাঁপা স্বরে মিনতি ঝরে পড়ল, ওরা কেউ এটা পছন্দ করবে না.... ওরা জানলে....

—বুঝেছি বুঝেছি, তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি কাউকে কিছু বলব না।

—মনে রাখবেন, সূর্য উঠবার ঠিক একঘণ্টা আগে এ পাশের পাঁচিলটা যেখানটায় সমুদ্রে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে নৌকো নিয়ে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

—আমার মনে থাকবে। তুমি ঠিক সময় আসবে তো?

—আমার কোন ভুল হবে না, আমি ঠিক সময়েই আসব।

মাথার উপরে তারা-জ্বলা আকাশ, তারকারাশি ম্লান হয়ে এলেও এখনও আকাশ-পট থেকে মুছে যায় নি। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ছেলেটির দেখা পেল কৃষ্ণেন্দু। একখানা পালহীন ছোট্ট নৌকোর উপর ছেলেটি বসেছিল। ঢেউ-এর দোলায় নৌকোখানি দুলছিল। এতটা পথ দাঁড় বেয়ে এসেছে ছেলেটি।

নৌকোয় উঠল কৃষ্ণেন্দু। যাত্রা শুরু হল। ছেলেটি একেবারে চুপচাপ। সাগর বিক্ষুব্ধ, শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কুয়াশার আড়ালে পাঁচিলটাকে অদ্ভুত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

ভাটায় জেগে ওঠা পাথুরে ডাঙার দিকে নৌকোটা এগোচ্ছিল দুলতে দুলতে।

—কে এই পাঁচিলটা তৈরী করেছিল?

—প্রাচীনেরা। সাগরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছেলেটির গলার স্বর থর থর করে কাঁপছে। উঁচু পাঁচিলটার দিকে পিছন ফিরে ছেলেটি নৌকো চালাচ্ছে। কতটা এগোনো হল বুঝবার জন্য পাঁচিলের দিকে না তাকিয়ে সাগরের দিকে তাকাচ্ছে।

ও পাঁচিলটা চিরকাল ধরে এখানে রয়েছে, আবার জবাব দিল।

উষার আলো ফুটে উঠছে। আকাশে তারার মালা অদৃশ্য। কেবল দু'চারটা বিবর্ণ ম্লান তারা এখনও আকাশ-পট থেকে মুছে যায়নি। প্রত্যুষের তরল অন্ধকারে এগিয়ে আসা দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণেন্দু ভাবতে থাকে। দেওয়ালটা বহু পুরোনো, এতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রিক সভ্যতা স্ফুরণের প্রথম যুগেই বোধ করি পাঁচিলটা তৈরী হয়েছিল। আর ঐ মা আর ছেলে? এও বোধহয় সে যুগেরই কোন মহানশিল্পীর সৃষ্টি। কিন্তু আসল প্রহেলিকা হচ্ছে এই যে, এমন কারিগরীবিদ্যা আর এমন তুলনাহীন অপূর্ব শিল্প-কর্ম বাইরের শিল্পজগতের কাছে এতকাল ধরে অজ্ঞাত রইল কি করে?

যুগ যুগ ধরে কালের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে এই অজানা দ্বীপের বুকে উঁচু দেওয়ালটা যেন সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এতকালের মধ্যে একজন সভ্য মানুষের পদসঞ্চারও কি এখানে শোনা যায়নি? এমন একজন মানুষও কি এখানে আসেনি যে ঐ দেওয়াল আর মূর্তির প্রকৃত গুরুত্ব আর তাৎপর্য বুঝতে পারে।

নিশ্চয়ই এসেছিল। কিন্তু বাইরের দুনিয়ায় একটা গুজব পর্যন্ত শোনা যায়নি কেন?

একখণ্ড কালো পাথরের গায়ে এসে নৌকো থামল। কৃষ্ণেন্দুর চিন্তাসূত্র কেটে গেল। ছেলেটি বৈঠা তুলে রাখল নৌকোর উপর।

—আমি আর এগোব না, জোয়ারের সময় আমি আবার এখানে আসব। ভয়-কাঁপা গলায় ছেলেটি বলল, আপনি..আপনি এখন আমার পাওনাটা মিটিয়ে দেবেন?

—নিশ্চয়ই, পকেট থেকে মানি-ব্যাগটা বের করল কৃষ্ণেন্দু, কিন্তু তুমি কি আমায় আর একটু এগিয়ে দেবে না?

—না, তীক্ষ্ণ গলায় ছেলেটি চীৎকার করে উঠল, আমি আর এগোতে পারব না।

—নৌকো লাগাবার ঘাট পর্যন্ত চল না।

—এখানে কোন ঘাট নেই, তীব্রভাবে জবাব দিল ছেলেটি।

না। সত্যিই কোন ঘাট নেই। কৃষ্ণেন্দু তাকিয়ে দেখল। সামনে বালুকাময় বেলাভূমি। এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড বড় বড় পাথরের চাঁই। তার ওপাশে আগাছার ঝোপ, মাঝে মাঝে দু'চারটে লম্বা 'সাইপ্রেস' গাছ দেখা যাচ্ছে।

—শোনো তোমায় যা বলি—আমি নৌকোটাকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাই। তুমি না হয় এখানেই অপেক্ষা কর, আমার মোটেই দেরি হবে না। আমি শুধু এ বাগানের মালিকের সঙ্গে একটু কথা বলেই চলে আসব বড়জোর ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।

—না! ছেলেটির গলা চিরে একটা আর্ত চীৎকার বেরিয়ে এল, আপনি যদি নৌকোখানা নিয়ে যান তাহলে—দারুণ ইত্তেজনায় ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। বৈঠা নিয়ে ঝুঁকে পড়ল পাথরের গা থেকে নৌকোখানাকে সরিয়ে নেবার জন্য। আর সেই মুহূর্তেই ঘটে গেল অঘটনটা।

প্রচণ্ড এক ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকোটা দুলে উঠল। টাল সামলাতে না পেরে ছেলেটি গিয়ে ছিটকে পড়ল অশান্ত সাগরের জলে। একখণ্ড পাথরের মতই ডুবে গেল ছেলেটি। ও বোধহয় ভাল করে সাঁতারই জানে না।

অঘটনটা এত আচমকা ঘটে গেল যে ব্যাপারটা বুঝতে মুহূর্ত সময় লাগল কৃষ্ণেন্দুর। তারপর বুকভরা শ্বাস নিয়ে ও ঝাঁপ দিল সাগরের জলে। একখণ্ড ডুবো পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লাগল ওর। কপালটা বোধকরি কেটেই গেল। তবু জল থেকে মাথা তুলল না কৃষ্ণেন্দু। ডুব সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল। হ্যাঁ পেয়েছে এইবার। ডুবন্ত ছেলেটার জামা চেপে ধরল কৃষ্ণেন্দু। কিন্তু ভিজে কাগজের মতো জামার টুকরোটা ছিঁড়ে এল ওর হাতে। আবার হাত বাড়াল কৃষ্ণেন্দু। এবার ছেলেটার মাথার উপর হাত পড়ল। শক্ত মুঠোয় ওর চুল ধরে জলের উপর ভেসে উঠল কৃষ্ণেন্দু। সাঁতরে এগিয়ে চলল কূলের দিকে। নৌকোটাকে দেখা যাচ্ছে না, কৃষ্ণেন্দুর লাফের ধাক্কায় ছিটকে গেছে নৌকোটা। বোধহয় আশেপাশের কোন পাথরের আড়ালে চলে গেছে। পরে খুঁজে দেখা যাবে। এখন আর নষ্ট করার মতো সময় নেই। ছেলেটাকে আগে ডাঙায় নিয়ে যেতে হবে। সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল কৃষ্ণেন্দু। শতখানেক গজ দূরেই পাঁচিলের দুটো হাতার মাঝখানে বালুকাময় বেলাভূমি! জল থেকে যখন ও উঠে এল তখন ছেলেটা দুর্বলভাবে কাশছে। ওর নাক মুখ থেকে ঝরে পড়ছে সাগরের নোনা জল। অনেকটা জল খেয়েছে ছেলেটা।

ওর অর্ধ-অচেতন দেহটাকে নিয়ে কূলে উঠে এল কৃষ্ণেন্দু। তারপর জলের সীমা থেকে দূরে বালির ওপর ওকে শুইয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত কাটল। ছেলেটা চোখ খুলল। হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে রইল কৃষ্ণেন্দুর দিকে।

—কোন ভয় নেই, এক্ষুনি তুমি ঠিক হয়ে যাবে। একটু বস তুমি এখানে। আমি দেখি তোমার নৌকোটা কোথায় গেল?

জলের দিকে আবার এগোল ও। সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল। না! ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে। নৌকোখানা এখনও বার দরিয়ায় ভেসে যায়নি। একখণ্ড পাথরের চাঁই-এর ওপাশে নৌকোখানা দেখতে পেল কৃষ্ণেন্দু। ঢেউ-এর তালে তালে ওখানা উঠছিল আর পড়ছিল। নৌকোয় উঠে বসল ও, তারপর বৈঠা দিয়ে জল কেটে এগিয়ে চলল।

দিগন্তে সাগরের বুকে সূর্যোদয় হচ্ছে। অপূর্ব দৃশ্য। বাতাসের বেগ স্তিমিত। বাতাস যেন কানে কানে কি কথা বলতে চাইছে। অদ্ভুত অনুভূতি!

নৌকো নিয়ে কূলে এসে পৌছল কৃষ্ণেন্দু। ছেলেটি আর বালির উপর শুয়ে নেই। একটা পাথরে হেলান দিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঘাড়টা ঘোরানো, বাগানের দিকে তাকিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ও যেন কি দেখছে!

—কি হে, এখন খানিকটা ভাল বোধ করছ তো? সোল্লাসে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, দুর্ঘটনাটা ঘটে ভালই হয়েছে কি বল? আমরা পাঁচিল ঘেরা বাগানে ঢুকবার একটা ছুতো পেয়ে গেছি।

ছেলেটির কাছ থেকে কোন জবাব এল না। ও এক চুল নড়ল না পর্যন্ত। যেমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি রইল।

—কি হে, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? ওর অনাবৃত কাঁধে হাত রাখল কৃষ্ণেন্দু।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে হাত সরিয়ে নিল ও। একি অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

নিদারুণ বিস্ময়ে, বালুকাময় বেলাভূমির দিকে তাকাল কৃষ্ণেন্দু। এই তো ওখানে বালির উপর ছেলেটিকে শুইয়ে রেখেছিল। ভিজে বালির উপর স্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকে উঠে ছেলেটি এই পাথরখণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। বালির উপর ওর দু'পায়ের ছাপ রয়েছে। আর এখানেই ও এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় হেলিয়ে কি যেন দেখছে ও। ওর ঠোঁঠ ফাঁক, দু'চোখ বিস্ফারিত—সারা মুখে এক অতলান্ত অতল বিস্ময়ের ছাপ।

এই তো আর এক সারি পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে! বাগানের দিক থেকে লঘুপদ সঞ্চারে কে যেন পাথরখণ্ডের ওপাশ পর্যন্ত এসেছিল। এই পাদুকাহীন নগ্ন পদচিহ্ন নিশ্চয়ই কোন নারীর।

ছেলেটির অবস্থা দেখে আর রহস্যময় পদচিহ্নের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণেন্দু মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। এটা ওর অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। নিজেকে ধিক্কার দিল ও।

ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে প্রাচীন গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী আর কিংবদন্তীর সঙ্গে যথেষ্ঠ পরিচয় ছিল ওর। বালুকাবেলায় রহস্যময় নারী-পদচিহ্ন দেখে এক ভয়ঙ্কর কিংবদন্তীর কথা ওর মনে এল। গ্যরগ্যান—এ কি গ্রীক পুরাণের সেই গ্যরগ্যানদের দ্বীপ।

গ্যরগ্যানরা হচ্ছে গ্রীক পুরাণের তিন ভয়ঙ্কর দানবী। মেডুসা, ইউরিয়েল আর স্থেনো। এই তিন বোনের নাম একদা মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করত মানুষের মনে।

ওদের মাথায় নাকি ছিল চুলের বদলে কতকগুলো জীবন্ত সর্প। ওরা এমনই ভয়ঙ্করী আর কুদর্শনা ছিল যে কোন মানুষ ওদের দিকে তাকাতে পারত না। গ্রীক পুরাণে বলে, তাদের মুখের দিকে যে তাকাত সে-ই নাকি পাথরে পরিণত হত।

সকালের নরম সেই সোনালী আলোয় বালুকাময় বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে রইল হতবুদ্ধি কৃষ্ণেন্দু। ওর মাথার উপর সিন্ধু-শকুনের চীৎকার—তিনপাশে অশান্ত ইজিয়ান সাগরের গর্জন। কৃষ্ণেন্দু এবার পরিষ্কার বুঝতে পারছে—কারা এই পাঁচিল তৈরী করেছিল—কেন তৈরী করেছিল—কেন দ্বীপের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল বাগানটাকে।

এ বাগান তিন গ্যরগ্যানের বিচরণভূমি। গ্রিক পুরাণ বলে, মহাবীর পারসিয়ুস মেডুসাকে নিহত করেছিলেন। কিন্তু তার বাকী দু'বোন ইউরিয়েল আর স্থেনো? সে দুই দানবী কি আজও বেঁচে আছে? ওরা কি অমর!

হায় ভগবান! এ অসম্ভব!—এ তো একটা পুরা কাহিনী—একটা কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে তাতে তো কেবল নিছক কিংবদন্তী বলে মনে হচ্ছে না তিন দানবী বোনের কাহিনীকে। এতো এক ভয়ঙ্কর সত্য!

দারুণ আতঙ্কে কৃষ্ণেন্দু তাকাল সামনের স্থানু মূর্তিটির দিকে। একখণ্ড পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অচল দেহটি। ঘাড় হেলান। ঠোঁট ফাঁক। দু'চোখ বিস্ফারিত। সারা মুখে অতলান্ত বিস্ময়ের ছাপ। কপালের দু'পাশের শীলিভূত দু'থোকা চুল যেন প্যানদেবের দু'টি হ্রস্ব শৃঙ্গ। নিখুঁত মাথার গড়ন। একটি সার্থক গ্রীক ভাস্কর্য। মসৃণ কাঁধের ওপর এখনও ফোঁটা ফোঁটা নোনা জল দেখা যাচ্ছে। ছিন্ন সার্ট থেকে এখনও ঝরে পড়ছে সমুদ্রের লবণাক্ত জল।

মূল্যবান পাথরে গড়া প্যানদেবের মূর্তি।

কিন্তু মূর্তি নিখুঁত নয়। নাকের পাশ থেকে উপরের ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত একটা ক্ষতচিহ্ন। ডান পাশের পাথরের ঠোঁটটা একটু একটু উঠে গেছে, দেখা যাচ্ছে মুক্ত শুভ্রদন্তরুচি।

টিপ টিপ টিপ—লঘুপদসঞ্চারে কে যেন আসছে পেছনে। খস্ খস্ খস্—কানে আসছে বাতাসে আন্দোলিত ঢিলে লম্বা গাউনের শব্দ। নাকে আসছে যেন কোন ভিন্ন-লোকের অজানা সুরভি। হিস্ হিস্ হিস্—শোনা যাচ্ছে যেন সহস্র সর্পের হিংসাতুর ক্রুদ্ধ গর্জন।

না না, কৃষ্ণেন্দু পিছন ফিরবে না....ও তাকাবে না....ও জানে কি মহা সর্বনাশ এগিয়ে আসছে। কিন্তু একি অদম্য কৌতূহল! সে যে না তাকিয়ে পারছে না।

এবং দেখল....

ট্রেনের কামরায়

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

(এ কাহিনীতে উল্লিখিত কর্ণেল ইউয়ার্ট হলেন খুব সম্ভবত লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের পুরানো বন্ধু মিঃ এইচ, বি, ইউয়ার্ট-এর কাকা। বন্ধুর কাছ থেকে হ্যালিফ্যাক্স এ কাহিনী শুনেছিলেন, আর বন্ধু শুনেছিল তাঁর কাকার কাছ থেকে।)

কর্ণেল ইউয়ার্ট হলেন সামরিক বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। ট্রেনে করে তিনি যাচ্ছিলেন লণ্ডনে। সরকারী কাজে। এক্সপ্রেস ট্রেন। কাজেই সব স্টেশনে থামছিল না গাড়িখানা। ছোটখাট স্টেশনগুলোকে যেন কুর্ণিশ করবার কোন প্রয়োজন নেই।

কর্ণেল সাহেবের কামরায় আর কেউ নেই। তিনি একলা। ট্রেনের ঝাঁকুনি আর দুলুনিতে তার ঘুম ঘুম আসছিল। ঝিমুতে ঝিমুতে একসময় তিনি ঘুমিয়েই পড়লেন।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন বলা শক্ত। কিন্তু জেগে উঠে কর্ণেল দেখলেন যে তিনি আর একলা নন। আর একজন তাঁর কামরায় উঠেছেন। হ্যাঁ, তা তো উঠতেই পারে। কর্ণেল তাঁর সীটটা 'রিজার্ভ' করলেও গোটা কামরাখানা তো আর 'রিজার্ভ' করেন নি। কামরার দ্বিতীয় যাত্রী একজন মহিলা। তিনি কোণের একটা আসনে বসে আছেন। ইউয়ার্ট যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তখন কোন এক স্টেশন থেকে এই মহিলা গাড়িতে উঠেছিলেন। মহিলার পরনে কালো পোশাক, মুখে ক্রেপের অবগুণ্ঠন। নিশ্চয়ই নিঃশব্দে কামরায় ঢুকেছিলেন উনি। কাজেই ওঁর আগমনে কর্ণেলসাহেবের পাতলা ঘুমও ভাঙে নি। কর্নেলের গায়ে কোট বা পায়ে বুট ছিল না। একজন ভদ্রমহিলার সামনে এরকম অসম্পূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরে থাকবার জন্য তিনি লজ্জিত হলেন। ঠিক করলেন এজন্য তিনি ভদ্রমহিলার কাছে ক্ষমা চাইবেন, ওঁর দিকে তাকিয়ে কর্ণেল বললেন,

—'মাফ করবেন, আপনি কখন এসেছেন তা ঠিক বুঝতে পারিনি, আমার অসম্পূর্ণ পোশাকের জন্য আমি খুবই লজ্জিত।'

ভদ্রমহিলা কোন উত্তর দিলেন না, এমনকি ফিরেও তাকালেন না কর্ণেলের দিকে।

মহিলা বোধহয় কানে খাটো—একথা ভেবে কর্ণেল নিজের আসন ছেড়ে মহিলাটির বিপরীত দিকের আসনে বসলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু মহিলা কোন উচ্চবাক্য করলেন না। এমনকি তিনি যে

কর্ণেলের কথা শুনেছেন তার ভাবভঙ্গীতে এটাও প্রকাশ পেল না।

ভদ্রমহিলা তাহলে নিশ্চয়ই বদ্ধ কালা। কর্ণেলসাহেব আর কথা বাড়ালেন না। বাড়িয়ে লাভই বা কি। নিজের আসনে ফিরে এলেন তিনি।

ভদ্রমহিলার অদ্ভুত আচরণের কথা চিন্তা করতে লাগলেন তিনি। আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক উনি কর্ণেলের কথা শুনতে পাননি, কিন্তু একজন ভদ্রলোক যে সামনে এসে বসল তা-ও কি দেখতে পাননি উনি! তবে কি উনি শুধু কালা নন—অন্ধও! কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? একজন কালা আর অন্ধ মহিলা কি চলাফেরা করতে পারেন! তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরাই বা তাকে একলা ছাড়বেন কেন?

ভাবনা চিন্তা করেও এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন না কর্ণেল সাহেব।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লাগল। কামরাখানা কাৎ হয়ে পড়ল একপাশে। কলিশন.....অন্য ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে এই ট্রেনের। বগিগুলো বোধহয় লাইনচ্যুত হল।

সৌভাগ্যক্রমে কর্ণেল ইউয়ার্ট একটুও আহত হলেন না। এক লাফে তিনি কামরা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি সমর-বিভাগের মানুষ, তাঁর কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। অবস্থাটা দেখতে হবে। দেখতে হবে কারো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা। তিনি কাউকে সাহায্য করতে পারেন কিনা।

নাঃ, কলিশনটা খুব বড় রকমের নয়। কিছু লোক আহত হলেও মারা বোধহয় কেউই যায় নি। গার্ডসাহেব এবং ড্রাইভার শঙ্কিত যাত্রীদের আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করছেন। তারা ইতিমধ্যেই অবস্থাটা আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেলেছেন। অদূরে একটা সিগন্যাল-পোস্ট দেখা যাচ্ছে।, কাজেই বোঝা যাচ্ছে সামনেই একটা স্টেশন রয়েছে। সেখান থেকেও সাহায্য আসতে দেরী হবে না।

কর্ণেলের মনে পড়ল তাঁর কামরার মহিলার কথা। ট্রেন কলিশনের ফলে তাঁর চিন্তাটা অন্যদিকে চলে গিয়েছিল, মহিলার কথা মনেই ছিল না। এবার প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে যাবার পর সহযাত্রিণী মহিলার কথা মনে এল। দেখা যাক সে মহিলার কি হল! মহিলাটি ভয় বা আঘাত পেয়েছেন কিনা সেটা দেখা দরকার।

ফিরে এসে কর্ণেল দেখলেন কামরা খালি। সহযাত্রিণী নেমে গিয়েছেন। কোথায় গেলেন তিনি? গার্ডের কাছে গিয়ে কর্ণেল জিজ্ঞেস করলেন।

—'আমার কামরায় যে ভদ্রমহিলা ছিলেন তিনি কোথায় গেলেন?'

—'আপনার কামরায়? ভদ্রমহিলা?' অবাক হয়ে গার্ডসাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

—'হ্যাঁ, উনি বোধহয় কানে খাটো. উনি আঘাত পাননি তো?'

—'কিন্তু আপনার কামরায় তো আর কোন প্যাসেঞ্জার ছিল না। থাকবে কি করে দরজা তো বন্ধ করা ছিল।'

—'আমি তো খোলা দরজা দিয়েই নেমেছি।'

—'তাহলে এই প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা খুলে গিয়েছে।'

—'তবে ভদ্রমহিলা কি করে কামরায় ঢুকলেন?'

—'কোন্ ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা আপনার কামরায় ঢুকতেই পারে না।' গার্ডসাহেব দৃঢ়স্বরে বললেন।

—'কেন?'

—'শুনুন স্যার, এ ট্রেনখানা ছেড়েছে কার্লিসলি স্টেশন থেকে, পথে কোথাও ট্রেন থামেনি। তাছাড়া আপনার কামরা লক' করা ছিল; কাজেই কোন লোক উঠবে কি করে?'

—'কিন্তু আমি ঘুম ভেঙে যে ভদ্রমহিলাকে দেখলাম...'স্খলিত স্বরে কর্ণেল বললেন।

—'আপনার ঘুম ভাঙেনি, আপনি স্বপ্ন দেখেছেন। আপনার ঘুম ভেঙেছে কলিশনের শব্দে।' মৃদু হেসে গার্ড বললেন।

গার্ডের ব্যাখ্যায় কর্ণেলসাহেব কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁর মন বলতে লাগল তিনি যা দেখেছেন তা স্বপ্ন নয়, সত্যি।

রহস্যটা পরিষ্কার হল লণ্ডনে যাবার পর। কর্ণেল জানতে পারলেন যে ক'বছর আগে এক নববিবাহিত দম্পতি ঐ তারিখে ট্রেনের ঐ কামরায় লণ্ডনে যাচ্ছিল। স্বামী বাইরে কি একটা দেখবার জন্য জানালার বাইরে মাথা নিয়ে এসেছিল—বেচারা ঝুঁকে পড়েছিল একটু বেশীই। এক্সপ্রেস ট্রেন তখন দুরন্তগতিতে ছুটছে। হঠাৎ একটা তারে তার মাথাটা আটকে গেল। মাথাটা আর খুলতে পারল না ও। মুহূর্তের মধ্যে ওর মুণ্ডহীন দেহটা আছড়ে পড়ল কামরার মেঝেতে। পরের স্টেশন এলে দেখা গেল নববধূ তার স্বামীর দেহের পাশে বসে ঘুমপাড়ানী গান গাইছে। আচমকা এই দারুণ আঘাতে মেয়েটি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে গিয়ে মেয়েটির চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ওকে আর সুস্থ করা যায় নি। কিছুদিন উন্মাদ আশ্রমে রইল মেয়েটি। দিন দিন ও কেমন যেন শুকিয়ে যেতে লাগল। শেষপর্যন্ত বাঁচল না মেয়েটি। বছর না ঘুরতেই মারা গেল।

কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কর্ণেল ইউয়ার্ট। নীড় বাঁধবার অতৃপ্ত আকাঙ্খা নিয়ে যে তরুণী অকালে মরণের কোলে ঢলে পড়ল তারই বিদেহী আত্মা কি সেদিন দেহধারণ করে কর্ণেলের কামরায় এসেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

কে দিল নির্দেশ?

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

(পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে বুদ্ধি দিয়ে যার কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। এগুলোকে আমরা অলৌকিক ঘটনা বলে থাকি। এমনি অনেক অলৌকিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন লর্ড হ্যালিফ্যাক্স তাঁর 'ঘোস্ট বুক' গ্রন্থে। সেই গ্রন্থ থেকে একটি বিস্ময়কর কাহিনী এখানে পরিবেশন করা হল।)

আটলাণ্টিকের সুনীল জলরাশি কেটে এগিয়ে চলেছে একখানি জাহাজ। গন্তব্যস্থল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। কয়েকদিন ধরে মহাসাগরের বুকে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। হয়ত জাহাজ কিছুটা সরে এসেছে তার নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে ক্যাপ্টেন আর ফার্স্টমেট কাজ করছিলেন। অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ নিয়ে হিসেব কষে তারা বুঝবার চেষ্টা করছিলেন জাহাজ এখন মহাসাগরের বুকে কোন্ জায়গায় রয়েছে। কিন্তু কিছুতেই হিসেব মিলছে না। বিরক্ত হয়ে ক্যাপ্টেন একসময় কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন। হিসেব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ফার্স্টমেট সেটা লক্ষ্য করল না।

হঠাৎ হিসেবটা মিলে গেল। খুশীভরা গলায় ফার্স্টমেট বলল, হিসেব মিলে গেছে স্যার, আমরা আমাদর নির্দিষ্ট পথ থেকে বেশিদূর সরে আসি নি।'

কিন্তু ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অবাক হয়ে মেট তাকাল ক্যাপ্টনের আসনের দিকে, আর তাকিয়েই চমকে উঠল। ক্যাপ্টেন তো তাঁর আসনে নেই। তাঁর আসনে বসে আছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা লোক। লোকটা তো এ জাহাজের নাবিক বা যাত্রী কোনটাই নয়! সে ক্যাপ্টেনের নির্দেশ দেবার 'শ্লেট'-এর উপর কি যেন লিখছে!

'কে? কে আপনি? এখানে কি করে এলেন?' ফার্স্টমেট জিজ্ঞেস করল। তার স্বরে একই সঙ্গে শঙ্কা আর বিস্ময়!

অপরিচিত লোকটি কোন উত্তর দিল না, আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেনের আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। শূন্যদৃষ্টিতে ও সামনের দিকে তাকাল। মনে হল না ও মেটকে দেখছে বা মেটের কথা শুনছে। মেটের অস্তিত্ব সম্পর্কেই যেন ও সচেতন নয়। আবিষ্ট মানুষের মতো কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা—গেল ডেকের দিকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে বেরিয়ে এল মেট। কিন্তু অপরিচিত লোকটাকে আর

দেখা গেল না।

এ কি তাজ্জব ব্যাপার! ব্যাপারটার মাথামুণ্ড তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাপ্টেনকে এক্ষুণি সব কথা জানাতে হয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেব কোথায়? একজন খালাসীর কাছ থেকে জানা গেল তিনি ইঞ্জিন-ঘর পরিষ্কার করতে গিয়েছেন। ছুটতে ছুটতে ক্যাপ্টেনের কাছে চলে এল ফার্স্টমেট।

ওর ভাবভঙ্গী দেখে ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে গেলেন। ব্যস্তভাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

'ব্যাপার কি? এরকম ছুটতে ছুটতে আসছ কেন?' দম নিয়ে মেট উত্তেজিতভাবে বলল, 'স্যার, আপনার কেবিনের ও লোকটা কে?'

—'আমার কেবিনে? লোক? হয়ত কোন খালাসী-টালাসী গিয়ে থাকবে।'

—'না স্যার, লোকটা এ জাহাজের কোন যাত্রী বা নাবিক নয়। ও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।'

—'পাগলের মতো কি সব বকছ?' বিরক্ত হয়ে ক্যাপ্টেন বললেন। 'আমরা এখন আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছি। এই মাঝ-সমুদ্রে কি করে বাইরের লোক জাহাজে আসবে?'

—'আমারও তো স্যার ঐ একই প্রশ্ন।' বিমূঢ়ভাবে মেট বলল।

—'তুমি বোধহয় কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আর সেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছ।' মুচকি হেসে ক্যাপ্টেনসাহেব বললেন।

—'না স্যার, কাজের সময় আমি কখনও ঘুমোই না'। আহত স্বরে ফার্স্টমেট বলল।

—কাজে ফাঁকি দেওয়াকে এই তরুণ মেটটি অপরাধ বলেই মনে করত। আচমকা কথাটা বলে ফেলে ক্যাপ্টেন নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

—'আমি নিজের চোখে দেখলাম লোকটা আপনার শ্লেটের উপর কি যেন লিখছে...' ক্ষুন্ন কণ্ঠে ফার্স্টমেট বলল।

—'ঠিক আছে, চল দেখে আসি ব্যাপারটা কি!' ক্যাপ্টেন বললেন।

দু'জনে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে এগোলেন।

কেবিনে এসে দেখা গেল সত্যিই শ্লেটের উপর গোটা গোটা হরফে লেখা রয়েছে 'উত্তর-পূর্ব দিকে জাহাজ চালান।'

—'কে লিখল এ কথা? ক্যাপ্টেন ছাড়া তো এ শ্লেটের উপর আর কারো নির্দেশ দেবার অধিকার নেই। কিন্তু লেখা যখন রয়েছে, তখন নিশ্চয়ই তা কেউ লিখেছে। লিখেছে রসিকতা করবার জন্য, এরকম বদ রসিকতা যে করেছে তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

ফার্স্টমেটের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে ক্যাপ্টেন বললেন, তোমার হাতের লেখা আমি চিনি। এ তোমার হাতের অক্ষর নয়, তবু তুমি একবার কথাগুলো

লেখ দেখি। আমি জাহাজের সবাইকার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে চাই।'

মেট লিখল কথাগুলো । হাতের লেখা মিলল না।

—'যাক্, আমি নিসন্দেহ হলাম। এবার আমি এক এক করে জাহাজের প্রত্যেকের হাতের লেখা মিলিয়ে দেখব।'

ক্যাপ্টেন নাবিক এবং যাত্রী প্রত্যেককে ডেকে ঐ কথাগুলো লেখালেন। কিন্তু না, কারো হাতের লেখার সঙ্গে শ্লেটের উপরকার লেখা মিলল না।

জাহাজখানা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু না, বাইরের কোন লোক জাহাজে নেই। মাঝ-সমুদ্রে সকলের অজ্ঞাতসারে কোন লোক জাহাজে আসবেই বা কি করে!

এবারে ক্যাপ্টেন নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। একি রহস্যময় ব্যাপার! কে লিখল? কে এল জাহাজে?

মেট বলল, 'আপনি তো স্যার কেবল লেখাটাই দেখলেন, আমি তো যে লিখেছে তাকেও দেখেছি। এবার তো বুঝতে পারছেন স্যার, আমি কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়িনি—স্বপ্ন দেখিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ক্যাপ্টেন তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, শ্লেটের নির্দেশমতো উত্তর-পূর্ব দিকেই জাহাজ চালাও।'

।। দুই।।

খুব বেশী দূরে যেতে হল না, দিনের শেষে আর একখানা জাহাজের দেখা মিলল। হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দ্বিতীয় জাহাজখানার অবস্থা তখন শোচনীয়। খোল ফুটো হয়ে জল ঢুকছে, আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে জাহাজখানা। নীচের ডেকে জল। যাত্রী এবং নাবিকেরা আশ্রয় নিয়েছে জাহাজের দোতলায়। এখনই ডুবন্ত জাহাজের বিপন্ন যাত্রীদের উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করা দরকার।

ক্যাপ্টেনের আদেশে উদ্ধারকারী জাহাজ থেকে তক্ষুনি, 'লাইফ বোট' নামিয়ে দেওয়া হল। বিপন্ন যাত্রীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল প্রথম জাহাজে। তা হলে সত্যিই উত্তর-পূর্ব দিকে জাহাজ চালান দরকার ছিল। না হলে এ-সব যাত্রীর নিশ্চয়ই সলিল-সমাধি হত। কিন্তু...কিন্তু ক্যাপ্টেনের শ্লেটে সেই রহস্যময় নির্দেশ দিল কে?

ডুবন্ত জাহাজের অনেকে অনাহারে আর দারুণ ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাদের ভাল করে খাইয়ে-দাইয়ে আর সেবা-শুশ্রূষা করে বিশ্রাম করতে পাঠান হল। তারা শতমুখে ক্যাপ্টেনের জয়জয়কার করতে লাগল।

শেষ লোকটিকে দেখে ফার্স্টমেট চমকে গেল। সে-ও যেন চমকে উঠল ব্রুসকে দেখে। দারুণ উত্তেজনায় ক্যাপ্টেনের পদ-মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে তাঁর কোটের আস্তিন চেপে ধরল মেট; উত্তেজিত গলায় বলল,

—'স্যার, এই সেই লোকটা! একেই আমি আপনার কেবিনে শ্লেটের উপর লিখতে দেখেছিলাম।'

শুনে ক্যাপ্টেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।' তারপর লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি একবার আমার কেবিনে আসুন।'

ক্যাপ্টেন, ফার্স্টমেট এবং লোকটি ক্যাপ্টেনের কেবিনে এলেন। উপরওয়ালার নির্দেশে মেট কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিল।

লোকটির দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'দয়া করে আপনি 'উত্তরপূর্ব দিকে জাহাজ চালান'—এ কথা কটি লিখুন দেখি।'

লোকটি অবাক হল ঠিকই, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য না করে একখণ্ড কাগজের উপর লিখল—উত্তর-পূর্ব দিকে জাহাজ চালান।'

শ্লেটের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন, দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। দুটোই একই হাতের লেখা। দুটো লেখারই অক্ষরের ছাঁচ হুবহু একই রকম।

বিস্মিত ক্যাপ্টেন নিস্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ব্রুসের দিকে তারপর লোকটির দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বললেন, 'আচ্ছা আজ সকালে আপনি কোথায় ছিলেন? কি করছিলেন?'

—'স্যার, কাল শেষ রাতে হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজ মারাত্মকভাবে জখম হল। খোল ফুটে হয়ে হু হু করে জল ঢুকতে লাগল জাহাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচের ডেকটা চলে গেল জলের তলায়। সামনে সলিল-সমাধি, যাত্রীরা প্রাণভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কিন্তু আমার মনে একটা অদ্ভুত ধারণা বাসা বাঁধল। মনে হল, শেষ মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যাবে—আমরা প্রাণে বেঁচে যাব। আজ সকালে আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে পড়েছিলাম। আচ্ছন্ন অবস্থায় আমার মনে হয়েছিল আমি যেন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি। ঘোর ভাঙতে অন্য যাত্রীদের আমি বললাম সেকথা—বললাম 'আমরা নিশ্চয়ই বেঁচে যাব। সাহায্য আসছে।'

কেবিনের এদিক ওদিক তাকাতে লাগল লোকটি। ক্যাপ্টেনের আসনের দিকে নজর পড়তে ও কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল তারপর বাধো বাধো গলায় বলতে লাগল, 'স্যার, মনে হচ্ছে এ ঘরে যেন আমি আরও একবার এসেছি, ঐ আসনে বসেছি...'

চমকে উঠে ক্যাপ্টেন আর ফার্স্টমেট একে অন্যের দিকে তাকালেন। ফার্স্ট মেটের দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল, '....আর মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোককেও যেন আমি এই কেবিনে বসে কাজ করতে দেখেছি.....না স্যার, আমার কোন ভুল হয়নি এঘরে ওঁকেই আমি দেখেছি.....'।

টেলিফোন
লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

।। প্রাক কথন।।

(এই কাহিনীতে একজন যাজকের রহস্যময় অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। কাহিনীর সঙ্গে যাজকমশাই লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে একখান চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'এ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। মিসেস পি-র রোগশয্যার কাছে উপস্থিত হবার জন্য আমার কাছে এক রহস্যময় আহ্বান এসেছিল ফোন মারফৎ। এর কোন সমাধান দেবার চেষ্টা আমি করছি না। কালকে আর্চ বিশপের বাড়ীতে যাবার পথে আপনার সঙ্গে দেখা করব। ধরুন, এই আড়াইটে নাগাদ। আশাকরি সে সময় আপনাকে বাড়ীতেই পাব।'

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ, সোমবার, যাজকমশাই-এর সঙ্গে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সাক্ষাৎ হল। তাঁর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জানলেন হ্যালিফ্যাক্স। যাজকমশাই-এর লেখা এবং তাঁর কাছ থেকে শোনা তথ্যের উপর ভিত্তি করে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স কাহিনীটি সাজিয়ে ফেললেন তাঁর 'ঘোস্ট-বুক'-এর জন্য। লেখাটি প্রকাশের জন্য তৈরী হল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিলে। ছাপতে যাবার আগে যাজকমশাই লেখাটি পড়লেন। লেখার তলায় মন্তব্য করলেন, 'উপরের কাহিনীটি নির্ভুলভাবে এবং সঠিকভাবে সত্যকে বজায় রেখে বলা হয়েছে।' এরপর যাজকমশাই নিজের নাম স্বাক্ষর করলেন। মুখবন্ধ শেষ হল। এবার মূল কাহিনীতে আসা যাক।)

।। কাহিনী।।

অল্প কিছুদিন আগে এক বিকেলে আমাকে এক ভদ্রমহিলার (মিসেস পি—) বাড়ীতে যেতে বলা হল। আমাদের উপাসনালয়ের প্রধান যাজকই আমাকে যেতে বললেন। ভদ্রমহিলা খুব অসুস্থ। তাঁর বাড়ি মন্টপেলিয়ার স্কোয়ারে। আমি বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলাম একজন ডাক্তার বেরিয়ে আসছেন বাড়ি থেকে। ডাক্তারও আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। একটু ইতস্তত করে বললেন,

—'এক্ষুনি শেষকৃত্যটা করবেন না ফাদার। রোগিনীকে বরং কিছু উৎসাহের কথা—কিছু আশার কথা শোনান। বলুন, উনি যেন সেরে উঠবার জন্য চেষ্টা

করেন। উনি যেন এই মুহূর্তেই জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে না পড়েন।'

—'কেন?'

—'আমার ধারণা এখনও ওঁর শেষ মুহূর্ত আসে নি। আমরা অর্থাৎ ডাক্তাররা শেষপর্যন্ত চেষ্টা করে দেখতে চাই। আমাদের কাছে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

—ডাক্তারের প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম। বললাম, ঠিক আছে, আমি এখন পাপের স্বীকৃতি গ্রহণ বা শেষ প্রার্থনা-এর কোনটাই করব না।'

—কিন্তু রোগিণীকে দেখবার পর মনে হল ডাক্তারকে এরকম কথা না দিলেই বোধহয় ভাল করতাম। ডাক্তারসাহেব যে কেন এমন একটা অনুরোধ করলেন তা বুঝতে পারলাম না। রোগিণীর অন্তিম সময়ের খুব দেরী আছে বলে তো আমার মনে হল না। এখন না করলে শেষকৃত্য আর কখন করা হবে? কিন্তু কথা যখন দিয়েছি তখন সেটা তো রাখতেই হবে। ঠিক করলাম কাল সকালে এসে শেষ ধর্মীয়-অনুষ্ঠানগুলো সেরে ফেলব।

—ডাক্তারের কথামত রোগিণীকে উৎসাহ দিলাম। মিসেস পি—তাতে খুশীই হলেন। বয়স তো তেমন বেশী কিছু হয়নি। বাঁচবার আকাঙ্খা এখনও ওর মনে তীব্রভাবেই রয়েছে। চলে আসবার সময় নার্সের কাছে আমাদের টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে এলাম। বললাম রোগিণী মিসেস পি-র অবস্থা যদি হঠাৎ খুব খারাপের দিকে যায় তাহলে আমাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে ফোন করা হয়।

—সেই রাতে একজন যাজকের ঘরে যথারীতি টেলিফোনের সুইচ অন করে রাখা হল। কেননা রাতেও কোন অসুস্থ মানুষের বাড়ি থেকে ডাক আসতে পারে। আমি যথাসময়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম।

—খুব ভোরে—হ্যাঁ, তখনও শেষ রাত কেটে যায়নি—গভীর ঘুম থেকে আমি হঠাৎ জেগে উঠলাম। আমার শোবার ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে যাবার জন্যই বোধহয় আমার ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানলা পথে অস্ত-চন্দ্রের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম আমার ঘরের দোরগোড়ায় একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হল লোকটি যেন বলল, 'একটা ফোন এসেছে। একজন মুমূর্ষুর বাড়ী থেকে ফোন।'

লোকটির গলার স্বর কেমন যেন অস্পষ্ট—কেমন যেন জড়ানো জড়ানো! ততক্ষণে আমার চোখ থেকে ঘুমের ভাব কেটে গিয়েছে। আমি বিছানায় উঠে বসে একটু রাগতভাবে রূঢ়স্বরে বললাম, 'একটু পরিষ্কার করে কথা বলুন, আপনার কথা ঠিক শুনতে বা বুঝতে পারছি না।'

কথাটা বলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রকলার ম্লান আলো

এসে পড়েছিল ছায়ামূর্তির কাঁধ আর গলার উপর। সেই আলোয় দেখলাম আগন্তুকের পোশাকের সাদা কলার। কি লজ্জা এ যে আমাদের উপাসনালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান যাজকের কলার। এত রাতে বৃদ্ধ যাজক নিজেই আমাকে জাগাতে এসেছেন। আর আমি কিনা রূঢ়ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম।

বৃদ্ধ এবার পরিষ্কার গলায় বললেন, 'এক মুহূর্ত নষ্ট করবার মতো সময় নেই। টেলিফোন মারফৎ একটা খবর এসেছে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।'

'টেলিফোন' শব্দটা শুনেই আমার গত বিকেলের কথাটা মনে পড়ল। সুতরাং কোথা থেকে ফোন এসেছে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম না। এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। বৃদ্ধ ততক্ষণে আমার দোড়গোড়া থেকে চলে গিয়েছেন।

দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। আলো জ্বেলে দেখলাম পৌনে চারটে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে আশ্রমের উপাসনালয়ে গেলাম! যাবার পথটা অন্ধকার। বৃদ্ধ যাজক আলো জ্বালতে ভুলে গিয়েছেন। উপাসনালয় থেকে বাইবেল এবং পবিত্র 'ক্রুশ' নিয়ে ফটকের দিকে এগোলাম। ফটক বন্ধ। দারোয়ানকে ডেকে খোলালাম। রাস্তায় বেরিয়ে চললাম আমার গন্তব্যস্থল মিসেস পি-র বাড়ীর দিকে।

বাড়ীর সামনে এসে দেখলাম জানালায় জানালায় আলো। বাড়ীর লোকজন ঘুমোয়নি, রোগিণীর অবস্থা তাহলে সত্যিই খারাপ। 'কলিং-বেল' টিপে হাত-ঘড়ির দিকে তাকালাম। চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। আবার বেল টিপলাম। কোন সাড়া নেই। আমি বার বার 'কলিং বেল' টিপতে লাগলাম। কাছাকাছি কোন ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজল। আবার বেল টিপলাম। অবাক কাণ্ড! যারা আমাকে আসবার জন্য ফোন করল তারা কেউ আমাকে দরজা খুলে দিতে আসছে না! বেল যে খারাপ তা-ও তো মনে হচ্ছে না। কাল তো এই বেল টিপতেই সাড়া মিলেছিল, তবে আজ কেউ দরজা খুলতে আসছে না কেন? তবে কি মিসেস পি—আর বেঁচে নেই। গতকাল বিকেলবেলার কথা মনে করে অনুশোচনায় মনটা ভরে গেল। কেন ডাক্তারের কথা শুনতে গেলাম? শেষকৃত্যটা তো কালকে করে ফেললেই হত।

এবার সজোরে ধাক্কা দিলাম দরজায়। এতো জোরে ধাক্কা মারলাম যে বাড়ীর সবাই যদি ঘুমিয়েও থাকে তবে এ শব্দে তারা জেগে উঠতে বাধ্য। কিন্তু বাড়ীর সবাই যে ঘুমিয়ে আছে তা-ও তো মনে হচ্ছে না। বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছি হলঘরে আলো জ্বলছে—সিঁড়ির মাথায় আলো, জানলা দিয়ে আলো আসছে। এরকম আলোয় আলোময় করে কেউ ঘুমোয় না। মনে পড়ল বাড়ীতে লোক আছে মোটে ছ'জন। মিসেস পি—অসুস্থ। তিনি আছেন এক ঘরে। তাঁর স্বামীও

খুব অসুস্থ। তিনি আছেন আর একখানা ঘরে। এছাড়া আছে তাদের নার্সরা। দু'জন নার্স দিনে আর দু'জন রাতে রোগী-রোগিণীর কাছে থাকে। ওরা হল চারজন। দিনের ন্যার্স দু'জন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছে। রাতের নার্সরা নিশ্চয়ই নিজের নিজের পেশেন্টের কাছে রয়েছে। কাজেই দরজা খুলবে কে?

রাস্তার ওপাশে একটা মোটাসোটা মিশকালো বিড়াল থেকে থেকে ডেকে উঠছে—

ম্যাও, ম্যা.....ও

কি রকম ভয়ঙ্করভাবে ডাকছে! গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

অপেক্ষা করতে লাগলাম। মৃত্যুপথযাত্রিণীকে—কি জানি মৃত্যুই কিনা—না দেখে আশ্রমে ফিরে যাওয়া এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। অধৈর্য হয়ে ফিরে গেলে যাজক হিসেবে আমার কর্তব্য করা হবে না।

না না, কোন খোঁজ-খবর না নিয়ে ফিরে যাওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না। কিন্তু শেষ রাতে আমাকে ডেকে এনে বাড়ীর বাইরে এই ভোরবেলায় দাঁড় করিয়ে রাখবার অর্থ কি? এটা কোন্ ধরনের রসিকতা!

আবার সজোরে বেল টিপলাম। বাড়ীর মধ্যে বেলের শব্দও শুনতে পেলাম। বাড়ীখানার নিস্তব্ধতা যেন খানখান হয়ে গেল ক্রিং ক্রিং শব্দে। হাতঘড়ির দিকে তাকালাম চারটে বেজে বারো মিনিট হয়েছে। এখনও কেউ দরজা খুলল না।

ঠিক করলাম আলোকিত জানলা লক্ষ্য করে একখণ্ড পাথর ছুঁড়ব। একখণ্ড পাথর কুড়িয়েও নিলাম। ছুঁড়তে যাচ্ছিলাম কিন্তু সেই মুহূর্তেই রাস্তার ওপাশের বিড়ালটা 'ম্যা.....ও' করে ভয়ঙ্কর চীৎকার করে উঠল। হাতের পাথরখানা ছুঁড়লাম বিড়ালটার দিকে।

সেই মুহূর্তে সওয়া চারটে বাজল। গভীর স্বস্তির সঙ্গে দেখলাম সদর দরজা খুলে গেল।

কোন প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করলাম না, সোজা চলে গেলাম বাড়ীর মধ্যে। ঢুকলাম মিসেস পি-র ঘরে, রোগিণীর বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে নার্স বাইবেল থেকে স্তোত্রপাঠ করছে। আমি ঘরে ঢুকতেই সে চমকে গেল। শুনলাম মিসেস পি—দুর্বল কণ্ঠে বলছেন, ' আমি চাইছি আমার শেষ সময়ে ফাদার সি—আসুন। তিনিই আমার স্বীকৃতি নিন—আমার শেষকৃত্য করান।...:

মুমূর্ষু মিসেস পি—আমার নামই করেছেন।

শুনলাম আমি এঘরে আসবার আধঘণ্টা আগে থেকে মিসেস পি—কেবলই আমার নাম করছেন। শেষপর্যন্ত উনি নার্সকে বলেছেন অন্তিম প্রার্থনা পাঠ

করবার জন্য।

—'অনুগ্রহ করে আপনি একটু বাইরে গেলে ভাল হয়। আমি এবার মিসেস পি-র স্বীকৃতি(খ্রীষ্টানেরা মনে করেন যে মৃত্যুর আগে কোন যাজকের কাছে অকপটে পাপ স্বীকার করলে সেই পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় একে বলে 'কনফেশন'।) নেব,' নার্সকে লক্ষ্য করে কথাটা আমি বললাম।

নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে গেল নার্স।

ঘরের মধ্যে এবার আমি আর মিসেস পি—।

দুর্বল কণ্ঠে মিসেস পি—তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি বলতে লাগলেন।

মিসেস পি-র স্বীকৃতি শুনলাম। শেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানও করা হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দু'য়েক পরে রোগিণী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি 'মৃতের জন্য প্রার্থনা' পাঠ করতে লাগলাম। মিসেস পি-র অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন। প্রার্থনা শেষ হল। আপাততঃ আমার আর কিছুই করবার নেই। আশ্রমে ফিরে যাবার জন্য তৈরী হলাম। স্বীকৃতি এবং শেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পরই নার্স মেয়েটি রোগিণীর ঘরে এসেছিল। মেয়েটি আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

শেষে বলল, 'অবশ্য হঠাৎ ঘরে ঢুকে আপনি আমাকে চমকে দিয়েছিলেন। তবু আপনি শেষ রাতে কষ্ট করে এখানে এসেছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

—'আমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই, মুমূর্ষুর শেষ সময়ে তার কাছে আসা তো আমাদের কর্তব্য। বরং ধন্যবাদ তোমার প্রাপ্য।'

—'আমার প্রাপ্য? কেন?' মেয়েটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

—'কারণ তুমি আমাকে টেলিফোন করেছিলে।'

—'কিন্তু আমি তো আপনাকে ফোন করিনি, ফাদার!' একটু বিমূঢ়ভাবেই মেয়েটি বলল।

—'তা হলে আর কেউ করেছিল। শুনলাম মিসেস পি-র বোন এসেছিল, হয়ত তিনিই ফোন করেছেন।'

মিসেস পি-র বাড়ী থেকে বিদায় নিলাম।

আশ্রমে ফিরে এসে মনে হল অধ্যক্ষ ফাদারের কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। বৃদ্ধ আমার ঘুম ভাঙাতে এলেন, অথচ আমি তাঁর সঙ্গে রূঢ়ভাবে কথা বললাম। প্রথমেই ফাদারের ঘরে ঢুকলাম। তিনি বাইবেল পড়ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকতে তিনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন আমার দিকে। একটু লজ্জিতভাবে বললাম,

'গত রাতে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্য আমি খুব দুঃখিত। আমি ক্ষমা চাইছি ফাদার।'

—'কি বলছ? তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না!' ফাদার বললেন।

—'কাল শেষ রাতে আপনি যখন আমাকে ডাকতে গিয়েছিলেন তখন আমি আপনার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করিনি।'

—'তুমি ভুল করছ। কাল রাতে আমি তো তোমাকে ডাকতে যাইনি।' অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী বললেন।

—'আপনি গিয়েছিলেন। পৌনে চারটের একটু আগে আপনি আমার দরজায় এসেছিলেন।'

—'কি বলছ তুমি?' বিস্মিত কণ্ঠে ফাদার প্রশ্ন করলেন।

—'আপনি বললেন, একটা ফোন এসেছে, একজন মুমূর্ষুর বাড়ী থেকে ফোন।'

—'আমি বললাম?' ফাদারের কণ্ঠে অকৃত্রিম বিস্ময়।

—হ্যাঁ, আপনি আরও বললেন, এক মুহূর্ত নষ্ট করবার মতো সময় নেই। টেলিফোন মারফৎ একটা খবর এসেছে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।'

—'দেখ হে, তুমি বোধহয় স্বপ্ন দেখেছ। গত রাতে আমি ঘর ছেড়ে একবারের জন্যও বাইরে যাই নি। অবশ্য কাল রাতে আমি মোটেই ঘুমোতে পারি নি। তুমি যে সময়ের কথা বলছ তখন আমি জেগেই ছিলাম, আমার ঘরে আলো জ্বলছিল। আর তাছাড়া কাল রাতে তো আশ্রমে কোন ফোন আসে নি। এলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। আমার ঘরেই তো ফোন রয়েছে আর আমি তো জেগেই ছিলাম।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নার্স ফোন করে নি.....ফাদার আমাকে ডাকতে যান নি.....ফোন আসে নি....এসব কি ব্যাপার! এ কি রহস্য!

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ফোন তুললাম, এক্ষুনি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করতে হবে। কাঁপা আঙুলে ডায়াল করলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে ওপাশ থেকে খবর এল, 'না কাল রাতে আশ্রমে কেউ ফোন করে নি।'

তা হলে?

অনুবিস

রবার্ট ব্লচ

অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে আছে অনুবিসের পাথুরে মূর্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার অন্ধ চোখ দুটি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে নীরন্ধ্র অন্ধকারের ঘন কালিমার দিকে। পাথুরে ভ্রূ-র উপর জমে রয়েছে বহুযুগের ধূলিকণা। গহ্বরের ভিজে বাতাসে তার দেহের শ্বাপদ বৈশিষ্ট্যগুলি কোথাও কোথাও ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু মূর্তির পাথুরে ঠোঁট দুটি এখনও বেঁকে রয়েছে এক দুর্বোধ্য, রহস্যময় নিগূঢ় আনন্দের দস্তুর হাসিতে।

মনে হয় মূর্তিটি যেন জীবন্ত। বহু অতিক্রান্ত ছায়াময় শতাব্দীর নীরব সাক্ষী এই মূর্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে আর তার সঙ্গে অন্তর্ধান করেছে প্রাচীন মিশরের গৌরব—অন্তর্ধান করেছে প্রাচীন মিশরের পুরাতন দেবমণ্ডলী।

অনুবিসের হাসবার কারণও হয়ত রয়েছে। অতীত দিনের জাঁকজমক এবং ব্যর্থ ও অন্তর্হিত গৌরব আর বিনষ্ট দীপ্তির কথা চিন্তা করেই বুঝি তার পাথুরে ঠোঁটে বঙ্কিম হাসির রেখা। কিন্তু পথ-প্রদর্শক অনুবিস—কর্ণেটারের শিবা-মুখ দেবতা অনুবিস জীবিত নন। তাঁর উপাসকেরা—যারা তাঁকে প্রণতি জানিয়ে মাথা নত করত তারাও দীর্ঘকাল আগে মৃতের জগতে প্রস্থান করেছে।

এখানে মৃত্যুর হাওয়া। মৃত্যু এখানে সর্বত্র। পাতালের ছায়াময় সুড়ঙ্গ পথে হানা দিচ্ছে। এই অন্ধকার পথেরই একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুপুরীর প্রহরী শিবামুখ দেবতা অনুবিসের বিশাল প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি! মৃত্যু লুকিয়ে রয়েছে শবাধারগুলির মধ্যে। পাথুরে মেঝের ধুলোর মধ্যেও অপেক্ষা করছে মৃত্যু। দিন গুনছে সঠিক মুহূর্তটি আসবার—পরম ক্ষণটির জন্য।

মৃত্যু আর অন্ধকার! সুদীর্ঘ তিন হাজার বছর ধরে আলোকের পরশ এই অন্ধকারকে দূর করতে পারে নি। অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে—কেবলই ঘনীভূত হয়েছে। মৃত্যুপুরীর প্রহরী দেবতা অনুবিস যুগের পর যুগ ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন পাতালপুরীর এই নিরন্ধ্র অন্ধকারের রাজ্যে।

আজ কিন্তু আলো এসেছে। আলোর আবির্ভাবের আগে শোনা গিয়েছে একটা ঝনঝন শব্দ। শব্দটা কর্কশ। মৃত্যুপুরীতে এ কিসের শব্দ। নিথর নিস্তব্ধ মরণলোকে

কি জীবনলোকের পদসঞ্চার ঘটল? পাতাল-পথের সুদূর প্রান্তে ভারী লোহার দরজাটা জং-ধরা কব্জার উপর ঘুরে ঘুরে খুলে যাচ্ছে। সুদীর্ঘ তিরিশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পর এই প্রথম খুলছে। খোলা পথে আসছে এক অদ্ভুত আলোর দীপ্তি। বিংশ শতাব্দীর বিজলী মশালের সুতীব্র আলোকরশ্মি পাতালের অন্ধ তমিস্রাকে যেন ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। হঠাৎ শুনতে পাওয়া গেল মানুষের কণ্ঠস্বর।

ঘটনার মধ্যে এমনই একটা ভীতিকর ব্যাপার রয়েছে যে ভাষায় বর্ণনা করে তা ঠিক বোঝানো যায় না। অবর্ণনীয়....অবিশ্বাস্য এই ঘটনা। তিন হাজার বছর পরে কবরের অন্ধকারের শান্তি ভঙ্গ করতে কে এল? কারা এল?

বিগত তিন হাজার বছর ধরে এই ভূগর্ভপথে বা ভূগর্ভ প্রকোষ্ঠ-গুলিতে কোন প্রদীপ জ্বলেনি। তিন হাজার বছর ধরে মেঝের কার্পেটের ধুলোর উপর পড়েনি মানুষের পদচিহ্ন। তিন হাজার বছর ধরে এখানকার প্রাচীন বাতাসে শোনা যায়নি কোন মানুষের কণ্ঠস্বর।

এখানে শেষবারের মতো আলো এসেছিল 'বাসট্' দেবতার পুরোহিতদের হাতের পবিত্র মশাল থেকে। শেষবারের মতো ধুলোর কার্পেটে পদচিহ্ন অঙ্কন করেছিল যে পা-গুলো, তা ছিল প্রাচীন মিশরীয় পাদুকায় ঢাকা। শেষ কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল প্রার্থনার মধ্যে! প্রার্থনার ভাষা ছিল উচ্চ নীল উপত্যকার ভাষা।

আর এখন? এখন বিংশ শতাব্দীর বিজলী মশালের আলো ভূগর্ভের এই অন্ধকারপুরীকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে মেঝের উপর ভারী বুট-পরা পায়ের গম্ভীর শব্দ। একজন ইংরেজের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। স্বর উত্তেজনায় ভরা। সেখানে রয়েছে যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞার ভাব। পবিত্র বস্তুর প্রতি যেন কোন শ্রদ্ধার ভাবই নেই সেই কণ্ঠস্বরে।

বিজলী মশালের আলোয় এবার মশালবাহীকেই দেখা গেল। লোকটি লম্বা, রোগা, প্যাপিরাস পার্চমেন্টের ভাঁজের মতো ওর মুখেও অসংখ্য বলিরেখা। লোকটির বাঁ হাতে প্যাপিরাস পার্চমেন্ট। হাতখানা কাঁপছে, হয়তো স্নায়বিক দুর্বলতার জন্যই। ওর মাথার চুল সাদা, চোখ দুটি কোটরাগত, গায়ের চামড়া হলদে। সব মিলিয়ে বেশ বোঝা যায় যে লোকটি বুড়ো হয়েছে। কিন্তু ওর পাতলা ঠোঁটের হাসিতে রয়েছে যৌবনের জয়দীপ্তি।

ওর পিছনে এল আর একটি লোক। চেহারার আদল তার প্রথম লোকটির মতই। তবে তার বয়স অনেক কম। দেখলেই বোঝা যায় একই বংশের সন্তান ওরা—একই রক্ত বইছে দু'জনের শরীরে। দ্বিতীয় লোকটি একটা শপথ উচ্চারণ করে বলল,

—'ঈশ্বরের দোহাই, বাবা, শেষপর্যন্ত আমরা সত্যিই আসতে পারলাম!'

—'হ্যাঁ, আমরা সত্যিই এসে গিয়েছি।'

—'দেখো! ঐ যে স্ট্যাচুটা রয়েছে, ঠিক যেমন করে ম্যাপে দেখানো রয়েছে!'

—'হ্যাঁ, ম্যাপের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।' কাঁপা গলায় বললেন।

ধুলো ঢাকা লঘু পদক্ষেপে মানুষ দুটি এগোল। থামল এসে অনুবিসের বিশাল প্রস্তর মূর্তির একেবারে সামনে। আলোকবাহী স্যার রোনাল্ড বার্টন শিবামুখ দেবতাকে আরো ভাল করে—আরো খুঁটিয়ে দেখবার জন্য আলোটা উঁচু করে ধরলেন। ছেলে পিটার বার্টন দাঁড়িয়ে রইল বাবার পাশে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করল তার বাবার দৃষ্টিকে।

অনেকক্ষণ ধরে দুই কবর অভিযানকারী সমাধিক্ষেত্রের অভিভাবক দেবতা অনুবিসের বিপুল প্রস্তর মূর্তিটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এই মৃতের জগতে জীবিত মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সমাধিভূমিতে প্রবেশ করে সেই প্রাচীন বিধানকে লঙ্ঘন করল পিতা ও পুত্র—স্যার রোনাল্ড বার্টন এবং পিটার বার্টন।

এ এক অদ্ভুত মুহূর্ত। এখানে এই ভূগর্ভের গহ্বরে সুদূর অতীত মুখোমুখি হয়েছে বর্তমানের। এই মুহূর্তে শাশ্বত যেন থেমে গিয়েছে। যোগসূত্র রচিত হয়েছে কুয়াশা ঘেরা সুদূর অতীতের সঙ্গে আলোকজ্জ্বল বর্তমানের। মানুষ যেন বুঝতে পারছে কালস্রোতের স্বরূপ এবং পরিমাপ।

বিস্ময় এবং আতঙ্কের দৃষ্টি নিয়ে মানুষ দুটি তাকাল দেবতার মূর্তির দিকে। শৃগালমুখ দেবতার বিপুল বিশাল মূর্তি ভূগর্ভের এই আলোক-বিহীন নিষ্প্রভ পথকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এখানে শিবামুখ দেবতারই নিরঙ্কুশ একাধিপত্য। জলে হাওয়ায় ক্ষয়ে যাওয়ায় দেবতার বিশাল পাথুরে দেহে যেন এখনও অতীত জাঁকজমক এবং ব্যাখ্যার অতীত-আতঙ্ক আর বিভীষিকার অবশেষটুকু রয়ে গিয়েছে।

খোলা জানালা পথে ছুটে এসেছে বাইরের বাতাস। দীর্ঘকাল পরে। সেই হাওয়ায় পাথুরে মূর্তির দেহে যুগ যুগ ধরে জমে ওঠা ধুলো উড়ে গিয়েছে। মূর্তিটা এখন ঝক্ ঝক্ করছে। সেদিকে তাকিয়ে দুই অনুপ্রবেশকারীর মন কেমন এক অজানা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। এ অস্বস্তি অস্পষ্ট কিন্তু নিশ্চিত।

অনুবিসের মূর্তি লম্বায় বারো ফুট। এই উঁচু মূর্তির দেহটা মানুষের, কিন্তু মুখখানা শেয়ালের। মুখের তলায় কাঁধ দুটো বিশাল। বৃষস্কন্ধ বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। মূর্তির হাত দু'খানা সাবধানতার ভঙ্গীতে প্রসারিত। যেন বহিরাগত কাউকে ঢুকতে নিষেধ করছে এই পাথরের মূর্তি।

কিন্তু এটা তো অদ্ভুত। এ নিষেধের কোন অর্থই তো বোঝা যাচ্ছে না, কেননা মৃতপুরীর অভিভাবক এই মূর্তির পিছনের দেওয়ালে একটা সংকীর্ণ কুলুঙ্গী ছাড়া আর তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবে কি এই কুলুঙ্গীটিকেই পাহারা দিচ্ছেন মরণপুরীর প্রবেশপথের প্রহরী এই শিবামুখ দেবতা? এর অর্থ? আপাতদৃষ্টিতে কোন অর্থই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

দেবতার দেহে যেন এক অশুভ ইঙ্গিতের হাওয়া। তার দেহে যেন এক পাশবিক মানবতার গূঢ় সংকেত। পাথুরে মূর্তি যেন লুকিয়ে রেখেছে কোন এক গোপন রহস্যকে। লুকিয়ে রেখেছে এক গোপন অথচ সংবেদনশীল সচেতন জীবকে। খোদাই করা মুখের বাঁকা হাসিটি যেন অদ্ভুত রকমের জীবন্ত। এ হাসির মধ্য দিয়ে যেন প্রকাশ পাচ্ছে মানব বিদ্বেষ। আর দোখ দুটি? যদিও সে দুটি পাথরের তবুও তারই মধ্যে রয়েছে যেন এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর সচেতনতা। ঐ চোখ দুটির দিকে তাকালে মনের শান্তি নষ্ট হয়, মনের প্রশান্ত সমুদ্রে জাগে আলোড়ন। জাগতে থাকে একের পর এক শঙ্কাময় তরঙ্গ।

এই পাথরের প্রতিমূর্তিটা যেন জীবন্ত। অথবা পাথরের বহিরাবরণের অন্তরালে যেন লুকিয়ে রয়েছে সচেতন জীবন, পাথরের খোলস ছেড়ে যেন সেই সুপ্ত জীবন যে কোন মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করবে।

দুই অভিযাত্রী যেন এটা অনুভব করতে লাগল। তারা নির্বাক। বহুক্ষণ ধরে তারা শিবামুখ দেবতার দিকে চেয়ে রইল। ভাবতে লাগল দেবতার কথা, ওদের মন ভরে উঠল অস্বস্তিতে। তারপর ঘোর কেটে যেন চমকে উঠলেন বৃদ্ধ। তার মধ্যে যেন ফিরে এল অভ্যস্ত কর্মতৎপরতা। ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

—'ওহে, বাছা, সারাদিন মূর্তিটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে তো চলবে না! আমাদের এখন অনেক কাজ করতে হবে...সবচেয়ে বড় কাজটাই তো এখনও বাকী। ম্যাপখানা....হ্যাঁ ম্যাপখানা দেখেছ?'

—'হ্যাঁ, বাবা।'

ছেলের কণ্ঠস্বর বাবার মতো সজোর বা দৃঢ় নয়। পাথুরে পথের পূতিগন্ধময় বাতাস তার ভাল লাগছে না। পাতাল পথের অন্ধকারময় কোণে কোণে যে বিষাক্ত দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে তা যেন ছেলে কোনমতেই সহ্য করতে পারছিল না। সে সবসময়েই একটা ঘটনা সম্পর্কে সচেতন—বলতে গেলে একটু বেশি মাত্রায়ই সচেতন। ঘটনাটা হল এই যে ছেলে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না যে সে আর তার বাবা এক গুপ্ত সমাধিগৃহে এসে পড়েছে, আর এই সমাধি হল

মরুবালুকার সাতাশ' ফুট নীচে। তারা এখন পাতালপুরীতে। পাতালপুরীর এই গোপন সমাধিগৃহ সুদীর্ঘ তিরিশ শতাব্দী যাবৎ উন্মুক্ত হয়নি—রয়ে গিয়েছে লোকচক্ষুর অগোচরে। এ সমাধির কথা কোন ইতিহাসের বই-এ লেখা নেই। সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে লোকে ভুলে গিয়েছে এর কথা। ছেলে পিটার বার্টন কিছুতেই সেই অভিশাপের কথা স্মরণ না করে পারছিল না।

হ্যাঁ, ভূগর্ভের এই সমাধিগৃহ অভিশপ্ত! বস্তুতপক্ষে এই অভিশাপের জন্যই পাতালপুরীর এই গোপন সমাধি-ভূমিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। হ্যাঁ, অভিশাপের কিংবদন্তীই স্যার রোনাল্ডকে পৌঁছে দিয়েছে আবিষ্কারের দোরগোড়ায়।

নবম পিরামিড উৎখননের সময়েই স্যার রোনাল্ড এই গোপন সমাধি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন একখানা ছাতা-ধরা সেকেলে প্যাপিরাস পার্চমেন্টের মধ্যে। সেখানেই ছিল এই ভুলে যাওয়া গোপন সমাধিগৃহে পৌঁছবার সাংকেতিক ইঙ্গিত। প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের কর্তা-ব্যক্তিদের নজর এড়িয়ে স্যার রোনাল্ড যে কি করে প্যাপিরাসের পার্চমেন্টখানাকে শিবিরের বাইরে পাচার করেছিলেন তা কেউ বলতে পারে না।

উৎখননের ফলে পাওয়া প্রাচীন বস্তুর অপহরণ নিঃসন্দেহে এক গুরুতর অপরাধ। কিন্তু তবুও স্যার বার্টনকে বোধকরি পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি মিশরভূমির ঊষর মরুস্থলী তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। একখানা বিরাট চিরুনী নিয়ে তিনি যেন সীমাহারা বালুকারাশিকে আঁচড়ে দিয়েছেন, কত প্রাচীন পবিত্র বস্তু তিনি মাটির তলা থেকে বের করেছেন, পাঠোদ্ধার করেছেন কত প্রাচীন চিত্রলেখার।

অক্লান্ত পরিশ্রমী স্যার বার্টন ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করেছেন কত ম্যমী, কত প্রতিমূর্তি, কত প্রাচীন আসবাবপত্র আর মূল্যবান পাথর এবং অমূল্য মণি-রত্ন! নিজের দেশের সরকারের জন্য তিনি মাটির তল থেকে উদ্ধার করেছেন অপরিমিত সম্পদ আর অবিশ্বাস্য রকমের মূল্যবান কত পাণ্ডুলিপি! কিন্তু প্রতিদানে তিনি কি পেয়েছেন? বলতে গেলে কিছুই নয়। স্যার রোনাল্ড বার্টন আজও একজন দরিদ্র মানুষ। সরকার থেকে আজও তাঁকে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযাত্রীদলের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলে পুরস্কৃত করা হয় নি। আজ যদি তিনি একটা ভ্রান্ত পদক্ষেপ করেই থাকেন তবে কে তাকে দোষারোপ করতে পারে? জীবন-সায়াহ্নে এসে একটুখানি অন্যায় কাজ করে যদি অনেক যশ আর সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় তবে সেটুকু অন্যায় করবেন না-ই বা কেন? নীতিবোধ? এতকাল নৈতিকভাবে পথে থেকেই বা হল কি?

তাছাড়া তিনি বুড়ো হয়ে পড়েছেন। মিশরে কুড়ি বছর কাটালে সব প্রত্নতাত্ত্বিকই বোধকরি কিছুটা পাগল হয়ে যায়। মাথার উপরে ক্রুদ্ধ সূর্যের অগ্নিবর্ষণ যেন ক্রমে অসাড় করে দেয় মরু অভিযাত্রীদের মস্তিস্কের কোষগুলিতে।

কুহেলীঘেরা সুদূর অতীতের বিলুপ্ত সভ্যতার অবশেষের সন্ধানে অভিযাত্রীদের সীমাহারা আদিগন্ত মরুস্থলী তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায়। ওরা মরুবালুকার তলায় খুঁজে পাওয়া ধ্বংসাবশেষ খনন করে। প্রবেশ করে পৃথিবীর গোপন অন্তঃপুরে। ভূগর্ভের মন্দির প্রকোষ্ঠগুলির আর্দ্রতা, অন্ধকার আর পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে যা জীবিত মানুষের আত্মাকে আতঙ্কিত করে তোলে। এক হিমেল পরশে শিহরিত হয়ে ওঠে মন। এক নিদারুণ শঙ্কা যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে মরদেহকে।

এখানে আজও রাজত্ব করেন প্রাচীন দেবতারা। এই অন্ধকার রাজ্যে তাঁদের দেখবার চেষ্টা করবার ফল বোধহয় খুব শুভ নয়।

কেননা বিড়াল-মুখ দেবতা বুবাসটিস, সর্পদেহ সেট, এবং মহা-অশুভ মহাঅমঙ্গল আমনরা ক্রুদ্ধ অভিভাবকের মতো ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পিরামিডগুলোর সামনে।

পিরামিডের পবিত্রতা নষ্ট করা মহাঅপরাধ....মহাপাপ। সবার উপরে রয়েছে সুদীর্ঘকাল মৃত এবং বিনষ্ট নিষিদ্ধ বস্তুর হাওয়া। মরণের এই হিমেল হাওয়া যেন রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে—দারুণ আতঙ্কে জমিয়ে দেয় তরল রক্তকে।

স্যার রোনাল্ড প্রাচীন মিশরের যাদুবিদ্যা নিয়েও কিছুটা চর্চা করেছিলেন। বোধকরি এই কারণেই পার্চমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি তাঁকে অন্য অভিযাত্রীদের থেকে বেশী প্রভাবিত করেছিল। তিনি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। যার ফলে স্যার রোনাল্ড শেষ পর্যন্ত পার্চমেন্টখানা চুরিই করলেন।

এ পাণ্ডুলিপির রচয়িতা প্রাচীন মিশরের একজন পুরোহিত। কিন্তু এ পুরোহিত একজন ধর্মপ্রাণ এবং পবিত্র মানুষ ছিলেন না। কোন মানুষ তার শপথ না ভেঙে এ জাতীয় জিনিস লিখতে পারে না। একজন ধর্মনিষ্ঠ পুরোহিত তো নয়ই। এ এক ভয়ঙ্কর পাণ্ডুলিপি। সমস্ত পাণ্ডুলিপি জুড়ে রয়েছে যাদুবিদ্যা আর বীভৎস ডাকিনীবিদ্যার আলোচনা; রয়েছে কত নাম-না-জানা আতঙ্কের অস্পষ্ট ইঙ্গিত। এক মহা-অমঙ্গলের—এক মহা-অশুভের বার্তা বহন করছে এই জীর্ণ পাণ্ডুলিপি।

সম্মোহনকারী পুরোহিত পাণ্ডুলিপিতে এমন সব দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা তাঁর উপাস্য প্রাচীন মিশরের দেবতাদের থেকেও প্রাচীনতর। 'দানব বার্তাবহ' এবং 'কালো মন্দির'-এর উল্লেখ রয়েছে এই পাণ্ডুলিপিতে,

তাছাড়া রয়েছে নানা গোপন পুরাকাহিনী আর কিংবদন্তী। এ সব হল অতি পুরাকালের—আদমের আবির্ভাবেরও পূর্ববর্তী সময়ের।

খ্রীষ্ট ধর্মের হল 'ব্ল্যাক ম্যাস'। পবিত্র ধর্মাধিষ্ঠানের বিধান এবং নির্দেশ অমান্য করে এই অনুষ্ঠানে শয়তানের উপাসনা করা হয়। অনেক তথাকথিত খ্রীষ্টানও এই ধর্মবিরোধী উপাসনায় অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গেই রয়েছে শয়তান এবং প্রেতশক্তির গোপন উপাসনা পদ্ধতি। প্রাচীন মিশরীয়রাও জানত তাদের অমঙ্গলময় অশুভ কালো দেবতাদের কথা। অবশ্য সবাই নয়। গোপন উপাসকেরাই কেবল জানত এই সব ভয়াল ভয়ঙ্কর অতিপ্রাকৃত শক্তির কথা।

সেইসব অভিশপ্ত দেবতার নাম লেখা রয়েছে এই জীর্ণ পাণ্ডুলিপিতে। কোন্ প্রার্থনায়—কোন্ অশুভ মন্ত্রে তাদের আবাহন করতে হবে, তাও লেখা রয়েছে এই অতিপ্রাচীন অ-শিব পাণ্ডুলিপিতে। এখানে পাতায় পাতায় মঙ্গলময় ঈশ্বরের সম্পর্কে নিন্দাপূর্ণ উক্তির ছড়াছড়ি। অত্যন্ত অশিষ্ট এবং কুৎসিত ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে ঈশ্বরকে। এ সব উক্তি পড়লে দারুণ আঘাত পেয়ে মনটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। মিশরের প্রচলিত ধর্মমতকে আক্রমণ করা হয়েছে—ভয় দেখান হয়েছে পুঁথির পাতায়। এ ধর্মমত যারা অনুসরণ করে তাদের দেওয়া হয়েছে ভয়ঙ্কর অভিশম্পাত। হয়ত এ কারণেই স্যার রোনাল্ড এই পাণ্ডুলিপির লেখক শয়তানের উপাসক সেই প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতের ম্যমীভূত দেহের সঙ্গে সমাহিত অবস্থায় এই ভয়ঙ্কর কালো পুঁথিখানা পেয়েছেন। এ পুঁথি যারা প্রথম আবিষ্কার করেছিল—সেই মিশরীয়রা এই পাণ্ডুলিপিখানা নষ্ট করে ফেলেনি। কেন না তাদের মনে আশঙ্কা ছিল এখানা নষ্ট করলে নিজেদের জীবনে চরম দুর্ভাগ্য—চরম অমঙ্গল নেমে আসবে। সেজন্য অভিশপ্ত লেখকের সঙ্গে তার অভিশপ্ত পাণ্ডুলিপিকেও এক গোপন সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

অবশ্য অন্যভাবে তারা প্রেত-পূজারীর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। পুরোহিতের ম্যমীভূত দেহে হাত নেই, পা নেই, এমনকি চোখ দুটি পর্যন্ত নেই। এগুলো যে কালের কবলে পড়ে নষ্ট হয়েছে তা-ও নয়। দেহটাকে ম্যমীভূত করবার আগেই হাত-পা কেটে ফেলা হয়েছিল, নৃশংসভাবে উপড়ে ফেলা হয়েছিল চোখ দু'টি।

স্যার রোনাল্ড, যদিও তিনি পাণ্ডুলিপির উপরে উল্লিখিত অংশগুলি সম্বন্ধে প্রগাঢ়ভাবে কৌতূহলী হয়েছেন তবুও তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে পাণ্ডুলিপির শেষ পাতাটা। এখানে অশুভ শক্তির উপাসক সেই ধর্মপথ ভ্রষ্ট অপবিত্র পুরোহিত বলেছে তার 'প্রভু'-র গোপন সমাধির কথা। এই 'প্রভু' নাকি তার কালে শয়তানের কালো উপাসনা পদ্ধতির সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী

ছিলেন। নরকের অধিপতি নাকি স্বয়ং তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। 'প্রভু'-র প্রতিটি আদেশ ছিল শয়তানের উপাসক। এবং প্রেত-পূজারীদের কাছে অবশ্য পালনীয়। তাঁর তুচ্ছতম ইচ্ছারও বিরুদ্ধাচারণ করতে কেউ সাহসী হত না। পাণ্ডুলিপির শেষ পাতায় শুরু হয়েছে ঃ

'প্রভুর দেহ শুয়ে আছে গোপন সমাধিমন্দিরে'—এই শিরোনাম দিয়ে। এর শেষের পাতায় রয়েছে একখানা মানচিত্র, একখানা চার্ট আর কিছু নির্দেশ। এগুলি প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপিতে লেখা হয় নি।—লেখা হয়েছে প্রাচীন 'চালডিয়ার কীলকাকার লিপিতে'। নিঃসন্দেহে এজন্যই প্রাচীন মিশরের প্রতিহিংসাপরায়ণ পুরোহিতেরা 'প্রভু'-র এই গুপ্ত সমাধি খুঁজে বের করে ধ্বংস করে ফেলতে পারেনি। সম্ভবতঃ মিশরীয় পুরোহিতেরা চালডিয়ার ভাষা আর লিপির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। অবশ্য এটাও হতে পারে যে অভিশাপের ভয়েই হয়ত তারা এই অশুভ পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেননি।

কায়রোর সে রাতের কথা পিটার বার্টনের আজও মনে পড়ে। ভোলা যায় না....কিছুতেই ভোলা যায় না সে রাতের কথা। অনেক খেটে পাণ্ডুলিপিখানার অনুবাদ করেছিলেন স্যার রোনাল্ড। সে রাতে পিটার আর তার বাবা অনুবাদটা পড়ছিলেন। বাবার ঝকঝকে চোখে তীব্র লোভের দীপ্তি দেখেছিল পিটার। লক্ষ্য করেছিল বাবার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসা স্বরে কি কম্পমান গভীরতা! অদ্ভুত স্বরে স্যার রোনাল্ড পড়ছিলেন ঃ

'....এবং মানচিত্র যেখানকার পথ নির্দেশ করেছে, সেখানে গিয়ে দেখতে পাবে আমাদের 'প্রভু-'র সমাধি। সেখানে তিনি শুয়ে আছেন তাঁর সহকারীদের সঙ্গে। সেখানে তাঁর পাশেই রয়েছে তাঁর সমস্ত সম্পদ।'

সম্পদ! এই শেষ শব্দটা উচ্চারণ করার সময় স্যার রোনাল্ডের কণ্ঠস্বর যেন উত্তেজনায় প্রায় ভেঙে গেল।

'এবং প্রবেশদ্বারের সম্মুখে, যে রাত্রে লুব্ধক নক্ষত্র আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে ঠিক মাথার উপরে অবস্থান করবে, সেই রাতে বেদীর উপর তিনটি শৃগাল বলি দিতে হবে। সমাধিগৃহের প্রবেশমুখের কাছে শৃগালের উষ্ণ শোণিত-ধারা সিঞ্চন করে মরুবালুকাকে সিক্ত করবে।

তারপর আকাশ থেকে অবতরণ করবে অতিকায় কালো বাদুড়ের দল। তারা পান-ভোজনে তৃপ্ত হবে। আনন্দময় এই রক্তের বার্তা তারা বহন করে নিয়ে যাবে অন্ধকার পাতালপুরীতে দেবতা সেট-এর কাছে।'

—'এগুলো সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের বাজে বকুনি' তরুণ পিটার মন্তব্য করেছিল সেই রাত্রে।

—'উপহাস করো না বাপু, এসব ব্যঙ্গ করবার বিষয় নয়, স্যার রোনাল্ড ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'এ পাণ্ডুলিপিতে যা লেখা রয়েছে, তার স্বপক্ষে আমি যুক্তি দিতে পারি। তোমাকে আমি এ সমস্ত কথার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলতে পারি। কিন্তু কেন বোঝাচ্ছি না? কারণ আমার আশঙ্কা এই যে সত্য হয়ত অনাবশ্যকভাবেই তোমাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। তুমি হয়ত বিনা কারণেই ভীত হয়ে পড়বে।'

চুপ করে গিয়েছিল পিটার। তার বাবা পড়ছিলেন ঃ

—'বাইরের পথটায় নেমে তুমি দরজা পেয়ে যাবে দরজায় রয়েছে আমাদের মহান প্রভুর প্রতীক, প্রভু অপেক্ষা করছেন ভিতরে। প্রতীকের সপ্তম মস্তকের সপ্তম জিহ্বা ধর। ছুরিকা নিয়ে অপসারিত কর এই সপ্তম জিহ্বাকে। তখন বাধাও অপসারিত হবে। পাতালপুরীর সমাধিগৃহের ভূগর্ভস্থ প্রবেশদ্বার তোমার অধিকারে আসবে তুমি এবার সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করবে। ভেতরের পথ দিয়ে তেত্রিশ পদ অগ্রসর হবার পর দেখতে পাবে শিবামুখ দেবতা অনুবিসের বিশাল প্রস্তর মূর্তি।'

'মহান দেবতা অনুবিস হলেন মৃতপুরীর প্রহরী। একমাত্র তিনিই খুলে দিতে পারেন জীবনের পরপারে মরণলোকের কুহেলীঘেরা ছায়াময় পথকে। একমাত্র তিনিই জানেন সে পথের সন্ধান।'

—'অনুবিস! কিন্তু তিনি তো প্রাচীন মিশরের একজন সর্বজনস্বীকৃত দেবতা, তাই নয়?' পিটার প্রশ্ন করল।

তার বাবা পাণ্ডুলিপিতে চোখ রেখেই প্রশ্নের উত্তর দেন ঃ

'কেননা শক্তিমান দেবতা মহান প্রভু অনুবিসের হাতেই রয়েছে জীবন ও মৃত্যুর চাবিকাঠি। তিনি কার্ণেটারের গোপন রহস্যের প্রহরী। তাঁর সম্মতি ছাড়া কেউ যবনিকা অতিক্রম করে যেতে পারে না—উন্মুক্ত করতে পারে না ছায়াময় পরজগতের রহস্যময় অবগুণ্ঠন। কোন কোন মানুষের ধারণা শিবামুখ দেবতা হলেন শাসককুলের বন্ধু। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত—সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দেবতা অনুবিস তা নন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ছায়ায়, কেননা তিনিই হলেন গূঢ়তম রহস্যের সংরক্ষক। প্রাচীন পুঁথিতে লেখা আছে যে 'সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যুষে অনুবিস মানুষের কাছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় যিনি আমাদের ধর্মীয় প্রভু ছিলেন, সেই প্রধান পুরোহিত দেবতার প্রকৃত রূপের অনুকরণে প্রথম প্রস্তর মূর্তি গড়েছিলন। সেই মূর্তিকেই দেখতে পাবে পাতালের ভিতরের পথের একেবারে

শেষপ্রান্তে। পথ-প্রদর্শক শিবামুখ দেবতার প্রথম এবং প্রকৃত প্রতিমূর্তি।'

—'আশ্চর্য! এসব কথা শুনলে তো বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়;' বাবার পড়া শুনতে শুনতে পিটার বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'বাবা, কথাগুলো যদি সত্যি হয় তবে অর্থটা কি দাঁড়ায় ভেবে দেখ। মানুষের হাতে তৈরী অনুবিসের প্রথম এবং প্রকৃত মূর্তি খুঁজে পাওয়া... উঃ! একবার কল্পনা কর ব্যাপারটা!

বাবা স্যার রোনাল্ড কোন উত্তর না দিয়ে কেবল একটু হেসেছেন। পিটারের মনে হয়েছে হাসিটা যেন একটু নিষ্প্রভ।

'অনুবিসের প্রথম মূর্তি আর পরবর্তী মূর্তিগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য নানাদিক থেকে।'

পাণ্ডুলিপি বলছে ঃ

'এই পার্থক্য সাধারণ মানুষের না জানাই ভালো। কারণ জানলে তার শুভ হবে না। সুতরাং আমাদর প্রভু পুরোহিতেরা দেবতা অনুবিসের প্রথম প্রস্তর মূর্তিকে যুগ যুগ ধরে এক অতি গোপন স্থানে লুক্কায়িত করে রেখেছেন। দেবতার দাবী অনুসারেই তাঁর বিশেষ ধরনের উপাসনার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এখন আমাদের শক্ররা এতদূর দুঃসাহসী হয়ে উঠছেন যে তারা দেবতার উপাসনার পবিত্রতাটুকু পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলছে। অভিশপ্ত হোক এই শক্ররা। তাদের জৈব দেহ, চেতনা ও আত্মা বিনষ্ট হোক...হোক ক্ষয়িষ্ণু এবং পচনশীল। তাদের অভিশপ্ত আত্মার স্থান হোক অনন্ত নরকে। সঙ্গত বিবেচনা করে আমাদের 'প্রভু' এমন এক ব্যবস্থা করলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর শিবামুখ দেবতার প্রস্তর মূর্তি তাঁরই সঙ্গে সমাধিগৃহে লুক্কায়িত থাকবে।'

পরবর্তী কয়েকটি পংক্তি পড়বার সময় রোনাল্ডের গলার স্বর কাঁপতে লাগল ঃ

.....'কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণেই মহান অনুবিস পাতালের ভিতরের পথের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে নেই। আরো কারণ রয়েছে। শিবামুখ দেবতা সত্যিই পথ উন্মুক্ত করে দেন। জীবনলোক থেকে মরণলোকে যাবার পথের উনি অতন্দ্রপ্রহরী। এই শক্তিমান দেবতার সাহায্য ছাড়া কোন মানুষ ভিতরের প্রকৃত সমাধিগৃহে প্রবেশ করতে পারে না।'

এই পর্যন্ত পড়েই বৃদ্ধ স্যার রোনাল্ড থামলেন। অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে পাঠ করতে লাগলেন পাণ্ডুলিপি।

'কি ব্যাপার?' অধৈর্য্য হয়ে পিটার জিজ্ঞেস করল, 'এবার বুঝি দেবতার 'স্ট্যাচু' নিয়ে বোকার মতো কোন আচার-অনুষ্ঠান করবার কথা লিখেছে?'

স্যার রোনাল্ড ছেলের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। নিঃশব্দে পড়তে লাগলেন পাণ্ডুলিপিখানা, পিটার লক্ষ্য করল বাবার যে হাতে পাণ্ডুলিপিখানা ধরা রয়েছে সে হাতখানা তো বটেই অন্য হাতখানাও কাঁপছে। শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ যখন মুখ তুললেন তখন দেখা গেল তাঁর মুখ একেবারে বিবর্ণ—পাণ্ডুর।

ছেলের দিকে তাকিয়ে নীরস শুকনো গলায় স্যার রোনাল্ড বললেন,—হ্যাঁ বাবা, ঠিক তাই। বোকার মতো আর একটা আচার-অনুষ্ঠান করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ সে জায়গায় না যাচ্ছি ততক্ষণ এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? আগে জায়গাটার খোঁজ পাই তবে তো....'

—'তুমি সেখানে যেতে চাইছ? জায়গাটা আবিষ্কার করতে চাইছ?' বাবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তরুণ পিটার ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল।

—'হাঁ, বাছা, আমি যাব। আমাকে যেতেই হবে।' কষ্টকৃত স্বরে স্যার রোনাল্ড বললেন।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। পাণ্ডুলিপির শেষ অংশে মনঃসংযোগ করলেন বৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক। এই অংশে লেখা রয়েছেঃ

—'কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান! যারা অবিশ্বাসী তারা কিন্তু মরবে। হ্যাঁ, তাদের মরণ অনিবার্য। তারা হয়ত ভগবান অনুবিসকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারবে, কিন্তু তবুও মহান 'প্রভু' জানতে পারবেন অনধিকারীর অশুভ আবির্ভাবের কথা। শিবামুখ দেবতা আর মানুষের জগতে তাদের প্রত্যাবর্তন করবার অনুমতি দেবেন না। কেননা প্রভু অনুবিসের এই প্রথম প্রস্তরমূর্তি বাস্তবিকই অদ্ভুত এবং রহস্যময়। এই মূর্তির মধ্যে রয়েছে বুদ্ধির অনধিগম্য এক গোপন আত্মার অস্তিত্ব। রয়েছে এক সুপ্ত চেতনা শক্তি।

বৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক খুব তাড়াতাড়ি শেষ কথাগুলো পড়লেন। পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুটিয়ে ফেললেন পাণ্ডুলিপি। এর পরে ইচ্ছাকৃতভাবেই অভিযানের বাস্তব সমস্যাগুলো আলোচনার দিকে তিনি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক এই মুহূর্তে পাণ্ডুলিপি থেকে যেসব কথা পড়লেন তা যেন ভুলে যেতে চান।

পরের কয়েকটা সপ্তাহ কাটল দক্ষিণ মিশরের যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন করতে। এ সময়ে স্যার রোনাল্ড ছেলেকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলেছেন। অভিযানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বাস্তব বিষয়গুলি ছাড়া বাবা আর ছেলের মধ্যে আর কোন কথাবার্তা, বলতে গেলে হয়ই নি।

তরুণ পিটার কিন্তু ভোলে নি, সে অবাক হয়ে ভাবত পাণ্ডুলিপির একটা অংশ বাবা নিঃশব্দে পড়লেন কেন? কি আছে সেই অংশে নিশ্চয়ই কোন গোপন আচার-অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। এসব আচার-অনুষ্ঠান করলেই বোধকরি প্রহরী দেবতা অনুবিসকে অতিক্রম করে সমাধিগৃহের গোপনতম অংশে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। কিন্তু বাবার মুখখানা ওরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন? কেনই বা অমনভাবে তাঁর হাত দু'খানা কাঁপছিল? কেনই বা তিনি তাড়াতাড়ি আলোচনার বিষয়বস্তু পাল্টে সুস্থ-বিষয়ের আলোচনায় এলেন? কেন বাবা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিখানা এমনভাবে আগলে রাখছেন? পিটারকে দেখতে দিচ্ছেন না কেন? পাণ্ডুলিপির শেষ দিকে যে 'অভিশাপ'-এর কথা বলা হয়েছে তারই বা অর্থ কি? প্রকৃতি কি?

এরকম অসংখ্য প্রশ্ন তরুণ পিটারের মনে জেগে উঠতে লাগল। প্রশ্নগুলো নিয়ে পিটার অনেক ভাবনা-চিন্তা করল কিন্তু কোন কুলকিনারা করতে পারল না। তবে একটা ব্যাপার হয়েছে; পিটারের মন থেকে ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছে। অভিযান সংগঠন এবং তার খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকবার জন্য পিটার কিছুদিন তার মনে জেগে ওঠা প্রশ্নগুলি নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাতে পারে নি। সে আর তার বাবা দক্ষিণ মিশরের ঊষর মরুস্থলীতে পৌছবার পর তার মন আবার শঙ্কাতুর হয়ে উঠল। এক ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা যেন মহামারীর মতই আক্রমণ করল তার মনকে। মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল পিটারের।

মরুস্থলীর বুকে সুন্দর অতীতের আবহাওয়া। বহু যুগের ওপার থেকে কুয়াশা ঘেরা অতীত যেন হাতছানি দেয় এখানে। রাতে তার হিমেল পরশ যেন অনুভব করা যায় দেহে এবং মনে।

দিনের বেলায় অসহ্য উত্তাপ। আকাশ থেকে সূর্যদেব যেন অগ্নি-বর্ষণ করেন; মাঝে মাঝে মরুস্থলীতে ঝড় ওঠে। ক্রুদ্ধ মরুদানবের দল যেন সোঁ সোঁ করে ছুটে আসে ওদের তাঁবুর দিকে। জিনে আর ইফ্রিতের হুংকার আর মানবাত্মার হাহাকারে ভরে যায় যেন দশদিক। সীমাহারা মুক্তমরুকে সীমার বাঁধনে বাঁধতে চায় তাঁবু, আর ক্রুদ্ধ মরুদানব যেন মানুষের স্পর্দ্ধা দেখে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় এই তুচ্ছ তাঁবুকে।

দিগন্ত প্রসারী মরুস্থলীতে যেন নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে অতীতের সৌরভ— মাঝে মাঝে দৃষ্টিসীমায় যেন ধরা পড়ে কুহেলী-ঘেরা সুদূর অতীতের অলৌকিক আভা। ইশারা পাওয়া যায় সেই স্মরণাতীত কালের—'ধরণী যখন তরণী ছিল।' মনে হয়, মানুষের বিজয় কত ক্ষণস্থায়ী! মরুভূমিতে সাদা স্থান পরিবর্তনকারী

বালুরাশিতে মানুষের পদচিহ্নের মতো তা অল্পকালের মধ্যেই কেমন করে কোন চিহ্ন না রেখেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ-রকম জায়গায় আত্মার গহনগভীরে অবতীর্ণ হয় স্ফিংসের চিন্তনের মতই অতলান্ত চিন্তার অপরিমেয় গুরুভার। বিষণ্ণ স্বগতোক্তি উৎসারিত হতে থাকে অবচেতনার গোপন কন্দর থেকে। বলগাহীন অসংযত ভাষণ সমস্ত মনকে ছেয়ে ফেলে। শাসন করতে থাকে মানবকে।

সীমাহারা মরুস্থলীর অনন্ত বালুকাবিস্তার আর তার গভীর নিস্তব্ধতা তরুণ পিটারের মনকে প্রভাবিত করে। মরুকায়া যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে তার দেহ-মন—তার সমস্ত সত্তাকে। এই মায়াপাশ ছিন্ন করবার শক্তি নেই তরুণ পিটারের। সাধ্য নেই এ মায়ার বাঁধনকে অবহেলাভরে অগ্রাহ্য করে যাবার। প্রাচীন মিশরের যাদুবিদ্যা আর ইন্দ্রজাল নিয়ে বাবা একসময় কিছু বলেছিলেন। পিটার সেসব মনে করবার চেষ্টা করে। মিশরের পুরোহিতকুল কি অদ্ভুত কি আশ্চর্যজনক আর বিস্ময়ের যাদুশক্তির অধিকারী ছিলেন তা তার মনে আসে।

সমাধি-প্রকোষ্ঠ এবং ভূগর্ভের আতঙ্ক নিয়ে রয়েছে অনেক কিংবদন্তী। এখানে এই বালুকাময় মরুস্থলীতে—যেখানে এসব কাহিনীর উদ্ভব, সেই উদ্ভবক্ষেত্রে এসে কিংবদন্তীমালা যেন নতুন করে বাস্তবতা লাভ করে। পিটার বার্টন ব্যক্তিগতভাবে এখন বহু লোককে জানে যারা অশুভশক্তি এবং অভিশাপের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অত্যন্ত অদ্ভুত এবং রহস্যজনকভাবে মরণকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন—হ্যাঁ, বাধ্যই হয়েছেন। তুত-আন্‌খ-আহ্‌মেন-এর ব্যাপার আর পাউত মন্দিরের কেলেঙ্কারীর কথা তো সবারই জানা। যাঁরা উৎখনন করেছিলেন তাঁরা কেমন করে একের পর এক রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন! তারপর সেই অতি দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী অভিযাত্রী ডক্টর কার্গোটি! লোকটি নিঃসন্দেহে অপ্রীতিকর। কিন্তু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে যে ভয়ঙ্কর গুজবগুলো শোনা যায় তা-ও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি করে!

রাতে তারা-জ্বলা আকাশের নীচে বসে এরকম অসংখ্য কাহিনী তরুণ পিটারের মনে আসে। তারাগুলো যেন গুপ্তচর। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে অতন্দ্র নেত্রে। কার গুপ্তচর? জীবনের পরপারে সেই কুহেলীঘেরা অপার্থিব অতিন্দ্রীয় লোকের? ওদের সামনে ভবিষ্যৎ কি নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে? সামনে কি একের পর এক ভয়ঙ্কর ঘটনার ঘনঘটা? এসব কথা ভাবতেই পিটারের মন এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠল। ওর শরীর কাঁপতে লাগল থর থর করে। না, এখানে আসা মোটেই উচিত হয় নি। যে ভাবেই হোক বাবাকে বাধা দেওয়া উচিত ছিল। অবশ্য সে বাধা বাবা হয়ত শুনতেন না; কিন্তু পিটারও তো তেমন করে

চেষ্টা করে নি।

ম্যাপে নির্দেশিত জায়গায় স্যার রোনাল্ড যখন তাঁবু খাটালেন, তখন পিটারের শঙ্কাবিহ্বল মনের আতঙ্কগুলি যেন মূর্তিমন্ত হয়ে উঠল। শুরু হল নবতর এবং আরও মূর্ত আতঙ্কের আনাগোনা।

সেই প্রথম রাত। স্যার রোনাল্ড তাঁবু ছেড়ে একা একা তাঁবুর পিছনের পাহাড়গুলির দিকে চলে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন একটা সাদা ছাগল আর একটা ধারালো ছুরি। বাবাকে অনুসরণ করে ছেলে যখন ঘটনাস্থলে পৌছল তখন কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ছাগ-রক্তে মরুর শুকনো বালির তৃষ্ণা মিটিয়েছে। চাঁদের আলোয় বালুকার বুকে ছড়ানো রক্ত ভয়ঙ্করভাবে জ্বলজ্বল করছে। বলিদান-কারী বৃদ্ধ স্যার রোনাল্ডের দুই জ্বলন্ত চোখেও হিংসা আর নিষ্ঠুরতার রক্তিম আভা। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন যেন অলৌকিক—কেমন যেন অপার্থিব! পিটার যেন এসে পড়েছে তার চেনা পৃথিবীর বাইরে কোন এক রহস্যময় অজ্ঞাত জগতে। এই পার্থিব পরিবেশে স্যার রোনাল্ডকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এক ঘোর নৃশংস ঐন্দ্রজালিক তার অশুভ যাদু শক্তিকে মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য গভীর রাতে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

এই কি বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার রোনাল্ড বার্টন!

তরুণ পিটার যেন চিনতে পারছে না তার বাবাকে।

নিজের উপস্থিতির কথাও জানাল না পিটার। বাবার ঐন্দ্রজালিক আচার-অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়াটাকেও ও খুব একটা সঙ্গত এবং সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করল না। বৃদ্ধ তখন চাঁদের দিকে তাকিয়ে পিটারের অজানা প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় মন্ত্রপাঠ করছিলেন। আকাশের চাঁদ যেন উপহাস করছে—বিদ্রুপ করছে বৃদ্ধকে।

আসলে পিটার তার বাবাকে একটু বেশীমাত্রায়ই ভয় করে। তা না হলে সে তার বাবাকে এই অভিযান থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য সচেষ্ট হতে পারত। কিন্তু স্যার রোনাল্ডের আচরণে এমন একটা কিছু ছিল যা থেকে পাওয়া যাচ্ছিল এক উন্মাদ আর অব্যাহত সংকল্পের ইঙ্গিত। এক অতি গূঢ় রহস্যের সংকেত যেন থেকে থেকে ধরা পড়ছিল তাঁর এই অভিযানের প্রস্তুতিপর্বেই। এটাই চুপ করিয়ে রেখেছিল পিটারকে।

এজন্যই সে পুরানো পাণ্ডুলিপিতে যে রহস্যময় 'অভিশাপ'-এর কথা রয়েছে সে সম্পর্কে বাবাকে স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি।

মধ্যরাতে পাহাড়ী এলাকায় সেই অদ্ভুত ঘটনার পরদিন স্যার রোনাল্ড রাশিচক্র সংক্রান্ত কয়েকখানা নক্‌শা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। দেখা শেষ হতে তিনি ঘোষণা করলেন ঠিক কোন মুহূর্তে উৎখননের কাজ শুরু হবে। মানচিত্রের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে স্যার রোনাল্ড বালির উপর মেপে মেপে কয়েক পা এদিক ওদিক করলেন। তার মজুরদের নির্দেশ দিলেন ঠিক কোন্ জায়গা থেকে খোঁড়ার কাজ শুরু করতে হবে।

সূর্যাস্ত নাগাদ দেখা গেল দশ ফুট গভীর একটা গর্ত খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।

গর্তটাকে দেখাচ্ছে পৃথিবীর বুকে একটা বিরাট ক্ষতচিহ্নের মতো। মিশরীয় মজুররা খুব উত্তেজিত। তারা চীৎকার করে উঠল।

—'একটা দরজা দেখা যাচ্ছে....মাটির নীচে একটা দরজা দেখতে পাচ্ছি।'

ইতিমধ্যে তরুণ পিটারের দেহের সমস্ত শিরা আর স্নায়ু দারুণ উত্তেজনায় টান টান হয়ে প্রায় ছিঁড়ে যাবার মুখে এসে পড়েছে। এই প্রচণ্ড স্নায়বিক দুর্বলতাকে ও কিছুতেই জয় করে উঠতে পারছে না। এখন যদি ওর জীবনে একটা বড় অঘটন ঘটে যায় তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু বাবাকে বড্ড ভয় করে পিটার; তাই তিনি যখন মাটির নীচে নামতে বললেন, তখন সে কোন আপত্তি করতে পারল না। এমন কি একটু ইতস্ততঃ করাও সম্ভব হল না তার পক্ষে। বৃদ্ধ স্যার রোনাল্ড নিঃসন্দেহে বুদ্ধিভ্রষ্ট.....নীতিভ্রষ্ট হয়েছেন। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁর জীবনসায়াহ্নে এসে যখন নিশ্চিতরূপেই বিপথগামী। তাঁর চেহারা আর কথাবার্তায় উন্মত্ততার ভাব যেন ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

পিটার সত্যিই তার বাবাকে ভালবাসে। কাজেই বাবার আদেশকে অমান্য করে সে তাঁকে প্ররোচিত করা সঙ্গত বলে বিবেচনা করল না। পৃথিবীর বুকে দুষ্ট ক্ষত্রের মত ঐ বিরাট গহ্বরের মধ্যে নামতে পিটারের আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু না নামলে বাবা উত্তেজিত হবেন....রেগে যাবেন।

কিন্তু যে উৎকট গন্ধটা গহ্বরের ভিতর থেকে আসছে তা সত্যিই অত্যন্ত বিরক্তিকর। ঐ বিকট গন্ধের জন্যই কেউ গহ্বরটার কাছে যেতে উৎসাহ বোধ করবে না। তাছাড়া নীচের ঐ কালো দরজাটা? ওটার আড়াল থেকই বীভৎস গন্ধটা আসছে। ঐ দরজা যেন এক অশুভ লোকের—এক মহা আতঙ্কময় জগতের মহা বিভীষিকার অশুভ সংকেত। ঐ কালো দরজাটার দিক থেকে যে গন্ধ আসছে তার হাজার গুণ বেশি গন্ধ সহ্য করা অনেক সহজ। ভূগর্ভের ঐ দরজার দিকে তাকালে দেহ-মন যেন কোন এক অজানা অনির্দেশ্য আতঙ্কে

শিউরে ওঠে। অথচ পিটারকে...বেচারা পিটারকে যেতে হবে ওখানেই....ঐ দরজার কাছেই। তারপর?

এটা নিশ্চয়ই পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত বাইরের পাতাল পথের দরজা। আচম্বিতে পিটার বুঝতে পারল পাণ্ডুলিপিতে লেখা 'সপ্তম মস্তকের সপ্তম জিহ্বা'—এ কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য। কিন্তু প্রকৃত অর্থটা না বুঝলেই বোধহয় ভাল হত। অর্থটা যদি চিরকাল অজ্ঞাত থাকত তাহলেই পিটার খুশী হত। অর্থটা পিটারের মস্তিষ্কের কোষে কোষে যেন প্রবাহিত করে দিল হিমেল আতঙ্কের শত ধারা।

কালো দরজাটার উপরে রূপো দিয়ে তৈরী এক প্রতীক মূর্তি। মূর্তির চারপাশ ঘিরে রয়েছে প্রাচীন মিশরীয় পুরাণের নানা চিত্র, রয়েছে বিশ্বের প্রাচীনতম চিত্রলেখমালা। দরজার ঠিক মাঝখানে সেই রহস্যময় প্রতীকচিহ্ন। কেন্দ্রের এই প্রতীকচিহ্নে রয়েছে প্রাচীন মিশরের সাতজন প্রধান দেবতার মাথা—ওসাইরিস, ইসিস, রা, বাস্ত, থথ, সেট এবং অনুবিস। আতঙ্কের কারণ হল এই যে ঐ সাতটি মাথা একই শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই সপ্তমুখ দেবতার দেহ মিশরের কোন পৌরাণিক দেবতার দেহের মতো নয়। না, বিন্দুমাত্র মিল নেই মিশরীয় পুরাণের কোন দেবতার দেহের সঙ্গে। প্রাচীন মিশরের দেবদেবীর আকৃতির সঙ্গে পিটারেরও তো কিছুটা পরিচয় আছে। কিন্তু এ কোন্ দেবতা?

এ দেবতার দেহের সঙ্গে মানবদেহের কোন সাদৃশ্য নেই। এ দেহের মধ্যে এমন কিছু নেই যা কোনদিক থেকে সামান্যতম ভাবেও মানবদেহের অনুকরণ করতে পারে। প্রাচীন মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অথবা দেবমণ্ডলীর বর্ণনায় এমন কোন দেবতার কথা পাওয়া যায়নি যার সঙ্গে এই অজানা অপরিচিত আতঙ্কের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য রয়েছে।

এ কোন্ দেবতা?

এ কাদের দেবতা?

কবে? কোন্ যুগে এই ভয়ঙ্কর দেবতার উপাসনা করা হত?

এ যেন এক অজানা লোকের অচেনা আতঙ্ক!

এ এক অশুভ শক্তি!

এ এক মহা অমঙ্গল!

এ প্রতীক দেখলে মনের মধ্যে যে মহা শঙ্কা আর প্রবল ঘৃণার উদ্রেক হয় তা ভাষায় প্রকাশ করে বলা যায় না। এ দৃশ্য যেন পিটারের চোখের মধ্যে হিমশীতল আতঙ্কের কতকগুলো ছোট ছোট শুঁড় ঢুকিয়ে দিল। এই অদৃশ্য শুঁড়গুলো দৃঢ়মূল হল মস্তিষ্কের কোষে কোষে। মস্তিষ্ক থেকে শুষে নিল অন্যসব অনুভূতি। কেবল

একটা অনুভূতির প্রবাহই প্রবাহমান রইল আর তা ক্রমেই বাড়তে লাগল ভয়! হ্যাঁ ক্রমবর্ধমান ভয় আর আতঙ্ক ছাড়া পিটারের মস্তিষ্কে—মনে বুঝি আর কোন অনুভূতির রেশমাত্রও রইল না।

ভয়ের কারণ রয়েছে। পিটারের মনে হল প্রতীক মূর্তিটা যেন ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে; গলে যাচ্ছে,—এক অবর্ণনীয় আকার থেকে অন্য বর্ণনাতীত রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে।

একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় প্রতীক মূর্তিটা যেন গ্রীক পুরাণের ভয়ঙ্করী মেডুসা (মেডুসাঃ গ্রিক পুরাণের তিন ভয়ঙ্কর দানবীর অন্যতমা। মেডুসার মাথার চুলগুলি হল সাপ—এই তিন দানবীর দিকে যে তাকাত সেই পাথর হয়ে যেত।) মূর্তির মতো—এক দল সাপ যেন কিল-বিল করছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টিতে মনে হয় প্রতীক মূর্তিটা যেন এক রাশি সুবিন্যস্ত বর্ণোজ্জ্বল পুষ্প। না, সাধারণ ফুল নয়। এ হল রক্তশোষক পুষ্পের একটা বিরাট স্তবক। এ ফুলের তুষার শীতল প্রাণ কোষের পাপড়িগুলি যেন ফোঁটা ফোঁটা রক্তের তৃষ্ণায় পরস্পরকে বিজড়িত করে একটি পূর্ণ স্তবক রচনা করেছে।

আবার তৃতীয়বার খুঁটিয়ে দেখলে মনে হবে যে এই আকারবিহীন প্রতীকটা যেন কতকগুলো রূপোলী নরকরোটির এক বিশৃঙ্খল সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার....আবার দেখা যাক...হ্যাঁ, এ প্রতীকের মধ্যে যেন রয়েছে বিশ্বনিখিলের এক গোপন নমুনা—এক গোপন নকশা। তারকা-পুঞ্জ এবং গ্রহজগৎগুলি এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করে রাখা হয়েছে যে তাদের বাইরে মহাবিশ্বের মহাশূন্যতা আর মহাবিশালতার একটা ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়।

কোন্ শয়তানী শিল্পকলা এই বুদ্ধির অগম্য দুঃস্বপ্নের আতঙ্ককে সৃষ্টি করেছে তা পিটার বলতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত দুঃস্বপ্ন যেন একত্রিত হয়ে এক মহাদুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করেছে এখানে। এই ভয়ঙ্কর প্রতীক যে কোন মানব-শিল্পীর শিল্পকর্ম—এটা ভাবতেও পিটারের প্রবৃত্তি হয় না। পিটার ভাবে দরজার ঐ প্রতীক মূর্তিটার মধ্যে রয়েছে কোন অশুভ অন্তর্নিহিত অর্থ—কোন রূপক তাৎপর্য রয়েছে ঐ বুদ্ধির অতীত প্রতীকের অন্তরালে। বুদ্ধির অতীত ঐ অদ্ভুত অজানা দেহের পটভূমিকায় সাত সাতটি দেহ যেন কোন গুপ্ত মহা আতঙ্কের প্রতীক। মানবীয় দেবমণ্ডলীর অন্তরালে থেকে এই মহা আতঙ্ক যেন নিখিল বিশ্বকে শাসন করছে—নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপ।

পিটার যতই দেখতে লাগল ততই প্রতীকটির জটিল রূপোলী গোলকধাঁধায় তার মন ডুবে যেতে লাগল। এ প্রতীক মূর্তি যে দেখে সে আবার—বারবার

দেখতে বাধ্য হয়। এ মূর্তি যেন সম্মোহন করে। এই মূর্তির দিকে তাকালে জীবনের অর্থ সম্বন্ধে নানা চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে এসে পড়ে। জীবনের অর্থ আর তাৎপর্য নিয়ে ক্রমাগত চিন্তা করতে করতে অনেক দার্শনিক উন্মাদ পর্যন্ত হয়ে যান। কি ভয়ানক চিন্তা!

এ সব বিষয়ান্তরের চিন্তা ভাবনায় পিটারের মন ডুবে গিয়েছিল। বাবার রুক্ষকণ্ঠস্বরে সে যেন জেগে উঠল—পারিপার্শ্বকতা সম্বন্ধে সচেতন হল। সারাটা সকাল বাবা কম কথাবার্তা বলেছেন। কথাবার্তার ধরন ছিল কাটখোট্টা—আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত। অন্য কিসের চিন্তায় যেন বাবা স্যার রোনাল্ডের সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়েছল। কিন্তু এবার তিনি যেসব কথা বললেন তা ছিল ব্যগ্রতা আর উৎসুক্যে-ভরা। এই ব্যগ্রতা....এই উৎসুক্য চিনতে পিটারের ভুল হল না। স্যার রোনাল্ড বলছিলেন ঃ

'হ্যাঁ, এই সেই জায়গা—না কোন ভুল নেই। পাণ্ডুলিপিতে লেখা দরজাটাও আমরা পেয়ে গিয়েছি। এইবার বুঝতে পারছি স্যারাসেনদের আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে প্রিন কি বোঝাতে চেয়েছেন। তিনিও 'দরজার উপর প্রতীক'-এর তাৎপর্য এবং অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা এই প্রতীকমূর্তিটার ছবি তুলব। স্থানীয় লোকেরা যদি আপত্তি না করে তবে ঐ মূর্তি দরজা থেকে খুলে আমরা সঙ্গে করেও নিয়ে যেতে পারি।'

বাবার কথাগুলোর মধ্যে একটা গোপন আনন্দ...একটা গোপন তৃপ্তি যেন লুকিয়েছিল। এটা পিটারের পছন্দ হল না। বরং বাবার কথাগুলোতে সে যেন আরো ভয় পেল। এক অজানা আশঙ্কায় তার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেল। আতঙ্কের একটা তুহিন শীতল স্রোত যেন বয়ে গেল তার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে।

হঠাৎ পিটারের মনে হল সত্যিই তো বাবার সম্বন্ধে সে কত কম জানে। কিছুদিন ধরে বাবা যে গোপন ডাকিনী-বিদ্যার চর্চা করছেন সে সম্বন্ধে তো পিটারের কিছুই জানা নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মনে পড়ল কায়রো লাইব্রেরীতে সযত্নে সংরক্ষিত ডাকিনীবিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকখানা মোটা সোটা পুঁথির কথা।

পিটারের মনে পড়ল কাল রাতের কথা। গভীর রাতে বাবা একা একা বেরিয়েছিলেন। বলির রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিলেন মরুভূমির শুকনো বালিরাশির উপর। তারপর? হ্যাঁ, সত্যিই আকাশ থেকে নেমে এসেছিল এক ঝাঁক কালো বাদুড়। সাদা ছাগলের রক্ত পান করে বাদুড়ের দল বুঝি তৃপ্ত হয়েছিল। সীমাহারা মরুর বুকে মরা চাঁদের হলদে আলোয় বাবাকে তখন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন সুদূর অতীতে কোন এক প্রেত-উপাসক উন্মাদ পুরোহিত।

কাল রাতে অতীতের বন্ধ দরজা যেন খুলে গিয়েছিল। আচ্ছা, বাবা কি সত্যিই এসব অর্থহীন আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করেন? নাকি তিনি জানেন যে এসব ব্যাপারই হল আসল সত্যি!

না, পিটার আর ভাবতে পারে না। ওর যুক্তিবাদী মন যেন ক্রমেই হেরে যাচ্ছে। হার মানছে অতীতের অন্ধবিশ্বাসের কাছে। কিন্তু কেন? কেন এরকম হল? শুধুই কি কেবল ভিন্ দেশের ভিন্ পরিবেশের জন্য?

বাবার কথায় ঘোর কাটল পিটারের।

'এইবার!' বৃদ্ধ স্যার রোনাল্ডের কণ্ঠে বিজয়ের উল্লাস, আমার সঙ্গেই তো ছুরি রয়েছে। বাছা, তুমি একটু পিছনে সরে দাঁড়াও।

আতঙ্কিত এবং মন্ত্রমুগ্ধ চোখে পিটার দেখল যে তার বাবা ছুরির মাথাটা সাত নম্বর মাথার তলায় ঢুকিয়ে দিলেন। এ মাথা হল প্রেত-পুরীর প্রহরী-দেবতা অনুবিসের। রূপোর উপর ইস্পাতের ঘষা লাগায় কর্কশ শব্দ উঠল। শেষপর্যন্ত ইস্পাতের চাপের কাছে রূপোকেই হার মানতে হল।

লুকানো 'পিভট' বা ঘোরানোর যন্ত্রের উপর ঘুরে যায় শিবা-মুখ অনুবিসের মাথা। সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন করে ধাতব শব্দ তুলে খুলে যায় সেই বিরাট দরজা। ধাতব শব্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে উন্মুক্ত পাতালপুরীর ছাতা-ধরা, দুর্গন্ধময় গভীরতার কোণে কোণে.....রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

অদূরের অন্ধকার পাতালপুরী তুচ্ছ দুটি মানুষের সীমাহীন স্পর্দ্ধা দেখে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওদের দু'জনকে গ্রাস করবার জন্যই যেন বিরাট হাঁ করল। পিটারের শরীরটা কাঁপতে লাগল থর থর করে। স্যার রোনাল্ডও কি কাঁপছেন!

পাতালপুরীর গহন গভীর সত্যিই ছাতা ধরা। যুগ যুগ ধরে বন্ধ থাকবার পর পাতালপুরীর দরজা খুলেছে। ভিতর থেকে আসছে অতি কটু দুর্গন্ধ। এ পূতিগন্ধ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ হল কবরভূমির পচা দুর্গন্ধ।

হ্যাঁ ঠিক তাই। মিশরের অধিকাংশ সমাধিভূমিতে যে 'ন্যাট্রন'-এর গন্ধ পাওয়া যায় এ গন্ধ মোটেই সেরকম নয়। সমাধিগৃহে মৃতদেহের পচন নিবারণকারী মশলা থেকে যে গন্ধ নির্গত হয় এই তীব্র গন্ধের সঙ্গে তারও অনেক পার্থক্য। এই উৎকট গন্ধ দেহ-মনকে যেন মুহূর্তের মধ্যে অবশ করে দেয়। এ যেন মৃত্যুর ঘনীভূত নির্যাস!

ছাতা-ধরা শুকনো হাড়, পচা মাংস আর বহুদিনের পুরোনো গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলোকে একসঙ্গে মেশালে যে রকম শ্বাসরোধকারী উৎকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, এ

যেন ঠিক সেই রকম বীভৎস গন্ধ।

দীর্ঘকালের বন্ধ পাতালপুরী ভরে গিয়েছিল বিষ-বাষ্পে। এবার পথ খোলা পেয়ে আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে যেতে লাগল। বিষাক্ত বাতাসের তেজ একটু কমতেই স্যার রোনাল্ড আর দেরী করলেন না, খোলা দরজা পথে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তাঁর পিছনে অনেক ধীরে ধীরে পা ফেলে অজানা পাতালপুরীতে ঢুকল তরুণ পিটার।

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্যার রোনাল্ড 'করিডোর' বরাবর তেত্রিশটা ঢালু সিঁড়ি পেরিয়ে এলেন। পাণ্ডুলিপিতে এরকমভাবে এগিয়ে যাবার কথা লেখা রয়েছে। তারপর লণ্ঠন হাতে বৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুবিসের প্রহেলিকাময় বিরাট প্রস্তর মূর্তির কাছে এসে পড়েন। সোজাসুজিভাবে তাকান রহস্যময় মূর্তিটির দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে প্রাথমিক আতঙ্কের ভাবটা কেটে গেল; এ সময় পিটারের মনে পড়ছিল অতীতের নানা ঘটনার কথা। স্যার ডোনাল্ডের কণ্ঠস্বরে পিটারের অতীতের স্মৃতিচারণার সুরটা কেটে গেল। স্যার রোনাল্ড ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন। কে জানে জোরে কথা বললে মরণলোকের অতন্দ্র প্রহরী প্রভু অনুবিস ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন। অতিকায় পাথুরে দেবতার পলকহারা দুটি চোখে গভীর ভ্রূকুটি। তুচ্ছ দুটি মানুষের চরম স্পর্দ্ধা দেখে দেবতা যেন ক্রোধে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। দেবতার দুটি পাথুরে চোখে যেন একই সঙ্গে ঘৃণা, অমঙ্গল আর চেতনার সংকেত। অন্ধকার পাতালপুরীতে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় অনুবিসের পাথুরে মুখের রেখাগুলো যেন ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে। একি কেবল আলো-আঁধারির কারসাজির জন্যই হচ্ছে? দেবতার পাথুরে মুখে ছেনি দিয়ে খোদাই করা দাঁত বের করা হাসি। আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলায় এ হাসির ধরনটা যেন পাল্টে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পরলোকের প্রহরী এই দেবতার মুখের হাসিটা যেন বিদ্বেষপূর্ণ...দুর্বুদ্ধিজাত। এর মধ্যে যেন রয়েছে জয়গর্ব বিজয় উল্লাস! লালসাময় এই বঙ্কিম কটাক্ষ আনন্দহীন...ভীতিকর।

পিটারের মনে যে ভয়াল-ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার আশঙ্কা জেগে উঠেছিল বাবার কথা শুনে তা শতগুণ বেড়ে গেল। এক মহা-প্রচণ্ড ভীতি, যেন তার সমস্ত সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

—'শোন বাছা', স্যার রোনাল্ড বললেন, 'কায়রোর সে রাতের কথা মনে পড়ে?'

—'পড়ে,' পিটার ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল।

—'সে রাতে পাণ্ডুলিপির অনুবাদের সবটা আমি তোমায় শোনাই নি। যে মহাসত্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল তা আমি তোমাকে জানাই নি। তোমার

বোধহয় মনে আছে পাণ্ডুলিপির একটা অংশ আমি নিজের মনেই পড়েছিলাম। কিন্তু কেন? তখন তোমাকে সবটা জানতে না দেওয়ার পিছনে সঙ্গত কারণও ছিল। তুমি হয়ত বুঝতে পারতে না। সব কথা তোমাকে জানালে তুমি সম্ভবত আমার সঙ্গে এখানে আসতে অস্বীকার করতে। অথচ তোমার সাহায্য আমার খুব প্রয়োজন। তাই সব কথা আগেভাগে খুলে বলবার ঝুঁকিটি আমি নিতে চাইনি।

—'পিটার, তুমি জান না, এই মুহূর্তটা আমার কাছে কতখানি প্রত্যাশার। বছরের পর বছর আমি গোপনে এমন সব বিষয় নিয়ে পড়াশুনা এবং কাজ করেছি যাকে অধিকাংশ মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অলস কল্পনা বলে অবজ্ঞা ভরে উপহাস করবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি, তাই শিখতে পেরেছি। আমি জেনেছি প্রত্যেকটি ভুলে যাওয়া প্রাচীন ধর্মমতের পিছনে কিছুটা সত্য লুকিয়ে রয়েছে। বিকৃত ঘটনাগুলিকে যুক্তিসহ বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারলে বাস্তবতা সম্বন্ধে নতুন ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এটা আমি সম্ভব বলে মনে করি। বিচার-বিশ্লেষণ ঠিকমতো করতে পারলে কোন ঘটনার আসল রূপ অর্থাৎ বাস্তব রূপ ঠিক আমাদের মনের কাছে ধরা দেবে। বিকৃতিগুলি বিচারের সময়েই ছাঁটাই হয়ে যাবে। দীর্ঘকাল ধরে আমি এ ধরনের একটা কিছুর খোঁজে ছিলাম। জানতাম, আমি যদি এ ধরনের কোন' সমাধি আবিষ্কার করতে পারি তাহলে তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন সব প্রমাণ পাব যা দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে পারব যে সেই সুদূর অতীতের আদিম ধর্মের মধ্যেও কিছুটা সত্য রয়েছে।'

'সম্ভবতঃ এ গুপ্ত সমাধির মধ্যে একাধিক ম্যমী রয়েছে। অশুভ কালো শক্তির উপাসকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে এই গোপন সমাধি। ঐ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় পুরোহিতদের দেহাবশেষ রয়েছে এখানে। কিন্তু বিশ্বাস কর পিটার, ম্যমীর খোঁজে আমি এত কষ্ট করে এখানে আসিনি। আমি এসেছি জ্ঞানের খোঁজে। পুরোহিতদের সঙ্গে যে জ্ঞান সমাহিত হয়েছে তার খোঁজেই আমার এই অভিযান। এখানে পাব প্যাপিরাসের পাতায় লেখা আরো কত পাণ্ডুলিপি। সে সব পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে কত নিষিদ্ধ গোপন কথা। রয়েছে কত জ্ঞান....কত শক্তি! হ্যাঁ, জ্ঞান মানেই তো শক্তি!

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় স্যার রোনাল্ডের কণ্ঠস্বর তীব্র...তীক্ষ্ণ। 'শক্তি! শক্তি! এই লুকানো জ্ঞান লাভ করতে পারলে আমি কতখানি শক্তির অধিকারী হব, তা কি বুঝতে পারছ পিটার?

স্যার রোনাল্ডের গলার স্বর অস্বাভাবিক উত্তেজনায় যেন থর থর করে কাঁপতে থাকে।

—'শক্তি! আমি কালো মন্দিরের অভ্যন্তরীণ চক্রের কথা পড়েছি। এই উপাসনা পদ্ধতিকে যারা শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করত তাঁদের বলা হত 'প্রভু'। আমার সঙ্গের এই প্যাপিরাসের পুঁথিতে এসব 'প্রভু'-দের কার্যকলাপের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এতদিন আমি তোমাকে সেসব কথা জানাই নি। এখন যা বলছি মন দিয়ে শোন।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তরুণ পিটার তাকিয়ে রইল তার বাবার দিকে। স্যার রোনাল্ড বলতে লাগলেন:

'এই প্রভুরা যাদুবিদ্যার সাধারণ পুরোহিত ছিলেন না। মানুষের জগতের বাইরে অতীন্দ্রিয় লোকের সত্তাদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল—লেনদেন ছিল। তাঁদের অভিশাপকে সবাই ভয় করত। তাঁদের ইচ্ছা আর আকাঙ্খাকে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু কেন? কারণ তাঁরা অনেক কিছু জানতেন যা সাধারণ মানুষের জানার সীমার বাইরে ছিল। জ্ঞানই 'প্রভু'-দের প্রতাপশালী এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছিল। মনে হয়, এই গোপন সমাধির মধ্যে আমরা কোন গোপন বস্তু অথবা তথ্য পেয়ে যেতে পারি। হয়ত এমন কিছু পেয়ে যাব যাতে আমি অর্ধেক পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতে সক্ষম হব! মৃত্যু-রশ্মি আর সূক্ষ্মভাবে কাজ করে এমন বিষ, পুরানো পুঁথি-পত্র এবং শক্তিশালী যাদু আর সম্মোহন মন্ত্র হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে। খুঁজে পাওয়া যাবে হয়ত আরো কত বিলুপ্ত গুপ্তবিদ্যা, যাদের সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে হয়ত সেই আদিম দেবতাদের আবার নবজাগরণ ঘটবে।'

'একবার ভেবে দেখ পুত্র...এর অর্থ একবার ভেবে দেখ। এসব বিলুপ্ত গুপ্তবিদ্যার খোঁজ পেলে আমরা কি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারি।

'এসব বিদ্যার অধিকারী সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, পারবে খুশীমতো রাজ্যশাসন করতে। এ জ্ঞানের সাহায্যে সে তার শত্রুদের ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। তা-ছাড়া...তা ছাড়া এই গোপন সমাধিতে পাওয়া যাবে কত মণিরত্ন, অপরিমিত সম্পদ, স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না এমন বিপুল ঐশ্বর্য। হয়ত পাওয়া যাবে হাজার হাজার যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সম্পদ...অমিত বৈভব!

দারুণ উত্তেজনায় স্যার রোনাল্ড হাঁফাতে লাগলেন।

বাবা একেবারেই উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন, পিটার ভাবল, মুহূর্তের জন্য উন্মত্ত আবেগের এক তাড়না তাকে পেয়ে বসল। তার মনে হল এই অন্ধকার পাতালপুরী থেকে এক ছুটে বেরিয়ে যাওয়াটাই ভাল। সে এক ছুটেই পথটা পেরিয়ে যেতে পারবে। মাটির উপরে সুস্থ স্বাভাবিক জগতে ফিরে যেতে চাইল পিটার—একান্ত ভাবেই চাইল। এখানে অন্ধকার—উপরে এখন সূর্য মাথার

উপরে—চারদিক আলোয় ঝলমল। মরুস্থলীতে বইছে তপ্ত বায়ু। নিজের কপালে সেই তপ্তময় বায়ুর আলতো পরশ অনুভব করতে চাইল পিটার। মরুভূমির বাতাস তপ্ত কিন্তু অসংখ্য মৃত শতাব্দীর পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলায় দুষ্ট নয়।

পিটার হয়ত পালিয়েই যেত, কিন্তু বৃদ্ধ তার কাঁধ দু'টো চেপে ধরে অস্পষ্টভাবে কথা বলতে লাগলেন; কাজেই পিটারকে বাধ্য হয়েই অন্ধকারের রাজ্যে থাকতে হল।

বৃদ্ধ স্যার রোনাল্ড বলছিলেনঃ

"আমি যা বলছি তুমি হয়ত তা বুঝতে পারছ না। হয়ত সেটাই ভাল। সেই যাইহোক, আমি জানি আমি কি করতে যাচ্ছি। তুমিও জানবে। যা প্রয়োজনীয় আমি সেটা করে ফেলবার পর তোমার আর বুঝতে কিছু অসুবিধা হবে না। এবার আমাকে বলতে হবে পাণ্ডুলিপিতে কি লেখা ছিল; কায়রোতে পাণ্ডুলিপির যে অংশটা আমি মনে মনে পড়েছিলাম, আমি তার কথা বলছি। এখন তোমার সেটা জানা দরকার।

পিটারের মস্তিষ্কের মধ্যে কোন গোপনতম সহজাত প্রবৃত্তি যেন নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠে তাকে সতর্ক করে দিল। ওকে এবার পালাতে হবে—অবশ্যই পালাতে হবে, বাবা এবার কি ভয়ঙ্কর কথা শোনাবেন! ওর মাথার মধ্যে—মনের মধ্যে গোপনতম সহজাত প্রবৃত্তি যেন আর্তস্বরে বারবার বলতে লাগল, 'পালাও—পালাও—এইবেলা প্রাণ নিয়ে পালাও—পালিয়ে যাও—'

—কিন্তু পিটার পালাবে কি করে? বাবা যে শক্ত মুঠোয় ওর কাঁধ দু'টো ধরে রয়েছেন। এ অবস্থায় একমাত্র ধস্তাধস্তি ছাড়া পালানো অসম্ভব। কিন্তু বাবার সঙ্গে সেরকম আচরণ করবার কথা পিটার ভাবতেই পারে না। বৃদ্ধ বলে চলেছেন, তাঁর হাতের মুঠি শক্ত হলেও গলার স্বর কিন্তু কাঁপা কাঁপা।

"পাণ্ডুলিপির এ অংশে লেখা আছে কি করে দেবতা অনুবিসের এই অতিকায় মূর্তি অতিক্রম করে মূল সমাধি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা যাবে। না, এই মূর্তির দিকে তাকিয়ে কিছুই আবিষ্কার করা যাবে না। এর পিছনে কোন গোপন পথও নেই।

দেবমূর্তির দেহের মধ্যে কোন চাপ দেবার বা চালনা করবার যন্ত্রও লুকানো নেই। 'প্রভু' এবং তাঁর সহকারীরা। অনেক বেশী চালাক ছিলেন। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক উপায়ে কোন কাজই হবে না, অদূরে—ঐ সমাধিগৃহে ঢুকবার একটিই মাত্র পথ রয়েছে। আর সে পথ স্বয়ং দেবতার শরীরের মধ্য দিয়ে।"

অনুবিসের মুখোশের মতো মুখখানার দিকে আবার তাকাল পিটার। দেবতার শিবামুখ যেন এক সুচতুর বোধগম্যতায় প্রবলভাবে কুঁচকে গিয়েছে। শিবামুখ

হাসছে! নাকি এ কেবল আলো-ছায়ার কারসাজি। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় পিটার কি ভুল দেখছে?

স্যার রোনাল্ড তাড়াতাড়ি বলতে লাগলেনঃ

—'ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। কিন্তু এটাই সত্য। তোমার বোধহয় মনে আছে পাণ্ডুলিপিতে এই মূর্তি সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এই মূর্তিই হল দেবতার প্রথম প্রস্তর মূর্তি। পরবর্তীকালে তৈরী অনুবিসের অন্য মূর্তিগুলির সঙ্গে এ মূর্তির তুলনা করা চলে না, কেননা পার্থক্য রয়েছে। হ্যাঁ, বিরাট সে পার্থক্য। পুঁথিতে খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে 'শিবামুখ' এই দেবতাই পথ খুলে দেবেন। এ কথার যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। এই তাৎপর্যটা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া পুঁথিতে 'গোপন আত্মা' বলতে কি বোঝান হচ্ছে? পাণ্ডুলিপিতে এর পরের পংক্তিগুলোতেই তা ব্যাখ্যা করে বোঝান হয়েছে। বলা হয়েছে যে এই অতিকায় প্রস্তর মূর্তিটি একটি 'পিভট'-এর উপরে ঘুরে যাবে। ফলে মূর্তির পিছন দিকে খানিকটা জায়গা ফাঁক হয়ে যাবে, তখন সেই পথে ভিতরের সমাধিগৃহে প্রবেশ করা যাবে।'

—'কিন্তু প্রশ্ন হল কখন এবং কিভাবে মূর্তিটা ঘুরবে?'

—'এ প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে পাণ্ডুলিপিতে। বলা হয়েছে এই মূর্তি যখন মানবীয় চেতনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে তখন, এবং কেবলমাত্র তখনই মূর্তিটি ঘুরে যাবে।

পাগল...পাগল...সবাই পাগল...পিটার ভাবল সে পাগল, তার বাবা পাগল, প্রাচীন প্রেত পুরোহিতেরা পাগল, এমনকি অনুবিসের এই অতিকায় প্রস্তর মূর্তিটাও পাগল। তারা এক বিশৃঙ্খল জগতের কতকগুলি উন্মাদ সত্ত্বা!

"এসবের অর্থ একটাই", কাঁপা কাঁপা গলায় স্যার রোনাল্ড বললেন, 'দেবতা অনুবিসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি নিজেকে সম্মোহিত করব। নিজেকে ঠিকমতো সম্মোহিত করতে পারলে আমার আত্মা দেবতার পাথুরে দেহের মধ্যে ঢুকবে। পাথরের মূর্তি হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত। তখন? তখনই মূর্তি ঘুরবে। শিবামুখ দেবতা সমাধিগৃহে ঢুকবার পথ খুলে দেবেন।

পিটারের রক্ত যেন শিরায় শিরায় জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হচ্ছে।

'এটা কোন অদ্ভুত বা উদ্ভট ধারণা নয়। ভারতের যোগীদের কথা আমি পড়েছি। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে সমাধির সময় তাঁরা তাঁদের উপাস্য দেবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, এই আত্ম-সম্মোহন সব জাতির ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই দেখা যায়। এটা সাধনার একটা স্তর। সম্মোহনবিদ্যার চর্চা করেছে। প্রাচীন মিশরের পুরোহিতেরাও এই বিদ্যার গূঢ় রহস্য ভেদ করতে পেরেছিলেন। মনে হয়, আমিও এ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছি। সুতরাং আমি যা করতে যাচ্ছি, তা আমার জানা

আছে। আমি নিজেকে সম্মোহিত করব, আমার আত্মা বা চেতনা প্রবেশ করবে ঐ পাথরের মূর্তির মধ্যে। জড়ের বুকে জাগবে চেতনা; প্রাণহীন হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত। মূর্তি ঘুরবে। খুলে যাবে প্রবেশ পথ। এমনি করেই আমি 'প্রভু' আর তাঁর সহকারীদের বন্ধ সমাধিগৃহের দরজা খুলব।'

—'কিন্তু অভিশাপ!' পিটার বিড় বিড় করে বলে উঠল, 'সেই অভিশাপের কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

শেষপর্যন্ত পিটার বুঝি আবার কথা খুঁজে পেল।

স্যার রোনাল্ড জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন ছেলের মুখের দিকে।

'অবিশ্বাসীদের উপর অভিশাপ নেমে আসবে—তারা আর প্রাণ নিয়ে মানুষের জগতে ফিরে যেতে পারবে না—এমন সব কথাও তো পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে।' দুর্বল কণ্ঠে পিটার বলল।

—'ডাহা দমবাজি। পুরো ধাপ্পা! ছেলের দিকে তাকিয়ে স্যার রোনাল্ড বললেন! তাঁর কণ্ঠস্বরে উন্মত্ত দৃঢ়তা। জ্বলজ্বলে চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, 'এসব অভিশাপের কথা লেখা হয়েছে সমাধিগৃহ যারা লুঠ করে তাদের ভয় দেখাবার জন্য। তা সে যাই হোক, আমাকে এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। তোমার কাজ কিছু শক্ত নয়। তোমাকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে। আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলেই পাথরের মূর্তিটা ঘুরবে। বেরিয়ে পড়বে ভিতরে ঢুকবার পথটা। সঙ্গে সঙ্গে সেই পথ ধরে সমাধিগৃহে ঢুকে যাবে। তারপর ভিতর থেকে ফিরে এসে আমার অচেতন দেহটাকে জোরে ঝাঁকুনি দেবে। তা হলেই আমার সমাধি ভাঙবে—জ্ঞান ফিরে আসবে। আমিও স্বাভাবিক হয়ে উঠব।

বাবার কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা কর্তৃত্বের ভাব ছিল যে সেকথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না—অমান্য করা যায় না। তরুণ পিটার কোন প্রতিবাদ করতে পারল না।

বাবার নির্দেশে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরল পিটার। আলোর রশ্মি গিয়ে পড়ল অনুবিসের শিবামুখের উপর। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ও। বাবা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অনুবিসের পাথুরে শৃগাল-চোখ দুটির দিকে। স্যার রোনাল্ডের সমস্ত দৃষ্টি যেন কেন্দ্রীভূত হল সেখানে।

ঐ বিস্ফারিত পাথরের চোখ দুটিতে যেন গোপন প্রাণের ইঙ্গিত। এ ইঙ্গিত তাদের মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে, মনকে করেছে শঙ্কা-বিহ্বল।

এ এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এ দৃশ্যের অভিনেতারা নীরব ও নিশ্চল। দুটি মানুষ আর বার ফুট উঁচু এক বিরাট দেবমূর্তি ভূগর্ভের অন্ধকার পাতাল পথে মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এরকম দৃশ্য দেখা যায় না। এ দৃশ্য দেখলে অতিবড় সাহসী মানুষও হতচকিত হবে।

স্যার রোনাল্ডের ঠোঁট কাঁপছে। ইতিহাসের আদিম ঊষায় প্রাচীন মিশরের পুরোহিতকুল যে ভাষায় প্রার্থনা করত, সেই ভাষাতেই প্রার্থনা করছেন তিনি। আপনমনে—বিড় বিড় করে। অনুবিসের শ্বাপদ কপালে অন্ধকারে ঘেরা এক আলোক বৃত্ত। স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন বৃদ্ধ স্যার রোনাল্ড। ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টি হয়ে গেল ঘোলাটে-ঘষা কাঁচের মতো। চোখের পলক পড়া থেমে গেল। মণি দু'টো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল এক অদ্ভুত নৈশদৃষ্টিহীনতার আগুনে। মণি দু'টো প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে উঠছে—জ্বলছে, যেন বহ্নিময় দুটি গোলক। স্যার রোনাল্ডের দেহটা যেন বেঁকে যাচ্ছে—যেন বিধ্বস্ত হচ্ছে। হ্যাঁ, তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কোন রক্ত-শোষক পিশাচ যেন তাঁর প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে শোষণ করে নিচ্ছে।

তারপর?

আতঙ্কভরা চোখে পিটার দেখল বাবার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ—কেমন যেন পাথর হয়ে গেল! সে মুখে যেন আর এক ফোঁটা রক্তও অবশিষ্ট নেই। বাবার শিথিল দেহটা নিঃশব্দে বসে পড়ল পাতালপুরীর অন্ধকার পথের পাথুরে মেঝের উপর। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি এক মুহূর্তের জন্যও অনুবিসের পাথুরে চোখ দুটি থেকে সরে গেল না। পলকহীন দৃষ্টিহারা চোখ দু'টি চেয়ে রইল শিবামুখ দেবতার দু'টি শৃগাল-চক্ষুর দিকে।

পিটার বাঁ হাতে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে আছে। দারুণ আতঙ্কে ওর হাতখানা কাঁপছে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। মিনিটগুলো যেন নিঃশব্দে ছুটছে। এখানে মৃত্যুর হাওয়া। পাতালের এই মরণপুরীতে সময়ের কোন অর্থ নেই—কোন মূল্য নেই।

পিটার আর ভাবতে পারছে না। সে আগেও বাবাকে আত্ম-সম্মোহনের চর্চা করতে দেখেছে। তা করা হত আয়না আর আলোর সাহায্যে। একজন দক্ষ সম্মোহনকারীর হাতে এ-ধরনের সম্মোহন সম্পূর্ণ নিরাপদ, কোন ক্ষতিরই সম্ভাবনা নেই সেখানে।

কিন্তু এখানে?

এখানকার পরিবেশটাই তো সম্পূর্ণ আলাদা। কাজটাও তো অত্যন্ত অদ্ভুত রকমের। বাবার আত্মা কি সত্যিই মিশরীয় দেবতার পাথুরে দেহের মধ্যে ঢুকতে পারবে? যদি ঢুকতে পারে তবে সেই অভিশাপের কি হবে? বাবা আর ছেলের

মাথার উপর কি কুহেলী ঘেরা সুদূর অতীতের কোন এক মিশরীয় পুরোহিতের অভিশাপ নেমে আসবে? এ সব প্রশ্ন যেন ক্ষীণ কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে তার অস্তিত্বের অন্তরালে।

—কোন এক গোপন কোণে। কিন্তু সবার উপরে এক সর্বগ্রাসী ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলল পিটারের সমস্ত সত্ত্বা।

পরিবর্তনটা নিজের চোখেই দেখল পিটার। দেখে তার ভয় যেন এক উন্মাদ সঙ্গীতের তীব্রতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেল!

ভয়! ভয়! ভয়ের স্রোত বইছে চারপাশে। পিটার যেন ভাসছে সীমাহীন ভয়ের সমুদ্রে।

সহসা বাবার চোখ দুটো নিভু নিভু আগুনের মতো কেঁপে কেঁপে জ্বলে উঠে নিভে যায়। বাবা চেতনা হারান।

কিন্তু পিটারের সামনে দেবতার চোখ দু'টি—অনুবিসের চোখ দুটি আর পাথরের চোখ নয়।

দেবতার অতিকায় প্রস্তরমূর্তি এখন প্রাণবন্ত। জড়ের বুকে জেগেছে চেতনা! মূর্তির চোখ দুটি এখন জীবন্ত মানুষের চোখের মতই দৃষ্টিশক্তি পেয়েছে। চোখ দুটি জ্বলছে!

বাবা ঠিকই বলেছেন। তাঁর পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন। আত্ম-সম্মোহনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্যার রোনাল্ডের চেতনা প্রবেশ করেছে পাথুরে মূর্তির জড় দেহের মধ্যে—জাগ্রত হয়ে উঠেছেন পরলোকের প্রহরী—শিবামুখ দেবতা অনুবিস।

হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় আসতেই পিটার দারুণ আতঙ্কে হাঁপাতে থাকে। এ যেন মুমূর্ষু মানুষের অতিকষ্টে শ্বাসগ্রহণ আর পরিত্যাগ। পিটার ভাবেঃ

এ পর্যন্ত যদি বাবার মতবাদটা সঠিক হয়ে থাকে তবে বাকীটার কি হবে?বাবা তো বলেছেন যে, একবার পাথুরে মূর্তির মধ্যে ঢুকতে পারলে তাঁর আত্মা মূর্তিকে পথ খুলে দেবার নির্দেশ দেবে। কিন্তু সে রকম কিছুই তো ঘটছে না। পথ তো খুলে যাচ্ছে না। কোথায় ভুল হল? কি ভুল হল?

বাবার অচেতন দেহটা লুটিয়ে পড়েছে পাতাল পথের পাথুরে মেঝেতে। পিটারের সামনে অনুবিসের অতিকায় মূর্তি। মূর্তির চোখ দুটো দানবীয় চেতনায় জ্বলছে!

দারুণ আতঙ্কে পিটারের সমস্ত শরীরটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। সে ঝুঁকে পড়ে বাবার অচেতন দেহটা পরীক্ষা করে।

বৃদ্ধ স্যার রোনাল্ডের শরীর নিস্তেজ...শীতল...প্রাণহীন! স্যার রোনাল্ড বার্টন মারা গিয়েছেন!

বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের এক শোচনীয় পরিণতি! তাঁর জীবনের এ কি করুণ পরিসমাপ্তি।

দেবতার অভিশাপ তাহলে নামল।

পিটারের মনে পড়ল পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত অথচ রহস্যময় সমাধানবাণীর কথা।

'...কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান! যারা অবিশ্বাসী তারা কিন্তু মরবে। হ্যাঁ, তাদের মরণ অনিবার্য। তারা হয়ত ভগবান অনুবিসকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারবে, কিন্তু মহান 'প্রভু' জানতে পারবেন অনধিকারীর অশুভ আবির্ভাবের কথা। শিবামুখ দেবতা আর মানুষের জগতে তাদের প্রত্যাবর্তন করবার অনুমতি দেবেন না। কেননা প্রভু অনুবিসের এই প্রথম প্রস্তর মূর্তি বাস্তবিকই অদ্ভুত এবং রহস্যময়। এই মূর্তির মধ্যে রয়েছে বুদ্ধির অনধিগম্য এক গোপন আত্মার অস্তিত্ব। রয়েছে এক সুপ্ত চেতনাশক্তি।'

গোপন আত্মা! সুপ্ত চেতনাশক্তি! দারুণ আতঙ্কে কপালের দুই পাশ দপ্ দপ্ করছে, দৃষ্টি হয়ে আসছে আচ্ছন্ন...তবুও লণ্ঠনটা উঁচু করে পিটার আর একবার দেবতার মুখের দিকে তাকাল। আবার দেখল অনুবিসের পাথুরে মুখে শ্বাপদের দন্তবিকাশ। মুখোসের মতো মুখখানায় চোখ দুটি কিন্তু জীবন্ত। এক গোপন প্রাণের অঙ্কুর যেন জেগে উঠেছে দেবতার পাষাণ দেহে।

দেবতার চোখে পাশবিক অশুভ অগ্নিময় দৃষ্টি। অন্ধকার পাতালপুরীর এই প্রাচীন দেবতা সবকিছুই জেনেছে—সবকিছুই বুঝেছেন। কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়। দেখতে দেখতে পিটার যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে চিন্তা করে না—চিন্তা করতে পারে না। সে কেবল জানে, তার বাবা মরে গিয়েছেন, সামনে এই পাথরের মূর্তিটাই কোন না কোনভাবে তার বাবাকে নিষ্ঠুরভাবে তার বাবাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে নিজে বেঁচে উঠেছে—

উন্মত্ত মানুষের মতো তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার করে পিটার ছুটে গেল পাথরের মূর্তিটার দিকে। ভয়? কোথায় ভয়? আর কোন ভয় নেই। ভয়ের সমুদ্র পার হয়ে এসেছে পিটার।

পাগলের মতো মূর্তিটার পাথুরে শরীরে পিটার ঘুসির পর ঘুষি মারতে লাগল। তার আঙুলের গাঁটগুলি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। রক্ত-ঝরা হাতে অনুবিসের ঠাণ্ডা পা দু'খানা আঁকড়ে ধরে পিটার পাগলের মতো নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। কিন্তু তবুও দেবতার দেহে কোন আলোড়ন জাগল না। শুধু চোখ দু'টো জ্বলতে লাগল এক মহাআতঙ্কবহ অশুভ চেতনায়।

পাগল হয়ে গিয়েছে পিটার। প্রলাপের ঘোরে দেবতাকে অভিশম্পাত দিতে

লাগল। উৎপীড়িত মানুষের মতো যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বরে প্রলাপ বকতে বকতে পিটার অনুবিসের বিদ্রুপভরা মুখ লক্ষ্য করে উঠতে থাকে। মূর্তির পাথুরে দেহ বেয়েই উঠতে থাকে। তাকে জানতেই হবে শিবামুখ দেবতার ঐ জ্বলন্ত দৃষ্টির অন্তরালে কি লুকিয়ে রয়েছে! দেখবে সেই অলৌকিক অস্তিত্বকে। ধ্বংস করবে তার অমঙ্গলময় অস্বাভাবিক জীবনকে।

উঠতে উঠতে বাবার কথা ভেবে পিটার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মূর্তির মুখের কাছাকাছি উঠতে কতটা সময় লাগল, তা পিটার বলতে পারে না। শেষ ক'টি মিনিট তার কাছে ছিল এক মহা দুঃস্বপ্নের উন্মত্ততার রক্তরাঙা প্রলাপের মতো। যখন চেতনা ফিরল তখন পিটার দেখল যে সে মূর্তির কাঁধ ধরে ঝুলে রয়েছে। তার পা দু'খানা জড়িয়ে ধরছে দেবতার উদরদেশকে আর সে নিজে তাকিয়ে আছে মূর্তির ভয়ঙ্কর জীবন্ত চোখ দুটির দিকে।

পিটার তাকিয়ে থাকে...সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকে ভয়ঙ্কর চোখ দুটির দিকে।

আচম্বিতে অনুবিসের শিবামুখে জেগে ওঠে প্রাণের স্পন্দন। এ অস্বাভাবিক অপ্রাকৃত জীবন মৃত্যুর মতই ভয়ঙ্কর। দেবতার বিরাট মুখখানা কুঁচকে কুটিল হয়ে ওঠে। ঠোঁট দুটো সরে যায়। বেরিয়ে পড়ে ঝকঝকে দাঁতের সারি...দুটো হিংস্র শ্বদন্ত। এক অপার্থিব হিংস্র উল্লাসে মুখটা খুলে যায়। মুখের ভিতরটাকে মনে হয় এক অন্ধকার গুহার মতো। শিবামুখের দাঁতগুলি ফাঁক হয়ে যায় এক ভয়ঙ্কর লোভে....এক উন্মত্ত লালসায়।

অনুবিসের বিরাট হাত দুটি পিটারকে জড়িয়ে ধরে পাথুরে আলিঙ্গনে। থাবার মতো আঙুলগুলো তার কম্পমান সঙ্কুচিত গলদেশকে চেপে ধরে হিংস্র পাশব উল্লাসে। শিকারী-সাপ যেমন শিকারকে জড়িয়ে ধরে চূর্ণ করে ফেলতে চায়। প্রবল ক্ষুধায় লোভী মুখের ধারালো দাঁতগুলো স্পর্শ করে পিটারের কণ্ঠদেশ..দাঁতগুলো বসে যায়...বিঁধে যায়।

এইভাবেই শেষ হয়ে যায় হতভাগ্য পিটারের জীবন। সমাধিভূমিতে অনধিকার প্রবেশকারী বাবা আর ছেলে কেউই বেঁচে রইলেন না। অভিশাপ নেমে এল দু'জনের জীবনেই। অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল সেই স্মরণাতীতকালের অভিশাপ।

কিন্তু মৃত্যুর আগে শেষ মুহূর্তে পিটার যা দেখেছিল, তাতে এ নিষ্ঠুর মরণকে সে বুঝি স্বাগতই জানিয়েছিল।

স্থানীয় লোকেরা পিটারের রক্তহীন দেহটাকে আবিষ্কার করে। ভেঙে-চুড়ে তালগোল পাকিয়ে দেহটা পড়েছিল অনুবিসের বিরাট মূর্তির পায়ের তলায়। অতীতে

দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়া হত। এ যুগেও যেন নতুন করে দেবতার সামনে নরবলি দেওয়া হয়েছে। পিটারের পাশে পড়ে আছেন তার বাবা। তিনিও মৃত।

স্থানীয় মানুষেরা এই নিষিদ্ধ এবং ভুলে যাওয়া সমাধির সামনে বেশীক্ষণ জটলা করতে সাহস করে নি। পিছনের সমাধিগৃহে ঢুকবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কেউ করেনি। তারা ভূগর্ভের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল।

ফিরে এসে তারা বলল যে বুড়ো 'এফেনদি' (এফেন্দিঃ তুরস্কের সম্মানসূচক সম্বোধন বা খেতাব। মিশর একসময় অটমানতুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার ফলেই এই তুর্কী শব্দটি মিশরীয় ভাষায় এসেছে।) এবং বাচ্ছা 'এফেন্দি— এই দু'জন বিদেশীই আত্মহত্যা করেছেন। এতে কেউ আশ্চর্য হয়নি, কারণ বাবা এবং ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী অন্য কোন কারণের কথাই তাদের মনে আসে নি।

না আসাই স্বাভাবিক। কেননা ওদের মৃত্যুর পিছনের অন্য কোন সূত্র তারা খুঁজে পায়নি। ওরা যখন গর্তের মধ্যে ঢুকেছিল তখন অনুবিসের বিশাল মূর্তি ছায়ার মধ্যে শান্ত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। গম্ভীরভাবে পাহারা দিচ্ছিল সুদূর অতীতের সুগুপ্ত রহস্যগুলিকে। গোপন রহস্যগুলি এখন আবার শান্তি-ছায়ায় গোপন রাজ্যে সুরক্ষিত। কোন অনধিকারীই আর সেখানে পৌছতে পারবে না। পাতালপুরীর সমাধিগৃহের গোপনপথের প্রান্তে গম্ভীরভাবে পাহারা দিচ্ছেন শিবামুখ দেবতা অনুবিস। এখন আর তাঁর পাথরের চোখ দুটিতে প্রাণের কোন ইঙ্গিত নেই। দেবতা এখন শান্ত।

সুতরাং কেউ জানবে না মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে পিটার বার্টন কি দেখেছিল? কোনদিন জানবে না। কেউ জানবে না মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে উপর দিকে তাকিয়ে কি দেখে সে মৃত্যুকে মুক্তি বলে স্বাগত জানিয়েছিল।

পিটার জেনেছিল কোন্ প্রাণশক্তি জাগ্রত করে তুলেছে পাষাণ দেবতাকে। পাথরের মূর্তির মধ্যে কি রয়েছে ভয়ঙ্করভাবে...বিকৃত রূপে। কোন্ শক্তিকে বাধ্য করা হচ্ছে তাকে হত্যা করতে। কেননা শেষবারের মতো অনুবিসের মুখের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেয়েছিল দুটি চোখ।

চোখ দুটি ব্যথায় কাতর...যন্ত্রণায় দীর্ঘ...উৎপীড়নে আর্ত...

চোখ দুটি তার বাবার...প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার রোনাল্ড বার্টনের।

রাতের কণ্ঠস্বর

উইলিয়াম হোপ হজসন

অন্ধকার। সে এক তারাহারা রাত। আমরা রয়েছি উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে। পালে বাতাস না থাকবার জন্য আমাদের এখানেই শান্তভাবে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আমাদের সঠিক আবাস-স্থলের কথা বলতে পারব না। কারণ এক ক্লান্তিকর নির্বাক সপ্তাহকাল ধরে সূর্যদেব মুখ লুকিয়ে রেখেছেন হাল্কা কুয়াশার আড়ালে। মনে হচ্ছে এ কুয়াশা ভেসে আছে আমাদের মাস্তুল উঁচুতে। মাঝে মাঝে এ কুয়াশার আবরণ নীচে নেমে আসছে। ঢেকে ফেলছে চারপাশের সমুদ্রকে।

হাওয়া নেই, কাজেই আমাদের জাহাজটাকে বেশ দৃঢ় করেই ধরে রেখেছিলাম আমরা। ডেকে মানুষ বলতে আমি একলা। নাবিক বলতে আছে দুটি মানুষ আর একটি বাচ্চা। তারা নিজেদের আস্তানায় ঘুমিয়ে আছে। আমার বন্ধু উইল হল এই ছোট্ট জলযানখানার মালিক। সে রয়েছে জাহাজের পিছনদিকে তার নিজের ব্যাঙ্কে। ছোট্ট কেবিনের পোর্টের পাশে তার ব্যাঙ্ক।

আমাদের জলযানের চারপাশে নিরন্ধ্র অন্ধকার। আচমকা সেই অন্ধকারের কালো যবনিকা ভেদ করে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

'স্কুনার, অ্যাহোয়! ওহে স্কুনার শোন' (স্কুনার—যে পাল-তোলা জাহাজে দুই বা তার বেশী মাস্তুল থাকে। অ্যাহোয়—নাবিকদের মধ্যে পরস্পরকে ডাকবার রীতি! নাবিকদের ভাষায় শব্দটির অর্থ হল 'ওহে শোন'।)

কণ্ঠস্বরটা এত অপ্রত্যাশিত যে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

অন্ধকারের ভিতর থেকে কণ্ঠস্বরটা আবার ভেসে এল। কেমন অদ্ভুত অপরিষ্কার ঘড়ঘড়ে অমানবিক কণ্ঠস্বর। আঁধার সাগরের বুকে রয়েছে এই অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত অমানবীয় উৎস।

—'স্কুনার...ওহে স্কুনার!'

—'এই যে!' স্তম্ভিতভাবটা কাটিয়ে আমিও চীৎকার করে বললাম।

—'কে তুমি? কি চাও?'

আমি আবার বুদ্ধি আর বিবেচনা শক্তি যেন ফিরে পেয়েছি।

—'ভয় পাবেন না' অন্ধকারের মধ্য থেকে অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে উত্তর ভেসে এল,

হয়ত ঐ অদ্ভুত কণ্ঠের অধিকারী আমার স্বরের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতির পরশ খুঁজে পেয়েছে, 'আপনার ভীত হবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার ক্ষতি করবার শক্তি বা সামর্থ্য আমার নেই।'

—' আপনি কে?'

—'আমি? আমি এক হতভাগ্য বৃদ্ধ...মানুষ।' বক্তব্যের মাঝখানে বিরতিটুকু কেমন যেন কানে বাজল। 'বৃদ্ধ' আর 'মানুষ' এই শব্দ দুটির মাঝখানে এমন অদ্ভুত বিরতি কেন! পরে অবশ্য আমি এই বিরতির তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলাম।

—'তাহলে কাছে আসছেন না কেন?' আমি একটু বিরক্তিভাবেই জিজ্ঞেস করলাম। আমি যে একটু ঘাবড়ে গিয়েছি, কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত ছিল, আর সে ইঙ্গিতটা আমি মোটেই পছন্দ করিনি।

—'আমি...আমি....পারি....না....আমি কাছে আসতে পারি না। সেটা নিরাপদ হবে না...মোটেই নিরাপদ হবে না। ...আমি...,' কণ্ঠস্বর থেমে গেল। চারপাশ আবার নিস্তব্ধ।

—'আপনি কি বলতে চাইছেন?' আরও অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম,'কি নিরাপদ হবে না? আপনি কোথায়?'

কান পেতে রইলাম কিছুক্ষণ! কিন্তু অন্ধকারের মধ্য থেকে কোন উত্তর এল না। আচম্বিতে একটা অনির্দিষ্ট সন্দেহ আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। অবশ্য কিসের সন্দেহ তা আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না! ছুটে গিয়ে একটা লণ্ঠন নিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ডেকে আঘাত করে উইলকে জাগাবার চেষ্টা করলাম। তারপর আবার ফিরে এলাম যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম। রেলিং-এর ওপারে নিঃশব্দে অনন্ত সমুদ্রের দিকে আলো ফেললাম, কিন্তু নিরন্ধ্র অন্ধকারের কালো যবনিকা ভেদ করে লণ্ঠনের হলুদ আলো বেশীদূর যেতে পারল না।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! সাগরের দিকে আলো ফেলতেই একটা অস্পষ্ট অবরুদ্ধ আর্তস্বর আমার কানে ভেসে এল। তারপরেই শুনতে পেলাম ছলাৎ করে একটা শব্দ। কেউ যেন আচমকা জলের মধ্যে দাঁড় ফেলল। আমি কিছু দেখছি, এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না; তবে মনে হচ্ছে আলোর প্রথম রশ্মি গিয়ে যখন পড়ল তখন জলের উপর কিছু যেন একটা ছিল! আর এখন? জলের উপর কাউকে দেখা যাচ্ছে না—কিছু দেখা যাচ্ছে না।

—'এই যে কে কথা বলছিলেন? কোথায় গেলেন? এ আবার কি রকম নির্বোধ রসিকতা!'

কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। কেবল দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল অস্পষ্ট ছপ্-ছপ্ শব্দ। কেউ যেন দাঁড় বেয়ে নৌকা নিয়ে গা-ঢাকা দিচ্ছে রাতের অন্ধকারে।

জাহাজের পিছন দিকটার পাটাতনের ফোকরের দিক থেকে উইল-এর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

—'ব্যাপার কি জর্জ?'

—'এখানে এস, উইল!' আমি বললাম।

—'কি হয়েছে?' ডেক দিয়ে আসতে আসতে উইল বলল।

—একটু আগে যে অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল, তার কথা ওকে বললাম। উইল আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল। তারপর এক মুহূর্ত নীরব থেকে নিজের ঠোঁটের কাছে হাত দু'খানা নিয়ে চীৎকার করে ডাকল,

—'বোট অ্যাহোয়! নৌকা...ওহে নৌকা!'

অনেক দূর থেকে একটা ক্ষীণ উত্তর ভেসে এল বাতাসে। আমার সঙ্গী আবার উকিল। কিছুক্ষণ চারপাশে নীরবতা। তারপরই শোনা গেল অস্পষ্ট ছপ্ ছপ্ শব্দ। দাঁড় বেয়ে নৌকা নিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে আমাদের ছোট্ট পাল তোলা জাহাজখানার দিকে। ছপ্ ছপ্ ছপ্ দাঁড় টানবার শব্দ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট এবং তারপর স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।—'আসুন, জাহাজের কাছে আসুন।' উইল সাদর আহ্বান জানাল।

—'অলোটা সরিয়ে নিন,' আবার শোনা গেল নৈশ কণ্ঠস্বর।

—'আলো সরাব কেন? কোন্ দুঃখে সরাব?' আমি আপন মনে বিড়বিড় করে বললাম। কিন্তু উইল দেখছি ঐ রহস্যময় কণ্ঠের অধিকারীর পক্ষে। সে বলল,

—'বেশ তো ও যা বলছে তা-ই করোনা কেন।'

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। অগত্যা আলোটাকে রেখে দিলাম বুল-ওয়ার্কের তলায়।

—'আসুন কাছে আসুন,' উইল বলল।

—'ছপ্—ছপ্—ছপ্—! আবার দাঁড় টানবার শব্দ শোনা গেল। তারপর আমাদের জাহাজের খানিকটা দূরে—এই ছয় ফ্যাদম দূরে শব্দটা থেমে গেল।

—'একি থামলেন কেন? জাহাজের পাশে আসুন, উইল বলল, 'ভয় পাচ্ছেন কেন? এখানে ভয় করবার মতো কিছুই নেই!'

—'কথা দিন আলো দেখাবেন না,' অন্ধকারের ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—'তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক,' আমি ক্রুদ্ধস্বরে বললাম, 'আপনি

আলোকে এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

—'কারণ...কণ্ঠস্বর শুরু হয়েই আচমকা থেমে গেল।

—'কারণ কি...কি?' আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

উইল আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলল,

—'তুমি একটু চুপ কর জর্জ।'

—নীচু গলায় জর্জ বলল, 'আমাকে ওর সঙ্গে মোকাবিলা করতে দাও।'

রেলিং এ ঝুঁকে পড়ে উইল বলল, 'শুনুন মশাই, এ তো বেশ অদ্ভুত ব্যাপার! রাতের অন্ধকারে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে আমাদের সামনে এসে পড়েছেন। কি করে জানব আপনি আমাদের উপর কৌশল আর চাতুরী খাটাতে এসেছেন কি না?

বলছেন আপনি একা, কিন্তু না দেখে তা কি করে বুঝব? আর এই অন্ধকারে আলো ছাড়া দেখবই বা কি করে? আলোর ক্ষেত্রে আপনার আপত্তির কারণ কি?'

আবার দাঁড়ের জল কাটবার শব্দ শোনা গেল। ছপ্—ছপ্—ছপ্—। শব্দটা চলে যাচ্ছে দূরে আরও দূরে। তারপর অনেক দূর থেকে অন্ধকারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সে স্বর নিরাশায় ভরা—বেদনায় বিধূর।

—'আমি দুঃখিত—খুবই দুঃখিত! আপনাদের বিব্রত না করলেই পারতাম, আসলে আমি খুব ক্ষুধার্ত, আর সে—সেই মহিলাও খুব ক্ষুধার্ত—।

ছপ্—ছপ্—ছপ্—দাঁড়ের এলোমেলো শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল।

—'থামুন!' উইল চীৎকার করে বলল, 'আমরা আপনাকে তাড়িয়ে দিতে চাই নি। ফিরে আসুন! আপনি যখন আলো চাইছেন না তখন লণ্ঠনটা না হয় সরিয়েই রাখব।

আমার দিকে ফিরে উইল বলল,

—'এতো দেখছি এক অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার, তবে ভয় করবার মতো কিছু নেই এর মধ্যে। তোমার কি মনে হয়?'

—'না না, ভয় পাবার মতো কিছু নেই। মনে হয় আশেপাশে কোথাও ওর জাহাজ-ডুবি হয়েছিল। লোকটা বেঁচে গেছে কোনরকমে।'

—'ও আলোকে ভয় পাচ্ছে কেন?'

—'তাই তো বুঝতে পারছি না, বোধহয় কষ্টে ভয়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

ছপ্.....ছপ্....ছপ্—

দাঁড়ের জল কাটবার শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠল। অন্ধকারে অদৃশ্য আগন্তুক

এগিয়ে আসছে আমাদের জাহাজের দিকে।

—'আলোটাকে রেখে এস জর্জ।' উইল বলল। তারপর সে রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে দাঁড়ের শব্দ শুনতে লাগল। বাতিটাকে যথাস্থানে রেখে এসে উইলের কাছে এলাম।

ছপ্—ছপ্—ছপ্—

দাঁড়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

আমরা দুজনেই উৎকণ্ঠিত।

জাহাজ থেকে একটু দূরে শব্দটা থেমে গেল।

—'এবার জাহাজের পাশে আসবেন না?' স্থিরকণ্ঠে উইল বলল, 'বাতিটাকে তো সরিয়ে রাখা হয়েছে।।'

—'না—না, আমি আসতে পারি না,' অপরিচিত কণ্ঠস্বর উত্তর দিল, 'আমি কাছে আসতে সাহস করছি না। আপনাদের কাছ থেকে কিছু খাবার-দাবার পেলেও তার দাম আমি দিতে পারব না দেবার ক্ষমতা নেই আমার।'

—'ঠিক আছে। আপনি ও নিয়ে বিব্রত হবেন না', উইল বলল। তারপর একটু ইতস্তত করে আবার বলল,'আপনাকে আমাদের জাহাজে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি আসুন, যতটা খাবার নিতে পারেন নিয়ে যান।' উইলের স্বরের মধ্যে বোধকরি একটু দ্বিধার ভাব রইল।—'আপনি খুব ভাল—খুব দয়ালু। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান—তিনি সবকিছু বোঝেন। তিনি আপনার মঙ্গল করুন—'

শেষ দিকটায় আঁধার রাতের আগন্তুকের কণ্ঠস্বর কেমন যেন খসখসে আর কর্কশ হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, সেই মহিলা? যার কথা আপনি বলেছিলেন,'উইল আচমকা বলে উঠল,'তিনি কি—'

—'তাঁকে আমি দ্বীপে রেখে এসেছি,'রাতের কণ্ঠস্বর উত্তর দিল।

—'কোন্ দ্বীপে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

—'সে দ্বীপের নাম জানিনা। ভগবানের কাছে—' আচমকা শুরু হয়ে আচমকাই থেমে গেল কণ্ঠস্বর।

—'আমরা কি সেই মহিলার জন্য একখানা নৌকা পাঠাতে পারি না?' এবার উইল এ কথাটা জিজ্ঞেস করল।

—'না!' অসাধারণ জোর দিয়ে আঁধার রাতের আগন্তুক এই ছোট্ট নেতিবাচক শব্দটি উচ্চারণ করল।

—'কেন?'

—'হায় ভগবান! না! না!' কর্কশ কণ্ঠে যেন আর্তনাদই করে উঠল নীল সাগরের অজানা আগন্তুক।

কিছুক্ষণ কোন তরফেই সাড়াশব্দ নেই। তরপর একটু যেন ভর্ৎসনার সুরেই নিশীরাতের আগন্তুক বলতে লাগল,

—'আমাদের অভাবের জন্যই আমি এতদূর আসতে সাহস করেছি।—ওর যন্ত্রণা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল—খুব পীড়া দিচ্ছিল। আর আমি সহ্য করতে পারিনি। দারুণ ঝুঁকি নিয়ে এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছি।

—'আপনি যে-ই হোন না কেন একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। এক্ষুনি আসব আমি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভাড়ার থেকে নানারকমের অনেক খাবার নিয়ে এল উইল। রেলিং-এর সামনে থেকে সে বলল,

—'খাবারটা নিতে জাহাজের গায়ে নৌকা লাগাবেন না?'

—'না—না—আমার সে সাহস নেই।'

কণ্ঠস্বর শুনে আমার মনে হল যে আঁধার রাতের অতিথি তার মনের একটা তীব্র আকাঙ্খাকে দমন করল। একটা দারুণ ইচ্ছাকে যেন চুপ করিয়ে দেওয়া হল—জোর করে।

হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আমার মনের মধ্যে কতকগুলি চিন্তা এল। অন্ধকারের ঐ জীবটি ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। আর একজন মহিলার কথাও শোনা গেছে। তিনিও ক্ষুধার্ত। ওঁদের প্রয়োজন খাদ্য। উইল যথেষ্ঠ খাবার নিয়ে এসেছে ওদের জন্য। কিন্তু কোন এক দুর্বোধ্য কারণে আতঙ্কিত হচ্ছে রাতের অতিথি। সে জাহাজের কাছে এসে খাবার নিতে পারছে না। বিদ্যুৎ-চমকের মতই আমার মনে ওর সম্পর্কে একটা ধারণা এসে গেল।

আমাদের এই অদৃশ্য আগন্তুক মোটেই পাগল নয়। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কেই সে এক অসহ্য আতঙ্কের মুখোমুখি হয়েছে।

আমার মনে নানা ভাবে নানা অনুভূতির খেলা চলতে লাগল! শেষপর্যন্ত ভাবকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল সহানুভূতির ভাবটা।

—'যাকগে, জাহাজে আসবার কথা ছেড়ে দাও উইল,' আমি বললাম, 'যে কোন কারণেই হোক উনি জাহাজের কাছে আসবেন না। তুমি বরং একটা বাক্স নিয়ে এস! বাক্সটার ভিতর খাবার পুরে আমরা ওটাকে জলে ভাসিয়ে দেব। তাহলেই, আশা করি, উনি ওটা পেয়ে যাবেন।'

তাই করলাম আমরা। একটা নৌকার হুকের সাহায্যে আমরা খাবার ভর্তি

বাক্সটাকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিলাম। এক মুহূর্ত পরেই একটা মৃদু হর্ষধ্বনি শোনা গেল। এ হর্ষধ্বনি অদৃশ্য আগন্তুকের। বুঝলাম, সে খাবারের বাক্সটা পেয়েছে।

একটু পরে অদৃশ্য আগন্তুক আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। যাবার আগে সে হৃদয় উজাড় করে আমাদের আশীর্বাদ করে গেল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে আবার দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল ঃ

ছপ্—ছপ্—ছপ্!

শব্দ ক্ষীণ হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল।

—'বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেল,' একটু আহতস্বরেই উইল মন্তব্য করল।

—'অপেক্ষা কর,' আমি বললাম, 'আমার ধারণা ও আবার ফিরে আসবে। ওর খাদ্যের খুব প্রয়োজন।—'

—'আর সেই মহিলা? তারও বোধকরি খাদ্যের প্রয়োজন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল উইল, তারপর বলল,

—'সাগরে মাছ ধরছি অনেকদিন ধরে। কিন্তু এরকম অদ্ভুত ব্যাপারের মুখোমুখি আগে আর কখনও হই নি। একটু আগে যা ঘটল তার চেয়ে রহস্যময় ব্যাপার আর কি হতে পারে?'

—'হুঁ!' আমি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম। নানান চিন্তা এসে আচ্ছন্ন করে ফেলল আমার মনকে।

সময় কাটতে লাগল। একঘণ্টা কাটল তবুও উইল আমার সঙ্গে ডেকের উপরই রয়ে গেল। রাতের এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা যেন ঘুম-কাতুরে উইলের সমস্ত ঘুমকে তাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

তৃতীয় ঘণ্টারও তিন ভাগ কেটে গেল। ঘণ্টা শেষ হতে আর মাত্র মিনিট পনের বাকী। এমনি সময়ে আমরা আবার নিস্তব্ধ সাগরের বুকে দাঁড় টানবার শব্দ শুনতে পেলাম।

ছপ্—ছপ্—ছপ্

শব্দটা এগিয়ে আসছে আমাদের স্কুনারের দিকে।

—'শোন!' চাপা গলায় বলল। ওর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার পরশ।

—'ও আবার ফিরে আসছে, আমি ঠিক এটাই ভেবেছিলাম।' আমি বললাম।

দাঁড় টানার শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে এল। লক্ষ্য করলাম, জলের মধ্যে দাঁড়ের প্রতিটি আঘাত এখন দৃঢ়তর এবং দীর্ঘস্থায়ী। আগন্তুকের দেহে যেন নতুন তেজ আর শক্তির সঞ্চার হয়েছে। সত্যিই, খাবারের খুবই দরকার ছিল।

জাহাজের একটু দূরে এসে দাঁড়ের শব্দ থামল। বুঝলাম, আর এগোবে না ঐ আঁধার রাতের অদৃশ্য অতিথি। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ

—'স্কুনার অ্যাহোয়—স্কুনার—ওহে স্কুনার।'

—'এই যে আপনি এসেছেন?' উইল জিজ্ঞেস করল।

—'হ্যাঁ,' কণ্ঠস্বর উত্তর দিল, 'আমি হঠাৎ আপনাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলাম; কিন্তু-কিন্তু তার খুব প্রয়োজন ছিল। নিতান্ত প্রয়োজনের জন্যই আমাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছিল।'

—'সেই মহিলা!' উইল প্রশ্ন করল।

—'সে মহিলা এখন পৃথিবীতে কৃতজ্ঞ। শীগ্‌গীরই স্বর্গে...হ্যাঁ, স্বর্গে গিয়ে আরও কৃতজ্ঞ হবেন।'

উত্তরে কিছু বলতে গিয়েও উইল হতবুদ্ধি হয়ে থেমে গেল। আমি কিছুই বললাম না। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম অদ্ভুত বিরতিগুলির কথা। অদৃশ্য আগন্তুক কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে থেমে যাচ্ছিল। কিন্তু কেন? কেন?

অবশ্য অবাক হলেও আমার মন ওর প্রতি সহানুভূতি এবং সমবেদনায় ভরে গিয়েছিল।

কণ্ঠস্বর বলতে লাগল ঃ

—'ঈশ্বরের দয়া আর আপনাদের অনুগ্রহের ফলকে ভাগাভাগি করে নিয়ে আমরা...হ্যাঁ, আমি আর সে আলোচনা করছিলাম....

ওর কথার মাঝখানেই কথা বলল উইল, কিন্তু তার কথাগুলো মোটেই পরিষ্কার বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হল না।

—'আজ রাতে আপনারা যে দানকর্ম করলেন...যে খ্রিস্টধর্মসুলভ করুণা দেখালেন, তাঁকে দয়া করে ছোট করবেন না,' কণ্ঠস্বর বলল, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের এ কাজ সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দৃষ্টি এড়ায় নি।'

কণ্ঠস্বর থামল। পুরো এক মিনিট সবাই নীরব। তারপর রাতের কণ্ঠস্বরের অদৃশ্য অধিকারীই নীরবতা ভাঙল।

—'আমরা দু'জনেই আমাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করলাম। আগে ভেবেছিলাম আমাদের জীবনে যে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক নেমে এসেছে তার কথা আর কাউকে বলব না। নিঃশব্দে শেষ হয়ে যাব দু'জনে। কিন্তু আলোচনা করে দু'জনেই একমত হলাম যে আজ রাতে যে ঘটনা ঘটল, তা ঘটল এক বিশেষ বিধানেই। আমরা যে কষ্ট সহ্য করেছি, যে জীবন্ত আতঙ্কের মুখোমুখি হয়েছি—

তা আপনাদের কাছে খুলে বলা উচিত বলেই আমরা মনে করলাম। আর ঈশ্বরও বোধহয় তাই চান।'

আমরা কোন কথা বললাম না। কণ্ঠস্বর আবার বলতে লাগল,

—'সেই সময় থেকে...সেই সময় থেকে...'

—দ্বিধাগ্রস্থভাবে কণ্ঠস্বর থামল।

—'হ্যাঁ, বলুন,' নরম গলায় উইল বলল।

—'আলবাট্রস' জাহাজখানা ডুবে যাবার সময় থেকেই...'

'ও!' নিজের অজ্ঞাতেই আমার গলা থেকে স্বর বেরিয়ে এল,—'ছ' মাস আগে ঐ জাহাজখানাই তো নিউ ক্যাসল থেকে ফ্রিস্কোর দিকে যাত্রা করেছিল। তারপর থেকে জাহাজখানার আর কোন খবর শোনা যায় নি। জাহাজখানা কোথায় কিভাবে উধাও হল তা-ও কেউ বলতে পারে না!'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি,' কণ্ঠস্বর উত্তর দিল।

—'বলুন কি করে জাহাজডুবি হল?'

'বিষুব রেখার কয়েক ডিগ্রী উত্তরে আমাদের জাহাজ 'অ্যালবাট্রস' এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ল, জাহাজের মাস্তুল ভেঙে গেল। সারারাত ধরে চলল ঝড়ের উদ্দম লীলা। ঝড়ের দাপটে জাহাজের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ ঝটিকা দানব-জাহাজখানাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল নিজের খেয়াল-খুশিমতো। পাহাড়ের মতো উঁচু এক একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল পাটাতনের উপর। মনে হল এই বুঝি পাটাতন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়! আর সে কি দুলুনি! জাহাজ এক একবার যেন তলিয়ে যাচ্ছিল রসাতলে—আবার ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে যেন উঠে পড়ছিল পাহাড়চূড়ায়। হাওয়া বইছিল সোঁ সোঁ করে। যেন লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ দানব দারুণ ক্রোধে হুংকার করতে করতে জাহাজখানাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল সুদূর দানবলোকে।

শেষ রাতের দিকে ঝড়ের দাপট কমল। ভোর হলে দেখা গেল জাহাজ ফুটো হয়ে গেছে—জল ঢুকতে শুরু করেছে জাহাজে। হাওয়া একেবারে পড়ে গেল। আর সব নাবিকেরা নৌকা করে চলে গেল ঝড়ে-বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে। বিধ্বস্ত জাহাজে পড়ে রইলাম আমরা দু'জনে—আমি আর আমার লিজা।'

—'আপনারা পড়ে রইলেন কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমরা নীচে গিয়েছিলাম আমাদের সঙ্গের জিনিসপত্রের মধ্যে অন্ততঃ অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস নিয়ে আসবার জন্য। সলিল সমাধি হবে—এই আতঙ্কে যাত্রী আর নাবিকদের বুদ্ধি আর বিবেচনাশক্তি বোধহয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল;

আমরা যখন ডেকের উপরে এলাম তখন নৌকাগুলো চলে গিয়েছে দূরে...দিগন্ত রেখার কাছাকাছি। ওদের ডেকে আর কোন লাভ নেই। অতদূর থেকে আমাদের ডাক ওরা শুনতেই পাবে না।

তবু নিরাশায় ভেঙে পড়লাম না আমরা। বরং সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লেগে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট্ট ভেলা তৈরী করে ফেললাম। তার উপর যতটুকু জিনিসপত্র ধরে ততটুকুই আমরা সঙ্গে নিলাম। অনেকটা পরিমাণ পানীয় জল আর কয়েক প্যাকেট বিস্কুট সঙ্গে নিতেও আমরা ভুললাম না। ইতিমধ্যেই জাহাজের অনেকখানিই জলের তলায় চলে গিয়েছিল। আমরা ভেলায় চড়ে বসলাম। জাহাজের বাঁধন কেটে ভেলা এগিয়ে চলল সমুদ্র পথে।

পরে লক্ষ্য করলাম, আমাদের ভেলা কোন স্রোতের গতিপথে পড়েছে। এই স্রোত দ্রুতগতিতে আমাদের ভেলাটাকে ডুবন্ত জাহাজখানা থেকে দূরে নিয়ে চলল। জাহাজ আর স্রোতের মাঝখানে একটা কোণের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই কোণ বজায় রেখেই স্রোতের মুখে আমাদের ভেলা এগিয়ে চলল। তিন ঘণ্টা কেটে গেল। জাহাজের কাঠামোটা আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেছে। ভাঙ্গা মাস্তুলটাকে আরও কিছুক্ষণ দেখা গেল বটে, কিন্তু একসময় সেটাও দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

সন্ধ্যার দিকে চারপাশ কুয়াশায় ঢেকে গেল। সারারাত আমাদের চারপাশে রইল ঘন কুয়াশার ধূসর যবনিকা। পরের দিনেও সে যবনিকা উঠল না। ঘন কুয়াশার মধ্যে আমরা ভেসে চললাম কোন্ অজানা দিকে কে জানে? অবশ্য আবহাওয়া শান্তই ছিল।

চারদিন ধরে সেই অদ্ভুত অস্বচ্ছ কুয়াশার মধ্য দিয়ে ভেসে চললাম আমরা। চতুর্থদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটা শব্দ শুনতে পেলাম। উপকূলে ঢেউ আছড়ে পড়বার শব্দ। ক্রমে শব্দটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। মধ্যরাতের পর আমাদের দু'পাশে ঢেউ-এর গর্জন শোনা যেতে লাগল। কয়েকবার আমাদের পলকা ভেলাটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে যেন শূন্যে লাফিয়ে উঠল। তারপর ভেলা সহ আমরা গিয়ে পড়লাম শান্ত নিস্তরঙ্গ জলরাশির মধ্যে।

সাগর তরঙ্গের উন্মত্ত ভৈরব গর্জন পড়ে রইল আমাদের পিছনে। অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে পারলাম না কোথায় এসে পড়েছি।

ভোর হল, দেখলাম, আমরা 'লেগুন' জাতীয় একটা বিশাল জলাশয়ের মধ্যে এসে পড়েছি। কিন্তু তখন আমরা এসব বিশেষ লক্ষ্য করিনি। কেননা আমাদের সামনেই কুয়াশার আবরণের আড়ালেই দেখা যাচ্ছিল একটা বিশাল সমুদ্রগামী

জাহাজের কাঠামো।

একসঙ্গে নতজানু হয়ে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম। ভাবলাম আমাদের বিপদের বুঝি শেষ হয়েছে। তখন কি জানতাম যে আমাদের এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকী রয়েছে।

ভেলাখানাকে চালিয়ে জাহাজের কাছে নিয়ে এলাম। চীৎকার করে উঠলাম,'আমরা বিপন্ন; দয়া করে আমাদের জাহাজে তুলে নিন।' কিন্তু আমাদের চীৎকারের জবাবে জাহাজ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আমাদের ভেলা গিয়ে থামল জাহাজের পাশে। আবার চীৎকার করলাম। নাঃ, কোন সাড়া নেই। জাহাজখানা কি পরিত্যক্তা। জাহাজ থেকে একটা দড়ি ঝুলছে নীচের দিকে। ঠিক করলাম ঐ দড়ি বেয়েই জাহাজে উঠব।

দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম। কিন্তু কাজটা খুব সহজ হল না। কেননা ঝুলন্ত দড়িটার গায়ে একধরনের ধূসর ছত্রাক রয়েছে। তাছাড়া জাহাজের পাশটাও ঢেকে গিয়েছে এ জাতীয় ছত্রাকে। মনে হচ্ছে জাহাজের গায়ে যেন ফুসকুড়ি উঠেছে। জায়গায় জায়গায় আবার নীলচে কালো দাগ।

দড়ি বেয়ে উপরে উঠে রেলিং ধরলাম। তারপর রেলিং টপকে এসে পড়লাম জাহাজের ডেকে। লিজা ভেলাতেই রইল।

সমস্ত ডেকটাই ছেয়ে গেছে ছত্রাকে। ধূসর বর্ণের ছত্রাক। কতকগুলো ছত্রাক থেকে আবার পিণ্ডের মতো বস্তু বেরিয়েছে। পিণ্ডগুলো উচ্চতায় বেশ কয়েক ফুট। কিন্তু সেসময় আমি এসব ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই নি, আমি খুঁজছিলাম মানুষ, জাহাজের ভিতরে মানুষ-জনের দেখা পাওয়াটাই ছিল তখন আমার প্রধান লক্ষ্য। আমি চীৎকার করলাম; কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। তারপর জাহাজের পিছন দিকটার সবচেয়ে উঁচু পাটাতনটার তলায় যে দরজাটা ছিল সেখানে গেলাম। দরজাটা ভেজান রয়েছে। দরজা খুললাম, তাকালাম ভিতরে। কেউ নেই ওখানে।

দরজাটা খুলতেই একটা বাসী গন্ধ নাকে এল। এরকম ঘরে কোন মানুষ থাকতে পারে না। কথাটা মনে হতেই আমি তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সহসা নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ—কেমন একাকী মনে হল।

যেদিক থেকে উঠেছিলাম জাহাজের সে পাশে গেলাম। লিজা চুপচাপ ভেলার উপর বসেছিল। আমাকে নীচের দিকে তাকাতে সে জিজ্ঞেস করল,—কাউকে দেখতে পেলে?'

—'না, দেখেশুনে মনে হচ্ছে জাহাজখানা অনেকদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায়

রয়েছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর। দেখি মই-টই জাতীয় কিছু পাই কি না। পেলে তুমিও উঠতে পারবে। তারপর দু'জনে মিলে ভাল করে জাহাজখানা খুঁজে-পেতে দেখা যাবে।

—একটু পরেই জাহাজের উল্টো দিকে একটা দড়ির মই খুঁজে পেলাম। সেটাকে এনে আমাদের ভেলার দিকে ঝুলিয়ে দিলাম। একটু পরেই ও এসে দাঁড়াল আমার পাশে।

দু'জনে মিলে বিশাল জাহাজখানার পিছন দিকটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কোন কেবিন আর অ্যাপার্টমেন্ট বাদ দিলাম না। কিন্তু না, কোথাও জীবনের কোন চিহ্ন নেই। জাহাজের এখানে ওখানে—এমনকি কেবিনগুলির মধ্যেও সেই অদ্ভুত ধরনের ছত্রাক জন্মেছে। লিজা বলল, এগুলি পরিষ্কার করে ফেলা যাবে।

জাহাজের পিছন দিকটায় যে জনমানব নেই এ-সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। এবার সামনের দিকটা দেখতে হবে। ধূসর রঙের কুৎসিত ছত্রাকের মধ্য দিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোলাম। দেখে মনে হয় কে যেন ফাংগাসের (ছত্রাক) চাষ করেছে এখানে। কতকগুলো বেশ বড় হয়েছে। ওগুলোর মাথায় গোলাকার পিণ্ডগুলো বেশ উঁচু। এদিকটাও আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু বৃথা খোঁজা। কোথাও কেউ নেই। আমরা দুটি প্রাণী ছাড়া জাহাজে আর কেউ নেই।

'আর খোঁজাখুঁজি করে কি হবে? জাহাজের পিছন দিকে ফিরে এলাম। এরকম অবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্যের যতটুকু ব্যবস্থা করা সম্ভব তাই করতে তৎপর হলাম দুজনে। দু'জনে মিলে দু'খানা কেবিন পরিষ্কার করলাম। তারপর আমি খুঁজতে গেলাম জাহাজের কোথাও কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা। খাবার পেয়ে গেলাম সহজেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম—তাঁর অসীম করুণা! টাটকা জলের পাম্পটাও খুঁজে পেলাম। পাম্পটা খাটালাম। জল পাওয়া গেল। একটু বিস্বাদ হলেও এ জল পান করা যেতে পারে।'

'কয়েকদিন আমরা জাহাজেই রইলাম। তীরে নামবার কোন চেষ্টাই করলাম না। আমরা জায়গাটাকে বাসযোগ্য করে তুলবার কাজেই ব্যস্ত রইলাম। তবুও—সেই প্রথমদিকের দিনগুলোতেও একটা ব্যাপারে কিন্তু আমরা সচেতন হয়ে উঠলাম। ব্যাপারটা হল এই যে আমরা যা ভেবেছিলাম বোধ করি আমাদের কপাল তার চেয়ে ঢের খারাপ। যদিও আমরা দু'খানা কেবিন আর সেলুনের মেঝে আর দেওয়ালের সমস্ত ছত্রাক নির্মূল করে ফেলেছিলাম, অদ্ভুত দাগগুলোকে ঘসে ঘসে তুলে ফেলেছিলাম তবুও মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ব্যবধানেই

সেগুলি আবার আগের রূপে ফিরে এল। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা যে কেবল আমাদের নিরুৎসাহিত করল তাই নয়, আমাদের মনের মধ্যে এনে দিল একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর অনুভূতি।

'কিন্তু আমরা পরাজয় স্বীকার করে হাল ছেড়ে দিলাম না। আমরা নতুন করে আবার কাজ শুরু করলাম। এবার আমরা কেবল ছত্রাক গুলিকেই চেঁছে ফেললাম না, চাঁছা জায়গার উপর কারবোলিক ছড়িয়ে দিলাম। জাহাজের ভাঁড়ারঘরে আমরা এক টিন কারবোলিকও পেয়েছিলাম। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে যে কে সেই—ছত্রাকগুলি আবার আগের অবস্থায় ফিরে এল। শুধু তাই নয়, ওগুলো ছড়িয়ে পড়ল আরও নানা জায়গায়। যেন আমাদের হস্তক্ষেপের ফলেই ওদের বীজ ছড়িয়ে গেল জাহাজের বিভিন্ন অংশে। এমন বিদঘুটে ছত্রাক তো আগে কখনও দেখিনি। এ জাতীয় ছত্রাকের কথা তো সমুদ্রযাত্রী কোন নাবিকের কাছেও শুনিনি। পণ্ডিতেরাও বোধকরি এগুলির অস্তিত্বের কথা জানেন না।

সপ্তম দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখল। ওর বালিশের খানিকটা জায়গা নিয়ে ছত্রাক জন্মেছে। আর তা জন্মেছে ওর মুখেরই কাছাকাছি। কোনরকমে গায়ে পোশাক চড়িয়েই ও আমার কাছে ছুটে এল। আমি তখন জাহাজের রান্নাঘরে বসে প্রাতরাশ তৈরী করবার জন্য আগুন জ্বালবার চেষ্টা করছিলাম।

—'জন, জন শীগ্‌গীর এসো, দেখে যাও কি হয়েছে!' হাঁফাতে হাঁফাতে ও বলল, 'কি ভয়ঙ্কর!—কি সাংঘাতিক ব্যাপার!'

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' উৎকণ্ঠিতভাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—'এসো, নিজের চোখেই দেখে যাও'।

একরকম টানতে টানতেই ও আমাকে নিয়ে গেল ওর কেবিনে। গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম দু'জনে একমত হয়ে। না, এ সর্বনেশে জাহাজে আর নয়। এক্ষুনি জাহাজ ছেড়ে চলে যাব আমরা। দেখা যাক লেগুনের উপকূলে আমাদের একটা থাকবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। সেখানে হয়তো সুখ না থাকলেও স্বস্তি থাকবে।

তাড়াতাড়ি আমাদের সামান্য ক'টা জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিলাম। দেখলাম, ওগুলোর মধ্যেও এই মারাত্মক ছত্রাকের অভিযান শুরু হয়েছে। ওর শালের একপ্রান্তে একদল ফাংগাস (ছত্রাক) জন্মেছে। ওকে কিছু না বলে আমি সেখানা একপাশে ছুঁড়ে ফেললাম।

আমাদের ভেলাটা তখনও জাহাজের গায়ে লাগানো রয়েছে। কিন্তু ওখানা

চালানো খুব মুশকিল। জাহাজের পিছন দিকে কয়েকখানা 'লাইফবোট' ঝুলান ছিল। তার একখানা নামিয়ে সাগরের জলে ভাসালাম। সেই নৌকায় করে এগিয়ে চললাম তীরভূমির দিকে।

কিন্তু তীরভূমির কাছাকাছি এসে দেখলাম জাহাজ ছেড়ে এসে কোন লাভই হয়নি। তীরের সর্বত্র ঐ দুষ্ট ছত্রাকের রাজত্ব। জায়গায় জায়গায় স্তূপাকৃতি ছত্রাক উঁচু হয়ে উঠেছে বড়সড় ঢিবি বা ছোট পাহাড়ের মতো। এ যে অদ্ভুত—এ যে ভয়ঙ্কর! একমাত্র গল্প-কথার কল্পলোকেই এরকম আজগুবী—এরকম অবাস্তব কিছু ঘটতে পারে কিন্তু নিজের চোখে যা দেখছি তা তো কোন গল্পকারের কল্পনার ফসল নয়—এ যে একান্ত বাস্তব।

সমস্ত উপকূলভাগটা ছেয়ে গেছে ঐ দুষ্ট ছত্রাকে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি এগুলো মরেও মরে না।

মনে হল ছত্রাকের ঢিবিগুলোর মধ্যে যেন জাগছে মৃদু কম্পন। নিঃশব্দ জীবনীশক্তি যেন তাদের মধ্যে নিয়ে আসছে শিহরণ। বাতাস এলেই দেখা যাচ্ছে এই শিহরণ। এখানে ওখানে ছত্রাকের আকৃতি বিশাল আঙুলের মতো। কয়েক জায়গায় আবার ওগুলোর আকার উঁচু সমতলক্ষেত্রের মতো। কিন্তু ওসব জায়গা তো আরও বিপজ্জনক। কোথাও কোথাও ঐ ছত্রাক দেখতে ছোটখাটো বেঁটে গাছের মতো। কিন্তু সেগুলো খুবই অদ্ভুত দর্শন। ওগুলো অসাধারণ পাক লাগান—অবিশ্বাস্য রকমের গ্রন্থিল।

কুদর্শন আর জটিল এই ফাংগাসগুলো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল থর থর করে।

প্রথমটা মনে হয়েছিল উপকূলভাগের সবটাই বুঝি ছত্রাকে ঢাকা। কিন্তু এখানটায় আমাদের ভুল হয়েছিল, কেননা উপকূল ধরে নৌকা চালাতে চালাতে একটু পরেই দেখতে পেলাম একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে ছত্রাক বা শৈবাল নেই। জায়গাটা সমতল এবং সাদা রঙের। সাদা রঙ হয়েছে বোধহয় মিহি বালুকণার জন্য। সেখানেই আমরা নামলাম নৌকা থেকে। এবার দেখলাম, যাকে বালি ভেবেছি তা আসলে বালি নয়। ওগুলো যে কিসের কণা তা আমি বলতে পারব না। তবে দেখলাম যে এই সাদা জায়গায় কোন ছত্রাক জন্মায়নি। শুধু তাই নয় উপকুলের যেখানেই এই বালির মতো মাটি রয়েছে সেখানেই ফাংগাস জন্মায়নি। আর এরকমের সাদা জমি অদ্ভুতভাবে ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে দু'পাশে ছত্রাকের জঙ্গলের মধ্য দিয়েও এই জমি চলে গিয়েছে। ঠিক যেন পায়ে চলা পথ।

অন্যত্র কেবল ছত্রাক আর ছত্রাক। ঘৃণ্য, ক্লিষ্ট আর ক্লেদাক্ত ধূসরতার অসুন্দর সমারোহ।

সম্পূর্ণ ছত্রাক-মুক্ত একটা জায়গা পেয়ে আমরা যে কতটা খুশি হলাম তা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। ওখানেই আমরা আমাদের জিনিসপত্র এনে রাখলাম। তারপর আবার জাহাজে ফিরে গেলাম দু'জনে। উদ্দেশ্য হল সেখান থেকে আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন সব মাল-পত্তর সংগ্রহ করা। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে আমি জাহাজের একখানা পালও সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। পালখানা দিয়ে পাশাপাশি দু'টি ছোট তাঁবু তৈরী করা হল। সে তাঁবু দু'টির কোন শ্রী বা ছাঁদ না থাকলেও যে উদ্দেশ্যে তা খাটান হয়েছিল তা সিদ্ধ হল। এই দুটি তাঁবুর মধ্যে আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র সঞ্চয় করে রাখলাম।

এক এক করে চারটি সপ্তাহ নির্বিঘ্নে কেটে গেল। সভ্যজগতের নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা সুখেই ছিলাম। কেননা আমরা দুজনে ছিলাম একসঙ্গে। সেই আপাত বালুকাময় ভূখণ্ডে আমরা দু'জনে গড়ে তুলেছিলাম রোমান্টিকতায় ভরা প্রেমের এক অপূর্ব স্বর্গলোক। সে কটা দিনের স্মৃতি আজও আমাদের মনে অম্লান। যতদিন চেতনা থাকবে ততদিনই থাকবে সেই মধুর স্মৃতির সৌরভ। সে সৌরভ আকুল করে তুলবে আমাদের তনু-মনকে। সেই মধুময় দিনগুলোর কথা ভুলব না—ভুলতে পারব না।

প্রথম দেখা গেল ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে—হ্যাঁ, দেখা গেল গোলাকৃতি ছত্রাক। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন আঙুলে একটা ধূসর রঙের আঁচিল হয়েছে। ও যখন আমাকে আঙুলটা দেখাল তখন দারুণ ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল। হায় ভগবান, একি হল! ওর আঙুলটা পরিষ্কার করে বিষাক্ত ছত্রাকমুক্ত করলাম। কার্বোলিক আর জল দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করলাম আঙুলটা।

পরদিন সকালে আবার আমাকে আঙুলটা দেখাল। হায় ভগবান, সেই ধূসর ভাবটা আবার ফিরে এসেছে আঙুলে। কিছুক্ষণ আমরা কোন কথা বলতে পারলাম না। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম নিঃশব্দে। তারপর নিঃশব্দেই আবার ওটাকে তুলে ফেলবার কাজে লেগে গেলাম। আমার কাজের মাঝখানেই ও হঠাৎ উত্তেজিত-ভাবে বলে উঠল,—'তোমার মুখের পাশে ওটা কি?'

দারুণ উৎকণ্ঠায় ওর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

জিনিসটা কি তা বুঝবার জন্য মুখের পাশে হাত নিলাম।

—'ঐ তো ওখানে। তোমার কানের পাশের চুলের তলায়! হ্যাঁ, আর একটু সামনে'—

আমার আঙুল জায়গা মতো পৌঁছল। এবং তখনই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি!

আমার মুখের পাশেও ছত্রাক জন্মেছে! বিষাক্ত ধূসর ছত্রাক! আমার কথাটাই ও মেনে নিল। কেননা আঙুলটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ও আমাকে স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছিল। আঙুলটাকে ভাল করে ধুয়ে বিষাক্ত বীজাণুমুক্ত করলাম। তারপর ওর কাজ শুরু হল। ও আমার মুখের পাশটা ছত্রাকমুক্ত করল। কাজ শেষ হলে আমরা কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে কথাবার্তা বললাম। হঠাৎ আমাদের খুশীভরা জীবনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে এক ভয়ঙ্কর চিন্তার কালো কুটিল মেঘ। মূর্তিমান অমঙ্গল যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমরা ভয় পেলাম। হ্যাঁ, আচম্বিতে দারুণ ভয়ে ছেয়ে গেল আমাদের সমস্ত মন। কিসের ভয়? কিসের ভয়—সে আমাদের মনে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু এটা যে মৃত্যুভয় থেকেও ভয়ঙ্কর সে সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

—'রসদ-পত্তর আর জল নিয়ে নৌকা করে দ্বীপ ছেড়ে সাগরে ভাসবার কথাও আমরা আলোচনা করলাম। কিন্তু ঐ সীমাহীন মহা-সমুদ্রের বুকেও তো আমরা একান্ত অসহায়। ঐ পলকা নৌকার উপর ভরসা করে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সভ্যজগতে ফিরে যাবার কল্পনা করাও বাতুলতার সামিল। আর—আর—তাছাড়া ঐ বিষাক্ত ধূসর ছত্রাক আমাদের দু'জনের দেহকেই আক্রমণ করেছিল। ঠিক করলাম এখানেই থাকব আমরা, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তিনি আমাদের নিয়ে যা করতে চান তাই হোক। আমরা অপেক্ষা করব। আর তাছাড়া আমাদের করণীয় আর কি-ই বা আছে।

এক মাস—দু'মাস—তিন মাস কেটে গেল। আমাদের দেহে ছত্রাকের আক্রমণের বেগ বেড়ে গেছে। শরীরের যে জায়গায় প্রথম আক্রমণের বেগ শুরু হয়েছিল সেখানে ছত্রাক বেড়ে গেছে—তাছাড়া দেহের নতুন নতুন জায়গায়ও শুরু হয়েছে আক্রমণ। আমরাও ক্রমাগত যুঝে চলেছি। কাজেই আমাদের দেহে যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ হবার কথা তুলনামুলকভাবে বোধ করি তার চেয়ে কম আক্রমণই হচ্ছিল।

প্রায়ই রসদ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করবার জন্য পরিত্যক্ত জাহাজখানায় যেতাম। সেখানে ফাংগাস (ছত্রাক) বেড়ে চলেছে অনিরুদ্ধ গতিতে। ডেকের উপর একটা গোলাকৃতি মুণ্ডি এত উঁচু হয়েছে যে সেটা প্রায় আমার মাথার সমান উঁচু।

দ্বীপ ত্যাগ করবার সমস্ত চিন্তা আর আশা আমরা ছেড়ে দিলাম। সুযোগ

পেলেও আর আমাদের সভ্য সমাজে ফিরে যাওয়া সঙ্গত হবে না। যে অদ্ভুত রোগের আমরা শিকার হয়েছি, সভ্যসমাজে ফিরে গেলে তা সংক্রামিত হয়ে পড়বে স্বাস্থ্যবান নীরোগ মানুষের মধ্যে। মানব সমাজের এতবড় ক্ষতি করবার অধিকার আমাদের নেই।

দ্বীপ ত্যাগ না করবার সিদ্ধান্ত নেবার পর একটা ব্যাপার স্পষ্ট হল। আমাদের খাদ্য এবং জল নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হবে। কেননা কতকাল আমাদের এখানে বেঁচে থাকতে হবে তা আমরা তখন জানতাম না। তাছাড়া জাহাজের ভাঁড়ারও অফুরন্ত নয়; তার উপর জাহাজ থেকে কোন টাট্‌কা খাবারও পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা অনেক দিনকার বাসী।

একটা কথা মনে পড়ে গেল! আপনাদের বলছি আমি একজন 'হতভাগ্য বৃদ্ধ।' কিন্তু বয়সের দিক থেকে বিচার করলে আমি মোটেই তা নই; কিন্তু কিন্তু—

হঠাৎ থেমে গেল অন্ধকারের কণ্ঠস্বর; তারপর আবার আচমকা শোনা গেল, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমরা জানতাম যে খাদ্যের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে। কিন্তু কত অল্প খাবার যে জাহাজের ভাঁড়ারে রয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। সপ্তাহ-খানেক পরে আমরা আবিষ্কার করলাম যে রুটির অন্য ট্যাংক্‌গুলি একেবারে খালি। অথচ আমি ভেবেছিলাম, প্রথমটির মতো এগুলিও রুটি বোঝাই থাকবে। যে ট্যাংকটা প্রথম খুলেছিলাম তার মধ্যে আর সামান্য ক'খানা রুটি রয়েছে। সবজী, মাংস আর টুকিটাকি খাবারের কয়েকটা টিন ছাড়া সারা জাহাজে আর খাদ্যদ্রব্য নেই।

কিন্তু এ সামান্য খাবারে আর কটা দিন চলবে আমাদের!

খাদ্যের ঘাটতি জানবার পর আমি লেগুনে মাছ ধরতে তৎপর হয়ে উঠলাম। কিন্তু মাছই ধরতে পারলাম না লেগুন থেকে। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে ঠিক করলাম লেগুনে যখন পাওয়া যাবে না, তখন প্রবাল প্রাচীরের বাইরে উন্মুক্ত মহাসমুদ্র থেকেই মাছ ধরব।

সেখানেই মাছ ধরবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে অদ্ভুত আকৃতির মাছ ধরা পড়ত। কিন্তু সেটা ক্বচিৎ। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরিশ্রমটাই সার হত, মাছ ধরা পড়ত না। পেটের ক্ষিধে পেটেই থেকে যেত। কিন্তু এমনি করে আর কত কাল চলে। মনে হল না খেতে পেয়েই আমরা মরে যাব। কতদিন আর অনাহারে বেঁচে থাকা যায়। আমাদের সমস্ত শরীর বিষাক্ত ছত্রাকে ছেয়ে গেছে। কিন্তু মনে হল ছত্রাকের আক্রমণে আমাদের শেষ করে ফেলবার অনেক আগেই আমাদের মৃত্যু হবে—আর সে মৃত্যু হবে অনাহারে। এই আমাদের নিয়তি।

আমার দেহ মনে ক্লান্ত। চতুর্থ মাস কেটে গেল। তারপর আমি এক ভয়ঙ্কর আবিষ্কার করলাম। একদিন দুপুরের একটু আগে আমি পরিত্যক্ত জাহাজখানা থেকে ফিরে এলাম। জাহাজের ভাঁড়ার তন্ন তন্ন করে খুঁজে কিছু বাসী বিস্কুট পেয়েছিলাম, তারই কয়েকখানা নিয়ে আমি তাঁবুতে ফিরে আসছিলাম। দূর থেকে দেখলাম, ওঁর তাঁবুর প্রবেশ পথটা খোলা। ও বসে আছে তাঁবুর দরজায়। শুধু তাই নয় একটা কিছু খাচ্ছে।

—'কি খাচ্ছ? কি খাচ্ছ?' বলতে বলতে আমি এক লাফে নৌকা থেকে নেমে পড়লাম। আমার কণ্ঠস্বর শুনে ও কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ঘুরে গিয়ে ও কোন একটা জিনিস ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। খানিকটা দূরে গিয়ে পড়ল জিনিসটা। আমার মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে ওঁর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া জিনিসটা তুলে নিলাম—

একখণ্ড ধূসর ছত্রাক!

তাঁবুর দোরগোড়ায় বসে ছত্রাক খাচ্ছিল! হায় ভগবান!

ছত্রাকের টুকরোটা হাতে করে ওর কাছে গেলাম। ও লজ্জায় একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে লালচে গোলাপী আভা ফিরে এল ওর মুখমণ্ডলে।

আমিও একটা প্রবল আচ্ছন্নতা আর ভীতির ভাব অনুভব করলাম।

—'লক্ষ্মী সোনা! লক্ষ্মী সোনা!—'এর বেশী আর কিছু বলতে পারলাম না আমি।

আমার দরদ্‌ভরা কণ্ঠস্বর শুনে ও ভেঙ্গে পড়ল কান্নায়। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল ও। তারপর যখন শান্ত হল তখন ওর মুখ থেকেই শুনলাম সব কথা। ক্ষুধার তাড়নায় আগের দিনই ছত্রাক খেয়েছে লিজা। এবং—এবং খেতে নাকি ওর মোটেই খারাপ লাগেনি—বরং ভালই লেগেছে। আমি ওকে দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিলাম যেন চরম ক্ষুধার মুহূর্তেও ও আর এই ছত্রাক স্পর্শ না করে। আমার সামনে নতজানু হয়ে ও শপথ করল যে ক্ষুধায় মৃত্যু হলেও ও আর খাদ্য হিসেবে ছত্রাক গ্রহণ করবে না। পরে ও আমাকে বলল যে ছত্রাককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা হঠাৎই ওর মনে আসে। আকাঙ্ক্ষার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ঐ ধূসর ছত্রাকগুলো ছিল ওর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য পদার্থ। ন্যাক্কারজনক এই ছত্রাকগুলোর উপর ওর তীব্র বিতৃষ্ণা—তীব্র বিকর্ষণ।

আমার মন অশান্ত—আমার মন বিচলিত। যে ভয়ঙ্কর আবিষ্কার আমি করেছি

তাতে আমার পক্ষে শঙ্কাবিহ্বল হয়ে পড়াটা মোটেই আশ্চর্য নয়।

অক্লান্ত মনকে একটু শান্ত করবার জন্যই দিনের শেষে একটু ঘুরতে বেরুলাম। দু'পাশে ছত্রাকের ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে আপাত-বালুকাময় সাদা ভূখণ্ড পথের মতো এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। সেই পথরেখা ধরেই এগোলাম। এর আগেও একবার এপথে এসেছি, কিন্তু বেশীদূর যাইনি। এবার নানা চিন্তায় আনমনা হয়ে আমি অনেকদূর এগিয়ে গেলাম।

আচম্বিতে একটা অদ্ভুত কর্কশ শব্দ শুনে আমার সম্বিত ফিরে এল। শব্দটা আসছে আমার বাঁপাশ থেকে। দ্রুত ঘুরে দেখলাম, আমার কনুই-এর কাছে অসাধারণ এবং অদ্ভুত আকৃতির ছত্রাকের একটা স্তূপ! স্তূপটা অচল নয়, ওটার মধ্যে রয়েছে গতি। অস্বস্তিকর-ভাবে ওটা আন্দোলিত হচ্ছে। যেন ওটার একটা নিজস্ব জীবন—নিজস্ব বোধশক্তি রয়েছে। ছত্রাকের স্তূপটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা আমার মনে হল স্তূপটাকে যেন আমি চিনতে পারছি। ওটার সঙ্গে যেন একটা অতিবিকৃত মানবদেহের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। কথাটা আমার মগজের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলতে না খেলতেই একটা ছিন্ন করবার শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা মৃদু কিন্তু পীড়াদায়ক। দেখলাম, ধূসর বর্ণের ছত্রাক স্তূপের মধ্য থেকে হাতের মত একখানা শাখা বেরিয়ে এল—এল আমার দিকেই। ছত্রাকের মাথা ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে। ধূসর মাথাটা একটা আকৃতিবিহীন বেঢপ বলের মতো! আমি নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতের মতো শাখাটা আমার মুখ স্পর্শ করে আলতোভাবে যেন হাত বুলিয়ে দিল। দারুণ আতঙ্কে চীৎকার করে আমি কয়েক পা পিছু হঠে এলাম। আমার ঠোঁটের উপর কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ। ওখানেও ছত্রাক-শাখার স্পর্শ এসে লেগেছিল। আমি ঠোঁট চাটলাম। বলতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীব্র অমানবীয় আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে বসল। সে আকাঙ্ক্ষায় ভরে গেল আমার সমস্ত মন। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি একখণ্ড ছত্রাক ভেঙ্গে নিলাম। খেলাম। আবার ভাঙলাম, আবার খেলাম। আবার—আবার—আবার। আমি বহুকালের ক্ষুধার্ত। আমার এই মহাক্ষুধার পরিতৃপ্তি নেই।

পাগলের মতো খেতে লাগলাম। বেশ খেতে!—চমৎকার মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ! খেতে খেতেই মনে পড়ল দুপুরের একটু আগে ওর তাঁবুর দরজায় যা ঘটেছিল তার কথা। বিদ্যুৎ চমকের মতই কথাটা আমার মনে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ যেন তড়িতাহত হয়ে উঠল। আমার আচ্ছন্ন মনটা যেন আবার হয়ে উঠল সজীব—সক্রিয়।

স্বয়ং ঈশ্বরই যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁবুর প্রবেশ পথে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার কথা। হাতের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। মুখের ভিতরকার খণ্ডগুলো-থু-থু করে ছিটিয়ে ফেললাম।

একি করলাম আমি! মুহূর্তের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমি অমানুষ হয়ে গেলাম! আমি নিতান্তই হতভাগ্য! আমার মন ভয়ঙ্কর অপরাধবোধ—তীব্র পাপবোধ ভরে গেল। ভারাক্রান্ত মনে ফিরে চললাম আমাদের শিবিরের দিকে।

লিজা সবই বুঝতে পারল।

ওর শান্ত সহানুভূতি আমার কাছে ব্যাপারটাকে অনেকখানি সহজ করে তুলল। আমার আকস্মিক দুর্বলতার কথা আমি ওর কাছে অকপটে স্বীকার করলাম। স্বীকার করে অনেকখানি স্বস্তি পেলাম। মনের গ্লানি অনেকটা কেটে গেল। কিন্তু ধূসর ছত্রাক-স্তূপের অন্তরালে আমি যে আভাস পেয়েছি— যে ভয়ঙ্কর সত্য আমি উপলব্ধি করেছি, তার কথা আমি ওর কাছে একেবারে চেপে গেলাম। অনাবশ্যক আতঙ্কের হাত থেকে আপাতত ওকে রক্ষা করতে চাইলাম।

কিন্তু আমি? আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার একটু বেড়েছে। কিন্তু এ জ্ঞান অসহ্য। এ জ্ঞান আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে প্রদাহের সৃষ্টি করল। মাথার মধ্যে বইতে লাগল আতঙ্কের স্রোত। এ স্রোতের কোন বিরাম নেই—কোন বিরতি নেই। মন হয়ে পড়ল শঙ্কা-বিহ্বল। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে হতভাগ্যের শেষ পরিণতি আমি একটু আগে স্বচক্ষে দেখেছি।

আমাদের জন্যও অপেক্ষা করে আছে ঐরকম নারকীয় পরিণতি।

ধূসর ছত্রাকস্তূপ!

এই হবে আমাদের পরিণতি!

হায় ভগবান!

এরপর থেকে আমরা আর কোনদিনই ঐ জঘন্য ছত্রাক খাইনি। কিন্তু ছত্রাক খাবার আকাঙ্ক্ষা বোধকরি আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। ঐ একবার খাওয়ার জন্য অনেকখানি মূল্য দিতে হল আমাদের। চরম অভিশাপ নেমে এল আমাদের জীবনে। শাস্তি পেলাম, কি সাংঘাতিক শাস্তি! এমন শাস্তি যেন চরম শত্রুর জীবনেও না আসে।

আমাদের সমস্ত শরীরে ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ল। এবং তা বাড়তে লাগল দানবীয় দ্রুতগতিতে। আমরা আমাদের হতভাগ্য দেহদুটির উপর ওদের নিষ্ঠুর অভিযান কিছুতেই রুখতে পারলাম না, তাই—তাই—যারা ছিল একদা মানব-মানবী, তারা পরিণত হল—

যাক সে কথা, ওসব কথা ক্রমেই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। কেবল এটুকু বিশ্বাস করুন একদা আমরা ছিলাম মানব-মানবী—

ধূসর ছত্রাকের সঙ্গে সংগ্রাম ক্রমেই আরো ভয়ঙ্কর—আরও আতঙ্ককর হয়ে উঠতে লাগল। আমরা হারতে লাগলাম, ক্রমাগত হারতে লাগলাম। ছত্রাক ঢেকে ফেলল আমাদের মানবীয় শরীর দুটিকে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল ছত্রাকের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ক্ষুধা—প্রচণ্ড ক্ষুধা, অথচ খাদ্য নেই। বলতে গেলে মনের সঙ্গে তীব্র লড়াই করেই ছত্রাককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা বিরত হলাম। মন? ছত্রাক-বিধ্বস্ত দেহে মন কি এখনও আছে?

এক সপ্তাহ আগে শেষ বিস্কুটখানা আমরা খেয়ে ফেলেছি। তারপর থেকে আমি মাত্র তিনটে মাছ ধরেছি। আজ রাতেও আমি সাগরে এসেছিলাম মাছ ধরবার জন্য। এমন সময় ঘন কুয়াশার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল আপনাদের 'স্কুনার' খানা। আমি আপনাদের ডাকলাম। এ কাহিনীর বাকিটা তো আপনারা জানেন। আপনারা গৃহহীন—সমাজহীন—দুটি হতভাগ্য প্রাণীকে দয়া করেছেন, এই দুটি হতভাগ্য একদা মানুষ ছিল। তাদের মনে ছিল কত আশা—কত স্বপ্ন। আপনাদের দয়ার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।'

ছপ্।

জলে দাঁড় পড়বার শব্দ শোনা গেল।

ছপ্।

আবার দাঁড় পড়ল জলে।

রাতের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। শেষবারের মতো শুনলাম সেই স্বর ভেসে এল কুয়াশার আবরণ ভেদ করে। কেমন যেন ভৌতিক—কেমন যেন শোকাতুর সেই কণ্ঠস্বর—

'ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন! বিদায় বিদায়! আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি—বিদায় নিচ্ছি—বিদায় নিচ্ছি মানুষের কাছ থেকে—'

শেষের দিকটায় রাতের আগন্তুকের কণ্ঠস্বর দারুণ আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠল।

—'বিদায়।' আমরা দু'জনে—আমি আর উইল চীৎকার করে বললাম। আমাদের হৃদয় আবেগে ভরা। সেখানে চলছে নানা আবেগের খেলা।

এতক্ষণ ধরে যেন আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, এবার পারিপার্শ্বিক আস্থা সম্বন্ধে যেন চেতনা ফিরে এল। তাকিয়ে দেখলাম, ভোর হচ্ছে। সাগরের বুকে যেন নেমে আসছেন অরুণ-প্রণয়িনী কল্যাণময়ী ঊষা। আমাদের চারপাশের কুয়াশার ধূসর

আবরণেও লালের ছোপ লাগল।

তারপর সূর্য উঠল। তীক্ষ্ণ বর্শার মতো একটা আলোক-রশ্মি এক-জায়গায় কুয়াশার পাতলা আবরণকে ছিন্ন করে ছড়িয়ে পড়ল এ-যাবত লুকানো সাগরের বুকে। আধো আলো আধো ছায়ার মধ্যে দেখা গেল অপসৃতমান একখানা নৌকা।

ছপ্ ছপ্ ছপ্—

নৌকাখানা চলে যাচ্ছে দূরে—আরও দূরে—দৃষ্টিসীমার বাইরে—ঘন কুয়াশার ধূসর যবনিকার অন্তরালে।

অস্পষ্টভাবে দেখলাম, দু'খানা দাঁড়ের মাঝখানে একটা বস্তু। বস্তুটা নড়াচড়া করছে। মনে হল একখানা স্পঞ্জ। ধূসর রঙের প্রকাণ্ড একখানা স্পঞ্জ যেন আন্দোলিত হচ্ছে।

জলে দাঁড় পড়ছে ছপ্ ছপ্ ছপ্। দাঁড়ের রঙ ধূসর—নৌকার রঙ ধূসর। মুহূর্তের জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বুঝতেই পারলাম না কোথায় হাতের শেষ আর দাঁড়ের শুরু। ধূসর হাত আর ধূসর দাঁড় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। ওদের সংযোগস্থল বের করতে পারলাম না।

মুহূর্তের জন্য আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ওর মাথার ওপর। ধূসর স্পঞ্জের মতো মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে আর দু'খানা দাঁড় যাচ্ছে পিছন দিকে—জল কাটাবার জন্য।

ছপ্ ছপ্ ছপ্—

দাঁড়ের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। নৌকা চলে গেল আলোকসীমার বাইরে। ধূসর নৌকার ধূসর চালক মাথা নাড়াতে নাড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল ধূসর কুয়াশার অন্তরালে।

ভূতুড়ে বাড়ির কাণ্ড

আলেকজাণ্ডার উলবাট

এলেরী কাজালেটের বাড়ীটা দেখতে ছিল খুবই অদ্ভুত ধরনের। বাড়ীটা দেখলেই মনে হত এটা আজকের নয় বহু যুগ আগের। বাড়ীটার ছাদটা ছিল লাল রংয়ের। ছাদটা টিউডর আমলের লাল টালী দিয়ে তৈরী। এই বাড়ীটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। যখন সূর্য মাঝ আকাশে উঠত ঠিক তখনই হঠাৎ ছাদের টালীগুলির লাল রং আরো গাঢ় লাল হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তাছাড়া ছাদের ঘর থেকে অনবরত টিক্ টিক্ করে ঘড়ির শব্দটা বেজেই চলত। এই ঘড়ির শব্দটার মধ্যেও কেমন যেন একটা যাদুর স্পর্শ ছিল! শুনলেই মনে হত এই ঘড়িটা যেন অষ্টম হেনরির আমল থেকেই বেজে চলেছে।

এই নির্জন নিষ্প্রাণ বাড়ীটাকে ঠিক ভূতুড়ে বাড়ীর মতোই দেখতে লাগত। নিস্তব্ধতায় বাড়ীটা যেন বন্দী হয়ে ছিল। শুধু ডাক্তার ছাড়া এই বাড়ীতে আর কেউই থাকত না। অবশ্য জন স্ক্রিপটিওর নামে একজন বুড়ো লোকের ওপর এই বাড়ীটার দেখাশুনার ভার ছিল। জন স্ক্রিপটিওর নিজেই ছিটগ্রস্ত লোক ছিল, তবুও এই বুড়ো উন্মাদ মানুষটার উপরই বাড়ীটার সব দায়িত্ব ছিল।

একদিন আলভান বারাক তার বন্ধু এলেরী কাজালেটের সঙ্গে দেখা করতে এল। কাজালেটের দি ক্রিপসে এসে উপস্থিত হল বারাক। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই সময় বন্ধু বাড়ীতে ছিল না।

কি আর করবে, যখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তখন অপেক্ষা করে যাওয়াই ভাল এই ভেবে বারাক বন্ধুর আশায় পথ চেয়ে বসে রইল। অবশেষে বারাক নিজের ডিনার শেষ করে একতলায় শোবার ঘরে চলে গেল। ঘরটা দেখে তার মন আনন্দে ভরে উঠল। খুব সুন্দর দেখতে ঘরটা। ঘরের মেঝের থেকে ছাদ পর্যন্ত নিখুঁত-ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরেতে শুধু একটা মোমবাতি জ্বালানো রয়েছে। এই মোমবাতির আলোয় আরও উজ্জ্বল করে তুলছে বাইরের খোলা জানালা দিয়ে এসে পড়া এক-টুকরো চাঁদের আলো। এত মনোরম পরিবেশেও কেমন যেন একটা গোপন রহস্যের ঘণ্টা বেজেই চলেছে। মনে হয় এই বুক-চাপা সন্দেহটা যেন চতুর্থ জর্জের আমল থেকেই চলে আসছে।

বারাক কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল তা ও নিজেই টের পেল না। কিছুক্ষণ বাদে

হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক তখনই সে অনুভব করল, সে এই ঘরে একা নেই, আরও একজন আছে। কোন এক অদৃশ্য দ্বিতীয় সত্ত্বার আবির্ভাব সে বুঝতে পারল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলভান বারাক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দ্বিতীয় সত্ত্বাকে দেখবার চেষ্টা করল। ও মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করল সত্যিই কেউ যেন এই ঘরে ঢুকেছে!

এক চিলতে চাঁদের আলোয় বারাক দেখতে পেল এক অদ্ভুত মূর্তি। মূর্তিটার চেহারাটা বীভৎস দেখতে। সারা শরীরটা কুঁজো হয়ে নেমে এসেছে। দেখলে মনে হয় দরজার সামনে একটা চেয়ারের উপর মাথাটা সম্পূর্ণভাবে নামিয়ে বসে আছে। হাতের আঙ্গুলগুলো বাঁকা, তার হাত দুটো যেন শূন্যে নড়াচড়া করছে! সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল সে শূন্যের মধ্যে ভাসছে।

বারাকের গোটা শরীরটা ভয়ে অবশ হয়ে এল। আতঙ্কগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে। তার মনে হল, কোন নারী যেন খুব তাড়াতাড়ি সেলাই করে চলেছে। এই অন্ধকারে কি করে সেলাই করা যায়! এই ভাবনা বারাকের ভয় পাওয়া মনটাকে আরও উত্তেজিত করে তুলল। সে নিজের মনেই প্রশ্ন করল—একি মানুষ হতে পারে? নিশ্চয় নয়। এ প্রেতাত্মা! এই কথা মনে আসতেই বারাকের শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে এল। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল। ঘর ছেড়ে পালাবার জন্যে দিশেহারা হয়ে উঠল। ভাবল, যেমন করেই হোক এখনই এখান থেকে বেরোতে হবে। কিন্তু উপায় নেই। বেরোবে কি করে? কারণ ঘরে মাত্র একটাই দরজা। আর সেই দরজার সামনে শূন্যে ভাসমান সেলাইকারী মূর্তিটা রয়েছে।

বারাক বেরোবার উপায় খুঁজতে লাগল। একবার ভাবল খোলা জানালা দিয়েই পালাবে কিন্তু সেই জানালা দিয়ে লাফালে কাঁটা ঝোপের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে। আর আছে এক বাথরুম। বারাক আপনমনেই বলে উঠল—এই বাথরুম দিয়ে বেরোবার আর কোন রাস্তা আছে তো? যদি না থাকে তাহলে? ভাবতেই ওর সমস্ত চেতনা অসাড় হয়ে এল। তাকিয়ে দেখল মূর্তিটা ঠিক সেই ভাবে সেলাই করে চলেছে।

বেরোবার কোন উপায় না দেখে বারাক হতাশ হয়ে পড়ে। আর কিছুই ভাবতে পারে না। মূর্তিটা ক্রমশই ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে। ঠিক সেই সময় একটা গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল। বারাক ভাবল নিশ্চয় তার বন্ধু ফিরে এসেছে। আনন্দে চীৎকার করতে গিয়েও পারল না কারণ ওর গলা জড়িয়ে আসছিল। বারাক বাথরুমে ঢুকে দরজার ছিটকানি তুলে দিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সব কিছু

দেখতে লাগল। চাঁদের আলোয় দেখতে পেল, সত্যিই কাজালেট ফিরে এসেছে। আরও দেখল কাজালেট হাতে বাতি নিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করছে। বারাক আনন্দে উন্মাদ হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই ছুটে গিয়ে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল।

ডাক্তার এলেরী কাজালেট কোন কথা না বলে এগিয়ে চলল খাবার ঘরের দিকে। খাবার টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে নানা রকমের সুখাদ্য—যেমন বীট, দুধ, মাংস আরও অনেক কিছু। কাজালেট মুখে কোন কথা না বলে একমনে খেয়ে চলল। ওর খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে ও ভীষণ ক্ষুধার্ত। কাজালেট খেতে খেতে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে খুব ক্ষেপে গেল। রান্নাঘরটা হাট করে কে যেন খুলে রেখেছে! ও বারাকের দিকে তাকিয়ে রাগত গলায় বলল, নিশ্চয় আমার রান্নার লোকটারই এই কাজ। ও প্রায়ই দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে যায়। কি মনে করে ডাক্তার নীচু হয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে দেখল কি যেন একটা পড়ে রয়েছে!

ওর বাতির আলোয় মেঝেতে দেখতে পেল এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! যা দেখে ওর শরীর কেঁপে উঠল। মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটা মুণ্ডহীন নারীর দেহ। কাজালেট কম্পিত গলায় জানাল—এইটা ওর রাঁধুনীর দেহ। শুধু দেহটাই পড়ে রয়েছে, মাথাটা নেই। মৃত-দেহটার পাশে পড়ে রয়েছে একটা রক্তাক্ত ছুরি। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিবেশটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠল।

স্ক্রিপটিওর! স্ক্রিপটিওর! বলে চীৎকার করে ডাকল ডাক্তার কাজালেট। নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে ছুটল। বাতি হাতে বারাকও বন্ধুর পিছু পিছু ছুটল।

ওরা দুজন নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সেই রহস্যময় ঘরটার দিকে। যেখানে কিছুক্ষণ আগেও বারাক ভয়ে, আতঙ্কে অসাড় হয়ে গেছিল, কোনমতে পালিয়ে ঢুকেছিল বাথরুমে। আবার সেই বিপদের ঘরটার দিকেই ওরা এগিয়ে গেল। খুব সন্তর্পণে আঙ্গুলে ভর রেখে হামাগুড়ি দিয়ে ওরা এগোতে লাগল।

ঘরে ঢুকেই বারাক ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সেই অদ্ভুত মূর্তিটা খুঁজতে লাগল। কোথাও কিছু দেখতে গেল না। ওরা শুধু দেখতে পেল বুড়ো স্ক্রিপটিওর-কে। যার দুই হাঁটুর মাঝে রয়েছে নারীর কাটা মুণ্ডু। এই কাটামুণ্ডুটা থেকে সে আবার পটাপট বেছে চলেছে একটার পর একটা পাকা চুল।

বারাক এতক্ষণে সব বুঝতে পারল। ওর আগে দেখা মূর্তিটা আর কেউই নয়, সে হচ্ছে স্বয়ং এই বাড়ীর রক্ষাকর্তা জন স্ক্রিপটিওর, যে এখনও কুঁজো হয়ে বসে একমনে খুব দ্রুততার সঙ্গে রমণীর কাটা মুণ্ডু থেকে বেছে যাচ্ছে একটার পর একটা পাকা চুল, যা দেখলে সত্যিই মনে হয় কেউ যেন খুব তাড়াতাড়ি সেলাই করে চলেছে।

ভূতের সঙ্গে বন্ধুত্ব

এইচ. জি. ওয়েলস্

শনিবারের সকালে আমরা সবাই মারমেড ক্লাবে এসে হাজির হয়েছি, শুধু ক্লেটনই আসেনি। কারণ আগের দিন রাতে ও ওখানেই ঘুমিয়েছিল, তাই হয়তো ক্লেটন গল্পটা বলার সুযোগ পেয়েছিল। এই ক্লাবে আমরা অনেকক্ষণ গল্ফ খেললাম, খাবার খেলাম তারপর গল্প শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে আছে ইভানস একজন কুশলী নায়ক আর আছে উইশ খুবই বিনয়ী লোক, ক্লেটন একটা গল্প বলতে শুরু করল, আমরা ধরে নিলাম ক্লেটন মিথ্যা বলছে। বেশ সুন্দর করে একটা ভূতের গল্প বলতে শুরু করল। আমরা সবাই ভাবলাম এটা ওর চালাকি, ও বলতে লাগল জান কাল রাতে আমি এখানে একা ছিলাম, যারা বাড়ির শেষ প্রান্তে শোয়, এতখানি বলে ক্লেটন সিগারে টান দিল, চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল জান আমি একটা ভূত ধরেছিলাম, অ্যান্ডারসন বলল, তুমি ভূত ধরেছিলে? সত্যিই কোথায় সে? উইশও চিৎকার করে বলল তুমি ভূত ধরেছিলে ক্লিটন? সত্যিই আমি সুখী হলাম, তুমি এখনই আমাদের গল্পটা বল ক্লেটন। ক্লিটন বলল যে এক মিনিটের মধ্যে সব জানবে এবং তাকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলল। জান এটা নিয়মিত ভূত নয়, আমার মনে হয় না আবার কখনও আসবে। অ্যান্ডারসন বলল তাহলে তুমি তাকে ধরে রাখনি, আমরা এই কথায় হেসে উঠলাম, দেখলাম ক্লেটন বেশ দুঃখিত হল, তবে হাসিমুখে সে বলল এটা সত্যিই একটা ভূত, আমি তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা বলছি ওটা তেমনই সত্যি, আমি মোটেই রসিকতা করছিনা। এই ধরনের ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি; তোমরা জান আগে কখনও ভূত বা সেই ধরনের কিছুর ওপর আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আমার এই অভিজ্ঞতা সব ওলট-পালট করে দিল। আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্লেটন অনেকক্ষণ চিন্তা করতে লাগল, উইশ বলল তুমি কথা বলেছিলে ভূতের সঙ্গে? এক ঘণ্টার মত কথা বলেছিলাম। বেচারা আত্মা বড় কষ্টে পড়েছে, খুব ফুঁপিয়ে কাঁদছিল তাই না? কে যেন বলে উঠল ক্লেটন একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সত্যিই ও বেচারা উইশ বলল কোথায় তুমি আঘাত করেছিলে তাকে? ক্লেটন তাকে পাত্তা না দিয়ে বলে আমি বুঝতে পারিনি একজন ভূত দুর্ভাগা হতে পারে। ক্লেটন পকেট থেকে দেশলাই বার

করে সিগারেট ধরাল, দেহ গরম করতে। সে বলল একটা চরিত্র দেহত্যাগ করলেও ঠিক একই চরিত্র থাকে, এই কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তোমরা কি জান প্রায় সব ভূতেরাই এক উদ্দেশ্যে ভাঁওতাগ্রস্ত এবং অন্ধত্বের মতো একগুঁয়ে হয় বারবার অভিভূত হয়। সেই বেচারা প্রাণীর হয়ত তা কিছুই ছিল না। ক্ষমতাবলে ও ওপর দিকে এবং ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। মনে হচ্ছিল বেশ দুর্বল মনে হচ্ছিল, লম্বা প্যাসেজে আমি তার সামনে পড়ি, তার পিছন দিকটা আমার সমানে ছিল। আমিই তাকে প্রথম দেখি, তাকে আমি ভূত বলেই মনে করি। সে স্বচ্ছ এবং সাদাটে রঙের, তার বুকের ভিতর দিকে আমি শেষ প্রান্তের জানালার আলো দেখতে পাই। তাকে দেখে খুব দুর্বল মনে হচ্ছিল, একটা হাত তার জানালার গরাদে আর একটা হাত তার মুখে কাঁপছে। স্যান্ডারসন বলল কেমন চেহারা তার? রোগা, সেই যুবকের ঘাড় থেকে দুটো বড় বাঁশির মতো হাড় নীচের দিকে নেমে গেছে। ছোট মাথায় বুরুশ করা চুল, কাল ছোট বিশ্রী, কাঁধ দুটোও বেমানান কোমরের থেকে সরু, জামার কলার নামান, রেডিমেড ছোট জ্যাকেট, ট্রাউজার থলের মতো ঢলঢলে, তলার দিকটা ছেঁড়া, আমি খুব সাহসিকতার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। সঙ্গে কোনো আলো নিইনি। আলোগুলো সব নীচের টেবিলের উপর ছিল। সেখানে লম্ফটা রয়েছে। আমি পাড় লাগনো চটি পড়েছিলাম, আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তাকে দেখতে পেলাম। ওকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি মরার মতো দাঁড়িয়েই রইলাম। আমি কিন্তু একদমই ভয় পেলাম না। আমি ভাবলাম এই সময় কারও ভয় পাওয়া বা উত্তেজিত হওয়া ঠিক নয়। আমি ভাবলাম শেষকালে এখানে একটা ভূত। আমি আমি গত পঁচিশ বছর ধরে এই ভূত-প্রেত বিশ্বাস করিনি। আমি দেখলাম একজন অপরিণত যুবকের মুখ। ভোঁতা নাক! ছোট গোঁফ আর তোবড়ানো গাল। কিছুক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম, আমরা দুইজন দুইদিকে দেখতে লাগলাম। তারপরই যেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে চেয়ে দুহাত তুলে ভূতের মতো হাত ছড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। গাল দুটো তার তুবড়ে গেল। মুখ দিয়ে কু-উ-উ শব্দ বেরিয়ে এল। আমি শ্যাম্পেন খেয়েছি তাই ভয় পাবার কোন চান্স নেই। আমি বললাম তুমি এখানে কি করছ? তুমি এখানকার লোক নও। ওকে আমি বেদনার কুঁচকে যেতে দেখলাম। ও শুধু আওয়াজ করল বু-উ-উ, বললাম তুমি কি এখানকার সভ্য? আমি ওকে পাত্তা না দিয়েই সাহসের সঙ্গে একপাশে গিয়ে বাতিটা জ্বালালাম, ফের বললাম তুমি কি সভ্য? এবার ও আমার সামনে থেকে সরে গেল। তাকে একটু মনমরা লাগল। বলল যা আমি সভ্য নই। আমি প্রেতাত্মা। তবে কি এখানে কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? আলোটা তার দিকে

তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলাম তবে এখানে কি করছ? হাতদুটো নামিয়ে নিয়ে ঘুমের শব্দ বন্ধ করল। দেখে মনে হল একটা দুর্বল, বোকা উদ্দেশ্যহীন যুবকের প্রেতাত্মা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে সে বলল আমি আতঙ্কগ্রস্ত, তারপর বলল, আমি একজন ভূত।

আমি বললাম এটা একটা ব্যক্তিগত ক্লাব, এখানে তোমার আমার কোন দরকার নেই। লোকেরা প্রায়ই তাদের ছেলেমেয়ে ও তাদের নার্স নিয়ে এখানে আসে এবং তোমার মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। ছোটো বাচ্চারা তোমায় দেখলে ভয় পাবে। আমার মনে হয় তুমি এসব কিছুই ভাবনি তাই না, এই ব্যাপারে তোমার ভাবা উচিত ছিল। এই জায়গায় তোমার কোন অধিকার নেই।

ভূতটা বলল স্যার আমি ভাবছিলাম এটা একটা পুরনো ও ওক কাঠের প্যানেল করা, আমি বললাম এটা কোন অজুহাত নয়, আকি পকেট থেকে দেশলাই বার করার ভান করে তার দিকে তাকিয়ে বললাম আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম তাহলে ভোর হবার জন্য অপেক্ষা করতাম না। আমি চলে যেতাম। ভূতটা বলল ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার, আমি কিছু একটা ভুলে গেছি। গত মাঝরাত থেকেই আমি এখানে ঘুরঘুর করছি। খালি ঘরের আলমারীর পেছনে লুকিয়েছি। আমি আগে এখানে কখনও আসিনি। আমি অসুবিধায় পড়েছি। একটা ছোটো জিনিস আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে সেটা ফেরত নিতে পারছি না। তোমরা জান না সেটা আমাকে কিভাবে বিপদে ফেলেছে। সে আমার দিকে হীনভাবে তাকাল। আমি আর তর্জন-গর্জন করতে পারলাম না। আমার মনে হল কে যেন নীচে চলাফেরা করছে। আমি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি ওকে বললাম আমার ঘরে এস, আমি একটা চেয়ারে বসলাম, এখানে বস, এবার তোমার সব কথা বল, সে বলল না, নিঃশব্দে চলাফেরা করতে লাগল। আধা স্বচ্ছ মায়াময় এক মূর্তি। শুধু পার্থক্য হচ্ছে তার ভূতুড়ে গলার স্বর, সুন্দর পরিষ্কার ছিট কাপড় ঝোলানো পুরনো শোবার ঘরে সে এদিক ওদিক পায়চারি করছে। আমি ওর শরীরের ভেতর দিয়ে আমার বাতিদানের আলো, পেতলের ছাই চাপা দেবার ঢাকনার ওপরে পড়া আলো ও দেওয়ালেরা কোণে কারুকার্য করা ছবির ফ্রেম চোখে পড়ছে। সে তখন তার সবেমাত্র পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার গল্প বলছে, তার মুখে কিন্তু কোন সততার ছাপ নেই, কারণ তার দেহটা স্বচ্ছ, সে সত্যটা এড়িয়ে যেতে পারল না। এবার উইশ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল—তার ানে সত্যিই বলছি, এটা সম্পূর্ণ সত্য, সে আমাকে বলল কিভাবে যে মারা গেছে, সটা লন্ডনের একটা বাড়ির নীচে বাতি নিয়ে গ্যাসের লিক দেখতে গিয়েছিল। স নিজে লন্ডনের এক প্রাইভেট স্কুলের সিনিয়র ইংলিশ টিচার বলে পরিচয় দিল।

এই ভূতটা যত বলতে লাগল আমার চিন্তা ততই বাড়তে লাগল। সে তার বাবা মার কথা স্কুল মাস্টারের কথা আর যারা তার জীবনে জড়িয়ে ছিল তাদের কথা বলতে লাগল। সে খুব ভীতু ছিল, তাই তাকে ঠিকমতো কেউ বিচার করতে ও বুঝতে পারেনি। আমার মনে হয় জীবিতকালে তার কোন প্রকৃত বন্ধু ছিল না। তার জীবনে কোনো বন্ধু আসেনি। খেলাধূলা এড়িয়ে চলত। তাছাড়া পরীক্ষাতেও সে সফলতা লাভ করতে পারেনি। বিয়েটা হতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় গ্যাসেই তার সব শেষ হয়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এখন তুমি কোথায়? ও বলল, সে এখন পাপ-পুণ্যের ফলে অস্তিত্বহীন বিশেষ সংরক্ষিত জায়গা আছে। তবে আমার মনে হয় যে একজন দয়ালু আত্মায় পরিণত হয়েছে ও হচ্ছে একজন দুর্বল ভূত। তার আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে।

উইশ আগুনের দিকে মুখ করে বসল। ক্লেটন গরম গলায় কথাগুলো বলতে বলতে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল। তার হতভাগ্য জীবনে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার ও সোজাসুজি নয় জীবন্ত অবস্থায় আমার ঘরে থাকলে তাকে আমি লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতাম। উইশ বলল নিশ্চয় এমন হতভাগ্য মানুষও আছে।

ও বলল কেউ আমার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায়নি শুধু আমি ছাড়া। ও কি চায় সেটা বুঝতে পেরে আমি তাকে ছেড়ে চলে যাবার মনস্থ করলাম, আমি উঠে দাঁড়ালাম বললাম এই নিয়ে বেশি দুঃখ করো না। যেটা তোমার করা দরকার তা হচ্ছে এখুনি এখান থেকে চলে যাও। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা কর ও বলল আমি পারব না। আমি ফের বললাম চেষ্টা কর। স্যান্ডারসন বলল চেষ্টা করল কি করে? ক্লেটন বলল পালিয়ে গেল। স্যান্ডারসন বলল, সত্যিই মিলিয়ে গেল? ক্লেটন বলল হ্যাঁ মিলিয়ে গেল। ও নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে হাত তুলে মিলিয়ে গেল। যেভাবে সে এসেছিল সেইভাবেই ও অদৃশ্য হয়ে গেল। স্যান্ডারসন আস্তে জিজ্ঞাসা করল তুমি কি ওর যাওয়া লক্ষ্য করেছিলে?

ক্লেটন হ্যাঁ বলল, আর বলল ওটা একটা ভীষণ অদ্ভুত ব্যাপার, জানতো এই বিশুদ্ধ শহরের শুক্রবারের রাতে এই নিস্তব্ধ শূন্য ক্লাব ঘরে এইখানে আমরা আছি, সেখানে আমি আর আমাদের গলার স্বর আর তার দেহ নাড়ানোর সময় ছায়া পড়ছে। দুটো ঘরে বাতি জ্বলছে একটা ঘরে আর একটা ড্রেসিং টেবিলে জ্বলছে, নড়ছে, কাঁপছে ভূতটা বলতে লাগল আমি পারব না, আমি কখনও...। কথা শেষ না করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, সত্যিই কি যন্ত্রণাদায়ক শব্দ। আমি ওর পিঠে চাপড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার ডান হাতটা সোজা ওর দেহের ভিতর দিয়ে চলে গেল। আগে যেমন সাহসী ছিলাম এখন তেমন থাকতে পারলাম না।

ডরোথি ডিংলে-র ভূত

ড্যানিয়েল ডিফো

এই বছরের গোড়ার দিকে এই লনচেষ্টন শহরে একটা রোগ দেখা দিল আর আমার কয়েকটি ছাত্র তাতে মারা গেল। এই রোগে যারা মারা গেল তাদের মধ্যে একজন হল ট্রেহাস্—এর এডওয়ার্ড ইলিয়ট, এস্কোয়ারের বড় ছেলে জন ইলিয়ট। ছেলেটির বয়স বছর ষোল, কিন্তু অসাধারণ ক্ষমতা ও বুদ্ধির অধিকারী। বিশেষ অনুরোধে ১৬৬৫-র ২০শে জুন তারিখে তার অন্ত্যেষ্টিকার্যে আমিই পৌরোহিত্য করলাম। বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই যুবকটির সম্পর্কে কিছু প্রশংসার কথা আমি বললাম; উদ্দেশ্য, যারা তাকে জানত তাদের কাছে তার স্মৃতি যাতে প্রিয়তর হয়, এবং যেসব ছাত্র তার সঙ্গে স্কুলে আসত আর তারপরেও যারা স্কুলে আসবে, তাদের সকলের কাছেই সে যেন দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকে। আমার কথাগুলি শুনে গির্জার একজন প্রবীণ ভদ্রলোক খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। বক্তৃতায় ভার্জিলের যে উক্তিটি আমি ব্যবহার করেছিলাম সেদিন সন্ধ্যায়ই তাকে বার বার সেটি আবৃত্তি করতে শোনা গেল ঃ

Etpeur ipse fuit Cartair dignus.

এই ছাত্রটির ব্যাপারে গম্ভীর ভদ্রলোকটির এতটা অভিভূত হওয়ার কারণ তিনি তাঁর নিজের একটি ছেলে সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। ছেলেটি একই বয়সী, কয়েক মাসের বড়; মিঃ ইলিয়টের চরিত্রের যে বিবরণ আমি দিয়েছি তার ছেলেটিও তার অযোগ্য নয়। কিন্তু একটা বিচিত্র দুর্ঘটনার ফলে তাকে নিয়ে এখন বাবা-মার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নষ্ট হতে বসেছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে আমি গির্জার বাইরে আসামাত্রই এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমাকে ডাকলেন; এবং অস্বাভাবিক আগ্রহাতিশয্যের সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করে সেই রাতেই আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। আর মিঃ ইলিয়ট যদি মাঝখানে পড়ে না বলতেন যে সারাটাদিন আমি তার সঙ্গে কাটাব বলে কথা দিয়েছি, এবং কোনমতেই তিনি সে কথার নড়চড় হতে দেবেন না, তাহলে হয়তো সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির হাত থেকে আমি কিছুতেই রেহাই পেতাম না।

এর ফলে তখনকার মতো ছাড়া পেলাম বটে, কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে কথা

দিতে হল যে পরবর্তী সোমবারে তার বাড়িতে গিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করব। তখনকার মত তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু সোমবার আসার আগেই তিনি নতুন করে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন, সম্ভব হলে আমি যেন রবিবারেই সেখানে যাই। সেটা আমার পক্ষে সুবিধা হবে না এবং আমার নিজের লোকজনের প্রতি আমার কর্তব্যের দিক থেকেও সেটা অসুবিধাজনক—এই কথা বলে তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকেও ঠেকিয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক কিন্তু সেখানেই থামলেন না; রবিবারে আর একটা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, আমি যেন কোন কারণেই সোমবারে যাওয়াটা বন্ধ না করি, এবং এমনভাবে কাজকর্মের ব্যবস্থা করে যাই যাতে অন্তত দু' তিনটে দিন তার সঙ্গে কাটাতে পারি। বিনা কারণে এত আগ্রহ এবং যাওয়ার জন্য এত তাড়ার বহর দেখে সত্যি আমি বিস্মিত হলাম; মনে সন্দেহ দেখা দিল যে এত অতি-ভদ্রতার অন্তরালে নিশ্চয় কোন অভিসন্ধি আছে। কারণ এই ভদ্রলোক বা তার পরিবারের সঙ্গে আমার কোনরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না; এমন কি সাধারণ পরিচয়টুকুও নয়; হঠাৎ কোথা থেকে এই বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাস গজিয়ে উঠল তাও ভেবে পেলাম না।

কথামতো সোমবার সেখানে গেলাম এবং আমন্ত্রণ যেরকম উচ্ছ্বাসপূর্ণ ছিল অভ্যর্থনাও পেলাম তদনুরূপ প্রচুর ও পরিপূর্ণ। সেখানে একজন প্রতিবেশী পাদরির সঙ্গেও দেখা হল; তিনি হঠাৎই এসে পড়ার ভান করলেও পরবর্তী ঘটনা থেকে আমার অন্যরূপ ধারণাই হল। ডিনারের পরে ভদ্রলোকটি আমাকে বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে বেড়াতে বেড়াতেই তিনি আমার কাছে এই পুরো ব্যাপারটির প্রথম রহস্যটি উদঘাটন করলেন।

প্রথমে তিনি সাধারণভাবে পরিবারের দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিয়ে শুরু করলেন, তারপরে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছোট ছেলের কথা উল্লেখ করলেন। ওকে নিয়ে সকলের কত আশা ছিল, ছেলেটি কত ফূর্তিবাজ ছিল; কিন্তু ইদানীং কেমন যেন মন-মরা আর আধভোলা হয়ে পড়েছে। তখন থেকেই কেমন যেন কান্নাকাটি করে, যুক্তিবুদ্ধিও হারিয়ে ফেলছে; কারণ, সে নিজেই বলেছে, তাকে নাকি ভূতে পেয়েছে; সে জোর দিয়েই বলে যে, একটা বিশেষ পথ দিয়ে যতবার সে স্কুলে যায় ততবারই এখান থেকে আধ মাইল দূরের একটা বিশেষ মাঠে তার সঙ্গে একটা ভূতের দেখা হয়।

আমাদের কথার মাঝখানেই বুড়ো ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী এসে হাজির হলেন। পাদরিটিও সামনের কুলবনটি দেখিয়ে আগেকার কথাই বলতে শুরু করলেন, আর তারাও (যুবকটির বাবা-মা) তার বক্তব্যকে সমর্থন করে বিস্তারিতভাবে

আরও অনেকক্ষণ ধরে সব কথাই আমাকে শোনালেন। অবশেষে তারা তিনজনই এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য ও পরামর্শ চাইলেন।

তাদের বক্তব্য সম্পর্কে হঠাৎই কোনরকম মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না; শুধু এইটুকু বললাম যে ছেলেটি তাদের যা বলেছে সেটা অদ্ভুত হলেও অবিশ্বাস্য নয়, আর এ বিষয়ে এক্ষুনি আমি কিছু ভাবতে বা বলতে পারছি না; কিন্তু ছেলেটি যদি আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে এবং আমার পরামর্শ শোনে তাহলে পরদিন তাদের আমার মতামত জানাতে পারব বলে আশা করি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, এই দম্পতিটি আমার জন্য যে জালটি পেতে রেখেছিল আমি তার মধ্যেই পা দিয়ে ফেলেছি; বৃদ্ধা মহিলাটি তার অধৈর্যকে মোটেই চেপে রাখতে পারলেন না, তখনই ছেলেকে ডেকে আবার প্রস্তাব করে বসলেন। বাধ্য হয়েই সে প্রস্তাব মেনে নিয়ে সম্মতি জানালাম, আর মহিলাটিও আমাদের ফেলে নিকটবর্তী একটি বাগানে গিয়ে নিজেই ছেলেকে সঙ্গে করে এনে আমার হাতে তুলে দিলেন।

তিনজনের বক্তব্যের একটাই মূল সুর ঃ তারা আমাকে বোঝাতে চাইলেন, হয় ছেলেটি আলস্যপরায়ণ এবং যে কোন ছুতো করে স্কুল পালাতে চায়, অথবা কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সেটা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে অথবা বাবার উপর চাপ দিয়ে কিছু টাকা ও নতুন জামাকাপড় বাগাবার তালে আছে, যাতে লন্ডনে তার যে দাদা থাকে তার কাছে পাড়ি জমাতে পারে; তাই তারা আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন আসল ব্যাপারটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি এবং তদনুযায়ী ছেলেটিকে এসব করা থেকে নিবৃত্ত করি, সৎপরামর্শ দিই, বা তিরস্কার করি, মোট কথা, যেভাবেই হোক তার মাথা থেকে এই ভূত-প্রেতের চিন্তাটা যেন দূর করে দিই।

অচিরেই যুবকটির সঙ্গে একটি গোপন বৈঠকে বসে গেলাম। প্রথমেই সে যাতে আমার প্রতি বিরূপ না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হলাম, মিষ্টি কথায় মন ভিজিয়ে তার মনের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করলাম, কারণ আমার সন্দেহ ছিল যে সে হয়তো আমাকে বিশ্বাস করবে না, বা মুখই খুলবে না। কিন্তু প্রথম পর্বটা পার হয়ে আসল কাজের কথা শুরু করার আগেই বুঝে ফেললাম যে তার মনের মধ্যে ঢুকতে কোনরকম কৌশল অবলম্বনের দরকারই হবে না; কারণ বেশ অনুগতভাবেই সে খোলাখুলিই বলল যে সে তার পুঁথিপত্রই ভালবাসে এবং একটি ভাল ছাত্র হওয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না; তার মা যাই বলুক, কোন মেয়েছেলের প্রতিই তার কোন টান নেই; বাবা মার কাছে তার শুধু একটিই

অনুরোধ, "হায়ারভ্রুম কোয়ার্টল্‌স"—এর মাঠে যে স্ত্রীলোকটি তাকে বিরক্ত করছে তার সম্পর্কে বার বার সে যা বলছে সেকথা তারা বিশ্বাস করুক। অনেক চোখের জলে ভেসে সে একেবারে খোলাখুলিই আমাকে বলল যে, তার বন্ধুরা তার প্রতি নিষ্ঠুর ও অন্যায় ব্যবহার করছে; তারা তার কথা বিশ্বাস করে না, তার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায় না; যে কেউ আমার সঙ্গে একবার সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা সত্য, ইত্যাদি।

ততক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে যে আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল, তার কথাগুলি মন দিয়ে শুনছি, আর তাই সে বলতে লাগল ঃ

"যে স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখা দেয় সে এখানে আমার বাবার প্রতিবেশী ছিল; আট বছর আগে মারা গেছে; নাম ডরথি ডিংলে; এইরকম উঁচু, এইরকম বয়স, আর এইরকম গায়ের রং। সে কখনও আমার সঙ্গে কথা বলে না, তাড়াতাড়ি আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, সব সময়ই ফুটপাথটা আমাকে ছেড়ে দেয়, এবং মাঠটা পার হবার মধ্যে সাধারণত দু'বার কি তিনবার আমাকে দেখা দেয়।"

"এইভাবে মাস দুই চলার পর ব্যাপারটা নজরে এল; মুখের আদলটা মনে থাকলেও তার নামটা তখন মনে পড়ে নি; কাজেই এ নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে ধরে নিয়েছিলাম যে এই স্ত্রীলোকটি হয়তো কাছাকাছি কোথাও থাকে, আর মাঝে মাঝেই তাকে এই পথ দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। অন্যরকম কোন কল্পনা আমার মাথায়ও আসে নি। কিন্তু ক্রমে সকালে ও সন্ধ্যায় অনবরত তার সঙ্গে আমার দেখা হতে লাগল; সব সময় ঐ একই মাঠে, আর অনেক সময় মাঠটা পাড়ি দেবার পথেই দুই কি তিনবার করে।"

"এই স্ত্রীলোকটির প্রতি প্রথম আমার নজর পড়ল প্রায় এক বছর আগে, তখনই আমার সন্দেহ হল, বিশ্বাস হল যে এটা একটা ভূত; কিন্তু তাতে ভয় পাবার ছেলে আমি নই; বেশ কিছুদিন ব্যাপারটা নিজের মনের মধ্যেই চেপে রাখলাম, অনেক ভাবলাম। অনেক সময় তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও জবাব পাই নি। তারপর আমি পথটাই বদলে ফেললাম; স্কুলে যেতে লাগলাম আন্ডার হর্স রোড ধরে; আর তখন সেও আমাকে দেখা দিত কোয়ারি পার্ক ও নার্সারির মাঝখানের সরু গলিটাতে। সেটা তো আরও খারাপ ব্যাপার।"

"শেষ পর্যন্ত আমার ভয় করতে লাগল; অনবরত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম হয় এর হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও, আর না হয় তো ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও। রাতে ও দিনে, নিদ্রায় ও জাগরণে, মূর্তিটা সব সময় আমার

মনের মধ্যে ছুটে বেড়ায়, ধর্মগ্রন্থের এই জায়গাটা আমি বার বার আবৃত্তি করি (পকেট থেকে একখানি ছোট বাইবেল বের করল), জোব vii, ১৪ ঃ "স্বপ্নে তুমি আমাকে ভয় দেখাও আর অপচ্ছায়া দেখিয়ে সন্ত্রস্ত কর।" আর ডিউটেরনমি, xxviii, ৬৭ ঃ "সকালে তুমি বলবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন যদি সন্ধ্যা হত; আর সন্ধ্যায় তুমি বলবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন যদি সকাল হত; কারণ মনের ভয় থেকেই তোমার ভয়ের জন্ম, আর চোখের দৃষ্টির জন্যই তুমি সব কিছুই দেখতে পাও।"

ধর্মগ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশগুলিকে তার অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করার ব্যাপারে ছেলেটির সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি খুব খুশি হলাম; তাকে আরও সব কথা বলতে লাগলাম।

সে বলতে লাগল ঃ "ধীরে ধীরে আমি এতদূর মনমরা হয়ে পড়লাম যে সেটা বাড়ির সকলেরই চোখে পড়ল; তারপর নানা প্রশ্নের জবাবে আমার ভাই উইলিয়ামকে ব্যাপারটা বললাম। সে গোপনে বাবা ও মাকে কথাটা জানাল, আর তারাও কিছুদিন পর্যন্ত কথাটা নিজেদের মধ্যেই চেপে রাখল।"

"এই জানাজানির একটি মাত্র ফল হল; তারা কখনও আমাকে দেখে হাসে, কখনও বকে কিন্তু সব সময় স্কুলে যাবার হুকুম করে এবং এই সব আবোল-তাবোল ধারণা মাথা থেকে দূর করতে বলে। ফলে আমি প্রায়ই স্কুলে যেতাম, আর সব সময়ই পথে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা হত।"

বাগানে বসে এই কথা এবং একই রকমের আরও অনেক কথা হল প্রায় দু ঘন্টা ধরে। অবশেষে আমি প্রস্তাব করলাম, কোনরকম গোপন না করেই পরদিন সকালে ছটা নাগাদ আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে সেই জায়গাটায় যাব। কথাটা বলতেই সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; বলল, "সত্যি যাবেন স্যার? সত্যি তো স্যার? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন আশা হচ্ছে আমি স্বস্তি পাব।"

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা বাড়ির ভিতর গেলাম।

ভদ্রলোক, তার স্ত্রী, ও মিঃ শ্যাম ঘটনাটা জানবার জন্য এতই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে তারা বৈঠকখানা থেকে হলঘরে বেরিয়ে এলেন। ছেলেকে বেশ উৎফুল্ল দেখে বৃদ্ধ লোকটিই প্রথম প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করলেন। "আসুন মিঃ রুডল ওর সঙ্গে কথা বলবেন; আশা করি এবার তার সুবুদ্ধি হবে। ছেলেটা অলস। ছেলেটা অলস।"

একথা শুনে কোন জবাব না দিয়েই ছেলেটি তার নিজের যাবার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল; আমিও এই বলে তিনটি অপেক্ষমান প্রাণীর কৌতূহলকে নিবৃত্ত

করলাম যে আমি কথা দিয়েছি চুপ করে থাকব, আর সে কথা রাখতে আমি কৃতসংকল্প; যথাসময়ে তাঁরা সব কিছুই জানতে পারবেন। বর্তমানে তাঁরা যেন আমার কথার উপর ভরসা রাখেন, আমি সাধ্যমতো তাঁদের সেবা করতে চেষ্টা করব, তাঁদের ছেলের যাতে ভাল হয় তাই করব। এককথায় তাঁরা চুপ করে গেলেন; সন্তুষ্ট হলেন একথা বলতে পারব না।

পরদিন সকাল পাঁচটার আগেই শ্রীমান আমার ঘরে এসে হাজির বেশ চটপটে ভাব। আমিও উঠে তার সঙ্গে চললাম। যে মাঠে সে আমাকে নিয়ে গেল আমার অনুমান সেটা বিশ একর, চারিদিক খোলা, সব বাড়ি ঘর প্রায় তিন ফার্লং দূরে। মাঠে ঢুকে এক-তৃতীয়াংশ যাবার আগেই স্ত্রীরূপধারী সেই ছায়ামূর্তি—আকস্মিক আবির্ভাব ও প্রস্থান সমেত হুবহু শ্রীমানের দেওয়া বর্ণনারই অনুরূপ—এসে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমিও কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। যদিও মনে মনে স্থির করেই গিয়েছিলাম যে তার সঙ্গে কথা বলব, তথাপি পিছন ফিরে তাকাবার শক্তি বা সাহস কোনটাই আমার হল না; তবু আমার ছাত্র তথা পথপ্রদর্শকের সামনে কোনরকম ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করলাম না। তাকে শুধু জানালাম, তার কথার সত্যতায় আমি সন্তুষ্ট। আমরা মাঠটার শেষ পর্যন্ত গেলাম, আবার ফিরে এলাম, কিন্তু ভূতটি একবারের বেশী আমাদের দেখা দিল না। ছেলেটির মধ্যে বিস্ময়মিশ্রিত একধরনের সাহসিকতা লক্ষ্য করলাম; তার সাহসের কারণ অবশ্যই আমার উপস্থিতি এবং তার কথার সত্যতার প্রমাণ, আর বিস্ময়ের কারণ ছায়ামূর্তির আবির্ভাব।

এককথায় আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম ঃ আমি কিছুটা বিচলিত, আর ছেলেটি উত্তেজিত। আমরা ফেরামাত্রই কৌতূহলী ভদ্রমহিলাটি আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সুযোগমতো তাকে বললাম, আমার মতে তার ছেলের অভিযোগ উপেক্ষা করা বা অবিশ্বাস করার মতো নয়; তবু এ ব্যাপারে আমার মতামত এখনও স্থির করতে পারি নি। তাকে সতর্ক করে দিলাম, কথাটা যেন প্রচার না হয়; তাহলে যে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত হতে পারি নি তা নিয়ে গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।

ঠিক সেইসময় আমার এমন কাজ পড়ে গেল যাতে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, সেই সন্ধ্যায়ই লন্ডনে যাত্রা করলাম, তবে কথা দিয়ে গেলাম যে পরের সপ্তাহে আবার তাদের সঙ্গে দেখা করব। তবু একটা বিশেষ কারণে আটকা পড়ে গেলাম; সেই সপ্তাহেই আমার স্ত্রী এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এল। যাই হোক, সেই অভিযানের নেশাটা আমার মন থেকে গেল

না। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করলাম, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা হেস্তনেস্ত করার সংকল্প নিয়ে তিন সপ্তাহ পরে আবার সেখানে ফিরে গেলাম।

পরদিন ১৬৬৫-র ২৭শে জুলাই তারিখ সকালে আমি একাই সেই ভূতুড়ে মাঠে হাজির হলাম এবং সারা মাঠ হেঁটেও কারও দেখা পেলাম না। ফিরে এসে অন্য একটা পথ ধরলাম; এবার কিন্তু প্রেতমূর্তিটা দেখা দিল, আগের বার ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেটাকে যেখানে দেখেছিলাম অনেকটা সেই জায়গাতেই। মনে হল, এবার সেটা আগেকার চাইতে দ্রুতগতিতে আমার ডান পাশে প্রায় দশ ফুট দূর দিয়ে চলে গেল; তাই আগে থেকে মনস্থির করে এলেও আমি কথা বলার মতো সময়ই পেলাম না।

সেদিন সন্ধ্যায় ব্যবা-মা, ছেলে ও আমি নিজে আমার শোবার ঘরে সমবেত হবার পরে আমি প্রস্তাব করলাম যে পরদিন সকালে আমরা সকলে একসঙ্গে সেখানে যাব, এবং এতে যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই সে বিষয়ে কিছু কথাবার্তার পরে সেটাই স্থির হল। সকাল হলে পাছে চাকর-বাকররা ভয় পেয়ে যায় তাই একটা গমের ক্ষেত দেখতে যাবার অছিলায় তারা তিনজন বেরিয়ে গেল, আর আমি একটা ঘোড়া আনিয়ে অন্য পথ ধরে একটা কম্পাস নিয়ে গেলাম এবং পূর্ব নির্দিষ্ট সিঁড়িটার কাছে তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম।

সেখান থেকে চারজন ধীরে ধীরে কোয়ার্টিল্‌স্‌-এর দিকে হাঁটতে লাগলাম এবং অর্ধেক মাঠ পার হবার আগেই ভূতের দেখা পেলাম। সিঁড়ির উপর দিয়ে সেটা ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হল, আর তারপরেই এত দ্রুত চলতে শুরু করল যে আমরা ছ' সাত পা যেতে না যেতেই সেটা আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তার দিকে ছুটতে লাগলাম; দেখলাম, যে সিঁড়ি দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম সেটার উপর দিয়ে সে চলে গেল; ব্যস, আর কিছুই দেখতে পেলাম না। এক জায়গায় আমি একটা বেড়ার উপর উঠলাম আর সে আর একটার উপর, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না; আমি জোর দিয়ে বলতে পারি—ইংলন্ডের দ্রুততম ঘোড়াও এত অল্প সময়ের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে পারত না। তার এদিনকার আবির্ভাব সম্পর্কে দুটো জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম।

(১) যে শিকারী কুকুরটা আমাদের অগোচরে আমাদের অনুসরণ করছিল সেটা কিন্তু প্রেতমূর্তিটাকে চলে যেতে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিল; তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রেতমূর্তিটা আমাদের ভয় অথবা কল্পনার সৃষ্টি নয়।

(২) প্রেতমূর্তিটার চলন পা ফেলে ফেলে একটার পর একটা ধাপে ধাপে নয় অনেকটা ভেসে চলার মতো, ঠিক যেভাবে ছেলেমেয়েরা বরফের উপর দিয়ে চলে, অথবা কোন নৌকা যেভাবে খরস্রোতা নদীর উপর দিয়ে চলে; প্রাচীনকালের লেখকরা (হেলিওডোরাস) প্রেতাত্মাদের চলার যে বিবরণ দিয়েছেন ঠিক তার মতো।

কিন্তু আমার কথায়ই ফিরে যাই। নিজেদের চোখে এই সব দেখে বৃদ্ধ দম্পতি ছেলের কথায় যেমন বিশ্বাস করল তেমনই খুব ভয়ও পেল; কারণ এই ডরোথি ডিংলেকে তার জীবিতকালে তারা চিনত, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিল, আর এখন এই প্রেতমূর্তির মধ্যে অবিকল তার মূর্তিই দেখতে পেল। আমি সাধ্যমতো তাদের উৎসাহ দিলাম, কিন্তু তারা আর অগ্রসর হতে চাইল না। যাই হোক, আমি স্থির করলাম শেষ পর্যন্ত দেখব, এবং এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর যেসব আইনসম্মত পন্থা আবিষ্কার করছেন, আর পন্ডিত লোকরা যাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তারই সাহায্য নেব।

পরদিন বৃহস্পতিবার। খুব ভোরে উঠে আমি একাই গেলাম। কোয়ার্টিল্‌স-এর ঠিক পাশের মাঠটাতে মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে আধ ঘন্টা ধরে হাঁটলাম। পাঁচটার পরেই আমি সিঁড়ি বেয়ে সেই ভূতুড়ে মাঠে পা ফেললাম, আর ত্রিশ বা চল্লিশ পা যেতে না যেতেই পরের সিঁড়িতে ভূতটা দেখা দিল। এসব ক্ষেত্রে যেরকম করতে হয় সেইভাবে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে তাকে ডাকলাম, আর সেটাও ধীরে ধীরে এগোতে লাগল এবং আমি যখন কাছে গেলাম তখন আর সেটা নড়ল না। আবার কথা বললাম, সে জবাব দিল, কিন্তু তার কথা স্পষ্ট শোনাও গেল না, বোঝাও গেল না। আমি কিন্তু মোটেই ভয় পেলাম না, কথা চালিয়ে গেলাম, আর শেষ পর্যন্ত সেও কথা বলল, আমি খুশি হলাম। কিন্তু তখন সব কাজটা শেষ করা গেল না; সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের এক ঘন্টা পরে সেই একই জায়গায় সেটা আবার আমার সঙ্গে দেখা করল, আর দু'পক্ষেরই কিছু কথাবার্তার পরে সেটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই থেকে আর কোনদিন সে দেখা দেয়নি, বা কোন মানুষের ক্ষতি করে নি। আমার সকালবেলাকার আলোচনাটা প্রায় পৌনে এক ঘন্টা ধরে চলেছিল।

এরা সত্য, আর তাই আমি জানি; চোখ ও কান যতটা নিশ্চয়তা দিতে পারে ততটা নিশ্চিতভাবেই জানি; আর যতদিন না আমি বুঝব যে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আমাকে প্রতারিত করে, আর সেই বোঝার ফলে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আমার অবিচল বিশ্বাস থেকে আমি বিচ্যুত না হব, ততদিন আমি জোরের সঙ্গেই বলব যে এখানে

যা কিছু লেখা হল সে সবই সত্য।

এ ব্যাপারে আমার কার্যক্রম নিয়ে লজ্জিত হবারও কোন কারণ দেখি না, কারণ যারা নীতিবান, সুবিবেচক ও প্রগাঢ় পান্ডিত্যের অধিকারী সেই সব মানুষের কাছে আমি এটা প্রমাণ করতে পারি, যদিও এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পেরেই আমি খুশি হয়েছি, অন্যকে বিশ্বাস করবার লাভবিহীন কষ্টের দায় বহন করতে চাইনি; কারণ এ ধরনের অসাধারণ ঘটনাকে বিশ্বাস করানো যে কত কঠিন তা আমি ভাল করেই জানি। এ ধরনের গল্প যে বলে তার কপালে ডাকাতদের হাতে পোলান্ডের পথিকের মতো আচরণই জুটে থাকে ঃ যথা, আগে খুন করে তারপর তল্লাসী—প্রথমে মিথ্যাবাদী হিসাবে দন্ড দিয়ে তারপর অনেক বিলম্বে তার যুক্তি ও প্রমাণগুলি পরীক্ষা করে দেখা। এই অবিশ্বাসের অনেকগুলি কারণ হতে পারে ঃ

(১) পোপতন্ত্রের অন্ধকার যুগে জনসাধারণের সীমাহীন অপপ্রয়োগ এবং চতুর সন্ন্যাসী ও ফকির কর্তৃক তাদের বিশ্বাসের উপর নানাভাবে চাপসৃষ্টি, ইত্যাদি; কারণ তারা খুশিমতো অপচ্ছায়া সৃষ্টি করে নিজেদের কৌশলে গড়া সেই সব অসাধারণ শক্তিকে শান্ত করে টাকা ও বাহবা দুইই আদায় করত।

(২) সেই সময়ে প্রচলিত বস্তুতন্ত্র ও হব্‌সের বিধান, যা নাকি সাড্‌ডুচিদের (সন্দেহবাদীদের) মতবাদেরই পুনরাবির্ভাব স্বরূপ; আর যেহেতু সে মতবাদ প্রকৃতিকেই অস্বীকার করে, সেইহেতু প্রেতমূর্তিকে স্বীকার করে নিতে পারে না; এই প্রসঙ্গে "লেভিয়াথান," পুঃ ১, সি ১২ দ্রষ্টব্য।

(৩) আত্মার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বিষয়ক দর্শন ও ধর্মের এই বিশেষ রহস্যময় অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের যুগের মানুষের অজ্ঞতা। দশ হাজারে একজন পন্ডিতও (অন্যক্ষেত্রে চমৎকার জ্ঞানের অধিকারী হলেও) এ বিষয়ে কিছুই জানে না, অথবা কিছু করতেও পারে না। যা হয়তো মানবজাতির অতুলনীয় কল্যাণ করতে পারত, এই অজ্ঞতার ফলে তার প্রতি জন্ম নিয়েছে আতঙ্ক ও ঘৃণা।

কিন্তু যেহেতু আমি একজন পাদরি ও বয়স্ক যুবক, এবং এ অঞ্চলে অপরিচিত, তাই নীরবতা ও গোপনীয়তাকেই আমি আমার শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা বলে মনে করি।

বাগানের মালী

ফ্রেড্রিক বেনসন

আমার দুই বন্ধু হিউ গ্রেইঞ্জার ও তার স্ত্রী বড়দিনের ছুটি কাটাবার জন্য যে বাড়িটা একমাসের জন্য নিয়েছিল সেখানে অদ্ভুত সব ঘটনার সাক্ষী আমাদের হতে হয়েছিল। তাদের সঙ্গে একপক্ষকাল কাটিয়ে আসার আমন্ত্রণ পাওয়ামাত্রই আমি তাদের সোৎসাহে সম্মতি জানিয়ে দিলাম। ঝোপঝাড়ে ভরা সেই সুন্দর গ্রামাঞ্চলের কথা আমি ভাল করেই জানতাম, এবং সেখানকার মনোরম গল্‌ফের মাঠের ছোট-খাট বিপদের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে গল্‌ফ নিয়েই হিউ ও আমার গোটা দিন কাটবে, আর যেহেতু মার্গারেট খেলাটাকে মোটেই পছন্দ করে না, তাই যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে খেলাটা খেলতে হয় তাতে তাকে কখনই হাত দিতে দেওয়া হবে না।

সেখানে যখন পৌঁছলাম তখনও দিনের আলো আছে; বাড়ির মালিকরা তখনও বাইরেই থাকায় আমি চারদিকটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। দক্ষিণমুখী একটা উঁচু জায়গার উপর বাড়ি ও বাগানটা অবস্থিত; তার নীচে একর দুই ঘাসের জমি একটা আঁকাবাঁকা স্রোতধারার দিকে নেমে গেছে; সেটাকে পার হবার জন্য আছে একটা পায়ে চলার মতো সেতু, আর তার পাশেই রয়েছে সব্জি-বাগানে ঘেরা একটা খড়ের বাড়ি। তার ঠিক পাশ দিয়ে ঘাস-জমির ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে বাগানের বাঁশের ফটকের দিকে; রাস্তাটা পায়ে চলার সেতুটার উপর দিয়ে চলে গেছে; এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান যতটা স্মরণে আছে তা থেকেই বুঝলাম যে এটাই আধ মাইল দূরের গলফের মাঠে যাবার সোজা পথ। কুটিরটা ছোট জমিদার বাড়ির জমিতেই অবস্থিত; তাই আমি সঙ্গে সঙ্গেই ধরে নিলাম যে এটাই মালীর ঘর। কিন্তু এই সহজ অনুমানে একটা খটকা দেখা দিল, কারণ কুটিরে কোন লোক নেই। সন্ধ্যাটা বেশ ঠান্ডা, অথচ চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার কুন্ডলি উঠছে না; আরও কাছে যেতেই মনে হল কুটিরটাকে ঘিরে এমন একটা ভাব রয়েছে যেটা আমরা সাধারণত পোড়ো বাড়ির ক্ষেত্রে কল্পনা করে থাকি। কুটিরের কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই, যদিও তার ছিমছাম অবস্থা দেখে মনে হয় যে নতুন ভাড়াটের জীবন-স্পন্দনের জন্য সেটা সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে আছে। বাগানের নতুন রং-করা পরিষ্কার খুঁটিগুলোও সেই একই কাহিনীর সাক্ষী; ফুলের

কেয়ারিগুলোর কোন যত্ন নেওয়া হয় নি, আগাছাগুলি কেউ তুলে ফেলে নি; সামনের দরজায় পাশের একসারি ক্রিসেন্থিমামের বোঁটাগুলি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এসবই মুহূর্তের ধারণামাত্র, কুটিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি সেখানে থামলাম না, পায়ে-চলা সেতুটা পেরিয়ে ঝোপঝাড়ে ঢাকা মাঠ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। জায়গাটা চিনতে আমার ভুল হয় নি, কারণ আমার ঠিক সামনেই ক্লাব-হাউসটা দেখতে পেলাম। বিকেলের ভ্রমণ সেরে হিউ নিশ্চয় এখনই ফিরে আসবে, আর আমরা একসঙ্গেই ফিরে যেতে পারব। কিন্তু ক্লাব-হাউসে পৌঁছতেই ভান্ডারী জানাল যে পাঁচ মিনিটও হয় নি মিসেস গ্রেইঞ্জার গাড়ি নিয়ে স্বামীর খোঁজ করতে এসেছিলেন; কাজেই আমি যে পথে এসেছিলাম সেই পথ ধরেই ফিরে চললাম। কিন্তু একজন গল্‌ফ খেলোয়াড়ের মতই আমি একটু ঘুরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ গর্তের পথটা চিনতে পারি কি না দেখবার জন্য অন্য একটা পথ ধরলাম।

শীত-সন্ধ্যার আলো দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে; ফিরবার পথে যখন পায়ে-চলা সেতুটা পার হলাম তখন অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। আমার ডান দিকে পথের পাশেই কুটিরটা; সূর্যাস্তের আলোয় তার চুনকাম-করা সাদা দেওয়াল চকচক করছে; চোখ ফিরিয়ে সেতুর সংকীর্ণ কাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে মনে হল যেন কুটিরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে; আর তাই কুটিরে কেউ বাস করে না বলে আমার যে ধারণা হয়েছিল সেটা ভুল প্রমাণিত হল। কিন্তু পুনরায় সেদিকে ভাল করে তাকাতেই বুঝলাম যে আমারই ভুল হয়েছে; পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যাস্তের লাল আলো কাঁচের উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাকে ঠকিয়েছে, কারণ গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় কুটিরটা আগের মতই জনশূন্য দেখাচ্ছে। তবু আমি নীচু খুঁটিওয়ালা বাঁশের ফটকটার পাশেই দাঁড়িয়ে পড়লাম, কারণ যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে বাড়িটা ফাঁকা, তবু অকারণেই একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল যে সেটা ঠিক নয়, কেউ না কেউ ওখানে বাস করে। অবশ্য লোকজন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, তবু আমার মনে একটা অবাস্তব ধারণা জন্মাল যে হয়তো কুটিরটার পিছনে কেউ বাস করে, কুটিরটা সামনে থাকায় আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি না; আর তার চাইতেও যুক্তিহীন একটা ধারণা আমাকে পেয়ে বসল ঃ ওখানে কেউ থাকে কি না সেটা আমাকে দেখতেই হবে। এই কৌতূহলের স্বপক্ষে আমার মন বলল যদি কাউকে সেখানে পাই তো তার কাছ থেকেই জেনে নিতে পারব যে আমার অভীষ্ট বাড়িতে যাবার এটাই সোজা পথ কি না। এই সব ভেবেই বাগানটা পার হয়ে দরজায় টোকা দিলাম। কোন

জবাব এল না; দ্বিতীয়বার টোকা দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেটা তালাবন্ধ; অগত্যা বাড়িতে ফিরে গেলাম। অবশ্যই সেখানে কেউ থাকে না; মনে মনে বললাম, আমার অবস্থা সেই লোকটির মতো যে বিছানার নীচে চোর খুঁজতে গিয়ে সেখানে তাকে পেয়ে গেলে সাতিশয় অবাক হয়ে যায়।

যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন মালিকরা দুজনেই ফিরে এসেছে। ডিনারের আগে দুটি ঘন্টা গল্প-গুজবে বেশ আনন্দেই কেটে গেল। গলফ, রাজনীতি, রাশিয়ার প্রয়োজন, রান্না, ভূতপ্রেত, মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের সম্ভাবনা, আয়কর—যে কোন বিষয় নিয়েই আলোচনা হোক গ্রেইঞ্জার দম্পতির সব কিছুতেই সমান আগ্রহ। নানা ধরনের কথার জাল বুনতে বুনতে যে কোন একটা বিষয়কে জোরদার করে তোলা খুবই সোজা, আর আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বারবারই ভূতের কথা এসে পড়ল।

একসময় হিউ মন্তব্য করল, "মার্গারেট তো পাগল হতেই চলেছে, কারণ সে প্ল্যাঞ্চেট ব্যবহার করতে শুরু করেছে। শুনেছি, তুমি যদি দু'মাস প্ল্যাঞ্চেট ব্যবহার কর, তাহলে অত্যন্ত সাবধানী ডাক্তারও সজ্ঞানে তোমাকে উন্মাদ বলে সার্টিফিকেট দেবে। তার অবশ্য রেডলাম যেতে এখনও পাঁচ মাস বাকি আছে।"

"ওতে কি কোন কাজ হয়?" আমি শুধালাম।

মার্গারেট বলল, "হ্যাঁ, অনেক মজার মজার কথা বলে। এমন সব কথা বলে যা কখনও আমার মাথায়ই আসে নি। আজ রাতে একবার পরীক্ষা করব।"

হিউ বলে উঠল, "না, আজ রাতে নয়, একটা সন্ধ্যা বাদ দেওয়া হোক।"

মার্গারেট একথা মানল না।

বলতে লাগল, "প্ল্যাঞ্চেটকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই, কারণ কোন না কোন জবাব তোমার মনের মধ্যে থাকেই। ধরা যাক, যদি প্রশ্ন করি কাল দিনটা পরিষ্কার থাকবে কি না তাহলে হয়তো—ইচ্ছা করে ঠেলে না দিলেও—আমিই পেন্সিলটা ঘুরিয়ে লিখে ফেলি হ্যাঁ।"

"আর সেদিনই বৃষ্টি হয়," হিউ বলল।

"সবসময়ই নয়, বাধা দিও না। আসল মজা হল পেন্সিলটাকে তার খুশিমতো লিখতে দেওয়া। প্রায়ই পেন্সিলের মুখে ঘ্যাস, ও বাঁকা লাইন আঁকা পড়ে—যদিও তার কোন অর্থ থাকতেও পারে—আর প্রায়ই এমন একটা শব্দ আসে যার অর্থই আমি জানি না, সুতরাং সেটা আমার মনের কথা হতেই পারে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কাল সন্ধ্যায় আমি বার বার লিখেছি, "মালী"। তার অর্থ কি হতে পারে?

এখানকার মালীটি মেথডিস্ট গির্জার লোক, তার থুতনিতে নূর আছে। প্ল্যাঞ্চেট কি তার কথাই বলেছে? আরে, প্রসাধনের সময় হয়ে গেছে। দয়া করে দেরি করবেন না, ঝোলের ব্যাপারে আমার রাঁধুনিটি বড়ই খুঁতখুঁতে।"

উঠে পড়লাম; "মালী," কথাটার সঙ্গে কিছু ধারণা আমার মনের মধ্যে গেঁথে রইল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাল কথা, পায়ে-চলা সেতুর পাশের এই কুটিরটা কিসের? ওটাই কি মালীর ঘর?"

"তাই ছিল," হিউ বলল। "কিন্তু নুর—দাঁড়ি এখন আর সেখানে থাকে না ঃ আসলে কেউ থাকে না। ওটা খালি। আমি যদি এখানকার মালিক হতাম তাহলে নুর—দাঁড়িকে এখানেই রেখে তার মাইনে থেকে ভাড়াটা কেটে নিতাম। অনেকেরই ব্যয়-হ্রাসের কোন ধারণা থাকে না তো। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

দেখলাম, মার্গারেট সাগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কৌতূহল," আমি বললাম। "নেহাৎই কৌতূহল।"

"আমি বিশ্বাস করি না," মার্গারেট বলল।

"কিন্তু সত্যি তাই," আমি বললাম। "বাড়িটাতে কেউ থাকে কি না সেটা জানবার একটা অর্থহীন কৌতূহল। ওটার পাশ দিয়ে ক্লাব হাউসে যাবার সময় ওটাকে খালি বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু ফিরবার সময় ওখানে কেউ থাকে বলে এত বেশী মনে হল যে দরজায় পর্যন্ত টোকা দিয়েছি, আর শেষ পর্যন্ত ফিরেই এসেছি।"

হিউ ততক্ষণে উপরে উঠে গেছে; মার্গারেট দাঁড়িয়ে পড়ল।

শুধাল, "সেখানে কেউ ছিল না? আশ্চর্য ঃ এ ব্যাপারে আমার ধারণাও কিন্তু ঠিক আপনার মতো।"

আমি বললাম, "প্ল্যাঞ্চেটে বারবার "মালী," কথাটা লেখার ব্যাপারটাও ওতেই পরিষ্কার বোঝা গেল। মালীর কুটিরটার কথা সর্বদাই আপনার মনের মধ্যে ছিল।"

"কী বুদ্ধি," মার্গারেট বলল। "তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিন।"

সে রাতে যখন বিছানায় শুতে গেলাম তখন আমার জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল চাঁদের আলো এসে পড়ায় বাইরে তাকালাম। আমার ঘরের সামনেই বাগান আর সেই মাঠটা বিকেলে যেটা আমি পার হয়ে এসেছি। সবকিছুই পূর্ণ চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। ছোট নদীটার পাশে সাদা দেওয়ালের

কুটিরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; জানালার কাঁচের উপর আলো পড়ায় আরও একবার মনে হল যেন ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। একই দিনে দু'বার এই ভ্রান্ত দর্শন ঘটাটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হল, কিন্তু এবার অধিকতর অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। আমি দেখতে দেখতেই আলোটা নিভে গেল।

রাত পরিষ্কার থাকায় পরদিন সকালটাও পরিষ্কার থাকবে বলে যে আশা করা গিয়েছিল সেটা হল না। ঘুম ভাঙতেই দেখি বাইরে বাতাস হাহাকার করছে, আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বৃষ্টির ছাঁট এসে আমার জানালার কাঁচের উপর আছড়ে পড়ছে। গলফ খেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না; যদিও বিকেলের দিকে ঝড়ের বেগ কিছুটা কমল, তবু একটানা বৃষ্টি পড়েই চলল। ঘরের ভিতরে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠলাম, অপর দু'জন বাইরে পা বাড়াতে কিছুতেই রাজী না হওয়ায় খোলা হাওয়ায় একটু শ্বাস নিতে গায়ে ম্যানিনটোশ চাপিয়ে আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম। বেড়াতে বেরিয়ে মাঠের ভিতরকার কর্দমাক্ত সোজা পথটার বদলে গল্‌ফের মাঠের রাস্তাটা ধরলাম; মনের ইচ্ছা, পরদিন সকালের জন্য হিউ ও আমার দুটো বক্স ঠিক করে রাখব। ধূমপানের ঘরে বসে ছবিওয়ালা পত্রিকাগুলি নিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম, পড়ার মধ্যে কতক্ষণ ডুবে ছিলাম মনে নেই, কিন্তু অস্তসূর্যের কিরণ এসে হঠাৎ আমার পাতাটাকে আলোকিত করে দিল; চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে, আর সন্ধ্যা নেমে আসছে দ্রুত পায়ে। তাই আবারও ঘোরা পথে না গিয়ে মাঠের ভিতরকার পথটা ধরেই বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। সেটাই দিনের মতো সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি, আর চব্বিশ ঘন্টা আগের মতই আবার আমি সেতুটা পার হয়ে এগোতে লাগলাম। যতদূর মনে পড়ে, সেই সময় পর্যন্তও সেতুর কথাটা আমি একবারও ভাবিনি, কিন্তু কাল রাতে সেখানে যে আলোটাকে হঠাৎ নিভে যেতে দেখেছিলাম সেই কথাটা চকিতে মনে পড়ে গেল, আর সেই মুহূর্তে আমার মনে দুর্জয় প্রত্যয় জাগল যে ঐ কুটিরে মানুষ বাস করছে। এই কথাগুলি ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, দরজার পাশে একটা মনুষ্য মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। গোধূলির আলোয় মুখটা চিনতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে লোকটি দীর্ঘকায়, মজবুত গড়ন। সে দরজাটা খুলল, ভিতর থেকে বাতির একটা আবছা আলো বেরিয়ে এল; ঘরে ঢুকে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তাহলে আমার ধারণাই ঠিক। অথচ আমাকে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কুটিরটা খালি ঃ তাহলে যেন বাড়িতেই ফিরেছে এমনভাবে কে ভিতরে ঢুকল? আর একবার, এবার ঈষৎ ভয়ের সঙ্গেই, দরজায় টোকা দিলাম, মনের ইচ্ছা

দু'একটা সাধারণ প্রশ্ন করব; আবার টোকা দিলাম, একবার বেশ জোরে, যাতে আমার ডাক না শোনার কোন প্রশ্নই উঠতে না পারে। কিন্তু তথাপি কোন জবাব না আসায় শেষ পর্যন্ত দরজায় হাতলটা লক্ষ্য করলাম। সেটা তালাবন্ধ। তারপর অনেক কষ্টে ক্রমবর্ধমান ভয়কে সংযত করে কুটিরের চারদিকটা ঘুরলাম। প্রতিটি খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। ভিতরে সব অন্ধকার, অথচ দু'মিনিট আগে খোলা দরজা দিয়ে একঝলক আলো বেরিয়ে আসতে দেখেছি।

যেহেতু আমার মনের মধ্যে অনেকরকম অনুমান গড়ে উঠেছিল তাই এই বিচিত্র অভিযানের কথা কাউকে বললাম না। ডিনারের পরে হিউর প্রতিবাদের মধ্যেই মার্গারেট সেই প্ল্যাঞ্চেটটা বের করল যেটা অনবরত "মালী" কথাটা লিখে যাচ্ছে। আমার অনুমানটা অবশ্য খুবই অদ্ভুত, কিন্তু মার্গারেটকে কোনরকম ইঙ্গিত করতে আমি চাইলাম না ..... অনেকক্ষণ যাবৎ পেন্সিলটা তার কাগজের উপর নড়েচড়ে কতকগুলি ঘ্যাঁস, বাঁকা রেখা ও আবহাওয়ার চার্টের মতো উঁচু-নীচু চড়াই এঁকে চলল, আর এই পরীক্ষা চালাতে চালাতে কোন সুসংবদ্ধ শব্দ গড়ে ওঠার আগেই ক্লান্তিতে হাই তুলতে তুলতে মার্গারেটের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল; মনে হল সে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে।

বই থেকে মুখ তুলে হিউ আমার কানে কানে বলল, "কালও এইভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

মার্গারেটের চোখ বুজে এল, ঘুমন্ত মানুষের মতো নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, তারপর আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে তার হাতটা নড়তে লাগল। মস্ত বড় কাগজখানার উপর সোজা এক পংক্তি লেখা হয়ে গেল; একেবারে শেষে গিয়ে তার হাতটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল; সে জেগে উঠল।

কাগজটার দিকে তাকাল।

বলল, "হ্যালো! তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে চালাকি করেছ!"

সেটা যে সত্যি নয় সেকথা তাকে বোঝালাম; যা লিখেছে সেটা সে পড়ল।

লেখাটা এইরকম ঃ "মালী, মালী, আমিই মালী। আমি ভিতরে আসতে চাই। তাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।"

"হায় প্রভু, আবার সেই মালী।" হিউ বলল, কাগজ থেকে চোখ তুলে দেখলাম, মার্গারেটের দুই চোখ আমার উপর স্থিরনিবদ্ধ; সেকথা বলার আগেই আমি তার মনের কথা বুঝতে পারলাম।

"আপনি কি খালি কুটিরটার পাশ দিয়ে বাড়ি এসেছিলেন?" মার্গারেট প্রশ্ন করল।

সে নীচু গলায় বলল, "এখনও খালি আছে? অথবা—অথবা অন্য কিছু?"

আমি সত্যি যা দেখেছি—অথবা দেখেছি বলে আমার ধারণা—সেটা তাকে বলতে চাইলাম না। যদি অদ্ভুত কিছু, দেখার যোগ্য কিছু ঘটে, সেক্ষেত্রে আমাদের নিজ নিজ ধারণা যাতে পরস্পরকে সমর্থন না করে সেটাই তো ভাল।

বললাম, "আবার টোকা দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন জবাব পাই নি।"

ইতিমধ্যে শুতে যাবার প্রস্তাব হল ঃ মার্গারেটই কথাটা তুলল; সে উপরে চলে যাবার পরে হিউ ও আমি আবহাওয়ার খোঁজ করতে সামনের দরজায় গেলাম। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠেছে, আমরা বাড়ির সামনেকার ঘাসে ঢাকা পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ দ্রুত ঘুরে গিয়ে হিউ বাড়ির কোণের দিকে আঙুল তুলে বলল, "ওটা কে? দেখ। ওখানে! ঐ তো মোড়টা ঘুরে গেল।"

শক্ত-সমর্থ গড়নের একটি ঢ্যাঙা লোককে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম।

হিউ শুধাল, "দেখতে পাও নি? আমি ঘুরে যাচ্ছি, ওকে ধরতেই হবে। রাতের বেলায় কেউ আমাদের চারধারে ঘোরাঘুরি করবে সেটা আমি চাই না। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর, লোকটি যদি ওদিক থেকে ঘুরে এখানে আসে তো সে কি জন্যে এসেছে জিজ্ঞাসা করো।"

হিউ চলে গেল; সামনের খোলা দরজাটার কাছে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে সবে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে এমন সময় দ্রুত অথচ ভারী পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম; উল্টোদিক থেকে সে শব্দ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। অদৃশ্য পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। তারপরই আমি আতঙ্কে কেঁপে উঠলাম, মনে হল অদৃশ্য কেউ আমাকে ধাক্কা দিয়ে চৌকাঠ পার হয়ে গেল। কেঁপে উঠলাম—ভূতের ভয়ে নয়, কারণ আমার হাতে তার বরফ-ঠান্ডা ছোঁয়া আমি অনুভব করেছি। অদৃশ্য অতিথিটিকে ধরতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সে পিছনে চলে গেল। আর পরমুহূর্তেই ভিতরকার মেঝের কার্পেটের উপর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ভিতরকার একটা দরজা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল, তারপর আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। পরমুহূর্তেই যেদিক থেকে পায়ের শব্দ এসেছিল বাড়ির সেই কোণের দিক থেকে হিউ ছুটতে ছুটতে এল।

জানতে চাইল, "কিন্তু সে কোথায়? আমার থেকে বিশ গজের বেশী দূরে তো ছিল না—একটি বড়, ঢ্যাঙা লোক।"

আমি বললাম, "কাউকে দেখতে পাই নি। রাস্তায় তার পায়ের শব্দ শুনেছি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাই নি।"

"তারপর?" হিউ শুধাল।

বললাম, "সে যাই হোক আমাকে ঠেলে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে।"

ওক কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হয় নি। বাড়ির একতলার এঘর থেকে ওঘর আমরা অনেক খুঁজলাম। খাবার ঘর ও ধূমপানের ঘরের দরজা তালাবন্ধ, বৈঠকখানা ঘরে ঢুকবার দরজাটা খোলা; একমাত্র যে দরজাটা দেখলে খুলে আবার বন্ধ করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে সেটা হল রান্নাঘর ও চাকরদের ঘরে যাবার দরজা। সেখানে খোঁজ করেও কোন ফল হল না; রান্নাঘর, বাসন মাজার ঘর, জুতোর ঘর, চাকরদের ঘর—সর্বত্র খোঁজ করা হল, কেউ কোথাও নেই, সব ফাঁকা। আগুনের পাশে একটা দোলনা-চেয়ার পাতা আছে; সেটা তখনও দুলছে, যেন কেউ সেটাতে বসেছিল, এইমাত্র উঠে গেছে। চেয়ারটা ধীরে ধীরে দুলছে, মনে হচ্ছে কেউ সেখানে আছে, কিন্তু এখন অদৃশ্য। মনে পড়ছে, এগিয়ে গিয়ে সেটাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার হাতটাই যেন সেদিকে যেতে চাইল না।

যা দেখেছিলাম, এবং বিশেষ করে যা দেখতে পাই নি, অধিকাংশ মানুষের ঘুম কেড়ে নেবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট, আর নিশ্চয়ই আমি খুব শক্ত মনের লোক নই। খোলা চোখে ও খোলা কানে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়েছিলাম; তারপর একসময় যখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম তখন ঘরের মধ্যে সঞ্চরমান একটি মানুষের অস্পষ্ট অথচ অভ্রান্ত শব্দ আমাকে ঘুমের দেশের সীমান্ত থেকে তুলে নিয়ে এল। আমার মনে হল, হিউ হয়তো একা একাই খোঁজ করতে এসেছে, আর এগুলো তারই পায়ের শব্দ, কিন্তু তখনই আমাদের দুই ঘরের মাঝখানের দরজায় একটা টোকার শব্দ হল, আর আমার প্রশ্নের জবাবে মনে হল যে আমিই এখন অস্বস্তির সঙ্গে কথা বলছি কি না জানবার জন্যই হিউ এসেছে। আমরা যখন কথা বলছি তখনই পায়ের শব্দটা আমার দরজাটা পার হয়ে গেল, এবং উপরে যাবার সিঁড়িতে মচমচ শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই ছাদের কোন ঘরে আমাদের ঠিক মাথার উপরে পায়ের শব্দ হতে লাগল।

হিউ বলল, "ওখানে তো চাকরদের শোবার ঘর নয়। ওখানে কেউ ঘুমোয় না। চল তো, দেখে আসি ঃ নিশ্চয় কেউ এসেছে।"

মোমবাতি জ্বালিয়ে পা টিপে টিপে উপরে উঠতে লাগলাম। আর যেই একেবারে উপরের সিঁড়িটায় পা দিয়েছি অমনি আমার ঠিক এক পা আগে থেকে কিন্তু হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলে উঠল।

"কিন্তু কে যেন আমার পাশ দিয়ে চলে গেল।" বলেই সে বাতাসকেই

আঁকড়ে ধরল। আমারও সেই একই অনুভূতি হল, আর পরমুহূর্তেই আমাদের নীচের দিককার সিঁড়িতে মচমচ শব্দ উঠল; অদৃশ্য মানুষটি নেমে গেল।

সারারাত ধরে সেই পায়ের শব্দ বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, কেউ যেন সারাবাড়িটা খুঁজে ফিরছে। শুয়ে শুয়ে সেই শব্দ শুনতে শুনতে মার্গারেটের আঙুল থেকে প্ল্যাঞ্চেটের পেন্সিলের মুখে যেকথা লেখা হয়েছিল সেটা আমার মনে পড়ে গেল। "আমি ভিতরে যেতে চাই। তাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।" ..... সত্যি, কেউ একজন এসেছে, সর্বত্র খোঁজ করছে। মনে হতে পারে, তাহলে তো সেই মালী। কিন্তু অদৃশ্য অনুসন্ধানকারী এ কোন্ মালী, আর কাকেই বা সে খুঁজছে?

কোন শারীরিক ব্যথা সেরে গেলে যেমন ব্যথাটা ঠিক কি রকম ছিল সেটা মনে করা বেশ শক্ত, ঠিক সেইরকম পরদিন সকালে পোশাক পরতে পরতে গতকালের নৈশ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত প্রেতাত্মার ভয়ের ব্যাপারটাকে অনেক চেষ্টা করেও সঠিকভাবে মনে করতে পারলাম না। শুধু মনে আছে, আবার রাতে দোল্না-চেয়ারটাকে দুলতে দেখে এবং বাইরের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে আমার ভিতরটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এবং আমার গায়ে যে অদৃশ্য ছোঁয়া লেগেছিল তাতেই বুঝেছিলাম যে একজন কেউ বাড়িতে ঢুকেছিল। কিন্তু এখন এই সুন্দর, শান্ত সকালে শীতের সূর্যস্নাত সারাটা দিনমানে কিছুতেই বুঝতে পারছি না সেটা কি ঘটেছিল। শারীরিক ব্যথার মতই সেটা উপস্থিত থাকলে তবেই তাকে বোঝা যেত, কিন্তু সারাটা দিন সে তো অনুপস্থিত। হিউয়েরও সেই একই অবস্থা, বরং ব্যাপারটা নিয়ে সে হাসি-ঠাট্টাই শুরু করে দিল।

বলল, "দেখ, সে যেই হোক, আর যাকেই খুঁজুক, সে কিন্তু দেখতে ভাল। ভাল কথা, মার্গারেটকে কিন্তু একটি কথাও বলো না। এই চেয়ারের দুলুনি বা আবির্ভাবের কথা সে কিছুই শোনে নি। আর যাই হোক, সে কিছুতেই মালী নয়; কে কবে শুনেছে যে মালী সারাক্ষণ বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়?"

সেদিন বিকেলে মার্গারেট গাড়ি নিয়ে তার কোন বন্ধুর বাড়ি চা খেতে গিয়েছিল; ফলে হিউ ও আমি খেলার শেষে ক্লাব-হাউসেই কিছু খেয়ে নিলাম, আর পরপর এই তৃতীয় দিন চুনকাম-করা কুটিরের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু আজ রাতে কেউ সেখানে আছে বলে মনে হল না; কুটিরটা ভয়ানক নির্জন, ভাড়াটেবিহীন খালি বাড়ি যেরকম হয়ে থাকে, জানালা দিয়ে কোন আলো অথবা আলোর মতো কিছুও দেখা গেল না। হিউকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলায় সে তাকেও রাতের স্মৃতির মতই হেসে উড়িয়ে দিল; বাড়ির দরজায় যখন পৌঁছে গেল তখনও সে ব্যাপারটা নিয়ে ইয়ার্কি করেই চলেছে।

বলল, "আরে বাবা, এও একধরনের মনের রোগ। মাথায় লাগাবার মতো। আরে, দরজা যে তালাবন্ধ!"

সে কড়া নাড়ল, দরজায় টোকা দিল; ভিতর থেকে চাবি ঘোরানো ও হুড়কো তোলার শব্দ এল।

যে চাকরটি দরজা খুলে দিল তাকে হিউ শুধাল, "দরজায় তালা কেন?"

"লোকটি এক পা থেকে অপর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। বলল, "আধ ঘন্টা আগে ঘন্টা বেজেছিল স্যার; তা শুনে এসে দেখি একটি লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আর—"

"আচ্ছা?" হিউ বলল।

"তার চাউনি আমার ভাল লাগে নি স্যার; তার কি কাজ জানতে চাইলাম। তিনি কিছুই বললেন না, আর তারপরেই চটপট সরে পড়লেন; আর তাকে দেখতে পেলাম না।"

আমার দিকে তাকিয়ে হিউ শুধাল, "তিনি কোন্‌দিকে গেলেন বলে মনে হল?"

"ঠিক বলতে পারব না স্যার। ঠিক চলে গেলেন বলে মনে হল না। কেউ যেন আমার পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।"

"ঠিক আছে", হিউ শক্ত গলায় বলল।

মার্গারেট তখনও বাড়ি ফেরে নি। একটু পরেই যখন তার মোটরের চাকার শব্দ শোনা গেল তখন হিউ আর একবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা যেন কিছুতেই তাকে না বলা হয়; ইতিমধ্যেই তো সে অভিজ্ঞতার একজন তৃতীয় অংশীদার জুটেছে। চোখে-মুখে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে মার্গারেট ঘরে ঢুকল।

বলল, "আমার প্ল্যাঞ্চেট নিয়ে আর কখনও হাসবে না। মড অ্যাশ্‌ফিল্ডের মুখে একটা অসাধারণ গল্প শুনে এলাম—ভয়ঙ্কর কিন্তু কি নিদারুণভাবে আকর্ষণীয়!"

"ওসব কথা থাক," হিউ বলল।

"শোন, এখানে একজন মালী ছিল। পায়-চলা সেতুটার পাশের ঐ ছোট কুটিরটায় সে থাকত; পরিবারের লোকজন যখন লন্ডনে চলে যেত, তখন সে আর তার স্ত্রী বাড়িটার দেখাশুনা করত আর এখানে থাকত।"

হিউয়ের সঙ্গে আমার দৃষ্টি-বিনিময় হল; তারপর সে চলে গেল। তখন আমি যা ভেবেছি সেও যে ঠিক তাই ভেবেছে এ—কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

মার্গারেট বলতে লাগল, "বিয়ে করেছিল নিজের চাইতে অনেক কম বয়সের একটি মেয়েকে; ধীরে ধীরে সে স্ত্রীর প্রতি ভয়ানক ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল। একদিন রাগের মাথায় নিজের হাতে স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে একজন কুটিরে এসে দেখল সে স্ত্রীকে ধরে কাঁদছে, তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। সকলে পুলিশ ডাকতে গেল, কিন্তু তারা আসার আগেই সে নিজের গলা কেটে ফেলল। কী ভয়ংকর, তাই না? কিন্তু এটাও তো অবাক ব্যাপার যে প্ল্যাঞ্চেট বলে, "মালী। আমি মালী। আমি মালী। আমি ভিতরে আসতে চাই। এখানে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।" জানেন, এসব কিছুই আমি জানতাম না। আজ রাতে আবার প্ল্যাঞ্চেটে বসব। আরে, আধঘন্টার মধ্যেই তো ডাক চলে যাবে, আর আমাকে তো একগাদা চিঠিপত্র পাঠাতে হবে। কিন্তু হিউ, ভবিষ্যতে আমার প্ল্যাঞ্চেটকে সম্মান দিয়ে চলো।"

মার্গারেট চলে গেলে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে কথা বললাম; নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বাস করলেও হিউ কিন্তু এই প্ল্যাঞ্চেটের বুজরুকির পিছনে ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করতে চাইল না। কিন্তু তবু সে আবার বলল, "গত রাতে এই বাড়িতে আমরা যা শুনেছি ও দেখেছি, এবং আজ সন্ধ্যায়ই পুনরায় যে বিচিত্র অতিথিটি এসেছিল তার কথা যেন মার্গারেটকে কিছুই বলা না হয়।"

সে বলল, "সে বেচারি ভয় পাবে, আর আজেবাজে কল্পনা করতে শুরু করবে। আর প্ল্যাঞ্চেটের কথা ওতে হিজিবিজি লেখা ও ঘ্যাঁস আঁকা ছাড়া আর কিছুই হবে না। ওটা কি? হ্যাঁ; ভিতরে আসুন!"

ঘরের ভিতরে কোন এক জায়গা থেকে একটা তীক্ষ্ণ, দৃঢ় ঠোক্করের শব্দ এল। শব্দটা দরজার কাছ থেকে এল বলে আমার মনে হল না, কিন্তু হিউ যখন দেখল যে আসতে বলার জবাবে কেউ সাড়া দিল না তখন সে লাফিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। বাইরের হলঘরে কয়েক পা গিয়েই ফিরে এল।

"শুনতে পাচ্ছ না?" সে শুধাল।

"পাচ্ছি। ওখানে কেউ নেই?"

"একটা প্রাণীও না।"

হিউ অগ্নিকুন্ডের কাছে ফিরে এল; বিরক্তির সঙ্গে সদ্য ধরানো সিগারেটটা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

বলল, "শব্দটা কী বিশ্রী। যদি জানতে চাও আমি আরাম বোধ করছি কি না তাহলে তোমাকে বলি, এর চাইতে কম আরাম আমি জীবনে কখনও পাইনি। যদি

জানতে চাও তো বলি, আমি ভয় পেয়েছি, আর আমার বিশ্বাস তুমিও ভয় পেয়েছ।"

একথা অস্বীকার করার তিলমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না; সে আবার বলতে লাগল।

"আমাদের খুব সংযত হয়ে চলতে হবে। ভয়ের মতো সংক্রামক আর কিছু নেই। আমাদের কাছ থেকে ভয় যেন মার্গারেটকে না ধরে। কিন্তু তুমি তো জান, আমাদের ভয়ের চাইতেও বড় কিছু আছে। একটা কিছু বাড়িতে ঢুকেছে, আর আমরাও তার পিছনে লেগেছি। আগে কখনও আমি এসব জিনিসে বিশ্বাস করতাম না। এক মিনিটের জন্য এটার মুখোমুখি হওয়া যাক। আসলে এটা কি?"

আমি বললাম, "আমি এটাকে কি মনে করি যদি জানতে চাও তো বলি, আমি বিশ্বাস করি যে—লোকটি স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলে তারপর নিজের গলা কেটেছিল, এটা তারই আত্মা। কিন্তু এটা আমাদের কেমন করে আঘাত করতে পারে তা আমি বুঝি না। আসলে নিজেদের ভয়কেই আমরা ভয় করছি।"

হিউ বলল, "কিন্তু আমরা তো এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। তাহলে এ কি করবে? হে ঈশ্বর, শুধু যদি জানতাম এ কি করবে, তাহলে তো কোন কথাই থাকত না। কিন্তু এই যে না জানা ..... আরে, পোশাক পরার সময় হয়ে গেছে।"

ডিনারের সময় মার্গারেটের মন-মেজাজ খুবই ভাল ছিল। গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যেসব আবির্ভাব ঘটেছে তার কিছুই জানে না। বলে তার প্ল্যাঞ্চেট মালীর সম্পর্কে যে "অনুমান" (ভাষাটা তারই) করেছে সেই চিন্তায়ই সে মশগুল হয়ে আছে। সেই আলোচনা থেকেই সে বিষয় পরিবর্তন করে একটা নতুন ধরনের তিনজনে মজার পেশেন্স খেলার কথা বলতে লাগল; খেলাটা সে তার বন্ধুর কাছ থেকে শিখে এসেছে, এবং তাকে কথা দিয়েছে যে ডিনারের পরে আমাদের দুজনকেও শিখিয়ে দেবে। তাই সে করল; আর আমরা দুজনই যে প্ল্যাঞ্চেটকে এড়িয়ে যেতেই চাইছি সেটা না জেনেই সে খেলা নিয়ে মেতে উঠল। কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হল যে রাত অনেক হয়ে গেছে; তাড়াতাড়ি সে সব তাস গুটিয়ে ফেলল।

বলল, "এবার আধ ঘন্টার জন্য প্ল্যাঞ্চেটে বসা যাক।"

হিউ বলল, "আহা, আরও একটা হাত কি খেলা যায় না? অনেকদিন পরে একটা ভাল খেলা দেখলাম। এ খেলার পরে প্ল্যাঞ্চেট একেবারেই জমবে না।"

মার্গারেট বলল, "লক্ষ্মীটি, মালীটি যদি আবার ধরা দেয়, তাহলে বেশ জমবে।"

"কিন্তু এসব তো প্রলাপ," হিউ বলল।

"তুমি এত কঠোর! তাহলে বই পড় গে।"

হিউ উঠে পড়ল। মার্গারেটও ততক্ষণে তার যন্ত্র ও একটা কাগজ বের করে ফেলেছে।

হিউ বলল, "মার্গারেট, আজ রাতে দয়া করে প্ল্যাঞ্চেটে বসো না।"

"কিন্তু কেন? তোমার তো থাকার দরকার নেই।"

"দেখ তবু বলছি, আজ ওটা থাক," হিউ বলল।

মার্গারেট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল।

বলল, "হিউ, তোমার মনে যেন কিছু আছে। সেটা ঝেড়ে ফেল। মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়েছ। ভাবছ, এর মধ্যে রহস্যময় কিছু আছে। সেটা কি?"

বুঝতে পারলাম, কথাটা বলবে কি বলবে না তাই নিয়ে হিউ ইতস্তত করছে। কিন্তু প্ল্যাঞ্চেটে কিছু হিজিবিজি লেখা হোক এটাই সে শেষ পর্যন্ত বেছে নিল।

বলল, "বেশ, তাহলে শুরু করে দাও।"

মার্গারেট ইতস্তত করতে লাগল; হিউকে বিরক্ত করতে সেও চায় না। কিন্তু হিউয়ের এই পীড়াপীড়ি তার কাছে খুবই যুক্তিহীন বলে মনে হচ্ছে। বলল, "বেশ, ঠিক দশ মিনিট; কথা দিচ্ছি, মালীদের কথা মোটেই ভাবব না।"

বোর্ডের উপর হাত রাখা মাত্রই মার্গারেটের মাথাটা সামনে ঝুলে পড়ল, তার যন্ত্রটা চলতে শুরু করল। আমি তার খুব কাছেই বসেছিলাম; সেটা কাগজের উপর ঘুরতে লাগল আর লেখাটা পরিষ্কার ফুটে উঠল।

লেখা হল ঃ "আমি ভিতরে এসেছি, কিন্তু তবু তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা কি তাকে লুকিয়ে রেখেছ? তোমরা যেখানে আছ সে ঘরটা আমি খুঁজে দেখব।"

আরও কি লেখা প্ল্যাঞ্চেটের তলায় চাপা পড়েছিল তা আমি জানি না, কারণ সেই মুহূর্তে একটা বরফ-ঠান্ডা বাতাসের স্রোত ঘরের মধ্যে বয়ে গেল, আর প্রচন্ড জোরে দরজায় একটা ধাক্কা পড়ল। এবার আর ভুল হবার কোন সুযোগ নেই। হিউ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "মার্গারেট, জাগো, কি যেন আসছে।"

দরজাটা খুলে গেল; একটি মনুষ্য মূর্তি দেখা দিল। ঠিক দরজায় দাঁড়িয়ে সে মাথাটাকে সামনে গলিয়ে এদিক ওদিক নাড়তে লাগল; মনে হল, দুটি চোখের একাগ্র ও একান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে ঘরের প্রতিটি কোণ খুঁজে ফিরছে।

হিউ আবার চেঁচিয়ে ডাকল, "মার্গারেট, মার্গারেট।"

কিন্তু মার্গারেটের চোখ দুটিও বিস্ফারিত; এই ভয়ংকর অতিথির উপর স্থিরনিবদ্ধ।

মার্গারেট উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চাপা গলায় বলল, "শান্ত হও হিউ।" ভূতটি এখন সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মরচে-রঙের পুরু দাড়ির উপরকার ঠোঁটটা একবারমাত্র নড়ল, কিন্তু কোন শব্দ বের হল না, শুধু মুখটা নড়ল, আর লালা গড়িয়ে পড়ল। ভূতটা মাথা তুলল, আর—ত্রাসের উপর ত্রাস—আমি দেখলাম তার গলার একটা দিকে একটা লাল, চকচকে ঘা হাঁ করে আছে .....

তিনজনই অনড়, জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; একটা মারাত্মক নিশ্চলতা আমাদের না দিল নড়তে, না দিল কথা বলতে। এ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম জানি না; মনে হয় খুব বেশী হলে দশ সেকেন্ড। তারপরই অপচ্ছায়াটা ঘুরে দাঁড়াল, যেমন এসেছিল তেমনিই চলে গেল। কার্পেট-পাতা মেঝের উপর দিয়ে তার চলমান পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম; সামনের দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হল, আর বাড়ি-কাঁপানো শব্দ করে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

"সব শেষ হয়ে গেল" মার্গারেট বলল। "ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা করুন।"

মৃত্যুর দেশ থেকে এই আবির্ভাবের যে কোন ব্যাখ্যা পাঠকরা খুশিমতো করতে পারেন। এটাকে যে মৃত্যুর দেশ থেকে আবির্ভাব বলেই মনে করতে হবে তারও কোন কথা নেই। তিনি একথাও বলতে পারেন, যেখানে এই হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল সেখানে এমন কোন আবেগদীপ্ত প্রমাণ রয়ে গেছে যেটা কোন বিশেষ পরিবেশে দৃশ্য ও অদৃশ্য মূর্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ইথারের ঢেউ, অথবা অন্য অনেক কিছুই এ ধরনের দৃশ্যের ছাপ ধরে রাখতে পারে; সমস্যার সমাধানের জন্য এও বলা যায় যে সেইসব ছাপ যে কোন সময়েই বাস্তবে রূপায়িত হবার যোগ্য। অথবা পাঠক একথাও বলতে পারেন যে মৃত মানুষটির আত্মা সত্যি সত্যি 'আত্মপ্রকাশ করেছিল; যে স্থানে সে অপরাধটি করেছিল আত্মিক প্রায়শ্চিত্ত ও অনুশোচনার জন্য সেখানেই ফিরে এসেছিল। স্বভাবতই কোন বস্তুবাদীই মুহূর্তের জন্যও এই ব্যাখ্যাকে মেনে নেবেন না; আবার একজন বস্তুবাদীর মতো একগুঁয়ে যুক্তিহীন মানুষও তো দ্বিতীয়টি নেই। একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা যে সেখানে ঘটেছিল সেটা তো সন্দেহের অতীত, আর মার্গারেটের শেষ উক্তিটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

লাল ঘর

এইচ. জি. ওয়েলস্

বললাম, "আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলতে পারি, ভূতটা একেবারে আমার সামনে এসে না দাঁড়ালে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।" গ্লাসটা হাতে নিয়ে অগ্নিকুন্ডের পাশে দাঁড়ালাম।

"বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা," শুষ্ক বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি বলল, তারপর আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি বললাম, "আঠাশ বছর আমি বেঁচে আছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা ভূতও দেখি নি।"

ম্লান চোখ দুটি মেলে বৃদ্ধটি অগ্নিকুণ্ডের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সে বলে উঠল, "বটে; তুমি আঠাশ বছর বেঁচে আছ, অথচ এরকম আর একটা বাড়িও তো কখনও দেখনি। মাত্র আঠাশ বছর বয়সে মানুষের অনেক কিছু দেখা বাকি থাকে।" বুড়ি ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়তে লাগল। "আরও অনেক কিছু দেখতে হবে, অনেক দুঃখ পেতে হবে।"

আমার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগল যে বারবার একই কথা বলে বুড়োবুড়ি তাদের বাড়ির ভৌতিক সন্ত্রাসটাকে বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। খালি গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ঘরের চারদিকে তাকালাম; শেষ প্রান্তে রাখা একটা অদ্ভুত পুরনো আয়নার মধ্যে আমার একটা অসম্ভব ছোট ও মোটা ছবি দেখতে পেলাম। বললাম, "বেশ তো, আজ রাতে যদি কিছু দেখি তাহলে তো আমার জ্ঞানই বাড়বে। কারণ খোলা মন নিয়েই আমি এসেছি।"

বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি আবার বলল, "সেটা তোমার ইচ্ছা।"

বাইরের বারান্দার টালির উপর একটা লাঠি ও লেঙচে-চলা পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম; কব্জার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে দ্বিতীয় বৃদ্ধ ঘরে ঢুকল; এ লোকটি আগের বুড়োটির চাইতেও বেঁকে গেছে, চামড়া আরও কুঁচকে গেছে, বয়স আরও বেশী। একটি মাত্র ক্রাচে সে ভর দিয়ে আছে, চোখ দুটো একটা আবরণ দিয়ে ঢাকা। ক্ষয়ে যাওয়া হলদে দাঁতের নীচ থেকে বিবর্ণ, লালচে নীচের ঠোঁটটা অর্ধেক ঝুলে পড়েছে। টেবিলের উল্টো দিকের হাতল-চেয়ারটার দিকে সোজা এগিয়ে এলোমেলোভাবে বসে পড়েই কাশতে শুরু করল। বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি

নবাগতের দিকে যেভাবে তাকাল তাতে তার অসন্তুষ্টিই স্পষ্ট প্রকাশ পেল; বুড়ি তো তার দিকে ফিরেও তাকাল না; একদৃষ্টিতে অগ্নিকুণ্ডের দিকেই তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণের জন্য কাশিটা থামলে বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি বলল, "বলেছি তো—সেটা তোমার ইচ্ছা।"

"সেটা আমার ইচ্ছা," আমি জবাব দিলাম।

এই প্রথম চোখ-ঢাকা লোকটি আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হল, আমাকে দেখার জন্য মাথাটাকে মুহূর্তের জন্য পিছনে ঠেলে দিয়ে কাৎ করল। চকিতে তার চোখ দুটি দেখতে পেলাম—ক্ষুদে, উজ্জ্বল, যেন জ্বলছে। সে আবার কাশতে কাশতে থুথু ফেলতে লাগল।

বীয়ারটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে শুকনো হাতওয়ালা লোকটি বলল, "একটু খেয়ে নাও না।" চোখ ঢাকা লোকটি কাঁপা হাতে এক গ্লাস ভর্তি বীয়ার ঢালতে গিয়ে আরও অর্ধেকটা টেবিলের উপরেই ফেলে দিল। সে যখন বীয়ার ঢেলে নিয়ে খেতে লাগল তখন তার একটা দানবীকে ছায়া দেওয়ালের উপর পড়ে যেন তার মদ ঢেলে খাওয়া কাজটাকেই ঠাট্টা করতে লাগল। স্বীকার করছি, এইসব অদ্ভুত বাসিন্দাদের আমি এখানে আশা করি নি। বার্ধক্যকে আমি কিছুটা অমানবিক বলেই মনে করি; মনে হয় পুরুষানুক্রমিক কোন রোগ যেন ওৎ পেতে আছে; নিজেদের অজ্ঞাতেই দিনের পর দিন বুড়োদের ভিতর থেকে মানবিক গুণগুলি যেন ঝরে পড়তে থাকে। এই তিন মূর্তির নীরবতা, কুব্জ দেহ, আমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি তাদের অমিত্রসুলভ আচরণ—সব কিছুতেই আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

বললাম, "আপনাদের বাড়ির ভূতুড়ে ঘরটা যদি আমাকে দেখিয়ে দেন তো সেখানে গিয়ে একটু আরাম করতে পারি।"

কেশে বুড়োটি হঠাৎ এমনভাবে মাথাটা পিছনে ঠেলে দিল যে আমি চমকে উঠলাম; ঢাকনার নীচ দিয়ে লাল চোখে সে আবার আমার দিকে তাকাল; কিন্তু কেউ কোন জবাব দিল না। তাদের দিকে পর পর তাকিয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করলাম।

একটু জোরেই বললাম, "আপনাদের ভূতুড়ে ঘরটা যদি দেখিয়ে দেন তো আমাকে দেখাশুনা করার দয়া থেকে আপনাদের মুক্তি দিতে পারি।"

শুকনো হাতওয়ালা লোকটি বলল, "দরজার বাইরে পাথরের উপর একটা মোমবাতি আছে," বলতে বলতে সে আমার পায়ের দিকে তাকাল। "কিন্তু তুমি যদি আজ রাতে লাল ঘরে যাও—"

("সব রাত ফেলে আজকের রাতেই!" বুড়ি বলল।)

"তোমাকে একলা যেতে হবে।"

"ঠিক আছে," আমি জবাব দিলাম। "কোনদিকে যাব?"

সে বলল, "বারান্দা দিয়ে কিছুটা গেলেই একটা দরজা পাবে, দরজা দিয়ে ঢুকলেই একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে, আর সিঁড়ি দিয়ে অর্ধেকটা উঠলেই একটা চাতাল ও পশমী পর্দায় ঢাকা একটা দরজা আছে। সেখানে ঢুকে লম্বা বারান্দা দিয়ে শেষ পর্যন্ত চলে যাবে; সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই তোমার ডান দিকে লাল ঘর।"

তার নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করে বললাম, "ঠিক বলেছি তো?" একটা বিষয়ে বুড়ো আমাকে শুধরে দিল।

চোখ-ঢাকা লোকটি তৃতীয়বার আমার দিকে তাকিয়ে মুখটা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিকভাবে কাঁপিয়ে বলল, "তুমি কি সত্যি সত্যি যাচ্ছ?"

("সব রাত ফেলে আজকের রাতেই!" বুড়ি বলল।)

"এইজন্যেই তো আমি এসেছি," বলে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। চোখ ঢাকা বুড়োটি উঠে লেঙ্চে লেঙ্চে টেবিলটার ওপাশে গিয়ে অন্যদের এবং অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকালাম। আগুকর প্রেক্ষাপটে তিনটি কালো মূর্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বার্ধক্যজীর্ণ মুখে একাগ্রভাব ফুটিয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

দরজাটা খুলে বললাম, "শুভরাত্রি।"

শুকনো হাতওয়ালা লোকটি বলল, "যেমন তোমার ইচ্ছা।"

মোমবাতিটা ভাল করে জ্বলে ওঠা পর্যন্ত দরজাটা খোলাই রাখলাম, তারপর বন্ধ করে দিয়ে ঠান্ডা, প্রতিধ্বনিমুখর বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

স্বীকার করছি, মাননীয়া মহিলাটি এই যে তিন পেন্সনধারী বুড়োবুড়ির উপর তার দুর্গ-নিবাসের দেখাশুনার ভার দিয়েছেন তাদের অদ্ভুত আচরণ, এবং গাঢ় রঙের পুরনোকালের আসবাবপত্রে ভর্তি যে ঘরটাতে তারা জমায়েত হয়েছিল, সেসব কিছুই আমার উপর বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা যেন অন্য যুগের, প্রাচীনতর যুগের মানুষ; সে যুগের ভৌতিক ব্যাপারগুলো আমাদের একালের চাইতে ভিন্নতর ছিল; সে যুগে মানুষ অলক্ষণ ও ডাইনীতে বিশ্বাস করত, আর ভূতের অস্তিত্ব ছিল অনস্বীকার্য। তাদের অস্তিত্বই ছিল অপচ্ছায়ার মতো; তাদের পোশাকের নমুনা ও ফ্যাশন জন্ম নিত মৃতদের মস্তিষ্ক থেকে। তাদের ঘরের অলংকরণ ও সুযোগ সুবিধাগুলিও ভৌতিক—সেইসব অদৃশ্য

মানুষের চিন্তাপ্রসূত যারা আজকের জগতের অংশীদার না হয়েও তাকে জুড়ে থাকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে এসব চিন্তাকে আমি মন থেকে সরিয়ে দিলাম। ভূগর্ভস্থ স্যাঁতসেঁতে লম্বা বারান্দাটা ঠান্ডা ও ধূলোময়; হাতের মোমবাতির শিখাটা কাঁপছে, আর ছায়াগুলো দুলছে। ঘোরানো সিঁড়িটার উপর—নীচে প্রতিধ্বনি ঘুরছে; একটা ছায়া পিছন থেকে আমাকে তাড়া করছে, আর একটা ছায়া আমার সামনে থেকে মাথার উপরকার অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে। চাতালে পৌঁছে একমুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালাম, মনে হল যেন একটা খস্‌খস্ শব্দ শুনতে পেলাম; পরে যখন বুঝতে পারলাম যে, চারদিকে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে তখন রেশমী পর্দায় ঢাকা দরজাটা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

ফল দাঁড়াল অপ্রত্যাশিত; বড় সিঁড়ির বড় জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলো সবকিছুকে স্পষ্ট কালো ছায়ায় অথবা রূপোলি আলো ফুটিয়ে তুলল। সবকিছুই যথাস্থানে সাজানো; আঠারো মাস আগের পরিবর্তে বাড়িটা যেন সবে গতকাল পরিত্যক্ত হয়েছে। শামাদানের গর্তে গর্তে মোমবাতি বসানো রয়েছে, কার্পেটের উপর অথবা পালিশ করা মেঝের উপর যে ধুলো জমেছে সেটা এতই সমানভাবে সব জায়গায় জমেছে যে চাঁদের আলোয় তা চোখেই পড়ছে না। এগোতে গিয়েও আমি হঠাৎ থেমে চাতালের উপরেই একটা ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য রাখা ছিল; দেওয়ালের আড়াল পড়ায় আমি সেটা দেখতে পাইনি; কিন্তু তার ছায়াটা এমন আশ্চর্য স্পষ্ট সাদা দেওয়ালের উপর পড়েছে যে আমার মনে হল আমাকে আক্রমণ করার জন্য কেউ বুঝি লুকিয়ে ওৎ পেতে আছে। হয় তো আধ মিনিটের জন্য আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর পকেটের রিভলবারের উপর হাতটা রেখে কিছুটা এগিয়েই বুঝতে পারলাম, গেনিমিড ও একটি ঈগলের মূর্তি চাঁদের আলোয় চকচক করছে। এই ঘটনায় আমার স্নায়ুর জোর ফিরে এল; আর তাই পরে পিতলের টেবিলের উপর রাখা চীনে মাটির চীনা মূর্তিটার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার মাথাটাকে নিঃশব্দে নড়তে দেখেও আমি মোটেই চমকে উঠিনি।

লাল ঘরের দরজা এবং সেখানে উঠবার সিঁড়ি একটা ছায়াচ্ছন্ন কোণে অবস্থিত। দরজাটা খুলবার আগে হাতের মোমবাতিটাকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখে নিলাম আমি ঠিক কোথায় আছি। মনে হল, এখানেই আমার পূর্ববর্তী আগন্তুককে পাওয়া গিয়েছিল। সেই গল্পটা মনে পড়ায় বুকটা হঠাৎ ভয়ে কেঁপে উঠল, ঘাড় ফিরিয়ে চাঁদের আ[illegible] গেনিমিডের দিকে তাকালাম, তারপর চাতালের পান্ডুর নিস্তব্ধতার দিকে মুখটা অর্ধেক ফিরিয়ে একটু দ্রুত হাতেই লাল ঘরের দরজাটা খুলে ফেললাম।

ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, ভিতরের তালার মধ্যেই চাবিটা পেয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে দিলাম, এবং মোমবাতিটাকে তুলে ধরে লোরেন দর্গের সেই মস্ত বড় লাল ঘরটাকে ভাল করে দেখতে লাগলাম যেখানে তরুণ ডিউকের মৃত্যু হয়েছিল। বরং বলা উচিত, যে ঘরে তার মৃত্যু শুরু হয়েছিল, কারণ সে দরজাটা খুলেছিল এবং যে সিঁড়ি বেয়ে আমি এইমাত্র উঠে এসেছি তার উপর দিয়ে সপাটে গড়িয়ে পড়েছিল। এইভাবেই তার জাগরণের অবসান ঘটেছিল, অবসান ঘটেছিল এখানকার ভূতুড়ে ইতিহাসকে জয় করার দুঃসাহসী প্রচেষ্টার, আমার মনে হল, সন্ন্যাস রোগ আর কখনও বুঝি কুসংস্কারক এমনভাবে সমর্থন করে নি। এই ঘরকে ঘিরে আরও অনেক পুরনো গল্পও আছে ঃ সেসবের একেবারে শুরুতে আছে একটি অর্ধ-বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী—একটি ভীরু স্ত্রীকে ভয় দেখাতে গিয়ে স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী। ছায়াচ্ছন্ন জানালাসমন্বিত মস্ত বড় ঘরটা, তার নানা ফাঁক-ফোকর ও কুলুঙ্গির দিকে তাকালেই এই ঘরটার কালো কালো কোণে ও অন্ধকারের ভিতর যেসব কাহিনী জন্ম নিয়েছে তার অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায়। এই বিরাট ঘরের মধ্যে আমার মোমবাতির আলোক-জিহ্বাটি এতই ছোট যে ঘরের অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছয় না; তাতে যেটুকু আলোকদ্বীপ গড়ে উঠেছে তার বাইরে রয়েছে রহস্য ও ইঙ্গিতের এক অসীম সমুদ্র।

স্থির করলাম, এই মুহূর্তেই জায়গাটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে নেব; এখানকার অস্পষ্টতার সুযোগে যেসব কল্পনার জাল বোনা হয়েছে সেগুলো আমার উপর প্রভাব বিস্তার করার আগেই তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। দরজাটা ঠিকমত বন্ধ আছে কিনা সেটা ভাল করে দেখে নিয়ে ঘরময় হাঁটতে শুরু করলাম, প্রতিটি আসবাবকে খুঁটিয়ে দেখলাম, বিছানা ওল্টালাম, পর্দা সরিয়ে দিলাম। ঘরের মধ্যে দুটো আয়না আছে; প্রত্যেকটিতে একজোড়া করে মোমবাতি বসবার গর্ত; তাছাড়া তাকের উপর চীনামাটির মোমবাতিদানে আরও অনেকগুলো মোমবাতি। একটা একটা করে সবগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম। বুড়ো মানুষটির কাছে অপ্রত্যাশিত হলেও অগ্নিকুণ্ডটা সাজানোই ছিল। যাতে শীতে কাঁপতে না হয় সেজন্য সেটা জ্বালিয়ে দিলাম। আগুনটা ভাল করে জ্বলে উঠলে সেটার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটাকে আর একবার লক্ষ্য করলাম। ছিট-কাপড়ে ঢাকা হাতল-চেয়ার ও একটা টেবিল টেনে এনে আমার সামনে একটা অবরোধ সৃষ্টি করে রিভলবারটাকে হাতের কাছেই রেখে দিলাম। সবকিছু দেখে নেওয়ার ফল ভালই হল; তবু জায়গাটার দূরবিস্তার অন্ধকার পরিপূর্ণ স্তব্ধতাকে নতুন করে কোন কল্পনাকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট মনে হতে লাগল।

নড়াচড়ার শব্দ ও আগুনের ফট্‌ফট্ আওয়াজ আমাকে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারল না। বিশেষ করে একেবারে শেষ প্রান্তের কুলুঙ্গির ছায়াটা দেখলেই মনে হয় ওখানে বুঝি কোন বর্ণনাতীত জীবন্ত প্রাণী লুকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার জন্য একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে তবে বুঝতে পারলাম যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছু সেখানে নেই। মোমবাতিটাকে সেই কুলুঙ্গির ভিতর বসিয়ে রেখে দিলাম।

এর মধ্যেই আমার স্নায়ুর উপর বেশ চাপ পড়তে শুরু করেছে, যদিও তার যথেষ্ট কোন কারণ ছিল না। অবশ্য আমার মনটা বেশ পরিষ্কার ছিল। অসংকোচেই ধরে নিলাম যে অতিপ্রাকৃত কোন কিছুই ঘটবে না; তাই সময় কাটাতে একটা স্থানীয় লোকগাথার সুর বাজাতে লাগলাম। কিছুটা জোর গলায় উচ্চারণও করলাম, কিন্তু তার প্রতিধ্বনিটা ভাল লাগল না। ভূত বা ভূতে-পাওয়া বলে যে কিছু নেই এতক্ষণ পর্যন্ত তা নিয়ে নিজের মনেই যেসব কথা বলছিলাম, ওই একই কারণে তাও ছেড়ে দিলাম। মন আবার ফিরে গেল নীচের ঘরের তিনটি বৃদ্ধ, বিকৃত মানুষের চিন্তায়। ঘরের গম্ভীর লাল ও কালো রং আমাকে অস্বস্তিতে ফেলল; সাতটা মোমবাতি থাকা সত্ত্বেও জায়গাটা নেহাৎই আবছা। কুলুঙ্গির মোমবাতিটা বাতাসে কাঁপছে, আর তার ফলে তার চারদিককার ছায়া ও উপচ্ছায়া অনবরত নড়ছে। এ অবস্থার একটি প্রতিকারের কথা ভাবতেই মনে পড়ে গেল যে বারান্দায় অনেকগুলি মোমবাতি দেখেছি; সামান্য চেষ্টাতেই একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে দরজাটা খোলা রেখে চন্দ্রালোকিত বাইরে বেরিয়ে গেলাম, এবং একটু পরেই দশটা মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলাম। ঘরের মধ্যে যেসব চীনামাটির টুকিটাকি জিনিস ছিল তাতে একটা করে মোমবাতি বসিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়ে যেখানে যেখানে ছায়া গাঢ় হয়ে জমেছে সেইসব জায়গায় বসিয়ে দিলাম; কোনটা মেঝেতে, কোনটা কুলুঙ্গিতে; ফলে আমার সতেরোটি মোমবাতি এমনভাবে রাখা হল যাতে ঘরের এমন এক ইঞ্চি জায়গাও রইল না যেখানে যেকোন একটা মোমবাতির আলো সরাসরি পড়ছে না। আমার মনে হল, এবার ভূত এলে তাকে সাবধান করে দেব যেন মোমবাতির উপর পা না ফেলে। ঘরটা এখন বেশ ভালভাবে আলোকিত হয়েছে। এই ছোট ছোট অগ্নিশিখাগুলি আমাকে ফূর্তি ও আশ্বাস এনে দিল,' মোমবাতিগুলোর পোড়া সল্‌তে কেটে দেওয়া আমার একটা কাজ হল, আর সময় কাটাবারও একটা ভাল উপায় পাওয়া গেল।

অবশ্য এসব সত্ত্বেও এইভাবে অধীর প্রত্যাশায় রাত জেগে বসে থাকতে বেশ কষ্ট হতে লাগল। মাঝরাতের পরে কুলুঙ্গির মোমবাতিটা হঠাৎ নিভে গেল, আর

একটা কালো ছায়া যেন লাফিয়ে সেখানে আস্তানা নিল। মোমবাতিটাকে নিভে যেতে আমি দেখি নি; শুধু মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারটাই দেখতে পেলাম; ঠিক যেভাবে মানুষ হঠাৎ চমকে উঠে কোন অপরিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিটা টের পায়। জোর গলায় বলে উঠলাম, "হায় জোভ! খুব জোর বাতাস তো!"

টেবিল থেকে দেশলাইটা নিয়ে কোণের আলোটা নতুন করে জ্বালিয়ে দিতে ধীরেসুস্থে মেঝেটা পার হয়ে গেলাম। প্রথম কাঠিটা ধরল না, দ্বিতীয়টা জ্বলে উঠতেই মনে হল আমার সামনের দেওয়ালে কে যেন চোখ মিটমিট করছে। অজান্তেই মাথাটা ঘুরিয়ে দেখলাম, অগ্নিকুন্ডের পাশে রাখা ছোট টেবিলটার উপরকার মোমবাতি দুটোও নিভে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ালাম।

বললাম, "ভারী অদ্ভুত! অন্যমনস্কভাবে নিজেই এ কান্ডটা করি নি তো?"

ফিরে এসে আর একটা মোমবাতি জ্বালালাম, আর জ্বালাতে জ্বালাতেই দেখলাম একটা আয়নার ডান দিককার গর্তে বসানো মোমবাতিটা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপরটিও তাই করল। একেবারে নির্ভুল। শিখাটা এমনভাবে নিভল যেন কেউ হঠাৎ একটা আঙুল ও বুড়ো আঙুলের মধ্যে সল্‌তেটা চেপে দিয়েছে; ফলে সল্‌তেটা জ্বলছে না, ধোঁয়াও বের হচ্ছে না, একেবারে কালো হয়ে গেছে। হাঁ করে তাকিয়ে থেকেই দেখলাম, বিছানার পায়ের কাছের মোমবাতিটাও নিভে গেল, আর ছায়াগুলো যেন আমার দিকে আরও এক পা এগিয়ে এল।

"এসব চলবে না!" বলতে বলতেই তাকের উপরকার প্রথমে একটা, তারপর আর একটা নিভে গেল।

"ব্যাপার কি?" চেঁচিয়ে বললাম; গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত স্বর বের হল। আলমারির উপরকার মোমবাতিটা নিভে গেল; যেটা নতুন করে জ্বালিয়েছিলাম সেটাও সেই পথ ধরল।

"মাথা ঠিক রাখ।" আমি বললাম, "মোমবাতিগুলো দরকার," তাকের উপরকার মোমবাতিদানের কাছে দেশলাইটা হাতড়াতে হাতড়াতে আধা-বিকৃত স্বরে বলে উঠলাম। হাত দুটো এমনভাবে কাঁপছে যে দু'দুবার দেশলাই বাক্সের ঠিক জায়গায় কাঠিটা ঠুকতে পারলাম না। তাকটা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জানালার শেষ প্রান্তের দুটো মোমবাতি নিভে গেল। কিন্তু সেই দেশলাইটা দিয়েই বড় আয়নার মোমবাতিগুলো ও মেঝেতে রাখা দরজার পাশের মোমবাতিগুলোকে আবার জ্বালিয়ে দিলাম। তখন মনে হল মোমবাতি নেভার উপরে এক হাত নিয়েছি। কিন্তু তারপরেই এক ফুৎকারে ঘরের বিভিন্ন কোণের

চারটে বাতি একসঙ্গে নিভে গেল; অতি দ্রুত আর একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালালাম, কিন্তু সেটা নিয়ে কোন্‌দিকে যাব তাই নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলাম।

মনস্থির করতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় একটা অদৃশ্য হাত যেন টেবিলের সবগুলি মোমবাতি ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল। ভয়ে চীৎকার করে উঠে কুলুঙ্গির দিকে, তারপর কোণের দিকে, ও পরে জানালার দিকে ছুটে গেলাম; তিনটে বাতিই নতুন করে জ্বালিয়ে দিলাম, আর তখনই অগ্নিকুন্ডের পাশে রাখা দুটো বাতি নিভে গেল। তখন একটা ভাল উপায় মনে পড়ায় দেশলাইটাকে লোহার সিন্দুকটার উপর ফেলে রেখে শোবার ঘরের বাতিদানটাকে হাতে নিলাম। এর ফলে দেশলাই জ্বালাবার সময়টা বাঁচানো গেল; কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাতি নেভার পালা চলতেই থাকল; আর যেসব ছায়াকে আমি ভয় করে দূর করে দিতে চাইছিলাম তারাই ফিরে এল; কখনও এ-পাশ থেকে, কখনও ও-পাশ থেকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসতে লাগল। ঝড়ের ফলে ছিন্ন মেঘ যেমন তারাগুলোকে মুছে ফেলে ঠিক সেইরকম। মাঝে মাঝে একটা তারা দেখা দেয়, আর তখনই হারিয়ে যায়। আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে আমার তখন প্রায় উন্মাদ হবার মতো অবস্থা; আত্ম-সংযম সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। বাতি নেভার বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রাম চালাতে আমি তখন একটা মোমবাতি থেকে অন্য মোমবাতিতে হাঁপাতে হাঁপাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছি।

টেবিলে লেগে আমার উরু ছড়ে গেল, একটা চেয়ার উল্টে দিলাম, ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম, আর টেবিলের ঢাকনাটা মেঝেয় পড়ে গেল। মোমবাতিটা হাত থেকে ছিটকে গেল; উঠতে উঠতেই আর একটা মোমবাতি হাতে নিলাম। টেবিল থেকে সেটাকে এক ঝট্‌কায় তুলে নিতে গিয়ে বাতাসের টানে সেটাও হঠাৎ নিভে গেল, আর সেই সঙ্গে বাকি দুটোও সেই পথেই গেল। কিন্তু ঘরে তখনও একটা আলো আছে, একটা লাল আলো, আর সেই আলোই ছায়াগুলোকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আগুন! অবশ্য তখনও আমি অগ্নিকুন্ডের শিকের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে নিতে পারি।

জ্বলন্ত কয়লার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে আলোর শিখাগুলি নেচে বেড়াচ্ছে এবং আসবাবগুলোর উপর লাল আলোর ঝলকানি ফেলছে, সেদিকে ফিরে ঝাঁঝরির দিকে দু'পা এগোতেই শিখাগুলো কমতে কমতে নিভে গেল, আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আর হাতের মোমবাতিটাকে শিকের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতে দিতেই চোখের নিমেষে অন্ধকার এসে আমাকে ঘিরে ধরল, শ্বাসরোধকারী আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল, আমার দৃষ্টিকে ঢেকে দিল, আমার মস্তিষ্ক থেকে চিন্তার শেষ চিহ্নটুকুও

বিলুপ্ত করে দিল। মোমবাতিটা হাত থেকে পড়ে গেল। সেই ভয়ংকর কালো অন্ধকারকে দূরে ঠেলে রাখতে বৃথাই হাতদুটিকে সামনে বাড়িয়ে দিলাম; আর গলা তুলে সব শক্তি একত্র করে চীৎকার করে উঠলাম—

একবার, দু'বার, তিনবার। মনে হয়, তারপরই স্খলিত পদক্ষেপে এগিয়েছিলাম। হঠাৎ চন্দ্রালোকিত বারান্দার কথা মনে পড়ে গেল, আর মাথাটা নীচু করে দুই হাতে মুখ ঢেকে দরজার দিকে ছুটে গেলাম।

কিন্তু দরজাটা ঠিক কোথায় আছে সেটা ভুলে যাওয়ায় বিছানার কোণের সঙ্গে প্রচন্ড ধাক্কা খেলাম। স্খলিত পায়ে পিছন ফিরে এগোতেই আবার একটা ভারী আসবাবের গায়ে ধাক্কা খেলাম। আজও আবছা মনে পড়ে, অন্ধকারে এইভাবে এদিক-ওদিক ছুটেছিলাম, হাত-পা ছুঁড়েছিলাম, ছুটতে ছুটতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চীৎকার করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত একটা আঘাত লেগেছিল কপালের উপর, মাটিতে পড়ে যাওয়ায় এমন ভয়ংকর একটা অনুভূতি হয়েছিল যার কথা আজও ভুলতে পারি নি, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার একটা উন্মাদ চেষ্টা করেছিলাম, তারপর—আর কিছু মনে নেই।

দিনের আলোয় চোখ মেললাম। মাথায় ভারী ব্যান্ডেজ বাঁধা; বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চারদিকে তাকিয়ে প্রকৃত ঘটনা মনে করতে চেষ্টা করলাম, কিছুক্ষণ কিছুই মনে পড়ল না। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের কোণে তাকালাম; দেখলাম, বৃদ্ধাটি একটি ছোট নীল শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ গ্লাসে ঢালছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কোথায় আছি? মনে হচ্ছে আপনাকে চিনি, কিন্তু আপনি কে তা স্মরণ করতে পারছি না।"

তারা তখন সব কথা বলল, আর আমিও গল্প শোনার মতো লাল ঘরের ভূতুড়ে কাহিনী শুনলাম। বুড়ো বলল, "ভোরবেলা তোমাকে দেখতে পেলাম; কপালে ও ঠোঁটে রক্ত লেগে আছে।"

খুব ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ল। বুড়ো বলল, "ঘরটা যে ভূতুড়ে সে কথা এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো?" তার কথায় এখন আর অনধিকার প্রবেশকারীর প্রতি বিরূপতার সুর নেই, আছে আহত বন্ধুর জন্য সমবেদনার সুর।

বললাম, "হ্যাঁ; ঘরটা ভূতুড়ে।"

"তুমি তো সবই দেখেছ। অথচ এখানে সারা জীবন কাটিয়েও আমরা দেখতে পাই নি। কারণ দেখার সাহসই আমাদের হয় নি ..... আচ্ছা, বল তো বুড়ো জমিদার কি সত্যি সত্যি—"

"না," আমি বললাম; "সেটা ঠিক নয়।"

গ্লাসটা হাতে নিয়েই বুড়ি বলল, "আমি তো তোমাকেও তাই বলছি। তার তরুণী কাউন্টেসটিই তো ভয় পেয়েছিলেন—"

"তাও নয়," আমি বললাম। "ওঘরে জমিদারের ভূতও নেই, কাউন্টেসের ভূতও নেই; কোন ভূতই নেই; কিন্তু তার চাইতে খারাপ, আরও খারাপ—"

"বটে?" সকলে বলল।

আমি বললাম, "যেসব বস্তু অসহায় মানুষগুলোকে তাড়া করে তার মধ্যে সবচাইতে হল উলঙ্গ ভয়। যে ভয় আলো বা শব্দের ধার ধারে না। বিচার-বিবেচনা মানে না, যা শুধু বধির করে দেয়, অন্ধ করে দেয়, অভিভূত করে ফেলে। সেই তো বারান্দায় আমাকে তাড়া করেছিল, ঘরের মধ্যে আমার সঙ্গে লড়াই করেছে—"

হঠাৎ থেমে গেলাম। সব চুপচাপ। আমার হাতটা ব্যান্ডেজকে স্পর্শ করল।

চোখ-ঢাকা লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক তাই, আমিও তাই জানতাম। অন্ধকারের এক মহাশক্তি। একটি নারীর উপর এ কী অভিশাপ? সব সময় ওৎ পেতে থাকে। দিনের বেলায় এমন কি গ্রীষ্মকালের উজ্জ্বল দিনমানেও তাকে অনুভব করা যায়—ঝোলানো ঝাড়-লণ্ঠনের আড়ালে, পর্দার পিছনে যতই মুখোমুখি হতে চেষ্টা কর সে ঠিক আড়ালে সরে যাবে। অন্ধকার নেমে এলে সে হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দায় নেমে আসবে, তোমাকে অনুসরণ করে, কিন্তু মুখ ফেরাবার সাহস তোমার হবে না। কাউন্টেসের ঐ ঘরে বাস করে ভয়—কালো ভয়, আর এই পাপের বাড়ি যতদিন থাকবে ততদিনই ভয়ও থাকবে।"

মাদাম ক্রোল-এর ভূত

যোশেফ সার্দিন হী ফানু

আজ আমি একটি বুড়ি; কিন্তু যে রাতে অ্যাপল্‌ওয়েল হাউসে এসেছিলাম সেদিন আমার বয়স সবে তেরো পার হয়েছে। পিসি ছিল সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী; একটা এক-ঘোড়ার গাড়ি লেক্সহো-তে অপেক্ষা করছিল আমাকে ও আমার বাক্সটাকে অ্যাপল্‌ওয়েল-এ নিয়ে যেতে।

লেক্সহোতে পৌঁছেই আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম; গাড়ি ও ঘোড়ার চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল মাকে নিয়ে তখনই হেজেল্‌ডেন-এ ফিরে যাই। "শে"-তে চড়েই—গাড়িটাকে আমরা ঐ নামেই ডাকতাম—আমি কাঁদতে শুরু করলাম, আর বুড়ো কোচওয়ান ভাল মানুষ জন মুল্‌বেরি আমাকে খুশি করার জন্য গোল্ডেন লায়ন-এ একমুঠো আপেল এনে দিল; মুখে বলল, সেই বড় বাড়িতে পিসির ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে গরম-গরম কিসমিস দেওয়া কেক চা ও শূকর-মাংসের চপ। জ্যোৎস্নালোকিত সুন্দর রাত; শে-র জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি আপেল খেতে লাগলাম।

আমার মতো একটি অসহায় বোকা শিশুকে ভয় দেখানো ভদ্রলোকদের পক্ষে অবশ্যই লজ্জার কথা। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওটা ওদের চালাকি। আমার পাশেই দুটি ভদ্রলোক বসেছিল। রাতে চাঁদ উঠবার পরে তারা আমাকে প্রশ্ন করল, আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম, লেক্সহো-র নিকটবর্তী অ্যাপল্‌ওয়েল হাউসের আরাবেলা ক্রোল ঠাকরুণের সঙ্গিনী হতেই আমি সেখানে যাচ্ছি।

একজন বলে উঠল, "তাই বুঝি; বেশীদিন সেখানে টিকতে পারবে না।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

সে বলল, "কারণ—যদি বাঁচতে চাও তো এ-কথা কাউকে বলো না—তাকে তো শয়তানে ভর করেছে; তিনি নিজেই তো আধা ভূত। তোমার সঙ্গে বাইবেল আছে তো?"

"হ্যাঁ স্যার," আমি বললাম। আমার বাক্সটাতে মা একখানা ছোট বাইবেল ভরে দিয়েছে; আমি জানি সেখানা আজও বাক্সেই আছে, আমার বুড়ো চোখের পক্ষে ছাপার অক্ষরগুলো খুব ছোট হলেও সেখানা আজও আমার কাছে আছে।

"হ্যাঁ স্যার," বলতে গিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই মনে হল যে তার সঙ্গীকে

চোখ টিপল; কিন্তু সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই।

সে বলল, "দেখ, প্রতি রাতেই বইখানাকে অবশ্যই বালিশের নীচে রেখে দিও তাহলেই বুড়ি খুকির নখগুলো তোমার কাছ থেকে দূরে থাকবে।"

তার কথা শুনে আমি যে কি ভয় পেয়েছিলাম তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। বৃদ্ধ মহিলাটি সম্পর্কে তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছাও হয়েছিল, কিন্তু আমি তখন খুব লাজুক ছিলাম, আর তারা দুজনও নিজেদের কথাই বলতে শুরু করে দিল। যথাসময়ে আমি লেক্সহোতে নেমে গেলাম। অন্ধকার পথ ধরে চলতে চলতে আমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগল। বড় বড় সব গাছ ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; গাছগুলিও পুরনো বাড়িটারই মতই পুরনো; চারজন লোক হাতে-হাত ধরেও সে সব গাছকে বেড় দিয়ে ধরতে পারবে না।

যাই হোক, বড় বাড়িটাকে প্রথমবারের মতো দেখবার জন্য জানালা দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম, আর তখনই হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল।

মস্ত বড় একটা সাদা-কালো রংয়ের বাড়ি; বড় বড় কালো বরগা, পাশকপালিগুলো চাঁদের আলোয় কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছে, বাড়ির ঠিক সামনে দু'তিনটে গাছের ছায়া পড়েছে, বড় হলের জানালাগুলির হীরকাকৃতি কাঁচের শার্সির উপর চাঁদের আলো পড়ে চিক চিক করছে, সামনে দেওয়াল থেকে ঝোলানো সেকেলে বড় বড় পর্দা ঝুলছে, সামনের বাকি জানালাগুলি হুড়কো দিয়ে আটকানো, কারণ বাড়ির অধিবাসী বলতে তিন চারটি চাকর ও একটি বৃদ্ধা মহিলা; অধিকাংশ ঘরই তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

যখন বুঝতে পারলাম যে যাত্রা শেষ হয়েছে তখন আমার প্রাণটা যেন মুখের ভিতর উঠে এল।

হলে ঢুকতেই পিসি আমাকে চুমো খেল, তার ঘরে নিয়ে গেল। পিসির চেহারা লম্বা ও সরু, পান্ডুর মুখে দুটি কালো চোখ, কালো দস্তানা পরা লম্বা সরু হাত। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, অল্প কথা বলে, কিন্তু তার কথাই আইন। তার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই; কিন্তু তার মনটা বড় কঠোর; মনে হয়, তার ভাইয়ের মেয়ে না হয়ে আমি যদি তার বোনের মেয়ে হতাম তাহলে পিসি হয় তো আমার প্রতি আরও সদয় ব্যবহার করত। কিন্তু এখন আর সেকথা ভেবে লাভ কি।

জমিদারবাবু—তার নাম মিঃ শেভেনিক্স ক্রোল, ক্রোল গিন্নীর নাতি—বছরে দু'তিনবার নীচে নামতেন বৃদ্ধ মহিলার খোঁজখবর নিতে। আমি যতদিন অ্যাপল্‌ওয়েল হাউসে ছিলাম তার মধ্যে তাকে মাত্র দু'বার দেখেছি।

ঠিক বলতে পারি না, তবে তার দেখাশুনা বেশ ভালভাবেই চলছিল, কারণ আমার পিসি ও দাসী মেগ ওয়াইভার্ন দুজনেরই বিবেক ছিল, আর দুজনই তার প্রতি কর্তব্য পালন করত।

মিসেস ওয়াইভার্ন—পিসি নিজে তাকে মেগ ওয়াইভার্ন বলে ডাকত আর আমার কাছে তার নাম বলত মিসেস ওয়াইভার্ন—মোটাসোটা ও আমুদে স্বভাবের মেয়েমানুষ, বয়স পঞ্চাশ, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সব সময় হাসি-খুশি, হাঁটা-চলা ধীরে সুস্থে। ভাল মাইনে পায়, কিন্তু কিছুটা কঞ্জুস, ভাল জামাকাপড় সব তালা-চাবি দিয়ে আটকে রাখে আর বেশীরভাগ সময় পরে থাকে চকোলেট রংয়ের সূতীর জামা, তাতে লাল-হলুদ টান, আর সবুজ পাতা ও বল আঁকা; জামাটা টেকেও খুব।

যতদিন সেখানে ছিলাম সে আমাকে কিছু দেয় নি, একটা পিতলের অঙ্গুলিত্রাণ পর্যন্ত না; কিন্তু সে ছিল খুব মজার মানুষ, আর সব সময় হাসত; চা খেতে বসে চাইতে তাকেই আমি বেশী পছন্দ করতাম—একটু হাসলে বা গল্প করলেই ছোটরা বশ হয়ে যায়—যদিও পিসি আমাকে খুবই ভালবাসত, তবুও কোন কোন বিষয়ে তার ব্যবহার ছিল কঠোর, কিন্তু নিঃশব্দ।

পিসি আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল, যাতে তার ঘরে চায়ের টেবিল সাজাবার ফাঁকে আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই আমার কাঁধে হাত বুলিয়ে বলল, বয়সের তুলনায় আমি তো বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছি, আর জানতে চাইল যে আমি সাদামাঠা কাজ ও সেলাই করতে পারি কি না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল। তার যে ভাই মারা গেছে আমি নাকি তার মতো অর্থাৎ আমার বাবার মতই দেখতে; অবশ্য সে এ আশাও প্রকাশ করল যে আমি যেন একজন ভাল খ্রীস্টানের মতো চলি এবং কোন বাজে কাজ না করি।

মনে হল, তার ঘরে প্রথম পা দিয়েই কথাগুলি বড়ই কড়া লাগল।

পাশের ঘরে—অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর ঘরে ঢুকলাম; ঘরটা খুব আরামদায়ক, চারদিকে কেবল ওক কাঠ—সুদৃশ্য অগ্নিকুন্ডে কয়লা, পচা ঘাস ও কাঠের আগুন জ্বলছে, টেবিলের উপর চা, গরম কেক ও ধূমায়মান মাংস; আর আছে মিসেস ওয়াইভার্ন—মোটাসোটা ও হাসিখুশি; এক ঘন্টায় সে যত কথা বলে পিসি এক বছরেও তা বলে না।

আমাকে চায়ের টেবিলে বসিয়ে রেখে পিসি উপরে গেল মাদাম ক্রোলকে দেখতে।

মিসেস ওয়াইভার্ন বলল, "বুড়ি জুড়িথ স্কোয়াইলেস জেগে আছে কি না

দেখতেই উনি উপরে গেলেন। আমি এবং মিসেস শাটার্স''—আমার পিসির নাম—''যখন না থাকি তখন জুডিথই মাদাম ক্রোলের পাশে বসে থাকে। মহিলাটি বড়ই গোলমেলে। তার সঙ্গে কথা বলতে হলে খুব সতর্ক থাকতে হবে, নইলে তিনি তোমাকে আগুনের মধ্যে অথবা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেবেন। তিনি যেন বিদ্যুৎগতিতে চলেন, সত্যি, বুড়ি হলেও সেইভাবেই চলেন।''

''তার বয়স কত মা'ম?'' আমি বললাম।

''গত জন্মদিনে তার বয়স ছিল তিরানব্বই বছর; তারপর আট মাস কেটে গেছে,'' বলে সে হাসল। ''তোমার পিসির সামনে তার বিষয়ে কোন প্রশ্ন করো না—বলে দিলাম, মনে থাকে যেন; তাকে যেমনটি দেখবে, তেমনটি চলবে, ব্যস, তাহলেই হল।''

আমি বললাম, ''আচ্ছা মা'ম, তার কাছে আমার কাজ কি হবে?''

''ওই বৃদ্ধার কাছে? দেখ, তোমার পিসি মিসেস শাটার্সই তোমাকে সেকথা বলে দেবেন; তবে আমার ধারণা তোমার কাজ নিয়ে তোমাকে ঐ ঘরে বসে থাকতে হবে, তিনি কোন কিছুর ক্ষতি না করেন সেদিকে নজর রাখতে হবে, টেবিলে তার যেসব জিনিসপত্র আছে তাই নিয়ে তিনি যাতে মেতে থাকেন তার ব্যবস্থা করতে হবে, তার কথামতো খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তাকে সব রকম ক্ষতির বাইরে রাখতে হবে, এবং তিনি বড় বেশী গোলমাল শুরু করলে সজোরে ঘন্টা বাজাতে হবে।''

''তিনি কি কালা মা'ম?''

''না, অন্ধও নন; তার বুদ্ধি সূঁচের মতো তীক্ষ্ণ, কিন্তু কোন কিছুই ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারেন না; আর রাজ-দরবার অথবা জাতীয় সমস্যার আলোচনায় তিনি যতটা সুখ পান ঠিক ততটাই সুখ পান দৈত্য নিধনকারী জ্যাক, অথবা ভাল জুতো-জোড়ার গল্প শুনে।

''আর গত শুক্রবারে যে ছোট মেয়েটি চলে গেছে, সে চলে গেল কেন? পিসি আমার মাকে লিখেছে যে তাকে যেতে হয়েছে।''

''হ্যাঁ; সে চলে গেছে।''

''কিসের জন্য?'' আমি আবার বললাম।

''আমার মনে হয় সে মিসেস শাটার্সের ডাকে সাড়া দেয় নি বলে। আমি ঠিক জানি না। অত কথা বলো না। তোমার পিসি বক-বক করা মেয়েকে সইতে পারেন না।''

''দয়া করে বলুন মা'ম, বৃদ্ধ মহিলার স্বাস্থ্য ভাল তো?'' আমি বললাম।

"সেকথা জিজ্ঞাসা করাটা দোষের নয়। সম্প্রতি একটু ভুগছেন বটে, কিন্তু গত সপ্তাহ থেকে ভাল আছেন; আমি জোর গলায় বলতে পারি তিনি শত বছর বেঁচে থাকবেন! হিস্! বারান্দায় তোমার পিসি আসছেন।"

পিসি ঘরে ঢুকে মিসেস ওয়াইভার্নের সঙ্গে কথা বলতে লাগল; কিছুটা স্বস্তি বোধ করায় আমি ঘরময় ঘুরে ঘুরে এটা-সেটা দেখতে লাগলাম। কাবার্ডে সুন্দর সুন্দর পুরনো চিনেমাটির পুতুল ছিল; দেওয়ালে ছবি টাঙানো; একটা দরজা খোলাই ছিল; ভিতরে একটা অদ্ভুত পুরনো চামড়ার কুর্তা ঝোলানো দেখতে পেলাম; তাতে পটি ও বকলস আঁটা; হাতদুটো খাটের ছত্রির সমান লম্বা।

ভেবেছিলাম আমার দিকে পিসির নজর নেই; কিন্তু সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "ওখানে কি করছ মেয়ে? তোমার হাতে ওটা কি?"

চামড়ার কুর্তাটা হাতে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে বললাম, "এটা মা'ম? এটা কি আমি জানি না মা'ম।"

পিসির ম্লান গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠল, রাগে দুই চোখ জ্বলে উঠল, মনে হল তার আর আমার মাঝখানে দু'পায়ের ব্যবধান না থাকলে সে আমায় আচ্ছা করে ধোলাই দিত। কিন্তু আমার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়েই পিসি এক ঝটকায় জিনিসটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, "যতদিন এখানে থাকবে নিজের জিনিস ছাড়া অন্য কোন কিছুতে কখনও হাত দেবে না।" কুর্তাটা যেখানে ছিল সেখানেই ঝুলিয়ে রেখে পিসি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

মিসেস ওয়াইভার্ন দুই হাত তুলে হাসতে লাগল; নিজের চেয়ারে একটু যেন গড়াগড়িও খেল।

আমার চোখে তখন জল এসে গেছে। পিসির দিকে চোখ টিপে নিজের চোখের জল মুছতে মুছতে—হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল—মিসেস ওয়াইভার্ন বলল, "ধুৎ, মেয়েটি কোন ক্ষতি করতে চায় নি—আমার কাছে এস মেয়ে। ওটা খোঁড়াদের জন্য একটা ক্রাচ; কিন্তু মনে রেখো, কোন প্রশ্ন করো না, তাহলে আমরাও তোমাকে মিথ্যা বলব না; এখানে এসে বস; শুতে যাবার আগে এক মগ বীয়ার খেয়ে নাও।"

মনে রাখবে, আমার ঘরটা ছিল দোতলায়, বৃদ্ধা মহিলার ঘরের ঠিক পাশে, আর মিসেস ওয়াইভার্নের বিছানা ছিল মহিলাটির ঘরে তার বিছানার কাছে। দরকার হলে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে যাবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

সেই রাত এবং আগের দিনের কিছু সময় থেকেই বৃদ্ধা মহিলাটির মেজাজ

ছিল খুবই খারাপ। মাঝেমাঝেই রাগে গোঁ ধরছেন। কখনও কাউকে পোশাক পরাতে দিচ্ছেন না, কখনও বা পোশাক ছাড়াতেও দিচ্ছেন না। সকলে বলে সময়কালে তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলের আশেপাশে এমন কেউ নেই যে মহিলাটির যৌবনকালের কথা স্মরণ করতে পারে। কিন্তু তার পোশাকের বাতিক ভয়ংকর; ঘন রেশম, ঘন সাটিন, ভেলভেট, লেস,—সবরকম পোশাক তার এত আছে যে অন্তত সাতটা দোকান তা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যায়। তার সব পোশাকই সেকেলে ধরনের আর অদ্ভুত, কিন্তু অত্যন্ত দামী।

যাই হোক, আমি শুতে গেলাম। কিছুক্ষণ জেগে কাটল। আমার কাছে সবই নতুন; মনে হল, আমার স্নায়ুর উপর চায়ের চাপ পড়েছে, কারণ উৎসবের দিন ছাড়া আমি চা খেতে অভ্যস্ত নই। মিসেস ওয়াইভার্নের কথা কানে এল; কানের কাছে হাত রেখে ভাল করে কান পাতলাম; কিন্তু মিসেস ক্রোলের কথা শুনতে পেলাম না; তিনি একটি কথাও বলেছেন বলে মনে হল না।

সকলেই তার খুব যত্ন নিত। অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলের লোকরা জানত যে তিনি মারা গেলে প্রত্যেকেরই চাকরি যাবে; আর তাদের চাকরিগুলো যেমন আয়েসের, তেমনই মাইনেও খুব ভাল।

বৃদ্ধাকে দেখতে সপ্তাহে দু'দিন ডাক্তার আসেন, আর তিনি যা বলে যান সকলেই সেইমতো কাজ করে। একটি কথা তিনি প্রতিবারই বলেন; তাকে যেন কখনও কোন বিরক্ত করা বা রাগানো না হয়; সব ব্যাপারেই তাকে তুষ্ট ও হাসিখুশি রাখতে হবে।

কাজেই একই পোশাকে তিনি সারারাত ও পরের দিনটাও কাটালেন, একটি কথাও বললেন না; আমি সারাটাদিন আমার নিজের ঘরে সেলাই করেই কাটিয়ে দিলাম; নীচে গেলাম শুধু খেতে।

বৃদ্ধাকে একবার দেখার, এমন কি তার কথা শোনার বড় ইচ্ছা হল। কিন্তু আমার কাছে তিনি যেন সারাক্ষণ লন্ডনেই কাটিয়ে দিলেন।

ডিনারের পরে পিসি আমাকে ঘন্টাখানেকের জন্য বাইরে বেড়াতে পাঠাল। ফিরে এসে যেন বেঁচে গেলাম। পথের দু'ধারে মস্ত বড় বড় সব গাছ, জায়গাটা অন্ধকার ও নির্জন, আকাশ মেঘে ঢাকা, একলা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কথা ভেবে আমি অনেক কাঁদলাম। সেদিন সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে নিজের ঘরেই বসেছিলাম; মাদাম ক্রোলের শোবার ঘরের দিককার দরজাটা খোলাই ছিল; পিসিও সেখানেই ছিল। এই প্রথম আমি এমন কিছু শুনলাম যেগুলি ঐ বৃদ্ধা মহিলার কথা বলেই মনে হল।

একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে এল; সেটা পাখির না জন্তুর তা জানি না, তবে এক ধরনের সংক্ষিপ্ত ভ্যা-ভ্যা শব্দ।

যত বেশী শুনতে পারি সেইভাবে কান খাড়া করলাম। কিন্তু তার কথার একবিন্দুও বুঝতে পারলাম না। আমার পিসি কিন্তু জবাব দিল ঃ

"প্রভুর ইচ্ছা না হলে শয়তান কাউকে আঘাত করতে পারে না।"

বিছানা থেকে সেই একই অদ্ভুত আওয়াজ এল, কিন্তু আমি তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমার পিসি আবার জবাব দিল ঃ "ওদের মুখ ভার করতে দিন মা'ম ওরা যা খুশি বলুক; প্রভু যদি আমাদের পক্ষে থাকেন তো কে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে?"

দরজার দিকে কান পেতে দম বন্ধ করে সব শুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেঘর থেকে আর কোন শব্দ বা আওয়াজই এল না। প্রায় বিশ মিনিট পরে টেবিলের পাশে বসে পুরনো ঈশপের গল্পের ছবি দেখছি, এমন সময় মনে হল দরজার কাছে কি যেন নড়ছে, তাকিয়ে দেখলাম পিসি দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে; তার হাতটা তোলা।

"হিস্!" নরম গলায় কথাটা বলে সে পা টিপে টিপে আমার কাছে এল, তারপর ফিসফিস করে বলল ঃ "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন; আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনরকম আওয়াজ করবে না; চা খেতে নীচে যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসব—আমি ও মিসেস ওয়াইভার্ন; উনি ঐ ঘরেই ঘুমিয়ে থাকবেন; আমরা এলেই তুমি ছুটে নীচে চলে যাবে, আমার ঘরেই জুডিথ তোমাকে রাতের খাবার এনে দেবে।"

এই কথা বলে পিসি চলে গেল।

আগের মতই আমি আবার ছবির বইটা দেখতে লাগলাম; মাঝে মাঝেই কান খাড়া করছি, কিন্তু কোন শব্দ বা নিঃশ্বাসের আওয়াজ কিছুই শুনতে পেলাম না; বড় ঘরটাতে বসে ক্রমেই আমার ভয় ভয় করতে লাগল, তাই মনে বল আনতে ছবিগুলোর সঙ্গে ফিসফিস করতে শুরু করলাম, কথা বলতে লাগলাম নিজের সঙ্গেই।

শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালাম, ঘরময় হাঁটতে হাঁটতে একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকালাম, কোনরকমে মনটাকে প্রফুল্ল রাখা আর কি। আর শেষ পর্যন্ত কি আর করা যায়, উঁকি দিলাম মাদাম ক্রোলের শয়নকক্ষে।

চমৎকার ঘরখানা; মস্ত বড় পালঙ্ক, সিলিং থেকে ঝোলানো ফুল-কাটা

রেশমী মশারি মেঝে পর্যন্ত নেমে এসে ভাঁজ হয়ে পড়েছে। যে আয়নাটা রয়েছে তত বড় আয়না আগে কখনও দেখি নি; ঘরখানা আলোয় উদ্ভাসিত। গুনে দেখলাম বাইশটা মোমবাতির সবগুলিই জ্বলছে। এরকমটাই তার পছন্দ, তাই কেউ না বলতে সাহস করে না।

দরজার কাছে কান পাতলাম; হাঁ করে চারদিকে তাকালাম, একটা নিঃশ্বাসের শব্দও যখন শুনতে পেলাম না, মশারিটাকে একবারও নড়তে দেখলাম না, তখন আমার বুকে সাহস এল, পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকে চারদিকে তাকালাম। তারপরই বড় আয়নাটায় নিজেকে দেখতে পেলাম, আর তখনই আমার মাথায় ঢুকল, "বিছানায় শোয়া বৃদ্ধ মহিলাটির দিকে একবার তাকাতে দোষ কি?"

ক্রোল ঠাকরুণকে দেখার সাধ যে আমার কত তার অর্ধেকটা জানলেও তুমি আমাকে পাগল মনে করবে; মনে মনে চিন্তা করলাম, এখন যদি উঁকি দিয়ে না দেখি তাহলে এত ভাল আর একটা সুযোগ পেতে আমাকে হয় তো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

তারপর বিছানার কাছে তো গেলাম, মশারিটা কত কাছে, মনের জোর একেবারেই কমে গেল! কিন্তু সাহসে ভর করে ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে আঙুলটা ঢুকিয়ে দিলাম, তারপর হাতটাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম; সবকিছু মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। কাজেই ধীরে-ধীরে মশারিটাতে টান দিলাম, আর সত্যি বলছি, চোখের সামনে দেখলাম লেক্সহো গীর্জার কবরের পাথরের উপর আঁকা যীশু জননীর ছবির মতো টান-টান হয়ে শুয়ে আছেন অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েল হাউসের বিখ্যাত ক্রোল ঠাকরুণ। অপূর্ব সাজে সজ্জিত। আজকাল তুমি সেরকমটা দেখতে পাবে না; লাল ও সবুজ সাটিন ও রেশম, সোনালী লেস; জেনের দিব্যি! সে একটা দৃশ্য বটে! পাউডার মাখানো মস্ত বড় পরচুলা মাথার উপর বসানো, আর, আহা, এত বলী-রেখা কোথায় আছে?—গলার ঢিলে চামড়া পাউডার ঢেলে সাদা করা হয়েছে, দুই গালে রুজ ঘসা হয়েছে, ভুরু দুটো আঁকা। তিনি শুয়ে আছেন যেমন মহিমময়ী তেমনই শক্ত হয়ে; পরনে রেশমী পাজামা; ওই দেখ! তার নাকটা বেঁকে গেল, সরু হয়ে উঠল; চোখের অর্ধেক সাদা অংশ খুলে গেল। এই পোশাক পরে হাতে একটা পাখা নিয়ে বড়িসে একটা বড় ফুলের তোড়া গুঁজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী করা তার অভ্যাস। লতার বালা পরা ছোট হাত দুখানি দুপাশে পড়ে আছে; সরু করে কাটা এরকম লম্বা নখ আমি জীবনে দেখি নি। এরকম নখ রাখা কি বড়লোকদের ফ্যাশন না কি?

দেখ, আমি মনে করি এরকম দৃশ্য দেখলে তুমি নিজেও ভয় পেতে! মশারিটা

ছাড়তে পারলাম না, এক ইঞ্চি নড়তে পারলাম না, তার উপর থেকে চোখও সরাতে পারলাম না; হৃৎপিন্ডটা তখনও স্তব্ধ হয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি চোখ মেললেন, উঠে বসলেন। সহসা ঘুরে গিয়ে লম্বা গোড়ালি দুটো মেঝের উপর ঠুকে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কাঁচের মতো চকচকে দুটি বড় চোখ আমার মুখের উপর রেখে কোঁচকানো ঠোঁটে ও লম্বা নকল দাঁতে একটা দুষ্টু হাসি ফোটালেন।

দেখ, মৃতদেহ একটা স্বাভাবিক বস্তু; কিন্তু এরকম ভয়ংকর দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। সবগুলো আঙুল সোজা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, বয়সের ভারে কোমরটা বেঁকে গেছে। তিনি বলে উঠলেন ঃ

"ওরে মেয়েটা! তুই কেন বলছিস্ যে আমি ছেলেটাকে খুন করেছি? গলা টিপে তোকে ঠান্ডা করে দেব।"

পারলে সেই মুহূর্তেই আমি মুখ ফিরিয়ে ছুটে পালাতাম। কিন্তু তার উপর থেকে চোখ সরাতে পারলাম না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে লাগলাম। আর যেন তারের উপর দিয়ে হাঁটছেন এমনিভাবে খটখট শব্দ করে তিনি আমার দিকে তেড়ে এলেন; তার আঙুলগুলো আমার গলা লক্ষ্য করে উদ্যত, আর জিভ দিয়ে অনবরত একটা শব্দ করছেন—হিজ্—হিজ্!

যত তাড়াতাড়ি পারছি পিছিয়েই চলেছি; তার আঙুলগুলো আমার গলা থেকে আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে; মনে হল তিনি আমাকে ছুঁলেই আমি সব জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলব।

এইভাবে পিছিয়ে পিছিয়ে ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বের হল, শুনলে মনে হবে আমার দেহ ও আত্মা পরস্পরকে ছেড়ে যাচ্ছে; আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পিসি দরজা থেকেই একই হাঁক দিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা মহিলাটি তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, আর আমিও সেই ফাঁকে একছুটে আমার ঘর পেরিয়ে সাধ্যমতো দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম।

তোমাকে বলি, নীচে গৃহকর্ত্রীর ঘরে ঢুকে প্রাণ খুলে একচোট কাঁদলাম। সব কথা শুনে মিসেস ওয়াইভার্ন হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলার কথাগুলি শুনেই তার গলার পর্দা নেমে গেল।

"আর একবার বল তো," সে বলল।

কথাগুলি আর একবার বললাম।

"ওরে মেয়েটা! তুই কেন বলেছিস যে আমি ছেলেটাকে খুন করেছি? গলা টিপে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব।"

মিসেস ওয়াইভার্ন বলল, "কি বললে, তিনি একটা ছেলেকে খুন করেছেন?"

"আমি না মা'ম" আমি বললাম।

সেই থেকে জুডিথ আমার উপর ক্ষেপে গেল। বয়স্ক মহিলা দুটি না থাকলে তার সঙ্গে একলা এক ঘরে থাকার চাইতে আমি বরং জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

যতদূর মনে পড়ে, এক সপ্তাহ পরের কথা; আমাকে একলা পেয়ে মিসেস ওয়াইভার্ন মাদাম ক্রোল সম্পর্কে এমন একটা কথা আমাকে বলল যা আমি আগে জানতাম না।

পুরো সত্তর বছর আগে তিনি যখন যুবতী ছিলেন, অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, তখন অ্যাপল্‌ওয়েলের জমিদার ক্রোলকে বিয়ে করেন। জমিদার ছিলেন বিপত্নীক, তার নয় বছরের একটি ছেলে ছিল।

একদিন সকালে ছেলেটি নিখোঁজ হয়ে গেল; সেই থেকে তার আর কোন খবরবার্তা পাওয়া গেল না। তাকে বড় বেশী স্বাধীনতা দেওয়া হত; কোনদিন হয় তো সকালেই চলে যেত শিকার-রক্ষকের ঘরে, সেখানেই প্রাতরাশ খেত, তারপর চলে যেত গো-চারণের মাঠে, সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরত না; আবার কোনদিন হয় তো হ্রদে চলে যেত তারপর—তার কি যে হল তা কেউ বলতে পারে না; শুধু হথর্নের ঝোপের মধ্যে তার টুপিটা পাওয়া গেল; সকলেই ধরে নিল যে স্নান করতে গিয়ে হ্রদের জলে ডুবে গেছে। পরে জমিদারের দ্বিতীয়া স্ত্রী মাদাম ক্রোলের ছেলে জমিদার হলেন, অনেক বছর বাঁচলেন, আর তারপরেই তার ছেলে, এই বৃদ্ধা মহিলার নাতি শেভেনিক্স ক্রোল যখন জমিদার হয়ে বসলেন তখনই আমি এলাম অ্যাপল্‌ওয়েলে।

আমার পিসি এখানে আসার আগে এ নিয়ে এখানে অনেক কথা হত; লোকে বলত, সৎ-মাটি অনেক কিছুই জানে, কিন্তু মুখ খোলে না। ছলাকলা ও তোষামোদ দিয়েই তিনি তার স্বামী বুড়ো জমিদার ভুলিয়ে রাখতেন। কিন্তু ছেলেটিকে যখন আর কোনদিনই দেখা গেল না, তখন কালক্রমে সকলে তার কথা ভুলেই গেল।

এবার তোমাকে বলব যা আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি।

আমি সেখানে গিয়েছি দু'মাসও হয় নি। শীতকাল। বৃদ্ধা মহিলাটি শেষবারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ডাক্তারের ভয় হল, আবার তার উন্মাদ-রোগ দেখা দিতে পারে। পনেরো বছর আগেও তিনি একবার উন্মাদ হয়েছিলেন; তখন অনেক সময়ই তাকে একটা খাটো ঘাঘরা পরিয়ে কোমরবন্ধের সঙ্গে বেঁধে রাখা হত। একদিন পিসির ঘরের

বাইরে সেই চামড়ার কুর্তাটাই আমি ঝোলানো দেখেছিলাম।

কিন্তু তিনি পাগল হলেন না। দিনরাত শুধু ভাবেন আর ভাবেন, উঁ-আঁ করেন; শেষ পর্যন্ত চলে যাবার দু'একদিন আগে বিছানায় শুয়ে কখনও ছটফট করছেন। কখনও বক্-বক্ করছেন, মনে হত একটা ডাকাত বুঝি তার গলায় ছুরি চেপে ধরেছে। এই সময় তিনি বিছানা থেকে নেমে পড়তেন, কিন্তু তখন আর হাঁটবার অথবা দাঁড়াবার মতো শক্তি না থাকায় মেঝেতে পড়ে যেতেন; অস্থিসার হাতদুটোকে মুখের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কেবলই ক্ষমা চাইতেন।

বুঝতেই তো পারছ তার ঘরে আমি যেতাম না; মেঝেতে পড়ে তিনি গড়াগড়ি যেতেন, আছারি-পিছারি করতেন, মুখে এমন সব কথা বলতেন যাতে আমার চামড়া নীল হয়ে যেত; ভয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে থর্ থর্ করে কাঁপতাম।

আমার পিসি, মিসেস ওয়াইভার্ন, জুডিথ স্কোয়াইলস, এবং লেক্সহো থেকে আগত একটি স্ত্রীলোক সবসময় তার কাছে থাকত। শেষ পর্যন্ত তার বিকার দেখা দিলে সকলে তাকে বাইরে নিয়ে এল।

টি মহাশয় (পাদরি) এলেন, তার জন্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তখন তিনি সব প্রার্থনার অতীত। আমার মনে হল প্রার্থনা করাটাই ঠিক, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে বলে কেউ মনে করল না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি চলে গেলেন, সব শেষ হয়ে গেল, বৃদ্ধা ক্রোল ঠাকরুণকে শবাচ্ছাদনে ঢেকে শবাধারে শোয়ানো হল, আর জমিদার শেভেনিক্সকে চিঠি লেখা হল। কিন্তু তিনি তখন ফ্রান্সে, ফলে এত দেরী হতে লাগল যে টি মহাশয় ও ডাক্তার দুজনই একমত হলেন যে মৃতদেহকে আর ফেলে রাখাটা ঠিক হবে না; স্থির হল, তারা দুজন আর অ্যাপ্‌ল্‌ওয়ে থেকে পিসি ও আমরা বাকি সকলেই তাকে সমাধি দিতে যাব। এইভাবে অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলের বৃদ্ধ মহিলাটিকে লেক্সহো গীর্জার ভূগর্ভ-কক্ষে সমাহিত করা হল। জমিদার ফিরে এসে যতদিন আমাদের সম্পর্কে তার ইচ্ছার কথা না জানাচ্ছেন এবং আমাদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে না দিচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত আমরা সেই বাড়িটাতেই থেকে গেলাম।

ক্রোল ঠাকরুণ যে ঘরে থাকতেন তার দুটো দরজার পরের একটা আলাদা ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়া হল; আর এই ঘটনাটা ঘটল জমিদার শেভেনিক্সের অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলে আসার আগের দিন রাত্রে।

আমার নতুন ঘরটা বেশ বড় আর চৌকো; ওক কাঠের প্যানেল করা কিন্তু পুরো সুসজ্জিত নয়; শুধু মশারিবিহীন একটা বিছানা, একটি চেয়ার, বড় একটা

টেবিল, এই আর কি; এত বড় ঘরটার পক্ষে এ আসবাব যেন কিছুই নয়। যে আয়নাটায় বৃদ্ধ মহিলাটি নিজেকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতেন তার মৃত্যুর পরে সেটার প্রয়োজন শেষ হওয়ায় আয়নাটাকে আমার ঘরের দেওয়ালের গায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে।

খবর এসেছে যে পরদিন সকালেই জমিদার অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলে পৌঁছে যাবেন; আমার তাতে মোটেই দুঃখ নেই, কারণ আমি ঠিক জানি যে এবার আমাকে বাড়িতে মার কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বরং আমার খুব আনন্দ হতে লাগল; কেবলই ভাবছি বাড়ির কথা, বোন জ্যানেট, বিড়ালবাচ্চাগুলো, কুকুর ট্রিমার ও অন্য অনেকের কথা। ফলে মন এত চঞ্চল হয়ে উঠল যে ঘুমোতেই পারলাম না। ঘড়িতে বারোটা বাজল, আমি জেগে আছি, ঘরময় গাঢ় অন্ধকার, আমার পিঠ দরজার দিকে, আর চোখদুটো বিপরীত দিকের দেওয়ালে।

তারপর বারোটা বেজে পনেরো মিনিটও হয় নি এমন সময় সামনের দেওয়ালে একটা আলো দেখতে পেলাম, যেন পিছনে একটা কিছু জ্বলে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিছানা, চেয়ার ও দেওয়ালে ঝোলানো আমার গাউনের ছায়াগুলি যেন সিলিং-এর বরগায় ও ওক কাঠের প্যানেলের উপর নাচতে শুরু করে দিল, কোন কিছুতে আগুন লেগেছে মনে করে তাড়াতাড়ি মাথাটা ঘোরালাম।

হায় জেন, এ আমি কি দেখলাম। এ যে সেই বৃদ্ধা মহিলা; তারই মৃতদেহ সাটিনে-ভেলভেটে সাজানো, ঠোঁটে অর্থহীন হাসি, চোখ দুটো পিরিচের মতো চওড়া, মুখটা যেন স্বয়ং শয়তানের। দেহের নীচের দিক থেকে একটা লাল আলো উঠে আসছে, যেন পায়ের চারদিকে তার পোশাকটা জ্বলছে। মূর্তিটা সোজা আমার দিকে ছুটে আসছে, কোঁচকানো জরাজীর্ণ হাতদুটি বাড়িয়ে দিয়েছে, যেন আমার গলা টিপে ধরবে; আমি নড়তেও পারলাম না, মূর্তিটা আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, ছড়িয়ে গেল এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া; তাকিয়ে দেখলাম, দেওয়ালের গায়ে দরজা-খোলা একটা কুঠুরি—আগেকার দিনে সেখানেই রাজকীয় শয্যা পাতা থাকত—আর মূর্তিটি সেখানে কি যেন খুঁজছে। আগে কখনও দরজাটা দেখি নি। মূর্তি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল; ঠিক যেন একটা বিন্দুর উপর দাঁড়িয়েছে; তার দাঁত কড়মড় করছে; তারপরেই হঠাৎ ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল; বিছানার একপ্রান্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি, কেমন করে সেখানে গেলাম তাও জানি না; শেষ পর্যন্ত গলায় স্বর ফুটল; চীৎকার করে বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে মিসেস ওয়াইভার্নের দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলে তাকে ভয়ে একেবারে হতভম্ব করে দিলাম।

বুঝতেই পারছ সারারাত ঘুমোতেই পারলাম না; ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে পিসির কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

আমি ভেবেছিলাম পিসি আমাকে বকবে, ধমকাবে, কিন্তু সেসব কিছুই করল না; হাতটা ধরে কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, আমি যেন ভয় না পাই। তারপর জিজ্ঞাসা করল ঃ

"মূর্তির হাতে কি একটা চাবি ছিল?"

মনে করার চেষ্টা করে বললাম, "হ্যাঁ, পিতলের অদ্ভুত হাতলওয়ালা একটা বড় চাবি।"

"একটু থাম," বলে পিসি আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে কাবার্ডের দরজাটা খুলে আঙুল বাড়িয়ে একটা চাবি তুলে নিয়ে শুধাল, "এইরকম চাবি কি?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "তাই হবে।"

চাবিটা ঘুরিয়ে পিসি বলল, "তুমি ঠিক জান?"

বললাম, "নিশ্চয়;" পরক্ষণেই মনে হল আমি বুঝি মূর্চ্ছা যাব।

"ঠিক আছে, এতেই হবে," বলে পিসি চাবিটাকে আবার তালা দিয়ে আটকে রাখল।

কি যেন ভেবে আবার বলল, "আজ বারোটার আগেই জমিদার স্বয়ং এখানে আসছেন; এসব কথা তাকে অবশ্য বলবে। মনে হচ্ছে আমি শিগ্‌গিরই এখান থেকে চলে যাব; কাজেই বর্তমানে সবচাইতে ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে তুমি আজ বিকেলেই বাড়ি চলে যাও; সুবিধামতো আমিই তোমার জন্য আর একটা কাজ খুঁজে দেব।"

বুঝতেই পারছ, একথা শুনে আমি খুশিই হলাম।

পিসি আমার জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করে দিল, বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য প্রাপ্য তিন পাউন্ড দিয়ে দিল। জমিদার ক্রোল সেইদিনই অ্যাপল্‌ওয়েলে এলেন; সুপুরুষ, বয়স প্রায় ত্রিশ। এই দ্বিতীয়বার তাকে দেখলাম, কিন্তু এই প্রথমবার তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন।

গৃহকর্ত্রীর ঘরে বসেই পিসি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলল, তাদের মধ্যে কি কথা হল আমি জানি না। জমিদারকে দেখে একটু ভয়ই পেয়েছিলাম; কত বড় ভদ্রলোক তিনি; তাই না ডেকে পাঠানো পর্যন্ত তার কাছে যাবার সাহস হয় নি। তিনি কিন্তু হেসে বললেন ঃ

"তুমি কি দেখেছ গো মেয়ে? নির্ঘাৎ একটা স্বপ্ন দেখেছ কারণ পৃথিবীতে ভূত-পেত্নী বলে কিছু নেই। সে যাই হোক, এখানে বসে সব কথা আগাগোড়া

বলো তো মেয়ে।''

তারপর আমি সব কথা বলতেই তিনি একটু চিন্তা করে পিসিকে বললেন ঃ

''জায়গাটা আমি ভালই চিনি। বৃদ্ধ স্যার অলিভারের সময় খোঁড়া ওয়াইন্ডেল আমাকে বলেছিল, ঐ কুঠুরির বাঁদিকে যেখানে মেয়েটি স্বপ্নের মধ্যে আমার ঠাকুরমাকে একটা দরজা খুলতে দেখেছে সেখানে সত্যি একটা দরজা ছিল। সে যখন আমাকে কথাটা বলেছিল তখন তার বয়স আশি পেরিয়ে গেছে, আর আমি তখন একটি বালকমাত্র। তারপর বিশ বছর পার হয়ে গেছে। অনেককাল আগে, পর্দা-ঢাকা ঘরের লোহার ঘরটা তৈরী হবারও আগে, সেখানেই সব মূল্যবান বাসনপত্র ও হীরে-জহরত রাখা হত। সে আমাকে বলেছিল, কুঠুরির দরজার চাবির হাতলটা ছিল পিতলের, আর আপনি বলছেন তিনি যেখানে তার পুরনো পাখাগুলি রাখতেন সেই সিন্দুকের তলায় চাবিটা পাওয়া গিয়েছিল। এবার যদি আমরা সেখানে গিয়ে ভুল করে ফেলে যাওয়া কোন চামচ বা হীরে দেখতে পাই তাহলে কি ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত হবে না? তুমি আমাদের সঙ্গে চল তো মেয়ে, ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দেবে।''

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনটাকে মুখের মধ্যে নিয়ে পিসির হাতটা সজোরে চেপে ধরে সেই ভয়ংকর ঘরটাতে ঢুকলাম, তাদের দুজনকেই বুঝিয়ে বললাম, কেমন করে তিনি এলেন, আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, ঠিক কোথায় তিনি দাঁড়ালেন আর কোথায় দরজাটা খুলে গেল বলে মনে হয়েছিল।

দেওয়ালের গায়ে তখন একটা পুরনো খালি আলমারি ছিল; সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতেই দেওয়ালের কাঠের আচ্ছাদনের উপর একটা দরজার চিহ্ন চোখে পড়ল; চাবির ছিদ্রটাকে কাঠ দিয়ে বন্ধ করে র‍্যাঁদা মেরে সমান করে দেওয়া হয়েছে, আর দরজার জোড়গুলোকে পুটিং দিয়ে বন্ধ করে ওক কাঠের রং লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে; আলমারিটা সরানোর ফলে কব্জার দাগটা চোখে না পড়লে কেউ বুঝতে পারত না যে সেখানে একটা দরজা কোনকালে ছিল।

বিচিত্র হাসি হেসে জমিদার বললেন, ''হ্যাঁ, সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।''

একটা ছোট বাটালি ও হাতুড়ি এনে চাবির ছিদ্রের ভিতর থেকে কাঠটা বের করতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগল। চাবিটা ঠিক লেগে গেল; চাবিটাকে সজোরে একপাক ঘোরানো হল, ক্যাচ করে একটা টানা শব্দ হল, হুড়কোটা পড়ে গেল আর একটানে তিনি দরজাটা খুলে ফেললেন।

ভিতরে আর একটা দরজা, আগেরটার চাইতেও মজবুত; কিন্তু তালা না থাকায় সহজেই খুলে গেল। ভিতরে একটা ছোট মেঝে, দেওয়াল ও ইঁটের ঘর;

ভিতরে কি আছে দেখতে পেলাম না, কারণ ভিতরটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

পিসি একটা মোমবাতি ধরালে জমিদার সেটা হাতে নিয়ে ভেতরে পা দিলেন।

পিসি পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

পিছিয়ে এসে জমিদার বললেন, "হ্যাঁ! হ্যাঁ! ওটা কি? কয়লা ঠেলার শিকটা আমাকে এনে দিন তো—জলদি।" তিনি পিসিকে বললেন। পিসি অগ্নিকুন্ডের খোঁজে চলে যেতেই আমি জমিদারের হাতের ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। দেখলাম মেঝের এককোণে সিন্দুকটার উপর বসে আছে একটা বাঁদর অথবা ছালছাড়ানো কোন জন্তু, আর তা না হলে অত্যন্ত কুঁচকে যাওয়া শীর্ণ-বিশীর্ণ কোন বৃদ্ধ।

শিকটা জমিদারের হাতে দিয়ে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে সেই দুর্গন্ধ বস্তুটাকে দেখতে পেয়ে পিসি বলে উঠল, "হায় জেন! খুব সাবধান স্যার; কী করছেন আপনি? ফিরে আসুন, দরজাটা বন্ধ করে দিন।"

তিনি কিন্তু তার পরিবর্তে শিকটাকে তলোয়ারের মতো তাক করে ধরে বস্তুটাকে একটা খোঁচা মারলেন, আর সেটা ধড়-মাথাসুদ্ধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, একগাদা হাড় ও ধূলো—একটা টুপি-ভর্তির চাইতে কিছু বেশী।

হাড়গুলো একটা শিশুর; বাকি সবটা ছোঁয়ামাত্রই ধূলোর মতো গুঁড়ো হয়ে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই, কিন্তু তিনি মেঝের উপরকার খুলিটার দিকে তাকালেন।

বললেন, "একটা মরা বিড়াল।" পিছিয়ে এসে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। "মিসেস শাটার্স, আপনি ও আমি আবার এখানে আসব। এবং একটা একটা করে তাকগুলো খুঁজে দেখব। আপনার সঙ্গে অন্য ব্যাপারেও আমার কিছু কথা আছে; আর আপনিই তো বললেন, এই ছোট্ট মেয়েটি বাড়ি চলে যাচ্ছে। ওর মাইনে ও পেয়ে গেছে; আমি ওকে একটা উপহার দিতে চাই," বলে তিনি আমার কাঁধটা চাপড়ে দিলেন।

তিনি আমাকে একটা পুরো পাউন্ড দিলেন, আর ঘন্টাখানেক পরে লেক্সহো যাত্রা করলাম; সেখান থেকে যাত্রীগাড়িতে চেপে বাড়ি পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অ্যাপল্ওয়েলের ক্রোল ঠাকরুণ আর কোনদিন আমাকে দেখা দেন নি—না সশরীরে, না স্বপ্নে। কিন্তু আমি বড় হয়ে উঠলে একবার পিসি লিট্ল্হাম-এ এসে একটা দিন ও রাত আমার কাছে

কাটিয়েছিল; তখনই সে আমাকে বলেছিল, যে বেচারি ছেলেটি অনেকদিন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, কুৎসিত দুষ্টু বুড়িটাই যে তাকে অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে মেরে ফেলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছেলেটির চেঁচামেচি, প্রার্থনা, দাপাদাপি কিছুই কেউ শুনতে পায় নি; সে যে জলে ডুবেই মারা গেছে সেটা বোঝাবার জন্যই তার টুপিটা জলের ধারে ফেলে রাখা হয়েছিল; কাজটা কে করেছিল তাও কেউ জানে না। হাত দেওয়ামাত্রই তার পোশাকগুলো একমুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে ছিল একমুঠো কালো বোতাম, সবুজ বাঁটের একটা ছুরি, আর দুটো পেনি; বেচারিকে যখন ভুলিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয় পেনি দুটো হয় তো তখন তার পকেটেই ছিল; তারপরে সে আর কখনও আলোর মুখ দেখে নি। জমিদারের কাগজপত্রের মধ্যে একটা বিজ্ঞপ্তির কপি পাওয়া গিয়েছিল। ছেলেটি হারিয়ে যাবার পরে বিজ্ঞপ্তিটা ছাপানো হয়েছিল; বুড়ো জমিদার ভেবেছিলেন; হয় সে পালিয়ে গেছে, নয় তো জিপ্‌সিরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে; বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল, ছেলেটির সঙ্গে সবুজ হাতলওয়ালা একটা ছুরি ছিল, আর তার বোতামগুলো ছিল জেট কেটে তৈরী। আর অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েল হাউসের বৃদ্ধ ক্রোল ঠাকরুণ সম্পর্কে আমার কথাও এখানেই শেষ।

পিশাচের মিনার

ব্রাম স্টোকার

সুন্দরী লুসির চোখে মুখে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। মনের আকাশে ঝোড়ো বাতাস। হরিণ কালো চোখে আমায় দিকে তাকাল, বলল তুমি কি বিশ্বাস করবে, এক মহিলা বাইরের সম্ভাব্য কোন আক্রমণ ঠেকাতে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে আশ্রয় নিলেন। দরজা জানলা সব বন্ধ। বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ থাকলেও যেন হাওয়ায় উড়ে কোন কিছু জিনিস ঘরের মধ্যে ঢুকে তার চোখ দুটো খুবলে নিয়ে গেল।

ওর এই ভয়ংকর কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকলেও লুসি অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বলছিল গোপন কথা বলার মতো।

আমরা বসেছিলাম পাহাড়ের ঢলে এক পুরনো বাড়িতে। সময়টা শীতকাল। গাছের পাতা শুকিয়ে অধিকাংশই হলুদ। মাটিতে শুকনো পাতার শয্যা। লণ্ডনে এই সময়ে বাতাসে স্যাঁতসেঁতে ভাব। আচমকা লুসি উঠে দাঁড়ায়। বাড়ির দরজার কাছে গেল। তারপর রাস্তায় গিয়ে অপলকে তাকিয়ে থাকল।

আমার দিকে মুখ না ঘুরিয়েই সে বলল, 'নিজেও জানিনা যে একা আমি আদৌ বিশ্বাস করি। কিনা? অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে সে জানাল। আমায় যদি বিয়ে কর, মনে রেখ, তুমি আমার পারিবারিক অভিশাপকেই বিয়ে করবে। এই কথা ভেবে আমি রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

লুসি এ ধরনের কথা এই প্রথম জানালে। আর কথাগুলো বলল কখন? আমি যখন খুশির আনন্দে টগবগ করছি। মশগুল হয়ে আছি ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন স্বপ্নে। তখন লুসির চোখ, লুসির গ্রীবা আমার কাঁধের উপর। ঘোড়ায় চড়ে এই কনে দেখা আলোয় বিকেলে লুসির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি সোজা স্যার জেমস ফেনউইকের কাছ থেকে। প্রায় হাওয়ায় উড়তে উড়তে এসেছি। খুশির আনন্দে চীৎকার করে গান গেয়েছি—আমার প্রিয়ার ডাকে ছুটে চলেছি। পৃথিবীর সবকিছুই যখন এক অসম্ভব ভাললাগায় ভরে উঠেছে, যে ঝরনার পাশে আমার ঘোড়াটা বেঁধেছি সেই ঝরনার জলের মতো মনটা যে মুহূর্তে নেচে উঠেছে ঠিক তখনই লুসি ভবিষ্যৎভাণীর মতো ওই কথাগুলো শোনাল। ।

এই আমার লুসি সোনার সঙ্গে কথা হয়েছিল একমাস আগে। আমাদের এই গ্রীষ্মকালে। ভ্রমর কালো চোখে বিজলির রেখা, ঘন কালো চোখের মতো চুলে

ধুসর রঙের রুমাল বাঁধা, দু ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি নিয়ে ও যেন আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছিল। আমার পৃথিবী তখন ওলট পালট হয়ে গেছে। তারপর আমরা চকোলেট রঙের এই পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে চেনা জানার পর্ব সেরে পরস্পরের কাছাকাছি চলে এলাম কখন তা টের পাইনি আদপেও। আমার কাছে এই বিকেলের ভুবন সোনালি আলোয় ভরে উঠেছিল এতক্ষণ। লুসির সতর্কবাণী এক ফুঁয়ে চারিদিকের আলো নিভিয়ে দিল। এই মুহূর্তে লুসির মুখ চোখ লজ্জা, গম্ভীর—আমার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ.

ওকে বললাম, তুমি কি বলতে চাইছ, তোমার ভয় কিসের? লুসি বলল, 'আমি অন্যের জন্য চিন্তিত। আমার বোনের সঙ্গে তোমার তো আলাপ হয়েছে, মনে পড়ছে তাকে? আমি আমাকে নিয়েই ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি। ভয় পাচ্ছি এই ভেবে, যে কোন মুহূর্তে কোন কিছু এসে আমাদের চোখগুলো উপড়ে নেবে। তুমি ভেব না যে আমি পাগল হয়ে গেছি।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর কাছে গিয়ে হাত দুটো ধরলাম। লুসির মুখটা সাদা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। লুসি বলল, দেখ, এটাকে শুধুমাত্র অভিশাপ বললে ঠিক বলা হবে না। অ্যান সামনের সপ্তাহে বিয়ে করছে। এক সুপুরুষ যুবককে ও বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে। বিয়ের খবর জেনে আমার কাকা হেনরি খুবই রেগে গেছেন। আমি অবশ্য তাতে কিছু মনে করছি না। কাকা যদি সব জেনেও মেনে না নেন তাহলে কিছু করার নেই। আবার সরাসরি তিনি বাধাও দিচ্ছেন না।

আমি বললাম, বাধা? কেন তিনি বাধা দেবেন?

লুসি কোন জবাব দিল না। পাহাড়ের উপর ঘোলাটে লাল রঙের ইঁটের বহু প্রাচীন এই বাড়ির দিকে তাকালাম। বহুদিনের পুরনো বাড়ি। জানালাগুলোর রঙও বিবর্ণ। একটা গম্বুজ বাড়ির মাথায়। ওই বাড়ির অন্যদের থেকে লুসি যেন আলাদা। নাম লুসি মর্টলেক। এই মর্টলেক পরিবারে রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে এই পরিখাবেষ্টিত মহলে বসবাস করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবার তাদের চারদিকে পর্দা টেনে দিয়েছে। বহির্জগতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। বন্ধু স্যার জেসম ফেনউইকের সঙ্গে একরাতে ওদের বাড়িতে নৈশভোজ করেছিলাম। তখনই লুসির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

মোমবাতির আলোয় ডিনার খেয়েছিলাম। লুসি ছাড়া সেখানে আরও চারজন ছিল। লুসির বোন অ্যান খুবই শান্ত এবং স্বল্পবাক। কাকিমা কেটি নাক উঁচু কালো মহিলা। যেন কোন পুরনো তৈলচিত্রের মূর্তি। আঠারো বছরের খুড়তুতো ভাই রিচার্ড। তবে সেই রাতে চোখে পড়েছিল হেনরি মর্টলেককে।

মোটা সোটা সব সময় ঘামছিলেন। মৃদু কণ্ঠস্বর। মোটা হাতের থাবায় কাঠ বাদাম ভেঙে মুখে দিতে দিতে হাসছিল।

আমায় কথার জবাব না দিয়ে লুসি বলল, আজ থেকে সাত দিন পরে অ্যান বিয়ে করছে। যাক হেনরির কথা অনুযায়ী আজ বিকেলে অ্যানের উপর সেই অচেনা আক্রমণকারীর হামলা হওয়ার কথা।

তুমি কি চুপ করবে? কম্পিত লুসির কাঁধ দুটো দুই হাতে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললাম এই জায়গা তোমার মন বিষিয়ে দিয়েছে। আমি তোমাকে নিয়ে কি করব সেটা কি মন দিয়ে একটু শুনবে? তাহলে শোন, ঘোড়ার পিঠে তোমাকে চড়িয়ে এখান থেকে সোজা নিয়ে যাব লেডি ফেনউইকের কাছে। তাদের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আগামীকাল আমি আর ফেনউইক এখানে এসে তোমার কাকাকে বলব যে আমি তোমার পাণিপ্রার্থী।

লুসি তাকাল ভেজা চোখে। ওর শরীরটা তখনও থরথর করছে। বলল, 'ঠিক আছে। তোমার কথা মেনেই চলব। তবে মন দিয়ে আমায় কয়েকটা কথা শোন। এটা কোন গল্প কাহিনী নয়, বাস্তব ঘটনা। এটা কোন অভিশাপ নয়। ঘটনাটা ঘটেছিল বছর পঞ্চাশ আগে। এই ঘটনার সাক্ষী এমন মানুষ এখনও বেঁচে আছেন। তাঁরা শপথ নিয়ে সেকথা বলবেনও।

ঠিক আছে, আমাকে বল। বললাম ওকে।

ওই গম্বুজটা দেখছ? ওই চূড়ার মতো গম্বুজের মাথায় একটি ঘর আছে। ইঁটের ওই ঘরটায় একটা চেয়ার একটা টেবিল ছাড়া আর কিছু নেই। একটা দরজা এবং একটা জানলা, ওই জানলার গরাদ অত্যন্ত মজবুত। রাস্তার এই দিকে ওই জানলার নীচে ষাট ফুট মসৃণ ইঁটের গাঁথনি। বাইরে থেকে জানলায় ওঠার কোন সুযোগই নেই।

ঘটনাটা ঘটে ১৮৮৬ সালের জুন মাসে। এ্যালেন আমার ঠাকুরদার বোন। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে এ্যালেন মর্টলেক এই রকম বিকেলে ওই ঘরে গিয়েছিলেন একা। যেহেতু চূড়ার মাথায় ঘর তাই বিশেষ রকমের মই বেয়ে ওখানে পৌঁছাতে হয়। ছাদের সঙ্গে জোড়া দরজা। খুবই শক্তপোক্ত ব্যবস্থা। মই ছাড়া ওখানে ওঠা যায় না।

যাই হোক, এ্যালেন মই বেয়ে ওই ঘরে পৌঁছলেন। ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। খিল লাগালেন। ওই ঘরটা তখন নিশ্ছিদ্র দুর্গের মতো। ঘরের ঠিক নীচে চারজন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন লোক সদা সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে যাতে বাইরে থেকে কোন কিছুই ভেতরে ঢুকতে না পারে। এ্যালেন

ঘরের মধ্যে ঢোকার দশ মিনিটের মধ্যে তার আর্ত চীৎকার শোনা গেল। টেবিল ওল্টানোর শব্দ এল। চারজন প্রহরী মই বেয়ে ঘরের দরজার খিল ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখল এ্যালেন ঘরের মাঝখানে মেঝেতে পড়ে আছে। চোখদুটো উপড়ানো, চোখের কোটর থেকে মণিদুটো বাইরে বেরিয়ে ঝুলছে। কোন কথা বলতে পারেন নি তিনি। আতঙ্কের চাপে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।'

লুসি কথা বলছিল খুবই আস্তে। ও যে কথা বলছে ঠোঁট নাড়া দেখেই শুধু বোঝা যাচ্ছে। ওর দৃষ্টি আমার মুখের ওপর। বলল, ভাবছ পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ থানায় খবর দেওয়ার পর পুলিশ এসেছিল। তাঁরা কি খুঁজে পেয়েছিল? এ্যালেন ছাড়া ওই ঘরে কেউ ছিল না। ঘরের মধ্যে কোন লুকনোর জায়গা ছিল না। ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার একমাত্র দরজা ভিন্ন অন্য কোন গোপন দরজা বা পথ ছিল না। এ্যালেনের চোখ উপড়ে নেওয়ার মতো কোন অস্ত্রও ঘরে পাওয়া যায় নি। টেবিল চেয়ার টুকরো করে ভেঙে পুলিশ দেখেছিল কোন হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা। না, কিছুই পাওয়া যায় নি। তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছিল, জানালা ছিল বন্ধ। জানালা দিয়ে ষাট ফুট নীচু থেকে একটা মাছি পর্যন্ত উড়ে আসা কঠিন। জান টম, কোন মানুষের পক্ষে এই খুন করা সম্ভব ছিল না, তবু এই খুন হয়েছিল।

যতটা সম্ভব গলার স্বর স্থির রেখে বললাম, 'তাহলে তুমি বিশ্বাস করো একটা অভিশাপই এ কাজ করেছে? ওই মহিলা একা ওই ঘরে ঢুকে কি করছিলেন?'

লুসি জবাব দিল, 'ওই অভিশাপ কিংবা কিংবদন্তীতে বিশ্বাস ছিল না তাঁর। তিনি প্রমাণ করে দেখতে চেয়েছিলেন—এসব মিথ্যা, পাগলামি মাত্র।'

কিংবদন্তীটা কি? আমি প্রশ্ন করলাম।

লুসি বলল, 'টম, আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে এই মর্টলেক বংশের এক মহিলা তিনশ বছর আগে এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটায়। তিনি নিজের মর্জি মাফিক চলতেন। তাঁর নাম ছিল ভিভিয়ান। তিনি চতুরা এবং সুন্দরী ছিলেন, তাঁর পরিবারে এমন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক করেছিল যে ভিভিয়ান তাঁকে ঘৃণা করতেন। ভিভিয়ান তাকে খুন করেছিলেন। এমনভাবে তাকে মেরেছিলেন যে প্রাণ থাকতে থাকতেই একটি কাক ওই লোকটির চোখদুটি উপড়ে নিয়েছিল।

আমি বলালম, বলে যাও, আমি তোমার কথা শুনছি। দাও, তোমার হাতটা আমার হাতে দাও। এতে তোমার কথা বলা সহজ হবে।'

মৃত্যুর আগে সেই ব্যক্তি বলেছিলেন, ভিভিয়ান যদি বিয়ে করে তাহলে বিবাহের সাতদিন আগে তিনি আসবেন। সেই অন্তিমক্ষণের দৃশ্য দূরে ওই চূড়ায়

ঘরের জানালা থেকে ভিভিয়ান দেখেছিলেন। বিয়ে ঠিক হল তার। বিয়ের ঠিক সাতদিন আগে একটা কাক এসেছিল—' গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লুসি বলল, 'অনেকে বলে থাকে ভিভিয়ান দেখেছিলেন কবর থেকে সে উঠে আসছে। এই রকম বিকেলের কনে দেখা আলোয় তার চোখের গর্ত থেকে রক্ত ঝরছে। এক ঝাঁক বড় মাপের কাক তাকে ঘিরে আছে। যাই হোক ভিভিয়ান মর্টলেক তারপরে চোখ দুটো হারিয়ে ছিলেন। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে লুসি বলল, 'এই হল কাহিনী টম, হেস না। এরপর থেকে মর্টলেক পরিবারের সম্মতি ছাড়া কোন মেয়ে বিয়ে করতে গেলে তারও ক্ষেত্রে একই পরিণতি ঘটেছে।

আমাকে হাসতে দেখে লুসি বলল, ঈশ্বরের দোহাই তুমি হেস না। আমি যা শুনেছি যা ঘটেছে সে কথাই বললাম। আমার বোনও বিয়ে করতে চলেছে পরিবারের বিনা অনুমতিতে।

আমি আর হাসছিলাম না। আমি শুধু কাকা হেনরিকে অভিশাপ দিতে চাইছিলাম। কেননা এ ধরনের ভুতুড়ে গল্প বলে এই নির্জন বাড়িতে দুটো তরুণীর মন বিষিয়ে দিয়েছেন তিনি। এ তো দেখছি সায়ানাইড দেওয়ার সামিল।

আমি লুসিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাকা চান না তোমারও বিয়ে হোক?

লুসি বলল, না, আমার আর অ্যানের কিছু অর্থ আছে। আমাদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার কাকা সেগুলোর ট্রাস্টের তরফে সব কিছু দেখাশোনা করেন। ওই অর্থের সাহায্যেই সকলের সংস্থান হয়।

তোমার কাকা নিশ্চয়ই ওই ট্রাস্টের মাথা?

হ্যাঁ।

ধিক্কার জানাই এ ধরনের মানুষকে, উনি চাইলে সব অর্থ নিতে পারেন তবে তার আগে ওর সঙ্গে অন্য বিষয়ে বোঝাপড়া করতে হবে।

ঠিকই বলেছ তুমি, পিছন থেকে কে যেন উঁচু গলায় এই মন্তব্য ছুঁড়ল। আমরা দেখলাম স্যার জেমস ফেনউইক। রাস্তার দিক থেকে আসতে আসতে বললেন, যদি বেশি দেরী না হয়ে গিয়ে থাকে। উনি ঘোড়ায় চড়ে কখন এত কাছে এসে গেছেন তা আমরা কেউই খেয়াল করিনি। টুইডের টুপি, কোট-প্যান্ট, বাঁ চোখে চশমা। লম্বা শক্ত কাঠামোর শরীরটা তার বিরাট ঘোড়ার পিঠে সটান ভঙ্গীতে বসা। তিনি বললেন, তাহলে টম শুনেছ তো কিংবদন্তী, এবার তাহলে সর্বশেষ ঘটনার কথাটাও শোনো।

এই বলে তিনি চূড়ার ঘরের দিকে আঙুল তুলে বললেন—লুসি, তোমাকে কি ওরা বলেছে যে তোমার কাকা হেনরি ওই চিলেকোঠা ঘরের মধ্যে দরজা জানালা বন্ধ করে ভাগ্য-পরীক্ষা করার জন্যে অ্যানকে রাজী করিয়েছেন। অ্যান এখন ওই ঘরে। খুড়তুতো ভাই ডিক তোমার কাকার মুখের উপর কোন কথা বলবে এমন সাহস নেই। সে আমাকে টেলিফোন করে এখানে চুপি চুপি আসতে বলল। সে অ্যানের হবু বর গর্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল—তাকে পায়নি। সে লণ্ডনে গেছে।

ভয়ে লুসির তখন আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। সে কোনক্রমে বলল, 'ওহ্, না! না! আপনি যা বলেছেন...?

ফেনউইক বললেন, এর মধ্যে শয়তানির গন্ধ পাচ্ছি। চল শিগগির। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি।

তখনই শোনা গেল তীব্র আর্ত চিৎকার এক মহিলার। পাহাড়ের ষাট ফুট উঁচুতে মিনারের চূড়ার ঘর থেকে তীব্র কাতর যন্ত্রণা ভরা চিৎকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। উড়ন্ত পাখির দল পর্যন্ত সেই কাতরোক্তি শুনে যেন থমকে গেল। একটু পরেই থেমে গেল সেই চিৎকার। ফেলউইক আপনমনে কি যেন উচ্চারণ করেই বিদ্যুৎ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মিনারের দিকে ধেয়ে গেলেন।

লুসি ও আমি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লাম। মোয়ার্ট হলে পৌঁছে দেখলাম সামনের জলে রাজহাঁসগুলো পাখা নাড়ছে। ফেনউইক সেখানে পৌঁছে প্রবেশ দরজায় ধাক্কা মারছেন। কেউ উত্তর দিচ্ছে না। দরজাটা তালাবন্ধ ছিল না। লুসি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতরের হলঘরে একটা মৃত্যুশীতল নীরবতা। যেন শয়তান আঘাত হেনেই পালিয়ে গেছে। দেখলাম একটা আবছা ছায়ামূর্তি আমদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এল আচমকা।

ছায়ামূর্তিটা মৃগীরোগীর মতো হাসতে আরম্ভ করল। দেখলাম খুড়তুতো ভাই ডিক। তার নরম-সরম সুন্দর মুখে হতাশার ছাপ। সে বলল, তোমরা বড্ড দেরী করে ফেলেছ। কাক ওর মাথার ঘিলু ঠুকরে বের করে দিয়েছে। ও আর বেঁচে নেই।

লুসির তখন হতচেতন অবস্থা। সে আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল। ফেনউইকের নির্ভীক উপস্থিতি আমাদের ভেঙে পড়তে দেয়নি। তিনি ডিকের জামার কলার ধরে ঝাঁকুনি দিতেই তার পাগলের মতো হাসি থেমে গেল। ফেনউইক তাকে কঠোর স্বরে বললেন, একদম চুপ কর। এবার বল। হেনরির কথা শুনে অ্যান ওই চিলেকোঠার ঘরে একা যাওয়ার মতো বোকামি করল কি করে?

ডিক লুসির দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, অ্যান তোমার জন্য একাজ করেছে।

সে বলছিল, তুমি নাকি একজনকে ভালবাস। তোমাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য ও ওই ঘরে যায় নি। গিয়েছিল এই অভিশাপ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

ফেনউইক ডিককে প্রশ্ন করলেন, হেনরি নিশ্চয়ই এখন ওখানে, তাই না? একটু থেমে আবার বললেন, তোমার কাকিমা এখানে আছেন নিশ্চয়ই।

ডিক বলল, হ্যাঁ ওরা ছাড়াও সেখানে আছে মিস্টার ওয়াল্টার্থ, ডাঃ পোর্টার আর স্কায়ার ব্রক্সলে। প্রথমজন যাজক, দ্বিতীয় জন চিকিৎসক এবং তৃতীয় জন মুখ্য বিচারক। প্রত্যেকেই সম্মানীয় এবং এদের মথার ওজন আছে, এই ঘটনার সাক্ষী হিসাবে থাকার জন্য প্রত্যেককে ডাকা হয়েছিল। সবাই এখন শপথ নিয়ে বলতে রাজি আছে যে তারা এক অবিশ্বাস্য অথচ সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। অ্যান মই দিয়ে উপরে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে খিল দিয়েছে। আমরা কেউই এক পলকের জন্য ঘরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিইনি। অথচ...। সবাই সাক্ষী দিতে রাজিও আছে।

ফেনউইক গর্জন করে উঠল, হ্যাঁ, সবাই তার সাক্ষী, অথচ কেউই অ্যানকে একবার আটকানোর চেষ্টা করেনি, তাই তো?

ডিক থেমে গেছে আচমকা। যেন অনেক কথা ইতিমধ্যে বলে ফেলেছে এরকম একটা ভাব তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। ঘাড়ের উপর মুণ্ডু অনবরত সে এদিক ওদিক নাড়াচ্ছে। অস্ফুট স্বরে সে বলল, ওয়াল্টার্স চেষ্টা করেছিল আটকানোর কিন্তু অ্যান শোনেনি। ডাঃ পোর্টার বলেছিলেন যত সব মূর্খামি। ব্রিক্সলে প্রচুর মদ্যপান করেছিলেন তাই তিনি হ্যাঁ কিংবা না কোন কিছুই বলেন নি। অ্যান উপরে চলে গেল। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। ও আমাকে খুব বিশ্বাস করত। নিশ্বাস ফেলে রিচার্ড বলল, আপনারা বরং উপরে যান।

পাথরের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে আমরা দুমিনিটের মধ্যে সেই ঘরে ঢুকলাম যেখানে প্রত্যক্ষদর্শীরা উপস্থিত রয়েছেন। অভিশপ্ত ঘরের নীচে এই ঘর। একটা মই লাগান আছে। চিলেকোঠা ঘরের দরজাটা ভাঙা। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে টের পেলাম উপরের ঘরে পায়চারি ও ফিসফিস স্বরে কথা বলার শব্দ।

নীচে এই ঘরটা চৌকো। সাদা ঘষা কাঁচে সূর্যাস্তের আলো পড়ে রক্তাভ দেখাচ্ছে। ওক কাঠের কালো রঙের আসবাবপত্র, রূপোর বাতিদানটা চকচক করছে। একটা টেবিলের ধারে বসেছিলেন কাকিমা কেটি মর্টলেক। হেনরির স্ত্রী। তার হাত দুটো ভাঁজ করা একসঙ্গে। এই ঘটনা যে তার মনে কোন রেখাপাত করেনি সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। পশ্চিম দিকের জানালার কাছ থেকে হেনরি বললেন, খুব দুঃখের ঘটনা। বুঝলে লুসি। প্রিয় লুসি তোমাকে অত্যন্ত দুঃখের

সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে তোমার হতভাগ্য বোন আর বেঁচে নেই। আমি তাকে সতর্ক করেছিলাম কিন্তু সে শোনে নি। আসলে সে বোকা আর মাথা গরম ছিল। সে স্বেচ্ছায় এই পথ বেছে নিয়েছিল।

বিশাল বপু হেনরি খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, মুখে অস্তগামী সূর্যের লাল আভা, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, মুখে তার মিটমিটে হাসি। তিনি কাঠবাদাম খাচ্ছিলেন। আমি দেখলাম একহাতে যখন তিনি কাঠবাদাম ভাঙছিলেন, তার হাতের নখগুলো কালো। তিনি নিজেকে উদাসীন রাখার চেষ্টা করছিলেন।

কাকিমা কেটি তার স্বামীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন, চলে গেল।

স্যার ফেনউইক অত্যন্ত ধীর গলায় বললেন, মর্টলেক, আমি কিসে বিশ্বাস করি তা তোমার ভালই জানা আছে। এই মুহূর্তে এখন সেটা খোলসা করে বলবে...।

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হেনরি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি বল, তোমার কিসে বিশ্বাস আছে। তারপর আমি তোমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনব। আদালত আমকে কয়েক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইয়ে দেবে তোমার জরিমানা করে। কি কেটি? আমার ভাইঝি অ্যান আমার নির্দেশ অমান্য করে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার জন্য সে শাস্তি পেয়েছে। আমার কোন দোষ নেই। এটা মানুষের ধারণার বাইরে যে একটা বন্ধ ঘরে কি করে সে খুন হল? উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা বলবেন, আমি ওদের চোখের সামনে থেকে একবারও আড়াল হইনি।

একটু থেমে মুচকি তির্যক হেসে মৃদু গলায় হেনরি বললেন, তুমি যে সে লোক নও, তুমি হলে কিনা ভারতীয় পুলিশের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান জেমস ফেনউইক। এই অপ্রাকৃতিক ভোজবাজি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে পার কিনা একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু একথাও স্পষ্ট শুনে রাখ। তুমি যা ইঙ্গিত করতে চাইছ সেরকম কিছু করলে আমি সোজা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে তোমাকে উলঙ্গ করার ব্যবস্থা করব। মনে থাকে যেন।

হুঁশিয়ারি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেনরির ব্যঙ্গ হাসি ফেনউইকের মুখে যেন চাবুক মারল। রাগে গরগর করে তিনি তার হাতের ঘোড়ার চাবুক মুঠিতে শক্ত করে ধরলেন। পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। হেনরির উদাসীন চোখের চাউনি আমাকে এক ঝলক জরিপ করে নিল। মজার সুরে তিনি বললেন, এখন শুনছি আমার অমতে আমাদের পরিবারে নাকি আরও বিয়ে হতে চলেছে, এক আমেরিকান যুবক আমাদের ছোট্ট লুসির সঙ্গে প্রেম করছে। আমি কি সবিনয়ে তোমাকে সতর্ক করতে পারি যে লুসির দুটো সুন্দর চোখ...।

আমার হাতে ঘোড়ার চাবুকটা জড়ান ছিল। চাবুকের বাটটা মুঠোয় ধরে এক পা এগোতেই আমার হাতটা ফেনউইক চেপে ধরে বললেন, নো, এই ভুলটা কর না। দেখছ না উনি চাইছেন উত্তেজিত করে তোমাকে ফাঁদে ফেলতে।

হেনরির চোখে চোখ রেখে আমি বললাম, হ্যাঁ আমি লুসিকে বিয়ে করতে চাই। আপনার কোন আপত্তি আছে?

খানিকটা থতমত খেয়ে হেনরি বললেন। আমি....আমি? না, না আপত্তি কেন? তুমি ঠিক বুঝবে না। আমার ভয়টা কোথায়। তোমরা আমেরিকান। তোমাদের পিতামহ কিংবা পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই আমার। এই মেয়েটি এক গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, এই বংশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে অভিশাপ সেটাই ওর ভবিতব্য। ও যদি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে তার ফল...'

'আমি মনে করি, তার কোন সুযোগ নেই। দৃঢ় গলায় বললাম আমি।

লুসি এতক্ষণে মুখ খুললেন, বলল, আমি উপরে যাচ্ছি অ্যানকে দেখতে। ও, আমার জন্যই একাজ করেছে। লুসি তরতর করে মই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। আমরা পিছনে। ঘরটা খালি প্রায় অন্ধকার, সূর্য ডুবে গেছে বিকেলের আলো স্তিমিত। ঘরের একমাত্র জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস আসছে।

ডাঃ পোর্টার মেঝেতে শায়িত অ্যানের দেহের এক পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়েছেন। অ্যানের ক্ষতবিক্ষত মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল না। কেন না অন্যদিকে বৃদ্ধ ওয়াল্টার্স এবং আরেকদিকে মেজর ব্রিক্সলে দাঁড়িয়ে। তিনজনকে যেন ঠিক শিকারী পাখির মতো দেখাচ্ছে।

ডাঃ পোর্টার হাত তুলে লুসিকে বললেন, লুসি, তুমি দেখো না। এই দৃশ্য সহ্য করতে পারবে না।

অ্যান ছোটখাটো চেহারার পাতলা গড়ন। পরনে ধূসর রঙের সিল্ক পোশাক। লুসি বেশিক্ষণ সেই ভয়ানক দৃশ্য সইতে পারল না। মেজর ব্রিক্সলে তাকে নীচে নিয়ে গেলেন হাত ধরে। বোঝা যাচ্ছে আক্রান্ত হওয়ার পরে অন্ধ অবস্থায় অ্যান ঘরময় ছোটাছুটি করেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এদিক ওদিক রক্তের দাগ ছড়ান। তার পোশাকে দাগ, একদিকে কাঁধের কাছ থেকে জামা ছেঁড়া। আক্রমণের চিহ্ন দেখে বোঝা যায়, এটা কোন মানুষের কাজ নয়, যেন নরক থেকে উঠে আসা প্রচণ্ড এক অশুভ শক্তির কুকর্ম। নৃশংস মৃত্যুর ছায়ায় সবাই স্তম্ভিত বাকরুদ্ধ অবস্থা। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি দেখেছি তথাপি যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। দেওয়াল মেঝে কোথাও একটি নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত লুকোনোর জায়গা নেই। কোন

টেবিল চেয়ারও নেই। এতদিন যে টেবিল চেয়ারের কথা বলা হত, তাও নেই। অ্যান এখানে আসার আগে কেউ আসেনি, আমরা দেখেছি স্বচক্ষে। তার চিৎকার শুনে যখন দরজা ভেঙে ঢুকছিলাম তখনও ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না। জানালার গরাদ এত কাছাকাছি এবং শক্ত যে কোন কিছু ঢোকার সাধ্য নেই। জানালার নীচে আট ফুট খাড়া দেওয়াল এত মসৃণ যে মাছি পর্যন্ত পিছলে যায়। তাহলে...?

ফেনউইক আচমকা তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি দেওয়াল দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে দেখেছেন কখনও?

পোর্টার জবাব দিলেন, আমি প্রতিটি ইঞ্চি পরখ করে দেখেছি। ছাদও পরীক্ষা করেছি। গোপন কোন যাতায়াতের পথ নেই। যান্ত্রিক কলা কৌশলে তাকে আক্রমণ করারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যেটা হয়ত আপনারা ভাবছেন। ওয়াল্টার্স তাঁর কথায় সমর্থন জানালেন। বৃদ্ধ পুনরায় বলে উঠলেন, আমারই দোষে এই ঘটনা ঘটেছে। আমি নিষেধ করেছিলাম। আমার কিছু একটা করা উচিত ছিল। বছর পঞ্চাশ আগে এ্যালেন মর্টলেক যখন মারা যায় আমি তখন বালক ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, তখনও ঠিক এরকম ঘটনাই ঘটেছিল।

ফেনউইক বললেন, আমিও শুনেছিলাম সেই সময়। তাই তো আমার আরও অবাক লাগছে, দুবার একই রকম ঘটনা। যাই হোক পুলিশকে জানানোর আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনারা সবাই সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন তো?

প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে পোর্টার বলে উঠলেন। সাক্ষ্য। ওহ্ হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী দেব। আরমা সবাই নীচে ছিলাম, অ্যানের সঙ্গে কেউ আসিনি।

হেনরি ছিল আপনাদের সঙ্গে? ফেনউইকের প্রশ্ন শুনে পোর্টার বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ছাদের ঘরের ভাঙা দরজার পাল্লা ফাঁক করে উঁকি মেরে হেনরি বললেন, ধন্যবাদ, আপনাদের কথায় স্যার জেমস ফেনউইকের মনের সন্দেহ নিশ্চয়ই ঘুচেছে। এবার তাহলে পুলিশকে খবর দেওয়া যেতে পারে। হেনরি আমাদের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন।

ওয়াল্টার্স চেঁচিয়ে উঠল 'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আপনি কি বুঝতে পারছেন যে আপনার ভাইঝি...?

হেনরির যেন অপরাধবোধ জেগে উঠল, চোখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। বললেন, 'মাপ করবেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনারা সম্ভবত বুঝতে পারছেন না যে অ্যান তার দোষের শাস্তি পেয়েছে।'

ডাক্তার পান্টা বললেন, 'আপিন কি সত্যিই তা বিশ্বাস করেন?

হেনরি চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললেন, আপনি কি অন্য কিছু প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন? যদি তা পারেন তাহলে তা করে দেখান। কিন্তু যা কিছুই করুন না কেন আমি আপনাকে পরামর্শ দেব, সাবধানে এগোবেন।

'আমরা চেষ্টা করতে পারি। ফেনউইক কথা বলতেই রিচার্ড দরজার সামনে মুখ বাড়াল। কথা শেষ করলেন তিনি। প্রশ্ন করলেন ঘটনাটা আনুপুর্বিক সাজিয়ে দেখা যাক। অ্যান এই ঘরে কখন ঢুকেছিল?

কব্জির ঘড়িটা দেখে পোর্টার বললেন, আধঘণ্টা আগে। ধরুন বিকাল ছটা নাগাদ।

ফেনউইক ঃ তার সঙ্গে আর কেউ ছিল?

পোর্টার ঃ না, এখানের কেউ না। তবে...

ফেনউইকঃ হ্যাঁ, বলুন?

পোর্টার ঃ অ্যান যখন মই চড়ছিল সেই সময় রিচার্ড মইয়ের কয়েক ধাপ চড়ে অ্যানকে ফিসফিস করে কিছু যেন বলছিল।

একথা শোনামাত্র তরুণ রিচার্ডের মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল যে আমি কিছুই বলিনি। আমার দিকে ওভাবে তাকাবেন না সবাই। আমি অ্যানকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম, ভয় পেয়ো না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। স্যার জেমস ফেনউইককে অবিলম্বে এখানে আসার জন্য টেলিফোন করেছি...।'

তার কথার মাঝে হেনরি মন্তব্য করলেন, ও এই কারণে আমাদের মহামান্য প্রতিবেশী এখানে এসেছেন?

ফেনউইক পোর্টারকে প্রশ্ন করলেন, রিচার্ড কি অ্যানের সঙ্গে একসঙ্গে উপরে এসেছিল?

পোর্টার ঃ না।

ফেনউইক ঃ অ্যান উপরে ওঠার আগে আর কেউ কিছু তাকে বলেছিল?

পোর্টার ইতস্তত করে বললেন, হেনরি বলছিলেন যদি রুপার্ট ও তার পোষা কাকেরা ওই রাস্তা দিয়ে আসে, অ্যান তাহলে তুমি...

ফেনউইক ঃ ও কথার অর্থ কী? উনি কি বলতে চেয়েছিলেন?

হেনরি মাথা নেড়ে মুখে হাসি এনে বললেন, আমি বলছি। এরপর তিনি জানালার কাছে গেলেন নাটকীয় ভঙ্গিতে জানালার লোহার গরাদ হাতের মুঠিতে চেপে ধরে আমাদের দিকে চোখ পিটপিট করে বললেন, এটা একটা দারুণ গল্প। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো গল্পটা শুনেছেন। ১৬২১ সালের কথা।

এখনকার আধুনিক কাক নয়, তখন কাকদের যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হত। রুপার্ট হেনরি ভিভিয়ান মর্টলেককে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ভিভিয়ানকে তার পরিবার হুকুম দিয়েছিলেন রূপার্টকে বিয়ে করার। কিন্তু শয়তানির প্রতিমূর্তি ভিভিয়ান তাকে ঘৃণা করত। এমন কি রুপার্ট যে তার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তার জন্যও সে বুকে অসীম ঘৃণা পুষে রেখেছিল। ভিভিয়ান রূপার্টকে দেখা মাত্রই অসভ্যের মতো চীৎকার করত। বলত তুমি কি আমার পিছন পিছন ঘুরতে ক্লান্ত হবে না কখনও? রুপার্ট জবাব দিতেন, ভালবাসার চারটে মুখ আছে, অনেকটা দিক নির্ণয় যন্ত্রের মতো। তুমি যেখানেই যাও সেই ভালোবাসা কাঁটার মতো আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে যায়। তুমি আমাকে কখনও কোথাও লুকিয়ে যেতে পারবে না। একথা নিশ্চিত জেনো।

সেই অহংকারী হিংস্র মহিলা রুপার্টকে কি করল জানেন?

একদিন রাতে তিনি যখন পাহাড়ের নীচে ভুট্টা খেত দিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন লোকজন লাগিয়ে তাকে উলঙ্গ করে সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে মুড়ে দেয়। জীবন্ত মমির মতো তখন তার অবস্থা। চোখ আর নাকটি শুধু খোলা। তারপর তাকে কম্বল, খড় আর কাঠ দিয়ে বেঁধে কাকতাড়ুয়ার মতো মাঠের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বের সমস্ত মানুষ যদি তার পাশ দিয়েও হেঁটে যায় তাহলে তাকে স্রেফ কাকতাড়ুয়া ভিন্ন কিছুই ভাবতে পারত না। তার শরীরের যে অংশ একটু আধটু উন্মুক্ত হছিল সেই জায়গা ছুরি দিয়ে কেটে দিয়েছিল। রক্ত ঝরতে দেখে কাকের দল ভিড় করবে এবং খুবলে খাবে তাকে। হয়েছিলও তাই।

পরদিন এই চিলেকোঠার ঘরে জানলার ধারে বসে ভিভিয়ান উল বুনতে বুনতে গান গাইতে গাইতে সেই নারকীয় দৃশ্য উপভোগ করেছিল। যথারীতি কাকের দল এসে ঠুকরে ঠুকরে শেষ কাজটুকু করে। দুদিন ওই অবস্থায় রুপার্ট বেঁচেছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু কেউ টের পায়নি। কাকেরা ঝাঁক বেঁধে যখন তাঁর মাথা খুবলে খাচ্ছিল তখন কালো পেঁজা জীবন্ত তুলোর মতো দেখাচ্ছিল তাকে। দুজন চাষীর ছেলে প্রথম এটা দেখতে পেয়েছিল। কাকদের তাড়িয়ে রুপার্টকে নীচে নামান হয়।

তখন অবধি রুপার্ট বেঁচেছিলেন কোনক্রমে। শেষ নিশ্বাস ছাড়ার অপেক্ষায় ছিলেন। তখনও কেউ ঘুণাক্ষরে টের পায়নি এই জঘন্য কাজের জন্য ভিভিয়ানই দায়ী। মৃত্যুর আগে তিনি মিলোডি মর্টলেককে বলেছিলেন, ভিভিয়ান যদি বিয়ে করে তাহলে বিয়ের সাতদিন আগে তিনি আসবেন তার সঙ্গে দেখা করতে। ভিভিয়ান তখন বুঝবে, যে মৃত্যুরও চারটে মুখ আছে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেনরি গলা বাড়িয়ে বললেন, আপনারা এর সত্যটা অস্বীকার করতে পারেন। আপনারা কি সবাই অন্ধ যে বুঝতে পারছেন না, আলো ঘরকে আলোকিত করে একথা যেমন সত্য তেমনি শয়তানের অস্তিত্বও সত্য। আমি তাকে প্রত্যক্ষ করেছি ঝোপের মধ্যে বাজপাখির রূপে। আপনারা কি উড়িয়ে দিতে পারেন যে সেই পিশাচই অন্ধ রূপার্টকে ঘোড়ার উপর বসিয়ে এই চিলেকোঠার দিকে পাঠিয়েছিল? কালো মেঘের মতো কাকের দল ঝাঁক বেঁধে জানালা গলে ভিভিয়ানের মুখ ছেঁকে ধরেছিল, হেনরি গলার স্বর এবার নীচু খাদে নামিয়ে এনে বললেন, যদি সেকথা বিশ্বাস না হয় তাহলে আজকের এই ঘটনার কথা ভাবুন। আমরা সবাই নীচে থেকে অ্যানের চিৎকার শুনেছি। আপনাদের অনুভূতি কি বলে, আপনারা কি তখন ডানা ঝাপটানোর কোন আওয়াজ পাননি।

কথা শেষ করে হেনরি তার তেল ঘামে চকচকে মুখটা মুছলেন। ঠোঁটের ফাঁকে তার হাসির রেখা, চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। ডাঃ পোর্টার কড়া নজরে তার দিকে তাঁকিয়ে বললেন, বুঝতে পারিছ না আপনার চিকিৎসা করা নাকি ধর্মীয় গুরুকে দেখানো দরকার। ডানা ঝাপটানোর শব্দ? হ্যাঁ আমরা সেরকম শব্দ শুনেছি কিন্তু আমি জানি সেটা কিসের শব্দ। ওটা নীচে ওই জলাধারে যে রাজহাঁস আছে তাদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ। অ্যান যখন চীৎকার করে উঠেছিল তখনই ওই শব্দ হয়। শুধু তাই-ই নয়, জলে পড়ার ঝাপসা শব্দও শোনা গিয়েছিল। আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, আপনিও সব শুনেছেন। আপনি তখন ওই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাই নাকি, ফেনউইক এতক্ষণ পরে কথা বললেন। সবাই তার দিকে তাকাল। পোর্টার বললেন, হ্যাঁ, উনি দাঁড়িয়েছিলেন ওখানে কিন্তু তাতে কি হল।

ফেনউইক ওয়াল্টার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, ১৮৮৬ সালে এ্যালেন মর্টলেক যখন এই ঘরে মারা যান সেইসময় আপনি কিশোর ছিলেন। সেই ঘটনার কথা আপনার মনে আছে? বলতে পারেন এ্যালেনের বিয়েতে কে আপত্তি করেছিল? তার বাবা?

মাথার সাদা চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তার বাবা? না। তিনি তখন মৃত। তার ভাই হেনরি আপত্তি জানিয়েছিল। তিনি এই বর্তমান হেনরির বাবা।

ফেনউইকের পরের প্রশ্ন ঃ তিনি পেশায় কি ছিলেন?

-যতদূর মনে পড়ে তিনি স্বর্ণকার ছিলেন। জবাব দিলেন ওয়াল্টার্স।

ফেনউইক হাতের চাবুকটা হাঁটুর উপরে আলতো করে মেরে বললেন, এর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। তিনি কোনমতেই স্বর্ণকার ছিলেন না। এটা নিশ্চয়

করে বলতে পারি আমি। ফেনউইক দ্বিতীয় হেনরির মধ্যে একটা বেপরোয়া ভঙ্গী দেখলেন। কঠোর ঘৃণাভরে দৃষ্টি এবং অগ্রাহ্য করার ভাব দেখে তিনি হেনরিকে বললেন, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি? ফেনউইক একথা বলার আগেই আমার সঙ্গে চোখের ইঙ্গিতে বলে দিয়েছেন তার কথায় সায় দিতে। তিনি বললেন, 'মর্টলেক, অভিশাপের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। কি করে বোঝা গেল জানেন? লুসি একটু আগে এই ঘরে এসেছিল, কিন্তু তার কোন ক্ষতি হয়নি।'

খুবই স্বাভাবিক। হেনরি বললেন, আমাদের ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে...।

সৌজন্যের সুরে ফেনউইক বললেন, 'ওদের বিয়ের তো মাত্র সাতদিন বাকি। তুমি বোধহয় শোনোনি লুসি আর আমার তরুণ বন্ধু টম ব্রুকলিন আজ বিকেলেই ঠিক করেছে অ্যানের বিয়ের তারিখে তারাও বিয়ে করবে। এই জলজ্যান্ত মিথ্যে কথায় মর্টলেকের মুখ ঝুলে গেল। ফেনউইক ঠাণ্ডা গলায় বলে চললেন, জানি, এটা শোভন হবে না, বিশেষত অ্যানের আচমকা মৃত্যুর পর। কিন্তু লুসি চায় অভিশাপ ও ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার থেকে মুক্তি পেতে। এই অভিশপ্ত ঘরে রাত কাটানোর চাইতে বরং কিছু রীতি লঙ্ঘন করা শ্রেয়। হেনরি, তুমি এবং তোমার ভূতের দল এই সিদ্ধান্তের কথা জান না। তোমার বাড়ির ছাদের নীচে এই শেষ রজনী কাটাবে লুসি। এখন আমি বিদায় নিচ্ছি।

ফেনউইক এই কথা শেষ করে মই বেয়ে নীচে নামতে উদ্যত হলেন। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। হেনরি মুখ বাড়িয়ে বললেন, বন্ধু, আমার শেষ কথাটা শুনে যাও, যদি চাও তো আমাকে সর্বদা নজরে রাখার জন্য পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করতে পার। লুসিকে দরজা বন্ধ করে রাখতে পার। প্রহরী রাখ তার জন্য। তবু তারা আসবে লুসিকে আঘাত করবার জন্যে। তবে হ্যাঁ, মিস্টা ব্রুকলিন...।

জবাব দিও না, চলে এস। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন ফেনউইক। পিছনে হেনরির কুটিল হাসি কানে এল। মিনারের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ফেনউইক আমাকে বললেন, ঈশ্বর আমার সদয় হোন। টম, আমার ধারণা হেনরি তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

আপনি বলছেন লুসি...? আমি প্রশ্ন করি।

হ্যাঁ ফেনউইক জবাব দিলেন। কিন্তু মানুষ কখনও অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে না। দৃঢ়স্বরে বলি। কালা জাদু কি ওর নখদর্পণে? শয়তানকে খুশিমতো ডেকে আনবে ও? সবার চোখের সামনে উপস্থিত থেকে একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে সে কাউকে খুন করতে পারে না। একাজ অসম্ভব যদি না সাক্ষীরা মিথ্যে কথা বলে।

ফেনউইক বললেন, সাক্ষীরা মিথ্যা কথা বলছে না। তবে সত্যি কথাটা জেনে রাখ এই ঘটনার মধ্যে কোন অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নেই। যেটা রয়েছে তা হল বুদ্ধি ও ভয়ানক কৌশল। এবার হেনরি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে।

আমার কৌতূহলী প্রশ্ন আপনি বলতে চাইছেন ওই ঘরের মধ্যে কোন গোপন কৌশল রাখা হয়েছে?

ফেনউইক বললেন, না, টম ওই ঘরটায় বাচ্চাদেরও নির্ভয়ে রাখা যায়। যখন তুমি জেনেছ যে এর মধ্যে অতীন্দ্রিয় কিছু নেই তখন নিশ্চিন্তে বসে থেক না। অন্য বিপদের দিকও আছে। মর্টলেক এমনিতে খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে। আমি ওকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ওর বুদ্ধির গোড়া আলগা হয়ে গেছে। ও এখন মরিয়া। সেটাই হবে আমাদের সুযোগ। ভুল পা ফেললেই ওকে পাকড়াও করব। আর তর্ক কর না। এখন লুসিকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

নীচের একটা হলঘরে ওকে পাওয়া গেল। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শিশুর মতো সে আমার হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে বলল 'দুঃখিত আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। ঘটনাটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবে এখন আমি সামলে নিয়েছি।

ফেনউইক তাকে বললেন, খুব আনন্দের কথা। তোমাকে মানসিক দিক থেকে আরও সবল হতে হবে। রাতে পুলিশ চলে যাওয়ার পর তুমি মিনারের ওই চিলেকোঠার ঘরে যাবে একা।

তিনি এই কথা বলা মাত্র আমার মনে হল এই পুরোনো বাড়িটা যতটা নির্জন ভেবেছিলাম তা নয়। আমাদের কথা শোনার জন্য যেন অনেকেই কান পেতে আছে। কোথাও যেন ফুটবল খেলার শব্দ পেলাম। কিন্তু কোন কিছুই মনে রাখলাম না। কেননা ফেনউইকের কথা আমাকে বিস্মিত করেছে। বললাম, আপনি কি বলছেন? রাতে একা লুসি ওই ঘরে যাবে? আপনার কথা মেনে ও যদি একা ওই ঘরে যায় তাহলে তবে আগে আমাদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে একটা কাজ করতে হবে। সেই কাজটা হল কাকা হেনরিকে গলা টিপে মেরে ফেলা।

ফেনউইক ঘুরে দাঁড়ালেন। তার যে চোখে চশমা রয়েছে সেটা যেন ঝলসে উঠল। চোয়ালদুটো পিষে ফিসফিস করে বললেন, 'বোকা, আমি যা বলব তাতেই সায় দাও।' লুসির দিকে তাকিয়ে সবাই যাতে শুনতে পায়, উঁচু গলায় বললেন, 'তুমি মন দিয়ে শোন, তুমি যদি প্রাণে বেঁচে থাকতে চাও তাহলে আমি যা বলব তা পালন করবে। বুঝেছ? আমি চাইব যে তুমি অভিশাপ ভাঙতে ওই ঘরে যাচ্ছ। এই বাড়ির সবকিছু একটা বিশেষ জায়গায় এসে পৌঁছেছে। ওই ঘরের জানলা দিয়ে দূরে ফেনউইক মহল, দেখতে পাবে।

আপনার বাড়ি, লুসির প্রশ্ন।

হ্যাঁ, আমার বাড়ি। ফেনউইক বললেন, আমি চাই তুমি রাত এগারোটায় ওই ঘরে যাবে। তার মধ্যে পুলিশ চলে যাবে। তারপর তুমি নিরাপদ। কোন আলো সঙ্গে নেবে না। বুঝেছ? কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র নেবে। এখানে পৌঁছে আমার সংকেতের জন্য অপেক্ষা করবে। ঠিক এগারোটায় আমার বাড়ির পূর্ব দিকের সর্বোচ্চ জানলায় আলো দেখতে পাবে। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝবে কিছু একটা ঘটতে পারে। দুটো আলো দেখলে বুঝবে আমার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। তৎক্ষণাৎ তুমি ঘর থেকে বাইরে চলে আসবে এবং সেই সময় তোমাকে কেউ বাধা দিলে পিস্তল থেকে গুলি চালাবে।

একটু থেমে তিনি বলবেন, জানি তোমার মনে অনেক প্রশ্ন ভিড় করেছে। জানি, তুমি যেরকম বিপদে পড়েছ তাতে অন্য কেউ হলে এতক্ষণে ভেঙে পড়ত। আমার উপর আস্থা রাখ, তবে আমি কখনই বলব না তুমি অন্ধের মতো আমাকে বিশ্বাস করো। যদি না আমি সব জানতাম। এটাই একমাত্র পথ তোমাকে অন্ধকার থেকে বের করে আনার, বুঝেছ?

লুসি বলল, হ্যাঁ আমি পারব। পারতেই হবে আমাকে। আমার বোন আমারই জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এখন বলুন কি করতে হবে?

ফেনউইক নীচু স্বরে বললেন, এখানে নয় বাইরে। দুজনেই চল তাড়াতাড়ি।

বাইরে এসে আমি বললাম, আমাদের কথা কিন্তু কেউ আড়ি পেতে শুনেছে জানেন নিশ্চয়ই।

ফেনউইক ঃ জানি, আমি তো তাই চাইছিলাম।

লুসি ঃ তাহলে কি আমাদের পরিকল্পনা পাল্টে ফেলা হবে।

ফেনউইক ঃ মোটেও না। যা বলেছি সেভাবেই করবে। শুধু একটা সংযোজন হবে। তুমি টমকে বাড়ির কোথাও লুকিয়ে রাখবে। পারবে তো? আর টম, তুমি লুসি যাওয়ার ঠিক পনের মিনিট আগে লুকিয়ে ওই মিনারে পৌঁছে যাবে. কোন আলো জ্বালবে না। ঘড়িও দেখবে না। যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে...দেখ, তোমরা ওইদিকে তাকাও। জলাশয়ের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন তিনি। দেখলাম জলের উপর সাদা রঙের কি যেন ভাসছে। একটা গলাকাটা রাজহাঁস।

লুসি বলল, কেউ যেন গলা কেটে দিয়েছে। হেনরি কাকা রাজহাঁসগুলোকে খুবই ভালবাসেন। প্রত্যেকের নামও দিয়েছেন।

ফেনউইক বললেন, তিন নম্বর প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রথম প্রমাণ সূর্য, দ্বিতীয় হেনরির বাবা স্বর্ণকার ছিলেন এবং তৃতীয় মৃত রাজহাঁস। ওর নাম কি 'বিচার'?

তাহলে ওই তাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করবে।

লুসি আমাকে ছোট লাইব্রেরীর মধ্যে লুকোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখানে দুজন চাকরের কেউই আসে না। লুসির মুখ ভয়ে সাদা হলেও ঠোঁটের হাসি মিলায়নি। সে তার দায়িত্ব পালন করতে গেছে। সঙ্গে নিয়েছে ·২২ বোরের ব্রাউনিং পিস্তল। কাছের শহর পোর্ন্টাক থেকে পুলিশ এসেছে অ্যানের মৃত্যুর তদন্ত করতে। লুসি চলে যাওয়ার পরে একা অন্ধকারে উদ্বেগ নিয়ে সময় গুনছি। না পারছি ধূমপান করতে, না পারছি নড়াচড়া করতে। হলঘরের ঘড়িতে সাড়ে দশটার ঢং শব্দ হতেই তৈরী হয়ে নিলাম। আরও পাঁচ মিনিট কাটিয়ে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগলাম অন্ধকারের মধ্যে। যত এগোচ্ছি মিনারের দিকে বুকের কাঁপুনি ততই বাড়ছে। পাছে কারোর চোখে পড়ে যাই এই ভয়েই কাঁটা হয়ে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যে মিনারের সিঁড়ি পেয়ে গেলাম। দু সেকেণ্ড পরে মীনারের নিচের ঘরে পৌঁছলাম। জানি না লুসি এখন কোথায় এবং কি করছে। বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে। ঘরের খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি ফেনউইকের বাড়ি থেকে আলোর সঙ্কেত দেখার ব্যাপারে গোলমাল বাঁধাবে।

একটু পরে শুনতে পেলাম মইয়ের দিকে কেউ যেন আসছে। বৃষ্টির জন্য পায়ের শব্দ হালকা মনে হচ্ছে। একটা ছায়া এগিয়ে এল চিলেকোঠার দরজাটা খুলল। টম! লুসির ফিসফিস গলা। আমি বললাম, ঘাবড়িও না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

লুসি ঃ মিনারের সিঁড়ি অবধি কেউ যেন আমাকে অনুসরণ করে এসেছে।

বৃষ্টি আরও ঝেঁপে নামল। তা সত্বেও নীচেরে ঘরের মধ্যে কেউ একজন হেঁটে গেল তার শব্দ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। যেই আসুক সে কিন্তু তার উপস্থিতি লুকোতে চাইছে না। আশ্চর্য! মতলব কি তার? আগন্তুকের পায়ের শব্দ জোর হল আরও। সে মই দিয়ে উঠে আসছে। লুসিকে ঘরের কোণে সরে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলাম। দরজা দিয়ে একটা মুখ উঁকি দিল। বিদ্যুৎ চমকের আভায় লুসিকে সিঁটিয়ে যেতে দেখলাম।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুক ফ্যাসফেসে স্বরে বলল, সব ঠিক আছে। লুসি, তুমি কি এখানে? আমি সব শুনেছি জানি, স্যার জেমস আমাকে বলেছেন। আমি ডিক।

·দূর থেকে লুসি বলল, তুমি কি চাও! তুমি কি জান না...'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতেই এসেছি। এই বৃষ্টিতে তুমি দূরের ওই আলোর সংকেত দেখতে পাবে না যদি তুমি...' এই কথা বলে সে কালো রঙের

একটা বাইনোকুলার বাড়িয়ে ধরল। রাতে দূরের জিনিস তাতে স্পষ্ট দেকা যায়. এবার তুমি সবকিছু দেখতে পাবে।' কথা শেষ করল ডিক।

'ধন্যবাদ ডিক। তাড়াতাড়ি দাও।' লুসি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, এগারটা বেজে গেছে...'

ঠিক তখনই আমার ডানদিকে অন্ধকার ফুঁড়ে, ছোট্ট অথচ তীব্র আলোর রেখা এসে পড়ল ডিকের মুখে। ডিকের তখন হতভম্ব অবস্থা। হাতের বাইনোকুলারটা সে লুকোবার চেষ্টা করল।

স্যার জেমস ফেনউইকের গলা কানে এল, 'ওই বাইনোকুলারটা ছোঁবে না। ওটাই অ্যানকে খুন করেছে। টম, ডিককে ধর, পালাতে দিও না ওকে দেখ ও যাতে সাহায্যের জন্য চেঁচাতে না পারে। জলদি কর।

ডিক মর্টলেক কোন বাধা ছিল না। একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সম্মোহিত শিশুর মতো সামনে দুহাত বাড়িয়ে খুনের হাতিয়ারটা তুলে দিতে চায় সে।

ফেনউইক বললেন, 'আসল অপরাধী অন্য জন। শয়তান চূড়াণির আজ্ঞা এই তরুণ পালন করছে মাত্র। তবে এর জন্য ওর ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। হেনরির কথায় ডিক অ্যানের হাতে এই বাইনোকুলারটা তুলে দিয়েছিল। অ্যান ডিককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। হেনরি সেই সুযোগটা নিয়েছে। দাও, আমার হাতে ওটা দাও।

ডিক বাইনোকুলারটা তুলে দিল। রোগা ডিকের তখন বিধ্বস্ত অবস্থা।

ফেনউইক বললেন লুসিকে, 'আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, তোমাকে কেউ বাইনোকুলার দেবে কিম্বা ধারে এই জিনিসটা তুমি খুঁজে পাবে। দূরের জিনিস দেখার জন্য তুমি এটা চোখে দিলে দেখবে যে সব ঝাপসা লাগছে। তখন তুমি কি করবে? স্বচ্ছ দেখার জন্য বাইনোকুলারের মাঝখানের চাকাটা আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক করবে। তাই না?

ঝাপসা দেখার কারণ কি? এর চাকায় বন্দুকের ট্রিগারের মতো ব্যবস্থা আছে। কমপ্রেসড এয়ার গানের কৌশলে তৈরী এটা। চাকাটা ঘোরালেই লেন্সের ভিতর থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা ক্ষুরধার ইস্পাতের ফলা বের হয়ে দুটো চোখ এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের অভিশাপের পাকা বন্দোবস্ত।

লুসি দুর্বল চিত্তের মেয়ে নয়, তা সত্ত্বেও ফেনউইকের মুখে তার কাকার ষড়যন্ত্রের নেপথ্য কাহিনী শুনে তার নিশ্বাস যেন আটকে আসছে। ঠোঁট ফাঁক করে মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছে। ফেনউইক থামলেন না, গম্ভীর স্বরে বললেন, এই নারকীয় হত্যালীলার চমকপ্রদ অংশ হল খুনি যন্ত্রটাকে অদৃশ্য করার কৌশল। দরজা বন্ধ, ভিতরে লাশ। উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে খুনি কি করে বাইনোকুলার

সরাবে? অথচ না সরাতে পারলে সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে। কিংবদন্তীর প্রথম সুযোগ নিয়েছিলেন প্রথম হেনরি। তিনি পেশায় ছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী। চশমা তৈরীর কাজ তিনি জানতেন। বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে পঞ্চাশ বছর আগে নিজের বোনকে হত্যা করে স্বার্থ সিদ্ধি করেছিলেন এইভাবে।

ফেনউইকের কথা সবাই দমবন্ধ করে শুনছে। তিনি বলে চললেন এই ঘরের জানলা দিয়ে অ্যানের মত তাকেও বলা হয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে অশরীরী রুপার্ট আসছে কিনা দেখতে। দূরের জিনিস দেখার জন্য হয় তার হাতে বাইনোকুলার তুলে দেওয়া হয়েছিল নয় জানলার ধারে ফেলে রাখা হয়েছিল। যেমন এবারে মই বেয়ে ওঠার সময় অ্যানকে ডিক ফিসফিস করে বলেছিল জানলার ধারে বাইনোকুলারটা রয়েছে। ওই সময় পশ্চিমদিকের জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়ে। তাই দূরের জিনিস দেখা যায় না। অন্যদিকে আমাকে বলা হয়েছিল দ্রুত আসার জন্য। ঘোড়ায় চেপে আমি আসব ওরা জানত।

লুসি বলল, অ্যান আপনাকেই দেখেছে...।

ফেনউইক বললেন, হ্যাঁ। দূরের ঝাপসা মূর্তিটা স্পষ্ট করে দেখার জন্য বাইনোকুলারটা জানলার তিন ইঞ্চি গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেখাই স্বাভাবিক। সেই সময় ইস্পাতের ফলাটা যখনই চোখে বিদ্ধ করবে তৎক্ষণাৎ হাত থেকে সেটা গিয়ে পড়বে ষাট ফুট নীচের জলাশয়ে, যেখানে রাজহাঁসের দল ঘুরে বেড়ায়। ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ, ঝপাস শব্দ, মরা হাঁস, সবই ছকে বাঁধা পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে। বাইনোকুলারের ফলাটা হাঁসের গলাটা কেটেছে। জলে পড়ার সময় শব্দ হয়েছে। অন্য হাঁস ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটে সরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য প্রমাণও লোপ পেয়েছে।

ফেনউইক বললেন, অ্যানের মৃত্যুর পরে ভাবছিলাম হাতেনাতে নাটের গুরুকে ধরতে হবে। পরিখার জল থেকে বাইনোকুলারটা খুঁজতে গেলে ধরব সঙ্গে সঙ্গে। বাধ্য হয়ে আমাকে আমার বাড়ির ওই আলো দেখানোর কথা বলতে হয়েছে। এই কথা বলেই প্রাক্তন গোয়েন্দাপ্রধান ডিকের কাছে গিয়ে তার জামার কলারটা ধরে ঝাঁকুনিটা দিয়ে বললেন, বাপধন, অ্যান ভেবেছিল তোমার প্রভু স্বয়ং আসবে। কিন্তু তাকে তখন ধরতে পারিনি যখন তুমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে নইলে তোকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

ডিক এতক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। হাত দিয়ে চোখ মুছছিল, ফেনউইকের শেষ কথা শুনে সে জোরে কেঁদে উঠল। লুসির দিকে তাকিয়ে বলল, বিশ্বাস কর, আমি একাজ করতে বাধ্য হয়েছি। স্বীকার করছি অপরাধ করেছি আমি। কাকা একটা আস্ত

উন্মাদ। আমি তার কথামতো না চললে তিনি আমাকে শেষ করে দিতেন। বিশ্বাস করো লুসি, আমি তোমার জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আমি তোমাকে বাঁচাবার...

ফেনউইক ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, সাক্ষীদের কাছে সে কথা খুলে বলতে হবে তোমাকে। বল রাজি আছ তো?

ডিক ঃ হ্যাঁ।

ফেনউইক ঃ তাহলে বলতো, হেনরি সর্বক্ষণ জানালার ধরে দাঁড়িয়েছিল কেন? বাইনোকুলারটা জানালা দিয়ে গলে নীচে পড়ে কিনা সেটা দেখতে। তাই না? যদি প্ল্যান মাফিক সেটা বাইরে না পড়ে তবে বিকল্প ব্যবস্থাও ছিল। তার পকেটে আরেকটা সাধারণ বাইনোকুলার ছিল। সেক্ষেত্রে তিনি সর্বাগ্রে মই দিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকে খুনি যন্ত্রটা সরিয়ে ফেলে নির্দোষ বাইনোকুলারটা রেখে দিতেন, তাই না?

ডিক ঃ হ্যাঁ।

ফেনউইক ঃ এসব কথা যদি তোমাকে লিখে সই করে দিতে বলা হয় তাহলে দেবে তো।

ডিক ঃ হ্যাঁ।

সেই সময় আমাদের পিছন থেকে নরম অথচ ভারী গলায় কে যেন বলে উঠল কেউ নড়বে না। প্রাণের বিন্দুমাত্র যদি মায়া থাকে।

মই দিয়ে নিঃশব্দে উঠে এসেছে কখন আমরা কেউ টের পাইনি। তার হাতে ঝোলানো লণ্ঠনের আলো। টাক মাথা, ভোঁদকা লম্বা চেহারার উপর কালো কোট। লণ্ঠনের আলোর ছায়ায় তাকে ঠিক পিশাচের মতো লাগছে। আমি লুসিকে আমার পিছনে টেনে আড়াল করে দাঁড়ালাম। আমরা ওর চোখের দিকে সরাসরি তাকালাম। দেখলাম খুন করতে এই লোকটার হাত একটুও কাঁপবে না।

লোকটি ডান হাতটা সামনের দিকে সামান্য তুলে বলল, আমার এই জিনিসটা তোমাদের জার্মানি পিস্তলের চাইতেও মারাত্মক। এয়ার পিস্তল। আমার বাবার তৈরী। পুরোনো হলেও খুব কাজের। আমার বন্ধু স্যার জেমস ফেনউইক নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, এতে শব্দ হয় না। তোমাদের আঙুল যদি সামান্য নড়ে তাহলে এর বুলেটটা তোমাদের এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। দেখবে পরীক্ষা করে? আচ্ছা, দেখাই যাক।

আমার কি হল ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর হাতের আলোটা একপাশে সামান্য সরে গেল। কি একটা জিনিস ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে এল। আমি কাটা গাছের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে

লাগলাম। মনে হল মাথার মধ্যে যেন বাজ পড়ল।

হেনরি বললেন, ওঠার চেষ্টা করবে না। তোমার ডান হাঁটুর নীচের দিকটা গুঁড়িয়ে গেছে। তোমার এখন ঘুম ঘুম পাবে। আমি তোমাদের কারোর শরীরে বুলেট ঢোকাতে চাই না। আমি চাই, তোমরা সবাই মিলে একে একে আমার এই টেলিস্কোপ দিয়ে রাতের আকাশের তারা দেখ। জান তো, আমার রসবোধ নিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার আছে।

ফেনউইকের মধ্যে ঘাবড়াবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি বললেন। 'না, তোমাকে ওরা ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে না। তোমাকে কোথায় পাঠানো হবে জান? চের্থামে নিশ্চয়ই জান, ওটা হচ্ছে উন্মাদ অপরাধীদের জায়গা।

অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে হেনরি মর্টলেক বললেন, তোমার জায়গায় আমি হলে একথা কখনই বলতাম না। বলেই বন্দুকের ট্রিগারটা টানলেন।

দেওয়ালে ঠক করে একটা আওয়াজ হল শুনতে পেলাম। ফেনউইক উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু মুখে কিছুই বলছেন না। তার চোখের চশমা মেঝেতে পড়ে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্যঙ্গ স্বরে মর্টলেক বললেন, কি হে বন্ধু দাওয়াইটা কেমন লাগল, তবে এখনও তেমন সাংঘাতিক কিছু হয়নি। বুঝলে হে, ভারতের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান। ভাল চাও তো দেওয়ালের দিকে সরে যাও। নইলে আরও দাওয়াই পড়বে। এবার কঠোর স্বরে হুকুম দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, তোমাদের সবাইকে আমার এই টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে। লুসি তুমি ভুলেও তোমার খেলনা পিস্তলটা যেন ব্যবহার করতে যেও না। আমি আগে থেকেই পিস্তলের গুলি বের করে নিয়েছি।

তোমরা কি আমাকে এত বোকা মনে কর? বলে চললেন, শয়তানের শাকরেদ মর্টলেক। আমি বুঝেছিলাম স্যার জে. কৌশল ধরে ফেলেছে। আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। ফেনউইকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এই পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত থানার পুলিশ এসে যদি এই বাড়িটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে তাহলেও তোমাদের রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কি গোয়েন্দাপ্রবর, তোমার কি মনে হচ্ছে?

আমি হাতে ভর দিয়ে এক ঝটকায় উঠে মর্টলেককে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। আমার মতলব বুঝতে পেরেই পিস্তলটা একবার উঠিয়ে তাক করলেন। আমার হাতে এসে কিছু যেন বিঁধে গেল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলাম।

মর্টলেক বললেন ডিককে, ডিক তুমি একটা ভুল করেছ বুঝতেই পারছি। ডিক তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করে চলেছে। তোমাকে আঘাত করার ইচ্ছা আমার নেই। তুমি আমার কথা শুনে চলতে রাজি আছ?

ডিক বলল, হ্যাঁ। ডিককে সত্যিই ওর কথা শুনে চলতে রাজি আছে বোঝা গেল। আর ও যে এটা করবে আমরা জানতাম।

মর্টলেক দাঁত চেপে ফেনউইকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন আমি একটা কথা জানতে চাই। তোমার বাড়ি থেকে আলো দেখানোর মতলব করেছ তার কারণ কি? কি বলতে চেয়েছ?

ফেনউইক বিচলিত না হয়েই জবাব দিলেন, তুমি নিজেই খুঁজে বের করার চেষ্টা কর।

হেনরি মেজাজি স্বরে বললেন, ঠিক আছে বন্ধু, তোমাকে বলতে হবে না। আমি নিজেই খুঁজে বের করছি। একথা বলে তিনি একটা বাইনোকুলার দেখালেন। বললেন এটা সাধারণ বাইনোকুলার। ক্ষতি করবে না। এটা দিয়েই দেখব তোমার আলো....। এরপরে তিনি জানলার নীচে তাকালেন। তখনই তার বিকট চিৎকার শুনলাম। হাতের আলোটা মেঝেতে পড়ে চুরমার। অন্ধকারে কালো বস্তার মধ্যে মেঝেতে কিছু যেন গড়াগড়ি দিচ্ছে এপাশ ওপাশ। সেই সঙ্গে যন্ত্রণাভরা কাতরোক্তি। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর সব চুপচাপ। শুধু বাইরে থেকে বৃষ্টির শব্দ ভেসে আসছে। বুঝলাম সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। আমরা বোধহয় বেঁচে গেলাম। তখনই কানে এলো ফেনউইকের গলা।

তিনি বললেন, লুসি ঠিক আছ তো? যাও এবার ওর পিস্তলটা নিয়ে নাও, আর কিছু করার ক্ষমতা নেই ওর।

ডিক রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, লুসি আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে মরতে দেব না। দেখ, আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছি। আজ রাতে এখানে আসার আগে ওর অজান্তে দুটো বাইনোকুলার পাল্টে রেখে দিয়ে ছিলাম। খুনি যন্ত্রটা ছিল ওর হাতে। আমি জ্ঞান হারাবার আগে শুধু বুঝলাম, ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন শেষ হল। দেখলাম লুসি আমার দিকে দৌড়ে আসছে।

মেরি বার্নেট

জেমস্ হগ্

নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলি সেন্ট মেরি হ্রদের একশ' মাইলের মধ্যে একটি মেষ-পালকের বাড়িতে ঘটেছিল বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু সেই পরিবারের কিছু বংশধর আজও কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করে, তাই আমি এমন সব নাম এখানে ব্যবহার করছি যাতে তাদের চিনতে না পারা যায়; অবশ্য গল্পটা যারা আগে থেকেই জানে তাদের কথা স্বতন্ত্র।

ইন্‌ভার্লন-এর চাষীর ছেলে অ্যালানসন ছিল সুদর্শন, বাউন্ডুলে ও বেপরোয়া চরিত্রের এক যুবক; সে ছিল উৎসাহী ও প্রেমপ্রবণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয়; পুরুষ, নারী অথবা প্রেতাত্মা কাউকে সে ভয় করত না। আরও অনেকের সঙ্গে প্রেমাভিসার ছাড়াও সে প্রেমে পড়ল, কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেটের সঙ্গে; মেয়েটি সুন্দরী ও নিষ্পাপ; গ্রাম্য সরলতার মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে। মেয়েটি ছেলেটিকে ভালবাসত আবার ভয়ও করত; অন্য সকলের সঙ্গে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে তার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও কখনও সে একাকী নির্জনে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করত না। একদিন "আওয়ার লেডি"-র ভজনালয়ে প্রার্থনার পরে যুবকটি সুযোগ বুঝে অনেক ভালবাসার কথা বলে, অনেক শপথ করে এমনভাবে মেয়েটিকে তার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে অনুনয়-বিনয় করল যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি কথা দিল, হয়তো সে এলে তার সঙ্গে দেখা করবে।

হ্রদের একেবারে তীরে একটি নির্জন সবুজ জায়গা মিলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হল ঃ যারা মাছ ধরতে ভালবাসে তাদের কাছে জায়গাটা খুবই পরিচিত। আর এই প্রাচীন কাহিনীর লেখকের কাছেও কিছু কম পরিচিত নয়। মিলনের সময় স্থির হল কিংস এল্‌ওয়াল্ড (এখন নাকি বোকার মতো তাকেই বলা হয় কালপুরুষ নক্ষত্র) যখন পাহাড়ের উপরে প্রথম ছড়িয়ে দেবে তার সোনালী আলো। অ্যালানসন অনেক আগেই এসে হাজির হল; এতই আগ্রহ ও অনুরাগের সঙ্গে সে আকাশের দিকে তাকাতে লাগল যে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশের প্রতিটি ছোট তারাকেই সে কিংস এল্‌ওয়াল্ডের প্রথম প্রকাশ বলে মনে করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত এল্‌ওয়াল্ড সগৌরবে আবির্ভূত হল, আর যুবকটি আবেগকম্পিত বুকে সেই উঁচু প্রান্তরের দিকেই তাকিয়ে রইল যে পথ ধরে সুন্দরী মেরি বার্নেট

নেমে আসবে। কিন্তু মেরি বার্নেট এল না; কিংস এল্‌ওয়াল্ডের পূর্ণ রূপটি আকাশপটে আঁকা পড়ল, কিন্তু মেরি বার্নেটের দেখা মিলল না।

যুবক অ্যালানসন তীব্র হতাশায় ভেঙে পড়ল; আর গল্পে যেরকম বলা হয়ে থাকে, মনে মনে একদা অশুভ কামনা উচ্চারণ করল—সে চাইল কোন ডাইনি বা পরী মেরিকে এমনভাবে প্রভাবিত করুক যাতে কুমারী মনের সব সংকোচ কাটিয়ে মেরি এসে তার সঙ্গে দেখা করে।

হতাশ প্রেমের আবেগে এই কামনা সে তিনবার উচ্চারণ করল। মাত্র তিনবারই সেটা উচ্চারিত হল, তার বেশী নয়, আর তখনই—কী আশ্চর্য দূরে দেখা গেল দ্রুত পা ফেলে মেরি এগিয়ে আসছে নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে। সে উত্তেজনা বুঝি অ্যালানসনেরও সহ্যের অতীত। আনন্দে সে যেন উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠল; পরবর্তীকালে সে নিজেই স্বীকার করেছে, প্রথম মিলনের কোন কথাই তার মনে নেই; শুধু মনে আছে, মেরি ছিল সম্পূর্ণ নির্বাক, ভাল-মন্দ কোন কথাই সে বলেনি। কিছুক্ষণ পরেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, কোন সান্ত্বনা মানল না। মর্মভেদী স্বরে হাহাকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আর তারপরেই আশ্চর্য দ্রুতগতিতে ছুটে চলে গেল।

আগেই বলেছি, হ্রদের এই দিকটা অনেকেরই চেনা; এখানে তীরের ঠিক উপরে একটা খাড়া পাহাড় ঝুলে আছে; আকারে বেশী বড় না হলেও উপর থেকে বা নীচ থেকে কোন পথেই সেখানে যাওয়া যায় না। খুব শুকনোর সময় ছাড়া অন্য সব সময়ই সমুদ্রের জল সেই পাহাড়ের নীচে কয়েক গজের মধ্যেই থাকে, আর বাকি জায়গাটা থাকে উপর থেকে ভেঙ্গে পড়া পাথরের স্তূপে আকীর্ণ। সেই সংকীর্ণ বন্ধুর পথে মৎস্য-শিকারীরাও দুপুর বেলায় চলতে পারে না, আর মেরি কিনা রাতের অন্ধকারে হরিণের মতো দ্রুতগতিতে সেখান দিয়েই ছুটে চলল। প্রেমিক সর্বশক্তি দিয়ে তার পিছনে ছুটতে ছুটতে ডাকতে লাগল, "মেরি! মেরি! প্রিয় মেরি, থাম আমার সঙ্গে কথা বল। আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব, অথবা যেখানে যেতে চাও সেখানেই পৌঁছে দেব, কিন্তু এভাবে ছুটে যেও না। থাম প্রিয়তমা মেরি—থাম!"

মেরি থামল না। দৌড়তে লাগল। একসময় হ্রদের উপর বেরিয়ে আসা এমন একটা ছোট পাহাড়ের উপর পৌঁছে গেল যার ওপারে আর পথ নেই। এবার প্রেমিক এসে তাকে ধরে ফেলবে একথা বুঝতে পেরে আর একবার আর্তনাদ করে উঠেই সে হ্রদের জলে ঝাঁপ দিল। হ্রদের শান্ত জলে তার পতনের শব্দ যুবকটির কানে বাজল মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনির মতো; এতক্ষণ সে ছিল প্রেমে পাগল, এবার সে হলে হতাশায়

পাগল, দেখল মেয়েটি ভাসতে ভাসতে ক্রমেই তীর থেকে হ্রদের গভীর জলের দিকে চলে যাচ্ছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবতে শুরু করল, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল; একটু নড়ল না, একটিবারও চীৎকার করল না। এ ঘটনার আগেই অ্যালানসন খুলে ফেলেছিল তার টুপি জুতো ও কোট। সেও জলে ঝাঁপ দিল। মেরি যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সাঁতরে সেখানে গেল; কিন্তু সেখানে জলে একটা বুড়বুড়িও কাটছে না। এমন কি তার প্রিয়তমা যেখানে ডুবে গেছে সেখানে শেষ নিঃশ্বাসের একটা শব্দও রেখে যায়নি। সেই সংকট-মুহূর্তে যুবকটির মনে হল, যদি বাঁচতে হয় তো প্রিয়তমার সঙ্গে বাঁচবে, আর না হয় তো তার বাহুবন্ধনের মধ্যেই মরবে। সেও ডুব দিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও না পারল হ্রদের তলদেশে পৌঁছতে, না বুঝতে পারল তলদেশ থেকে কতটা দূরে সে আছে। অবশেষে ক্লান্ত দেহে ভগ্ন হৃদয়ে আবার সে তীরের পথই ধরল, আপাদমস্তক ভেজা অবস্থায় অর্ধ-নগ্ন দেহে সে ছুটল মেয়েটির বাবার বাড়িতে দুঃসংবাদ জানাতে। সব নিশ্চুপ। বুড়ো চাষী পরিবারটির একমাত্র কন্যা মেরি; তারা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে। এই দুঃসংবাদ জানাতে তাদের ঘুম ভাঙাতে হবে—এ কথা ভাবতেই প্রেমিকের চোখ জলে ভরে উঠল; কিন্তু জানাতে তো হবেই; দুঃসংবাদ হলেও তো তা জানাতেই হবে।

চাষীর জানালার কাছে গিয়ে কাতর স্বরে সে ডাকল, "অ্যান্ড্রু। অ্যান্ড্রু বার্নেট তুমি কি জেগে আছ?"

"এত রাতে আবার অ্যান্ড্রু বার্নেটকে কিসের দরকার পড়ল?"

"খুব খারাপ খবর অ্যান্ড্রু বার্নেট।"

"খবর যে খারাপ সে তো তোমার গলা শুনেই বুঝতে পারছি। কিন্তু খবরটা কি?"

"তোমাদের আদরের মেয়ে—তোমাদের একমাত্র মেয়ে মেরি—"

বুড়ো চমকে উঠল; বলল "মেরির কি হয়েছে?" মেরির মাও ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, কি হয়েছে মেরির? তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালালো।

প্রতিবেশী যুবকটির অর্ধনগ্ন দেহ থেকে তখনও জল ঝরছে; তার দৃষ্টিতে উন্মাদ হতাশা ফুটে উঠেছে। সে দৃশ্য দেখে বুড়ো-বুড়ির বুকের ভিতরটা শির্‌শির্ করে উঠল ঃ একটা কথাও তারা বলতে পারল না। একসময় যুবকটিই বলল "মেরি চলে গেছে; তোমাদের ও আমার ভালবাসার মেয়েটি হারিয়ে গেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে জলের নীচে, আর আমিই তাকে মেরে ফেলেছি।"

"তুমি পাগল হয়েছ জন অ্যালানসন," বুড়ো তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, "বাবা পাগল; হ্যাঁ, তোমার চোখ-মুখই বলছে তুমি পাগল হয়েছ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে

তুমি পাগল হয়েছ; কিন্তু তুমি তো আবার ভাল হয়ে উঠবে, আবার আমাদের জ্বালাবে।" হঠাৎ কি মনে পড়ায় সুর পাল্টে বলল, "কিন্তু কি সব বলছি? এখনই তো চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করা যায়। বৌ, মেয়ের বিছানার কাছে চল তো দেখি?"

দুঃখে ও আতঙ্কে কম্পিত বুকে জিন লিন্টন আলো নিয়ে মেরির ঘরের দিকে চলল, আর পুরুষমানুষ দুটি চলল তার পিছু পিছু। ছোট লম্বা কুটিরটির একেবারে শেষ প্রান্তে মেরির ঘর। সে ঘরে ঢুকে তারা দেখল মাথার উপর চাদর টেনে দিয়ে কে যেন বিছানায় শুয়ে আছে। বিছানার পাশে মেরির ছোট বাক্সটার উপর তার পোশাকগুলি সুন্দরভাবে পাট করে রাখা আছে। সব সময় যেমন থাকে। এ দৃশ্য দেখে বুড়ো-বুড়ির মুখে ফুটল আশার আলো, কিন্তু প্রেমিকের হৃদয় ডুবে গেল গভীর হতাশার মধ্যে। বাবা নাম ধরে ডাকল, কিন্তু বিছানা থেকে কোন সাড়া এল না; তবে একটা কান্নার শব্দ সকলেই শুনতে পেল। বুড়ো সাহস করে মুখের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিল, আর কী আশ্চর্য, বিছানায় শুয়ে আছে মেরি বার্নেট; মুখখানি চোখের জলে ভিজে গেছে, কিন্তু ত্রিমূর্তির ভয়ার্ত মুখ দেখে সে মোটেই বিস্মিত হয়নি। অ্যালানসন ঢোঁক গিলল, এখনও সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেরির পোশাকে হাত দিল; সব শুকনো খটখটে, হ্রদের জলে ডুবে যাওয়ার চিহ্নমাত্র নেই।

অ্যালানসন বিস্ময়ী-বিমূঢ়। তবু মেরি বেঁচে আছে—তাতেই তার আনন্দ অপরিসীম। মেরির বিছানার পাশে নতজানু হয়ে সে অনুমতি চাইল একবার তার হাতে চুমো খেতে।

মেরি কিন্তু ঘৃণায় তাকে সরিয়ে দিল; জোর গলায় বলল ঃ তুমি দুষ্টু লোক জন অ্যালানসন, মিনতি করছি, আমার চোখের সামনে তুমি দূর হয়ে যাও। আজ রাতে যে কষ্ট আমি সয়েছি তা রক্ত মাংসের মানুষের সহ্যের অতীত আর সে কষ্ট আমাকে দিয়েছে তোমারই কোন দুষ্ট লোক। তাই যাঁর বিধান তুমি লঙ্ঘন করেছ তাঁর নামে তোমাকে মিনতি করছি, তুমি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও।

পরস্পরবিরোধী ঘটনার চাপে বিভ্রান্ত যুবকটি দুই হাত তুলে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। মুখটা মরার মতো সাদা হয়ে গেছে। তা দেখে বুড়োবুড়ির করুণা হল। মেয়ের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তার শরীরটাকে গরম করল; তারপর তীব্র কৌতূহলে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু তার মুখ থেকে বোধগম্য কোন কথাই বের করতে পারল না। থেকে থেকে সে শুধু কয়েকটি অসংলগ্ন উক্তিই করতে লাগল। যেমন "হে ঈশ্বর, এ সবের অর্থ কি? অথবা এ সবই শয়তানের ভেল্কি; অশুভ শক্তি আমার উপর ভর করেছে।"

তার কাছ থেকে কোন কথা বের করতে না পেরে বুড়োবুড়ি নিজেরাই নানারকম জল্পনা কল্পনা শুরু করে দিল। জিন লিন্টন বলল, নিশ্চয় হ্রদের ভিতর থেকে কোন জলপরী উঠে এসেছিল, মেরির বেশ ধরে ছেলেটিকে নষ্ট করতে। তা শুনে অ্যান্ড্রু বার্নেট উপদেশের ছলে বলল, "এবারের মতো খুব বেঁচে গেছ জন অ্যালানসন কিন্তু বুড়ো মানুষের একটা পরামর্শ শোন—আর কখনও কোন ভাল মানুষের মেয়েকে ভুলিয়ে নিতে কখনও রাত-বিরেতে বেরিও না—বেরুলে তোমার কপালে অনেক কষ্ট আছে।

অ্যালানসন তখনও থর থর করে কাঁপছে দেখে জন লিন্টন দৌড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে দুই শিশি ভর্তি করা সুরা এনে তাকে খাইয়ে দিল; আর অ্যান্ড্রু তার কব্জিতে সুতো বেঁধে দিয়ে একটা শক্ত লাঠি তার হাতে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল; যাবার আগে সেই সাবধান বাণীটা আর একবার শুনিয়ে দিল।

পরদিন সকালে মেরি অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশী সাজগোজ করল, কিন্তু তার সুন্দর মুখের উপর একটা গভীর বেদনার ছায়া স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। মাঝে মাঝেই দুটি চোখে অকারণ অশ্রুধারা যেন টলমল করতে লাগল। সারা সকাল ভালমন্দ একটা কথাও বলল না, শুধু দুই একবার গভীর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সব দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল। বেলা নটা নাগাদ একটা খড়ের পাকানো দড়ি কাঁধে ফেলে সে হ্রদের পূর্বপ্রান্তের মাঠে চলে গেল, ঘরের খড়ের কিছু অংশ বেঁধে নেবে বলে; আগে থেকেই কথা ছিল, তার বাবা ও দাদা দুপুরবেলা ভেড়ার খোঁয়াড় থেকে সেখানে এলে মেরি গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে।

বুড়ো অ্যান্ড্রু বাড়িতে ফিরে এলে তার স্ত্রীর সঙ্গে গত রাতের ঘটনা নিয়েই কথাবার্তা চলতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে অ্যান্ড্রু বলল, "ভাল কথা জিন, গত রাতে আমাদের মেয়ে যুবক জন অ্যালানসনকে কিন্তু একটা খুব খারাপ কথা বলেছে।"

"কী আবার খারাপ কথা ও বলেছে ঃ একটি ভাল খ্রীষ্টান মেয়ের মতই তো কথা বলেছে, বেশ করেছে।"

"আমি কিন্তু তা মনে করি না জিন। ও যে ছেলেটিকে হাটিয়েছিল সেটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে না শয়তানের নামে তা কিন্তু সঠিক বোঝা গেল না।"

"আহা অ্যান্ড্রু তুমি এ-কথা বলছ কেন? সে যে ঈশ্বরের নামেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?"

"আরে, মেয়ে তো স্পষ্ট করেই ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করতে পারত; তাহলে তো আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না; তার পরিবর্তে সে কি বলল, না—

যার বিধান তুমি লঙ্ঘন করেছ তাঁর নামে তোমাকে মিনতি করছি তুমি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও। সে কার কথা বলেছে—ঈশ্বরের না শয়তানের? তাছাড়া সে তো আরও বলেছে, তার কষ্ট রক্তমাংসের মানুষের সহ্যের অতীত। তা থেকে কি এটাই বোঝায় না যে সে রক্ত-মাংসের জীবের চাইতে অন্য কিছু? জিন লিন্টন, জিন লিন্টন! হায়, যদি এটাই ঘটে থাকে যে আমাদের মেয়ে জলে ডুবে গেছে, আর তার রূপ ধরে আমাদের বাড়িতে ফিরে এসেছে একটা পরী, তাহলে তুমি কি বলবে?"

"চুপ কর অ্যান্ড্রু—বার্নেট চুপ কর; আমার বুকটা যে ঠান্ডা হয়ে আসছে। আমরা তো চিরদিনই প্রভুর উপর ভরসা রেখেছি, তিনিও কোনদিন আমাদের পরিত্যাগ করেন নি; তিনি কখনও শয়তানকে আমাদের উপর বা আমাদের সন্তানের উপর ভর করতে দেবেন না।"

"তুমি ঠিক বলেছ জিন; সেই আশাকেই আমরা আঁকড়ে ধরে থাকব।" এই কথা বলে বুড়ো অ্যান্ড্রু ছেলে আলেকজান্ডারকে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল আদরের মেরির কাজে সাহায্য করতে।

মাঠে পৌঁছে তারা তো অবাক। তিন ঘন্টা হয়ে গেল মেরি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। প্রতি ঘন্টায় তারা অন্তত পক্ষে একডজন খড়ের গাদার আনাচে-কানাচে অনেক খুঁজল কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। যুবকটি গোয়ালেই রাত কাটাত বলে গত রাতে তাদের বাড়িতে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার কিছুই সে জানত না; তাই তার বাবা এতে খুব শঙ্কিত হয়ে পড়লেও সে নিজে ততটা ভয় পেল না। বাবা কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারল না ঃ মেরির জন্য অপেক্ষা করে একসময় কোটটা গায়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরল—সব দুঃখের কথা স্ত্রীর কাছে বলতে। যাবার আগে ছেলেকে বলে গেল সে যেন আশপাশের সব খামারে ও বাড়িতে খোঁজ নেয় কেউ মেরিকে দেখেছে কি না।

বাড়িতে পৌঁছে অ্যান্ড্রু যখন স্ত্রীকে খবরটা দিল যে তাদের আদরের মেয়েটি হারিয়ে গেছে, তখন বৃদ্ধ দম্পতিটির শোকের আর শেষ রইল না, দুজনে বসে বসে কাঁদতে লাগল। বুড়োর সব রাগ গিয়ে পড়ল জন অ্যালানসনের উপর। বলল, "হতচ্ছাড়াটা যদি ক্ষুব্ধ বাবা-মার মিনতি না শোনে তাহলে এই দুটি হাতের ধকল তাকে সইতেই হবে।" যুবক অ্যালানসনকে বাড়িতে পাওয়ার তিলমাত্র আশা নেই জেনেও অ্যান্ড্রু সোজা চলে গেল ইন্‌ভার্লনে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে সবিস্ময়ে দেখল, অ্যালানসন প্রচন্ড জ্বরে একেবারে শয্যাশায়ী। বিকারের ঘোরে অনবরত ডাইনী, ভূত ও মেরি বার্নেটের কথা বলছে। তার বিকার এতই তীব্র

আকার ধারণ করেছে যে তিনজন লোক তাকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে রেখেছে। তার বাবা মা খোলাখুলি বলল যে তাদের ছেলেকে হয় ডাইনীতে ধরেছে, না হয় তো কোন অপদেবতা তার উপর ভর করেছে। ফলে সেই পরিবারের দুঃখের কথা বলে আর কি হবে—এই কথা ভেবে বুড়ো মেষপালক নিঃশব্দে নিজের শোকসন্তপ্ত বাড়িতে ফিরে গেল।

ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পরে তার ছেলেও বাড়ি ফিরল। কেউ তার বোনকে দেখে নি। তবে অক্সক্লুশ নামক জায়গায় একটা পাগলি বুড়ি বলেছে, একটা মস্ত বড় রথে চড়ে যুবক জন অ্যালানসনের সঙ্গে মেরিকে বাকহিলের পথ ধরে যেতে দেখেছে; এতক্ষণ তারা ডাস্‌গ্রি চৌরাস্তায় পৌঁছে গেছে। শুনে বুড়ো-বুড়ি ভাবল, অত বড় পাগলি বুড়ির কথাগুলোকে তারা বুড়ো বয়সের ভীমরতি বলেই ধরে নিল। তবু অনেক চেষ্টা করেও যখন মেরির কোন খোঁজই পাওয়া গেল না তখন বুড়ো অ্যান্ড্রু আর একবার সেই পাগলি বুড়ির কাছেই গেল। কিন্তু এবার সে কোন কিছুই স্মরণ করতে পারল না; এমন সব উপকথা আওড়াতে লাগল যার মাথামুন্ডু কিছুই সে বুঝতে পারল না।

সুন্দরী মেরি বার্নেট হারিয়ে গেল। ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল নটায় সে তার বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়; পরনে ছিল সাদা গাউন ও সবুজ ওড়না, কাঁধে ছিল খড়ের দড়ি; সেই বেশেই তাকে গ্রামের মধ্যে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। এইভাবে কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেট হারিয়ে গেল। এই রহস্যজনক ঘটনায় সারাদেশে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে একসময় একটা দীর্ঘ পল্লী-গাথাও রচিত হয়েছিল; সর্বত্র গাওয়াও হত। আমি শুধু তার কথাই শুনেছি। তার গান বা আবৃত্তি কখনও শুনিনি। তার অনেকগুলি শ্লোকই এইভাবে শেষ হত ঃ

"কিন্তু সুন্দরী মেরি বার্নেট।
তোমাকে তো আর কোনদিন দেখতে পাব না।"

গল্পটা ক্রমেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল (এবং সেটা যে অত্যন্ত অতিরঞ্জিতভাবেই হল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই), আর যে যুবকটি বেঁচে রইল তার প্রতি কটূক্তি বর্ষণের যেন কোন মাত্রা রইল না। অবশ্য কটূক্তি তার কিছুটা প্রাপ্যই ছিল। কারণ তারপর থেকেই সে আগের চাইতে দশগুণ খারাপ হয়ে উঠল। একটা ব্যাপারে কিন্তু সারাদেশ একমত হল; আসল মেরি বার্নেট হ্রদের জলে ডুবে মরেছে, আর যে জীবটি বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিল ও পরদিন উধাও হল সে হয় কোন পরী, আর না হয়তো কোন পেত্নি, কারণ মাত্র একবার [illegible]টি রহস্যজনক উক্তি করা ছাড়া আর কোন কথাই সে বলেনি, এবং পরিবারের

কারও সঙ্গে বসে কোনরকম খাবারও খায় নি। বাবা-মা এ নিয়ে কোন কথাও বলে না, কোনরকম চিন্তা-ভাবনাও করে না, এই ক্লান্ত পৃথিবীর পথে তারা যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দিনগুলো কাটাতে লাগল। মেরি বার্নেটের সব জিনিসই তারা পবিত্র স্মৃতি হিসাবে বাড়িতে রেখে দিল; সেগুলিকে ঘিরে মায়ের চোখে অনেক জল ঝরল। বুড়ো অ্যান্ড্রু মাঝে মাঝেই হ্রদের তীর বরাবর হাঁটতে থাকে; মেয়ের কোন স্মৃতিচিহ্ন যদি খুঁজে পাওয়া যায় এই তার মনের আশা। অনেক ছোট ছোট হাড় সে সংগ্রহ করল; কোনটা ভেড়ার, কোনটা বা অন্য জন্তুর, আবার কোনটা হয় তো মাছের; বুড়োর ধারণা ওগুলো তার মেয়ের হাত পায়ের আঙুলের হাড়। সেইসব হাড় সে তার ছোট থলিটাতে লুকিয়ে রাখে।

যুবক অ্যালানসনের জ্বর-বিকার ভাল হয়ে গেল, কিন্তু অন্য সকলের মতো ধীরে ধীরে নয়, হঠাৎ একদিন সে সুস্থ হয়ে উঠল। তাকে দেখে মনে হত মেরি বার্নেটের কথা তার মনেই নেই। সে আগের চাইতে দশগুণ বেশী খারাপ হয়ে গেছে। অসংকোচে সবরকম অন্যায় কাজ করে। সকলেই তাকে ঘৃণা করে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। মেরি বার্নেট হারিয়ে যাবার পরের বছর। এক শুক্রবার সকালে জন অ্যালানসন গেল অ্যানান্‌ডেল-এর অন্তর্গত শেফাই গ্রামের মস্ত বড় ভাড়াটে মেলায় বাড়ির কাজের জন্য একটি দাসী ভাড়া করতে। তার চরিত্রের কুখ্যাতি তখন এতই ছড়িয়ে পড়েছে যে আশেপাশের কোন যুবতীই তার বাবার বাড়িতে কাজ করতে রাজী হয় না। তাই সে শেফাই-এর মেলায় গেল একটি সুন্দরী মেয়েকে ভাড়া করে আনতে; মনের ইচ্ছা, বাড়িতে এনেই তাকে নষ্ট করবে। এটা কোন অনুমানমাত্র নয়, কারণ মেলায় তার সহযাত্রী কারিকেরান গ্রামের মিঃ ডেভিড ওয়েলচ্‌কে সে তার মনের কথাটি বেশ গর্বভরেই বলেছিল। কিন্তু অ্যানান্‌ডেল-এর কুমারী মেয়েদের একটি অভিভাবক-পরী যে সেদিন মেলায় উপস্থিত ছিল সে কথা তারা কেউই জানত না।

ভাড়াটে বাজারে ঘুরতে ঘুরতে একটি মেয়ে অ্যালানসনের নজরে পড়ে গেল; না পড়ে আর যাবে কোথায়, তার মতো সুন্দরী, মনোরমা মেলায় আর একটিও ছিল না। মিঃ ওয়েলচ্‌ চুপচাপ দাঁড়িয়ে অ্যালানসনকে দেখতে লাগল। অ্যালানসন সুন্দরীকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল। তার পরনে সবুজ পোশাক; যেন সদ্যফোটা গোলাপটি।

"তুমি কি ভাড়া যাবে সুন্দরী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার সঙ্গে ভাড়া যাবে?"

"আপত্তি নেই। তবে অনেক দিনের জন্য ভাড়া করতে হবে।"

"অবশ্য। যত বেশী দিনের জন্য হয় ততই ভাল। কত মাইনে চাও?"

"কি জানেন, আমি যদি ভাড়া যাই তো ইন্‌ভার্লনে প্রথম যে জীবিত প্রাণীটিকে দেখব তাকেই আমার চাই।"

"তাহলে সে তো আমিই হব। কিন্তু ইন্‌ভার্লন সম্পর্কে তুমি কি জান?"

"আমার তো ধারণা সব কিছুই আমার জানা উচিত।"

"কী আশ্চর্য! এ মুখ যে আমার কাছে নিজের মুখের মতই চেনা বুঝি বা তার চাইতে বেশী চেনা। কিন্তু নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। তোমার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

মেয়েটি ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "আমার নাম মেরি বার্নেট।" বলেই সে তার ওড়না মুখের উপর টেনে দিল।

সেই মুহূর্তে যদি অ্যালানসনের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করা হত তাহলেও হয় তো তার বুদ্ধিশক্তি এতখানি লোপ পেত না। মুখটা মরার মতো সাদা হয়ে গেল, চোয়াল ঝুলে পড়ল, চোখ দুটি চকচক করতে লাগল। মিঃ ওয়েলচ্ সারাক্ষণ তার উপরে নজর রেখেছিল। সহযাত্রীর সংকটজনক অবস্থা। বুঝতে পেরেই সে এগিয়ে গেল। বলল, "অ্যালানসন, মিঃ অ্যালানসন? কি হল তোমার? মেয়ে যে তোমাকে যাদু করেছে—একেবারে পাথরের মূর্তি বানিয়ে ফেলেছে।"

অ্যালানসনের গলার মধ্যে একটা শব্দ হল; যেন কিছু বলতে চাইল, কিন্তু জিভে কোন শব্দ উচ্চারিত হল না; কেবল বিড়বিড় করতে লাগল। তার বিকার দেখা দিয়েছে, এখনই মূর্চ্ছা যাবে—এটা বুঝতে পেরে মিঃ ওয়েলচ্ তাকে ধরে নিয়ে "জনস্টন আর্মস্" সরাইখানাতে ঢুকল। কিন্তু অনেক প্রশ্ন করেও তার মুখ থেকে কোন কথা বের করতে পারল না। ওয়েলচের কিন্তু ঐ সবুজবসনা সুন্দরীকে আর একবার দেখার খুব ইচ্ছা হল। তাই অ্যালানসনকে বেশ কিছুটা মদ খাইয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে গোটা মেলা তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু সবুজবসনা সুন্দরী উধাও, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। নিজের নামটা বলেই সে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। অ্যালানসন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল—আবার সে ফিরে গেল বাজারের মাঝখানে।

অচিরেই আগেরটির চাইতে সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখতে পেল। সে যেন একটি ক্ষীণকটি পরী; পরনে বরফ-সাদা পোশাক তাতে সবুজ ফিতে বাঁধা। ওয়েলচ বলল, এমন সুন্দরী সে জীবনে দেখে নি। অ্যালানসন তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে যথারীতি প্রশ্ন করল ঃ "তুমি কি ভাড়া যাবে সুন্দরী?"

"আপত্তি নেই।"

"তাহলে কত মাইনে চাও? আরে—খোলাখুলি বল। তবে ভেবেচিন্তে বল। অল্পসল্পের জন্য তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাব না।"

"আমার মাইনে হবে বিনিময়ে; অন্য কোন শর্তে আমি কাজ করব না। বলুন তো ইনভার্লনের সব ভাল মানুষরা কেমন আছে?"

অ্যালানসনের দমবন্ধ হয়ে এল; শরীরের ভিতর দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বইতে লাগল; কোনরকমে বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ—সকলেই মোটামুটি ভাল আছে।"

মেয়েটি আবার শুধাল, "আর আপনার প্রতিবেশী বৃদ্ধ দম্পতি! তারা কি এখনও বেঁচে আছে—ভাল আছে?"

অ্যালানসন জানতে চাইল—কোন দম্পতির কথা বলছ তুমি?

"সে কি?" মেয়েটি বলল, "কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেটকে তুমি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?"

অ্যালানসন এমনভাবে চমকে উঠল যেন একটা বুলেট তার বুকে বিঁধেছে। সুন্দরী পরী-মূর্তি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল, আর হতভম্ব যুবকটি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। মিঃ ওয়েলচের ডাকে চমক ভাঙতেই আর একটি সুন্দরীকে দেখতে পেয়ে তাকেও ভাড়া করতে চাইল এবং একই জবাব পেল। একই নাম শুনল। আসলে, প্রথম যখন আমি গল্পটা শুনি তখন এইরকম সাতটি সুন্দরীর কথা আমাকে বলা হয়েছিল, আর তারা সকলেই ছিল কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেট। কিন্তু আমার ধারণা, অতগুলি সুন্দরীকে পরীক্ষা করার আগেই সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল যে তার উপর কোন অপদেবতার ভর হয়েছে। যাই হোক যখন কিছুতেই কিছু হল না, তখন সে বসে বসে বেশ খানিকটা কড়া মদ পেটে ঢালতে লাগল। আর তখনই মেলায় এমন একটি অপরূপ সুন্দরীর আবির্ভাব ঘটল যে সকলেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তার উপরে। সোনালী কাজ করা রথে চড়ে মেলায় এসেছে এক সুন্দরী। সোনালী সবুজ উর্দিপরা দুটি পরিচারক তার রথের সামনে, দুটি পিছনে; শেফাই-এর মেলায় এমন চমৎকার উল্কা এর আগে কেউ কখনও দেখেনি। সঙ্গে সঙ্গে গোটা মেলার খবর ছড়িয়ে পড়ল যে এই সুন্দরী আল অব মর্টনের জ্যেষ্ঠা কন্যা লেডি এলিজাবেথ ডগ্‌লাস; সম্প্রতি তিনি সোকার্টের নিকটবর্তী অচিনক্যাসলে বেড়াতে এসেছেন। স্কটল্যান্ডে তখন তার রূপের খুব খ্যাতি; আর পরবর্তীকালে তিনিই হয়েছিলেন লেডি কীথ। এই কাহিনীতে তার নামটি উল্লেখিত হওয়াতেই জানা যায় যে সময়টা ছিল চতুর্থ জেম্‌সের

রাজত্বকাল। আর সেই সময়েই স্কটল্যান্ডে ভূত-প্রেত ডাইনিতে মানুষের বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক।

মেলার সকলেরই বিশ্বাস যে এই সুন্দরী আর্ল অব মর্টনের কন্যা। তিনি যখন "জনস্টন আর্মস" সরাইখানায় এলেন তখন সবুজ পোশাক পরা একটি ভদ্রলোক খালি মাথায় এসে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিল। সকলেই এক দৃষ্টিতে এই অপরূপ সুন্দরীকে দেখল, কিন্তু অ্যালানসনের মতো এত বিহ্বল কেউ হল না।

স্বর্গে মর্ত্যে বা পরীদের দেশে এর অর্ধেক মনোরমা কাউকে দেখার কথা সে কোনদিন ভাবতেই পারে নি। প্রশংসায় বিমূঢ় হয়ে যখন দাঁড়িয়েছিল তখন তাকে আরও বিস্মিত করে দিয়ে সেই অতুলনীয় সুন্দরী তাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারল না। আর কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে কি না বুঝবার জন্য এদিক ওদিক তাকাতে লাগল; কিন্তু সুন্দরী তাকে দ্বিতীয়বার কাছে ডাকলেন; এবার তার মুখে বিজয়িনীর মধুর হাসি। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালানসন মাথার বীভার টুপিটা খুলে দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল; আর সুন্দরী হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে দুজনে সরাইখানায় ঢুকে গেলেন।

অ্যালানসন ভাবল, দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী লেডি এলিজাবেথ ডগলাস এইভাবে তাকে কৃতার্থ করেছে; মেলার অন্য সকলেও তাই ভাবল।

মহিলাটি প্রথমেই অ্যালানসনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। অ্যালানসন যথাসম্ভব বিনীতভাবে মহিলাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপরেই সুন্দরী অ্যালানসনের বাবা ও মার কথা জানতে চাইলেন। ওহো। যুবকটি নিজের মনেই বলে উঠল, তাহলে, তাহলে তো এই সুন্দরী তার প্রেমে পড়েছে। একান্ত বিনয়ে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যুবকটি সুন্দরীর বাবা ও যুবক লর্ড উইলিয়ামের কথা বলতে শুরু করতেই মহিলাটি তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, যুবক তাকে চিনতে পেরেছে কি না।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়! মাননীয়া মহিলাকে সে অবশ্যই চেনে, মনে হচ্ছে আগে তাকে সে অনেকবার দেখেছে। কিন্তু কবে, কোথায় তাদের দেখা হয়েছিল এই মুহূর্তে সেটা কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না।"

তারপরেই সুন্দরী কার্কস্টাইলের প্রতিবেশীদের কথা জানতে চাইলেন; তারা এখনও বেঁচে আছে কি না, ভাল আছে কি না!

অ্যালানসনের মনে হল তার হৃৎপিন্ডটা বুঝি জমেই বরফ হয়ে গেছে। সারা দেহে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল! ধপ্ করে একটা আসনে বসে নিশ্চল হয়ে রইল; কিন্তু সুন্দরী মহিলা মধুর বচনে তাকে সান্ত্বনা দিলেন; তখন সে আবার

কথা বলার মতো সাহস ফিরে পেল। যুবক বলল, "সে কী! তাহলে আপনিই কি সারাটাদিন আমাকে নিয়ে খেলা করেছেন?"

সুন্দরী বললেন, "মিঃ অ্যালানসন, প্রথম প্রেম তো এত সহজে চলে যায় না। আমাকে দেখেই তুমি বুঝতে পারছ যে আজ আমি ভাগ্যবতী; কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার প্রতি আমার প্রথম প্রেম আজও অটুট ও অপরিবর্তিত আছে; তাই তোমার ভালবাসাকে পরীক্ষা করতে, আমাকে দেখলে তোমার মনে কি ভাব জাগে সেইটা বুঝতে তোমার সঙ্গে যদি একটু লুকোচুরি খেলে থাকি তো সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

যুবক বলল, "আজ সারাটাদিন আমি যে বারে বারে তোমার মুখই দেখেছি সেটাই আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু একবার যখন দুজনের দেখা হয়েছে তখন আর সহজে আমরা আলাদা হয়ে যাব না। তোমার সেবাতেই জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দেব, শুধু বল তুমি কোথায় থাক।"

"খুবই কাছে; এখান থেকে সামান্য দূরে; তোমার পক্ষে যদি সুবিধা হয় তো আজ রাতে সেখানে তোমাকে কাছে পেলে আমি খুব-খুব খুশি হব। কিন্তু বর্তমানে আমার স্বামী যে বাড়িতে নেই, অনেক দূর দেশে চলে গেছে।"

যুবক বলল, "তাতে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটায় কোন বাধা হবে বলে তো আমি মনে করি না।"

বাইরে অনিচ্ছা দেখালেও শেষ পর্যন্ত সুন্দরী যুবকটিকে তার বাড়িতে যাবার অনুমতি দিলেন; তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোককে রেখে যেতে চাইলেন; কিন্তু যুবকটি তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল সে একাই যেতে পারবে; অগত্যা তাকে নিজের প্রাসাদের পথটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে সুন্দরী তার রথে চেপে চলে গেলেন।

অ্যালানসন তখন পার্থিব সবকিছুর উপরে উঠে গেছে। বন্ধু ডেভিড ওয়েলচ্‌কে খুঁজে বের করে তার অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা জানাল, কিন্তু সেই সুন্দরী যে লেডি এলিজাবেথ ডগলাস নয় সে কথাটা তাকে বলল না। ওয়েলচ্‌ জোর করেই তার সঙ্গ নিল, এবং মহিলাটির মস্ত বড় প্রাসাদের রাস্তা পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গেই গেল। সেখানেই একা দাঁড়িয়ে থেকে সে দেখল, অ্যালানসন প্রাসাদের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আকাশের তারার মতই অসংখ্য আলোয় প্রাসাদটা ঝল্‌মল্‌ করছে।

অ্যালানসন বাবা-মাকে কথা দিয়ে গিয়েছিল, মেলা ভাঙ্গবার পরদিন সকালে প্রাতরাশে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু সেদিন তো সে এলই না। তৃতীয় দিনে

বুড়ো মানুষটা সাদা ঘোড়ায় চেপে সোকাটের পথে যাত্রা করল ছেলের খোঁজে। পথে কারিকেরান-এ মিঃ ওয়েলচ্-এর সঙ্গে দেখা করল। যুবকটি বাড়ি ফেরেনি শুনে সে তো খুবই অবাক হয়ে গেল।

তবু বুড়োকে বলল, তার ছেলে নিরাপদেই আছে, কাজেই জানাল যে তার ছেলে আর্ল অব মর্টনের সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছে, সেই সুন্দরীর ইচ্ছানুসারেই তার প্রাসাদে গেছে, ডেভিড ওয়েল্চ্ নিজে ফটক পর্যন্ত তার সঙ্গে গেছে, তাকে প্রাসাদে ঢুকতে দেখেছে; সে যখন এতদিন সেখানেই রয়ে গেছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে সেখানে তার আদর আপ্যায়ন বেশ ভালই হয়েছে।

বুড়োকে খুব ভেঙ্গে পড়তে দেখে মিঃ ওয়েল্চ্ অগত্যা তার সঙ্গেই চলল। সোকাটে পৌঁছে তারা দেখল তার ঘোড়াটা সরাইখানার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু লেডি এলিজাবেথ ডগলাসের বাড়ি যাবার পর থেকে ঘোড়ার মালিকের দেখা পাওয়া যায়নি। মিঃ ডেভিড ওয়েল্চ্কে সঙ্গে নিয়ে বুড়ো অচিন-ক্যাসলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল; কিন্তু সেখানে পৌঁছবার অনেক আগেই মিঃ ওয়েল্চ্ তাকে বলল যে তার ছেলেকে মোটেই পাওয়া যাবে না, কারণ মেলার দিন সন্ধ্যার পরে এ পথের ঠিক বিপরীত দিকের একটা পথে তারা গিয়েছিল। যাই হোক দুর্গপ্রাসাদে গিয়ে হাজির হল। আর্লের সঙ্গে দেখা করল। বুড়োর কথা শুনে মেয়ে এলিজাবেথকে ডেকে পাঠালেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের মেলায় দেখা হওয়া এবং গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তাকে এই বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনার বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত আর্ল বললেন যে তাকে নিশ্চয় প্রাসাদের কোথাও নিরাপদে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বাবার মুখে এইসব কথা শুনে এবং বুড়ো মানুষটির গম্ভীর বিপর্যস্ত দৃষ্টি দেখে মহিলাটি যে কি করবেন, কি বলবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু মিঃ ওয়েল্চ্ তাকে যে খুব ভাল করে দেখেছে, এবং হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যেও তাকে আবার চিনতে পারবে; তাছাড়া, সেদিন যে প্রাসাদের কাছে সে বুড়োর ছেলের সঙ্গে এসেছিল সেটাও এই প্রাসাদ নয়, সে প্রাসাদটা মোটেই এই ধরনের নয়। তারপর বলল, বরং তুমি আমার সঙ্গে চল, এ অঞ্চলে নবাগত হলেও তোমাকে আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারব।'

আবার তারা যাত্রা করল। মিঃ ওয়েল্চ্ যুবক অ্যালানসনের সঙ্গে সোকাট থেকে যেপথে গিয়েছিল সেই পথ ধরে কয়েক মাইল যাবার পরে তারা একটা চৌমাথায় পৌঁছে গেল। তখন ওয়েল্চ্ বলল, "আমরা ঠিক পথেই এসেছি। আর একটু এগিয়েই আমরা ঐ গাছটার কাছে পৌঁছে যাব; সেখান থেকে একটু দূরেই

আমি অ্যালানসনকে মস্ত বড় ফটকটা দিয়ে ঢুকতে দেখেছিলাম। তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা সেই প্রাসাদে পৌঁছে যাব।"

তারা গাছটার কাছে গেল; আরও এগোল; তারপরেই মিঃ ওয়েল্‌চের মুখে আর কোন কথা নেই ঃ সেখানে না আছে প্রাসাদ না আছে ফটক আছে শুধু পঞ্চাশ ফ্যাদম গভীর একটা প্রচণ্ড খাদ, আর তার নীচ দিয়ে ফেনিল তরঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে একটা স্রোত।

বুড়ো অ্যালানসন বলে উঠল, "এটা কি হল? এখানে তো না আছে প্রাসাদ, না আছে জনবসতির কোন চিহ্ন।"

ওয়েল্‌চের মুখে অনেকক্ষণ একটি কথাও ফুটল না, পাথরের মূর্তির মতো সে হাঁ করে এই পরিবর্তিত ভয়ংকর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একসময় বলল "যিনি মানুষের আত্মা সৃষ্টি করেছেন, যেসব আত্মা মাটিতে ও বাতাসে ঘুরে বেড়ায় তাদের সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তিনিই বলতে পারেন এটা কি? আমরা এক যাদুর রাজ্যে এসে পড়েছি, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কোন শক্তি আমাদের উপর ভর করেছে। ঠিক এইখান থেকে আমি তোমার ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, আর ওদিকে—ওই খাদের প্রান্তে অথবা তার ঠিক উপরেই ছিল সেই অপূর্ব প্রাসাদের মস্ত বড় ফটক। মানুষের বুদ্ধি বিবেচনায় এসব ব্যাপার কেমন করে ধরা পড়বে?"

তারা খাদের একেবারে সীমানার কাছে এগিয়ে গেল। মিঃ ওয়েল্‌চই আগে আগে গেল ঠিক যেখানে ফটকটা খুলে গিয়েছিল। সেখানে লাফিয়ে ওঠা ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ তারা দেখতে পেল; কিন্তু দেখে মনে হল যে ঘোড়াটা কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, কিন্তু নীচে—অনেক নীচে পড়ে আছে জন অ্যালানসনের তালগোল-পাকানো মৃতদেহ; আর এইভাবে এক অদৃষ্টপূর্ব রহস্যের ভিতর দিয়ে একটি দুষ্ট পাপাসক্ত যুবকের জীবনের অবসান ঘটল। এই রূপকথা থেকে কী সুন্দর একটি নীতিবাক্যই না বের করা যায়।

আপনারা হয়তো বলবেন এই গল্পের অনেক আঁকাবাঁকা পথের কোথাও মেরি বার্নেটের পরে কি হল তা বলা হয়নি; কারণ সোকাটে তাকে যখন সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল তখন সে তো একটা অশরীরী মূর্তি বা ছায়ামাত্র! প্রিয় পাঠক পাঠিকা সেই কুমারীর কি হল তার একটি বিবরণ আমি আপনাদের দিতে পারি। এই প্রাচীন রূপকথায় যাই বলা হোক না কেন আমার তো মনে হয় মেয়েটির ভাগ্য আরও দশগুণ বেশী রহস্যের জালে আবৃত।

যেদিনটিতে মেরি হারিয়ে গিয়েছিল প্রতিবছর সেই দিনটিকে মেরির সান্ত্বনা

বিহীন বৃদ্ধ বাবা মা শোক উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তের দিন হিসাবে পালন করে। সাত-সাতটা বছর এল ও চলে গেল; উপবাস ও প্রার্থনার সপ্তম বার্ষিকী দিবস সমাগত। আগের দিন সন্ধ্যায় বুড়ো অ্যান্ড্রু আদরের মেরির স্মৃতিচিহ্নের খোঁজে যথারীতি হ্রদের বালির উপর দিয়ে হাঁটছিল। এমন সময় সে দেখল উস্কোখুস্কো চেহারার একটি ছোটখাট বুড়োমানুষ তার দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে। লোকটির উচ্চতা পাঁচের বেশী নয়; মুখটা মোটেই মানুষের মতো দেখতে নয়; তবু তার আচরণ ভদ্র, কথাবার্তা শোভন। অ্যান্ড্রু শুভসন্ধ্যা জানিয়ে শুধাল, সে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অ্যান্ড্রু জবাব দিল, যা কোনদিন পাওয়া যাবে না তাই সে খুঁজছে।

নবাগত বলল, "প্রবীণ মেষপালক, দয়া করে আপনার নামটা বলুন; মনে হচ্ছে আপনার দরকারী কিছু কথা আমার জানা উচিত; হয়তো আপনাকে একটা খবর আমি দিতে পারব।

অ্যান্ড্রু বলল, "হায়রে! আমার নাম জেনে আপনার কি হবে? আমার নামে এখন কারও কোন দরকার নেই।"

নবাগত শুধাল, "আপনার কি কোন সুন্দরী কন্যা ছিল যার নাম মেরি?"

"এ বড় হৃদয়-বিদারক প্রশ্ন।" অ্যান্ড্রু বলল; "তবে হ্যাঁ এক সময় মেরি নামে আমার একটি আদরিণী কন্যা ছিল।"

"তারপর তার কি হল?" নবাগত শুধাল।

অ্যান্ড্রু মাথাটা নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল; এ বিষয়ের কোন আলোচনা সে সইতে পারে না। হ্রদের বালুকাময় তীর ধরে সে চলতে লাগল। তার ন্যুব্জ দেহ, তার চলন, চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব—সব কিছুতেই ফুটে উঠেছে গভীর হতাশা। বেঁটে লোকটি তবু তার পিছনেই চলতে লাগল। একসময় বলল ঃ "দেখুন, দেখে মনে হচ্ছে কোন সত্যিকারের অথবা কল্পিত দুঃখে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আপনি যা করছেন সেটা যুক্তিসম্মতও নয়, ধর্মসম্মতও নয়। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে যা ঘটেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কী অধিকার মানুষের আছে?"

উপদেশদাতার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে অ্যান্ড্রু বলল, "নিজেকে সমর্থন আমি করছি না; কিন্তু এমন কিছু ভাবও আছে যাকে মনের মধ্যে লালন করলে বাবা-মার কোন পাপ হয় না।"

নবাগত বলল, "আমি কিন্তু তা স্বীকার করি না। সর্বময় অধিকর্তার নির্দেশকে শান্ত হৃদয়ে গ্রহণ না করাটাই অধর্ম। কিন্তু এসব তর্ক থাক। আবার আপনাকে প্রশ্ন করছি; আপনার মেয়ের কি হল?"

অ্যান্ড্রু গম্ভীর মুখে জবাব দিল, "যিনি তার আত্মার পিতা তার দেহের সৃষ্টিকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করুন; জিজ্ঞাসা করুন তাঁকে যাঁর হাতে শিশুকাল থেকেই তাকে সঁপে দিয়েছিলাম। আমার সেই মেয়ের কি হয়েছে তা জানেন শুধু তিনি, আমি জানি না।"

"কতদিন আগে হারিয়েছেন?"

"কাল সাত বছর পূর্ণ হবে।"

"আচ্ছা; আপনার দেখছি সময়টা খুব ভালই মনে আছে। এত বছর ধরে তার জন্য শোক করছেন?"

হ্যাঁ আর আমার সব স্নেহের আধার সেই একমাত্র কন্যার জন্য শোক করতে করতেই কবরে চলে যাব। হে অপার্থিব পরামর্শদাতা আমার আদরের মেয়ের কোন খবর কি আপনি রাখেন? যদি রাখেন তাহলে আপনি নিশ্চয় জানেন যে সে অন্য মেয়েদের মতো ছিল না;`যে সরলতা ও পবিত্রতা আমার মেয়ে মেরিকে ঘিরে ছিল তা মানুষের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়।

"আপনি কি আবার তাকে দেখতে চান?" বামন জিজ্ঞাসা করল।

অ্যান্ড্রু ঘুরে দাঁড়াল তার সারা শরীর কাঁপছে; বেঁটে বামনটির দিকে তাকিয়ে সে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, "আবার তাকে দেখতে পাব? আপনি বলছেন তাকে দেখতে চাই কি না!"

বামন বলল, "হ্যাঁ তাই তো বলছি; আরও বলছি, এই স্মারকটি চেনেন কি? ভাল করে দেখুন, চিনতে পারেন কি না!"

অ্যান্ড্রু স্মারকটি হাতে নিল; একবার সেটার দিকে, তারপর নবাগতের দিকে, আবার স্মারকটির দিকে তাকাল; দুই চোখ জলে ভরে গেল; সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। সে কান্না সুখের কান্না। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাসি। স্মারকটিকে চুমো খেতে খেতে সে ভগ্ন কণ্ঠে বলতে লাগল ঃ "হ্যাঁগো বুড়ো, আমি এটিকে চিনি!—আমি চিনি!—আমি চিনি! এতো সেই এডোয়ার্ড-মার্কা মোহর, এতে তিনটে ছিদ্র আছে; অষ্টাদশ জন্মদিনে মেরিকে এটা উপহার দিয়ে বলেছিলাম, সে যেন একপ্রস্থ পোশাক কিনে নেয়। কিন্তু স্মারকটি হাতে পেয়ে সে বলেছিল, 'আহা, এটা এত সুন্দর?' 'তার কথা স্মরণ করে আমি এটা রেখেই দেব, খরচ করব না। আহা, সোনা আমার!' কিন্তু আগে আপনি বলুন, সে কেমন আছে? কোথায় আছে? সে কি বেঁচে আছে, না মারা গেছে?"

বামন জবাব দিল, "সে বেঁচে আছে, সুস্থ দেহে আছে; বরং আগের চাইতে ভাল আছে, আরও সাহসী হয়েছে, আরও সুখে আছে, আরও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু

আপনি যদি তাড়াতাড়ি তৈরী হতে পারেন, তাহলে কাল বিকালে সোকাটে তাকে সপরিবারে দেখতে পাবেন। দূর দেশে ভ্রমণের পথে তারা সেখান দিয়ে যাবেন; কিন্তু যাত্রাটা খুব জরুরী; তাই আমাকে এই স্মারকটি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন যাতে সব কথা জেনে মরবার আগে আদরিণী কন্যাকে আর একবার দেখবার ও আলিঙ্গন করবার সুযোগ আপনি পান।"

"সোকাটে আমার মেরির সঙ্গে দেখা হবে? তাহলে আসুন ছোট মানুষটি, আসুন স্বর্গের দূত, এই বুড়ো মেষপালকের ঘরের সেরা আনন্দের পেয়ালায় একটু চুমুক দেবেন আসুন।"

লোকটি বলল, "আপনার বাড়িতে যাবার অথবা সেখানে পেয়ালায় চুমুক দেবার মতো সময় আমার নেই, আপনার সংসার আরও বাড়-বাড়ন্ত হোক, আপনাদের অন্তর সুখে ভরে উঠুক; কিন্তু আমার পথ তো এদেশে আপনার দেওয়া মাংসের স্বাদ গ্রহণ বা পেয়ালায় চুমুক দেবার দিকে নয়, আমাকে দ্রুত ফিরে যেতে হবে। তার কাছে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনি যান, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে আসুন, কারণ নষ্ট করার মতো সময় আপনার হাতে নেই।"

অ্যান্ড্রু শুধাল, "ঠিক কখন সে ওখানে হাজির হবে?"

বামন চেঁচিয়ে জবাব দিল "পবিত্র ক্রুশের ছায়া যখন পূর্ব দিকে হেলবে ঠিক তখন।" বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে পা চালিয়ে দিল।

বুড়ি জিন লিন্টন স্বামীকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে ফটকের বাইরে এসে উদ্বেগের সঙ্গে শুধাল, "কি হয়েছে অ্যান্ড্রু বার্নেট?"

"আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও বৌ; কি জান, আমার খুব তাড়া আছে।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি গো ভালমানুষ; কিন্তু একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, আমাকে বল কিসের এত তাড়া।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়নি—আমাকে এক্ষুণি সোকাট পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে।"

"হা ঈশ্বর! বুড়োর কথা শোন! সোকাটে আবার তোমার কি কাজ পড়ল? তোমার কি মনে নেই যে রাত পোহালেই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে?"

"আরে বুড়ি, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও। ওসব অনুষ্ঠানের কথা এখন থাক। অনুষ্ঠান হবে সোকাটে, সকালবেলা। আরে বৌ, তুমিও তো সোকাটে যাবে। কি ভাবছ বৌ? হু-হু! আমার কেরামতি যে কতখানি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

"অ্যান্ড্রু—অ্যান্ড্রু বার্নেট!"

"হাঁ করে দেখছ কি গো? তাড়াতাড়ি কর, আমার গরমের পোশাকটা বের করে দাও। আরে জিন লিন্টন, শুনতে পাচ্ছ, তুমিও বিয়ের গাউন আর রেশমী ওড়নাটা পরে নাও; কারণ সকালে তোমাকেও যে সোকাটে পৌঁছতে হবে। অবাক হচ্ছ তো? হু-হু তা তো হবেই। এখনও তো তোমাকে বলিনি যে আমাদের মেরি আমাদের সঙ্গে দেখা করবে কাল সকালে—সোকাটে।"

"আঃ অ্যান্ড্রু! দুঃখী মায়ের মন নিয়ে তামাশা করো না।"

"ঈশ্বরের দোহাই বৌ, তোমার মন নিয়ে আমি যেন কোনদিন তামাশা না করি!" অ্যান্ড্রু কেঁদে ফেলল। "আমি যা বলছি সব সত্যি। কাল সকালে সোকাটে আমাদের আদরের মেয়ে দুই হাতে দুই ছেলেকে ধরে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে; মরবার আগে অন্তত একটিবার তাকে আমরা বুকে জড়িয়ে ধরতে পারব, চুমো খেতে পারব, আশীর্বাদ করতে পারব।"

এবার বুড়ির চোখে জলের ধারা নামল; তার দুঃখদীর্ণ গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল। তারপর স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে প্রাণ খুলে পরমপিতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে জ্ঞানহারার মতো সোকাটের পথে ছুটে গেল। অ্যান্ড্রু তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল; দুজনেই যাত্রার জন্য তৈরী হতে লাগল।

কার্কস্টাইল থেকে সোকাট বিশ মাইলের পথ; তাই তারা ১৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলেই রওনা হল; পথে টার্নবেরি শিল-এ রাতের মতো বিশ্রাম নিল; সোকাটে পৌঁছল পরদিন দুপুরে। বুড়োবুড়ির বাকি দিনটা যেন আর কাটতে চায়না। দুজনে কেবলই ভাবতে লাগল, কোন পথে তাদের মেয়েটি আসবে? কেমন লোকজন সঙ্গে নিয়ে আসবে?

তারা দক্ষিণের পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে গেল; যদি সেই পথে মেরি আসে সেই আশায়; আবার ফিরে এল পবিত্র ক্রুশের ছায়াটা দেখতে; সেটা যখন পূর্বদিকে হেলে পড়ল তখন যেন তাদের আর কিছুই করার রইল না। পথের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা চারদিকই দেখতে লাগল। অবশেষে ড্রামফিস্ রোডের উপর প্রায় আধমাইল দূরে দেখা গেল দুটি শিশুকে নিয়ে একটি ভিখারিণী এগিয়ে আসছে; তাদের থেকে বেশ কিছুটা পিছনে আসছে একটি ভিখারী। বুড়ো-বুড়ি এক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল; অ্যান্ড্রুর মনে হল, পিছনের লোকটি সেই বামন ছাড়া আর কেউ নয়; এই মুহূর্তে তাদের কাছে এই ক'টি ভিখারী ছাড়া আর সবকিছুই অর্থহীন। ঠিক সেই মুহূর্তে সোনালী কারুকার্য-করা একখানি রথ পূর্ব দিক থেকে গ্রামে প্রবেশ করল; সবুজ-সোনালী উর্দি-পরা দুটি লোক রথের

সামনে, আর দুজন পিছনে। রথটা পূর্ণ গতিতে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। "ওহ্-হো পার্থিব ঐশ্বর্যের কী অহংকার।" অ্যান্ড্রু চেঁচিয়ে উঠল; রথটা গর্জন করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল; কিন্তু তার বা তার স্ত্রীর দৃষ্টি তখন আর রথের দিকে নেই; তাদের সব মনোযোগ তখন ভিখারী দলের উপর নিবদ্ধ। অ্যান্ড্রু বলে উঠল, "আরে, ঐ তো আমাদের মেয়ে, ঠিক সে; যত গরীবই হোক, তার চলার ভঙ্গী আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। হোক তারা দীন-দরিদ্র তবু যতদিন আমার ঘর-বাড়ি আছে ততদিন ওরা দুজন আর ওদের সন্তানরা আমাদের অগ্নিকুণ্ডের পাশেই আশ্রয় পাবে।"

বুড়োবুড়ির চোখ জলে ভরে উঠল; স্নেহ ও করুণায় গলে গেল তাদের অন্তর; আর তখনই অ্যান্ড্রুর মনে হল কে যেন তার দুই হাঁটুকে জড়িয়ে ধরেছে। চোখ নামিয়ে দেখল, রূপে ও ঐশ্বর্যে সদ্যফোটা ফুলের মতো মেরি তাদের পায়ের নীচে নতজানু হয়ে আছে। আনন্দে চীৎকার করে অ্যান্ড্রু মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল। জিন লিন্টন কিন্তু দুই হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল; এত বড় ঐশ্বর্যময়ীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরার সাহস তার হল না; তখন মেয়েই এগিয়ে এসে মাকে আলিঙ্গন করল, আর তখনই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

এ এক আশ্চর্য ঘটনা—তুলনাবিহীন এক পুনর্মিলন। সত্যি সত্যি আদরের মেরিকে তারা ফিরে পেয়েছে, তাকে আলিঙ্গনে বেঁধেছে, তাকে চিনতে পেরেছে, খুশি হয়েছে। কি বললাম—খুশি? এত সুখ বুঝি মানুষের কপালে জোটে না। এইমাত্র মেরি রথ থেকে নেমে এসেছে; বুড়ো বাবা-মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে এসে তাদের পায়ে পড়েছে। এবার তারা সরাইখানায় ফিরে গেল; বাবা-মার সঙ্গে দুই ছেলের পরিচয় করিয়ে দিল। নানারকম আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যাটা কেটে গেল। বুড়োবুড়িকে মেরি অনেক দামী দামী উপহার দিল, মধ্যরাত পর্যন্ত তাদের চোখে-চোখে রাখল, তারপর তারা সুখের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। মেরি তখন পুনরায় রথে চেপে চলে গেল।

তাকে যদি আর কখনও স্কটল্যান্ডে দেখা গিয়ে থাকেও আমি কিন্তু সে কথা কখনও শুনিনি। কিন্তু তার বাবা-মা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই আনন্দ নিয়েই বেঁচে রইল যে তাদের মেয়ে বড় সুখে আছে।

নরকের অতিথি

রে ব্রাডবেরী

এক

মার্চ মাসের সেই দিনটা।

বেশ ভালোভাবেই এবং আশাপ্রদভাবেই শুরু হয়েছিল। পরিষ্কার দিন, চারিদিক বেশ রোদ ঝলমল ছিল। কেউ ভাবতেই পারেনি যে দিনের শুরুটা এইভাবে হয়ে হঠাৎ অন্যরকম রূপ নেবে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো দিনের শেষ আকাশ ঢেকে গেল অন্ধকার মেঘে। আচম্বিতে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তার সঙ্গে শুরু হল কুয়াশার জাল বোনা। মার্চ মাসে এমন কুয়াশাচ্ছন্ন দিন কেউ দেখেনি। ঘন কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে শেষ দিনের আকাশ যেন এক মায়াময় দিন সৃষ্টি করল। যেমন বৃষ্টির দাপট, তেমনই ঘন কুয়াশার আস্তরণ। কার দাপট যে বেশী তা বলা মুশকিল। শীতের কুয়াশা আর বর্ষার বৃষ্টি। দুই-য়ে মিলেমিশে যেন এক মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হল।

এইরকম দিনের যখন অবস্থা তখন সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যাবেলা একখানা বাস ছুটে চলেছে লন্ডন শহরের রাস্তার মাঝখান দিয়ে। বাসটাতে লোকের ঠাসাঠাসি ভিড়। যাত্রীবোঝাই বাসটাতে কিছু লোক আবার দরজার সামনে ভিজতে ভিজতে ঝুলে ঝুলে চলেছে। কারণ সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় যদি তারা বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে বাস ছেড়ে দেয় তাহলে হয়তো পরের বাস নাও মিলতে পারে। কেননা আকাশ ও রাস্তার পরিস্থিতি মোটেও সুবিধাজনক নয়। বাসের ভেতর বসে থাকা যাত্রীদের উদ্দেশ্য করে কন্ডাকটারটি বলছিল কি রকম কুয়াশাভরা সন্ধ্যা! এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে পথে বের হওয়া খুবই কষ্টকর। আর যারা বৃষ্টিতে দরজার সামনে ভিজতে ভিজতে চলেছে তাদের উদ্দেশ্যেও বলেছিল ইস্ কি রকম বৃষ্টিই না শুরু হয়েছে। বাসযাত্রী, সে ভেতরে বসা-ই হোক কিংবা ঝুলন্তই হোক— তাদের প্রতি যেন তার কত সহানুভূতি। কন্ডাকটারটির এই সহানুভূতি মন্তব্যে কিন্তু কোন যাত্রীরই তেমন অসন্তোষ দেখা গেল না। এইরকম প্রতিকূল আবহাওয়াটাকে ঘিরে সকলে বেশ উপভোগই করছিল। হাল্কাভাবেই নিয়েছিল সকলে। কারণ লন্ডন শহরে এইরকম আবহাওয়া নতুন কোন চমক নয়। সকলেই

এইরকম আবহাওয়া ও পরিস্থিতির সঙ্গে বেশ পরিচিত। তাই কোনরকম বিরক্তিই তাদের মুখে ফুটে উঠল না।

কন্ডাকটারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাসের ভেতর ও বাইরের যাত্রীরাও বেশ বর্ষণমুখর সন্ধ্যার বৃষ্টি উপভোগ করছে এবং টুকটাক সরস মন্তব্যও চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে টুকটাক কথাবার্তার মধ্যেই বাসযাত্রীদের যার যেখানে নেমে যাওয়ার কথা সে সেখানেই নেমে যাচ্ছে।

সেদিনের মতো সেটাই ছিল শেষ বাস। তাই রাস্তা প্রায় জনমানবহীন বলা চলে। আর হবে নাই বা কেন! একে শেষ বাস তার উপর আবার এইরকম বর্ষা। যে যার গন্তব্যস্থলে নামতে নামতে একসময় বাসটা প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে গেল। হালকাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু যাত্রী বসে আছে বাসটার ভিতরে। কন্ডাকটারের মনে হল যে এইরকম বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় শেষ বাসের একজন যাত্রী প্রায় ভিজতে ভিজতে দরজায় দাঁড়িয়ে চলেছে। অথচ বাসের ভেতরে বেশ কিছু খালি-ফাঁকা জায়গা আছে। কন্ডাকটারের মনে হতে লাগল যে ভেতরে জায়গা থাকতেও লোকটি কেন বাসের ভেতরে ঢুকছে না। কন্ডাকটারের একটা কথাই মনে হতে লাগল যে লোকটি হয় খুব কুঁড়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সরে যাবার ইচ্ছা বা আগ্রহ তার নেই। নতুবা খুব কষ্টসহিষ্ণু। ঐভাবে যেতে সে অভ্যস্ত। সে ঠায় একভাবে বাসের দোতলায় ওঠার সিঁড়িটাতে দাঁড়িয়ে আছে। কন্ডাকটারের মনে হল যে সেই লোকটি এতটাই কুঁড়ে যে ভেতরে ঢুকে গেলে আবার তাকে নামার জন্য উঠে বেরিয়ে আসতে হবে তাই সে যাচ্ছে না। কন্ডাকটারটি বেশ একটু অবাকই হল ঐ লোকটিকে ঠায় একভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

যাই হোক এইভাবে চিন্তা ভাবনার মধ্যে বাস নদীর পাড়ের বাঁধানো রাস্তায় এসে পড়ল। সিঁড়ির উপর দাঁড়ানো লোকটি এবার মনে হল নড়েচড়ে উঠল। বোধহয় তার গন্তব্যস্থল এসে গেছে। সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। তার পায়ের শব্দ কন্ডাকটার ছেলেটির কানে পৌঁছল। কন্ডাকটার সচকিত হয়ে তাকে নামতে সাহায্য করল। একবার তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে বাসের উপরে আর কোন যাত্রী আছে কিনা। কারণ বাসে যত যাত্রী বোঝাই ছিল ধীরে ধীরে তা হাল্কা হয়ে গেছে; অর্থাৎ অনেক যাত্রীই তখন বাস থেকে নেমে গেছে। তবুও যদি কেউ থেকে থাকে তাই জিজ্ঞাসা করে নিল।

আগন্তুক লোকটি কাউকে উপরে দেখতে পায়নি সেকথাই জানালো। কন্ডাকটার লোকটির কথায় বিশ্বাস করলো না। কারণ বাসে কেউ আছে কিনা

সেটা দেখা তারই কাজ। তাই লোকটির কথা অবিশ্বাস না করেও সে বাসের দোতলায় উঠবার জন্য উদ্যত হল।

কন্ডাকটার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। বাসের প্রতিটা সিট খালি। কিন্তু সামনের দিকের একটা সিটে বসে আছে একজন যাত্রী।

যাত্রীটি কোত্থেকে উঠল, কখন উঠল আর কিভাবেই বা উঠল তা টের পেল না কন্ডাকটার ছেলেটি।

যাত্রীটির মাথায় একটা টুপি দেওয়া আছে। টুপিটা মাথার সামনের দিকে নীচু করা। পরনে একটা কোট। সেই কোটের কলার উঁচু করে ওপর দিকে ওঠানো আছে। গলায় একটা মাফলার। কলারটা দিয়ে মুখের নীচের দিকের অনেকটা অংশই ঢাকা আছে। বেশভূষা দেখে মনে হয় যেন এই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় আর ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে শীতের কনকনে আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই ঐভাবে কোট, টুপি-মাফলার দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে।

যাত্রীটির কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সোজা হয়ে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। কন্ডাকটারের দিকেও তার কোন মনোযোগ নেই। তার হাবভাব দেখে মনে হয় সে যেন কন্ডাকটারটিকে উপেক্ষা করছে। সেইরকম মনোভাব নিয়ে সে যাত্রী আসনে বসে আছে।

পিছন থেকে আসা কন্ডাকটারের পায়ের শব্দে সে সচকিত হয়ে উঠল। কন্ডাকটারের উপস্থিতি বুঝেই সে নিজের হাতের মুঠোয় ধরা একটা কয়েন নিয়ে বসে ছিল। ভাড়ার টিকিট কাটার জন্য। কন্ডাকটার-এর পায়ের শব্দে সে তৎপর হয়ে উঠল।

যাত্রীটির সঙ্গে আলাপ করার জন্য কন্ডাকটার একটু এগিয়ে গিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল দিনটা কি কনকনে ঠান্ডা, রাতটা খুব ঠান্ডা, শীতল রাত।

কন্ডাকটারের কথায় যাত্রীটি কোন উত্তর দিল না। সেই একইরকমভাবে বসে রইল, আর হাতের পেনিটা হাতেই ধরা রইল। মুখে কোন কথাই বলল না। তার মধ্যে কোনরকম কথা বলার উৎসাহই দেখা গেল না। যাত্রীটির দিক থেকে এইরকম নীরব-শীতল হাবভাব দেখে কন্ডাকটারটি ভীষণরকম বিরক্ত হল। সে আবারও বলতে লাগল ওঃ কি ভীষণ ঠান্ডার রাত। এর পরও যাত্রীটি কোন উত্তর করল না। কন্ডাকটারটি এরপর বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল যে যাত্রীটি কোথায় যেতে চায়? এবার যাত্রীটি উত্তর দিল যে সে ক্যারিক স্ট্রিট যাবে। কন্ডাকটার যাত্রীর কথা স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করল যে সে কোথায় যাবে? আর তাছাড়া যাত্রীটিকে একটু অপমানিত করার জন্য সে দুবার

জিজ্ঞাসা করল। যাত্রীটির সঙ্গে আলাপ করার জন্য কন্ডাকটার উৎসাহী হয়েছিল। কিন্তু যাত্রীটি কোনরকম সভ্যতা-ভব্যতা দেখায়নি; সেটার শোধ নেবার জন্যই কন্ডাকটার দুবার করে জিজ্ঞাসা করল। যাত্রীটি আবার উচ্চারণ করল 'ক্যারিক স্ট্রিট'।

যাত্রীটিকে একটু খোঁচা দেবার জন্য কন্ডাকটার বলল যে সে ঐ রকম অদ্ভুত সুরে উচ্চারণ করছে কেন? যাত্রীটির উচ্চারণ এমনই অস্পষ্ট যে তার কথার উত্তর স্পষ্ট নয়। তাই সে বুঝতে পারে নি আর সে কারণেই সে বারে বারে তাকে প্রশ্ন করেছে।

যাত্রীটি কোথায় নামবে, এবার সে আবার রিপিট করে বলল, আর তার কথায় বিরক্ত হয়েই কন্ডাকটার বলেছে যে সে এমন অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করছে কেন? দু-পক্ষের এইরকম বাদানুবাদ চলার পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ হয়ে গেল।

কিছু সময় দুজনেই নীরব। শুধুমাত্র এক মুহূর্ত। তারপর যাত্রীটি কি ভেবে নিয়ে আবার বলল যে সে 'ক্যারিক স্ট্রিটে' যাবে। দুজনে দুজনকে কথা বলাবলি করতে লাগল। যাত্রীটি ভাবল কন্ডাকটার বোধহয় শুনতে পাচ্ছে না। তার হয়তো কোথাও বুঝতে ভুল হচ্ছে। আবার অপর পক্ষে কন্ডাকটার ভাবছে যে সে তাকে যেমন উপেক্ষা করেছে; এবার সেও যাত্রীটিকে না শোনার ভান দেখিয়ে প্রশ্ন করে তিতিবিরক্ত করে তুলবে। তাকে অবজ্ঞা করার মজাটা সে এবার পাইয়ে ছাড়বে। যখন যাত্রীটি বলল যে সে যাবে ক্যারিক স্ট্রিট তখন কন্ডাকটার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল যে হ্যাঁ, হ্যাঁ সে জানে তার গন্তব্যস্থল। ব্যাজার মুখে কথাগুলো বলেই সে যাত্রীর হাত থেকে পেনিটা নিজের হাতে নিয়ে নিল। একরকম প্রায় ছিনিয়েই নিল। হাতে নিয়ে দেখল পেনিটা সত্যিই খুব ঠান্ডা।

কন্ডাকটার পেনিটা নিয়ে বলল যে সেটা এতটাই ঠান্ডা যে মনে হচ্ছে যেন বরফের স্তূপ খুঁড়ে সেটা বের করে আনা হয়েছে। কারণ এমনি বৃষ্টি ঠান্ডা অথবা শীতের ঠান্ডায় কোন ধাতব জিনিস এতটা ঠান্ডা হতে পারে না।

কন্ডাকটারের এই কথায় যাত্রীটি বলে উঠল সে কি জানে আর কতটাই বা জানে? কথাগুলো বলে সে কন্ডাকটারের দিকে সন্দেহসূচক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। তার উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকল।

কন্ডাকটার তাকে টিকিট দেবার জন্য টিকিটের দিকে মনোযোগ দিল এবং যাত্রীটিকেও ঐ দিকে মনোযোগ দেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। যাত্রীটির ঐ রকম প্রশ্নের জন্য কন্ডাকটার কিছুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে পাল্টা কথা ছুঁড়ে দিল তার

দিকে। কন্ডাকটারটির মনে হল যাত্রীটি যেন খুব চালাক চতুর। কন্ডাকটারের সব কথা এবং কার্যকলাপ সে সুনিপুণভাবে লক্ষ্য করছে। তারপর সে যাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করল যে তার টিকিটখানা সে কোথায় দেবে? কারণ পেনিটি কন্ডাকটার-এর হাতে দেওয়ামাত্র সে টিকিট-এর জন্য উৎগ্রীব হল না। তাই কন্ডাকটার বললো তার টিকিটখানা তিনি কোথায় দেবেন; জামার বাটন হোলের মধ্যে কিনা। তার এই কথায় আগন্তুক যাত্রীটি যেন একটু থতমত খেয়ে বলল এখানেই রাখুন। তার কথাটা কন্ডাকটার বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা করল টিকিটটা কোথায় রাখবে। তখন যাত্রীটি দেখিয়ে দিল তার হাতের দুটো আঙুলের মাঝের জায়গাটা। অর্থাৎ সেখান থেকেই পেনিটা কন্ডাকটার নিয়েছিল। তাই টিকিটটাও সেখানেই গুঁজে দিতে বলল। যাত্রীর এইরকম কথায় কন্ডাকটার খুবই বিরক্ত বোধ করল। ব্যঙ্গ করে সে বলে উঠল যে তাকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে সে একখানা চিঠি রাখার সুন্দর র‍্যাক।

যাত্রীর কথামতো কাজ করতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। তার মনে হল যেন লোকটার হাতটা পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তাই সে হাতটা এগিয়ে আনতে পারছে না। কন্ডাকটারের একদম ইচ্ছা ছিল না তবুও তাকে টিকিটখানা দিতে হবে। আর দিতে হবে তার হাতেই। ঐ হাতে হাত লাগাতে তার মোটেও ইচ্ছা হল না।

শেষ পর্যন্ত যাত্রীটির দুই আঙুলের ফাঁকে টিকিটটা গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল ঠিক আছে কিনা। সেই কথাটায় ঠাট্টার সুর মিলিয়ে বলে বসল, কাইজার উইলিয়ম ঠিক আছে তো?

এইরকম রসিকতা যাত্রীটির পছন্দ হল না। সে চুপ করেই রইল। তারপর একবার কেবলমাত্র বলে উঠল বিরক্তির সুরে যে সে যেন তার সঙ্গে আর কোন কথা না বলে। কারণ তার ঐ রকম ঠাট্টার সুরে কথা বলা একদম পছন্দ হচ্ছে না। তাই সে আর কথা বাড়াতে চায় না। তার একদম ভালো লাগছে না কন্ডাকটারের সাহচর্য। কথায় কথা বাড়ে। তাই কথা না বাড়িয়ে চুপ করে যাওয়াই শ্রেয় মনে করল যাত্রীটি।

কিন্তু কন্ডাকটার ছাড়বার পাত্র নয়। তাই সে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল আপনার সঙ্গে কথা বলব আমি! তীব্র ঠাট্টার সুরে সে বলে উঠল তার সঙ্গে কথা বলা আর একটা মৌন পুতুলের সঙ্গে কথা বলা একই ব্যাপার। তবু পুতুলের সঙ্গে কথা বলা সহজ কিন্তু তার সাথে কথা বলা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

পরবর্তী স্টপেজ এগিয়ে আসছে। তাই কন্ডাকটার বাসের গেটের দিকে

এগিয়ে যেতে লাগল আর বিড়বিড় করতে থাকল। সিঁড়ি বেয়ে সে নীচে নেমে গেল।

বাসটা চলতে চলতে এক সময় ক্যারিক স্ট্রিটের মোড়ে এসে থামল। নিয়মমাফিক কন্ডাকটার চীৎকার করতে লাগল। আগন্তুক যাত্রীটির ক্যারিক স্ট্রিট-এ নামার কথা। সে নেমেছে কিনা কন্ডাকটার সেটা দেখেনি। কন্ডাকটার জানে যার যেখানে নামার দরকার সে সেখানে নেমে যাবে। কিছু যাত্রী বাসে ওঠানামা করল। কন্ডাকটার জানে যে বাসের যাত্রীটির ক্যারিক স্ট্রিট-এ নামার কথা। আমিও চীৎকার করে সেটা জানিয়ে দিয়েছি যে ক্যারিক স্ট্রিট এসে গেছে। এখন যাত্রীটি নেমে না গিয়ে যদি দোতলায় থাকে তবে সেটা তার দায়। কন্ডাকটারের মোটেই দায় নেই বাসে উঠে তাকে নামবার জন্য অনুরোধ করার। টিকিট দেবার সময় তার মনে হয়েছিল যে সে বোধহয় পঙ্গু, কারণ তার হাতটা টিকিট নেবার জন্য এগিয়ে এল না। তাই সে পঙ্গু হোক বা নাই হোক তার কোন ইচ্ছাই নেই তাকে হাত ধরে বাস থেকে নামিয়ে আনার। পরমুহূর্তেই তার মনে হল যে হয়ত বা তার চোখ এড়িয়ে সে নেমে গিয়েছে। যখন যাত্রীরা বাসে ওঠানামা করছিল তখনই সে নেমে গেছে কিনা সে দেখেনি।

অতঃপর একসময় বাস ছেড়ে দিল।

দুই

ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা, প্রায় পাঁচ-ছ ঘন্টা আগে হবে, কিংবা একটু বেশি বা কম সময়ে একটা ট্যাক্সি এসে থামল সেই ক্যারিক স্ট্রিটে। একটা ছোট হোটেলের দরজায়। হোটেলটা যেখানে অবস্থিত সেখানটার রাস্তা-ঘাট পরিবেশ সবই খুব নির্জন। সেখানকার অঞ্চলে লোকসংখ্যাও খুব কম। তাই সন্ধ্যার পর ঐ অঞ্চলটা একেবারে জনমানবশূন্য বললেই চলে। রাস্তাটা অনেক গলি গলি দিয়ে গেছে। হঠাৎ করে মনে হয় সেটা একটা কানাগলি। কিন্তু সেটা কানাগলি নয়। রাস্তাটা অনেক দূর চলে গেছে। তারপর সেটা গিয়ে মিশেছে একটা সরু গলির মুখে। সরু গলিটা এঁকে বেঁকে সাপের মতো গিয়ে মিশেছে সোহো অঞ্চলের দিকে।

ট্যাক্সির মধ্যে একজন আরোহী ছাড়া কেউ নেই। ট্যাক্সি থামল এসে হোটেলের দরজায়। আরোহী ট্যাক্সির দরজা খুলে পথে নেমে দাঁড়াল এবং একটা একটা করে তার মালপত্তর নামাতে লাগল। তারপর বারকয়েক এইভাবে

কয়েকটি প্যাকেট নিয়ে আরোহীটি হোটেলে ঢুকল এবং ট্যাক্সিতে ফিরে আসতে লাগল। এইভাবে যাওয়া আসা করতে করতে একসময় ট্যাক্সি খালি হল।

আরোহীটি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে গাড়ী থেকে মোট কটা প্যাকেট নামানো হল। তিনি জানতে চাইলেন যে ট্যাক্সি ড্রাইভার জিনিসপত্রের সঠিক দিকে সঠিক নজর রেখেছেন কিনা। তাই ঐ প্রশ্ন করলেন। ট্যাক্সি ড্রাইভার উত্তর দিলেন মোট নটা প্যাকেট নেমেছে।

আরোহীটি বললেন যে ট্যাক্সি ড্রাইভার ঠিকই বলেছেন, নটা প্যাকেটই ছিল। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন যে ট্যাক্সি ড্রাইভার ঐ রকম নটা প্যাকেটের মধ্যে তার সমস্ত জিনিসপত্র ভরে ফেলতে পারেন কিনা। অথবা তার আরো কম বা বেশি প্যাকেট লাগত কিনা।

ট্যাক্সিড্রাইভার উত্তর দিল যে না, তার নটা প্যাকেট লাগবে না। আরো অনেক কম প্যাকেট লাগবে। দুটো প্যাকেট হলেই চলে যেতে পারে। তাতেই তার সব জিনিসপত্র ভরে ফেলা যেতে পারে।

আরোহীটি ট্যাক্সিড্রাইভারকে বলল তার গাড়ীর ভিতরটা একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিতে। কারণ ট্যাক্সির মধ্যে যদি তার কোন জিনিসপত্র পড়ে থাকে। আরোহীর এই কথায় ড্রাইভার তাঁকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহী হল। এগিয়ে এলো নিজের সিট ছেড়ে।

ড্রাইভার গাড়ীর ভিতর দিকে একবার তাকাল। গদির উপরে হাত বুলাল, কিন্তু কোন জিনিস বা প্যাকেট তার নজরে এল না। সে আরোহীকে জানিয়ে দিল যে, না, গাড়ীর ভিতরে আর কোন জিনিসই পড়ে নেই।

আরোহী ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে জানতে চাইল যে যদি গাড়ীর মধ্যে কোন জিনিস পড়ে থাকে, কিংবা প্যাসেঞ্জারের ফেলে যাওয়া কোন জিনিস পাওয়া যায় তাহলে তারা সেগুলো নিয়ে কি করে? ড্রাইভার জানাল সেই খোয়া যাওয়া জিনিস নিয়ে তারা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে পুলিশের কাছে জমা দিয়ে আসে। কারণ ঐখানেই জমা দেবার নিয়ম।

অবাক হয়ে আগন্তুক প্রশ্ন করলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে! আরোহীর অবাক হওয়া দেখে ড্রাইভার বললেন যে সেখান ছাড়া আর কোথায়ই বা জমা দেবেন!

ড্রাইভারের কথা মেনে নিয়ে আরোহী সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুততার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন যে ড্রাইভারের কাছে একটা দেশলাই আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তার থেকে একটা কাঠি জ্বালাতে হবে। তিনি নিজের চোখে গাড়ীর ভিতরটা একবার দেখে নেবেন। যদি কিছু ফেলে গিয়ে থাকেন। কিন্তু গাড়ীর ভেতর কিছুই

পাওয়া গেল না। অগত্যা তিনি ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলেন। ট্যাক্সিটা তার দিক পরিবর্তন করে বেরিয়ে গেল। যাত্রীটিও হোটেলের দিকে পা বাড়ালেন।

যাত্রীটি যখন হোটেলের মধ্যে এসে ঢুকলেন তখন হোটেলের সমস্ত বাসিন্দারা হৈ হৈ করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। হোটেলের ম্যানেজার ছুটে এলেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর দিকে সহাস্যবদনে এগিয়ে গেলেন। বয়-বেয়ারাও বাদ গেল না। তারাও এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। আগন্তুক যে সকলের কাছে খুব জনপ্রিয় তা সকলের ব্যবহার দেখে বোঝা যায়। ম্যানেজারের স্ত্রী উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন আগন্তুককে মিঃ রামবোল্ড, কেমন আছেন? আরও নানাভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন যে তিনি কেন এতদিন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তিনি হয়তো তাদের ভুলে গেছেন। অনেকদিন পরে তাদের কাছে তাঁর পায়ের ধূলো পড়ল। ম্যানেজার সস্ত্রীক ভেবেছিলেন যে তাদের কথা হয়তো আগন্তুক ভদ্রলোক অর্থাৎ মিঃ রামবোল্ড ভুলে গেছেন। ম্যানেজারের স্ত্রী বলতে লাগলেন যে আর একটা আশ্চর্যের বিষয় ঘটেছে, যে রাতে ম্যানেজার সস্ত্রীক মিঃ রামবোল্ডের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন সেই রাতেই সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে তাঁর টেলিগ্রাম আসে। তার জন্য চিন্তা করে মন খারাপ করার কোনই কারণ নেই। একদিন না একদিন সে নিজের পায়ে ঠিক দাঁড়াতে পারবে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিরাট ধনী হয়ে উঠবে, অনেক টাকা পয়সা হবে তাঁর। লক্ষপতি হয়ে উঠবে, তার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল ঠিক কথা কিন্তু ধনী সে ছিল না। ধনী বলতে লক্ষপতি বা কোটিপতি বোঝায়। সেই লক্ষপতিই সে হয়ে উঠবে অচিরে। তখন সে কোনরকম কুণ্ঠা না রেখে, সমস্তরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সসম্মানে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াবে। উনি আরও বলেছেন যে ধনী মানে লক্ষপতিই হবেন।

এই কথাগুলি শুনে মিঃ রামবোল্ড বেশ গদ্গদ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নিজের কানে নিজের প্রশংসা তিনি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলেন। শান্ত ধীর গলায় তিনি বলতে লাগলেন যে তাঁর স্বামী ঠিক কথাই বলেছেন। তিনি ঠিক ঠিক অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাঁর অনুমান যে ঠিক তা আজকের পরিস্থিতিই বলে দিচ্ছে। ওনার কথা আজ সঠিক হয়েছে। আমি সত্যিকারের ধনী।

ম্যানেজারের এই কথা যে ফলে গেছে তা জেনে ম্যানেজারের খুব গর্ববোধ হল। তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী যে সফল হয়েছে একথা তিনি একবার বলে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কথাটা তিনি কয়েকবারই বলে গেলেন। তারপর তিনি একটু চুপ করে থেকে মিঃ রামবোল্ডকে বললেন যে একটা কথা ভেবে তিনি খুবই অবাক হচ্ছেন।

একটু অবাক হয়ে রামবোল্ড বললেন কি কথা। তিনি কেন অবাক হচ্ছেন। তাঁর চোখে মুখে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি তাকিয়ে রইলেন ম্যানেজারের দিকে।

ম্যানেজার বলতে লাগলেন যে মিঃ রামবোল্ড এতবড় একজন ধনী মানুষ, তাঁর সঙ্গে কারোর তুলনা চলে না। তিনি এতবড় ধনী যে শহরের যেকোন নামীদামী হোটেলে তাঁর থাকার কথা আর সেই তিনিই কিনা এসে উঠেছেন এইরকম একটা ছোটখাটো হোটেলে!

ম্যানেজারের কথায় মিঃ রামবোল্ড আশ্বস্ত হলেন। তিনি সহজভাবে ম্যানেজারকে বললেন যে তাঁর অন্য কোনখানে থাকার জায়গা নেই। তাই তিনি সেখানে এসে উঠেছেন। আর যদিও বা থাকত তাহলেও তিনি সেখানে উঠতেন না। কারণ কোনখানে নিজের মতো করে থাকা যায় না। তাই যত অসুবিধাই হোক না কেন তিনি এখানেই উঠবেন। এই হোটেলটা তাঁর নিজের বাড়ীর মতো। এখানে যেমন তেমনভাবে থাকা যায়, ঘোরাফেরা করা যায়।

কথাগুলো বলে রামবোল্ড হোটেলের ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপরে সেগুলোর পরিচিত দৃশ্য দেখে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। ধীরে ধীরে রামবোল্ড খুব তৃপ্তি লাভ করলেন কথাগুলো বলে।

এবার মিঃ রামবোল্ড ম্যানেজারের দিকে ঘুরে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পরিচিত ঘরখানা তিনি পাবেন কিনা। সেই হোটেলের প্রিয় ঘরখানা তাঁর জন্য বরাদ্দ করা থাকে। তিনি সেই ঘরখানা তাঁর জন্য দাবী করলেন। ম্যানেজার বললেন যে তাঁর সেই ঘরখানা সত্যিই ফাঁকা আছে; তখন তিনি খুব খুশী হলেন।

ম্যানেজারের স্ত্রী মিঃ রামবোল্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি এখনই তাঁর ঘরে যাবেন কিনা। যদি যেতে চান তবে তিনি এখনই যেতে পারেন। উত্তরে রামবোল্ড বললেন যে তিনি এখনই সেখানে যাবেন না। এরপর তিনি বেয়ারা ক্লুটসাম-এর খবর নিলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে ক্লুটসাম এখনও সেখানে চাকরি করছে নাকি চলে গেছে? জিজ্ঞাসা করে ম্যানেজারের স্ত্রীর কাছে জানতে পারলেন যে ক্লুটসাম এখনও চাকরি করছে। তখন তিনি বললেন যে তাহলে তাকে বলতে যে তার মোটঘাটগুলো খুলে ফেলতে। কারণ সেই রাতের যা কিছু দরকার সব তাঁর সবুজ স্যুটকেসের মধ্যেই আছে। সুতরাং সমস্ত প্যাকেট খোলার দরকার নেই। তাঁর যে স্যুটকেসটা দরকার তিনি সেটা নিজের কাছেই রাখতে চান এবং রাতে যখন হোটেলের ঘরে ফিরবেন তিনি নিজেই সেটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

তিনি কিছুক্ষণের জন্য লাউঞ্জে বসতে চাইলেন, আর এ-ও বললেন যে যদি কোন বেয়ারা তাঁর জন্য শোর নিয়ে আসে তাহলে যেন সে ওই লাউঞ্জেই নিয়ে যায়। লাউঞ্জ এমন কিছু দূরে নয়। কাছেই। যাওয়ার পথটা আলো-আঁধারি মতো। একটা নিস্তব্ধ থমথমে মতো জায়গা। পথটা আঁকাবাঁকা। সেই আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চললে মনে হয় যেন পথটা অনেক দূরে। সেই বাঁকাচোরা পথ ধরে মিঃ রামবোল্ড এগিয়ে গেলেন। তাঁর হাঁটাচলা একজন পরিতৃপ্ত মানুষের মতো ধীর মন্থর। মানুষের টাকাকড়ি, ধন-সম্পদ এমন কি ভোগ-বিলাসের বাসনা যদি মিটে যায় তবে সে যেমন তৃপ্ত মানুষ রামবোল্ডের হাঁটা-চলার মধ্যেও সেইরকম একজন পরিপূর্ণ তৃপ্ত মানুষের আভাস পাওয়া যায়। তাঁকে দেখলে যে কোন মানুষের হিংসা হওয়া স্বাভাবিক।

এইভাবে ধীর মন্থর ভঙ্গীমার একজন মানুষের মতো রামবোল্ড লাউঞ্জে এসে উপস্থিত হলেন। লাউঞ্জে আসার পর একটা জায়গা বেছে নিয়ে তিনি আরাম করে বসলেন। সেই সময় সেখানে একজন ওয়েটার এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে তাঁর প্রিয় পানীয় এগিয়ে দিলেন। রামবোল্ড ধীরে ধীরে সেই পানপাত্রে চুমুক দিতে লাগলেন।

ঘরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। সেখান থেকে তাপ এসে তাঁর শরীরটাকে আরামের পরশ দিয়ে যাচ্ছে। একসময় ঘরের মধ্যের সেই নরম আরামের পরশ এসে তাঁকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে তুলল। ঘরের আরাম পরিবেশ এবং তন্দ্রালু অবস্থার মধ্যে মিঃ রামবোল্ডের কানে একটা কণ্ঠস্বর প্রবেশ করল। সেই কণ্ঠস্বরে মিঃ রামবোল্ডের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব পালিয়ে গেল। তিনি অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হল কণ্ঠস্বরটা যেন দেওয়ালের উপর দিক থেকে আসছে। কণ্ঠস্বরটা একটু খসখসে ধরনের। কণ্ঠের বক্তব্য যেন খুব সতর্ক এবং সংক্ষিপ্ত।

কণ্ঠস্বর শুনে মিঃ রামবোল্ড ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যদি সেখানে কাউকে দেখা যায়। না, সেখানে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। কেউই আসেনি, তবে তিনি কার কণ্ঠস্বর শুনলেন, কে এসেছে সেখানে। রামবোল্ড নিশ্চিতভাবে কোন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনেছেন তাই তিনি তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কারণ, কণ্ঠস্বরের বক্তব্য তিনি নিজের কানে শুনেছেন, আর সেই কণ্ঠস্বর মনে হল যেন তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে চাইছে। এই কণ্ঠস্বর যেন ঠিক দৈববাণীর মতো শোনাল। বক্তা যেন বলবার কর্তব্য সম্পর্কে খুব বেশি মাত্রায় সচেতন আর মিঃ রামবোল্ড যেন সেই নির্বাচিত শ্রোতা যার কাছে শোনাটা

একটা আনন্দময় একটা লাভজনক ব্যাপার।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কণ্ঠস্বরটি যেন "শিশুদের সম্মিলিত"। শিশুদের সেই স্বরটির মধ্যে যেন একইসঙ্গে অরুচি ও রুচির মেলবন্ধন শোনা যায়। আবার অন্যদিকে উৎসাহ উদ্দীপনা ও অবসাদ লক্ষ্য করা যায়। একই কণ্ঠস্বরে সাম্য ও অসাম্য দুয়েরই মেলবন্ধন রয়েছে।

কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হল ছটি মেয়ে ও ছটি ছেলেকে 'ব্রডকাস্টিং কোম্পানি' এক চায়ের আসরে চা পান করার জন্য নেমন্তন্ন করেছে। কোম্পানির ইচ্ছা ঐ ছটি বাচ্চা ছেলে আর মেয়েকে যে চায়ের আসরে ডাকা হয়েছে সেখানে আপনারাও তার সাক্ষী হোন। বাচ্চাদের চা খাবার জন্য ডাকা হয়েছে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে চা পর্বে যোগদানও করেছে। কণ্ঠস্বর আবার বাচ্চাদের কাছে জানতে চাইল যে তাদের চা খাওয়া শেষ হয়েছে কিনা। বাচ্চারা সমস্বরে বলে উঠলো যে তাদের চা খাওয়া শেষ হয়েছে। তাদের চা পানের আসরটা ভালো লাগল কিনা সেটাও কণ্ঠস্বরটি জানতে চাইল। বাচ্চারা তাতেও সায় দিল। শিশুদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তারা একসঙ্গে সকলেই চেঁচিয়ে বলে উঠল হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাদের আসরটা ভালো লাগল।

'এইবার তা হলে আমাদের মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ করা যাক।'

শিশুদের অনুষ্ঠান শুনতে লাগলেন রামবোল্ড। এক সময় শোনা গেল ঃ

"মোমের আলোয় যাও চলে যাও শোবার ঘরে খাটের পরে, খুব সাবধান। আসছে খুনী কাটতে মাথা ঘচাং করে।

ঘচাং ঘচাং শব্দ হল
মুন্ড যে হায় কাটা গেল
তারপরেতে কি যে হলো
খুনী কোথা পালিয়ে গেলো
কেউ জানেনা কোথায় গেল
সাবধান! সাবধান!

একটি শিশু ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল। তারপরই সব চুপ। মিঃ রামবোল্ড কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

একটু পরেই আবার 'প্রোগ্রাম' শুরু হল। এবারের প্রোগ্রামটা একটু অন্য রকমের। মিঃ রামবোল্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ঘরে ঢুকল ক্লুটসাম। সে এই হোটেলের বহুদিনের পুরানো কর্মচারী।

ক্লুটসাম জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে কি আর কোন পানীয় দেব, স্যার?'

'হ্যাঁ, এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে এস।'

—'ঠিক আছে স্যার।'

একটু পরেই ক্লুটসাম নিয়ে এল এক আকাঙ্খিত পানীয়।

প্রথম গ্লাসটা মিঃ রামবোল্ড এক চুমুকে খেয়ে নিলেন।

ক্লুটসাম বলল, 'আপনার আর কিছু চাই স্যার?'

—না, মিঃ রামবোল্ড বললেন—'আচ্ছা, ক্লুটসাম, আমি ছাড়া বাইরের আর কেউ ডিনারের জন্য আসছে এখানে?'

—'এখন আসবে কেন, স্যার? এখন তো সবে নটা,' ক্লুটসামের স্বরে যেন একটু ভর্ৎসনারই পরশ!

—'দুঃখিত, ক্লুটসাম। আসলে আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। তাই হোটেলের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে গল্পগুজব না করে লাউঞ্জে বসেই একটু বিশ্রাম করছি।'

ক্লুটসাম বলল, 'হ্যাঁ, স্যার দেখেই মনে হচ্ছে যে, আপনার মনটা ভাল নেই। আশা করি কোন দুঃসংবাদ পেয়ে আপনার মনটা খারাপ হয়নি।'

—'না ... না ... সেসব কিছু নয়,' মিঃ রামবোল্ড বললেন, 'অনেক দূর থেকে আসার ফলেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

—'হ্যাঁ, স্যার আপনি তো আসছেন সেই কতদূরের অস্ট্রেলিয়া থেকে।'

—'হ্যাঁ,' মিঃ রামবোল্ড বললেন।

'আমি তাহলে এখন যাই স্যার।'

তোমার হাতে যদি কাজ না থাকে, তাহলে বোস। একটু কথাবার্তা বলা যাক।'

ক্লুটসাম বুঝল যে, মিঃ রামবোল্ড এখন কথা বলতে চাইছেন। এই ধনী লোকটিকে খুশী করা দরকার। তাই হাতে সামান্য কাজ থাকলেও সে মিঃ রামবোল্ড আর কি বলেন তা শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

মিঃ রামবোল্ড বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস।'

—'অস্ট্রেলিয়া জায়গাটা কেমন স্যার?'

—'খুবই সুন্দর। ওখানে গিয়ে মানুষ নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতে পারে।'

—'আবহাওয়া কেমন?' ক্লুটসাম আবার প্রশ্ন করল।

—'আমি যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে চলে আসি তখন ওখানের আবহাওয়া এখানের চাইতে অনেক ভাল ছিল।'

শ্যাম্পেনের দ্বিতীয় গ্লাসটা শেষ করলেন মিঃ রামবোল্ড। তাকিয়ে দেখলেন

বোতলের ভিতরে আর কতটা পানীয় রয়েছে।

বাইরে বৃষ্টি থামেনি। কফিরুমের কাঁচের ছাদের উপরে বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্ করে।

ক্লুটসাম বলল, ভাল আবহাওয়াটাই সব নয় স্যার। ভিন্‌দেশ কখনও নিজের দেশের মতো হতে পারে না।'

—'না, তা অবশ্য হতে পারে না,' মিঃ রামবোল্ড স্বীকার করলেন।

'পৃথিবীতে এমন দেশও আছে স্যার যেখানকার লোকেরা একটা গোটা দিন ধরে বৃষ্টি হলে খুবই খুশী খুশী হয়।'

—'তা আছে,' মিঃ রামবোল্ড বললেন।

ক্লুটসামের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর মনটা যেন ক্রমেই শান্ত হয়ে উঠতে লাগল।

—'বিদেশে গিয়ে নিশ্চয়ই খুব মাছ ধরেছেন স্যার?'

—'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মাছ ধরতে গিয়েছি বৈকি।'

—'এদেশের মতো অস্ট্রেলিয়ায় বোধ হয় মাছ ধরাটা সংরক্ষিত নয়।'

—'না,' মিঃ রামবোল্ড বললেন।

—'তাহলে অনধিকারীর অন্যায়ভাবে মাছ চুরি করার ব্যাপারটাই নেই সে দেশে।' ক্লুটসাম দার্শনিকের মতো সিদ্ধান্ত করল। একটু থেমে সে মন্তব্য করল, 'ওদেশে তাহলে প্রত্যেকে তার নিজের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত থাকে।'

—'হ্যাঁ, এটাই অস্ট্রেলিয়ার নিয়ম।'

'এ নিয়মটা আইনের মতো নয় স্যার, তাই না?' ক্লুটসাম বলল।

—'এটা নির্ভর করছে 'আইন' বলতে তুমি কি বোঝ তার ওপর।'

'স্যার, আমি কি বলতে চাইছি তা বোধ হয় আপনি ভাল করেই বুঝতে পারছেন। আমি বলছি পুলিশের কথা। যদি আপনি অস্ট্রেলিয়ায় কোন লোককে খুন করেন তবে ধরতে পারলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আপনাকে ফাঁসি দেবে? দেবেনা?'

কাঁটার (স্কর্ক) এক প্রান্ত দিয়ে গেলাসের পানীয়টা আলোড়িত করে মিঃ রামবোল্ড আবার এক চুমুক পান করলেন, তারপর বললেন, 'বিশেষ কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা না থাকলে সম্ভবতঃ ফাঁসিই দেবে।'

'কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার তো ছাড়া পেয়ে যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে?'

'হ্যাঁ, ছাড়া পেতেও পারি।'

'আইন বলতে আমি এ কথাটাই বোঝাতে চাইছি। আপনি তো জানেন আইন

বলতে কি বোঝায়। আইনের বিরুদ্ধে গেলে আপনাকে শাস্তি পেতেই হবে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি 'আপনাকে' বোঝাচ্ছি না। আমি বলছি আইন ভঙ্গকারীর কথা। আমার কথাগুলোকে ভাল করে বোঝাবার জন্যই আমি 'আপনি' 'আপনাকে' এ সব শব্দগুলো ব্যবহার করছি।

—'তা বুঝেছি।' মিঃ রামবোল্ড কেমন যেন অদ্ভুত কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

দক্ষ হাতে মিঃ রামবোল্ডের সামনের টেবিলটা পরিষ্কার করতে করতে ক্লুটসাম বলল, 'যদি কেবল 'নিয়মই' থাকে তখন আপনাকে খুঁজে বের করবার দায়িত্ব যেকোন লোকের ঘাড়েই এসে পড়ে। সে লোক আমিও হতে পারি।'

'কেন তুমি বা অন্য কেউ আমাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবে? আমি তো তোমার বা অন্য কোন খোঁজারুর ক্ষতি করি নি।' মিঃ রামবোল্ড বললেন।

—'কিন্তু আপনি যদি হত্যাকারী হন তবে আমাদের খুঁজবার চেষ্টা করতেই হবে।'

—'কেন?' মিঃ রামবোল্ড প্রশ্ন করলেন।

—'কারণ আপনি ছাড়া থাকলে আমরা তো নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না। আপনি হয়তো আর একটা খুন করবেন। কাউকে না কাউকে তো ব্যাপারটা দেখতেই হবে।'

—'ধরো দেখবার মতো কেউই নেই, তাহলে?'

—'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যার।'

—'ধরো নিহত ব্যক্তির কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নেই। ধরো সে কেবল অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কেউ জানেনা যে সে নিহত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কে হত্যাকারীকে খুঁজবে?'

ক্লুটসাম যেন অশুভ ভবিষ্যৎ দেখার জন্যই অস্বাভাবিকভাবে চোখ পিট পিট করে বলল, 'সে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি নিজেই আপনাকে তাড়া করবে। সে কিছুতেই কবরের ভিতরে শান্ত থাকতে পারবে না, প্রতিশোধ নেবার জন্য তার আত্মা মরিয়া হয়ে উঠবে।'

মিঃ রামবোল্ড চমকে উঠলেন। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'ক্লুটসাম, আমার জন্য আর এক বোতল মদ নিয়ে এস। হ্যাঁ, মদের জন্য বরফ মেশাতে হবে না।'

টেবিলের উপর থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে ক্লুটসাম সেটা আলোর সামনে তুলে ধরল। বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, এটা খতম হয়ে গিয়েছে।'

—'খতম?' মিঃ রামবোল্ড একমত হলেন, 'একেবারে খতমই হয়ে গিয়েছে।'

রাত প্রায় এগারোটা। মিঃ রামবোল্ড একাই 'লাউঞ্জ'-এ বসে আছেন। এক্ষুণি ক্লুটসাম তাঁর জন্য কফি নিয়ে আসবে। বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। সোঁ সোঁ করে বইছে ঝোড়ো হাওয়া।

এতদিন পরে দেশে ফিরেও ভাল লাগছে না মিঃ রামবোল্ডের। মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বাচ্চাদের বেতার অনুষ্ঠানের খুনীর কথা, ক্লুটসামের মুখে হত্যাকারীর কথা—এ সবই যেন অতীতের এক অপ্রীতিকর স্মৃতিকে মনের ভিতরে জাগিয়ে তুলছে। নাঃ, দেশে এসে প্রথম দিনটাই ভাল কাটল না। খারাপ—খুবই খারাপভাবে কাটল।

অবশ্য 'ফায়ার প্লেস'-এর আগুনের তাপটা খুবই ভাল লাগছে। দুপায়ের স্লিপার-এর সোল দু'খানা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। শ্যাম্পেনটা চমৎকার। একটু বেশী মাত্রায় পান করা হলেও কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। ক্লুটসাম ভাল ব্রান্ডিও পরিবেশন করবে বলে কথা দিয়ে গিয়েছে। এই বাদল ঝরা শীতের রাতে শরীরটা বেশ গরম হয়ে উঠবে। ক্লুটসাম লোকটা খুব ভাল। বেশ যত্ন আত্তি করে। অবশ্য লোকটা একটু সেকেলে ধরনের। তা হোক, এ হোটেলটাও তো আধুনিক কায়দায় নয়। মদের প্রভাবে উত্তপ্ত হয়ে মিঃ রামবোল্ডের চিন্তাস্রোত ক্রমেই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে লাগল।

'আপনার কফি স্যার?' মিঃ রামবোল্ড চমকে উঠলেন। এক কাপ কফি নিয়ে এসেছে ক্লুটসাম।

—'ধন্যবাদ ক্লুটসাম, তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। তুমি চমৎকার মানুষ। তোমার মতো ভাল লোকের সংখ্যা যদি একটু বেশী হত তবে মানুষের সমাজটাই অন্যরকম হয়ে যেত।'

একটু নেশা হয়েছে। নেশার ঝোঁকে অতি ভদ্রভাষায় কথা বলতে গিয়ে বোধ হয় একটু বাড়াবাড়িই করে ফেললেন মিঃ রামবোল্ড।

খুশী হয়ে ক্লুটসাম বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, মানুষ ভাল হলেই দুনিয়াটা ভাল হয়ে উঠত।'

—'ঠিক বলেছ তুমি।' সোৎসাহে চীৎকার করে উঠলেন মিঃ রামবোল্ড।

'আমি তাহলে এখন আসি স্যার?'

ক্লুটসাম দরজার দিকে পা বাড়াতেই মিঃ রামবোল্ড বললেন, 'তোমাদের হোটেল এখন কেমন চলছে?'

—'খুবই ভাল চলছে স্যার। হোটেলের সবগুলি 'স্যুইট' এবং ঘর ভাড়া হয়ে গিয়েছে। রোজই আমাদের লোক ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। জায়গায় নেই, কোথায়

নতুন লোকদের থাকতে দেওয়া হবে। এই তো আজ রাতেই এক ভদ্রলোক 'ফোন' করেছিলেন। তিনি বললেন যে, একটু বেশী রাতেই আসবেন তিনি। কিন্তু তিনি যখন আসবেন তখন দেখবেন পাখি উড়ে গিয়েছে।'

—'পাখি উড়ে গিয়েছে?' মিঃ রামবোল্ডের প্রশ্নটা ক্লুটসামের কথার প্রতিধ্বনির মতই শোনা গেল। ক্লুটসাম বলল, 'আমার কথার অর্থ হল এই হোটেলে আর ভাড়া দেবার মতো একটাও ঘর নেই। আজ রাতে যদি মালিকের কোন প্রিয়পাত্র আসে অথবা কেউ যদি দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ ভাড়া দিতেও রাজী থাকে, তাহলেও তাকে আমরা ঘর দিতে পারব না।'

—'এসেও যে লোক ঘর পাবে না, সেই হতভাগ্যের জন্য আমি দুঃখবোধ করছি, ক্লুটসাম। আজকের রাতটা কিরকম তা তো দেখছ। এই দুর্যোগের রাতে কাউকে যদি ঘর না পেয়ে বাইরে রাত কাটাতে হয় তাহলে তার তো খুবই কষ্ট হবে। সে লোক আমার চেনা বা অচেনা, বন্ধু বা শত্রু, যা-ই হোক না কেন তার জন্য আমি সত্যি সত্যিই দুঃখবোধ করছি। আমার ঘরে যদি একটা অতিরিক্ত বিছানা থাকত তবে সেটা আমি আশ্রয়হীন মানুষটাকে ছেড়ে দিতাম।'

আপনার তো আছে স্যার, ক্লুটসাম বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছেই তো। কি বোকা আমি। আমার ঘরখানাই তো ডবল বেডের। [illegible] লোকটি আজ এখানে এসে ঘর পাবে না, তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। পৃথিবীর সব গৃহহারাদের জন্যই আমার দুঃখ হয়।'

—আমেন! ভক্তিভরে ক্লুটসাম বলল। মিঃ রামবোল্ড বলতে লাগলেন, 'ডাক্তারদের জীবনের কথা একবারও ভেবে দেখেছ? এরকম ঝড়-জলের শীতার্ত রাতেও বিছানা ছেড়ে তাঁদের বেরোতে হয়। দুর্যোগভরা মধ্য রাতেও তাঁদের বিচরণ করতে হয় গৃহহারার মতো। বড় কষ্টের জীবন তাদের, তাই না ক্লুটসাম।'

—'ডাক্তারদের জীবনের এদিকটা ভেবে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ডাক্তারদের জীবনটা যে কষ্টের তা আমার কাছ থেকে জেনে নাও।'

মিঃ রামবোল্ডকে যেন কথার নেশায় পেয়েছে। তিনি কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না ক্লুটসামকে। কিন্তু রাত হয়েছে, এবার কথোপকথনটা থামানো দরকার। তাই কথাবার্তার ছেদ টানবার জন্য সে বলল—'সকালে কটার সময় ডেকে দেব, স্যার?'

—'আমাকে ডাকবার কোন প্রয়োজন নেই, সুরেলা গলায় মিঃ রামবোল্ড বললেন—'আমি তৈরী হয়েই উঠে পড়ব। আমার উঠতে দেরীও হতে পারে।

ভাল করে শুয়ে সুনিদ্রায় ভাল করে ছড়িয়ে শুয়ে—ঘুম দিতে পারলে তার চাইতে আরামের আর কিছুই নেই। তাই না ক্লুটসাম?'

—'ঠিকই বলেছেন, স্যার এবার তাহলে আপনার ঘরে ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না।'

—'শুভরাত্রি, ক্লুটসাম, তুমি খাসা লোক। হ্যাঁ, একথা আমি বলবই। এতে যে যা-ই মনে করুক না কেন। আমি তার পরোয়া করি না।'

'শুভরাত্রি, স্যার।'

মিঃ রামবোল্ড আরাম করে চেয়ারে বসলেন। চেয়ারখানা যেন আঁকড়ে ধরে তুলে নিয়ে রইলেন। চেয়ারখানার সঙ্গে তিনি যেন একাত্মতা অনুভব করলেন। শুধু কি তাই ফায়ার-প্লেস-এর আগুন. দেওয়াল ঘড়ি, ঘরের টেবিল এবং অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গেও যেন একাত্মতা বোধ করলেন মিঃ রামবোল্ড।

মিঃ রামবোল্ডের চোখের পাতা দুটি ভারী হয়ে গেল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখলেন মিঃ রামবোল্ড। দেখলেন তিনি যেন আবার তাঁর ছেলেবেলায় ফিরে গিয়েছেন, গ্রামে নিজেদের পুরোনো বাড়ীটাতেই রয়েছেন তিনি। জ্বালানী কাঠ কাটতে যেতে হবে তাঁকে। হ্যাঁ, কাঠ কাটবার একটা প্রচন্ড তাগিদ বোধ করছেন তিনি। কিশোর রামবোল্ড যেতে বাধ্য।

কাঠ কাটবার জন্য বাগানে ঢুকলেন কিশোর রামবোল্ড। বাড়ী থেকে কিছু দূরে একটা বিরাট উঁচু গাছের কাছে এসে থামলেন তিনি। চারপাশে লম্বা লম্বা ঘাসের জটলার মধ্যে এ গাছটা অন্য গাছগুলো থেকে দূরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এককভাবে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছটার নীচের দিককার ডালপালা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। কান্ডের মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে ডালপালা। তার নীচের কান্ডের গায়ে অনিয়মিতভাবে রয়েছে অনেকগুলি পত্রবহুল গুচ্ছ। পাতার সেই থোকাগুলিকে দেখলেই বোঝা যায় যে, ছেঁটে ফেলবার আগে কান্ডের ওসব জায়গায় ডাল ছিল। ডালখানার ছালবাকল শুকিয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে। সেটার মাঝখানটা হাতের কনুই-এর মতো বাঁকা। ঐ শুকনো ডালখানাকে ভেঙে আনতে পারলে খুব ভাল জ্বালানী কাঠই পাওয়া যাবে।

কিশোর রামবোল্ড গাছে উঠতে শুরু করলেন। সহজেই উঠতে লাগলেন তিনি। এত সহজেই যে ওঠা যাবে, তা আশাই করতে পারেন নি মিঃ রামবোল্ড। তাঁর দেহের যেন কোন ওজনই নেই। কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন যেন আরম্ভ হল তাঁর মনের উপরে। তিনি যত উপরে উঠতে লাগলেন উৎপীড়নের মাত্রা যেন ততই বেড়ে যেতে লাগল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি ক্রমেই আচ্ছন্ন করে ফেলতে

লাগল তাঁর মনের আকাশকে। মিঃ রামবোল্ডের মনে হতে লাগল গাছের ঐ শুকনো ডালগুলো যেন তাঁকে চায় না। একি অদ্ভুত অনুভূতি! শুকনো ডালপালা যেন গাছের কান্ডের নীচের দিকে তার শত্রুতার তীর ছুঁড়ছে মিঃ রামবোল্ডকে লক্ষ্য করে। প্রতি মুহূর্তে মিঃ রামবোল্ড আরও এগিয়ে যাচ্ছেন এমন একটা বস্তুর দিকে যাকে তিনি সব সময়েই ভয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন। বস্তুটা হল বৃক্ষকান্ডের একটা অনভিপ্রেত উদ্‌গত অংশ। গাছের কান্ড থেকে ফুলে বেরিয়ে আসে গোলাকৃতি একটা অংশ। সে জায়গায় অনেক ছোট ডাল, পল্লব আর ফেঁকড়ি জটা পাকিয়ে থাকে। এ বস্তুর সঙ্গে নিজের মাথার ধাক্কা লাগার চাইতে একেবারে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

কিশোর রামবোল্ড যখন শুকনো ডালখানার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার রাতের অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। তিনি জানেন এবার তাঁকে কি করতে হবে। শুকনো ডালখানাকে ভাঙতে হবে এবার। নীচের দিকে চোখ পড়ল মিঃ রামবোল্ডের। নীচে ... অনেক নীচে মাটির উপর একখানা সাদা কাপড় পাতা রয়েছে। গাছ থেকে পড়ে গেলে ঐ কাপড়খানার উপরেই গিয়ে পড়বেন মিঃ রামবোল্ড। এক নজর দেখেই মিঃ রামবোল্ড বুঝতে পারলেন যে ওখানা হল একখানা শবাচ্ছাদন বস্ত্র।

পাগলের মতো কিশোর রামবোল্ড শুকনো ডালখানা ভাঙার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ডালখানা ভাঙার একটা তীব্র ইচ্ছা যেন তাঁকে পেয়ে বসল। হ্যাঁ, যে করেই হোক এ শুকনো ডালখানা তাঁকে ভাঙতেই হবে। সামনের দিকে বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ে ভাঙা ডালগুলোর কনুই-এর মতো জায়গায় সজোরে চাপ দিলেন। মড়মড় করে ভেঙে গেল ডালখানা। মিঃ রামবোল্ড গাছ থেকে পড়ে গেলেন। নীচের শবাচ্ছাদন বস্ত্রখানা যেন হাওয়ার বেগে ছুটে আসতে লাগল উপরের দিকে। দারুণ আতঙ্কে কিশোর রামবোল্ড চোখ বন্ধ করলেন।

জেগে উঠলেন মিঃ রামবোল্ড। এই শীতার্ত রাতেও তাঁর সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। দেখলেন আরাম কেদারার একখানা বাঁকানো বাহুকেই সজোরে আঁকড়ে ধরেছেন তিনি। এই বাহুর উপরেই তাঁর জন্য এক গেলাস ব্র্যান্ডি রেখে গিয়েছিল ওয়েটার ক্লুটসাম। গেলাসটা উল্টে গিয়েছে। চামড়ার আসনখানার উপরে পড়ে যাওয়া ব্র্যান্ডি যেন একটা ছোট্ট জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে।

..... ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মিঃ রামবোল্ড আপন মনেই বলে উঠলেন, ব্র্যান্ডিটা খেতে পারি নি, এখন আমার এক গেলাস ব্র্যান্ডির দরকার।

ঘন্টা বাজালেন মিঃ রামবোল্ড 'একজন ওয়েটার' এল। এ নতুন লোক। একে

মিঃ রামবোল্ড চেনেন না। তিনি বললেন, 'ওহে, শোন। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার ঘরে ব্র্যান্ডি আর সোডা নিয়ে আসবে। তুমি আমাকে চেন না, আমার নাম মিঃ রামবোল্ড।' 'ওয়েটার'-কে অনুসরণ করে মিঃ রামবোল্ড 'লাউঞ্জ' থেকে বেরিয়ে এলেন। অনেক রাত হয়েছে, এবার নিজের ঘরে যাওয়া দরকার। ব্র্যান্ডিটা খেয়েই বিছানা নেবেন তিনি। আরাম করে ঘুমোবেন।

'প্যাসেজ'-টা বলতে গেলে অন্ধকারই। মৃদু নীল আলো অন্ধকার দূর করতে পারে নি, কেবল একটা রহস্যময় আলো-আঁধারির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নিজের মনেই তিনি বললেন,

মোমের আলোয় যাও চলে যাও শোবার ঘরে—খাটের উপর। কিন্তু ছড়াটার চরণটা মনে পড়তেই আঁতকে উঠলেন তিনি। শেষ চরণগুলি তিনি আর উচ্চারণই করলেন না।

তিন

মিঃ রামবোল্ড তাঁর শোবার ঘরে যাবার একটু পরেই হোটেলের দরজার ঘন্টাটা একটুও না থেমে পরপর তিনবার সজোরে বেজে উঠল।

রাতের দারোয়ান বিরক্ত হয়ে ক্লুটসামকে বলল, 'এই দুর্যোগের রাতে এমন বিরক্ত করতে আবার কে এল?'

আবার পরপর তিনবার ঘন্টা বেজে উঠল।

—নাঃ জ্বালালে দেখছি। লোকটা খুব তাড়াতাড়ি ভিতরে আসতে চাইছে। বোধ হয় নিজের চাবির কথা ভুলেই গিয়েছে সে।'

ডাকে সাড়া দেবার জন্য দারোয়ান ব্যস্তভাবে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল না। ভুলো লোকটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুক—বুঝুক মজাটা। এতে তার ভালই হবে, ভবিষ্যতে আর এরকম ভুল করবে না সে। ভালই শিক্ষা হবে লোকটার।

এত ধীরে সুস্থে দারোয়ান হলঘরের দরজার কাছে গেল যে ঘন্টা আবার বেজে উঠল। এরকম নাছোড়বান্দা আচরণে আরও বিরক্ত হয়ে দারোয়ান দরজা না খুলে ঘরের ভিতরে স্তূপীকৃত খবরের কাগজগুলোকে সাজিয়ে রাখতে বলল।

আবার ঘন্টা বাজল—একবার, দু'বার, তিনবার। নিজের অবজ্ঞা আর উদাসীনতা দেখার জন্য দারোয়ান দরজা খুলেও পাল্লার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। সুতরাং নিশীথ রাতের আগন্তুকের পিছন দিকটাই সে প্রথমে দেখতে পেল। কিন্তু

তা দেখেই সে বুঝতে পারল যে, আগন্তুক এই হোটেলের বাসিন্দা নয়।

আগন্তুকের গায়ে একটা কালো রঙের লম্বা ওভারকোট। কোটের কলার টেনে চিবুকের উপরে তুলে দেওয়া হয়েছে। মাথার টুপিটা টেনে নামিয়ে আনা হয়েছে মুখের ওপর। ফলে আগন্তুকের মুখ বা চেহারা কেমন তা বোঝাই যাচ্ছে না। ওভারকোটের একটা দিক ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। বোধহয় লোকটার হাতে একটা ঝুড়ি অথবা বড় ডালা রয়েছে। লম্বা কালো ওভারকোটে ঢাকা লোকটাকে দেখাচ্ছে একটা অতিকায় ডানাভাঙা কাকের মতো।

দারোয়ানের মনে কেমন যেন একটা অজানা অস্বস্তির ভাব জেগে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "শুভ সন্ধ্যা, স্যার। বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি।"

আগন্তুক কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের এক কোণে রাখা একখানা টেবিলের দিকে যেন ভেসে এগিয়ে গেল। তারপর ডান হাত দিয়ে টেবিলের উপরে রাখা কতকগুলি চিঠি উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল।

—"আপনি কি কোন সংবাদ পাবার আশা করছেন?" দারোয়ান প্রশ্ন করল।

"না", আগন্তুক উত্তর দিল। 'আমি' আজকের রাতের জন্য তোমাদের এই হোটেলে একখানা ঘর পেতে চাই।'

—'আজ সন্ধ্যায় একখানা ঘরের জন্য আপনিই কি টেলিফোন করেছিলেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে ক্ষেত্রে আমাকে দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, আজ রাতে আপনাকে ঘর দিতে পারব না আমরা কেননা হোটেলের সব ঘরই ভর্তি হয়ে গিয়েছে, আর একখানা ঘরও খালি নেই।'

—'তুমি ঠিক জান?'

—'হ্যাঁ, স্যার,' দারোয়ান উত্তর দিল।

—'আর একবার ভেবে দেখ।'

'ভাবনার কিছু নেই স্যার, কোন ভদ্রলোক ঘরের খোঁজে এই হোটেলে এলে তাঁকে একথা বলবার নির্দেশই আমাকে দেওয়া হয়েছে।

দারোয়ানের অস্বস্তিটা যেন এবারে আরও বেড়ে গেল। একটা অদ্ভুত অজানা অনুভূতিতে তার মনটা ভরে গেল। মনে হল যেন তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, হয়তো তার প্রাণটাই, স্রোতে ভাসতে ভাসতে তার ভিতরে ঢুকে গিয়ে চক্রাকারে ক্রমাগত ঘুরতে শুরু করেছে। মনের অবস্থাটা একটু স্বাভাবিক হতেই সে কোনরকমে বলল, 'আমি ওয়েটারকে ডাকছি স্যার।'

কিন্তু তাকে ডাকবার আগেই 'ওয়েটার' নিজের কাজেই সেখানে এসে গেল। সে দারোয়ানকে বলল, 'এই যে বিল, মিঃ রামবোল্ডের ঘরের নম্বরটা কি? তিনি তাঁর ঘরে ব্র্যান্ডি নিয়ে যাবার জন্য বলেছেন। কিন্তু তাঁর ঘরের নম্বরটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি আমি।'

—'মিঃ রামবোল্ডের ঘরের নম্বর হল তেত্রিশ,' স্খলিত স্বরে দারোয়ান বলল, "আরে, ওখানাই তো ডবল বেডের ঘর।"

—'আরে তোমার আবার কি হল? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন ভূত দেখেছ', অবাক হয়ে 'ওয়েটার' বলল।

দুজনেই ঘরের মধ্যে চারিদিকে তাকাল। একে অন্যের পিছন দিক দেখল। কিন্তু তারা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই এখানে।

—কি আশ্চর্য! কাকে দেখলাম আমি? কোন মূর্তিমান আতঙ্ককে। দেখ—দেখ—এখানটা দেখ।

পাথরে বাঁধানো মেঝেতে পড়ে আছে এক টুকরো বরফ। এক ইঞ্চি কি দুই ইঞ্চি লম্বা। টুকরোটার চারপাশে বরফগলা জল।

কি আশ্চর্য বিল, এখানে বরফ এল কি করে? বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু জল বরফ হয়ে যাবার মতো অবস্থা তো হয়নি, 'ওয়েটার' মহা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

—'যাকে দেখেছি, সেই-ই বরফ নিয়ে এসেছে,' শঙ্কা-বিহ্বল কণ্ঠে দারোয়ান বলল।

ওয়েটার এবং দারোয়ান একে অন্যের দিকে শঙ্কাতুর চোখে তাকাল। হোটেলের ভিতর ঘন্টার শব্দ শোনা গেল। ওদের শঙ্কা পরিণত হল নিদারুণ আতঙ্কে।

দারোয়ান ফিস ফিস করে বলল, 'ওখানে ক্লুটসাম আছে। ও যে-ই হোক না কেন ক্লুটসামকে ওর ডাকে সাড়া দিতে হবে।'

চার

ক্লুটসামের 'ডিউটি' মাঝরাত পর্যন্ত। রাতের মতো 'ডিউটি' তার শেষ হয়ে গিয়েছে। সে 'টাই' খুলে, পোশাক পাল্টে বিছানাতে শোবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। এমনি সময়েই বেজে উঠল ভিতরের ঘন্টা। সে ভাবল, 'এই দুর্যোগের রাতে কোথা থেকে কে এল? সে কি চায়?'

তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে দিয়ে সে উপরতলার দিকে পা বাড়াল।

উপরের হলঘরে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত মূর্তি। এই মূর্তিটার আবির্ভাব এবং অকস্মাৎ অন্তর্ধানই দারোয়ানকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল।

'বলুন স্যার, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

গম্ভীর গলায় অপরিচিত আগন্তুক বলল, 'তুমি একবার মিঃ রামবোল্ডের ঘরে তাঁকে জিজ্ঞেস করে এস আজ রাতে তাঁর ঘরের বাড়তি বিছানাটা তিনি একজন পুরোনো বন্ধুকে ছেড়ে দিতে পারেন কিনা!'

ক্লুটসাম অবাক হয়ে আগন্তুকের দিকে তাকাল। মিঃ রামবোল্ডের ঘরের বাড়তি বিছানাটার কথা এই অচেনা অজানা লোকটি জানল কেমন করে?' এ প্রশ্নটা কিন্তু মাথার মধ্যে না ঘামিয়ে আগন্তুকের কথামত মিঃ রামবোল্ডের ঘরে গেল। একটু পরেই সে ফিরে এল। আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিঃ রামবোল্ড আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। তিনি আপনার নামটি জানতে চাইলেন।'

.আগন্তুক ঘরের মাঝখানে রাখা একখানা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। টেবিলের উপর রাখা ছিল অস্ট্রেলিয়ার একখানা সংবাদপত্র। ক্লুটসাম সেখানা আগে লক্ষ্য করেনি। আগন্তুক খবরের কাগজের পাতাগুলি ওল্টাতে লাগল তারপর অস্বাভাবিক সরু এবং লম্বা আঙুলের ছুঁচালো নখ দিয়ে সে কাগজখানা থেকে একখানা চতুষ্কোণ অংশ কেটে নিল। অংশটার আকৃতি হল অনেকটা ভিজিটিং কার্ড-এর মতো। টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে আপাদমস্তক ঢাকা আগন্তুক কাগজখানা নেবার জন্য ক্লুটসামকে ইঙ্গিত করল। ক্লুটসাম কাগজখানা নিতেই আগন্তুক বলল, 'এখানা এক্ষুণি মিঃ রামবোল্ডকে দিয়ে এস'।

'প্যাসেজ' দিয়ে যেতে যেতে গ্যাসের আলোয় ক্লুটসাম খবরের কাগজের টুকরোটা পড়ল। তাতে লেখা রয়েছে, 'সিড্‌নি শহরের মিঃ জেমস্ হ্যাগবার্ড— হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। পুলিশের ধারণা মিঃ হ্যাগবার্ডকে হত্যা করা হয়েছে।'

কাগজখানা পড়ে ক্লুটসাম ভাবল, 'এটা তো দেখছি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটা শোকসংবাদের মতো। এই সংবাদের জন্য মিঃ রামবোল্ডের আগ্রহের কি কারণ থাকতে পারে? যাই হোক, কাগজখানা দিয়ে আসি তাঁকে।'

- বেশ কিছুক্ষণ পরে ক্লুটসাম ফিরে এল। সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে—একটু ভয়ও যেন পেয়েছে। নিশীথ রাতের রহস্যময় আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে সে বলল ঃ

—'মিঃ রামবোল্ড আবার আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, মিঃ জেমস্ হ্যাগবার্ড নামে কাউকে তিনি চেনেন না।'

—'চেনেন না! বেশ! এবার তাহলে এই কাগজখানা নিয়ে যাও।' পকেট থেকে খবরের কাগজের আর একখানা টুকরো বের করে ক্লুটসামের হাতে ধরিয়ে দিল।

ক্লুটসাম যাবার জন্য পা বাড়াতেই আগন্তুক অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলল, 'মিঃ রামবোল্ডের কাছে জিজ্ঞেস করবে, আমি উপরে উঠে তাঁর কাছে যাব, না তিনি নীচে নেমে আমার কাছে আসবেন?'

আগন্তুকের নির্দেশে ক্লুটসাম আবার চলল মিঃ রামবোল্ডের কাছে। যেতে যেতে সে খবরের কাগজের টুকরোটা পড়ল। এ কাগজখানা প্রথম কাগজখানার চাইতে কিছুটা পুরোনো। সেখানে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে ঃ

'সিডনির মিঃ জেমস্ হ্যাগবার্ড হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। তিনি এবং তাঁর বন্ধু মিঃ রামবোল্ড শিকার করবার জন্য জঙ্গলে ঢুকেছিলেন। তাঁদের কারো কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

মিঃ রামবোল্ডের কাছ থেকে ফিরে এসে সে ধূমপান কক্ষের দরজাটা খুলল না। আগন্তুকের কাছে না এসে দূর থেকে ভীত কণ্ঠে সে বলল, 'মিঃ রামবোল্ড বললেন, আপনি নরক থেকে এসেছেন, আবার নরকেই ফিরে যান। মিঃ রামবোল্ড আরও বললেন যে, তিনি নীচে নামবেন না। আপনার যদি সাহস থাকে তবে উপরে উঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।'

কোনরকমে এই কথাগুলি বলেই আতঙ্কে বিহ্বল ক্লুটসাম এক ছুটে চলে গেল সেখান থেকে। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

কিন্তু সে রাতে ক্লুটসামের কপালে বোধ হয় বিধাতা পুরুষ বিশ্রামের কথা লেখেন নি। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। মিঃ রামবোল্ডের ঘরের দিক থেকে ভেসে এল তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ এবং ক্রুদ্ধ গর্জনের শব্দ।

বিপদ-প্রীতি অথবা বিপদকে অগ্রাহ্য করার আদিম অনুভূতি এবং আবেগ ক্লুটসামের মনকে আলোড়িত করে তুলল। সে ছুটল মিঃ রামবোল্ডের ঘরের দিকে। এত জোরে সে বোধ হয় কোনদিন ছোটেনি। প্যাসেজে মিঃ রামবোল্ডের বুটজোড়ার সঙ্গে ধাক্কা লেগে ক্লুটসাম হোঁচট খেল।

মিঃ রামবোল্ডের শোবার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকল ক্লুটসাম। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ঘরখানা খালি—একেবারে খালি, ঘরের ভিতরে আসবাবপত্র এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। বিছানাটার অবস্থাটাই

সবচাইতে শোচনীয়। বালিশে রক্তের দাগ, বিছানা রক্তে ভেজা, ঘরের মেঝেতে রক্তের স্রোত।

ভয় পেয়ে গেল ক্লুটসাম। কিন্তু সবচাইতে বেশী ভয় পেল জানালাটার গোবরাটার উপরে একটা জিনিস দেখে। জিনিসটা দেখে সে এমনভাবে স্তম্ভিত এবং নির্বাক হয়ে গেল যে নীচে গিয়ে চিৎকার করে লোকজন ডেকে আনতে অনেকটা দেরী হয়ে গেল। জিনিসটা হল একখন্ড বরফ। সেই তুষারখন্ডের আকৃতি তীক্ষ্ণ এবং বক্র নখের মতো। চীনাম্যানের নখের মতো সেই বাঁকানো নখের ডগায় আটকে রয়েছে এক টুকরো সদ্যছিন্ন রক্তমাখা মাংসখণ্ড।

পাঁচ

মিঃ রামবোল্ডের সঙ্গে ক্লুটসামের আর কোনদিন দেখা হয়নি।

কিন্তু সে রাতে ক্যারিক স্ট্রিটের রাস্তায় যে পুলিশ কনস্টেবল টহল দিচ্ছিল সে দেখেছিল একটা অদ্ভুত এবং সন্দেহজনক দৃশ্য। কনস্টেবল দেখেছিল একটা কালো 'ওভারকোট' পরা একটা আড়ষ্ট মূর্তিকে। প্রচন্ড ঝড়-জলকে একেবারে উপেক্ষা করে সেই মূর্তি যেন কিরকম অদ্ভুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার হাতের অবস্থান দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন একটা ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের লোকটির মনে সন্দেহ হওয়ায় সে ওভারকোটে ঢাকা মূর্তিটিকে থামতে বলে। কিন্তু সে থামে না, তাকে ধরার জন্য পুলিশের লোকটি দৌড়ে যায়। কিন্তু যদিও সেই দুর্যোগের রাতের পথচারী খুব দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল না, তবুও পুলিশের লোকটি ছুটে গিয়েও তাকে ধরতে পারে নি।

ঝড়-জলের রাতে সে যেন হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

পদধ্বনি

শিলভা শেরি

সিঙ্গাপুরে একটি চীনা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। বললাম বটে মেয়ে, তার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন তার বয়স ত্রিশ বছর; কিন্তু সে দেখতে এতই ছোটখাট ছিল আর তার গায়ের চামড়া ছিল এতই মসৃণ যে তাকে খুবই অল্পবয়সী মেয়ে বলে মনে হত।

কি করে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সেটা বড় কথা নয়। তার নাম কোয়ান আন। বেশ সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে; তার মা ছিলেন সে সময়কার বিখ্যাত সুন্দরী ও কবি। কোয়ান আন ও দুটি বুড়ো চাকরকে নিয়ে তিনি তখন বাস করতেন শহরের তাংলিন অঞ্চলে ছায়াঘেরা শান্ত রাজপথের উপরে একটি সেকেলে মস্তবড় কাঠের বাড়িতে। বাড়ির কাঠের কারুকার্যমন্ডিত হলঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; সামনের ফটক দিয়ে ঢুকেই হলঘরের একদিকে ছিল প্যারিবারিক উপাসনাবেদী; আর ছিল কাঠের প্যানেলের উপর চীনা ভাষায় সোনালী রং-এ খচিত নানা বাণী।

উপাসনা-বেদীর দু'পাশ দিয়ে দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে। কোয়ান আনের বসবার ঘরটি ছিল দোতলায় খোলা বারান্দায়, ঠিক বাগানের উপরে। সেখানে যেতে আমরা সবসময় বাঁ-হাতি সিঁড়িটাই ব্যবহার করতাম। মনে পড়ে, একদিন আমি ডান-হাতি সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে যেতেই সে আমাকে শান্তভাবে বলেছিল যে ও সিঁড়িটা এখন আর তারা ব্যবহার করে না। সে সময় কথাটাকে কোনরকম গুরুত্ব দিই নি, কিন্তু পরবর্তীকালে কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কোয়ান আনের মা মিসেস লীর সঙ্গে আমার কখনও সখনও দেখা হত; তিনি তাঁর ঘরেই থাকতেন, নয়তো রান্নাঘরে বুড়ি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন; কথাও বলতেন কম।

একদা সন্ধ্যায়—বাদুড়ের ডানায় ভর করে যখন গোধূলি নেমে আসে—কোয়ান আনের ঘরে বসে আমরা কি নিয়ে যেন কথা বলছিলাম—সম্ভবত সাহিত্য নিয়ে, কারণ তাতেই ছিল তার বেশী আগ্রহ। চারদিক শান্ত, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে, ফ্রাঞ্জিপানি ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর তখনই আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম সিঁড়িতে একটা ক্যাচক্যাচ আওয়াজ হল; যেন কেউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে।

চেয়ারেই একটু পাশ ফিরলাম; ভাবলাম, কোয়ান আনের মা আসছেন আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে। পায়ের শব্দ সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেল; দরজাটা খোলার অপেক্ষায় রইলাম, কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। তখন বুঝতে পারলাম, যে সিঁড়িটা আমরা ব্যবহার করে থাকি তার পরিবর্তে পায়ের শব্দ হচ্ছে হলঘরের অন্যদিকের সিঁড়িতে, অথচ সেদিক থেকে বসার ঘরে ঢুকবার কোন দরজাই নেই।

আমাকে বিস্মিত হতে দেখে কোয়ান আন বলল, "ও আমার দাদা।"

"তোমার দাদা? কিন্তু আমি তো জানতাম না—কখনও তার সঙ্গে দেখাও হয়নি।"

কিন্তু সে দাদাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল না।

"ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। সে এখানে আসবে না।"

"কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হলে আমি খুশি হতাম ..."

কোয়ান আন ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল।

"সে ছিল খুবই চালাক-চতুর। তার জীবনটা ছিল বড়ই দুঃখের; বিয়েটাই ছিল তার দুঃখের কারণ।"

তার কথায় অতীত কালের ব্যবহার শুনে সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়ও আমার শরীরটা শিউরে উঠল।

"তার মৃত্যুর পরে—তখন আমার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর—প্রায়ই ওই সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতাম, ভাবতাম সে বুঝি ঘরে ঢুকবে। কিন্তু ঢুকত না। তাকে সুখী করতে সাধ্যমতো সবকিছুই আমরা করেছি, কিন্তু কিছু লোক মৃত্যুর পরেও তাদের দুর্ভাগ্যকেই বয়ে বেড়ায়।"

সে হাসল। "চমকে উঠো না। গল্পটা খুবই সাধারণ। দুঃখেরও বটে।" গল্প বলার জন্য তৈরী হয়ে সে ভালভাবে বসল।

দাদা আমার চাইতে আট বছরের বড় ছিল; আমি তাকে ভালবাসতাম, তাকে নিয়ে গর্ব করতাম। কি জান, সে খুবই ভাল ছাত্র ছিল, আইন পড়ছিল। আমাদের আশা ছিল, সে একদিন বিখ্যাত সফল লোক হবে।

স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যায় এখানে বসে স্কুলের পড়া করতাম আর সিঁড়িতে দাদার পায়ের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম ঃ কখনও সে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে বলে উঠবে, "কেমন আছ গো ছোট বোনটি আমার? আজ রাতে, সিনেমা দেখার কি হবে?" মনে পড়ে একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে সে বাড়ি ফিরত, ওই লনে ব্যাডমিন্টন খেলত, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে গল্প করত; আমিও তাদের সঙ্গে থাকতাম। আমাকে নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যেত; তারপর যখন

তার গাড়ি হল তখন প্রতি রবিবার আমাকে নিয়ে সাগর সৈকতে পিকনিক করতে যেত।

তারপর সে প্রেমে পড়ল। সেকথা মাকে জানাল না। কি জান, মেয়েটি মোটেই তার যোগ্য ছিল না; সে জানত, তাদের বিয়ে করতে দেওয়া হবে না। কেবল আমাকেই সে সব কথা বলত। মেয়েটির নাম ছিল মিংলী; একটা বার-এ কাজ করত, মদ পরিবেশন করত। কি করে তাদের বিয়ে হবে? শহরের দরিদ্র অঞ্চলে একটা ছোট ঘর নিয়ে আরও দুটি মেয়ের সঙ্গে সে থাকত। দাদাই আমাকে বলেছে, মায়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মেয়েটি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। আমি ঠিক জানি না; তবে আমার ধারণা, সে ধরনের জীবন চালাবার হয় তো অন্য কারণও ছিল। তাই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব রোম্যান্টিক মনে হত। আর সে সুন্দরীও ছিল।

কোন কোন সন্ধ্যায় দাদা আমাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যেত। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে সেই মেয়েটি ও তার বান্ধবীদের সঙ্গে আমার দেখা হত; সকলে একসঙ্গে বেড়াতাম। দাদা ও মেয়েটি হাত ধরাধরি করে হাঁটত; বেশী কথা বলত না। আমার কেমন ঈর্ষা হত; দাদার অন্য হাতটা শক্ত করে চেপে ধরতাম।

মনে হয়, মার মনে সন্দেহ জেগেছিল। আমি ঠিক জানি না। মিংলীর কথা মাকে না বললেও দাদার হাবভাবে মা বোধহয় কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। দু'একবার দাদা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই মাও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত।

তারপর একদিন ভয়ংকর ধাক্কা খেলাম। ভোরে উঠে নীচে নামলাম। বাড়িটা তখনও বন্ধ, গরম, অন্ধকার, আর চুপচাপ। কাগজওয়ালা সকালবেলাকার খবরের কাগজটা কাঠের বড় দরজাটার নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে রেখে গেছে। কাগজটা তুলে নিতেই আলো অন্ধকারে দেখলাম, তার মুখখানা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে পাল্লা খুলে দিতেই শিরোনামটা চোখে পড়ল ঃ "বার-গার্লের আত্মহত্যা ঃ ব্যর্থ প্রেম।" মেয়েটি মারা গেছে। নিজের ঘরে একাকী হাতের কব্জিটা কেটে ফেলার ফলে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে। বান্ধবীরাই তার একটা চিরকূট পেয়েছে ঃ

"আমি ভালবেসেছি, আর সেও আমাকে ভালবাসে; কিন্তু এ ভালবাসা আশাহীন ও দুঃখময়, কারণ আমাদের বিয়ে হবে না। এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। আমাকে দোষ দিও না। বিদায়।"

কাগজটা পড়তে পড়তে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। দাদা যাতে

দেখতে না পায় সেজন্য খবরের কাগজটা লুকিয়ে ফেলতে চাইলাম। কিন্তু সে তো জানতে পারবেই। তাই কাগজটাকে মেঝের উপর ফেলে রেখেই লুকিয়ে বিছানায় চলে গেলাম। তাদের দুজনের জন্য অনেক কাঁদলাম।

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, বাড়িটা চুপচাপ। তারপর দাদা ও মার গলা শুনতে পেলাম—তারা চীৎকার করছে, কান্নার শব্দ। দুই হাতে কান ঢেকে ছুটে বাগানে গেলাম।

দরজার ঘন্টাটা বেজে উঠল। পরিচিত গলা শুনতে পেলাম—আমার কাকা। ছুটে গেলাম। সদয় হাসি হেসে আস্তে আমাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে কাকা বলল, "তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব সোনা, এখন তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।" কাকা উপরে উঠে গেল।

পরদিন পুলিশ এল—একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার। সঙ্গে কাকা। হল-ঘরে, তারা মা ও দাদার সঙ্গে কথা বলল। সিঁড়ির রেলিং-এ ঝুঁকে আমি তাদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই কানে এল না। পরে দাদা আমার পাশ দিয়েই উপরে উঠে গেল—অথচ আমাকে যেন দেখতেই পেল না। তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করছে।

মনে পড়ে, তারপরেই দাদা হংকং চলে গেল। সেটা কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সেখানে এক আত্মীয়ের কাছে থেকে দাদা তার কাছে থেকে ব্যবসা শিখবে। তার সঙ্গে সকলেই বিমানবন্দরে গেলাম—আমি, মা ও ঠাকুমা। বিমানের অপেক্ষায় বসে থেকে আমরা কেক খেলাম। দাদার মুখে কথা নেই। যেন সেই হাসিখুশি দাদাই নয়। যাবার সময় আমাকে বলল, "ঠাকুমাকে দেখিস লক্ষ্মীটি।"

"দেখব—আর মাকে?" আমি বললাম।

"ওঃ, মা নিজেকে সামলাতে পারবে।"

সেকথা শুনে মা উদাস চোখ তার দিকে তাকাল।

গাড়িতে ফিরবার সময় ঠাকুমা বলল, "তুমি সব কিছুতেই বড় বেশী নাক গলাও। গাছ-গাছড়াকে নিজের মতো বাড়তে দিতে হয়।"

মা বলল, "আপনার আদরের গাছটাকে আগাছায় ছেয়ে ফেলুক তাই কি আপনি চান?"

তখন এসব কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। এখন বুঝি।

কিন্তু দাদা অল্পদিন পরেই বাড়ি ফিরে এল। হংকং-এ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল; বাড়ি ফিরল বেশ রুগ্ন ও কুঁজো হয়ে। ছোকরা-চাকরটা তাকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে তুলছে দেখে আমি কেঁদে ফেললাম।

তার পাশে বসে গল্প করতাম; অনেক সময়ই সে বিকারের ঘোরে থাকত; কখনও বা একদৃষ্টিতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকত।

জ্বলন্ত চোখ মেলে একদিন সে আমাকে বলল, "সে আমার জীবনটা নষ্ট করেছে। সে আমাকে খুন করেছে। দেখ যেন তোমাকেও খুন করতে না পারে।"

"দাদা কি বলছে?" মাকে শুধালাম।

"মদের দোকানের যে মেয়েটা ওকে ফাঁদে ফেলেছিল তার কথাই ও বলছে।" এই কথা বলে মা ঠোঁটে কুলুপ এঁটে দিল।

"কিন্তু সে আমাকে খুন করবে কেমন করে?" আমি প্রতিবাদ জানালাম। মা কোন জবাব দিল না।

মা ডাক্তার ডাকল—প্রথমে ইউরোপীয় ডাক্তার, হাসপাতাল থেকে, হংকং থেকে, লন্ডন থেকে বিশেষজ্ঞরা এল। তারপর চীনা ডাক্তার এল, তার শরীরে ছোট ছোট পিন ফোটাল, বিশেষ ধরনের ওষুধ দিল। এমন কি একজন মালয় "বোমো" কেও ডাকা হল। লোকটা যাদু জানত; নারকেল মালার তেলে ভাসমান সল্‌তে জ্বালিয়ে সে দাদার বিছানার চারধারে রেখে দিল। ঘরময় ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। দেওয়ালে ও সিলিং-এ তার ছায়া নড়তে লাগল। কিন্তু কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত সে বলল, "মেয়েটির আত্মা কবর থেকে তোমার ছেলেকে ডাকছে। তোমার ছেলে সে ডাক ফেরাতে পারছে না। সে তার কাছেই যাবে।"

তারপর থেকে মা কখনও দাদার ঘরে যেত না। নীচের হলে বসে ক্রুদ্ধ মুখে দাদার মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েকদিন পরেই দাদা মারা গেল; মাকে একবার দেখতেও চাইল না।

দাদার জন্য ঠাকুমা ও আমি অনেক চোখের জল ফেললাম। আমার শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না ঃ তবু ঠাকুমার পীড়াপীড়িতে তাকে নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলাম।

ধীরে ধীরে মৃত্যুর শোক কমে এল। বাড়িটা আর আগের মতো ফাঁকা লাগে না। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যায়ই এখানে এসে বসলে দাদার কথা মনে পড়ে ঃ বাড়ি ফিরেই সে উপরে উঠে আসত, আমার সঙ্গে কথা বলত, হৈ-চৈ করত।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম; হাল্কা পায়ে অতি দ্রুত সে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সে ঘরে ঢুকল না। সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললাম। কেউ কোথাও নেই। মা ও ঠাকুমাকে কথাটা বলতে ছুটে নীচে নেমে গেলাম। তারা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

"ভাল কথা নয়," ঠাকুমা বলল।

"কোন অনুষ্ঠানের কি আমরা বাকি রেখেছি?" মা শুধাল।

প্রতি সন্ধ্যায় পদধ্বনি শোনা যেতে লাগল; টান-টান ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আমি অপেক্ষা করে থাকি। বাড়ির বাইরে যেতে বা এঘর থেকে ওঘরে যেতে পারি না। ঘরেই থাকতাম, আবার ভয়ও করত; আমি জানতাম, একদিন না একদিন সে ঘরে আসবেই। আমি চাইতাম সে আসুক, আবার ভয়ও পেতাম। ক্রমে আমার খাওয়া বন্ধ হল, শুকিয়ে যেতে লাগলাম, ফ্যাকাসে ও চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তারপর একদিন স্বপ্ন দেখলাম। দাদা যেন আমার বিছানার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলছে, "মিংলী আমার কাছেই আছে। আমরা এখনও পরস্পরকে ভালবাসি। বিয়ে করতে চাই। মাকে এ বিয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতে হবে। মাকে বলো কোয়ান আন।"

ঘুম ভাঙতেই ছুটে গেলাম মার কাছে। কাঁপতে কাঁপতে তাকে সব কথা বললাম। মার মুখটা শক্ত হয়ে উঠল। "বটে! সেই জিতল—সবকিছু জিতে নিল!"

মা উঠে দাঁড়াল। আমার ঘর থেকেই শুনতে পেলাম, মা সারা রাত ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে।

পরদিন কাকাকে ডাকা হল। তিনজনে অনেক পরামর্শ হল। কাকা বলল, "দেখ বৌদি, তার আত্মার শান্তি যদি চাও তো এটা করতেই হবে। এখন আমাদের সব অহংকার ও ঘৃণা ভুলে যেতে হবে।"

পরদিন মা কেন যে আমাকে সঙ্গে নিল জানি না। প্রাতরাশের পরে গাড়িটা আনা হল। আমরা শহরের একটা দরিদ্র অঞ্চলে পৌঁছে গেলাম। মার পিছন পিছন দোকানের উপরকার একটা অন্ধকার ছোট ঘরে গিয়ে উঠলাম। সেখানে একটি পুরুষ ও একটি নারী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পুরুষটি শীর্ণকায়, মাথার চুল পাকা, নারীটি স্থূলকায়, কিন্তু মুখ বলীরেখায় ভর্তি। তাদের পরনে জীর্ণবাস, ঘরে আসবাবপত্র কিছু নেই বললেই চলে, প্রার্থনা-বেদীর উপর মিংলীর একখানা ফটো ঝোলানো রয়েছে। মা তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। মাকে খুব ক্রুদ্ধ মনে হল। সবকিছু বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এটা বুঝলাম যে এরাই দাদার প্রেমিকার বাবা-মা, আর মা চেষ্টা করছে তাদের মৃত কন্যার সঙ্গে আমার মৃত দাদার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে।

পুরুষটি বলল, "ওরা যখন বেঁচেছিল, তখন তো আপনি এটা চান নি। তাহলে আজ তাদের বিয়ে দিতে চাইছেন কেন?"

"কারণ আমার ছেলের জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার মেয়ে তাকে কবরেও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। সেই আমার ছেলেকে মেরেছে।"

"না। তাকে মেরেছেন আপনি। ঠিক যেমন আপনি আমার মেয়েকেও মেরেছেন।"

এসব দেখে শুনে আমি তো হতভম্ব। ভেবেছিলাম মা খুব রেগে যাবে, চেঁচামেচি করবে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা নীচু করে মা চুপচাপ বসে রইল। তারপর ঘৃণাভরা চোখ তুলে বুড়োর দিকে তাকাল।

"তারা এ বিয়ে চায়। আমিও তাতে রাজী হয়েছি।"

"নিশ্চয় যথাবিহিত অনুষ্ঠানই করা হবে। সেই তো হবে প্রথমা স্ত্রী?"

মা মাথা নাড়ল।

"কন্যা-পণ দেবেন?"

মা আবার মাথা নাড়ল। "একজন পুরোহিত ও ঘটক পাঠিয়ে দেব। তাদের তোমার মেয়ের কবরে নিয়ে যেয়ো।"

বাড়ি ফিরবার পথে মা একটাও কথাও বলল না।

ক'দিন পরেই মিংলীর সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়ে গেল। পুরোহিত ও ঘটক ফুলে সাজানো বড় গাড়িতে করে মিংলীর আত্মাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এল। গাড়ির বনেটের সামনে একটা কনে পুতুল বাঁধা ছিল। পুরো ব্যাপারটাই মার না-পছন্দ ছিল ঃ তবু যথাবিহিতভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য মা কাকাকে ছাড়া আরও অনেক বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করে আনল।

পুরোহিত ও ঘটক যখন বাড়িতে এল তখন আমি হলঘরেই ছিলাম। মা, ঠাকুমা ও কাকা বসল এক দেওয়াল জুড়ে, আর অতিথিরা বসল অন্য দেওয়াল বরাবর; দুই আত্মার মধ্যে পরিণয়-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল, মাঝখানে পারিবারিক প্রার্থনা-বেদীর সামনে। পরে অদৃশ্য দম্পতি যখন পূর্বপুরুষের স্মৃতি-ফলক ও পারিবারিক দেবতাদের সামনে প্রণাম নিবেদন করল তখন আমরা নীরবে তা দেখলাম। আত্মীয়রা মুখ তুলে দেখল, অদৃশ্য কনেটি মা ও ঠাকুমাকে চা খেতে দিল। তারপর কাগজ ও ভৌতিক টাকায় তৈরী দামী দামী সব উপহার পোড়ানো হল যাতে অন্য জগতে গিয়ে দম্পতি সেটা ব্যবহার করতে পারে। অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হল চমৎকার বৈবাহিক ভোজ।

মা পাথরের মতো কঠিন মুখে বসে রইল; একটা কথাও বলল না। মদ পরিবেশনের পর অতিথিরা ক্রমে ভুলেই গেল যে তারা এসেছে ভূতের বিয়েতে। কাকা আগেই নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল।

তারপর থেকে আর কোন স্বপ্ন দেখিনি। সিঁড়িতে কোন পায়ের শব্দ শুনি নি। স্কুলে যেতে লাগলাম। শনিবার সকালে বন্ধুদের সঙ্গে শহরে গিয়ে আইসক্রিম খেতাম, পিকনিকে যেতাম, খেলাধূলা করতাম। একবার মা আমাকে নিয়ে হংকং গেল আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে। মাঝে মাঝে মা কোন পাহাড়েও যেত ছুটি কাটাতে। ঠাকুমা মারা গেল। শেষের দিকে সে প্রার্থনা-বেদীর পাশে তার চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকত। একদিন মাকে বলল, "অচিরেই আমি তোমার ছেলে ও তার স্ত্রীকে দেখতে পাব। তাদের জন্য কোন খবর পাঠাবে কি?"

মা কখনও দাদার কথা বলত না। ঠোঁট শক্ত করে বলল, "এ বিয়ে করে আমাদের অমর্যাদা করা তার উচিত হয় নি। তাকে বলার আমার কিছুই নেই।"

.ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টিও খুব বড় মাপের হয়েছিল। সিঙাপুর ও মালয়ের প্রবীণ চীনাদের মধ্যে তার অনেক বন্ধু ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত বাড়িটা লোকজনে ভর্তি ছিল।

মা বলল, "আমি মনে করি, আমাদের একবার ইওরোপ ভ্রমণে যাওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগে সে দেশটা তোমার দেখা উচিত।"

এইভাবে আমার সতেরো বছর বয়সে আমরা ইওরোপ গেলাম। ইতালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, এমন কি স্পেন ঘুরে বেড়ালাম। কোন কোন স্থানে মার বন্ধু বা আত্মীয়রা ছিল; তারাই সব ঘুরিয়ে দেখাল। লন্ডনে আমার এক কাকা ছিল। কেন্টের একটা ছোট গ্রামে ছিল আর এক কাকা ও কাকিমা। হ্রদ অঞ্চল, এডিনবরা ও স্ট্র্যাটফোর্ডেও গেলাম। দিনগুলি চমৎকারভাবে কেটে গেল। তবু সিঙ্গাপুরে ফিরে বিমান থেকে নামতেই খুবই ভাল লাগল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আমি সাহিত্য পড়লাম, কারণ মার মতো আমারও সাহিত্যেই আগ্রহ আর অনেক বছর ধরেই লেখালেখি করেছি।

প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার ঠিক আগে। মনে হয়, উদ্বেগবশত বড় বেশী পড়াশুনাই করছিলাম। স্নায়ু-বিকারের ফলে আমার একটু জ্বর জ্বর ভাবও হয়েছিল। মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমার মন-মরা বিষণ্ণ ভাবটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। কেন যে এরকম হল বুঝতে পারলাম না। তারপর একদিন সন্ধ্যায় ঠিক এইখানে বসেছিলাম মন মেজাজ খারাপ করে, আর ঠিক তখনই আবার সেটা শুনতে পেলাম—সিঁড়িতে সেই পদধ্বনি; এবার আরও ভারী; আরও ধীরগতি। জানতাম দাদা এসেছে। আরও জানতাম, এঘরে সে ঢুকবে না। দরজার কাছে এসে পদধ্বনি থেমে গেল।

মাকে কিছুই বললাম না। অকারণে তার দুশ্চিন্তা বাড়াতে চাইলাম না। একবার মনে হল, ভুল শুনেছি। যা শুনেছি সেটা আমার অসুস্থ মনের কল্পনামাত্র।

কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায়ই সে পদধ্বনি শুনতে পেতাম। বুঝলাম, আমার দাদাই ফিরে এসেছে।

একদিন রাতে সে স্বপ্নে এসে দেখা দিল; দাঁড়াল আমার বিছানার পায়ের কাছে। "অন্য জগতে আমি বড় কষ্টে আছি। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমরা আলাদা হয়ে গেছি। তাকে বিয়ে করা উচিত হয় নি। তার আর আমার পথ এক নয়। আমি বাড়িতে ফিরে যেতে চাই। মাকে বলো।"

মাকে বললাম। তার চোখে খুশির ঝিলিক দেখা দিল। একটু মৃদু হাসিও। "আমি জানতাম সে ভুল করেছে। অকারণ অর্থব্যয়—তাও একটা বার-গার্লের জন্য। আমার কথাই ঠিক হল।" একটু থেমে বলল, "তাকে তো এ বাড়ি থেকে ফেরাতে পারি না। সে বরং তার পুরনো ঘরটাতে থাকুক। কিন্তু সে তো এখন বড় হয়েছে, কাজেই ঘরটাকে বেশ কিছু অদল বদল করে দেওয়া দরকার।"

ছুতোর মিস্ত্রিকে ডাকা হল। ওখানকার দরজাটাকে তক্তা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হল; ফলে যে সিঁড়িটা দিয়ে এখানে এবং তার ঘরে যাওয়া যেত সেটা দিয়ে এখন শুধু তার ঘরে যাওয়া যায়। মার ও আমার আসা যাওয়ার জন্য অন্য দিকে আর একটা সিঁড়ি বানানো হল। ছেলের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে আত্মীয়-বন্ধুদের একটা মজলিসের ব্যবস্থা করা হল। তার ঘরটা পরিষ্কার করা হল। দরকার মতো সব জিনিসপত্র এনে রাখা হল। এইভাবে আবার আমরা একত্রে বাস করছি। প্রতি রাত্রে আমি শুনতে পাই, দাদা তার ঘরে ফিরে আসছে।

কোয়ান আনের কথা বন্ধ হল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাপিয়ে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল, চি-চক্-চক্।

কোয়ান আন উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিল। হলুদ আলোয় ঘরটা ভরে গেল; আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল তার গল্পের রহস্যময়তা।

তার শান্ত মুখের উপর আলো পড়ে চিকচিক করছে। আমার দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হেসে বলল, "প্রিয়জনের মৃত্যুর উপরে একটা প্রাচীন কবিতা আছে ঃ "রেশমী আস্তিনের কোন খসখস শব্দ নেই। নেই মেঝের উপরে কোন পদধ্বনি।" সেদিক থেকে আমার ভাগ্য ভাল। প্রতি রাতে আমি দাদার ফিরে আসার পায়ের শব্দ শুনতে পাই। চৌকাঠে ভেজা পাতা লেগে থাকে।

স্বীকার করতে বাধা নেই, দাদার প্রেতাত্মা সম্পর্কে যে যাই বলুক বাকি সময়টা আমার খুব অস্বস্তিতে কাটল; দোতলার ঘরটা ছেড়ে নীচের হলঘরের স্বাভাবিক বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সাদা কুর্তা ও কালো ট্রাউজার পরে বুড়ি কাঠের মেঝেতে চপ্পলের শব্দ করে

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে সোনা বাঁধানো দাঁত বের করে হাসল। "আপনি কি এখন বাইরে যাবেন তুয়ান?" বলে সামনের দরজাটা খুলে দিয়ে ফটকের আলো জ্বেলে দিল। বাগানের তাজা বাতাসে আর দূরের বড় রাস্তার যানবাহনের শব্দ ঘরটাকে ভরে দিল।

কোয়ান আন কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমার আগ্রহের কথা জানে বলেই দেওয়ালের চীনা ভাষার সোনালী লেখাগুলোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"এগুলোর কথা তোমাকে কখনও বলেছি মনে হয় না। এতে আমাদের পরিবারের কাম্য সব রকম শুভেচ্ছার উল্লেখ রয়েছে—যেমন স্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, আনন্দ, দীর্ঘায়ু, সহিষ্ণুতা, আত্মার শান্তি, বংশবৃদ্ধি .....

জানতে চাইলাম, "এসব শুভেচ্ছাই কি তোমাদের পরিবারে ফলবতী হয়েছে?"

সে জবাব দিল না। মনে হল, আমার প্রশ্নটা সে শুনতেই পায় নি। তার মুখখানি তখনও প্রশান্তিতে ভরা, হাসিটি গম্ভীর, মাথাটা ঈষৎ হেলানো, একটা হাত প্রত্যাশায় উপরে তোলা। অপর সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে সে কান পেতে আছে দাদার পদধ্বনি শোনার আশায়।

মধ্যরাতের রহস্যময়ী নারী

ওয়াশিংটন আরভিং

সেটা ছিল এক ঝড়ের রাত। ফরাসি বিপ্লবের আগুনশিখা জ্বলে উঠেছিল চারপাশে। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ক্রমশই মুখর হচ্ছে। এই পটভূমিতে আমরা জার্মান দেশীয় এক যুবকের কথা বলব। রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। প্যারিস শহরের পুরোনো অংশে সে এখন হেঁটে চলেছে। আলোকশিখা ক্রমশই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। আকাশের এখানে সেখানে সর্বনাশা বজ্রপাতের সংকেত। সংকীর্ণ গলিপথে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। কিন্তু সবথেকে আগে ওই জার্মান যুবক সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের বলা দরকার কারণ সে-ই হল এই গল্পের এক হতভাগ্য নায়ক।

তার নাম গটফ্রায়েড উলফ গ্যাঙ্গ। অভিজাত পরিবারে জন্ম হয়েছিল তার। বেশ কিছুদিন সে গোটিনজেন শহরে পড়াশোনা করেছিল। একদিকে কল্পনাবিলাসী অন্যদিকে আশাপ্রদ—এই দুই বিপরীতমুখী সত্তার প্রতিফলন ঘটে গেছে তার মনের দর্পণে।

কিছুদিন বন্য উগ্রতায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াল উদ্দেশ্যহীনভাবে—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সেইভাবে চিন্তাভাবনা করল না।

অবশ্য জার্মান দেশের অনেক ছাত্রই এই রোগে ভুগে থাকে। একাকীত্বের জীবনদর্শন, তীব্র দহন এবং নিঃসঙ্গতার জ্বালা তার শরীর ও মনকে করল নিঃস্ব, রিক্ত ও ক্লান্ত। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, কল্পনা হল বিষাদগ্রস্ত। মাঝেমধ্যেই সে আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে স্বজগৎ কল্পিত চিন্তাধারায় মগ্ন থাকত। চারপাশে নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছিল, সোয়েডেনবার্গের মতো।

তারপর? তারপর সে জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা পোষণ করত। এই ধারণার অন্তরালে কোন্ বিশেষ কারণ নিহিত আছে তা আমার জানা নেই। সে ভাবল জীবনের সর্বত্র বোধহয় একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিচ্ছুরণ ঘটে যায়। শুধু তাই নয়, এমন কিছু আধিদৈবিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে যা মানুষকে সবসময় নিয়ন্ত্রিত করে। ধীরে ধীরে তার মন আচ্ছন্ন হল এই চিন্তাধারায়। আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে উঠল সে। আরও বিরক্ত ও জীবনযাত্রার প্রতি তীব্র অনীহা। এবার সে কী করবে?

বন্ধুরা তার জন্য প্রার্থনা করল। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে বলল স্থান পরিবর্তন করলে তার এই মনোভাবের পরিবর্তন হতে পারে। তাই সে চলে এল প্যারিস নগরীতে, বাকি পড়াশোনা শেষ করবে বলে। আর প্যারিস যাকে আমরা যৌবনের তীর্থক্ষেত্র বলতে পারি।

গটফ্রায়েড উলফ গ্যাঙ্গ যখন প্যারিসে আসে তখন প্যারিসের চারদিকে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। প্রথমদিকে এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিল এক পৈশাচিক উন্মাদনা। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তা কমে এসেছে। প্যারিসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নায়কটি, সেখানকার রাজনৈতিক এবং দার্শনিক মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হল। কিন্তু এই রক্তপাতকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত, তাই রক্তাক্ত-বিপ্লবের জগৎ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করল।

প্যারিসে এসে কিন্তু তার স্বাস্থ্য, বা মনের খুব একটা উন্নতি হল না।

সে থাকত ছাত্রদের কোয়ার্টার পেস ল্যাটিনে। সেখানকার একটা অ্যাপার্টমেন্টে সম্পূর্ণ একা, বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। মাঝেমধ্যে সে ... সংকীর্ণ গলিপথে হাঁটতে হাঁটতে, দু'পাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজস্ব অনুমানগুলো ভাবত। আবার কখনো সে প্যারিসের বিখ্যাত গ্রন্থাগারে গিয়ে বইয়ের জগতে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকত। যেসব লেখকরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের রচনা পড়তে সে খুব ভালোবাসত। শুধু তাই নয়, সে পড়ত সেই সব লেখা, আপাতত যার কোনো মূল্য নেই, যারা ধূলিধূসরিত শয্যা পেতেছে। এইভাবে সে অ-স্বাস্থ্যকর বইয়ের খিদে আরও বাড়িয়ে তুলত। সংক্ষেপে বলা যায় এইভাবেই সে সাহিত্য জগতের এক অবাঞ্ছিত আগন্তুক হয়ে উঠছিল। ক্ষয়প্রাপ্ত সাহিত্যচর্চায় হয়ে উঠেছিল এক এবং অদ্বিতীয়।

উলফ গ্যাঙ্গ তার এই নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শুদ্ধতা বজায় রেখেছিল। আসলে সে কল্পনার জগতে বাস করতে ভালোবাসত। এই বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে কোন সংযোগ ছিল না। সে ছিল খুব লাজুক প্রকৃতির, চট করে কারো সাথে মিশতে পারত না। কখনো কোন বন্ধুমহলে তাকে দেখা যায়নি। তবে সে নারীসৌন্দর্যের এক কামনামদির উপাসক ছিল।

মাঝেমধ্যেই সে তার একাকীত্বের নিজস্ব যন্ত্রণাদগ্ধ দ্বিপ্রহরে বিভিন্ন নারীর মুখাবয়ব কল্পনা করত। তার কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়া দিগদিগন্তে কোথায় ছুটে যেত কে জানে, এইভাবেই সে বোধহয় তার নিজস্ব জগতের মধ্যে একটি আলোকিত উদ্যানের সন্ধান করেছিল, যেখানে শুধুই সুন্দরী রমণীদের মুখের ছবি শোভা পাচ্ছে।

দিন এগিয়ে চলে, উত্তেজনা বাড়তে থাকে, উন্মাদনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। স্বপ্ন দেখা জগৎটা ক্রমশ দিগন্তবিস্তৃত হচ্ছে, সে একটা মুখচ্ছবি দেখতে পেল। আহা! এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য সত্যিই কি সম্ভব? বারবার চোখ বন্ধ করলেও সে একই মুখ দেখতে পায়। তখন সে একেবারে উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠছে। আসলে ওই ছলনাময়ী নারীর মুখটা সমগ্র দিনের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করেছে, রাতের স্বপ্নকে করেছে আচ্ছাদিত। সংক্ষেপে বলা যায় সে সবসময় স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে ভালোবাসে। কোন কাজে তার মন বসছে না। একক যন্ত্রণাদগ্ধ-প্রহর কাটছে শুধু ওই কল্পিত মুখটির দিকে তাকিয়ে।

হয়তো এটাই উন্মাদ অবস্থার প্রাক্‌মুহূর্ত।

এটাই হল গটফ্রায়েড উলফ গ্যাঙ্গের মানসিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কাহিনী। ঠিক এইসময় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, মুখোমুখি নয়, কালো কালির আমন্ত্রণে। সেই বৃষ্টিমুখর ঝড়ো রাতে সে বাড়ি ফিরছিল, মারাইসের পুরোনো সংকীর্ণ গলিপথের মধ্যে দিয়ে। মারাইস হল প্যারিস নগরীর সবচেয়ে প্রাচীন অংশ, যে অংশ এখনও আভিজাত্যের এবং পরম্পরাকে বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। মাঝেমধ্যেই বজ্রপাতের হুঙ্কার রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিচ্ছিল। সে এসে দাঁড়াল প্লেসে গ্রিভে। এই জায়গাটিতে সবসময় ফাঁসি দেওয়ার মতো জঘন্য কাজটি করা হয়। সেখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উলফ গ্যাঙ্গের মনে কিরকম যেন এক বাতাবরণের সৃষ্টি হল। সে সুপ্রাচীন হোটেল ডে ভিলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার সামনে ধূ ধূ বিস্তৃত শূন্যতা। এ চতুষ্কোণ অঞ্চলটি পার হবার সময় হঠাৎ তাকে এক প্রচন্ড ভয় এসে গ্রাস করল। সে দেখতে পেল একটি গিলোটিন যন্ত্রের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। এই যন্ত্রটি আতঙ্ক এবং অভিশাপের প্রতীক। এই যন্ত্রটির মাধ্যমে কত মানুষের জীবনদীপ নিভে গেছে। এর সর্বত্র লেগে আছে রক্তের দাগ, তার সমস্ত চিন্তাধারা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সে অবাক চোখে তাকাল সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রটির দিকে। তার কেবল মনে হল, এই যন্ত্রটি বুঝি তার নতুন শিকারের সন্ধানে মগ্ন।

এখন সে কী করবে? তার হৃদস্পন্দন হয়েছে দ্রুততর, সমস্ত শরীরে জেগেছে শিহরণ। সে ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলোর কথা চিন্তা করতে লাগল। এবার কি তাকে ছুটতে হবে? এই জঘন্য নরকের অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ চমকে আলো ঝলসে উঠছে; একী? কাকে দেখতে পেল চোখের সামনে? এক নারীমূর্তি—সম্পূর্ণ কালো পোশাকে ঢাকা।

সেই মূর্তিটি কোথায় বসে আছে? একটি বেদির সোপানে। সামান্য ঝুঁকে

আছে সামনের দিকে। সে কোলের মধ্যে তার মুখ লুকিয়েছে, অথচ তার কেশরাশি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টিস্নাতা এই মহিলা মধ্যরাতে তাকে কী বার্তা শোনাবে?

উলফ গ্যাঙ্গ ভাবল এখানে সে একমুহূর্ত থাকবে না। পরমুহূর্তে তার মনের মধ্যে অন্যতর এক ভাবনার অনুরণন। সে ভাবল সেই স্বপ্নে দেখা নারীই বোধ হয় এই সোপানে উপবিষ্টা। এর সাহচর্য পেলে আমি আমার রুক্ষ ক্লান্ত জীবনের অবসান ঘটাতে পারব।

এই মেয়েটিকে আমি কি রাতে স্বপ্নে এবং দিনে প্রলাপের মধ্যে দেখে থাকি? তখন আর কিছুই ভাবতে পারছে না সে। তার মনে বিভিন্ন ভাবনারা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এখন সে কী করবে? এখন সে কি সত্যি সত্যিই এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবে? সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করল সে, মনে হল সময় অনন্তকালের দিকে বয়ে চলেছে।

এক পা এক পা করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল আমাদের হতভাগ্য নায়কটি। ধীরে ধীরে পৌঁছে গেল সেই কালো পোশাক পরিহিতা রহস্যময়ী নারীর দিকে। এবার রমণী বোধহয় তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সে মাথাটা একটু তুলল, তাকাল ছেলেটির দিকে, তার দুটি চোখের তারায় এক আশ্চর্য বন্যতা ঠিকরে বেরোচ্ছে। ছেলেটি এবার অবাক হল, এইতো বজ্রপাতের আলোকশিখায় উদ্ভাসিত মুখখানি, একেই তো আমি দেখেছি আমার স্বপ্নের মধ্যে। হ্যাঁ, সেই বিষণ্ণতার ছাপ, সেই একাকীত্বের যন্ত্রণা, অথচ কী এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যমাখা। উলফ গ্যাঙ্গের সমস্ত সত্তায় তখন এক হিংস্র-উন্মাদ এবং পরস্পর বিরোধী আবেগের সঞ্চরণ। উলফ গ্যাঙ্গ আবার মেয়েটির দিকে তাকাল। এখন উলফ গ্যাঙ্গ কি কিছু বলবে? কিন্তু কীভাবে নীরবতার প্রহর সে ভাঙবে?

মেয়েটি ইঙ্গিত করা দৃষ্টিতে তাকাল ওই ভয়ঙ্কর গিলোটিনের দিকে।

তারপর সে নিজেকে ভাসিয়ে দিল তার বেদনক্লান্ত কন্ঠস্বর—এ পৃথিবীতে আমার কোন বন্ধু নেই।

উলফ গ্যাঙ্গ বলল—কিন্তু তোমার তো একটা থাকার জায়গা আছে।

ঈষৎ হেসে মেয়েটি বলল—হ্যাঁ, কবরের অন্ধকারে।

এই কটি শব্দ জার্মান দেশীয় যুবকের হৃদয় গলিয়ে দিল।

উন্মাদের মতো ছেলেটি বলতে থাকে—যদি আমাকে তুমি তোমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো তাহলে কতই না ভালো হবে। দোহাই তোমার, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমি একজন বন্ধুর জন্য দারুণ উদগ্রীব। প্যারিস শহরে আমার

কোন সহচর নেই। এই বিদেশে আমি একেবারে একা। তবে আমি কি তোমায় সাহায্য করব? আমি কি তোমার বন্ধু হতে পারি? এসো, অনেক কথা জমে আছে আমার বুকের মধ্যে। তোমার কাছে সব কথা খুলে বলে আমি ভারমুক্ত হই।

গরগর করে অনেক কথাই বলে গেল উন্মাদ উলফ গ্যাঙ্গ। ভাবতে পারল না এমন সাহস সঞ্চয় করেছে কীভাবে? উলফের কথার মধ্যে বিদেশী টান দেখে বোঝা গেল সে প্যারিসের সেই নাছোড় যুবকদের মতো নয়—যারা মেয়ে দেখলেই লোভী কুকুরের মতো ছুটে আসে।

মেয়েটি কি তার ব্যবহারে খুশি হয়েছে? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। মেয়েটি এখন কী করবে? সে কি তার আমন্ত্রণে সাড়া দেবে? নাকি .....

সেই বিদেশী যুবকটিকে উপেক্ষা করবে?

ধীরে ধীরে ছেলেটি আরও সামনের দিকে এগিয়ে আসে। এই তো এখানেই তো সেই কুখ্যাত ... এখানেই তো আছে চতুর্থ হেনরির স্ট্যাচু, যা ক'দিন আগে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার বজ্রপাতের শব্দ, বৃষ্টি এবার জোরে পড়তে শুরু করল। সমস্ত প্যারিস এখন শান্ত, কিন্তু একটু আগে সেখানে ছিল মানুষের উদগ্র রাগের বিস্ফোরণ, পরবর্তীকালের অগ্ন্যুৎপাতের জন্য মানুষ এখন প্রস্তুত হচ্ছে। এখন কী করবে এই সদ্য আলাপিত যুবক-যুবতী?

ছেলেটি কি পেস ল্যাটিনের সেই সংক্ষিপ্ত গলিপথে ফিরে যাবে? হেঁটে বেড়াবে সরবনের ধূলিধূসরিত দেওয়ালগুলোর পাশ দিয়ে? নাকি যে পুরোনো সংকীর্ণ স্যাঁতস্যাঁতে হোটেলে সে আশ্রয় পেয়েছে, সেখানেই চলে যাবে? না, তার দুঃখ আরও পরিপূর্ণ হচ্ছে। উলফ গ্যাঙ্গ বুঝতে পারছে না এখানে তার থাকাটা উচিত হবে কি না।

কিন্তু এবার যে তাকে কিছু একটা করতেই হবে? কীভাবে সে মনের ভাব ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করবে?

এরপর আমরা একটি অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা দেখতে পেলাম। সামনে হাঁটছে ছেলেটি, আর তাকে অনুসরণ করছে রহস্যময়ী ওই নারী। দেখতে দেখতে ছেলেটি তার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেল। এই প্রথম সে তার বাসস্থানে অগোছালো বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে লজ্জা পেল। এত উদাসীনতা জমে আছে প্রতিটি কোণে কোণে? তার একটি মাত্র থাকার ঘর—একটা পুরোনো দিনের সালুন, হারানো সভ্যতার চিহ্নমাখা। এই জায়গায় মেয়েটিকে আনা বোধহয় ঠিক হয়নি, আসলে লাক্সেমবার্গে প্যালেসের মধ্যস্থিত এই জায়গাটায় আভিজাত্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নেই কোন আধুনিকতার দিকচিহ্ন। এক সময় এই স্থানে

অভিজাত শ্রেণীর মানুষ বসবাস করত। ঘরের কোণে কোণে অসংখ্য বই ও কাগজপত্রের ছড়াছড়ি, তারই মধ্যে একজন ছাত্রের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একক খাটটি একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

আলো জ্বেলে দেওয়া হল, এবার উলফ গ্যাঙ্গ সদ্য পরিচিতা ওই মেয়েটিকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ পেল। হ্যাঁ, স্বপ্নে সে যেমনটি দেখে থাকে, এ তার থেকে বেশি সুন্দরী। কিন্তু সমস্ত মুখমন্ডলে এমন নির্লিপ্তির ছায়া কেন? সে কি কোন কারণে বিষণ্ণা? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না, তার কালো কুচকুচে চুল একটু আগে বৃষ্টিতে ভিজেছে, চোখ দুটি বড়ো এবং উজ্জ্বল। মনে হয় সে বোধহয় বন্যতার মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। তার কারণ পোশাকের সাথে তার শারীরিক অবয়বের মিল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে তারা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে, সব মিলিয়ে সে সত্যি রহস্যের এক চলমান নিদর্শন, যদিও তার পোশাকের মধ্যে পারিপাট্যের অভাব আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে এটি বুঝি তার আলগা সৌন্দর্যের পরিচায়ক। একটিমাত্র গয়না সে পরেছে তার গলদেশে, একটি কালো ব্যান্ড, সেখানে হীরক দ্যুতির সৌন্দর্য চোখে পড়ছে।

এতক্ষণ তাৎক্ষণিক উন্মাদনায় ভরা ছিল যুবকটির মন। এবার সে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে এল। সে কীভাবে এই অসহায়াকে সাহায্য করবে? কাঙ্খিত নিরাপত্তা দেবে? সে ভাবল এই ছোট্ট ঘরটি ওই রাতের অতিথির জন্য ছেড়ে দেবে। সে অন্য কোথাও শুয়ে থাকবে। কিন্তু ওই অজানা মেয়েটির শারীরিক এবং মানসিক সৌন্দর্যে সে এত বিমোহিত হয়ে গেছে যে, সে সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে পারল না। মনে হল কেউ যেন তাকে সম্পূর্ণভাবে সম্মোহিত করেছে। কথারা হারিয়ে গেছে। এমন কি সে একমুহূর্তও অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবতেও পারছে না।

এবার মেয়েটির কথা কিছু বলা দরকার। মেয়েটি কিন্তু গিলোটিন সম্পর্কে কোন কথা বলছে না। মনে হয় তার দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার কিছুটা উপশম হয়েছে। আসলে এই যুবকটির সংস্পর্শে এসে সে বোধহয় কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে তার হৃদয়-মোম গলতে শুরু করেছে। যুবকটি সম্পর্কে সে অনেক কিছু জানতে আগ্রহী, তারা একে অন্যকে বোঝবার চেষ্টা করবে এখন।

সময় এগিয়ে গেল। উলফ গ্যাঙ্গ ভালোভাবে তাকাল মেয়েটির দিকে। এবার ধীরে ধীরে সে মেয়েটিকে বলল তার স্বপ্নের কাহিনী। কীভাবে ওই মেয়েটি ইতিমধ্যেই তার হৃদয় হরণ করেছে। সেই অবিশ্বাস্য ইতিহাস। ছেলেটির বলার মধ্যে এমন এক আন্তরিকতা ছিল, মেয়েটি অবাক হল। আরও কাছে আসার চেষ্টা

করল। প্রগাঢ় আর্তিতে ভরে উঠল তার সমস্ত হৃদয়।

আসলে এই ঘটনার অন্তরালে বিশ্বাস অথবা তর্কের কোন স্থান নেই। এখানে যা কিছু ঘটেছে তাকে আমরা এক অলৌকিক অভিপ্রায় বলতে পারি। এক সময় পৃথিবীতে এমন অনেক কষ্টকল্পনার জন্ম হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা এসব কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখনও পৃথিবীতে উলফ গ্যাঙ্গের মতো কিছু মানুষ বেঁচে আছে, যারা মধ্যযুগীয় কষ্টকল্পনাগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে জার্মান দেশীয় যুবকটি বলল—আমরা কেন আলাদা থাকব? আমাদের হৃদয় এক হয়ে গেছে। আমরা কেন পৃথিবীর বুকে একসঙ্গে বেঁচে থাকব না? আমাদের দুটি আত্মা কি কখনো এক হতে পারবেনা?

এই কথাগুলো মেয়েটির মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল?

ছেলেটি তখনও উন্মাদের মতো বলে চলেছে—তোমার কোন বাড়ি নেই, কোন পরিবার নেই, আমার সবকিছু আমি তোমাকে সমর্পণ করব। তুমি নিজেকে আমার প্রতি নিবেদন করো। কথা দিচ্ছি, আমি সারাজীবন এভাবেই তোমার জন্য বেঁচে থাকব।

এই প্রথম ওই অজানা মেয়েটি একটু হাসল, বিষণ্ণতা ঝরে পড়ছে ওই হাসির মধ্যে। সে বলল—চিরদিনের জন্য?

উলফ গ্যাঙ্গ আবার বলল—হ্যাঁ, চিরদিনের জন্য।

এবার মেয়েটি হাততালি দিল। খুশি ছড়িয়ে পড়ছে তার সমস্ত তনুবাহারে। সে বলল—তাহলে আমি তোমার, ফিসফিস কণ্ঠস্বরে। আর সে এল, আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল দুই তরুণ-তরুণী।

পরদিন সকাল হল। যেন সদ্য বিবাহিতা এই মেয়েটি তখনও ঘুমিয়ে আছে। এবার ছেলেটিকে বাইরে যেতে হবে। বড়ো অ্যাপার্টমেন্টের সন্ধান করতে হবে। বেরিয়ে গেল সে একরাশ খুশি নিয়ে। যখন সে ফিরে এল, দেখল তখনও সেই রাতের রহস্যময়ী নারীটি বিছানায় শুয়ে আছে। তার মাথাটা অদ্ভুতভাবে ঝুলছে, একটি হাত তার ওপর স্থাপিত।

ছেলেটি তাকে ডাকল, কিন্তু কোন উত্তর পেল না। এবার সামনে এগিয়ে এল, তার হাতে হাত রাখল। এ কী? এত ঠান্ডা কেন? হৃদয়ে কোন স্পন্দন নেই, তার মানে? মুখের দিকে তাকাল, না, মুখটি বিবর্ণ রক্তশূন্য এবং ফ্যাকাসে। সংক্ষেপে বলা যায় ওই নারী তখন মৃতদেহে পরিণত হয়েছে।

ভীষণ ভয় পেল সে, চিৎকার করে ডাঁকল সবাইকে। তার মনে নানা বিপরীত ধারণার অনুরণন। পুলিশ এসে গেল। পুলিশের একজন অফিসার ঘরে

ঢুকলেন, তিনি এই মৃতদেহের দিকে তাকালেন।

তারপর চিৎকার করে বললেন—হায় ভগবান, এই মেয়েটি এখানে এল কী করে?

উলফ গ্যাঙ্গ উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল—স্যার, আপনি কি একে চেনেন?

অফিসার বললেন—হ্যাঁ, গতকালই তাকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়েছে।

উনি এগিয়ে গেলেন। মৃতদেহের গলায় যে কালো কলারটি ছিল সেটি ধরে টান দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কর্তিত মুন্ডটি মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

এবার বোধহয় উলফ গ্যাঙ্গের অবাক হবার পালা। তার মানে? পিশাচ আমাকে ভর করেছিল? আমার সর্বস্ব খেয়েছে, এই ডাইনি সর্বনাশী? আমি চিরদিনের জন্য হেরে গেলাম .....

অনেকে ছেলেটিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুই হল না। চোখ বন্ধ করলেই সেই রমণীর কথা মনে পড়ে যায় তার? আসলে একটি মৃতদেহ তখন তার সমস্ত সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে আছে। শেষ পর্যন্ত ছেলেটির স্থান হল এক উন্মাদাগারে।

এভাবেই ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর গল্প শেষ করলেন।

জিজ্ঞাসু চোখে আমি জানতে চাইলাম—স্যার, সত্যি কি এটা এক বাস্তব ঘটনা?

উনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ, আমি প্যারিসের এক উন্মাদাগারে ছেলেটিকে দেখেছি। নিজের মুখে সব কথা সে আমাকে বলেছে। এরপরেও কি তাকে অবিশ্বাস করা যায়?

সেই পাখীরা

আলফ্রেড হিচকক

কিছুদিন আগে পর্যন্ত শরতের বাতাস বইছিল। আবহাওয়া ছিল নরম নাতিশীতোষ্ণ। কিন্তু ৩রা ডিসেম্বর যেন মুহূর্তের মধ্যে আবহাওয়া তার পোশাক পরিবর্তন করল—শীত শুরু হল, কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাটি যেখানে ফেটেছে এখন সেখানে মাটি সরস।

ন্যাট হকেন যুদ্ধে আহত। তাই সে এখন পেনসন-ভোগী। সে ফার্মে পুরো সময় কাজও করে না। সপ্তাহে তিনদিন সে কাজ করে। ওরা তাকে যৎসামান্য হাল্কা কাজই দিয়েছে। সে বিবাহিত এবং জনক। কিন্তু সে একা থাকতে এবং একা কাজ করতে ভালবাসে। চাষের জমিকে সমুদ্র যেখানে দুদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে সেই ব-দ্বীপের শেষ প্রান্তে—বাঁধ তৈরী বা গেট মেরামতের কাজ পেলে সে সবচেয়ে খুশী হয়। কাজ করতে করতে যখন দুপুর হয়, তখন সে কিছুক্ষণের জন্য তার কাজ থামিয়ে দেয়। সেই সময়টুকুতে সে স্ত্রীর হাতে সেঁকা মাংসের পিঠে খায় আর পাহাড়ের ধারে বসে মুগ্ধ হয়ে পাখী দেখে।

শরতের পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে ব-দ্বীপে উড়ে আসে। ওরা সারাদিন চঞ্চল, অসহায় গতিতে নিজেদের ক্লান্ত করে রাখে। ওদের দুর্বার গতি কখনও আকাশের বুকে, কখনও সদ্য চষা উর্বর জমিতে শস্যের সন্ধানে। ওরা যখন সেই শস্য-দানা খায়, তখন দেখে মনে হয় ওদের যেন সত্যি কোন খিদে নেই—খাবার কোন বাসনাও নেই। এ যেন এক নিয়ম তাই পালন করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবাধ্য চঞ্চল পাখীর দল আবার আকাশে উড়ে যায়। উড়তে উড়তে ওরা চিৎকার করে একে অন্যকে ডাকে, গান গায়, শিস দেয়—তারপর শান্ত সমুদ্রের জল স্পর্শ করে আবার তীর ছেড়ে শূন্যে উড়ে যায়।

ওরা যেন সর্বদাই অতি ব্যস্ত। কেন যে ওদের এত ব্যস্ততা-দ্রুততা—কি যে উদ্দেশ্য। শরতের চঞ্চলতার প্রেরণা, অসন্তোষ ও বিষাদ যেন ওদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। শীত যতক্ষণ না সেজে-গুজে আসছে, ততক্ষণ ওদের চঞ্চলতা থামবে না।

ন্যাট ওদের দেখে আর কত কি আপনমনে ভাবে। সে ভাবে ওরাই বোধহয় আগে খবর পায়—

শরত চলে যাচ্ছে—শীত আসছে—সাবধান হও। কারণ শীত যে ওদের প্রিয় নয়। এই দারুণ বরফ-জমা শীতে অনেক পাখী মারা যায়। মৃত্যুর ভয়ে জীবৎকালে যেমন অনেক মানুষ ভয়ে মরে, সেইরকম এই শরতের পাখীরাও যেন ভীত—

ওদের মৃত্যুদিন আসছে। ন্যাটের মনে হয় এ বছরের হেমন্তের পাখীরা বেশী চঞ্চল! যেহেতু দিন শান্ত, ওদের চাঞ্চল্য আরও বেশী চোখে পড়ে।

মিস্টার ট্রিগারের ট্রাক্টরটা পশ্চিমের পাহাড়ী রাস্তা ধরে একনাগাড়ে উঠছে আর নামছে। ন্যাট বসে বসে দেখে আর ভাবে ট্রাক্টরের চালক যেন ঐ উড়ন্ত পাখীদের চিৎকারে ঢাকা পড়ে গেছে। সারাদিনের কাজের পর ট্রিগারের সঙ্গে দেখা হলে ন্যাট তার মনের কথা বলে। ট্রিগ বলেন, তারও মনে হচ্ছে এ বছরে পাখীদের সংখ্যা বেশী! খুব তাড়াতাড়িই এবার শীত পড়বে। তাই পাখীগুলো অতো চঞ্চল।

অবশেষে ফার্মের মালিকের কথাই ঠিক হল। রাতের মধ্যেই আবহাওয়া বদলে গেল।

ন্যাটের কটেজের শোবার ঘর পূর্বমুখী, তাই রাত দুটোর সময় যখন তার ঘুম ভাঙল,

সে শুনতে পেল শুকনো ঠাণ্ডা পূর্ব-হাওয়ার শব্দ। ফাঁকা চিমনির শব্দ। ছাদের আলগা শ্লেটগুলো যেন নড়ে উঠছে। দূর থেকে উপসাগরের বুকে জলের গর্জন শোনা যাচ্ছে। ন্যাট দেখে স্ত্রী বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। সে কম্বলটিকে আরো জড়িয়ে নিয়ে স্ত্রীর পিঠ ঘেঁষে শোয়।

তারপর .....

হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন তার জানলায় ঠক ঠক আওয়াজ করে। ন্যাট অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিছানা থেকে উঠে জানলা খোলে। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা তার হাতের চামড়া ছিঁড়ে ঘষে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

হ্যাঁ, পাখীর ঝাপটা। ছাদের ওপর দিয়ে পাখীটা কটেজের পিছনে উড়ে যায়। কি জাতের পাখী ঠিক বোঝা গেল না। খুব ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটে মনে হয় জানলার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল।

ন্যাট আবার জানলা বন্ধ করে শুতে গেল। সে ছড়ে যাওয়া হাতের জায়গাটায় জিব ঠেকায়। রক্ত বার করে দিয়েছে। ন্যাট আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে।

আবার সেই একইভাবে আরো জোরে আওয়াজ। যেন আকুল আর্তনাদ—খুলে দিতেই হবে। এবারে তার স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। সে উঠে বলে, ন্যাট, দ্যাখো তো জানলাটায় শব্দ হচ্ছে কেন?

ন্যাট উত্তর দেয়, দেখেছি, একটি পাখী ভিতরে ঢুকতে চাইছে।

তাড়িয়ে দাও। এইভাবে শব্দ হলে আমার ঘুম আসবে না। ন্যাট আবার উঠে জানলা খোলে। এবার একটা নয় যেন আধ ডজন পাখী। পাখীগুলো সোজা যেন ন্যাটের মুখের কাছে এসে ধাক্কা মারে। ন্যাট চিৎকার করে, হাত ছোঁড়ে ওদের দিকে। জানলাটা চেপে বন্ধ করে দেয়, পাখীগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে ছাদের উপর দিয়ে উড়ে পালায়।

ন্যাট শুতে যাবে এমন সময় পাশে ছেলেমেয়েদের ঘর থেকে ভয়ার্ত চিৎকার শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ছুটে ওদের ঘরে যায়। দেখে জানলা খোলা। পাখীগুলো ঢুকে ছাদে দেওয়ালে ঘরের সর্বত্র উড়ছে আর ধাক্কা খেয়ে বিছানায় বাচ্চাদের গায়ে পড়ছে।

ন্যাট বাচ্চাদের অভয় দিয়ে বলে ওঠে, ভয় নেই তোমাদের আমি এখানে। বাচ্চারা চিৎকার করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ওকে জড়িয়ে ধরে। অন্ধকারে পাখীর ডানা ওঠে নামে—ন্যাটের দিকে আসে।

পাশের ঘর থেকে ওর স্ত্রী জিজ্ঞেস করে—ন্যাট, কি হলো?

ন্যাট খুব তাড়াতাড়ি, প্যাসেজের দরজা খুলে বাচ্চাদের বার করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর একলাই অন্ধকার ঘরে পাখীদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। কম্বলটাকে ঘাড় থেকে তুলে নিয়ে চতুর্দিকে ঘোরাতে থাকে। কম্বলের গায়ে পাখীর ধাক্কা মারার শব্দ শোনা যায়—বুঝতে পারা যায় পাখীর ছোট শরীরটা ছিটকে কোথাও পড়ল। তবু পাখীগুলো হার মানে না। বারবার ন্যাটকে এসে আক্রমণ করে। শক্ত ঠোঁট দিয়ে ন্যাটের শরীরের সর্বত্র কাঁটার মত দংশন করতে থাকে। কম্বলটা তার এখনো আত্মরক্ষার অস্ত্র।

ন্যাট কম্বলটাকে এবার মাথায় জড়িয়ে নেয়। তারপর অন্ধকারে খালি হাতে পাখীগুলোকে মারতে শুরু করে, সে দরজা পর্যন্ত গিয়ে দরজা খুললেই পাখীগুলো ওঘরে গিয়ে ঢুকবে। ন্যাটের খেয়াল নেই, সে অন্ধকারে কতক্ষণ পর্যন্ত পাখীদের সঙ্গে লড়েছে।

তারপর একসময় তার চারপাশে ডানার শব্দ থেমে যায়। ক্রমশ সে কম্বলের আড়ালে বুঝতে পারে অন্ধকারে আলো জ্বলছে। দূরের বেডরুমের থেকে একটা অশান্ত বাচ্চার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে।

আস্তে আস্তে সে মাথা থেকে কম্বলটা খুলে দেখতে পায়, প্রথম প্রভাতের ঠাণ্ডা ধূসর আলো ফুটেছে বলেই খোলা জানালা দিয়ে জীবন্ত পাখীরা পালিয়েছে। আর মরা পাখীগুলো ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ক্লান্ত শ্রান্ত ন্যাট খোলা

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দূরের বাগান ও মাঠের দিকে তাকায়। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে। কুয়াশার জন্য মাটি শক্ত ও কালো। জোয়ারের টানে অশান্ত সমুদ্রে সাদা ফেনা, ঢেউ ভাঙছে। পাখীগুলোর আর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। জানলা দরজা বন্ধ করে করে ন্যাট নিজের বেডরুমে ফিরে আসে।

ন্যাটের স্ত্রী ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বিছানায় বসে। তার মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। একটা বাচ্চা পাশে ঘুমুচ্ছে।

ওর চোখের কোণে রক্ত ছিল। কে যেন কেটে দিয়েছে। জিন বলছিল পাখীগুলো ঠুকরে দিয়েছে।

আতঙ্কিত মুখে ন্যাটের স্ত্রী তাকিয়ে দেখছে। ন্যাটও এই কয়েক ঘন্টার ঘটনায় আতঙ্কিত কিন্তু সে তার স্ত্রীকে বুঝতে দিতে চায় না।

এই পাখীগুলো স্থানীয় পাখী নয়। খুব ঠান্ডা পড়েছে। তাই উত্তরের দেশান্তরী পাখীগুলো এদিকে উড়ে এসেছে।

—কিন্তু ন্যাট আবহাওয়া তো সবেমাত্র আজ রাতেই পরিবর্তন হল। পাখীগুলো এর মধ্যে এত ক্ষুধার্ত হবে কেন, এখনও মাঠে ওদের যথেষ্ট খাবার আছে।

ওরা পরস্পরের দিকে সোজাভাবে চেয়ে থাকে। বাচ্চাগুলোর ঘুম ভেঙ্গেছে। জিন কথা বলে চলেছে। ছোট্ট জনি কাঁদছে। ন্যাট ওদের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরী করতে যায়।

জিন তাকে বলে, বাবা তুমি পাখীগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁ, ওরা পুব হাওয়ায় এসেছিল—আবার চলে গেছে।

—আবার যেন না আসে।

—আমি তোকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে আসব।

জিন গত রাতের ঘটনা ভুলেই গেছে। মেয়েটা নাচতে নাচতে উড়ন্ত পাতাগুলোর পিছনে পিছনে ছুটছে। মুখটা তার গোলাপী হয়ে গেছে।

রাস্তার ধারে গাছের সারির দিকে ন্যাট চেয়ে আছে। সেখানে জ্যাক পাখীরা জটলা করে। এখন একটাও পাখী নেই। পাহাড়ী উৎরাই বেয়ে স্কুলের বাস নেমে আসে। ন্যাট মেয়েকে বাসে তুলে দিয়ে নিজে ফার্মে ফিরে যায়।

আজ ন্যাটের কাজের দিন নয়, কিন্তু সব ঠিক আছে কিনা তাই দেখে সে নিশ্চিত হতে চায়। সে ফার্মের পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকে। ফার্মের মালিক মিস্টার ট্রিগারে বৌ মোটা-সোটা বেশ হাসিখুশী। সে গান গাইছে। সেই সঙ্গে রেডিওর বাজনা যেন মিশে যাচ্ছে।

—হ্যালো মিস্টার হকেন, কোথা থেকে এত ঠান্ডা আসছে বলো তো? রাশিয়া? রেডিও বলছে মেরুবল থেকে হিমপ্রবাহ নামছে।—

—আমরা সকালে রেডিও খুলিনি, কাল রাতে—

ন্যাট থেমে যায়, কারণ দিনের আলোয় রাতের পাখীর সঙ্গে লড়াইয়ের ঘটনাটা তার হাস্যকর বলে মনে হয়। তবু সে আবার ঘটনাটা বলে।

মিসেস ট্রিগারে মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে ঘটনাটা বিশ্বাস করছে না। ভাবছে, ন্যাট স্বপ্ন দেখেছে।

—সত্যিকার পাখী!

—হ্যাঁ মিসেস ট্রিগ, বাচ্চাদের শোবার ঘরে পঞ্চাশটা পাখী মরে পড়ে আছে। এরা আমাকে প্রথমে আক্রমণ করে; ছোট জিনের চোখ ঠুকরে দিতে চেয়েছিল।

—আবহাওয়ার ব্যাপার! বেডরুমে ঢুকে পাখীগুলো ঘাবড়ে গিয়েছিল। মনে হয় মেরু অঞ্চল থেকে এসেছে—বিদেশী পাখী।

—না,—ওরা এখানকারই পাখী। ওদের এই অঞ্চলে রোজই দেখা যায়।

ন্যাট বাড়ী ফিরে মরা পাখীগুলোকে বস্তায় পুরতে শুরু করে। তারপর বাগানে বের হয়। বরফ এখনও পড়েনি। তবু এরই মধ্যে মাটি শক্ত জমাট।

গত কয়েক ঘন্টা অন্য কোন কিছুরই পরিবর্তন সবাই যেন অস্বাভাবিক। উপসাগরের জলে সাদা ফেনা। পাখীগুলোকে সমুদ্রতীরের বালিতে পুঁতে ফেলাই ভালো।

সমুদ্রে এখন ভাঁটার টান। অসম্ভব জোরে বাতাস বইছে। পূর্বদিক থেকে ঠিক সেই মুহূর্তে ঝোড়ো হাওয়ায় পাখীগুলো আবার উড়ে যায়। ন্যাট ভাবে জোয়ার এলে আবার ওরা ভেসে যাবে। সমুদ্রে জোয়ারের ওঠানামা, সবটাই ফেনা। ঢেউগুলো উঠছে আবার এঁকে-বেঁকে ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভাঁটার সময় বলে অনেক দূর থেকে সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। তবে শব্দ কিছুটা চাপা। জোয়ারের মতো তীব্র নয়।

ও আবার পাখীগুলোকে দেখল।

সমুদ্রের উপরে সমুদ্র-শকুন। প্রথমে ঢেউয়ের ফেনা বলে মনে হয়েছিল। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে অসংখ্য সমুদ্র-শকুন ঢেউয়ের তালে উঠছে নামছে ভাসছে। যেন প্রকান্ড একটা সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা করছে।

সকালে ফোমন্ডফেস থেকে রেডিওতে খবর প্রচারিত হল। সারা দেশ থেকে ঘন্টায় ঘন্টায় খবর আসছে, অসংখ্য পাখী গ্রাম-শহর-মফঃস্বলের দেশগুলিতে ট্রাফিকের বাধা সৃষ্টি করছে, ক্ষতি করছে। মেরু অঞ্চলের যে বায়ুপ্রবাহ—এই

মুহূর্তে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সেই প্রবাহে পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উত্তর থেকে দক্ষিণ উড়ে আসছে।

সেই সময় দারুণ ক্ষুধার্ত পাখীরা মানুষকে আক্রমণ করছে! জানলা, দরজা, চিমনি দিয়ে পাখীরা যেন ভেতরে না ঢোকে। বাচ্চাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। একটু পরে রেডিওতে আবার বিবৃতি প্রচারিত হবে।

ন্যাট খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—এইতো। সকাল থেকে ভাবছি কি যেন একটা ঘটছে! একটু আগে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি, হাজার হাজার সমুদ্র-শকুন ঢেউয়ের উপর ভাসছে। অপেক্ষা করছে।

—ন্যাট, ওরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছে?

—তা জানি না। ন্যাট হাতুড়ি ইত্যাদি রাখার ড্রয়ারটা খুলছে।

ওর স্ত্রী বলে ওঠে,

—ন্যাট, কি করছ?

ঐ যে রেডিওতে বলল—ওদের কথামতো জানলা, চিমনী সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে।

ন্যাট সারা সকাল ধরে কাঠ দিয়ে বেডরুমের জানলা ও চিমনীর তলা আটকাবার ব্যবস্থা করছে।

রেডিওতে দুপুরের খবর বলা হচ্ছে।

সর্বত্র ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল জীবনযাত্রা ব্যাহত করে দিচ্ছে। আজ সকালে লন্ডনের বাড়ীতে জানলায় ছাদে চিমনিতে ঘন কালো মেঘের মতো পাখীর ঝাঁক এসে বসে। বেশীর ভাগই ব্ল্যাকবর্ল্ড, থ্রাশ ও চড়ুই, মফঃস্বল এলাকার পায়রা, স্টালিং ও টেমস নদীর কালো মাথা গার্ল।

এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখতে বহু রাস্তায় ট্রাফিক চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, দোকানে ও অফিসে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আর ফুটপাতে দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে এই পাখীর ঝাঁকে ঝাঁকে দৃশ্য দেখছে।

খবর শুনতে শুনতে ন্যাটের বৌ মন্তব্য করে, ওদের উচিত সেনাবাহিনী নামিয়ে গুলি করে মারা।

ন্যাট উত্তর দেয়, হ্যাঁ চেষ্টা করলেই পারে। কিন্তু সম্ভব হবে কি?

—কিন্তু কিছু একটা তো করা দরকার।

ন্যাট খুব ভাল করে জানে, লন্ডন বা বড় শহরগুলোতে কর্তৃপক্ষ যাই করুন—তিনশ' মাইল দূরের এই অঞ্চলে বিশেষ কোন লাভ হবে না।

সে জিজ্ঞেস করে বাড়ীতে কতদিনের খাবার মজুত আছে?—

—দু-একদিনের মতো। কাল বাজার করার দিন। কসাই মাংস আনবে—

ন্যাট রান্নাঘরের জানলাও কাঠের বোর্ড দিয়ে বন্ধ করেছে।

মোমবাতি কম আছে। মোমবাতি জোগাড় করতে হবে। রাতে তাড়াতাড়ি শুতে হবে। যদি—

ন্যাট পেছনের দরজা দিয়ে বাগানে বের হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সারাদিন রোদের দেখা নেই। এখন মাত্র তিনটে বাজে। কিন্তু চারদিক অন্ধকার এরই মধ্যে। আকাশটা গুমোট, ভারী হয়ে আছে। ভেজা নুনের মতো বিষণ্ণ বিবর্ণ।

ন্যাট দেখছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি পাথরের বুকে আছড়ে আছড়ে নিজেদের ভাঙছে। ন্যাট সমুদ্রের দিকে হাঁটতে থাকে। কিছুটা হেঁটে থেমে যায়। জোয়ার আসছে। সমুদ্র শকুনেরা হাজারে হাজারে পাখা ঝাপটে উপরে উড়ে যাচ্ছে। তাদের ভিড়ে আকাশটা যেন আরো বেশী কালো হয়ে গেল। পাখীর দল নিঃশব্দে উপরে উঠছে, নামছে। ন্যাট তার কটেজের দিকে ছুটতে শুরু করে।

সে বলে স্ত্রীকে, আমি জিনকে আনতে যাচ্ছি। স্ত্রী তার বিবর্ণ মুখ দেখে হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার? তুমি অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছ কেন?

ন্যাট শুধু বলে জনিকে ঘরের ভেতরে রাখো। দরজা বন্ধ করো, আলো জ্বালো, পর্দা টেনে দাও।

—সবে তো তিনটে বাজে।

ন্যাট বলে, কিছু মনে করো না, যা বলছি তাই করো। কোদাল হাতে নিয়ে গলি দিয়ে ন্যাট বাসস্টপের দিকে দৌড়তে লাগল।

সমুদ্র-শকুনেরা এখন আরও ওপরে; তাদের বৃত্তগুলো আরও বড় হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। চারটের আগে বাস আসবে না। তবু ন্যাট অপেক্ষা করে না—সে ছুটে আসছে।

দূরে কাদামাটির পাহাড়, সাদা আকাশের ভারী বর্ণহীন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, পাহাড়ের আড়াল থেকে কি যেন একটা কালো ঘূর্ণি উঠল। প্রথমে ছায়া তারপর মেঘ, মেঘগুলো উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে উড়ে গেল। না, ওগুলো মেঘ নয়—পাখী। আকাশে পাখীর ঝাঁক ন্যাটের থেকে দু-তিন ফুট উপরে। ওরা তীরের সন্ধানে উড়ে চলেছে।

ওরা রুক, কাক জ্যাক ও ফ্যাগপাই,—যেসব পাখী সচরাচর ছোট কীটপতঙ্গ শিকার করে। কিন্তু আজ এরা অন্য শিকারের সন্ধানে চলেছে।

ন্যাট রাস্তায় টেলিফোন-বক্স থেকে রিসিভার তুলে বলে—হাইওয়েতে

বাসস্টপের পাশ থেকে বলছি।

পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে তীরের দিকে উড়ে চলেছে। রাশি রাশি সমুদ্র শকুন—
অপর প্রান্ত থেকে ক্লান্ত নিরুত্তেজ গলায় উত্তর ভেসে আসে—ঠিক আছে।
ঠিক জায়গায় খবরটা পৌঁছে দেবেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

ক্লান্ত, অধৈর্য। গুরুত্বটা ওরা বুঝছে না। স্কুলের বাস পাহাড় বেয়ে নেমে আসে। জিন নামছে। সে জিজ্ঞেস করে, বাবা, কোদালটা দিয়ে কি হবে? এমনি নিয়ে এলাম, বডডো ঠান্ডা পড়েছে। ছুটে বাড়ী চল। ঐ দ্যাখো বাবা, সমুদ্র শকুন উড়ছে। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চল। বাবা, ঐ পাখীর দল কোথায় যাচ্ছে? তীরের দিকে। যেখানে ঠাণ্ডা কম। বাবা, তুমি অতো তাড়াতাড়ি ছুটো না। আমি তোমার সঙ্গে পারছি না।

পাখীগুলো আমাদের অতো কাছে আসছে কেন? ফার্মের মালিক মিস্টার ট্রিগ গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছে। ন্যাট ওর গাড়ীতে জিনকে উঠিয়ে দেয়।

—মজাটা এবার জমেছে। দেখেছ, সমুদ্র শকুনের ঝাঁক? জিন আর আমি আজ পাখী শিকার করব।

—না। জিন পাখী দেখে ভয় পাচ্ছে। ওকে বাড়ী পৌঁছে দিন। গাড়ী চলে যায়। ট্রিগ কি পাগল। যেখানে মেঘের মতো পাখীর ঝাঁক সেখানে একটা বন্দুক কি করবে? পাখীরা এবার ফার্মের দিকে উড়ে চলেছে। গাড়ী আবার ওর পাশে এসে থামে। ট্রিগ বলে—বাছা তোমার বাড়ীতে চলে গেছে। মনে হচ্ছে তোমার স্ত্রী ওর জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। কি ব্যাপার বলত? শহরের সবাই বলছে এটা রাশিয়ানদের কাজ। রাশিয়ানরা পাখীদের উত্তেজিত করে তুলেছে।

—আপনি বোর্ড দিয়ে জানলা বন্ধ করেছেন?

মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার? সময় কোথায়? সকালে এসো। কাল পাখীর মাংস খাওয়াব।

কথা শেষ করে হাসতে হাসতে ট্রিগ গাড়ী নিয়ে চলে যায়। ন্যাট ছোট জঙ্গল পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে আর একটু যেই এগিয়েছে তার মাথার উপরে পাখীর ডানার শব্দ। কালো একটা শকুন থেকে থেকে পাক খেতে খেতে ওকে এসে আক্রমণ করে। কিন্তু পাখীটার লক্ষ্য থমকে যায়। এবার আরো অনেক বেশী উপরে উঠে আবার ডাইভ খায়। এবার ওর পিছনে দুটো, সাতটা, এক ডজন শকুন।

কোদালটা কোন কাজে আসছে না শুধু ভারী বোঝা। ন্যাট ওটাকে ফেলে দিয়ে দুহাতে মাথা ঢেকে নিজের কটেজের দিকে ছুটতে শুরু করে। পাখীগুলোর

সাহস যেন বেড়েই চলেছে। ওরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বার বার আক্রমণ করছে আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে মরে যাচ্ছে। মরা পাখীগুলো লাথি মেরে সরিয়ে ন্যাট পথ করে ছুটতে থাকে। বার বার হোঁচট খায়।

ছুটতে ছুটতে এক সময় সে কটেজের দরজায় গিয়ে পৌঁছায়। বন্ধ দরজায় রক্তাক্ত হাত দিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা মেরে বলে—দরজা খোলো। আমি ন্যাট—

তারপর ও আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে। ঠিক ওর মাথার উপর একটা বিশাল গ্যানেট পাখী। সমুদ্র-শকুনেরা হাওয়ায় চক্কর খেতে খেতে সরে যায়। এখন মাথার উপরে কেবল একটা গ্যানেট ডাকছে। ডানা মুড়ে হঠাৎ গ্যানেট পাখীটা মাটিতে পড়ল। তখন সে বাড়ীর ভিতরে তার বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দেয়।

এবার ন্যাটের ক্ষতস্থানগুলো ব্যান্ডেজ করা হয়। হাতের পিছনে দিকটাই বেশী গভীর ক্ষত। মাথায় টুপি না থাকলে মাথাটাও চোট খেত। আর গ্যানেট পাখীটা তার মাথার খুলি ফাটিয়ে দিতে পারত।

বাচ্চাগুলো বাবার রক্তাক্ত হাত দেখে কাঁদছে। ওর স্ত্রী বলল—ন্যাট, ঐ পাখীরা কি করবে?

—ওরা আক্রমণ করবে। যে রাস্তায় বেরুবে তাকেই মারবে। জাননা ওরা চিমনী খোলা পেলেই বাড়ীর ভিতরে ঢুকেও আক্রমণ করবে।

—সরকার কেন ফৌজ নামাচ্ছে না? মেসিনগানই বা চালাচ্ছে না কেন?

—সময় পায়নি—কেউ তৈরী নয় তাই!

আবার পাখীর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বন্ধ জানালার বাইরে পাখীর ডানার ঝাপটা। ভেতরে ঢোকার জন্য ব্যর্থ চেষ্টার শব্দ। মাঝে মাঝে কোন মরা পাখীর মাটিতে পড়ে যাওয়ার শব্দ।

ন্যাট চারদিক ভাল করে বন্ধ করতে ব্যস্ত। সে কাঠের বোর্ডের আশ-পাশে টিন ও ধাতুর টুকরো হাতুড়ি মেরে পেরেক দিয়ে আটকাচ্ছে! পাখীদের ঠোঁটের ঠকাঠক শব্দ ছাপিয়ে তার কানে আসছে জানলার কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ।

রেডিও খুলে শুধু নাচের বাজনার সুর। সন্ধ্যা ছ'টার সময় বিশেষ ঘোষণা।

এবার ঘোষকের স্বর গম্ভীর।

লন্ডন থেকে বলছি। আজ বিকেল ৪টের সময় সারা দেশে এমার্জেন্সী ঘোষণা করা হয়েছে। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সকলের মনে রাখা উচিত অদৃষ্টপূর্ব এবং অভাবনীয় বর্তমান

সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ নয়। প্রত্যেক বাড়ীর মালিককে তাই নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে অনেক লোক একত্রে ফ্ল্যাট বা হোটেলে থাকে, তাদের সমবেতভাবে পাখীর প্রবেশ ঠেকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রত্যেকটি লোকের আজ বাড়ীর ভেতর থাকা দরকার। পাখীরা একসঙ্গে অসংখ্য মানুষ দেখলে আক্রমণ করছে। তারা এরই মধ্যে বাড়ীগুলো আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু বাড়ীর মালিক যদি ঠিকমতো ব্যবস্থা নেয়, তাহলে ওদের বাড়ীর মধ্যে ঢোকা সহজ হবে না। জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অভাবনীয় পরিস্থিতিতে জরুরী অবস্থা জারী হওয়ার ফলে কাল সকাল সাতটার আগে কোন রেডিও স্টেশন থেকে কোন প্রোগ্রাম প্রচার করা হবে না।

গড সেভ দি কুইন—বাজনা শুনিয়ে রেডিও থামে।

ন্যাট তার স্ত্রীকে নৈশভোজের খাবার তৈরী করতে সাহায্য করে। সে শিস দিতে দিতে সব কাজ করে। খুব হাসিমুখে স্বাভাবিকভাবে সব কাজ করে। যাতে স্ত্রী সন্তানেরা ঘাবড়ে না যায়।

ছাদে পাখীর ঝটপট শব্দ শোনা যায়। জানলায় পাখীর ঠোঁট ঠোকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাখীগুলো বুদ্ধিমান। জানলা দিয়ে ঢোকা শক্ত জেনে ছাদে গেছে।

রাতে খাওয়া যখন সকলের শেষ হয়েছে ঠিক সেই সময়—ন্যাট একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পায়—প্লেনের শব্দ।

একবার, দুবার তিনবার! প্লেন ওড়ার শব্দ আর শোনা যায় না।

ওটা কিসের শব্দ হল—ওর স্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করে।

জানি না।

ন্যাট জানে ওটা প্লেন ভেঙ্গে পড়ার শব্দ। তবু সে কিছু বলে না। কর্তৃপক্ষ খুব ঝুঁকি নিয়েই প্লেন পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেটা আত্মহত্যারই নামান্তর হয়েছে।

পাখীরা প্রোপেলার ও কিউ সিলেজে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরছে, প্লেন তাদের কি করে!

এখন প্লেনের শব্দ বন্ধ, নৌবাহিনীর কমান্ড নিস্তব্ধ। ন্যাট ভাবে শুধু শুধু জীবনের অপচয় ঘটানো ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে বেশী পাখী মারা যাবে না। কেবল খরচই বড়ডো বেশী হবে। অবশ্য বিষাক্ত দিয়ে কিছু হতে পারে।

মাস্টার্ড গ্যাস স্প্রে করলে পাখীরা মরবেই। তবে তার আগে মানুষকে সাবধান করে দিতে হবে। যাক, দেশের সেরা বুদ্ধিজীবীরা আজ রাতে ব্যাপারটা নিয়ে ভাববে। জানলায় পাখীর শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। যুদ্ধবিরতি।

ন্যাটের মনে পড়ে যায় আবার সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার কথা। সমুদ্রের স্রোত দিক বদলেই পাখীদের যুদ্ধবিরতি। পূর্ব হাওয়া—আর সমুদ্রের দিক বদল—এই দুটো নির্দেশ পাখীরা মেনে চলেছে।

রাত এখন আটটা। যখন জোয়ার আসবে—পাখীরা তখনই আক্রমণ করবে। সেই হিসাবমতো—রাত একটা কুড়ি নাগাদ পাখীরা আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু তার স্ত্রী রাতে ন্যাটকে বাইরে যেতে দিতে রাজী নয়।

আজ ফার্মে নিশ্চয়ই দুধ দেওয়া হয়নি। সবাই নিশ্চয় ঘরের ভেতরে। অবশ্য ওরা যদি কাঠের বোর্ড দিয়ে জানলা আটকাবার সময় পেয়ে থাকে। ন্যাট দরজা খুলে আস্তে আস্তে চোরের মতো বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে জমাট কালো অন্ধকার। সমুদ্র থেকে কনকনে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছে। সিঁড়িতে অজস্র মরা পাখী যারা আত্মহত্যা করেছে, ডাইভ দিতে গিয়ে যাদের ঘাড় ভেঙ্গেছে।

জীবন্ত পাখীরা সমুদ্রে ভাঁটার টান আসার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে ফিরে গেছে। সমুদ্র-শকুনেরা নিশ্চয়ই এখন সমুদ্রের উপরে ঘুরছে। দূর পাহাড়ের উপর ভেঙ্গে পড়া প্লেনটা পুড়ছে। জানলার কার্নিসের উপর মরা পাখীদের তুলতে তুলতে বমি পাচ্ছে। জানলার মরা পাখীদের এই ব্যারিকেড এমন কিছু নয়। তবুও এগুলোকে আগে না সরালে আক্রমণ করবে না।

জানলার সব কাঁচই প্রায় ভাঙ্গা। ভেতরে গিয়ে দরজা জানলা সব সাবধানে পরিষ্কার করে ন্যাট। বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ন্যাটও এক কাপ কোকো খেয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে জ্বলন্ত প্লেন ...

পাখীরা আবার ফিরে এসেছে। তার বৌ আর সহ্য করতে না পেরে ন্যাটের কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে তুলে দেয়। তাছাড়া কি যেন একটা গন্ধ ... কি যেন একটা পুড়ছে ...

তখনই ন্যাটের মনে পড়ে—সেই বাকী কাজটা, ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানো হয়নি। জ্বালানির অভাবে আগুন প্রায় নিভেই এসেছে। এখন জানলা দরজায় পাখীর ঠোঁটের চেয়েও মারাত্মক হল পাখীর পোড়া পালকের গন্ধ। পাখীরা চিমনী বেয়ে নেমে আসছে।

নিভন্ত আগুনের উপরে কাঠ জড়ো করে কেরোসিন তেল ঢেলে দেয় ন্যাট। আগুনের শিখা ঝলসে ওঠে! তাতে পাখীর শরীরগুলো ঝলসে যায়।

ছেলেমেয়েরা উঠে পড়ে। জিন জানতে চাইছে কি হয়েছে? চিমনী থেকে মরা পাখীগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে ন্যাট। আগুন দেখে চিমনীর উপর থেকে পাখীরা পালাবে। কিন্তু বিপদ হল চিমনীর দিকটা আধপোড়া পাখিতে ঠাসা।

বাইরে পাখীগুলো যা খুশি করে করুক। আগুন থেকে জ্বলন্ত মরা পাখীগুলোকে টেনে টেনে সরাচ্ছে ন্যাট। চিমনীতে আগুন ধরে না গেলে ওরা সুবিধে করতে পারবে না।

রান্নাঘরের ঘড়িতে এখন তিনটে বাজে, এখনও চার ঘন্টা পাখীরা আক্রমণ চালাবে। সকাল সাড়ে সাতটায় সমুদ্রে যখন ভাঁটার টান আসবে তখন ওরা আবার যুদ্ধবিরতি জানাবে।

তখন ফার্ম থেকে জ্বালানি কাঠ আনতে হবে। এক হাতে স্ত্রী অন্য হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ছোট্ট জনিকে কোলে নিয়ে ভাবছে ন্যাট জানলায় কাঠে পাখীরা আরো জোরে শব্দ করে চলেছে। এটা কোন্ জাতের পাখী? কাঠ-ঠোকরা? না—তার স্বর হালকা। আরও শক্ত ঠোঁট। বেশীক্ষণ এভাবে চললে কাচের মতো কাঠও ভেঙ্গে যাবে। বোধ হয় বাজপাখী। তবে সমুদ্র-শকুনের পরিবর্তে বাজপাখীরা এলো? বাজপাখী শকুন। শেষ কখন!

ন্যাট শিকারী পাখীদের কথা ভুলেই গেছিল। সে নানা চিন্তা করে চলেছে। ছেলেদের বেডরুমে পাখীর শব্দ। আরো তিন ঘন্টা। পাখীরা ওখানে ঢুকে পড়েছে। ন্যাট আসবাবপত্রগুলো সিঁড়ির দরজার কাছে স্তূপীকৃত করেছে। ব্যারিকেড তৈরী করছে। ঘড়ির কাঁটা যেন আজ বড়ডো আস্তে ঘুরছে। সমুদ্রের জোয়ার যাবে—ভাঁটার টান আসবে—তবে পাখীরা পালাবে, সারাদিন একনাগাড়ে হাওয়া, বিশ্রাম বা খাদ্য ছাড়া ওরা যুদ্ধ চালাতে পারবে না।

ঘর ঘর শব্দ!

ওটা কিসের শব্দ?

রেডিওর। সাতটা বাজল। কোন খবর নেই কেন? সওয়া সাতটা। রেডিওতে কিছুই শোনা যায় না। কেবল ঘর ঘর শব্দ। আটটা বাজে। ব্যাটারী ফুরোতে কত দেরা কে জানে? পাখীদের শব্দ কমে আসছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে সমুদ্রের ভাঁটার টান। শুধু হাওয়ার শব্দ। আর রেডিওর সেই একই শব্দ।

ন্যাট রেডিও বন্ধ করে বাইরে যায়। এখন ছ'ঘন্টা যুদ্ধবিরতি। খাবার আলো আর জ্বালানি চাই। সমুদ্র-শকুনেরা সমুদ্রে ফিরে গেছে। কিন্তু গাছের ডালে, মাঠে, বাগানে সারি সারি পাখী নিশ্চয় অপেক্ষা করছে। ওরা স্থলের পাখী।

ন্যাটের স্ত্রী একলা ঘরে থাকতে চায় না। সিঁড়ি থেকে মরা পাখীদের স্তূপীকৃত মৃতদেহ সরিয়ে পেরাম্বুলেটারে জনিকে বসিয়ে জিনের হাত ধরে বৌয়ের সঙ্গে ন্যাট ফার্মের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

—বাবা ঐ দ্যাখো মাঠে পাখীরা বসে আছে। আমার ভয় করছে।

—ওরা এখন আমাদের কিছু করবে না।

· স্ত্রীকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ন্যাট ফার্মের ভিতর ঢোকে। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। গরুর দুধ দোয়া হয়নি। ভেড়াগুলো বেড়া ভেঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ীর প্রত্যেকটা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ প্রত্যেকটা জানলা বন্ধ।

উঠানে পড়ে আছে মিঃ ট্রিগারের মৃতদেহটা। দেহের যেটুকু পাখীরা ছিঁড়ে খায়নি সেইটুকুই পড়ে আছে। পাশে ওর বন্দুকটা। ঘরের ভিতরে ফোনের রিসিভার হুক থেকে ঝুলছে। চারপাশে অনেক মরা সমুদ্র-শকুন পড়ে আছে। ছোট ছোট জীবন্ত পাখীর ঝাঁক গাছের ডাল ও ছাদে বসে দৃশ্যটা দেখছে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে ন্যাট হঠাৎ দেখে মিসেস ট্রিগারের পা দুটো বেডরুমের দরজা দিয়ে ঝুলছে। চারপাশে মরা শকুন। একটা ভাঙা ছাতা! বন্দুক বা ছাতা—সবই নিষ্ফল।

ওর স্ত্রী ন্যাটকে জিজ্ঞেস করে, ট্রিগাররা কোথায়? মনে হয় পালিয়েছে। রুটি, খাবার-দাবার জানলা সারাবার তক্তা জ্বালানী কাঠ—গাড়ীতে ভরে বাসস্টপের দিকে যায় ন্যাট।

টেলিফোন-বক্স থেকে সে টেলিফোন করে—কোন শব্দ নেই। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকায় ন্যাট। মাইলের পর মাইল কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। শুধু মাঠে সারি সারি পাখীর ঝাঁক। ওরা সবাই যেন ঘুমুচ্ছে। সারারাত ধরে ওরা খেয়েছে। তাই এখন নড়তে পারছে না। আকাশ বিবর্ণ ধূসর। গাছগুলো নুইয়ে পড়েছে। পাখীগুলো নিশ্চল। এখনই তো সময়। কর্তৃপক্ষ এখনই প্লেন থেকে মাস্টার্ড গ্যাস ছড়িয়ে মারছে না কেন।

ওর স্ত্রী বলে, ন্যাট তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাও।

দু'নম্বর গেটের পাশে পোস্টম্যানের মৃতদেহ পড়ে আছে, জিন যেন দেখতে না পায়।

ন্যাট কটেজে ফিরে বৌকে খাবার তৈরী করতে বলে প্রত্যেকটা জানলা দরজা এবং রান্নাঘর ছাড়া ঘরের চিমনীতে কাঠের তক্তা লাগায়। মাঠে একটিও প্লেন নেই। ন্যাট মনে মনে কর্তৃপক্ষকে অভিশাপ দেয়। অপদার্থ কোথাকার!

ন্যাটের যেন মনে হল সমুদ্রের আড়ালে ধূসর মতো জাহাজ বা নৌবাহিনী? কিছু না—জাহাজ না—সমুদ্র-শকুনের ঝাঁক উড়ে আসছে। হাওয়া ঘুরছে—সমুদ্রে আবার জোয়ার আসছে। পাখীরা আবার আক্রমণ করছে।

দুপুর দুটো বাজে। দরজা বন্ধ করে ব্যারিকেড লাগায় ন্যাট। ন্যাটের স্ত্রী রেডিওর প্রত্যেকটা স্টেশন ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু না, ইউরোপ যেন মরে

গেছে। তারপর আবার সেইভাবে একই কায়দায় পাখীরা আক্রমণ শুরু করল।

কটেজের ভেতর খাবার আছে, পানীয় আছে, রান্নাঘরের চিমনীতে আগুন জ্বলছে। জোয়ারের সময় পাখীরা আক্রমণ করবে। ভাঁটার সময় যুদ্ধবিরতি। মাথা ঠান্ডা থাকলে এইভাবে দীর্ঘদিন বাঁচা যাবে। ন্যাট ভাবে কাল সকালে ফার্ম থেকে কাঁটাতার এনে জানলার বাইরে ব্যারিকেড করবে।

ঘরের ভেতরে ইউরোপের একমাত্র জীবিত পুরুষ ন্যাট ও তার পরিবার।

পাখীরা বাইরে থেকে অবিশ্রান্তভাবে ঠোকর দিয়ে চলেছে। ওদের মনে দীর্ঘদিনের কোন ঘৃণ্য স্মৃতি জমে আছে। মানুষের অবহেলা, মানুষের জিঘাংসার স্মৃতি। ওরা বোধহয় প্রতিশোধ চাইছে। কে জানে! ন্যাট তার মজুতের শেষ সিগারেটটা জ্বালায়।
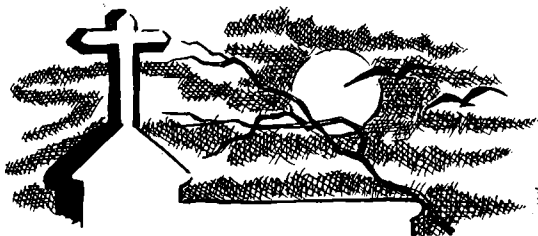
এমন মেয়ে দেখাই যায়না

ডরোথি সেরাস

একদা এক তরুণ রোমে বেড়াতে গিয়েছিল। এই তার প্রথম রোমে আসা। পাড়া-গাঁ থেকে আসছে সে। কিন্তু খুব তরুণ বা সরল নয় ছেলেটি। কাজেই সে একথা ভাবেনি যে একটা মহাসুন্দর রাজধানী নগরী তার সামনে অন্য জায়গা থেকে অনেক বেশী করে সুন্দর প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়ে ধরবে। ইতিমধ্যেই সে জেনে ফেলেছে যে জীবনটা হল প্রধানতঃ ভ্রান্তি আর বিভ্রমে ভরা। জীবনে অনেক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটে ঠিকই কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ করবার জন্যই বুঝি আসে নৈরাশ্য আর হতাশা। ছেলেটি জানে জীবনে হয়ত এর চেয়েও খারাপ গুণের আবির্ভাব হতে পারে। এমন সম্ভাবনাও আছে যে কিছুই হয়ত ঘটল না। এক ব্যস্ত সমস্ত শহরে সেই সম্ভাবনাটাই বেশী। এই ব্যস্ত শহরে সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে তরুণ এসে দাঁড়াল স্পেনীয় সিঁড়িগুলির উপর। দেখতে লাগল তার সামনে প্রসারিত মনোরম দৃশ্যাবলী। শুনতে লাগল সায়ংকালীন যানবাহনের শব্দ। রোমের সোনালী প্রদোষ। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। ঝকঝকে অটোমোবাইলগুলো ফোয়ারা পেরিয়ে নিঃশব্দে ছুটে যাচ্ছিল। বাঁক নিচ্ছিল আলোকোজ্জ্বল ভিয়ারুনদোন্তির দিকে। নিয়ন-লাল সাইনবোর্ডগুলো যেন অন্ধকারকে আবাহন করে এনে ছুরিকাবিদ্ধ করছিল। বাসের হলুদ জানালাগুলোতে মানুষের মুখের ভীড়। মানুষেরা যে যার কাজে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় সবার হাতেই কাজ রয়েছে। কাজ নেই কেবল আমাদের এই তরুণের। নাঃ সত্যি, ওর এখন করবার মতো কিছুই নেই।

নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ মনে হল ওর। হ্যাঁ এ শহরে সে একক ও নিঃসঙ্গ। কিন্তু এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজ করলে অ্যাডভেঞ্চারকে পাওয়া যায় না। বরং হয়ত আরও দূরে চলে যায় অ্যাডভেঞ্চার।

এরকম মেজাজ কোন কিছুরই প্রতিশ্রুতি দেয় না। সুতরাং তরুণ পিছন ফিরল। সিঁড়ি পেরিয়ে চমৎকার গীর্জাটিকেও পেরোল। তারপর পাহাড় পথে সে চলল তার হোটেলের দিকে। সঙ্কীর্ণ পথের দু'ধারে মদের দোকান আর খাবারের দোকানের ভীড়। কিন্তু ভিত্তোরি ও ভেনিতোর চওড়া পায়ে চলার পথগুলো

মোটেই এরকম ঘিঞ্জি নয়। গাছের ছায়ায় ছায়ায় যে পথ উঠে গেছে বোরজিস উদ্যানের দিকে। রোম নগরীর উপরতলার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সোনালী সন্ধ্যাকে পানীয় সহ উপভোগ করবার জন্য এদিককার কাফেগুলিতে আসেন। সমস্ত ইয়োরোপে বোধ হয় এত মনোরম—এত সুন্দর কাফে আর নেই। এদিকটাও ভীড়ও খুব কম। প্রায় নির্জনই বলা যেতে পারে। সে পথে গেল না তরুণ। সে একটা পুরোনো শান্ত নিস্তব্ধ পথ ধরে এগোল। এ পথে পথচারীদের চলবার জন্য পেভমেন্ট নেই। পুরোনো হলুদ-রঙা বাড়ীগুলোর মধ্য দিয়ে চলে গেছে পথটা রৌমনগরীতে, এরকম পথে চলতে মাঝে মাঝে বেশ মজা পাওয়া যায়। যেতে যেতে হয়ত আচম্বিতে দেখা যায় পথ হয়ে গেছে একটা 'পিয়্যাৎজ্যা' বা সাধারণের ব্যবহারের জন্য এক চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ, যেখানে রয়েছে ফোয়ারা, গীর্জা। অসুন্দর পথটা হঠাৎ যেন এসে পড়েছে সৌন্দর্য্যলোকে।

ছেলেটি দেখল এ পথে সে আর একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়েটি পাহাড়ের দিক থেকে নেমে আসছে—এগিয়ে আসছে তারই দিকে।

মেয়েটি আরও কাছে এল। তরুণ দেখল তার পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ রুচিসম্মত। মেয়েটির দেহভঙ্গীমার মধ্যে রয়েছে কেমন এক কোমল ল্যাটিন দীপ্তি। ওর চলার ছন্দ অপূর্ব। এ ছন্দ মনে জাগিয়ে তোলে সম্ভ্রমবোধ। মেয়েটির মুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। কিন্তু তাহলেও সে সুন্দরী নয় এমন কল্পনা করাও অসম্ভব। এমনি করে নির্জন পথে মেয়েটির একমাত্র সহযাত্রী হয়ে, ওর এত কাছাকাছি চলবার সুযোগ পেয়ে ছেলেটির মনে এক বিচিত্রভাবের সৃষ্টি হল। একটু আগে সন্ধ্যাটা ছিল অ্যাডভেঞ্চারবিহীন। কিন্তু এখন কে বলে রোমের সোনালী সন্ধ্যায় কোন অ্যাডভেঞ্চার নেই। ঐ এগিয়ে আসা অবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ীই তো অ্যাডভেঞ্চারের মূর্ত প্রতীক।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিষণ্ণতাবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলল তরুণকে। নিজেকে তার বড় ছোট—বড় তুচ্ছ বলে মনে হল। বোধকরি করুণার পাত্র বলেও মনে হল নিজেকে। চোখ নামিয়ে নিল ছেলেটি। কিন্তু নামাবার আগে চোরা দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে নিতে ভুলল না।

কিন্তু চোরা চাউনিতে যা দেখল তাতে কিন্তু ছেলেটি চমকে উঠল। সে থেমে গেল। সে এবার সোজা তাকাল মেয়েটির দিকে। না কোন ভুল নেই—কোন ভুল করেনি সে, মেয়েটি হাসছে। এক সোনালী সন্ধ্যায় নাম না জানা এক সুতনুকা অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে এক তরুণের দিকে। একটু ইতস্ততঃ করে মেয়েটিও থেমে গেছে। ছেলেটির মনে হল এ সন্ধ্যা আর বিষণ্ণ

নেই। রোমের এ সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে পরম রমণীয়—পরম প্রার্থিত।

হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল তরুণের। কোন খারাপ মেয়েছেলে নয়ত? শিকার ধরতে বেরিয়েছে নাকি?

কিন্তু পরমুহূর্তেই এ চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল তরুণ। না—না এ মোটেই সে জাতীয় মেয়ে নয়। সেরকম মেয়ে এমন হাসি হাসে না। এর হাসি সহজ, সরল মমতা মাখানো।

বিস্মিত ছেলেটিকে আরও বিস্মিত করে মেয়েটি কথা বলল—'আমি ... আমি জানি আপনাকে এমনিভাবে বলা আমার উচিত নয় ... কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা কি চমৎকার, এমন সোনালী সাঁজ রোমনগরীতেও সহজলভ্য নয়। আমার মতো আপনিও বোধ হয় নিঃসঙ্গ।'

মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী! ছেলেটি কোন কথা বলতে পারল না। কিন্তু বর্তমান এক উল্লাস তাকে হাসবার শক্তি যোগাল। মেয়েটি বলতে লাগল ঃ

ভাবছিলাম ... বোধহয় ... মানে আপনিও একা, আমিও একা ... এই চমৎকার, স্বর্ণ-সন্ধ্যায় আমরা দু'জনে খানিকটা বেড়িয়ে আসতে পারি।

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে একটু ইতস্ততঃ ভাব মাখানো থাকলেও সে স্বরে অনুনয়ের লেশমাত্র ছিল না।

প্রাথমিক বিস্ময়বোধ কাটবার পর ছেলেটি ততক্ষণে খানিকটা আত্মস্থ হয়ে উঠেছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে। এখান থেকে কয়েক মিনিট হেঁটে গেলেই তো ভেনিতো।'

মেয়েটি আবার হাসল। বলল, 'আমার বাড়ীতো এখানেই।'

নিঃশব্দে কয়েক পা হাঁটল ওরা দু'জনে। এসে পড়ল একটা বাঁকের কাছে। একটু আগেই ছেলেটি এ বাঁকটা দেখিয়ে দিল মেয়েটি। আরও কিছুটা এগোবার পর রাস্তার একপাশে ছোট বাড়ীগুলো শেষ হয়ে গেল। শুরু হল একটা বাগান বাড়ীর পাঁচিল। পাঁচিলের ওপাশের বাগান—তারপর একখানা চমৎকার সুন্দর বাড়ী। মেয়েটির মুখে এক অদ্ভুত পান্ডুর দীপ্তি। ওর স্বাস্থ্য-সুন্দর ত্বক থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি। সে শক্তি অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে মানুষকে। ধূসর কিন্তু উজ্জ্বল দু'টি চোখ। কালো ভুরু, কুচকুচে কালো চুল।

বাগানের দরজায় একটা তালা ঝুলছে।

তালাতে চাবি লাগাল মেয়েটি। তালা খুলে গেল। খুলল সদর দরজার ভারী পাল্লা দু'খানা। ওরা দু'জন ভিতরে ঢুকল।

ভেলভেটের উর্দীপরা একজন চাকর এসে ওদের অভ্যর্থনা করল। সে ওদের দুটিকে নিয়ে গেল চমৎকারভাবে সাজানো একখানা বড় ঘরে। সিলিং থেকে ঝুলছে দামী কাঁচের সুদৃশ্য দীপাধার। ঘরের সামনে সবুজ অঙ্গন। সেখানে ফোয়ারা। ফোয়ারার জল-কণায় অঙ্গনের সবুজ ঘাস ভেজা ভেজা।

বেয়ারা দুটি সুদৃশ্য পানপাত্র এনে রাখল। পাত্রে ফেনিল পানীয়। পানীয়কে ঠান্ডা করা হয়েছে বরফ দিয়ে। রোমের সোনালী সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেছে। এখন কবোষ্ণ রাত্রি। শীতল পানীয় ওদের দেহ-মনকে ভরে দিয়েছে এক অদ্ভুত উল্লাসের উত্তাপে। যেন সঞ্জীবনী সুধা পান করে ওরা হয়ে উঠেছে আরও সতেজ—আরও প্রাণবন্ত। তরুণটি কৌতূহলীর দৃষ্টি দিয়ে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে তরুণীর দিকে।

আর মেয়েটি?

সে তার দৃষ্টি ..... তার মুখের রহস্যময় হাসি আর চোখে সুষম ভাবভঙ্গী আর কারুকার্য দিয়ে যেন ঘনিষ্ঠতা—একান্ত অন্তরঙ্গতার জন্যই প্রলুব্ধ করতে চাইছিল তরুণকে। এ ঘনিষ্ঠতা ... এ অন্তরঙ্গতার তাৎপর্য অনেকখানি। তরুণ ভাবল এবার তাকে সতর্ক হতে হবে। আর নয়, এবার মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে এখান থেকে বিদায় নেবে। সে কোন বাধ্য-বাধকতার মধ্যে পড়তে চায় না। এখানে থাকলে পরে আবার কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয় কে জানে। কাজেই এখন বিদায় নেওয়াই হচ্ছে সুবিবেচনার কাজ—বোধ করি এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভাল কাজ।

কিন্তু এ কাজে বাধা এল মেয়েটির কাছ থেকে। প্রথমে হেসে তারপর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে বাধা দিল মেয়েটি।

ছেলেটির বিচলিত বা উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। মেয়েটি জানে ওর কাছে হয়ত সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। এরকম অবস্থায় তা মনে হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নয়। ছেলেটি হয়ত ভাবতে পারে ওকে আরও কিছুক্ষণ থাকতে বলার পিছনে হয়ত দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য আছে ..... আছে কোন গভীরতর উদ্দেশ্য। আসল ব্যাপার হল মেয়েটি নিঃসঙ্গ তার মধ্যে রয়েছে একাকীত্বের বেদনাবোধ। রোমের সোনালী সন্ধ্যায় নির্জন পথে ছেলেটি হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়। যে মুহূর্তে ওদের দু'জনের দেখা হয়েছিল সে মুহূর্তটার মধ্যেই হয়ত একটা যাদু ছিল। মেয়েটি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি।

এরকম সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা যেন এক মিষ্টি মধুর স্বপ্ন। রূঢ় বাস্তবের আঘাতে বারবার মোহমুক্তি ঘটলেও এ মধুর স্বপ্নের রেশ একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি তরুণটির মন থেকে। বাস্তব নিষ্ঠুরভাবে হত্যা

করে ফেলতে পারেনি তার রোমান্টিক মন-টাকে। তরুণ মনস্থির করে ফেলল। তার মনে এল গর্ব আর উল্লাসের জোয়ার। মেয়েটিকে সে বিশ্বাস করল—সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করল। সে যেন হয়ে উঠল পরিপূর্ণ। মেয়েটি তাকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করল।

চাকরেরা খাবার নিয়ে এল। চমৎকার খাবার। শেলফিশ, নধর পাখীর মাংস, রসাল নরম ফল। খাওয়া শেষ হল। দু'জনে গিয়ে বসল অঙ্গনের পাশে নরম সোফায়। জায়গাটা বেশ ঠান্ডা। বেয়ারা সুদৃশ্য পানপাত্রে নিয়ে এল সুস্বাদু পানীয়। ওরা পান করল সেই ফেনিল পানীয়। বেয়ারা চলে গেল। চারপাশে নেমে এল এক নিস্তব্ধতা। রাত নিঝুম। ওরা দুজন ছাড়া কেউ নেই কোথাও। শুধু ওরা দু'জন—এক তরুণ আর এক তরুণী।

ওরা একে অন্যের বাহুডোরে বাঁধা পড়ল। নিঃশব্দ পদচারণায় চলল বাড়ীর ভিতরে। ওদের মধ্যে এখন গভীর নীরবতা। তরুণের হৃৎপিন্ডটা ধ্বক ধ্বক করছে। নিজের কানেই সে শুনতে পাচ্ছে হৃৎযন্ত্রের শব্দ। সে শব্দ বুঝি এই হলঘরখানার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একখানা হলঘরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ওরা দু'জনে। ঘরের মেঝে মারবেল পাথরে ঢাকা। নিজের বাহুমূল দিয়ে যেন মেয়েটির সমস্ত সত্তাকে অনুভব করছে ছেলেটি। ওর দেহমনে উত্তেজনার শিহরণ। এ উত্তেজনা আসছে নিশ্চয়তাবোধ থেকে। কিসের নিশ্চয়তা? এমন মধুর মুহূর্তে—এমন সুন্দর রাতে কোন ভুলভ্রান্তিই হতে পারে না। দু'জনেই নীরব। কথা বলবার কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই।

ওরা দু'জনে একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

তরুণীর শয়ন কক্ষ, সুসজ্জিত বিছানার কাছে মেয়েটির একখানি ছবি। ছবির তরুণী স্বচ্ছ-বসনা। এখানে—এই এক টুকরো রোমান্টিক জগতের মধ্যে এসে ছেলেটি তার প্রেম নিবেদন করল।

ওদের প্রেম হবে চিরন্তন ..... শাশ্বত। এ প্রেম হবে পূর্ণ ..... কোন ফাঁক থাকবে না তার মধ্যে। তাদের অপূর্ব সাক্ষাতের মতো তাদের অপূর্ব প্রেম-কাহিনীও উপকথায় পরিণত হবে। সেই উপকথা যুগ যুগ ধরে তরুণ-তরুণীকে প্রেরণা দেবে।

প্রতিদানে মৃদু স্বরে মেয়েটিও বলল তার ভালবাসার কথা। ওদের ভালবাসার মধ্যে আসবে না কোন ভ্রান্তি। আসবে না দু'জনের প্রেমের মধ্যে কোন অন্তরায়। একে অন্যকে বিশ্বাস করবে পরিপূর্ণভাবে। কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না।

ধীরে ধীরে মেয়েটি বিছানার উপরকার দামী আবরণখানা টেনে নিল।

ওরা দু'জনে এবার এক শয্যায়। মেয়েটির পাশে শুয়ে আছে ছেলেটি। ওর ঠোঁট যখন মেয়েটির টুকটুকে অধর আর ওষ্ঠকে ছুঁই ছুঁই করছে তখন হঠাৎ ছেলেটি চমকে উঠল। তরুণ ইতস্ততঃ করতে লাগল।

ভুল? হ্যাঁ কোথাও একটা ভুল হয়েছে। ভুলটা সে অনুভব করতে পারছে। তারপর ক্রটিটা ওর নজরে এল।

বিছানার পাশে শেড দেওয়া মৃদু কোমল আলো, কিন্তু ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড়। ও আলোর সুইচটা দরজার পাশে।

ছেলেটির মনে দ্বিধা। একটু সন্দেহের দোলায়ই বুঝি দুলে উঠল ওর মন। মেয়েটি চোখের পাতা তুলল। ছেলেটির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল। দেখল বুঝল।

ওর চোখ দুটি ঝক্-ঝক্ করে উঠল। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ও নরম গলায় মৃদুস্বরে বলল,

'প্রিয় ..... প্রিয়তম, কোন চিন্তা করো না। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি যেমন আছ তেমনি শুয়ে থাক, আমি দেখছি .....।

মেয়েটি হাত বাড়াল। বিছানার ঘেরাটোপ পেরিয়ে বিশাল হাতখানা এগোল দরজার কাছে—আলোর সুইচের দিকে। লম্বা কার্পেট পেরিয়ে চলে গেল দানবীয় হাতখানা। বিরাট ঘরখানা ছায়ায় ঢেকে গেল।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ছেলেটি দেখল মেয়েটির অমানুষিক হাতের দানবীয় আঙুলগুলো পৌঁছলো দরজার কাছে।

'খুট'।

আলো বন্ধ করে দিল রহস্যময়ী নারী।